ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত

প্রতিভা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ

১৩২০

সম্পাদক

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার এম এ বি এল

বার্ষিক মূল্য ২।৶

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

প্রতিভা

৩য় বর্ষ বৈশাখ ১৩২০ ১ম সংখ্যা

উপবাস ও ক্লান্তি

(চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত)

উপবাস সম্বন্ধে আমি একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষা করিয়াছিলাম। অদ্য সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। উপবাস কালে যে সকল শারীরিক ও মানসিক অনুভূতি হয় তাহা লক্ষ্য করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

শেষ বার সাধারণ আহারের ২৪ ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় বার আহার করা হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে অন্ন বা জল কিছুই গ্রহণ করা হয় নাই। নিয়মিত ভোজন কালের পর দুই ঘণ্টা অতীত হইলে ক্ষুধার তাড়না সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছিল। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের ও মাংসপেশী সমূহের শক্তি এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়া উঠে। সামান্য শারীরিক চেষ্টার ফলেই মাথা যেন ঘুরিয়া আইসে; চারিদিক যেন অন্ধকার হইয়া উঠে। কিন্তু ঐ অবস্থাটা ক্রমে ক্রমে কাটিয়া গেল। দুই ঘণ্টার মধ্যে শরীর পুনরায় প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে ক্ষুধার আর কিছুমাত্র তাড়না ছিল না। শরীর একটু দুর্ব্বল কিন্তু খুব লঘু বলিয়া বোধ হইল। ঐ সময়ের পর প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া খুব প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম করা হইয়াছিল। কল্পনাশক্তি ও মনোযোগ দিবার শক্তি এই সময়ে সাধারণ অবস্থার অপেক্ষাও অধিকতর বিকসিত হইয়া উঠে। তারপরে বৈকালিক ভ্রমণ অন্য দিবসের মত মাত্রই করা হইয়াছিল। ঐ সময়ে শরীরকে পূর্ব্বদিনের অপেক্ষা কতকটা দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইয়াছিল। ভোজনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানসিক শক্তি অব্যাহত ছিল।

এক্ষণে ঐ সকল ঘটনার কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। শরীর একটা ষ্টীম ইঞ্জিনের মত যন্ত্রবিশেষ। ইঞ্জিন কাজ করে কয়লা খাইয়া। কয়লা পুড়িয়া যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তির বলেই ইঞ্জিন নিজের কাজ করিয়া থাকে। শরীরযন্ত্রও খুব ছোট ছোট বহুসংখ্যক ইঞ্জিনের দ্বারা নির্ম্মিত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঞ্জিন গুলিই প্রাণবিদ্যাবিদের কোষ (Cell)। যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়া এই শরীর নির্ম্মাণকারী এই কোষগুলির সকলের বা কতকাংশের সমবেত চেষ্টার ফলে সংঘটিত হইয়া থাকে। এই আমি হাত নাড়িয়া একটু লিখিলাম তাহাতে আমার হাতের মাংশপেশীর কতকগুলি কোষ (Cell) বা ক্ষুদ্র ইঞ্জিন খানিকটা কার্য্য করিয়া লইল। সাধারণ ইঞ্জিন যেমনই খানিকটা কাজ করিয়া লয় উহা তেমনই খানিকটা কয়লা খাইয়া ফেলে অর্থাৎ পুড়াইয়া ফেলে। কয়লা পুড়িয়া তাপ উৎপাদন করে, তাপ শক্তি (energy) উৎপাদন করে এবং শক্তি কার্য্য উৎপাদন করে। আমাদের ছোট ইঞ্জিনগুলি অর্থাৎ মাংশকোষগুলি এ বিষয়ে উক্ত সাধারণ ইঞ্জিনগুলি হইতে কোনও অংশে ভিন্ন নহে। উহারা যেমনই একটু

একটু কার্য্য করে তেমনই একটু একটু খাদ্য খাইয়া ফেলে, অর্থাৎ পুড়াইয়া ফেলে। ইহা হইতে তাপ ও তাপ হইতে শক্তি উদ্ভূত হয়। দাউ দাউ করিয়া না জলিয়াও কোন কোন জিনিস ধীরে ধীরে আলোক উৎপাদন না করিয়াও পুড়িয়া যাইতে পারে। এক টুকরা ফসফরাস রৌদ্রে রাখিলে উহা শীঘ্র জলিয়া পুড়িয়া যাইবে, কিন্তু উহাকে কোনও শীতল স্থানে রাখিলে উহা অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে পুড়িবে। এক্ষেত্রে কোনও আলোক উৎপন্ন হইবে না। তবে তাপ পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই সমান মাত্রায়ই হইবে। শরীরের শক্তি উৎপাদকের জন্য যে জলন ক্রিয়া তাহা এইরূপ ধীরে ধীরেই সংঘটিত হইয়া থাকে।

মাংশকোষ সমূহের মধ্যে যে অল্পমাত্রায় খাদ্য সঞ্চিত থাকে তাহা তাহাদের কার্য্য করিবার ফলেই নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। মাংস-কোষগুলির পাশ দিয়া রক্তবাহী নল সকল গিয়াছে। রক্ত যেন ফেরিওয়ালা, সে বাড়ী বাড়ী খাবার ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে। যাহার প্রয়োজন হয় সে উহার কাছ হইতে খাদ্য লইতেছে। মাংসকোষগুলিও রক্তের নিকট হইতে খাদ্য লইয়া নিজেদের ভাণ্ডার পূরণ করিয়া লয়। রক্তের ভাণ্ডারে ইহাতে যে ক্রমশঃ টান পরে তাহা বলাই বাহুল্য। রক্ত উদরের নিকট যাইয়া নিজের ক্ষতি পূরণ করিয়া লয় (অবশ্য উদরে যদি কিছু খাদ্য থাকে তবেই সে ক্ষতি পূরণ হইতে পারে)।

ভাবা যাউক, একটা প্রকাণ্ড যৌথ পরিবারে নিয়মিত খাবারের সময়ের ঠিক একটু পূর্ব্বেই সমস্ত অন্নব্যঞ্জন নষ্ট হইয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ীতে মহা গোলমাল লাগিয়া গেল; ছেলে পিলেগুলো কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিল; কর্ত্তারা ছুটোছুটি করিতে লাগিল, গিন্নিরা চেঁচামেচি করিতে লাগিল। নিয়মিত সময়ে উদরে দুটি অন্ন না পড়িলে দেহরূপ প্রকাণ্ড যৌথ পরিবারটির অবস্থাও ঐরূপ হইয়া পড়ে। মাংসকোষ নিজের ভাণ্ডার শূন্য দেখিয়া রক্তের কাছে গেল; দেখিল রক্তের ভাণ্ডার শূন্য; রক্ত উদরের কাছে গেল, দেখিল সেখানেও কিছু নাই। কাজেই প্রথমে খানিকটা মহা গোলযোগ চলিল, শরীর-যন্ত্র যেন বিকল হইয়া উঠিল, উহাই ক্ষুধার তাড়না। কিন্তু ঐ যৌথ পরিবারের কোলাহলটা খুব বেশীক্ষণ যে স্থায়ী হয় এমন নহে। গিন্নিরা তখন নিজেদের পোটলা, পুটুলী, প্যাটারা প্রভৃতি হাটকাইয়া চিড়ে মুড়কী, আমসত্ব প্রভৃতি বাহির করিয়া প্রথমতঃ অবোধ ছেলেগুলোকে শান্ত করিল; পরে কর্ত্তাদের ও নিজেদেরও কতক কতক ব্যবস্থা করিল। শরীররূপ যৌথপরিবারেও কতকটা ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। শরীরের মধ্যেও কতক কতক খাবার সঞ্চিত থাকে, শরীর-নির্ম্মাণকারী কোষগুলি দুর্ভিক্ষের সময় সঞ্চিত খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করে। শরীরের কতকগুলি কোষ ভাণ্ডারীর কাজ করে। তাহারা নিজেদের দেহের মধ্যে উক্তবিধ খাদ্য সঞ্চিত রাখে। যকৃতের কোষগুলিতে শ্বেতসারের মত একপ্রকার পদার্থ (Glycogen) সঞ্চিত থাকে। চর্ব্বিসঞ্চয়কারী কোষগুলির মধ্যে (Adepose tissue) চর্ব্বি সঞ্চিত থাকে। ক্ষুধার তাড়না যখন চরম হইয়াছে, অথচ উদরের নিকট হইতে কোনও সাহায্য পাওয়া গেল না, তখন ভাঁড়ারীগুলি নিজেদের খাদ্য-ভাণ্ডার বাহির করিয়া একটু একটু করিয়া রক্তপ্রবাহ ঢালিয়া দিতে আরম্ভ করে। ক্ষুধার্ত্ত কোষগুলি ইহা হইতেই নিজ নিজ অভাব পূরণ করিতে থাকে। এইরূপে ক্ষুধার তাড়না কমিয়া যায়; উহাকেই সাধারণ ভাষায় বলে ক্ষুধা পড়িয়া যায়।

নিয়মিত উপবাস করিয়া একটা বিশেষ লাভ এই যে, শরীরের ভাণ্ডারী কোষগুলি নিজেদের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে শিখে। যাহারা নিয়মিত উপবাস করে তাহাদের উপবাসে তত কষ্ট হয় না; কিন্তু যাহারা কালে ভদ্রে এক আধ দিন উপবাস করে, তাহারা বড় কষ্ট পায়। তাহাদের দেহের ভাণ্ডারী কোষগুলি বহুকাল সঞ্চিত খাদ্য ভোগ দখল করিয়া করিয়া উহাকে একেবারে নিজস্ব ভাবিয়া ফেলে, অন্য কোষগুলিকে সহজে উহার ভাগ দিতে চাহে না।

ক্ষুধা পড়িয়া যাইবার কিছুকাল পরে মস্তিষ্কের কতকগুলি বৃত্তি যে বিশেষ প্রখর হইয়া উঠে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রাচীন কালে যে [illegible]

ছিল সে ব্যবস্থা যে একান্ত নির্ব্বুদ্ধির পরিচায়ক নহে এবং কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের যে সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, উপবাস-ক্লিষ্ট মনে মনঃসংযোগ অসম্ভব তাহাও ধ্রুব সত্য নহে। কি কারণে উপবাসের পরও মস্তিষ্কের কার্য্য বন্ধ হয় না তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করা যাউক। আমাদের পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের যৌথপরিবারে দুর্ভিক্ষের সময় সকল ব্যক্তিই যে সমান মাত্রায় আহার্য্য পাইয়া থাকে এমন নহে। ছেলেরা সকলের চেয়ে বেশী খাইবে। এমন কি বেশী অসুবিধার সময় মাতৃগণকে নিজেদের খাবারের সমুদায় অংশ ছেলে-দিগকে ত দিতেই হয় পরন্তু নিজেদের শরীরের কিয়দংশকে দুগ্ধের আকারে দিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতে হয়। শরীর-যন্ত্রেরও সকলবিধ কোষগুলিই যে সমান মাত্রায় শরীরে সঞ্চিত খাদ্য পাইয়া থাকে এমন নহে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী-নির্ম্মাণকারী কোষ সমূহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় ভাগ পাইয়া থাকে। আর সকল কোষের যত কষ্টই হউক না কেন তাহাদের ভাগে কিছু কম পরিবার যো নাই। শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতগণ (Physiologist) যে সকল জীব অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখিয়াছেন যে, হৃদয়যন্ত্র, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীতেই সর্ব্বাপেক্ষা কম অপচয় এবং মাংসপেশী-নির্ম্মাণকারী কোষগুলিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ অপচয় হইয়া থাকে। অতএব এক দিবসের উপবাসে যে মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষতি হয় না তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

পরন্তু উহার সুচারুরূপে কার্য্য করিবার একটি বিশেষ সুবিধা হয়। শরীরের মধ্যের রক্তের একটা নির্দ্দিষ্ট পরি-মাণ আছে। শরীরের যখন যে অঙ্গটা কার্য্য করে তখন সেই অঙ্গটাতেই অধিক রক্ত পরিচালিত হইয়া থাকে। সাধারণ পাঠকের ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইবে যে, অনেকক্ষণ কোদাল পিটিতেও যে রূপ পরিশ্রম লাগে এক [illegible] হজম করিতেও সেই রূপ বা ততোধিক পরিশ্রম লাগে। [illegible] হৃদয়ের মাংসপেশীগুলির দিকে রক্ত পরিচালিত [illegible] যে রূপ বেগে কার্য্য করে উদরের দিকে রক্ত পরিচালিত করিতেও সেই রূপই পরিশ্রম করে। উপবাসের পর যখন উদরযন্ত্রে রক্তের বিশেষ আবশ্যকতা নাই তখন শরীরের রক্ত প্রবাহের অধিকাংশ ভাগ বেগে মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়াকে পরিবর্দ্ধিত করিতে পারে।

শরীর এমনি ভাবে নির্ম্মিত যে, উহা দুইটি কঠোর কার্য্য এক কালে সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে। এক সঙ্গে একটা পরীক্ষার (Examination) জন্য প্রস্তুত হওয়া বা একটা একটা কাপ মেচ্ (Cup match) এর জন্য প্রস্তুত হওয়া দুইটি কার্য্যই এক সঙ্গে ঘটিয়া উঠিতে পারে না। অতিরিক্ত উদর-পূরণের পর দেহযন্ত্র গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিবার পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার সময় ছাত্রদিগকে যখন গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিতে হইতেছে তখন তাহাদের প্রচুর আহার্য্যের আবশ্যক নাই। সে কয় দিনের আহার্য্য যত দূর সম্ভব লঘুপাক ও স্বল্প হওয়া আবশ্যক।

শুধু যে মানসিক পরিশ্রমের পক্ষেই ঐ কথা সাজে এমন নহে শারীরিক পরিশ্রমের পক্ষেও ঐ কথা সাজে। যে দিন খুব গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, সে দিনের খাদ্য অতি অল্প হওয়া আবশ্যক। আমিও আমার বন্ধুগণের সহিত দূর পথ বা উচ্চ পর্ব্বতারোহণ করিবার সময় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি যে, যাহারা ঐ সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে শরীরে বলাধান হইবে বলিয়া উত্তম রূপ ভোজন করিয়া উক্তরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহারাই পরিশ্রমের কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোগ করিয়াছে। পাঠকের এক্ষণে বোঝা আবশ্যক আমি পরিমিত পরিশ্রমের কথা বলিতেছি না, গুরুতর পরিশ্রমের কথাই বলিতেছি। পরিমিত পরিশ্রমে ক্ষুধা বেশ উদ্দীপ্ত হয় এবং প্রচুর খাওয়াও যায়। কিন্তু গুরুতর পরিশ্রমের সময় শরীরের সমস্ত রক্ত শরীরের এমন কার্য্য সম্পাদন করিবার যন্ত্রগুলিতে যাওয়া আবশ্যক। উহারা উদরে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। শরীরের সমস্ত সঞ্চিত খাদ্য হৃদযন্ত্র, ফুস্ফুস্, স্নায়ুমণ্ডলী ও মাংসপেশীগুলীতে গিয়া তাহাদিগকে সবল রাখা

আবশুক। এ কারণ ঐ অবস্থাতে যাহারা অনাহারে স্বল্পাহারে বা জলমাত্র গ্রহণ করিয়া কার্য্য করে তাহারা ভুক্ত জনগণের অপেক্ষা অল্প ক্লান্তি অনুভব করে। এই কারণে কুস্তিগীর বা অন্যান্য ব্যায়ামকারীগণ বাজি লড়িবার দিন ও তাহার ঠিক পূর্ব্বের দুই এক দিন যথাসম্ভব লঘু আহার করিয়া থাকে। বাজি লড়িবার পূর্ব্বে তাহারা নিজেদের শারীর যন্ত্রগুলিকে যে রূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়া লয় তাহা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। তাহারা বাজি লড়িবার মাস-খানেক পূর্ব্ব হইতে শিক্ষা লইতে আরম্ভ করে। সে শিক্ষা আর কিছুই নহে সংযম, প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন, পরিমিত ব্যায়াম এবং বিশ্রাম। ব্যায়ামের মাত্রা দিন দিন বাড়িতে থাকে উহাতে তাহার 'দম' বাড়ে। 'দমটা' কি তাহা একটু বুঝা যাউক।

খুব দূর পথ চলিবার সময় কয়েক মাইল চলিবার পর একটা অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হয়। তখন পা আর যেন চলে না বলিয়া মনে হয়। এরূপ অবস্থায় আর খানিকক্ষণ চলিয়া গেলে একটু একটু করিয়া প্রথম ক্লান্তির অবস্থাটা অনেকটা চলিয়া যায় এবং তাহার পরে অনেক ক্ষণ বেশ চলা যায়। এই অবস্থাটাকে দ্বিতীয় 'দম' বলা যাউক। দৌড়ান প্রভৃতি স্বল্পকালব্যাপী গুরুতর পরিশ্রমের সময় প্রথম দম খুব সত্বরই চলিয়া যায় তাহার পর দ্বিতীয় দমটির প্রথম প্রথম সময় মত আসিতে কিছু বেশী মাত্রায় বিলম্ব হয়। কুস্তীগিরের শিক্ষার প্রভাবে তাহার প্রথম দমটির পর দ্বিতীয় দমটি খুব শীঘ্র উপনীত হয়, আর তাহার শরীরে বেশী ক্লান্তি আসে না। বর্ত্তমান কালের শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতদিগের এই মত যে, গুরুতর পরিশ্রমের কালে মাংসপেশীগুলির বিবিধ প্রকার ঘর্ষণও ক্ষয় নিবন্ধন উহাদের মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়। ঐ পদার্থ মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-মণ্ডলীকে অভিভূত করিয়া ক্লান্তি জনিত অবসাদের সৃষ্টি করে। শারীর যন্ত্রের কিন্তু আত্মরক্ষা করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। প্রথম দিন শরীর ক্লান্তিজনক বিষের দ্বারা কষ্ট পাইয়া পরদিন সে বিষের প্রতিষেধক এক প্রকার পদার্থ সে নিজেই সৃষ্টি করে। সেই পদার্থ তাহার শরীরে উপস্থিত থাকে বলিয়া পরদিন ঐ রূপ পরিশ্রমে আর সে রূপ ক্লান্তি আসে না। এই রূপে শরীরে প্রতিদিন উত্তর উত্তর অধিকতর পরিশ্রম করিবার ফলে শরীরের ক্লান্তি দূরীভূত হইতে আরম্ভ করে।

একটি মাংসপেশী যখন কার্য্য করিতেছে তখন উহার মধ্যে নিম্ন লিখিত তিনটির এক বা ততোধিকটির সমবায়ে ক্লান্তি উৎপাদিত হইতে পারে।

(১) তখন মাংসপেশীর মধ্যে তাপ উৎপন্ন হয়।

(২) মাংসপেশীর কোষগুলির বিবিধ ঘর্ষণও ক্ষয়ের ফলে বিবিধ দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়।

(৩) কোষগুলির আহার্য্য সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

শরীরে অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হইলে যে পরিশ্রম করিবার কালে শীঘ্রই শ্রান্তি আইসে, তাহা এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের সকল লোকেই অবগত আছে। শীতের দিনে গ্রীষ্মের দিনের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করা যায়। পরিশ্রম কালে শরীরে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়; শীতকালে চারিদিকের বায়ু শীতল বলিয়া শরীরের তাপ শীঘ্রই সমতা প্রাপ্ত হয় কিন্তু গ্রীষ্মের দিনে কিম্বা শরীর যদি অধিক বস্ত্রাবৃত থাকে তাহা হইলেও শরীর হইতে তাপ সহজে বাহির হইতে পারে না এ কারণ সত্বরই ক্লান্তি উপস্থিত হয়। খালি গায়ে দূর পথ ভ্রমণ বা দৌড়ান যত সহজে করা যায় প্রচুর গরম বস্ত্র পরিধান করিয়া সে রূপ করা যায় না।

শরীর যখন পরিশ্রম করে তখন শরীরে সঞ্চিত খাদ্য-সম্ভার ক্রমশঃ নিঃশেষ হইতে থাকে। চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া ২৪ ঘণ্টা উপবাস করিলেও যে ফল হয় ঘণ্টা চার পাঁচ শিকার করিলেও সেই ফলই হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের উপায়ে শরীরস্থ খাদ্য সামগ্রী ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয় দ্বিতীয় উপায়ে উহা অতি সত্বর নিঃশেষ হয়। প্রথমতঃ রক্তে সঞ্চিত খাদ্য ও যকৃৎ-যন্ত্রে সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষ হয় পরে চর্ব্বি-সঞ্চয়কারী কোষগুলিতে সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষ হয়; সর্ব্বশেষ শরীর-গঠনকারী মাংসপেশী প্রভৃতির ক্ষয় হইতে থাকে। উপবাস ও পরিশ্রমের এই শেষোক্ত অবস্থাই

ক্ষতিকর। প্রথমকার অবস্থাগুলি নহে। যেমন হস্তের কার্য্য পরিশ্রম করা,মস্তিষ্কের কার্য্য চিন্তা করা ; তেমনই চর্ব্বি-সঞ্চয়কারী কোষগুলির কার্য্য চর্ব্বি সঞ্চয় করা ও প্রয়োজন মত তাহা বাহির করিয়া দেওয়া। কার্য্য করিতে না পাইলে যেমন হস্তের মাংসপেশী সমূহ বিশীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, মস্তিষ্ক জড় হইয়া পড়ে, তেমনই মাংসপেশী সমূহও কার্য্য করিতে না পাইলে ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাহারা শরীরের হিতার্থ ব্যবহৃত না হইয়া শরীরই তাহাদের হিতার্থ ব্যবহৃত হইতে থাকে। শরীরের চর্ব্বি-সঞ্চয়কারী কোষগুলিকে কার্য্য দিতে হইলে শরীরকে হয় মাঝে মাঝে উপবাস করিতে হইবে, নয় মাঝে মাঝে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। শরীরের প্রত্যহ যতটুকু ক্ষয় হয় সেই ক্ষয় পূরণ করিবার জন্য যিনি পরিমিত ও নিয়মিত আহার করেন তাহার উপবাসের আবশ্যক নাই ; তাহার শরীরে অনাবশ্যক দ্রব্য কিছুই নাই। তাদৃশ নিয়মে থাকা শুধু যোগীরই সম্ভব। এজন্য যোগীর পক্ষে উপবাস ও পরিশ্রম দুইই অনাবশ্যক।

কিন্তু সাধারণ লোকে, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন মত যাহারা প্রচুর আহার গ্রহণ করেন, তাহাদের পক্ষে সুস্থ থাকিতে হইলে মাঝে মাঝে প্রচুর পরিশ্রম বা উপবাসের প্রয়োজন। পরিশ্রম বা উপবাসের ফলে তাহাদের চর্ব্বি সঞ্চয়কারী কোষগুলি উপযুক্তরূপে কার্য্য করিতে শিখে। পাকস্থলী ও যকৃৎ-যন্ত্র বিশ্রাম করিবার অবকাশ পায়। তদ্ব্যতীত শরীর যে সামান্য ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া পড়ে না ইহাও একটা কম লাভ নহে।

পৃথিবীর সুস্থ ও সবল জাতিগণ শারীরবিধান শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও অভিজ্ঞতার ফলে বা প্রয়োজনের অনুরোধে উপবাস ও ক্লান্তি সম্বন্ধীয় উপরি উক্ত নিয়মগুলি পালন করিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণকে ব্রতাদিতে উপবাস করিতে হইত কিন্তু যোগীর পক্ষে উপবাস ছিল না। ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ-কালে বা শিকারের সময় উপবাস ও কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। বর্ত্তমান ইউরোপের দীর্ঘজীবী পণ্ডিতগণ মিতাহারী ও মিতাচারী। গৃহী কর্ম্মীগণ কঠোর পরিশ্রমী। তাহাদের শিকার প্রভৃতিতে উপবাস ও ক্লান্তি অভ্যাস। অসভ্যজাতিগণ প্রায় বলিষ্ঠ ও সুস্থ! তাহারা কখনও প্রচুর খাদ্য পায়, কখনও বা তাহাদিগকে সুদীর্ঘ কাল অনাহারে কাটাইতে হয় ও শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। আমি দেখিয়াছি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাহারা ইউরোপীয়দিগের স্বাস্থ্যবিধির অনুসরণ করেন কিংবা যাহারা প্রাচীন দেশীয় প্রথানুসারে চলেন তাহারা উভয়েই সুস্থ ও দীর্ঘজীবী। কিন্তু যাহারা খিচুড়ী শ্রেণীর বাঙ্গালী তাহারাই অসুস্থ ও অকালমৃতের দল পুষ্টি করিয়া থাকেন। *

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* Extracts from—

Studies of Inanition In Its Bearing upon the Problems of Growth I. By Sergius Morgulis.

From Archiv fur Entwicklungsmechanic Der Organismen, Band XXXII, Heft 2, May 1911.

"The discontinuance of the necessary supply of food materials from the outside induces a state of inanition in the organism, the latter being now compelled to consume its own substance"

"Men are known to have fasted for periods varying from 7 to 50 days without any deleterious consequences to their well-being."

In experimental inanition, on the other hand, the muscles are heavily taxed for the maintenance of the organism.

Every animal, no matter how high or how low it stands in the scale of classification, has the capacity to withstand a more or less protracted period of want of food, regaining its original strength when brought under favourable conditions. That such an inherent quality may be brought into prominence under the demand of recurring vicissitudes, I hope, will be conceded.

From investigations upon the influence of inanition on rabbits it is known that there is a distinct tendency for these animals to accumulate fat upon a return to normal diet.

রূপহীনা

১

সে যে আমায় এত ভালবাসে, শুধু
আপন গুণে ;
এই কথাটিই কাঁটার মত বিঁধে আছে
আমার মনে।
রূপহীনা করলে কেন ? হায় গো বিধি !
এ জীবনে এত সুখী করবে যদি।
জীর্ণ তরীখানা,
পাঠিয়ে দিলে সাগর পারে
বইতে মাণিক সোনা !

২

কাঙ্গাল ক'রে পাঠিয়ে দিলে দাতার পাশে
দীনের বেশে ;
দেবার কিছু নেইকো, শুধু নিতেই হবে
হেসে হেসে।
আর সকলে মাথা তুলে আসবে যাবে,
উচিত মূল্য চুকিয়ে দিয়ে জিনিষ নেবে।
আমি দুয়ার ধোরে—
জয়-ধ্বনি করবো ল'য়ে
দানের বোঝা শিরে।

৩

মর্ম্ম-শোণিত চুমুক দিয়েও হয় নি আমার
অধর রাঙা।
শিরা জুড়েও বাজেনিকো আমার বীণা
এতই ভাঙা।
অনেক আশার প্রদীপটি মোর,—তৈলহীন !
জেলে, নিবে ভেঙ্গে গেছে অনেক দিন।
পাঁজরখানি মুছে,
হৃদয় জেলে ব'সে আছি,—
আঁধার নাহি ঘুচে।

৪

আমার বনে সুগন্ধ ফুল বিমল সরিৎ
নেইকো বলে,
সে বলে—সে তৃপ্ত শুধু ধুঁতরো ফুল
আর গঙ্গাজলে।
সে মহত্ত্বে উঠছে বেড়ে ত রি দীপ্তি,
পূজা কোরে আমার ত গো হয়না তৃপ্তি।
হায় গো কঠিন বিধি !
করলে নাকো যোগ্য
দিলে অধিকার যদি।

৫

হে আরাধ্য মম !
ইচ্ছা ছিল নাকো, তবু তোমায় আমি
দিলাম ফাঁকি ;
তুমি কিছুই চাইলে নাকো, পুরিয়ে দিলে
আমার বাকী।
ছিল না মোর কিছু, তবু চাইলে পরে
যেচে নিতাম ত্রুটির ক্ষমা পায়ে ধোরে।
শুধু বিপুল দানে
ডুবিয়ে দিলে নারীর গর্ব্ব
যা ছিল মোর প্রাণে।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত।

শিশুর পরিণতি

শিশুকে ঠিক বুঝিতে হইলে, তাহার জীবনের ক্রম পরিবর্ত্তনের যুগগুলি বেশ করিয়া জানা আবশ্যক।

প্রথম অবস্থায়, শিশুর যত কিছু চৈতন্য (Consciousness) তাহার ক্ষুধানুভব শক্তির মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। তাহার স্পর্শ-বোধ-শক্তি দেহের অন্যত্র তেমন থাকে না যতটা মুখের মধ্যে। এই জন্য তাহার পায়ে সুড়সুড়ি দিলে, সে তাহা টের না পাইতেও পারে, কিন্তু মুখে কিছু দিলে

তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে। এ সময় শিশু-জীবনের একমাত্র সেব্য দেহের পরিপোষ্য ভিন্ন আর কিছু নহে। এই কারণেই তাহার সকল চৈতন্য একমাত্র মুখ গহ্বরেই নিহিত থাকিতে দেখা যায়। তাহার দেহের পোষণ কার্য্যটির কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটিলেই সে পরিতৃপ্ত রহে; ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলেই ক্রন্দন করিতে থাকে। সাধারণ ৭।৮ মাস পর্য্যন্ত শিশু এই ভাবেই জীবন অতি-বাহিত করিতে থাকে।

ইহার পর তাহার চৈতন্যের মাত্রাটি একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহা যতই বাড়িতে থাকে শিশু একে একে তাহার আপনার অধিকার বুঝিয়া লইতে আরম্ভ করে। তাহার জামাটি, তাহার গেলেসটি, তাহার দুধ খাওয়ার বাটিটি এমন কি তাহার মাথায় দেওয়ার বালিশটি পর্য্যন্ত চিনিয়া লইতে পারে। ফলতঃ এ সময় হইতে শিশু আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া অনুধাবন করিতে সক্ষম হয়। শিশুর এই যে ভেদজ্ঞান ইহা একান্ত স্বাভাবিক। তাহার পরিণতির পক্ষে এই ভেদজ্ঞানের বিশেষ সার্থকতা আছে। এই স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানটি যাহাতে যথোচিত বিকাশ পায়, পিতা মাতার সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এ সময় তাহাকে উদার নীতির মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে গেলে, তাহার ভবিষ্যৎটি এককালীন নষ্ট করা হয়। আমরা এই কথাটি যেন বিস্মৃত না হই যে, স্বার্থপরতা হইতেই পরার্থপরতার উৎপত্তি হইয়াছে। যে ব্যক্তি আপনার অর্থ বুঝে না সে পরের অর্থ কি করিয়া বুঝিবে? শিশুকে যদি বলা যায়, গেলাসটি তাহারই ইহাতে অন্যের কোন অধিকার নাই, তবেই সে হয় তো তাহার ছোট ভাই কিংবা ভগ্নীকে হৃষ্ট চিত্তে উহা দিতে পারিবে; জোর করিলে ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। এই রূপ স্বভাব-জাত উদারতা হইতেই ক্রমে ক্রমে স্বার্থ-ত্যাগ প্রবৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে।

এত দিন পর্য্যন্ত শিশু কেবল তাহার নিজের বিষয় লইয়াই ব্যস্ত ছিল, এখন হইতে সে আপনাকে ছাড়া অপরকেও ভাবিতে পারে কিন্তু সে অপর আর কেহ নয় তাহার বাপ, মা, ভাই, বোন প্রভৃতি নিতান্ত আপনার জন। ইহাও এক রূপ স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কি বলা যায়? ইহা স্বার্থপরতা, কিন্তু শিশুর পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক এবং পরম হিতকর।

অতঃপর তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি আর একটু পরিসর প্রাপ্ত হইতেই তাহার ঘরখানি তাহার নিকট আপনার রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। ঠিক যেন—

"খেলার গৃহ হ'য়ে উঠে বিশ্বজগৎ
খোকা তার মাঝ খানেতে বেড়ায় ঘুরে।"

এ ঘরখানিতে যেন আর কাহারও কোন অধিকার নাই, সে যেন এখানকার একমাত্র অধীশ্বর। বাড়ীতে কত ঘর আছে খোকার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। তাহার যত ভাবনা আপনার এই ঘরখানি লইয়া। এখানকার সকল দিকে সেই তাহার পূর্ণ অধিকার। এখানকার সামান্য জিনিসটাও স্থানান্তরিত করিতে কাহারও কোন অধিকার নাই; করিলে যতক্ষণ তাহা পুনঃ স্থাপিত না হয় ততক্ষণ শিশুর যেন আর শান্তি নাই। এ সময় এই বিপুল বিশ্বে দুই চারি জন ব্যক্তি ছাড়া আর সকলকে, শিশু একান্ত অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই দুই চারি জনকে না হইলে তাহার চলিতেই পারে না। শিশুর নিকট এ দুই চারি জনের মত ভাল লোক আর থাকিতে পারে না। ইহা-দের ক্ষমতা যে তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী শিশু তাহা জানে বটে কিন্তু বুদ্ধি বিষয়ে ইহারা তাহার অনেক নিম্নে, এই রূপ তাহার বিশ্বাস। এমন মনে করিবার একটা নিগূঢ় কারণ আছে। সে কারণটি এই যে, শিশু এ সময় যে জগতে বাস করে তাহা আমাদের এই বস্তুতন্ত্রময় বাস্তব জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহার জীবন স্বতন্ত্র, চিন্তা স্বতন্ত্র, আদর্শ স্বতন্ত্র। সে তাহার নিজের গড়া একটা কল্পনা-লোকে বাস করে। তাহার সকল বিষয়েই যেন একটা মোহিনী মায়ার ছায়া থাকে। তাহার জগতে—

"সেথা ফুল, গাছ, পালা
নাগ-কন্যা, রাজবালা
মানুষ, রাক্ষস, পশু, পাখী

যাহা খুসী তাই করে
সত্যেরে কিছু না ডরে
সংশয়েরে দিয়ে যায় ফাঁকি"।

তাই বলিয়া শিশুর জগৎ যে মিথ্যা আর আমাদের জগৎ যে সত্য, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। স্বতন্ত্র হইলেও এই দুই জগৎই তুল্য সত্তাকার। কথাটা বেশ করিয়া তলাইয়া বুঝা আবশ্যক। আমরা মনে করি আমরা এই জগৎখানিকে যে ভাবে দেখি শিশুর সে ভাবে দেখিবার শক্তি না থাকাতেই এই বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু কথাটা প্রকৃত তাহা নহে। আসল ব্যাপারটি এই যে, শিশু জগৎকে দেখে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্টিতে। সে তো আমাদের মত এই সঙ্কীর্ণ পৃথিবীর একটি কোন আশ্রয় করিয়া থাকে না। তাহার জগতের আদিও নাই, অন্তও নাই। সেখানকার সমাচার কেবল শিশুই রাখে, আমাদের রাখার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাহার কাছে অসম্ভব যে খুবই সম্ভব হয়। কেন না—

"খোকা থাকে জগৎ মায়ের
অন্তঃপুরে—
তাই সে শুনে কত যে গান
কতই সুরে।
নানারঙে রাঙিয়ে দিয়ে,
আকাশ পাতাল,
মা রয়েছেন খোকার খেলা—
ঘরের চাতাল ;
সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
সূর্য্য-শশী
খোকার সাথে হাসে যেন
এক বয়সী।
সত্য বুড়ী নানারঙের
মুখোস পরে
শিশুর সনে শিশুর মত
গল্প করে।"

আমরা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা যদি এ সময় শিশুকে জীবনের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে, আমাদের অবস্থাটি নিতান্তই হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের সমস্ত যুক্তি, সকল তর্ক শিশুর নিকট নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও অগ্রাহ্য হইয়া দাঁড়ায়। সে আমাদের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া বলিতে থাকে, "না তা নয়। ও কথা ঠিক হইতে পারে না।" বাস্তবিক ব্যাপারও ঠিক তাহাই। আমরা "পক্ষিরাজ" ঘোড়া দেখি নাই সত্য, তাই বলিয়া ইহা যে নাই শিশু তাহা বিশ্বাস করিতে একেবারে অসমর্থ। সে আমাদের অজ্ঞতায় একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ে। সে মনে মনে আমাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া থাকে। সে মনে ভাবে আমরা যেন চোক থাকিয়াও কাণা।

খোকা তাহার মাকে বলিতেছেন—

"আমার রাজার বাড়ী কোথায়, কেও জানে না সে ত!
সে বাড়ীটি থাকত যদি লোকে জান্‌তে পেত ?
রূপো দিয়ে দেওয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত ;
থাকে থাকে সিঁড়ি উঠে শাদা হাতীর দাঁত।
সাত মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সুয়ো রাণী।
সাত রাজার বাড়ী কোথায় শোন মা কাণে কাণে,
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেই খানে।"

আছে যে তাহার প্রমাণ !

"তোমরা যখন ঘাটে চল স্নানের বেলা হ'লে
আমি তখন চুপিচুপি যাই সে ছাদে চলে"

ইহার পর কি আর অবিশ্বাস করা চলেতে পারে ? শিশু যাহা বলে, তাহার একটি কথাও মিথ্যা নহে, সকলই সত্য। শিশুর আত্মা ত আমাদের ন্যায় শত শৃঙ্খল শত বন্ধনে আবদ্ধ নহে। সে যে সম্পূর্ণ মুক্ত তাই তাহার গতি অবাধ। আমাদের বুদ্ধিতে যাহা অসম্ভব শিশুর নিকট তাহা মোটেই অসম্ভব নয়।

সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, শিশুরা মিথ্যা স্পর্দ্ধা এবং অমূলক কাল্পনিক গল্প করিতে বড়ই ভালবাসে। সময় সময় তাহার এই সব আজগুবি গল্প আমাদের নিকট বিশেষ বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায় এজন্য হয়ত আমরা তাহাকে তাড়নাও করিয়া থাকি। ইহার মত নির্দ্দয় ব্যবহার আর

কিছুই থাকিতে পারে না। খোকা আপনার বীরত্বের বড়াই করিয়া বলিতেছেন—

"ধূ ধূ করে যে দিক পানে চাই,
কোন খানে জন মানব নাই"

খোকার মা পাল্কিতে আছেন, খোকা তাঁহার সঙ্গী হইয়া যাইতেছেন।

"এমন সময় হাঁরে রে রে রে রে
ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে;
তুমি ভয়ে পাল্কিতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করচ মনে!
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটা বনে
পাল্কি ছেড়ে কাঁপচে থরোথরো!
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে
আমি আছি ভয় কেন মা কর
হাতে লাঠি মাথায় কোঁকড়া চুল
কাণে আছে গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি দাঁড়া খবরদার!
এক পা কাছে আসিস্ যদি আর
এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার
টুক্‌রো করে দেবো তোদের মেরে।"

ইহার পর জোড়া দিঘির মাঠে খোকার সহিত ডাকাতদের তুমুল লড়াই বাধিল। মা ভাবছেন খোকা এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে বুঝি মারাই পড়ল। কিন্তু—

"আমি তখন রক্ত মেখে মেখে
বলচি এসে লড়াই গেছে থেমে
তুমি শুনে পাল্কি হ'তে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্চ আমায় কোলে
বলচ "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কি দুর্দ্দশাই হত তা না হলে।"

খোকার এমন বীরত্ব কাহিনী যে কত আছে তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। এগুলি মিথ্যা বলিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। খোকার জগৎ বিস্ময়ের আধার। খোকার জগতে সবই সম্ভব হয়। এ কথাটি যিনি না বুঝেন, শিশুর সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই রাখা উচিত নয়।

ইমার্সন্ (Emerson) কল্পনাকে (imagination) হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (angel of mind) বলিয়াছেন। ইহার আগমনে মানুষের সকল চিন্তা, সকল কাজ ধন্য হয়। শিশু যত দিন এই দেবীটির সংসর্গে কালাতিপাত করিতে পারে, তাহার পক্ষে ততই মঙ্গল মনে করিতে হইবে। শিশুকে তাহার শৈশবের চিরউর্ব্বর, ছায়ামণ্ডিত ক্ষেত্র হইতে জোর করিয়া তুলিয়া আনিয়া আমাদের এই তাপ-দগ্ধ নীরস বাস্তব জীবনের মধ্যে প্রোথিত করিতে নাই, সেই রূপ করিলে তাহার স্বাভাবিক পরিণতির এবং তাহার বুদ্ধি বিকাশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি সাধন করা হয়।

আর কেহ শিশুর মত এত অনুকরণপ্রিয় নহে। সে যাহা দেখে, তাহাই অনুকরণ করিতে থাকে। এই কারণে শিশুকে যে স্থানে "মানুষ করা" হয়, সেখানকার আব-হাওয়ায় যাহাতে আমাদের বাস্তব জীবনের গন্ধ স্পর্শ না করে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহা এত ছোঁয়াচে যে, যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই ঘোরতর সংসারী করিয়া তুলে। ইহার সংস্পর্শে শিশু অকাল-পক্ক হইয়া উঠে। শিশুর জীবনটি একটা মায়াজাল দ্বারা যেন আচ্ছাদিত থাকে। সে যতই বড় হইতে থাকে, এই মায়াজালটী একটু একটু করিয়া অপসারিত হইতে থাকে। অকাল-পক্ক দিগের তাহা হইতে পারে না। ইহাদের মনোবৃত্তি ও শরীরবৃত্তি-সমূহ সম্যক পরিণত না হইতেই এই মায়াজালটি সহসা অপসৃত হয়; তাহার ফলে তাহাকে একেবারেই সত্যকার পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে হয়। এ সময় জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য্যটি বুঝিয়া উঠা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়।

এখন শিশুরা আমাদের কার্য্যকলাপ কি ভাবে দেখিয়া থাকে তাহাই দেখা যাউক। শিশু ভাবে—

"আমি যে কাজে রত
লইয়া খাতা ঘুরাই মাথা
হিসাব কসি কত;

আঁকের সারি হতেছে ভারি
কাটিয়া যায় বেলা
সে ভাবে দেখি মিথ্যা এক
সময় নিয়ে খেলা।"

আবার—

"মধু মাঝির ঐযে নৌকাখানা
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে,
কারো কোন কাজে লাগছে না ত
বোঝাই করা আছে কেবল পাটে
আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি
আমি একশো বড় দাঁড় আঁটি
পাল তুলে দিই চারটে, পাঁচটা, ছটা
মিথ্যে ঘুরে বেড়াই নাক হাটে।
আমি কেবল যাই একটি বার
সাত সমুদ্র তের নদী পার।"

এই রূপে আমরা যাহা কিছু করি শিশুর কাছে সেগুলি নিতান্ত বাজে-কাজ সময় নিয়ে খেলা ভিন্ন আর কিছু নয়! আমরা যেন জীবনের প্রকৃত কার্য্যটি হারাইয়া ফেলিয়া, মিছামিছি ঘুরিয়া মরিতেছি। আমাদের দুর্দ্দশায় তাহার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয়। আমাদের এই অবস্থাটি তাহার নিকট মোটেই লোভনীয় বলিয়া বোধ হয় না। শিশুর মনের এই যে ভাবটি এইটিই শৈশব ও যৌবনের মধ্যকার প্রকৃত বেড়া। এই বেড়াটি উঠাইয়া ফেলিলে শিশু একেবারে বয়স্কদিগের মধ্যে আসিয়া পড়ে। সেখানকার আবহাওয়া তাহার স্বাস্থ্য ও পরিণতির পক্ষে কোন মতেই সুবিধাজনক নহে।

আমাদের জীবনের যাত্রা-পথটি যতই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে ও-পারের কালো ছায়া একটু একটু করিয়া যতই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, শিশুর জীবনের প্রকৃত রহস্য আমাদের নিকট ততই যেন সুস্পষ্ট হইতেছে। এখন অজ্ঞাতকেও আমরা যেন জানিতে পারিতেছি, এই বস্তুতন্ত্রতাময়ী পৃথিবীই যে একমাত্র সত্য, ইহা ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে না এরূপ বলিতে যেন আমাদের সাহসে কুলাইতেছে না। এখন দৃষ্টও আমাদের কাছে যেমন সত্য অ-দৃষ্টও তাহার অপেক্ষা কম সত্য নহে। এখন বুঝিয়াছি তাঁহার দর্শন পাইতে হইলে তাঁহাকে হৃদয়ের রাজরাজেশ্বর করিতে হইলে শিশুর সেই সরল স্বাভাবিক পবিত্র বিশ্বাস-সলিল দ্বারা হৃদয়ের সকল পার্থিব ধূলি, কুটা, ময়লা, আবর্জ্জনা ধৌত করা আবশ্যক, তাহা না করিতে পারিলে হৃদয়রাজ হৃদয়ে বিরাজমান হইবেন না। এত দিনে শৈশব জীবনের প্রকৃত রহস্য আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মানব জীবনে শৈশব বড় সামান্য কাল নহে, ইহা নিরর্থক নহে। শিশুর আত্মার মধ্যে জীবনের কাজটি পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগচী।

বশিষ্ঠাশ্রম

(সন্ধ্যাচল)

শিলংএর চিত্র বড় সুন্দর; উহা নিবিষ্টভাবে উপভোগের জিনিষ—উহার ভিতর আলস্য জড়ানো যে একটি ঔদাস্য আছে উহা কৈশোরের সঙ্গীতের মত রহস্যপূর্ণ ঝঙ্কারে মনকে উতলা করিয়া তোলে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর বেলা দশ ঘটিকার সময় শিলং ছাড়ি। মটর ষ্টেশনে প্রত্যহ অসংখ্য লোক বিদায়-সম্ভাষণের জন্য জড় হইত। রাস্তার উভয় দিকে পাহাড়ের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্য ক্ষেত্র সৌর কিরণে সমুজ্জ্বল। নীচে জল প্রবাহ সো-সো শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে—কত ছোট বড় পাথর, নুড়ি স্রোতোজলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—তাহার এক দিকে বড় বড় সরল বৃক্ষ, একটির উপর একটি, সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে—দূরে ও নিকটে নগ্ন পাহাড়গুলি ছোট বড় পাথর বুকে পিঠে ও শীর্ষদেশে ধারণ করিয়া অনন্ত কাল হইতে প্রহরীর মত বর্ত্তমান; সেই পাহাড়ে যেইগুলি খুব উচু সেগুলির মাথায় সাদা সাদা ধোঁয়া।



[illegible] গ্রাম

[illegible] আর্ট প্রেস, ঢাকা।

বড়পানির নিকট দুই এক জায়গায় গাড়ী এত হেলিয়া ছুটে যে, প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয়, বুঝি বা আমাদিগকে লইয়া মটর এখন কোথায় অতল গুহায় ঝুপ করিয়া ছুটিয়া পড়িবে। পার্ব্বত্য পথের এই সব সুন্দর ও ভীতিজনক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অপরাহ্নে—প্রায় সাড়ে তিনটার সময় আমরা গৌহাটী পৌঁছিয়া জনৈক বন্ধুর বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করি।

গৌহাটী সহর হইতে বশিষ্ঠাশ্রম সাত মাইল দূর। ভোড়ে সাড়ে ছয়টার সময় আশ্বযানে আমরা আশ্রমের দিকে রওনা হই। নির্জ্জন মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল। জেলা বোর্ডের সুদীর্ঘ পথ মহর্ষির আশ্রম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মাঠের উপর দিয়া সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; সেই বায়ু-হিল্লোলে বৃক্ষ-পত্রের মৃদু মৃদু কম্পন, অদূরে অরণ্য-লীন পার্ব্বত্য শোভার কমনীয়তা ও স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য, বন-বিহগের কূজন-মাধুরী এবং চতুর্দ্দিকের প্রগাঢ় শান্তি আশ্রমের পথকে অপরূপ সৌন্দর্য্যশ্রীতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। পথের দুই ধারে দূর-বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। তখনও শস্য-ক্ষেত্রে ধান পাকিয়া উঠে নাই। আমরা প্রাণ ভরিয়া পর্ব্বত-সংলগ্ন প্রান্তরের দৃশ্য-বৈচিত্র্য দেখিতে লাগিলাম। যতদূর দৃষ্টি চলে দেখিলাম, শস্যরাশির শ্যামল শোভা ঊষার সিন্দুর-রাগে অনুরঞ্জিত হইয়া কেমন এক দুর্লভ কমনীয়তা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সে দৃশ্য কত মধুর!

বেলা ৯ টা বাজিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের কিরণ প্রখর হইতে লাগিল। পথ যেন আর শেষ হয় না, অশ্বের গতি ক্রমশঃই মন্থর হইতে মন্থরতর হইতেছে। বেলা দশটার সময় আমরা আশ্রমের এক মাইলের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। গাড়োয়ান গাড়ী থামাইয়া ঘোড়াগুলি ছাড়িয়া দিল, আমরাও এতক্ষণে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এখান হইতে নাগেশ্বর বীথিকার মধ্য দিয়া কানন পথ চলিয়াছে। রাস্তার উপরিভাগ নাগেশ্বর গাছের শাখা ও পাতায় ঢাকিয়া গিয়াছে—সূর্য্যরশ্মি পাতার ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করিতে পারে না। বৃক্ষস্থিত ঝিল্লি পোকার কর্কশ রব ও অদূরবর্ত্তী জলপ্রপাতের গভীর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এই স্থানটিকে নিয়ত মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা পদব্রজে এই অন্ধকারময় কানন-পথ দিয়া আশ্রমে পৌঁছিলাম।

বশিষ্ঠাশ্রম হিন্দুর নিকট পরম পবিত্র তীর্থ। পূর্ব্বে এই স্থান বেলতলা মৌজার অন্তর্গত ছিল, এখন উহা খাস মহালের অধীন। আসাম বিজয়-কালে কোচবিহারা-ধিপতি নরনারায়ণ, বেলতলা, ডরং ও বিজনী এই তিন স্থানে বিজয় চিহ্ন রাখিয়া যান। বেলতলার রাজা কোচবংশীয়। বর্ত্তমান নাবালক রাজার নাম চিদানন্দ চৌধুরী। রাজ্য শাসনে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এক জন ম্যানেজার (সরবরাহ কার) নিযুক্ত করেন। ভূতপূর্ব্ব রাজার দুই রাণী এখনও জীবিত আছেন। এই বেলতলা মৌজার বার্ষিক আয় ত্রিশ হাজার টাকা। রাজা গবর্ণমেণ্টের অধীনে স্থায়ী মৌজাদার। ইনি খাজানা সংগ্রহের জন্য শতকরা ত্রিশ টাকা কমিশন পান। অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌজাদারগণ শতকরা দশ টাকা পান। গৌহাটী হইতে চারি মাইল দক্ষিণে আশ্রমের পথে রাজবাড়ী দৃষ্ট হয়।

কথিত আছে রঘুকুল-পুরোহিত ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ কামাখ্যা দর্শনে আসিয়া এই আশ্রমে সমাধি-মগ্ন হন। এখনও জনসাধারণের বিশ্বাস এই পুণ্যাশ্রমে ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে পাতক নাশ হয়। সত্য সত্যই কি রামায়ণ বর্ণিত বশিষ্ঠমুনি গৌহাটী আসিয়াছিলেন? কালিকা পুরাণের ৩৬—৪০ অধ্যায়ে বশিষ্ঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি নরক কর্ত্তৃক কামাখ্যা-দর্শনে বাধা পাইয়া নরককে অভিশাপ দিয়াছিলেন। বশিষ্ঠাশ্রমের অনতিদূরে একটি বৃহৎ বটগাছের শিকড় দ্বারা নির্ম্মিত গোফা আছে। উহা অরুন্ধতী গোফা বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। অরুন্ধতী নাম দেখিয়া মনে হয় সম্ভবতঃ সেই অতীত যুগে রামায়ণের বশিষ্ঠই সস্ত্রীক এখানে ছিলেন। অপর কাহারও মতে বশিষ্ঠ ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। তদ্‌গোত্রীয় ব্যক্তি।

বশিষ্ঠাশ্রমের চতুর্দ্দিকে উচ্চ শৈল শ্রেণী। তাহার গাত্রে

আকাশচুম্বী নাগেশ্বর বৃক্ষ—দূর পার্ব্বত্য বনের মধ্য দিয়া আশ্রমের পূর্ব্বোত্তর হইতে সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা নাম্নী তিনটি পাষাণ-শয্যা-শায়িনী নির্ঝরিণী ভীম বলে ক্ষুদ্র ও বিশাল প্রস্তর খণ্ডের উপর আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে। সেই গম্ভীর গুম্ গুম্ ধ্বনি ও চতুর্দ্দিকের নীরব ভীষণতা পুণ্যাশ্রমকে কেমন একটা অলৌকিক মহিমায় ও স্নিগ্ধতায় সরস করিয়া রাখিয়াছে। উপরের তিনটি জলধারা কিছু নিম্নে আসিয়াই একত্র মিলিত হইয়া দুইটি স্রোতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই মিলন স্থানই বশিষ্ঠকুণ্ড। এই স্থানে একখানি শিলাখণ্ডোপরি মহর্ষি বশিষ্ঠ কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। পাণ্ডাজী ঐ যোগাসনে মহর্ষির পদচিহ্ন অদ্যাপি অঙ্কিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই আসন দেখিয়া বল্মীকীর বশিষ্ঠ-চিত্র মনে পড়িল, আর প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিলাম—

'পদচিহ্নে ব্রহ্মশক্তি আছে তথা মুকুট শিলাপরে,
সংসারের নরনারী-পূজ্য তাহা, নমি ভক্তিভরে।
পাপ-তাপ-শোক-জ্বালা রবেনাক হলে দরশন,
দেব লোকে ধ্রুব বাস মোক্ষ তার হয় যে সাধন।'

আমরা সকলে মিলিয়া এই স্রোতোজলে তৃপ্তির সহিত অবগাহন করিলাম। এ আবার যে সে অবগাহন নয়। প্রতি মুহূর্ত্তে জল ধারার প্রবল আকর্ষণে নীচের দিকে চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

জল প্রপাতের সন্নিকটে শিব মন্দির। ১৬৮৭ শকে (খ্রীঃ ১৭৬৫) এই মন্দির আহোমরাজ রাজেশ্বর সিংহের সময় দশরথ দুয়ারা কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের গঠন প্রণালীতে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় না। কামাখ্যা-মন্দিরের প্রায় দুই শত বৎসর পর ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের নিম্নভাগ সপ্ত কোণ বিশিষ্ট ; ইহার পরিধি ৫৬হস্ত। উপরিভাগ গুম্বজের আকার, ইহার উচ্চতা ৪০ ফিট্। মন্দিরের বাহিরে দেওয়ালের গায়ে একখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।* মন্দির-গাত্রে সিদ্ধি-দাতা গণেশ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর বিশেষত্বহীন প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে বশিষ্ঠ মুনির একখানি প্রতিমূর্ত্তি শয়ান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহা দুই হাত দীর্ঘ ও এক হাত প্রস্থ। এই প্রতিমূর্ত্তির নিকটেই একটি ঝরণা আছে। পুঞ্জীভূত অন্ধকারে উহা সহসা নয়ন-গোচর হয় না। শিব মন্দিরের সম্মুখভাগে একখানি টিনের (Corrugated iron) নাট মন্দির, তাহাতে যাত্রিগণ বিশ্রাম করিয়া থাকেন। উত্তরাংশে লোকাল বোর্ড নির্ম্মিত ডাক বাংলায় বিনা ভাড়ায় দুই এক দিন অবস্থান করা যায়। কুণ্ডস্থিত বৃহৎ শিলাখণ্ডের উপর তীর্থ-যাত্রিগণ স্নান ও তর্পণান্তে রন্ধন ও আহারাদি করেন। সময় অল্প বলিয়া আমরা স্নানান্তে মন্দির দর্শনের পর আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দুপুর একটার সময় বাসায় ফিরিয়া আসি। †

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

---

* বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনারেবল মিঃ গেট এই শিলালিপির ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন—

"Under the orders of king Rajeswar singha, Dasarath Duara, son of Taruna Duara and grand-son of Anuja Duara the Barphukan and Commander-in-chief, built (1673-1691 Saka) this temple in Vasisthasrama. Report on the Progress of Historical Researches in Assam (1897) *

(বশিষ্ঠাশ্রমস্থ শিব মন্দিরের শিলালিপি)

শ্রীরাম

† ৭ ৮ স্বস্তি নিস্সীম ভীমপরাক্রম প্রবল বৈরিবল প্রলয় কালানল সম্পূর্ণ গুণগণৈকধাম ভবভবানী পদারবিন্দ মকরন্দ মধুকর শক্রকুলকুমুদেন্দু শ্রীশ্রীমদ্রাজ রাজেশ্বর সিংহ নিদেশেন্দ্রনীলাবলম্বি মৌলি তদীয় চরণচারণচক্রবর্ত্তি কুন্দাবদাত কীর্ত্তিসমরধীরপারাবার গম্ভীর বিদ্যা বিদ্যোতিভাস্করণ শ্রীগোবিন্দ পদাব্জরো লব্ধ বর বাহিনী পতি শ্রীমদনুজদুবরা বৃহৎ ফুকণাত্মজ শ্রীমত্তরুণ দুবরা বৃহৎ ফুকণ তনুজ শ্রীমদ্দশরথাভিধেয় সেনাধ্যক্ষো বশিষ্ঠাশ্রম শিবোপরি প্রাসাদম চীকর ওর্কনাগরসেন্দু শাকে ॥ ১৬৮৭॥

উপলব্ধি

(১)

[শোভার ঘরে শোভা ও ঊষা উপবিষ্টা। শোভা কবিতা লেখে, বয়স পনরো, পরণে নীল শাড়ি। দেখিতে অপূর্ব্ব সুন্দরী। অবিবাহিতা। বন্ধু ঊষা বিবাহিতা। বয়স ষোড়শ। শ্যামবর্ণ, দেখিতে সুশ্রী। উভয়েই শিক্ষিতা। ঘরের এক দিকের টেবিলে কতকগুলা কবিতা পুস্তক, একটা খোলা। ঘরের জানালার মধ্য দিয়া নদীর স্বচ্ছ সুন্দর জল দেখা যাইতেছে ;—ওপারে গ্রাম ও সবুজ শস্যক্ষেত্র]

শোভা—বিয়ে আমি করব না!

ঊষা—বিয়ে করা যত বড় একটা ভীষণ ব্যাপার বোধ করছিস্ ঠিক ততটা নয়। আমরাও বিয়ে করেছি।

শোভা—(দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু আমি করতে পারি নে !

ঊষা—তুই কবি-মানুষ, তোর সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ নিয়ম সব সময়ে খাটে না জানি ; তোকে খানিকটা জ্যোৎস্না, মলয়-বাতাস, পাখীর গান জোগাতে না পারলে, মন পাওয়া দায়, কিন্তু কবিরাও ত বিয়ে করব না এমন প্রতিজ্ঞা সাধারণতঃ করে না! তোর হ'য়েছে কি ?

শোভা—তা' আমি জানি না!

ঊষা—আমি গোটে এই এক বৎসর নেই তারি মধ্যে এত গোপন কথা ? কি হ'য়েছে যে বিয়ে করবি নে ? ভালবেসেছিস বুঝি কাউকে ?

শোভা—(স্তব্ধ)

ঊষা—(একটা বইয়ের পাতা উল্টাইতে -উল্টাইতে একটা ফটো বাহির হইয়া পড়িল। ফটোয় এক জন সুশ্রী, যুবার আকৃতি)—এ কার ফটো ?

শোভা—আমি বলব না।

ঊষা—একেই ভালবেসেছিস্ বুঝি ? ও বুঝেছি। একেবারে হৃদয় দান ? সে হৃদয়ে আর কারও স্থান নেই বুঝি ? হায় কবি-হৃদয় !

শোভা—এ সব কথা নিয়ে ঠাট্টা ভাল লাগে না!

ঊষা—ঠাট্টার এত বড় একটা ব্যাপার নিয়ে দি চুপ্ করে থাক্‌তে হয়, তবে আর ঠাট্টা করব কবে ? ইনি হচ্ছেন আমার সখি-পতি ?

শোভা—ঊষা আমি চল্লাম (দুই চোখে জল ভরিয়া উঠিল ; অঞ্চল দিয়া চোখ ঢাকিল)

ঊষা—(ডান হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আপনার নিকটে টানিয়া আনিল)—কাঁদছিস্ ? এতদূর আমি বুঝতে পারি নি বোন্ !

শোভা—স্তব্ধ ; ঊষা খানিক ক্ষণ নিস্তব্ধ।

ঊষা—এ কত দিন হ'ল ?

শোভা—কেমন ক'রে আমি বলব ? আমি বলতে পারবো না !

ঊষা—(স্নেহ-স্বরে) বল, লক্ষ্মী বোনটি আমার! প্রথম দেখা হ'ল কি করে ? নাম কি ?

শোভা—গরমের ছুটিতে আমাদের দেশে বেড়াতে আসেন, দাদার বন্ধু ; বিপিনবাবু আমাদের এখেনেই ছিলেন।

ঊষা—তার পর ?

শোভা—তার পরে পুজোর ছুটিতে আবার এসেছিলেন।

ঊষা—তার পর ?

শোভা—আর আসেন নি !

ঊষা—চিঠি লেখেন ?

শোভা—হুঁ।

ঊষা—তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবি নে ?

শোভা—বলেছি ত।

ঊষা—তোর বাবা যদি অন্য কোথাও তোর সম্বন্ধ করেন !

শোভা—তা হলে কি করব জানি নে !

ঊষা—তোর বাবা, তোর দাদার বন্ধুর কথা জানেন ?

শোভা—হুঁ।

ঊষা—বাবা কি বললেন।

শোভা—তাঁর মত নেই।

ঊষা—তবে !

শোভা—(তাহার দুই হাত ধরিয়া) তবে কি করব আমাকে বলে দে ! আমি ত' বুঝতে পারছি নে !

ঊষা—তোর অন্য জায়গায় সম্বন্ধ হচ্ছে জানিস বোধ হয় !

শোভা—জানি।

ঊষা—তাঁকে আমি চিনি। তাঁর নাম সতীশ বাবু আমার শ্বশুর বাড়ীর দেশে বাড়ী। আমার স্বামীর বন্ধু। রূপে গুণে সমান্ টাকা কড়ি বিস্তর। সেখানে যদি তোর বিয়ে হয়, ত' নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিস্।

শোভা—কিন্তু এ সব আমি ত কিছুই চাই নে !

ঊষা—আশ্চর্য্য তোর নিজেকে ভোলাবার ক্ষমতা ! তুই এ সব চাস্‌নে ত' চাস কি? বিপিন বাবুর মধ্যে কি এ কিছুই নেই !

শোভা—কিন্তু—

ঊষা—বলছিস ভালবাসা ! শোভ', আমার আজ দু'বৎসর বিয়ে হয়েছে, দু'বৎসর বৎসর হিসেবে কিছুই নয় বটে ; কিন্তু জ্ঞান অনেক দেয় ! তাতে আমি এই বুঝেছি, যে, মানুষ ভুল অনেক বিষয়ে করে, কিন্তু সব চেয়ে বড় ভুল করে সে ভালবাসা নিয়ে ! যাকে আজ আমি ভাব্‌ছি সব চেয়ে ভালবাসি, কাল বুঝব সত্যি ভালবাসা তাকে এতটুকুও বাসি নি ! এই একটা অত্যন্ত বড় সত্য ভালবাসাকে নিয়ে মানুষ কত না আত্ম-বঞ্চনা করে !

শোভা—কিন্তু আমি করি নি !

ঊষা—এখন মনে হ'চ্ছে তাই, কিন্তু এর পরে হয় ত এমন দিন আসবে, যে দিন ওটার সন্দেহ হয়ে দাঁড়াবে। তার পরে, বলছিলাম কি, বিয়ে একটা মস্ত জিনিষ ! ধর্ম্ম সাক্ষী করে যাকে তুমি আত্মসমর্পন করলে, তাঁকে না ভালবেসে থাকতেই পারবে না ; দিনে দিনে, পলে পলে তিনি তোমাকে অধিকার করেন ! কেন হয় জানি নে তখন অন্য ভালবাসা যেন তার কাছে ছেলেখেলা মনে হয় !

শোভা—ভালবাসা এক বারই যায়।

ঊষা—ভালবাসা যাকে বলে সে একটা বিচিত্র জিনিষ ! দু দিনে চার দিনে যেটা গ'ড়ে ওঠে সেটা ভালবাসা না-ও হ'তে পারে, যেটা-রয়ে বসে পলে পলে, দিনে দিনে গড়ে উঠে, ন্যায় অন্যায়, ভুল ভ্রান্তি সেই সমস্তকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয় সেইটেই ভালবাসা ! এর বেশী আর কি বলব !

শোভা—সে কথা আমিও জানি।

ঊষা—একটা জিনিষকে জানাই চুড়ান্ত নয়, তাকে অনুভব করতে পারা চাই। তুমি ভেবে দেখো ! একটা খেয়াল যেন তোমার সমস্ত জীবনটাকে মাটি না করে দেয় ! এখন আসি আবার আসব। (প্রস্থান)

শোভা (সগতঃ) খেয়াল ! ভগবান্ তুমি জানো ! আমার সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে ! সেই তার স্নেহপূর্ণ দুটি চোখ, কি তার ভাষা ! ভুল, ভ্রান্তি মিথ্যা এই ! ঊষা জানে না ভালবাসা কি ! লেখাপড়া সে বৃথাই শিখেছে ! বিয়ে ক'রে যাদের ভালবাসা হয়, তারা ভালবাসা কি তা জানে না ! যে ভালবাসা আপনি নীরবে সুকুমার পদ্ম-দলের মত বিকশিত হ'য়ে ওঠে, সে খেয়াল ! যাক্ তার কথা, কিন্তু বিয়ে আমি করতে পারি না ! যদি বাবা দিয়ে দেন্? জানি নে কি করব কিন্তু সে জীবন আমি বহন করতে পারবো না !

(২)

[জমিদার সতীশের সহিত বিবাহের পর শোভার আট মাস কাটিয়া গিয়াছে। শোভার শ্বশুর-বাড়ী। চক্‌মিলান বাড়ীর দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত দ্বিতল বারান্দায় রেলিংয়ে হেলান দিয়া শোভা দাঁড়াইয়া, মাথার উপর সামান্য কাপড়, চক্ষু আকাশের দিকে। পাশে একটা খাঁচায় তোতা পাখী থাকিয়া থাকিয়া রাধাকৃষ্ণ পড়িতেছে। দ্বিপ্রহর ; নীচের উঠানে একটা কুকুর ঘুমাইতেছে। দাসদাসী ইতস্ততঃ]

শোভা—(স্বগতঃ) জীবনটা আমার নষ্ট হবার পক্ষেই চলেছে ! বাবা তাই চান ! আর আমার জীবনে দরকারই বা কি ! সার্থক কি সব জীবনই হয় ! সবই আমার হ'য়েছে; আমার স্নেহময় স্বামী পাখী,

আমার ঘর, আমার বাড়ী, কিন্তু আমিই নেই! ধীরে ধীরে সরে পড়ছি! বুকের বেদনাটা একটা উপসর্গ হ'য়েছে, এক দিন সে-ই আমাকে নিয়ে যাবে! আঃ পাখীটা জ্বালাতন করছে। [উচ্চৈঃস্বরে ঝি—ঝি!]

ঝি—কি মা!

শো—পাখীটা নিয়ে যা, জ্বালাতন করছে!

ঝি—ও রাধাকৃষ্ণ পড়ছে!

শো—(ক্রুদ্ধ হইয়া) নিয়ে যা বলছি! (ঝি পাখী লইয়া গেল)।

শো—(স্বগতঃ)—তার সেই দুটি চোখ এখনও আমাকে পাগল করছে! আর কেন, সব ত গেছে! তাকে ভুলতে পারি নে কেন! আমার স্বামী তাঁর কোন গুণেরই ত' অভাব নেই, তাঁকে আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভাল-বাস্‌তে পারি নে কেন? মোহ,—উষা বলেছিল মোহ; মোহ এত মারাত্মক তা জানতাম না! ঐ আস্‌চেন, তিনি আস্‌চেন; (মাথার কাপড়টা আরও খানিকটা টানিয়া দিল)

(সতীশের প্রবেশ। যুবা পুরুষ, সুশ্রী, সুন্দর। মুখে স্মিত হাস্য)

স—এখানে দাঁড়িয়ে যে!

শো—ঘরের ভেতরে আর থাক্‌তে ইচ্ছে হলো না—তাই।

স—আমি এ সময়ে আসবো ভাব্‌তে পেরেছিলে!

শো—না।

স—বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলছিলাম—কিন্তু অনেক ক্ষণ তোমাকে না দেখে থাক্‌তে পারলাম না—তাই এসেছি।

শো—(সংক্ষেপে) বেশ!

স—ঘরে চলো।

শো—চলো।

(উভয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল,—শয্যার উপরে সতীশ বসিল; শোভা খানিকটা দূরে দাঁড়াইল।)

স—তুমি আমার এত দেরী দেখে কি ভাবছিল? (খানিকটা উত্তরের অপেক্ষা করিয়া) ভাব্‌ছিলে বোধ হয় তোমার স্বামী যুদ্ধ যাত্রা করেছে; আর সেখানে হস্ত্যশ্ব-রথপদাতিকের মধ্যে ভারি বিপদে পড়ে গেছে, ঠিক না?

শো—একটু হাসিল।

স—কিন্তু না, আমি নিরাপদেই ছিলাম, ব্রীজ খেলেছিলাম, এবং শ্রীমতী শোভা দেবীর কথা বরাবর ভাবছিলাম! বুঝেছ?

শো—হুঁ।

স—(শোভার হস্ত ধরিয়া আপনার নিকট টানিয়া আনিল) —আর তোমার ইতিমধ্যে খুব বিরহ হ'য়েছিল—আর বিরহের জন্যে একেবারে বারান্দায় বেরিয়ে পড়ে আমার অপেক্ষা করছিলে—না!

শো—আবার একটু হাসিল।

স—শোভা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব!

শো—কি!

স—তোমার কি আমাকে ভাল লাগে না! এই আট মাস তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে,—যেন কোনও দিনই সম্পূর্ণ তোমাকে পাই নি—তোমার মুখের একটা কথা শুনি নি, একটা প্রসন্ন হাসিও দেখ্‌তে পাই নি!

শো—(চমকিত হইল; মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল) বোধ হয়—ঐ—আমার বুকের—ঐ বেদনাটা—

স—(আদর করিয়া শোভাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া) ও ভুলে গিয়েছিলাম,—তোমার বুকের বেদনাটা! আমাদের সম্পূর্ণ সুখের অন্তরায় ঐটেই দাঁড়িয়েছে! এত ডাক্তার দেখালাম ওটা আরামও ত' করতে পারলে না। মুখ্যু সব ডাক্তার! এখন কি বেদনা বোধ হচ্ছে?

শোভা—একটু একটু হচ্ছে, বেশী নয়।

স—তবে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ কেন? শুয়ে থাক না একটু! মালিশের শিশিটা দেবো? বামাকে ডেকে দোবো—সে মালিশ করে দেবে!

শো—না, না, দরকার নেই, সেরে যাচ্ছে।

স—তবে আর নড়া চড়া করো না, শুয়ে থাকো; আমি বাইরে যাই, এতক্ষণ বন্ধুরা আমার সম্বন্ধে বদনাম করছে

নিশ্চয়ই, যত শীঘ্র পারি আসব। তুমি শোও আমি দেখে যাবো।

[শোভার শয়ন ;—সতীশের প্রস্থান]

শোভা—(স্বগতঃ) এত দয়া, এত ভালবাসা! চোখে আজ এমন করে জল আসছে কেন! বুকের বেদনাটা আজ এত হাল্কা মনে হচ্ছে কেন! আর একটুখানি যদি থাকতেন। আজ তাঁর কথাগুলো কেমন করে এত মিষ্টি হ'লো! আমি শোবো—তিনি দেখে যাবেন!

(বামা আসিল)

বামা—মা, আমি মালিশ করতে এসেছি—বাবু বল্লেন।

শোভা—(বালিশে মুখ লুকাইয়া চোখের উচ্ছ্বসিত জল লুকাইতে লুকাইতে ভাঙ্গা গলায়) না, যা, দরকার নেই।

(৩)

(সতীশের বাহিরের বসিবার ঘরে চেয়ারে সতীশ বসিয়া—সম্মুখে টেবিলে একটা ফটো, একটা চিঠি। আশে পাশে চেয়ার সাজান। বাড়ীর ভিতরের দিকে একটা দরজা, ভিতর হইতে বন্ধ।)

স—এ চিঠি, এ ফটো আমার হাতে না পড়ত ত' ভালই হ'ত। এ কথা কোনও দিনই ত' আমার মনে হয় নি! কে, এ বিপিন রায়? মনটা বড় অশান্ত হ'য়ে উঠ্ছে—উঃ কি করি!

[টেবিলে মাথা দিয়া খানিক ক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে রহিল। ইতিমধ্যে বাড়ীর দিকে দরজার কাছে শোভার আগমন; চাবির গর্ত্তের মধ্য দিয়া ফটো, চিঠি ও তদবস্থ সতীশকে দেখিয়া স্তব্ধ বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।]

স—এখন বুঝতে পারছি আমার তরে তার এ উপেক্ষা কেন! প্রতিক্ষণ প্রতিপলে আমি যখন তার কথা ভাবছি, তখন সে ত' ভাবছে আর এক জনের কথা! মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হ'তে পারে? কিন্তু আমি আর কি করব?—এ কালসর্পকে অন্তরের মাঝখানে পোষণ করার চেয়ে এক দিন বেরিয়ে চলে যাব—কোথায়? জানি নে ইহজগতের কোথাও—কি পর-জগতের কোথাও!

[দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।]

শো—(অন্তরালে স্বগতঃ) আর শুনতে পারছি নে! বুকের ভেতর কেমন করছে, চারি দিক অন্ধকার হয়ে আসছে! মাগো—দয়া কর! তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে ঠিক রাখো। (প্রস্থান)

স— (খানিক ক্ষণ পরে) পানিহাটির বিপিন রায়! লিখেছে, "তুমি যেমন লিখেছ, আমার ও ঠিক তাই হ'য়েছে, আমার সমস্ত জীবন তোমা দ্বারা ব্যস্ত হ'য়ে গিয়েছে।" ভাল হ'য়েছে—বেশ কথা,—বুকের বেদনা এই! উঃ!

স—(খানিকটা স্তব্ধ থাকিয়া) না, এতটা কঠিন হওয়া হয় ত' ঠিক হ'চ্ছে না! মানুষের এ দুর্ব্বলতা ত' হয়েই থাকে! চিঠিটা আগেকার, হয়ত ও একটা তরুণ বয়সের ছেলেখেলা! তার পরে সে হয় ত' আমাকেই ভালবাসে! হয়ত' পুরাণ কথা ভোলবার জন্যে তাকে প্রতিদিন নিজের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করতে হ'চ্ছে। অভাগিনী সত্যই অভাগিনী! তাই বুকের বেদন', তাই এই শান্ত, নিঃশব্দ ভাব!

আহা, দয়ার পাত্র! তার কি অপরাধ! কিন্তু তবু এই দারুণ শাস্তি তার! এর উপরে আমি যদি কঠিন হই, ত' কি নিদারুণ অবস্থা হবে তার!

উঃ! কিন্তু জীবনটা মুহূর্ত্তে কি জটিল হ'য়ে পড়েছে! ভগবান্, সহ্য করবার শক্তি দেও! (দুই হাতের উপর মাথা রক্ষা) (ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য—হুজুর, সদরের ডেপুটি বাবু হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে ভারি চোট খেয়েছেন! ডাক্তার বাবু ডাক্তার খানায় তাঁকে এনেছেন—কিন্তু তাঁর জ্ঞান হয় নি। ডাক্তার বাবু আপনাকে ডাকছেন।

স—চল। (উভয়ের প্রস্থান)

(শোভার ঘরে, মেজের উপর শোভা পড়িয়া)

শো—বুকের ব্যথাটা আমার সমস্ত বুক ভেঙ্গে দিচ্ছে! উঃ কি লজ্জা, কি পাপ! তাঁর দেখা যদি একটি বার

পাই! বলব ও মিথ্যে কথা,—ও আমার জীবনের সব কথা নয়! ওর চেয়ে সত্যি কথা আছে! ধরা যখন পড়লাম, তখন মিথ্যে কথা নিয়ে! একটিবার এস, তোমাকে সব কথা বলব—! বলব, আমার চোখের জলের মধ্যে দিয়ে তোমাকেই দেখি, আমার বুকের বেদনার মধ্যে তুমিই আছ! বলব, তোমার কথার চেয়ে মিষ্টি কথা কোনদিন শুনিনি, তোমার বিরাগের চেয়ে বড় শাস্তি কোন দিন পাইনি! কেমন করে তিনি বুঝবেন যে, যে দিন ওই চিঠি আর ওই ছবিকে সবচেয়ে বেশী অবহেলা করেছি সেইদিনই তারা আমার গোপনতার থেকে বেড়িয়ে প্রকাশ লাভ করেছে! তারা আমার সম্বন্ধে যে মিথ্যা বলেছে, সে কি করে ভাঙ্গব!

[পরদিন সন্ধ্যা বেলা। শোভা আপনার ঘরে, পূর্ব্ববৎ মেজের পড়িয়া। পূর্ব্বাপেক্ষা কৃশ, চক্ষু কোটরগত]

শোভা—কাল সমস্ত দিন, সমস্ত রাত গেল, আজ সন্ধ্যা হল তবু এলেন না! কেন এলেন না! চলে গেলেন! একটিবার ক্ষমা চাইবার, পরে ধরে কাঁদবার অবসরও দিলেন না! এত কঠিন ত তিনি নয়! পাপিয়সী আমি, তাঁকে যত্ন করিনি, তবু কোনও দিন ত তাঁর স্নেহের অভাব দেখিনি! আমি কি করব? ইচ্ছা করছে আমার এই পাপ দেহটাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলি! উঃ কি ক'রে আমি থাকব—আজ যদি তিনি না আসেন ত কার জন্যে বেঁচে থাকব? না—বেঁচে থাকতে পারবো না, ওই বালিশের ঔষধটা আছে বেঁচে থাকব না! শুধু আজকের রাত্তিরটা অপেক্ষা করব—এমনি করে মেজের পড়ে, তাঁর পায়ের ধুলোর মাঝখানে!

(বামার প্রবেশ)

বামা—মা।

শো—কি!

বা—আজ ও সমস্ত দিন কিছু খেলে না!

শো—বামা, মানুষের সময় অসময় বুঝিসনে! আজ আমার খাওয়া? সমস্ত দিন বিরক্ত করছিস্!—যা, চলে যা!

(বামার প্রস্থান)

শোভা—খাই ত একেবারে কাল সকালে খাব! আর খাবার জন্যে থাকতে হবে না! কিন্তু এস, তার আগে একটিবার এস! তুমি আমাকে ক্ষমা করো না আমাকে দয়া করো না! যে শাস্তি দেবার নিজে হাতে দেও—তারপর আমার ছুটি!

(কাণ পাতিয়া শুনিয়া)

ঐ আসচেন! উঃ আমি কি করি! কেমন করে তাঁর আসা পর্য্যন্ত থাকি! বুকের ভেতর এ কি কাঁপুনি! নিঃশ্বাস যে বন্ধ হয়ে আসছে! মাগো!

[সতীশের আগমন]

সতীশ—একি! এমন ক'রে এখানে শুয়ে যে! শোভা তোমার চেহারা এমন হ'য়ে গেছে কেন! মুখ এত কাল কেন! [আপনার কোলে শোভার লুণ্ঠিত মস্তক তুলিয়া লইয়া] ইস্ কি হ'য়েছে তোমার! বুকের ব্যথাটা কি খুব ধরেছে?

শো—বেশী না—তা নয়—

স—বেশী না কি? এমন কষ্ট দিচ্ছে তবু যথেষ্ট নয়! কোন ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠাই! (উঠিবার চেষ্টা করিল, শোভা তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিল)

শো—না, না, যেয়োনা, ডাক্তার কাজ নাই।

স—তোমার কষ্ট দেখে আমি থাকতে পারচি না—ডাকি ডাক্তার।

শো—একটা কথা।

স—কথা—কি?

শো—মাপ করো, মাপ করো!

স—মাপ করবো, তোমাকে! কেন শোভা?

শো—(কাঁদিতে কাঁদিতে) কেমন ক'রে বলব? সে তুমি জান! সেই ছবি,—চিঠি—!

স—(হাসিয়া) ওঃ তার কথা আমি ভুলেই গিয়েছি! তাই জন্যে বুঝি—

শো—সে দেখে তুমি—

স—তার জন্যে অত ভাবিত হচ্ছ কেন শোভা? আমি বুঝেছি—ও কিছুই নয়,—অমন সকল জীবনেই হয়! আমি বুঝেছি, আমি জানি, তুমি একমাত্র আমাকেই ভালবাস,—সে আমার তোমার ওপর ভালবাসা দেখে বুঝতে পারিনে? (শোভাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন)

শো—(উচ্ছ্বসিত হইয়া) তুমি কত বড়, কত উঁচু!

স—তোমার ছবি চিঠির কথা হঠাৎ মনে হ'ল কেন?

শো—(খানিক থামিয়া) কাল সমস্ত রাত্রি দুঃস্বপ্ন দেখেছি!

স—হাঁ, কাল আমার একটু অন্যায় কাজ হয়ে গিয়েছিল। কাল শুনলাম সদরের ডেপুটি বাবু আমার জমিদারির মধ্যে ঘোড়া থেকে পড়ে ভারি চোট খেয়েছেন! গিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই, একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন! সমস্ত রাত্রি জ্ঞান হ'ল না—তাই তাঁকে ছেড়ে আসতে পারিনি—কিন্তু তোমাকে খবর পাঠান উচিত ছিল—তা হ'য়ে ওঠেনি। আজ এই মাত্র জ্ঞান হয়েছে—তাই আসতে পেরেছি।

হাঁ শোভা কাল আরও একটা অন্যায় কাজ হ'য়েছিল। তোমার সেই ছবি আর চিঠি তোমাকে না ব'লেই আমি দেখেছিলাম—তার জন্যে বরং তুমিই আমাকে মাপ করো।

(শোভা নিঃশব্দে সতীশের পা জড়াইয়া ধরিল)

স—ও কি করছ শোভা! (টানিয়া আপনার বুকের মধ্যে আনিল)। হাঁ, আরও একটা কথা, ডেপুটি বাবুটি, সেই পাণিহাটের বিপিন রায়।

(শোভা অনুচ্চ শব্দ করিয়া সতীশের বুকের ভিতর মুখ লুকাইল)

শো—দয়া করো, দয়া করো, তার কথা বলোনা!

স—শোভা তুমি যে কবি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হ'চ্ছে এই যে ছোট জিনিষ কে বড় করে তোলবার ক্ষমতা তোমার অদ্বিতীয়!

শোভা—নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

স—হাঁ, আসল কথাটাই ভুলে গেছি। বুকের ব্যথাটা কেমন?

শো—নেই, একেবারে সেরে গেছে!

স—তবে আর কান্না কিসের?

[সতীশ শোভার মুখ তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল]

শ্রীগিরীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বর্ষবরণ

এস আজি নব বর্ষ, বিশ্ব আলোকিয়া,
ধরণীর সঙ্গে সঙ্গে উঠ পুলকিয়া।
অশোকের রক্ত রাগে, মাদক বকুলে,
কেশরে, কুসুমে, মধু মঞ্জরী-মুকুলে,
সন্ধ্যার সিন্দুরময় নীরদের কেশে,
পাটল-সুরভি বায়ে, চারু দিবাশেষে।
রৌদ্র-দাহে দগ্ধ করি সকল জঞ্জাল,
উড়াইয়া শুষ্ক পত্র পাংশু ধূলি-জাল,
বৈশাখী ঝঞ্ঝার মাঝে ধূসরিয়া ভানু
বিদূরিয়া রোগ-শোক দ্বন্দ্বের বীজাণু
নিনাদি দুন্দুভি-ডঙ্কা তোরণের তলে,
জাগায়ে বিশ্বের জন ডাকি দলে দলে,
দাও আশা মৈত্রীবল, নবীন জীবন,
কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে আজি নব জাগরণ।

শ্রীকালিদাস রায়।

হাতীর বুদ্ধি ও মনোবৃত্তি

হাতী বড় বুদ্ধিমান জন্তু। বিবেচনাশক্তিতেও হাতী অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্মরণশক্তি ও সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি হাতীতে যেরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, কুকুর

বিড়ালেও তেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। হস্তীর কার্য্যকলাপে সাধারণতঃ সুপ্রবৃত্তির বিকাশই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বৈরসাধনপ্রবৃত্তি বড় প্রবল, কিন্তু পূর্ব্বকৃত অপরাধের কথা মনে না থাকিলে হাতী কখনও অপকারীর অপকার করে না। অস্ত্রচিকিৎসার সময় কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং ঔষধপ্রয়োগকালে ইহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই সকল গুণে হস্তী মনুষ্যের সমকক্ষ।

হাতীর গুণ

হাতীর স্মৃতিশক্তি বড় প্রবল। দুই বৎসরের পোষা হাতী "বুনো" হইয়া পনর বৎসর পরে ধরা পড়িলেও, পোষা অবস্থার আদেশবাক্যগুলি ইহার বেশ মনে থাকে। হাতী নিজের অভ্যাস সহজে ছাড়িতে পারে না। এমন কি বুড়ো হাতী তরুণ কালের মাহুতকেও চিনিতে পারে।

স্মৃতিশক্তি

হাতী অপকারীর অপকার করিতে প্রায়ই ভুলিয়া যায় না। অনেকেই দরজী ও হাতীর গল্প জানেন। এরূপ আরও অনেক সত্য গল্প আছে।

দুই জন মাহুত জল তুলিবার জন্য দুইটা হাতীকে একটা কূপের কাছে লইয়া যাইতেছিল। এই দুইটার মধ্যে একটা খুব বড় ও বলবান, এবং আর একটা ছোট ও দুর্ব্বল ছিল। ছোট হাতীটা শুঁড়ে করিয়া একটা বালতি লইয়া যাইতেছিল। বড় হাতীটা আপন বুদ্ধি-কৌশলেই হউক বা মাহুতের ইঙ্গিত ক্রমেই হউক, জোর করিয়া বালতিটা সঙ্গীর শুঁড় হইতে ছিনাইয়া লইল। ছোট হাতীটা তখন নীরবে এই পরাভব সহ্য করিল। পরে বড় হাতীটা জল তুলিয়া কূপের ধারে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় ছোট হাতীটা কয়েক পা পাছে হটিয়া গিয়া অতর্কিতে আপন শত্রুকে হঠাৎ মাথা দিয়া এরূপ ধাক্কা দিল যে, সামলাইতে না পারিয়া বড় হাতীটা কূপের মধ্যে পড়িয়া গেল। পাশে কতগুলি কাষ্ঠ-খণ্ড পড়িয়াছিল। মাহুত একটি একটি করিয়া সবগুলি কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল, হাতীটাও নিজের বুদ্ধিবলে সেগুলিকে উপরি উপরি সাজাইয়া একটা মাঁচার মত করিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিল, এবং শেষে কূপ হইতে উঠিয়া পড়িল।

হাতীর বৈরসাধন প্রবৃত্তি

সামান্য অপকারের জন্য শত্রুতা সাধনের ইচ্ছা অন্য কোন প্রাণীতে এত প্রবল নহে, এবং এরূপ বুদ্ধি-কৌশলও অন্য প্রাণীতে এতটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

হাতী যেমন সামান্য অপকারের জন্য প্রতিশোধ লইতে ভুলিয়া যায় না তেমনই আবার দুঃখার্ত্ত বা যন্ত্রণা-ক্লিষ্টের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেও কুণ্ঠিত হয় না।

হাতীর সমবেদনা।

অপকারীর অপকার করা যেরূপ হাতীর স্বভাব, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও হাতীর তেমনই স্বভাব। মানসিক আবেগ, বিচারশক্তি প্রভৃতি গুণেও হস্তী অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে।

অন্যান্য পশুর মানসিক বৃত্তি হইতে হাতীর মানসিক বৃত্তির একটা অদ্ভুত রকমের বিশেষত্ব আছে। দুধ খায় এমন হস্তিশাবক যদি দুই তিন দিনও মা-ছাড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে হস্তিনীর সহিত শাবকের সমস্ত সম্বন্ধ লোপ পাইয়া যায়। কিন্তু শাবক নিজের মাকে ভুলিতে পারে না এবং সর্ব্বদাই মায়ের কাছে যাইতে চায়, হস্তিনী শাবককে কাছে আসিতে দেয় না।

হাতীর মনোবৃত্তির বিশেষত্ব

এক দলের হাতী অন্য দলের হাতীর সঙ্গে মিশিতে পারে না। কোনও হাতী যদি দৈবক্রমে স্বীয় দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তাহা হইলে অন্য দলে আশ্রয় পায় না। অন্য দলের সহিত এক স্থানে চরিতে পারে, এক জলাশয়ে স্নান করিতে পারে তথাপি কোন সম্বন্ধ হয় না। এমন কি এইরূপ দলভ্রষ্ট হাতী যদি কোনও দলের সহিত খেদায় পড়ে, তাহা হইলে দলের হাতীগুলি ইহাকে তাহাদের সঙ্গে থাকিতে দেয় না, দল হইতে তাড়াইয়া দেয়। এই রূপেই গুণ্ডা হাতীর সৃষ্টি হইয়া থাকে।

গুণ্ডা হাতী

গুণ্ডা হাতীর প্রবৃত্তিগুলি স্বভাবতঃই মন্দ এবং ইহারা সর্ব্বদাই লুটপাট করিতে ভালবাসে। সিংহলে

গুণ্ডা হাতীকে রোগ (rogue) বলে। এই সকল হাতীর অসৎ প্রবৃত্তিগুলিই সর্ব্বদা ইহাদের কার্য্যকলাপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

হাতী স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয়, সহানুভূতিশীল ও সাধু-প্রকৃতি। কিন্তু দলভ্রষ্ট হইলে ইহারাই আবার উদ্ধত, নিষ্ঠুর ও সময় সময় এত বিষণ্ণ ও ক্রোধপরায়ণ হয় যে, অন্য প্রাণীতে এরূপ প্রায় দেখা যায় না কিন্তু গুণ্ডা হাতীর স্বভাব এরূপ নহে।

গুণ্ডা হাতী মানুষ দেখিলেই যে হঠাৎ রাগিয়া যায় এমন নহে। ইহাদের ক্রোধ অস্বাভাবিক এবং ইহারা ইচ্ছা করিয়া নানাপ্রকার অনিষ্ট করিয়া থাকে। সকল বিষয়েই একটা বিদ্রোহ উপস্থিত করা গুণ্ডা হাতীর প্রধান লক্ষণ। এই স্বভাবের বশে ইহারা সুযোগ পাইলেই গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পথিকদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহাদের এই রূপ স্বভাব হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উদ্দেশ্য স্থির করিয়াই ইহারা সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

মনোদুঃখে হাতীর মৃত্যু

হাতী অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা বেশী দিন বাঁচে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, হাতীর জীবনী শক্তি খুব বেশী। কিন্তু ভগ্ন-হৃদয় হইলে ইহারাও হঠাৎ মরিয়া যায়।

গুণ্ডা হাতীও মানসিক দুঃখে প্রাণ ত্যাগ করে। পোষা হাতীও অনেক সময় মনোদুঃখে মরিয়া থাকে।

আবার দাঁড়াইয়া আছে এমন অবস্থায় হাতী যদি হঠাৎ পড়িয়া যায় তাহা হইলে বাঁচে না; হয় তখনই মরিয়া যায়, নয় ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া মরিয়া যায়। পোষ মানার অব্যবহিত পরেই যদি হাতীকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে হাতী অনেক সময় মনোদুঃখে মরিয়া যায়।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানে গৃহ-নির্ম্মাণ কাষ্ঠসংগ্রহ ও কাঠের স্তূপ দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে হস্তীর ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যে হস্তীর সাধারণ বুদ্ধিমত্তা বেশ প্রকাশ পায়।

হাতীর সাধারণ বুদ্ধি

হাতীর সাধারণ বুদ্ধি বড় প্রখর। এক জন ভদ্রলোক এক সময়ে একটা হাতীকে গোল আলু খাইতে দিয়াছিল। একটা আলু মাটীতে পড়িয়া গেল এবং অনেক চেষ্টা করিয়াও হাতীটা আলুটি ধরিতে পারিল না। পরে মাটীতে এরূপ জোরে নিশ্বাস ছাড়িল যে দেওয়ালে লাগিয়া আলুটি হাতীর কাছে আসিয়া পড়িল। পশুশালায় এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়।

হাতীর সাবধানতা

হাতীর মত কোন জন্তুই এত সাবধান নহে। গ্রীষ্মকালে জলহীন প্রদেশে হাতী অতি সতর্কতার সহিত জল পান করিয়া থাকে। দলের প্রধান হাতীটা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া কোন জলাশয় হইতে প্রায় এক শত গজ দূরে আসিয়া দাঁড়ায়। পরে তিন বার থামিয়া এই এক শত গজ পথ অতিক্রম করে, এবং জলাশয়ের ধারে আসিয়া জলপান না করিয়াই সেখানে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকে, অবশেষে জঙ্গলে ফিরিয়া যায়। পরে আবার পাঁচটা হাতী সঙ্গে লইয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত পদবিক্ষেপে জলাশয়ের দিকে আসিতে থাকে। কয়েক গজ দূরে ইহাদিগকে প্রহরী রাখিয়া পুনরায় জঙ্গলে ফিরিয়া যায়। সর্ব্বশেষে দলের সমস্ত হাতী লইয়া জলাশয়ের দিকে আসে, এবং প্রহরী-হাতীগুলির নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়। তখন দলের প্রধান হাতীটা জলাশয়ের নিকটে গিয়া বেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে। বিপদের কোনও আশঙ্কা নাই বুঝিলে হাতীগুলিকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করে। তখন ইঙ্গিত ক্রমে সকল হাতী সশব্দে ও নিঃশঙ্কচিত্তে জলে নামিয়া জল পান করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মতলব ঠিক করিয়া হাতী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। আর মনুষ্য-সমাজের নেতার ন্যায় দলপতি হাতীর দায়িত্বজ্ঞান যথেষ্ট আছে।

অভিজ্ঞতার বলে হাতী জিনিষের লঘুত্ব-গুরুত্ব বুঝিতে পারে। নূতন হাতী তিন মাস পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা পায়। তিন মাস পরে মাটী হইতে জিনিষ তোলা অভ্যাস করে। প্রথম প্রথম লঘু জিনিষ তুলিতে বলাই উচিত। কারণ

ওজনের জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত হাতী সকল জিনিষই বড় জোরে মাহুতের হাতে দিয়া থাকে। কাপড় প্রভৃতি লঘু দ্রব্য তুলিয়া যখন ওজনের জ্ঞান হয় তখন হাতীকে ভারি জিনিষ তুলিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তখন লৌহদণ্ড প্রভৃতি অত্যন্ত ভারি জিনিষও বেশ সাবধানে তুলিতে পারে। সর্ব্বশেষে ধারাল ছুরি তোলার অভ্যাস হয়। ছুরি তুলিয়া মাহুতের হাতে দেয় না, মাথায় রাখিয়া দেয়। এইরূপে মাহুত অক্লেশে বাঁটে ধরিয়া ছুরিটি নিজের হাতে তুলিয়া লইতে পারে।

দ্রব্যের লঘুত্ব-গুরুত্ব-বোধ শক্তি

'বুনো' হাতী ধরিতে পোষা হাতী যেরূপ সাহায্য করে ইহাতে হাতীর যুক্তি ও বিচারশক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার মাদী হাতীগুলি "বুনো" হাতীকে যেরূপ ভাবে ভুলাইয়া লইয়া যায়, ইহাতেও বুঝা যায় যে, হাতীও ইচ্ছা করিলে প্রলোভন দেখাইতে পারে।

অনেকে বলিয়া থাকেন হাতী অভ্যাস বশেই সকল কার্য্য করিয়া থাকে, এবং ইহাদের গতিবিধি অনেকটা কলের মত। আর অভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটিলে ইহারা নিতান্ত বিরক্ত হয়। কিন্তু এই কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। হস্তীর প্রকৃতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে,হাতীর প্রতি ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, কার্য্যকালের বা কর্ত্তব্য কার্য্যের পরিবর্ত্তন ঘটিলে ঘোড়ার ন্যায় ইহাদের মানসিক ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না, বরং ইহাদিগকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করা যায় সেই কার্য্যেরই উপযুক্ত হইয়া থাকে।

বিচার শক্তি

হাতীকে যে কার্য্যেই নিযুক্ত করা যায় না কেন ইহারা খুব আগ্রহের সহিত সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। পর্য্যবেক্ষণের জন্য কোন লোক না থাকিলেও কার্য্যের হানি হয় না। তবে পর্য্যবেক্ষণের জন্য কেহ না থাকিলে কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হওয়া মাত্রেই ইহারা মনের সুখে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, গাছের ডালা ভাঙ্গিয়া গা ঝাড়িতে থাকে এবং পিঠের উপর মাটী ফেলে।

ভয় এবং ভালবাসার ফলেই হাতী মাহুতের বশে থাকে। হাতী সমস্ত রাত্রি অনাহারে থাকিলেও মাহুতকে না লইয়া কোথাও যায় না; অথচ প্রয়োজন হইলে অতি সহজে নূতন মাহুতের বশীভূত হয়।

অন্য কোন প্রাণী ভয় পাইলে হাতী বেশ বুঝিতে পারে। হাতী দেখিয়া অন্য কোন প্রাণী ভয় পাইলেও বুঝিতে পারে।

এত বড় ও প্রকাণ্ড জন্তুকে জোর করিয়া শাস্তি দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। সুতরাং যেরূপ শাস্তিতে মানসিক ভাবের উপর ক্রিয়া হইয়া থাকে হাতীকে সেইরূপ ভাবেই শাস্তি দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে কোন কোন সময় খাদ্যের পরিবর্ত্তন করা হয়, কোন কোন সময় খাওয়া একেবারে কয়েক দিনের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, আর স্থলে স্থলে দৈনিক খাদ্যের কোন কোন বস্তু দেওয়া হয় না। অনেক স্থলে সঙ্গীদের খাওয়া না হইলে খাইতে না দিয়া হাতীকে শাস্তি দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ করিলে হাতী দৃষ্টি ও ভঙ্গী দ্বারা অপমান ও অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করে এবং দর্শকের দয়াও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

হাতীর শাস্তিবিধান

হাতী শারীরিক আরামের ব্যবস্থা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। গ্রীষ্মকালে মশা মাছির উৎপাত বাড়ে। এজন্য হাতী গাছ পাতা দিয়া সমস্ত পিঠ ঢাকিয়া রাখে, অথচ শীতকালে সেরূপ করে না। সুতরাং বুঝা যায় যে, হাতী ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর অবস্থাও বুঝিতে পারে। 'বুনো' হাতী গ্রীষ্ম কালে এরূপ করে কিনা বলা যায় না, তবে পোষা অবস্থায়ই এই স্বভাবটার গঠন ও পরিণতি হইয়া থাকে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য

পথে চলিতে চলিতে যদি মশা মাছির কামড়ে হাতী কষ্ট পায় তাহা হইলে নিকটবর্ত্তী কোনও গাছের ছোট একটা ডাল ভাঙ্গিয়া লয়। পরে গোড়ার পাতাগুলি ফেলিয়া দেয় ও আগার কতগুলি পাতা রাখে, এবং বাঁটটি পরিমাণমত লম্বা রাখিয়া ইহা দ্বারা গা ঝাড়িতে ঝাড়িতে অগ্রসর হইয়া থাকে। এইরূপে গাছের ডাল দিয়া পাখার কার্য্য করিয়া

থাকে। আর কোনও জন্তুতে শারীরিক আরামের জন্য এরূপ বুদ্ধির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সময়োপযোগী শস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেও হাতী বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে। দেখা গিয়াছে, হাতী বাঁশ ভাঙ্গিয়া চটা করিয়া শরীর হইতে জোঁক চাঁচিয়া ফেলে। গরু, ঘোড়া প্রভৃতি এরূপ অবস্থায় শুধু দাঁত ও জিভের ব্যবহার করিয়া থাকে। কেবল হাতীই এই কার্য্যের জন্য অস্ত্র নির্ম্মাণ ও প্রয়োগ করিয়া থাকে।

আবার দুষ্ট বুদ্ধিতেও হাতী অন্য কোন জন্তু অপেক্ষা হীন নহে। অনেক সময় ধূর্ত্ততায় হাতী মানুষকেও প্রতারিত করে। এক সময়ে এক জন মাহুত হাতীর কাছে চুলা করিয়া ও কয়েকখানা রুটি সেঁকিবার জন্য চুলায় দিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। যাওয়ার সময় ঘাস পাতা দিয়া চুলাটা সুন্দর রূপে ঢাকিয়া রাখিয়া যায়। বোধ হয় হাতীটা রুটিগুলি দেখিয়াছিল, সুতরাং মাহুতের যাওয়ার পরই শুঁড় দিয়া পায়ের শিকলটা খুলিয়া ঘাস পাতা সরাইয়া রুটিগুলি খাইয়া ফেলিল। আবার ঘাস পাতা দিয়া পূর্ব্বের মত চুলাটা ঢাকিয়া পূর্ব্বের স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এবার পায়ে শিকল বাঁধিতে পারিল না, কিন্তু শিকলটা পায়ে বেশ করিয়া জড়াইয়া চুলার দিকে পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাহুত ফিরিয়া আসিয়া দেখে রুট নাই অথচ চুলাটা ঠিক ঢাকা রহিয়াছে। যখন সে চুলাটা পরীক্ষা করিতেছিল, তখন হাতীটা আড়নয়নে মাহুতের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। মাহুত দেখিয়া বুঝিল, ইহা হাতীরই কাজ এবং তদনুসারে ধূর্ত্তের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিল। এরূপ ধূর্ত্ততা অন্য কোন প্রাণীতে কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি না জানি না।

হাতীর দুষ্টবুদ্ধি

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

বিগত বর্ষের কয়েকখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক।

বিগত বর্ষের প্রকাশিত তথ্যমূলক গ্রন্থগুলি ধরিলে বলা যায়, বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যে ইতিহাসের আলোচনা সমধিক ভাবে চলিতেছে। প্রাচীন গ্রন্থকারগণের লিখিত বিবরণের নূতন আলোচনা, বিদেশীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, পুরাতত্ত্বের আলোচনা প্রসূত ইতিহাস উদ্ধার, স্বাধীন অনুসন্ধান লব্ধ ঐতিহাসিক আবিষ্কার ইত্যাদি নানা ভাবে বাঙ্গালার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ইতিহাস-বিষয়েই অধিকতর আগ্রহান্বিত দেখা যাইতেছে। ব্যক্তিগত ও ব্যূহবদ্ধ ভাবে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে, প্রবন্ধ ও পুস্তকাকারে সাধারণ ও স্থানীয় ইতিহাস যুগপৎ গ্রথিত হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্যের এইরূপ ঐতিহাসিক যুগে বিগত বর্ষে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে যে কয়েকখানি ইতিহাস-গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থমধ্যে পরিগণিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্যজনক নহে।

(১) গৌড়রাজমালা।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত।

এই গ্রন্থ বর্ষের প্রথমাংশেই প্রকাশিত হয়। রাজসাহীর 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' কর্ত্তৃক আরব্ধ ঐতিহাসিক তথ্য-সঙ্কলনের মহীয়সী চেষ্টার ইহা প্রথমফল। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক বিধানের সাহচর্য্যে বিশিষ্ট অনুসন্ধান ও বিচারপদ্ধতি অবলম্বনে, প্রতীচ্য জগতে গত অর্দ্ধশতাব্দি মধ্যে আধুনিক ইতিহাস জন্ম ও পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে। আধুনিক সমস্ত সাজসরঞ্জামসহ ইতিহাসগঠনোপযোগী সেইরূপ সমবায়-প্রযত্নের বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্বে প্রয়োগ এই ব্যাপারেই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হইল। গ্রন্থখানি অনুসন্ধান সমিতির কার্য্যের

পরিচায়ক আটভাগে বিভক্ত "গৌড়বিবরণের" প্রথম খণ্ড। সমস্ত ভাগগুলি যাহাতে একই বিষয়ের অংশরূপে প্রতিভাত হইতে পারে এইরূপ একতা সংবিধানার্থ মুখবন্ধ স্বরূপে, গৌড়বিবরণের সাধারণতঃ বোধসৌকর্য্যার্থে, বিশেষ বিশেষ নৃপতির নামনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ধারাবাহিক কালচিহ্নের সমষ্টিমাত্র 'গৌড়রাজমালায়' দেওয়া হইয়াছে?

বিশেষজ্ঞগণ গ্রন্থোক্ত কোন কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ পাঠক যখন গ্রন্থখানিকে সাধারণ সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ অধ্যয়ন করিবেন, তখন এই সমস্ত খুটিনাটি তাহার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না। বিশেষতঃ 'গৌড়বিবরণের' অপরাপর খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইলে, 'গৌড়রাজমালা' আরও পূর্ণাবয়ব দেখাইবে।

অনুসন্ধানলব্ধ যৎসামান্য বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এই কাঠিন্যের সম্পূর্ণ পরিমাপ গ্রহণ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানি বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক ইতিহাসালোচনাপদ্ধতির এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন—বঙ্গভাষায় প্রথম নিদর্শন বলিতে হইবে। গ্রন্থের কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত নবাবিষ্কৃত সত্যের আলোকপাতে ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও গৌড়রাজমালা পাঠের একটা মূল্য থাকিবে। ইতিহাসের উপাদান হইতে কিরূপে ইতিহাস গঠন করিতে হইবে, গৌড়রাজমালা এই বিষয়ের একখানি অনুশীলন গ্রন্থস্বরূপ হইবে।

'এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন 'লেখমালা'—তাহাতে পুরাতন তাম্রশাসনের ও শিলালিপির পাঠ, বঙ্গানুবাদ এবং টীকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর এক শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য অবলম্বন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের ও শিলালিপির পাঠ, পুরাতন পুস্তক নিহিত ঐতিহাসিক জনশ্রুতি, এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের ঐতিহাসিক গবেষণা।'

গৌড়রাজমালার উল্লিখিত সিদ্ধান্তের মধ্যে কতকগুলি বিশেষজ্ঞের বিবেচনায় নবাবিষ্কৃত সত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, আবার কতকগুলি ভ্রমাত্মক বলিয়া দুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের হিসাবে ধরিতে গেলে দেখা যাইবে যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, এবং বহুকাল হইতে গৌড়কে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালীর রাজনৈতিক সত্তার যে ধারাবাহিক বিবরণ গৌড়রাজমালায় একত্র সন্নিবেশিত ও বিচার দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে তাহা সাধারণ পাঠকের নিকট এক প্রকার নূতনত্বের আভাতে জড়িত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করি না। অতএব আমরা নিম্নে এই নূতন গ্রন্থখানিতে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া সন্তুষ্ট হইব।

এই গ্রন্থের মতে মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। প্রথম ভাগে, ঐতিহাসিকের গ্রাহ্য বিদেশীয়দিগের বিবরণ হইতে বাণিজ্য ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত একটি রাজ্যরূপে বঙ্গদেশের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় অবস্থার কোন সঠিক বিবরণ জানা যায় না। গ্রীকবীর সেকেন্দরের ইতিবৃত্তলেখকগণ, গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস, জাষ্টিন, টলেমি প্রভৃতির রচিত গ্রন্থে বাঙ্গালার এই প্রকার উল্লেখ আছে।

২। দ্বিতীয় ভাগে, উত্তর ভারতের সম্রাটগণের বিজিত রাজ্যসমূহ মধ্যে অন্যতমরূপে বাঙ্গালা দেশের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন শিলালিপি ও চৈনিক পরিব্রাজকগণের রচনা লব্ধ ভারতের পুরাতত্ত্বে বাঙ্গালার ইতিহাসের এই অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়।

৩। তৃতীয় ভাগে, গৌড়াধিপ শশাঙ্কের ক্ষমতায় বাঙ্গালার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া যায়।

৪। চতুর্থ ভাগে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সমস্ত উত্তরাপথের অপরাপর অংশের ন্যায় বাঙ্গালায়ও অবিরত রাজবিপ্লব ঘটিতেছিল যানা যায়।

৫। পঞ্চম ভাগে, গোপাল কর্ত্তৃক পালসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাসে স্থায়ী পরিচিত রাষ্ট্রীয় যুগের আরম্ভ হইয়া পাল ও বর্ম্মা ও সেন বংশের প্রাধান্যের অবসানে মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হয়।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিক বিচারে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকাল ভারতেইতিহাসের কালগণনার একটা সর্ব্বজনমান্য চিহ্নবিশেষ। আলেকজাণ্ডারের ইতিবৃত্তে উল্লিখিত গঙ্গরিডয় ও মেগাস্থিনিস উল্লিখিত গঙ্গারিডি রাজ্য অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহা ভাগিরথীর পশ্চিমতীরস্থ রাঢ়দেশ। তবে গঙ্গরিডয় রাজ্য যে রাঢ়দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না। বাঙ্গালার অপর দুইটী বিভাগ পুণ্ড্র (বরেন্দ্র) এবং বঙ্গ, নিশ্চয়ই গঙ্গরিডই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কলিঙ্গও ঐ সময়ে এই রাজ্যের সহিত সংলগ্ন ছিল। মেগাস্থিনিসের উল্লিখিত "গঙ্গরিডি-কলিঙ্গিই" বোধ হয় অশোকান্বিত কলিঙ্গ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। অশোকের শিলাশাসনসমূহে বাঙ্গালার কোন অংশেরই নামোল্লেখ না থাকিলেও বাঙ্গালা যে অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহার জনশ্রুতিমূলক প্রমাণের অভাব নাই।

প্রথম ভাগ

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে অন্ধ্র এবং কলিঙ্গ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। "গঙ্গারিডি" হয়ত সেই সময়েই কলিঙ্গের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া থাকিবে। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙ্গালীর রণপাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূর রোম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতের রাজন্যবর্গ তৎকালে রোমে দূত প্রেরণ করিতেন, এবং ভারতের সহিত রোমের ঘনিষ্ট বাণিজ্য-সম্বন্ধ ও বর্ত্তমান ছিল। "গঙ্গরিডির" প্রধান নগর গঙ্গে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের একটি প্রধান বন্দর ছিল। "গঙ্গে" হইতে প্রবাল, মস্‌লিন বস্ত্র, এবং বহুবিধ দ্রব্যের রপ্তানী হইত। টলেমি বাঙ্গালার ভৌগোলিক বিবরণ অবগত ছিলেন। টলেমি যে যুগের বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই যুগে আর্য্যাবর্ত্তে কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কুষাণ সাম্রাজ্যের সহিত বাঙ্গালার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন। চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নৃপতি সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-কাহিনী প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সমতট

দ্বিতীয় ভাগ

ও ডবাক প্রভৃতি দেশের নৃপতিগণ কর্ত্তৃক তিনি প্রণামাদি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। ডবাক নামে বাঙ্গালার কোন অংশ যে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা স্থির করা কঠিন। সমতট এবং ডবাক ব্যতীত বাঙ্গালার অপরাপর অংশ পুণ্ড্র এবং রাঢ় সম্ভবতঃ খাস গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ বঙ্গের বা সমতটের সামন্তগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য তৎকালীন সম্রাট বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যখন আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট তখন পরিব্রাজক ফাহিয়ান আর্য্যাবর্ত্ত ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং ভ্রমণের শেষ ২ই বৎসর (১১-১২ খৃষ্টাব্দ) তাম্রলিপ্ত বন্দরে বাস করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করণে এবং দেবমূর্ত্তির চিত্রসঙ্কলনে নিরত ছিলেন। ৪৩২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ কুমার গুপ্তের সময়ের একখানি তাম্রশাসন রাজসাহী জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদীয় পুত্র স্কন্দ গুপ্তের মুদ্রা ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং ঢাকা, ফরিদপুর এবং যশোহর জেলার কোন কোন স্থানে গুপ্ত সম্রাটদিগের মুদ্রার ঢঙের মুদ্রা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দের প্রারম্ভে হূণাধিপ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধন ৫৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই লৌহিত্য নদের উপকণ্ঠ হইতে মহেন্দ্র গিরির উপত্যকা পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ যশোধর্ম্মের মৃত্যুর পর উত্তরাপথে কেহ সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন কি না, বা তাহাদের প্রভাব বাঙ্গালা দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল কি না বলা সুকঠিন। তবে ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত চারিখানি তাম্রশাসনে যথাক্রমে ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচারদেব নামক তিনজন মহারাজাধিরাজ বা সম্রাটের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ের পর বাঙ্গালার ইতিহাসে তৃতীয় যুগের আরম্ভ।

৬০৫ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বরের অধিপতি প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর উত্তরাপথের সার্ব্বভৌমত্ব লাভার্থ প্রতিদ্বন্দীগণের মধ্যে অন্যতমরূপে আবির্ভূত গৌড়াধিপ শশাঙ্কের নাম উল্লেখযোগ্য

তৃতীয় ভাগ

রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রথম গৌরবময় যুগ। বাঙ্গালার অধিপতি এই সময়ে আর আততায়ীর প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান নহেন, পরন্তু বিজিগীষু হইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে সাম্রাজ্যস্থাপনে অগ্রসর। এই সময় হইতে তুরুষ্ক-বিজয় পর্য্যন্ত গৌড়মণ্ডলের আভ্যন্তরিক অবস্থা যখন যেরূপই হউক, গৌড়েশ্বর বা গৌড়াধিপ উপাধি সর্ব্বদাই প্রচলিত ছিল। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ রাঢ়দেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যিনি কর্ণসুবর্ণ হইতে কান্যকুব্জে জয়ার্থ যাত্রা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তিনি যে পূর্ব্বেই বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন ও মিথিলা ও মগধে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন; তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। বোধ হয় শশাঙ্ক প্রথমে কোনও সার্ব্বভৌম নরপালের সামন্তশ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন, এবং ষষ্ঠ শতাব্দের শেষ ভাগে, যে সুযোগে পশ্চিম দিকে থানেশ্বরের প্রভাকরবর্দ্ধন এক অভিনব সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সুযোগে পূর্ব্ব দিকে শশাঙ্ক গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গৌড়মণ্ডল দীর্ঘকাল উত্তরাপথ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত থাকিলেও ইতিপূর্ব্বেই ভাষায় এবং সাহিত্যে গৌড়জনের স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা প্রকাশিত হইয়াছিল। অলঙ্কারশাস্ত্রবিৎ দণ্ডী ভাষার মধ্যে "গৌড়ী" নামক স্বতন্ত্র প্রাকৃত ভাষার এবং কাব্যরচনায় "গৌড়ীরীতি" নামে স্বতন্ত্র রচনা-রীতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইলে কান্যকুব্জ নির্ব্বিবাদেই শশাঙ্কের হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার উত্তরাপথে প্রাধান্য-স্থাপনের আশা সফল হইল না। বিধাতা গৌড়াধিপের ভাগ্যে সার্ব্বভৌমের পদলাভ লেখেন নাই। রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন থানেশ্বরের শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হর্ষবর্দ্ধন গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছয় বৎসর কাল অবিরত যুদ্ধ করিয়াও গৌড়াধিপের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই যুদ্ধের পরও শশাঙ্ক শান্তিভোগ করিতে পারেন নাই। বোধ হয় মিথিলা ও মগধের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বুদ্ধগয়া ও কুশীনগরের বৌদ্ধ শ্রমণগণের নির্য্যাতনে তাঁহাকে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। শশাঙ্কের পরলোক গমনের পর সহজেই তদীয় সাম্রাজ্য হর্ষবর্দ্ধনের পদানত হইয়াছিল।

৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর হইতে সমগ্র বঙ্গের কোন নিশ্চিত বিবরণ পাওয়া যায় না। বহু সংখ্যক খণ্ড রাজ্যের অধিপতির নাম পাওয়া যায়। বঙ্গীয় ইতিহাসের পরবর্ত্তী যুগে পাল নরপালগণের আরম্ভ পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থাই বর্ত্তমানছিল।

চতুর্থ ভাগ

সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে সেএচি নামক একজন চীন পরিব্রাজক রাজভট নামক একজন বৌদ্ধনৃপতিকে সমতটের সিংহাসনে আসীন দেখিয়াছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে শৈলবংশীয় কোন আক্রমণকারী পৌণ্ড্রদেশ অধিকার করেন। ঐ সময়ে যশোবর্ম্মা নামে একজন দিগ্বিজয়ী নরপাল কান্যকুব্জের সিংহাসন লাভ করিয়া গৌড়পতি বা মগধনাথকে নিহত করিয়া সমুদ্রতীরস্থ বঙ্গরাজ্যে উপনীত হইয়া বঙ্গেশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু গৌড়বঙ্গবিজয়ের অনতিকাল পরেই ৭৩৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের অধিপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় তাঁহাকে বশীভূত করেন। যশোবর্ম্মার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গৌড়ীয় মহাসামন্তকেও ললিতাদিত্যের পদানত হইতে হয়, এবং পরে কাশ্মীরে যাইতে হয়। গৌড়পতি কাশ্মীরে নিহত হইলে উহার প্রতিশোধ প্রদানার্থে গৌড়ীয়গণ অসাধ্য সাধন করিয়াছিল।

যশোবর্ম্মার সাম্রাজ্যধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ের সহিত কান্যকুব্জের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। সম্ভবতঃ এই সুযোগে এবং গৌড়াধিপ কাশ্মীরে নিহত হইলে পর ভগদত্ত বংশীয় হর্ষদেব গৌড়মণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া এক বিস্তৃত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীর চতুর্থপাদে কাশ্মীরপতি জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপ জয়ন্ত নামক তাহার শ্বশুরকে গৌড়াধিপের আসনে প্রতিষ্ঠাপিত করেন বলিয়া রাজতরঙ্গিণীতে

উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু জয়ন্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না বলা কঠিন!

ঢাকা জেলায় রায়পুরা থানার অন্তর্গত আসরফপুর নামক গ্রামে প্রাপ্ত দুইখানি তাম্রশাসনে "খড়্গোদ্যম" কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক 'গৌড়বধ' হইতে গৌড়মণ্ডলের অপরাপর অংশে ক্রমাগত রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতে থাকিলেও খড়্গরাজগণের শাসনাধীনে বঙ্গ সম্ভবতঃ শান্তিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু ৭৮৪ খৃষ্টাব্দের পরে পশ্চিম দিক্পাল প্রতিহারবংশীয় বৎসরাজ বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া গৌড়পতি ও বঙ্গপতি উভয়কেই পরাভূত করিয়াছিলেন; কিন্তু যশোবর্ম্মার ন্যায় বৎসরাজকেও রাষ্ট্রকুটরাজ ধ্রুবের তাড়নায় বিজয়ফলভোগে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল।

এইরূপ বহিরাক্রমণ ও ক্ষণস্থায়ী রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে তারানাথের কথায় বলিতে হয়

পঞ্চম ভাগ প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন অংশে প্রত্যেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে আপন আপন প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু সমগ্র দেশের কোনও রাজা ছিল না। পালবংশের প্রথম রাজা গোপালের অভ্যুদয়ে এই অরাজক 'মাৎস্যন্যায়' অবস্থা দূরীভূত হইয়া আবার বাঙ্গালাদেশ একজন রাজার শাসনাধীনে আসিলে বঙ্গের ইতিহাসের পঞ্চম যুগের আরম্ভ হয়।

গোপাল কর্ত্তৃক পালবংশের প্রতিষ্ঠা-সময় হইতে বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘটনা-স্রোতঃ পরিচিত খাতে বহিতে আরম্ভ করে। পালরাজগণের দীর্ঘ রাজত্বকাল তিন যুগে বিভক্ত করা যায়।

(১) প্রথম গোপাল হইতে দেবপালের রাজত্ব শেষ পর্য্যন্ত উন্নতির যুগ।

(২) বিগ্রহ পাল হইতে নয়পাল পর্য্যন্ত সময়কে পালরাজত্বের স্থিতিশীল যুগ বলা যাইতে পারে।

(৩) তৃতীয় বিগ্রহপাল হইতে পালবংশের অধঃপতনের যুগ আরম্ভ হয়।

(১) পালরাজত্বের প্রথম যুগে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ক্রমে উন্নতিলাভ করে। গোপাল সমুদ্র পর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডল অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মধগ অধিকার করিয়াছিলেন; হয়ত মিথিলা বা তীরভুক্তিও(ত্রিহুত) তাঁহার পদানত হইয়াছিল।

তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল কোন সময়ে সিংসাসন লাভ করিয়াছিলেন, নিরূপণ করা সুকঠিন। কিন্তু বোধ হয় ৮১৫ কি ৮১৬ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাভূত করিয়া উত্তরাপথের সার্ব্বভৌমত্বলাভ করিয়া কান্যকুব্জের সিংহাসনে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এবং ঐ ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বেই পিতৃসিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য পূর্ব্বদিকে সমুদ্র হইতে পশ্চিমে ভিল্লি (দিল্লি) পর্য্যন্ত এবং উত্তরে জলন্ধর হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি রাষ্ট্রকুলতিলক পরবলের কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। গুর্জ্জররাজ নাগভট্ট মৎস্য প্রভৃতি কান্যকুব্জরাজের অনুগত রাজ্যনিচয় আক্রমণ করাতে তাঁহার সহিত চক্রায়ুধের ও বঙ্গপতি ধর্ম্মপালের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধে নাগভট্ট জয়লাভ করিয়াছিলেন। নাগভট্টের পৌত্র মিহিরভোজ ধর্ম্মপালকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মপাল বা মিহিরভোজ এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কাহারও উত্তরাপথের সার্ব্বভৌমত্ব সম্পূর্ণরূপে লাভ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্মপালের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে গৌড়মণ্ডলে সুখশান্তি বিরাজিত ছিল।

ধর্ম্মপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী উত্তরাপথের সার্ব্বভৌমপদলাভ করিতে সমর্থ হন নাই বটে, কিন্তু তিনি দক্ষিণাপথ ও উত্তরাপথ এই উভয় খণ্ডের নৃপতি-সমাজে শ্রেষ্ঠত্বলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়পাল উৎকল এবং কামরূপে গৌড়েশ্বরের আধিপত্য বিস্তৃত করেন। প্রতীহাররাজ মিহিরভোজ,কলচুরি-রাজ কোকল, রাষ্ট্রকুটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ এবং চান্দেল্লরাজ শ্রীহর্ষ কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে দেবপাল উত্তরাপথের সার্ব্বভৌমের পদলাভে সমর্থ হন নাই।

দশম শতাব্দের প্রারম্ভে দেবপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গৌড়রাষ্ট্রের উন্নতির যুগের অবসান। কেবল গৌড় কেন, এই সময় হইতেই সমস্ত উত্তরাপথের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।

(২) অতঃপর গৌড়রাজ্যের স্থিতিশীল যুগ। এই যুগের সর্ব্বপ্রথম নৃপতি দেবপালের উত্তরাধিকারী বিগ্রহপাল। তিনি ধর্ম্মপাল ও দেবপালের প্রতিভা ও উচ্চাভিলাষ উভয়েই বঞ্চিত ছিলেন। তিনি হৈহয় বা কলচুরি রাজকুমারী লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

ইঁহার মৃত্যুর পর পুত্র নারায়ণপাল নৃপতি হন। গরুড়স্তম্ভপ্রতিষ্ঠাতা গুরব মিশ্র নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন। এই নৃপতি ন্যায়নিষ্ঠ, দানশীল, সাধুচরিত্র এবং বিজিগিষু বলিয়া প্রশস্ত, কিন্তু কোন্ দেশ আক্রমণ বা জয় করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

নারায়ণ পালের পুত্র রাজ্যপালও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। ইনি রাষ্ট্রকূট তুঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ও বহু জলাশয় ও দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ইঁহার মৃত্যুর পর ২য় গোপাল সিংহাসন লাভ করেন।

ইঁহার পুত্র ২য় বিগ্রহপালের ভাগ্যে অখণ্ড গৌড়রাজ্য সম্ভোগ ঘটিয়া উঠে নাই।

দীনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাণনগরের ধ্বংসস্তূপ হইতে সংগৃহীত প্রস্তর-স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, যে ৯৬৬ খৃষ্টাব্দের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিব্বত বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী কোন প্রদেশ হইতে বহির্গত কাম্বোজবংশজ কোন বিজেতা কর্ত্তৃক গৌড়রাজ্যের অংশ অধিকৃত হয়।

কিন্তু আনুমানিক ৯৮০ খৃষ্টাব্দে ২য় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল এই বিজেতার হস্ত হইতে অধিকৃত পিতৃরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিয়া পালরাজ্যকে আরও প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দীর পরমায়ু প্রদানে সমর্থ হন। মহীপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। পুনরায় বিদেশীয় আক্রমণকারীর হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল। চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোল বোধ হয় উড়িষ্যা, বঙ্গ, এবং রাঢ়ের সামন্তগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন; এবং মহীপালের সহিত সম্মুখ যুদ্ধের পরেই হউক, বা পূর্ব্বেই হউক, অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। মহীপাল শশাঙ্ক, ধর্ম্মপাল, এবং দেবপালের ন্যায় উচ্চাভিলাষী ছিলেন না, পরন্তু শান্তিই ভালবাসিতেন! এই সময়ে তুরস্কগণকর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের সূত্রপাত হয়। থানেশ্বর, মথুরা, কান্যকুব্জ, গোয়ালিয়র, সোমনাথ যখন সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইতেছিল, উত্তরাপথের পূর্ব্বার্দ্ধের অধিপতি তখন উদাসীন ছিলেন। কাম্বোজবিজেতার হস্ত হইতে বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়া মহীপাল যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিয়া পরহিতকর ও পারত্রিক কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানে রত ছিলেন। তিনি নানাস্থানে সুবৃহৎ জলাশয় ও নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সারনাথের কীর্ত্তিনিচয়ের জীর্ণসংস্কার ও বারাণসীতে কীর্ত্তি স্থাপন করেন। বারাণসী তখন গৌড়রাষ্ট্রভুক্ত এবং গৌড়সেনারক্ষিত ছিল।

সুলতান মামুদের অভিযান-নিচয় সম্বন্ধে গৌড়াধিপ মহীপালের এই ঔদাসীন্য উত্তরাপথের সর্ব্বনাশের অন্যতম কারণ। যদি গৌড়ীয় সেনাবল মামুদের বিরুদ্ধে অপরাপর প্রতিরোধকারীর সাহায্য করিত, হয় ত ভারতের ইতিহাস বিভিন্ন আকার ধারণ করিত।

মহীপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নয়পালের পশ্চিম দিকে রাজ্যবিস্তারের সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনিও উচ্চাভিলাষবর্জ্জিত ছিলেন বলিয়া কেবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে গৌড়রাজ্য অখণ্ড রাখিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। বোধ হয় তাঁহারই সেনা ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে লাহোরের শাসনকর্ত্তা আহম্মদ নিয়ালতিগীনের আক্রমণ হইতে বারাণসীর উদ্ধার সাধন করে। নয়পালের রাজ্যকালে কর্ণরাজ্যের রাজাকর্ত্তৃক মগধ আক্রান্ত হয়, কিন্তু পরে নয়পালই জয়লাভ করেন।

(৩) নয়পালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ৩য় বিগ্রহপাল। তিনি কর্ণদেবের দুহিতা যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন ও সংগ্রামচতুর ছিলেন। কিন্তু এই ৩য় বিগ্রহপালের আমলেই, কল্যাণের চালুক্য রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের

দিগ্বিজয়কালে, গৌড় ও কামরূপ আক্রমণের ফলে পাল বংশের অধঃপতনের বীজ উপ্ত হয়। কারণ, গ্রন্থকারের মতে, কর্ণাট বলিতে তৎকালে কল্যাণের চালুক্য রাজগণকে বুঝাইত, এবং পালবংশের পরবর্ত্তী কর্ণাটক্ষত্রিয় বংশজাত সেনরাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ বোধ হয় এই দিগ্বিজয়লব্ধ গৌড়রাষ্ট্রবিচ্ছিন্ন রাঢ়দেশ শাসনার্থই কুমার বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক নিয়োজিত হন।

৩য় বিগ্রহপাল মহীপাল, শূরপাল, ও রামপাল নামে তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এই মহীপাল ২য় মহীপাল নামে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি নানা দুষ্কার্য্যরত ছিলেন ও শূরপাল ও রামপালকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর কৈবর্ত্ত জাতীয় দিব্য বা দিব্বোক প্রজাবিদ্রোহের অধিনায়ক হইয়া মহীপালকে যুদ্ধে নিহত করিয়া বরেন্দ্র অধিকার করে এবং দিব্বোকের অনুজ রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজপদে আরূঢ় হন। ইতিমধ্যে রামপাল বরেন্দ্রী ত্যাগ করিয়া গৌড়রাজ্যের অন্যান্য সামন্তগণকে একত্রিত করিয়া বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিয়া গৌড়রাষ্ট্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কামরূপ ও কলিঙ্গেও আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

রামপালের মৃত্যুর পরেই, আবার রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌড়েশ্বর কুমারপাল এবং তাঁহার প্রধান সচিব এবং সেনাপতি বৈদ্যদেবের বাহুবলে গৌড়রাষ্ট্রের পতন আরও কিছুকাল স্থগিত রহিল।

কুমারপালের মৃত্যুর পর তদীয় শিশু পুত্র ৩য় গোপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বোধ হয় তিনি যুদ্ধে বা ঘাতুক হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

অতঃপর মদনদেবীর গর্ভজাত রামপালের পুত্র মদনপাল আনুমানিক ১১১৪অব্দে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি সমরকুশল ছিলেন না, অতএব গৌড়রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ গৌড়পতির হস্তচ্যুত হইতে আরম্ভ করে। কুমারপাল কর্ত্তৃক কামরূপের রাজপদে নিয়োজিত বৈদ্যদেব স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। মদনপালের রাজ্যের ১৯শ সম্বতের বা ১১১৩খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ বর্ম্মবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল, এবং সামন্তসেনের পুত্র বিজয় সেন গৌড়রাষ্ট্রের কেন্দ্র বরেন্দ্রমণ্ডলে সেন-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছিলেন।

মগধে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে মহেন্দ্র পাল এবং গোবিন্দ পাল নামক আরও দুই জন পাল নরপালের পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দ পালের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয় তিনি পালবংশের শেষ নৃপতি। বোধ হয় গোবিন্দ পাল বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি বিজয় সেন কর্ত্তৃক বরেন্দ্র হইতে তাড়িত হইয়া মগধে আশ্রয় লইয়াছিলেন। গোবিন্দ পালের রাজ্যের অবসান কাল ১১৬১ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার রাজ্যনষ্টকারী হয় ত বিজয়ের পুত্র বল্লাল সেন।

বর্ম্মবংশ

যে দুইটি স্বতন্ত্র রাজবংশের অভ্যুদয়ে পালরাজবংশ উন্মূলিত হয়, তন্মধ্যে বঙ্গের বর্ম্মবংশ পূর্ব্বতন এবং প্রথম উল্লেখযোগ্য। ভুবনেশ্বর প্রশস্তির ভট্ট ভবদেব যাঁহার মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার নামে বঙ্গে বর্ম্মবংশ নামে এক রাজবংশের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোধ হয় ভবদেবের পিতামহ আদিদেবের সময়ে রাঢ়ে বঙ্গে এই বর্ম্মবংশীয় বঙ্গরাজের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। এই বর্ম্মবংশ ও পাল ও সেনবংশের পরস্পর সম্পর্ক এখনও বলা কঠিন। *

সেনবংশ

বর্ম্মবংশের অভ্যুদয় এবং মদনপালের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন গৌড়রাষ্ট্র যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সামন্তসেনের পৌত্র বিজয় সেন বরেন্দ্রভুক্তিতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়সেনের অভ্যুদয় কাল

* গৌড়রাজমালা প্রকাশিত হইবার পর বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে বর্ম্মবংশের আরও কয়েকজন নৃপতির নাম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই রাজবংশের সহিত উল্লিখিত অপর দুইটি রাজবংশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক পূর্ব্ববৎ অমীমাংসিতই রহিয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (আনুমানিক ১১২৫—১১৫০ খৃষ্টাব্দে) নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। বিজয়সেনের আক্রমণফলেই সম্ভবতঃ গৌড়েন্দ্র মগধে, আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপর প্রতিবেশী নৃপতিমাত্রই হয়ত তাঁহার প্রতিকূলতাচরণে উদ্যত হইয়াছিলেন। বিজয়-সেন কামরূপভূপকে দমন করিয়াছিলেন, এবং কলিঙ্গ-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মিথিলাপতি নান্যদেব বিজয়সেনকে আক্রমণ করিতে আসিয়া ধৃত এবং কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। দক্ষিণ দিকে, বঙ্গ এবং রাঢ়ে ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক বিজয়সেনের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বরেন্দ্রে বিজয়সেনের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল, এবং সেখানে তিনি অনেক লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের অবসর পাইয়াছিলেন। বিজয়সেনপ্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত বিজয়নগর অঞ্চলে তাঁহার রাজধানী বিজয়পুরের ধ্বংসাবশেষ অধিকৃত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া সমগ্র গৌড়রাষ্ট্র করায়ত্ত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে পালবংশজ গোবিন্দপালদেব সম্ভবতঃ বল্লালসেন কর্ত্তৃকই একেবারে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। বর্ম্মরাজকে পদচ্যুত বা পদানত করিয়া বল্লাল রাঢ়ে ও বঙ্গে স্বীয় আধিপত্য বিস্তৃত করিয়া-ছিলেন। বল্লাল বোধ হয় কলিঙ্গ রাজ্যও আক্রমণ করিয়া ছিলেন। ১১৬৯খৃষ্টাব্দে বল্লাল "দানসাগর" সঙ্কলিত করেন এবং ইহার পূর্ব্ব বৎসর "অদ্ভুত সাগর" সঙ্কলন আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তী কালের গৌড়রাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনা করিতে প্রতীয়মান হয়, বল্লালসেন গৌড়রাষ্ট্র প্রতিদ্বন্দ্বিহীন করিতে সমর্থ হইলেও, দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ স্থায়ী রাজত্বকালে বিস্তীর্ণ গৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন অংশ সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিবার—গৌড়রাষ্ট্র পুনরায় সুগঠিত এবং এক কেন্দ্রীভূক্ত করিবার অবসর পাইয়াছিলেন না।

বল্লালের পুত্র গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনও অবশ্যই কলিঙ্গপতি এবং কামরূপপতিকে বশীভূত রাখিতে যত্ন করিয়াছিলেন, এবং কান্যকুব্জেশ্বরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেন গৌড়রাষ্ট্রের বহিঃশত্রু দমনে সমর্থ হইয়া থাকিলেও, প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতার অভাবে, আভ্যন্তরীন ঐক্যসাধনে এবং বিভিন্ন অংশের রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। সেই জন্যই মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার অবাধে মগধ এবং বরেন্দ্র অধি-কার করিতে পারিয়াছিলেন।

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের জায়গীর দক্ষিণ বিহার বা মগধের পশ্চিম সীমা কর্ম্মনাশা নদীর পশ্চিমে চুনার গড়ের নিকটে অবস্থিত ছিল। এখান হইতে মহম্মদ মাঝে মাঝে মগধে প্রবেশ করিয়া গ্রাম লুটপাট আরম্ভ করিলেন। অবশেষে তিনি বিহার দুর্গ অধিকার করিতে মনঃস্থ করিলেন। এই কিল্লা বিহার পাটনা জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান বিহার মহকুমার প্রধান নগর বিহার বলিয়া অনুমিত হয়। মহম্মদ ১১৯৭ কি ৯৮ খৃষ্টাব্দে "বিহার" এবং তৎপর "নোদিয়া" দখল করেন। মহম্মদ অধিকৃত বিহার বর্ত্তমান দক্ষিণ বিহার বা সাহাবাদ, পাটনা, গয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর জেলা—ত্রিহুত নহে।

মহম্মদ বক্তিয়ারের "নোদিয়াহ্" আক্রমণের সময় লক্ষ্মণ সেন ঠিক অশীতিবর্ষীয় না হউন, বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়া ছিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাস্য, "সহর নোদিয়াহ্" কোন্ খানে ছিল? 'নবদ্বীপ' না বলিয়া, বিজয়সেনের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম রাজধানী রাজসাহির অন্তর্গত বিজয়-নগরকেই মিনহাজের উল্লিখিত 'নোদিয়াহ্' বলিতে প্রবৃত্ত হয়।

"নোদিয়াহ্" অধিকার ব্যাপারে মিনহাজউদ্দিনের একমাত্র অবলম্বন "বিশ্বাসযোগ্য লোকের" উক্তি। কিন্তু বক্তিয়ারের নোদিয়াহ্ প্রবেশের পূর্ব্বে এবং পরোক্ষে নোদিয়ায় যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ইঁহাদের প্রদত্ত বিবরণ বিশেষ বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এবং যুক্তিবিরুদ্ধ অংশ অমূলক গল্প বলিয়া উপেক্ষণীয়। এইরূপ বিচার করিলে লক্ষ্মণসেনের নোদিয়া হইতে পলায়ন-কাহিনী প্রকৃত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তাহা অল্প

লোকের পরিকল্পিত উপকথামাত্র অনুমান হয়। মহম্মদ-বক্তিয়ার কর্ত্তৃক বিহার ফতে হওয়ার সংবাদ রায় লখমনিয়ার (লক্ষ্মণসেন) রাজধানীতে পৌঁছিলে যখন ব্রাহ্মণগণ এবং ব্যবসায়ীগণ নোদিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, নোদিয়ার অধীশ্বরও তখনই রাজধানী ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মহম্মদ-বক্তিয়ার কর্ত্তৃক এরূপ নির্ব্বিবাদে পশ্চিম বরেন্দ্র অধিকারের প্রকৃত কারণ এই যে, যখন মহম্মদ কর্ত্তৃক মগধ আক্রমণের সংবাদ বিক্রমপুরে পৌঁছিল, তখনই হয়ত ভয়াতুর মন্ত্রিগণের উপদেশে লক্ষ্মসেন (পূর্ব্ব) বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এবং তাহার অনতিকাল পরে নোদিয়া আক্রমণের পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণের যে দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, লক্ষ্মণসেনের অভাবে সিংহাসন লইয়া পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের পরলোক গমনের পরে ভ্রাতৃবিরোধ-বহ্নি প্রধূমিত হইবার সময়ে মহম্মদ-বক্তিয়ার পশ্চিম বরেন্দ্র অধিকার করিবার অবসর পাইয়া থাকিবেন।

এইখানে "গৌড়রাজমালা" শেষ হইল।

পরস্পরবিরোধী প্রমাণ গ্রন্থাদির বিচারপূর্ব্বক ঐতিহাসিক সত্যের নিষ্কাশনের পদ্ধতি এই গ্রন্থের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন না করিলে এই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

— —

বাণী-বন্দনা।

(সুরমা-উপত্যকা সাহিত্য-সম্মীলনে পঠিত ১৩১৯ বাং)

আজি মঙ্গল-শাঁখ উঠিছে বাজিয়া
প্রাঙ্গনে তোর,
ভক্ত অযুত তব অর্চ্চন
আনন্দে ভোর।
আমি এ পূজার দিনে দূরে র'ব কিগো
বিশ্বরমা?
অকৃতী ব'লে কৃপা-বঞ্চিত
থাকিব কি মা?
হই না অধম, তোমারি ত মা!
এ ভরসা মনে,
কুণ্ঠিত কবে করুণা তোমার
অকিঞ্চনে!
কত অভাজন, অধম, ভ্রান্ত,
দস্যুপতি,
প্রসাদে তোমার লভিল চকিতে
পরমা গতি,
মঙ্গল ক্ষণে কৃপা কটাক্ষে
হের মা যারে,
খুলে যায় তার অন্ধ নয়ন
আলোক-পারে।
গুঞ্জরে সেথা অজানা দেশের
কত না ধ্বনি,
নব সুষমার আভরণে সাজে
প্রকৃতিরাণী।
চন্দ্রে চন্দ্রে ললিত ছন্দ
জাগিয়া উঠে,
দিব্য রাগিণী শুনিয়া ধরণী
নাচিয়া ছুটে।
তারায় তারায় স্বর্ণ বিভায়
কবিতা জ্বলে,
হরষে বিবশ মলয় লুটায়
কানন-তলে।
পুষ্প-পুঞ্জে গুঞ্জরে যত
শুক শাখী,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহরে লক্ষ
মৌন পাখী,
চির-সুন্দর চরাচরময়
কবিতা মাঝে,
নিত্য, দীপ্ত তোমারি শোভন
আসন রাজে।

অমৃত-যোগে যে সুর সে দিন
আলাপে কবি,
অলস বিশ্ব জাগে গো তাহে
জীবন লভি।
প্রথম যে দিন প্রভায় উজলি
প্রাচীর ভালে,
করুণা-আর্দ্র মূর্ত্তি তোমার
ছড়ায়ে দিলে,
অতীত-ভারত-তপোবন-তল
কুটীরে বসি,
বিশ্বমোহন কণ্ঠ তোমার
শুনিল ঋষি।
পুলক-আবেশে ধেয়ান-মগন
নয়ন তুলি,
হেরিলা বিশ্ব প্রেমে করুণায়
গিয়াছে গলি!
পাতায় পাতায় পুণ্য পীযুষ
পড়িছে ঝরি,
ধুলায় ধুলায় মূর্ত্ত চেতনা
ছুটিছে, মরি!
সে দিন, শিল্পী রচিল তোমারি
মাধুরী দিয়া,
সাগর-বক্ষে রক্ষপুরীর
স্বর্ণমায়া,
গড়িল হর্ষে কত অযোধ্যা
স্বপনে ভরি!
কত নন্দন-গন্ধ-গরবী
অমরাপুরী!
শান্তি-নিকনে তীব্র তটিনী
প্রবাহ রোধি
কাব্য-সূত্রে যুগযুগান্ত রাখিল
বাঁধি!
চাহি না সাম্যে, সে অতিপ্রসাদ
নাহি সে আশা।
শুধু ব্যক্ত করিতে শক্তি দাও মা!
প্রাণের ভাষা,
এস গো অর্চ্চ্য, এস গো কাম্য
এস গো বাণি!
রাখ মা, আমার মানস-সরোজে
চরণখানি।
প্রসাদ সেবকে শুভাননে, ওগো
ভারতী-মাতা!
ভক্ত তোমার রক্তিম পায়
নোয়ায় মাথা।

শ্রীক্ষীরোদবিহারী সোম।

একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি

ইহা একখানি অতি সুন্দর প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি। শঙ্করাচার্য্যের "মোহমুদ্গর এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের "সদ্ভাব শতক" যে ধরণের গ্রন্থ, ইহাও কতকটা সেই ধরণের, দুঃখের বিষয়, গ্রন্থের নামটি কি জানা যাইতেছে না। পাণ্ডুলিপির লেখাগুলি অতি সুন্দর! আধুনিক ধরণের গোটাগোটা অক্ষরে রয়েল ফরমের কাগজের ২৩ পত্রে পুঁথিখানি সমাপ্ত হইয়াছে। ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। লিপিকরের নাম রসিকচন্দ্র দাস, নিবাস চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত পরৈকোড়া গ্রামে। ৪০।৪৫ বৎসরের অনূর্দ্ধ কালের লেখা বোধ হয়। লেখক মহাশয় নির্ঘণ্ট পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থের নামটি দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

দীনেশ নামধেয় কোন কবি ইহার রচয়িতা! শুধু এই নামাংশটুকু ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন কথা জানিবার উপায় নাই। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্মদিগের কোন সঙ্গীত গ্রন্থ পাঠ করিতেছি বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থের ভাষাও বর্ত্তমান কালের ভাষার মত বিশুদ্ধ।

এই পুঁথিখানি প্রকাশিত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইহার কবিত্ব, ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার ভাবুকত্ব অতুলনীয়, তাহা বুঝাইবার বিষয় নহে। ইহার তাবৎ গুণাবলি প্রকটন করিবার জন্য কোন বিশিষ্ট শিল্পীর লেখনী আবশ্যক। আমাদের ক্ষীণশক্তি লেখনী তৎকার্য্য সাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের মাতৃভাষায় এমন সুন্দর গ্রন্থ আছে দেখিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে। বস্তুতঃ এমন সুন্দর সহজ কবিতা আজকাল খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

পুঁথিখানির নাম আবিষ্কৃত হওয়া একান্ত আবশ্যক। পাঠকগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে এস্থলে আমরা নির্ঘণ্ট-পত্রের প্রতিলিপি প্রদান করিলাম:—"পরমেশ্বরের বন্দনা; মনের প্রতি উপদেশ ১ অবধি ৩৬ প্রকরণ; পরমেশ্বরের স্তব; পুনঃ মনের প্রতি উপদেশ; পুনঃ ঈশ্বরের প্রতি স্তুতিপাত ১ অবধি ১০ প্রকরণ; রমণীর দুঃখ-খেদবর্ণনা; পুরুষের দুঃখবর্ণনা—১ অবধি ৬ প্রকরণ; মৃত্যুরূপ ক্ষুধা; বর্ণনা; খেদোক্তি—"তেমন সুখের কাল আর নাকি হয়" —এক অবধি ত্রয়োদশ প্রকরণ; সঙ্গীত পয়ার চৌপদী একাবলী; বিলাপ—হরির প্রতি স্তুতি-১ প্রকরণ; আশা, লোভ ইত্যাদিতে ঈশ্বরের প্রতি স্তবাক্ষেপ এক অবধি বিংশতি প্রকরণ; কালের বিবরণ; ভাবের বিবরণ; পুনঃ কালের নিয়মিত আচরণ বিষয়; ললিতছন্দে বিরহ বর্ণনা; অতি আক্ষেপ বর্ণনা; মনের প্রতি তিরস্কার বর্ণনা একাবধি পঞ্চম; মনের প্রতি প্রবোধ দুই প্রকার; নিদাঘবর্ণনা; তত্বপ্রকরণ মনের প্রতি উক্তি; প্রেমালিঙ্গন ফিরি লওয়ার বিবরণ; ঈশ্বরের স্তব পদ—সমাপ্ত"

গ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, পাঠকবর্গ এখন তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আগেই বলিয়াছি, ইহা অতি মনোহর গ্রন্থ—এত সুন্দর যে ইহার যে কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে। পুঁথিখানির আরম্ভ এইরূপ:—

পরমেশ্বরের বন্দনা—ত্রিপদী।

জয় জয় হে মুকুন্দ, পরমাত্মা চিদানন্দ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিতা।
নির্ব্বিকার নিরাশ্রয়, নিরাকার নিরাময়,
নিরঞ্জন নিখিল নিখিল (?) নির্ম্মাতা॥
অনন্ত জীবের জীব, চরমে পরম শিব,
বাক্যাতীত মহিমা কীর্ত্তন।
মন চক্ষু অগোচর, ব্যাপ্ত বিভু চরাচর।
পরাৎপর পরম কারণ।
বিবর্জ্জিত দেহ মন, অথচ মনের মন,
শ্রুতি বিনা করহ শ্রবণ।
বিরহিত করক্রম, সমগ্র গৃহীত হয়,
পদ বিনে সর্ব্বত্র গমন॥
রসজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ স্বামী, অখিলের অন্তর্যামী,
বিশুদ্ধ স্বভাব সর্ব্বগত।
পূর্ণানন্দ জ্যোতির্ম্ময়, কিন্তু নেত্রগম্য নয়,
বিমল বিজ্ঞানে বিকাশিত॥
তুমি সত্য তুমি নিত্য, অনাদ্য পরম বিত্ত,
তত্বজ্ঞানে তত্ব সারাৎসার।
অজ্ঞান তিমিরালোক, পূজিত অনন্ত লোক,
অদ্বিতীয় করুণা আধার॥
তুমি হে পরমেশ্বর, পিতা মাতা সর্ব্বেশ্বর,
পরব্রহ্ম পূর্ণানন্দময়॥
আমি অতি অকৃতজ্ঞ, ভাবভক্তিহীন অজ্ঞ,
রচনেচ্ছা বৃত্তি বলবতী।
অকারণে কাল হরি, নিকট হইল হরি,
হরি বিনা হারব কি গতি॥
সদা সুস্থ রাখ দেহ, রচনার শক্তি দেহ,
নষ্ট কর কষ্টসমুদয়।
নাহি চাই হীরা হেম, তোমার পবিত্র প্রেম,
অন্তরে উদয় যেন হয়।

গ্রন্থখানির নামোদ্ধারের সুবিধা হইবে বিবেচনায় উহার নানাস্থান হইতে নিয়ে কতক কতক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা হইতে পাঠকবর্গ উহার সৌন্দর্য্য এবং উপাদেয়ত্বও বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

("মনের প্রতি উপদেশ" হইতে।)

(৫ম প্রকরণং)

শুনরে মন আমার কর উপাসনা কার ?
তুমি আপনি প্রসন্ন হৈলে ভাবনা কি আর।
তুমি মন একাদশ, নিজে হোলে নিজবশ,
এ ভুবন চতুর্দ্দশ সকলি তোমার ॥
তুমি নাস্ত হোলে সান্ত, প্রবোধ পীযুষ কান্ত,
হরিবে ভবের ধ্বান্ত, ত্রিতাপ আধার।
কেবা সূর্য্য শশধর, কেবা বিধি পুরন্দর,
কেবা হরি কেবা হর, কেবা আর কার ॥
জল্পনায় করিয়ে দ্বেষ, কল্পনা হইবে শেষ,
নিজে তুমি নিজ দেশ, পাবে অধিকার।
চির নিরানন্দরাশি, অখণ্ড আনন্দ রাশি,
আপনি অন্তরে আসি, করিবে বিহার ॥
কাম আদি রিপুগণ দেহ দেহ বিসর্জ্জন,
কে তুমি আপনি মন ! ভাব একবার।
আমি আমি আমি কই, সে আমি ত আমি নই,
একমাত্র সর্ব্বজয়ী তুমি মূলাধার ॥
যে তুমি যে তুমি হও, তোমারে চিনিয়া লও,
তুমি ছাড়া তুমি নও, এই জেন সার।
শরীরে রয়েছ যেই, আমি আমি বলি তাই,
এ অহং হবে শেষ হলে নির্ব্বিকার ॥
এরূপ ৩৬শ 'প্রকরণে' এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

"একমেবাদ্বিতীয়ং চৌপদী" হইতে—(পঞ্চমং)

অভিনব মনোহর, পেয়ে এই কলেবর,
কত তার [illegible] যতন করিছ হে।
না বুঝিয়ে সবিশেষ, মনোমত কর বেশ,
বাঁকায়ে মাথার কেশ, সময় হরিছ হে ॥
জান না কি কাল এসে, যখন ধরিবে কেশে,
কোথায় রবে বেশ ভূষে, দেহ মাটি হবে হে।
অতএব ওরে মন, ভক্তিভাবে প্রতিক্ষণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, ভাবনা না রবে হে ॥
(নরম)
এ কেমন তব মতি, না হইলে মহামতি,
ধূলায় ফেলিয়া মতি, ঝিনুকে যতন হে।
মহাধন নিজ ঘরে, সামান্য ধনের তরে,
কেন দেশ দেশান্তরে, করিছ ভ্রমণ হে ॥
যিনি সর্ব্ব মূলাধার, সর্ব্বব্যাপী নিরাকার,
দেখিবে আকার তার, কেমনে সম্ভব হে।
অতএব ওরে মন, ভক্তিভাবে সর্ব্বক্ষণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, ভাবনা না রবে হে ॥
এরূপ ১০ম 'চৌপদী'তে এই পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত।

"রমণীর দুঃখ বর্ণনা" হইতে—

হোলে পতিহীনা নারী, হোলে পতিহীনা নারী,
জায়াকায়া ছায়া প্রায়, পতি বিনে প্রাণ যায়,
নয়নেতে বহে হায়, বরষার বারি ॥
তার মঙ্গল মরণ, তার মঙ্গল মরণ।
বিধবা হইলে পরে, মিছে কেন প্রাণ ধরে,
বৃথায় শরীর তার, বৃথায় জীবন ॥

মুখ ফেটে কারে বলি, মুখ ফেটে কারে বলি,
যে দুখ বিধবা সয়, কারে বলিবার নয়,
সকল সহিতে হয়, যেন অজাবলি ॥
কারে করি সম্বোধন, কারে করি সম্বোধন ?
কার প্রতি করি রোষ, কপালের যত দোষ,
কেবল চোরার ফোঁশ, বিফল রোদন ।

"মৃত্যুরূপ ক্ষুধা বর্ণনা" হইতে ।

ধিক ধিক ওরে যম, পৃথিবীর (তে ?) তোর সম,
অধম না দেখি আর হেন ।
দেখা পেলে বিধাতায়, বিশেষ সুধাব তায়,
তোর সৃষ্টি করিলেন কেন ॥
পড়িয়া ভবের ফেরে, কি আর কহিব তোরে,
দূর দূর পাপী দুরাচার ।
এত দ্রব্য দিলি দাঁতে, প্রাণের দ্বারকা নাথে,
তবু তুই করিলি আহার ॥
গুণে বশ দিগ দশ, গান করে যার যশ,
কাল তুই কাল হলি তার ।
এই দেখ সবে ক্ষুণ্ণ, হোয়ে স্বীয় শোভাশূন্য,
জগত করিছে হাহাকার ॥

"চৌপদী হইতে"—

(দ্বিতীয়ং)

এলে ধরাধাম ভেবে পরিণাম,
হরিনাম লও মুখে ।
মনের মতন, কর রে যতন,
পাইবে রতন সুখে ॥
ধন পরিবার, কিছু নহে কার,
কারে বা আমার কহ ।
না জানে আমারে, আমি বল কারে,
আপনি আপন নহ ॥

"কালের বিবরণ" হইতে—

রাজা রাজবল্লভের, হৃদি রূপ পল্লবের,
সমুদয় দুর্লভের ধন ।
সাধনেতে যেই ধন, সঞ্চারিল নৃপধন,
সেই ধন করিলি নিধন ॥
বিক্রম বিক্রমপুরে, ছিল যে বিক্রমপুরে,
সে বিক্রম কিছু নাই আর ।
বঙ্গদেশ ভঙ্গ করি, রঙ্গরস পরিহরি,
অঙ্গ শোভা হরিয়াছে তার ॥
খড়দহ মেল যারা, বেমেল হোতেছে তারা,
খড়েতে আগুন লাগিয়াছে ।
নাহি আর পূর্ব্বভাব, ক্রমে ক্রমে ভঙ্গ ভাব,
স্বভাবে অভাব ঘটিয়াছে ॥
বিক্রমেতে কুলে কুলে, বিক্রমপুরেতে কুলে,
কোরেছিল কুলের গৌরব ।

সে ফুলের নাহি রস, সে ফুলের নাহি বর্ণ,
নাহি তার মধুর সৌরভ ॥

"মনের প্রীতি উপদেশ হইতে"—

ওহে মন এ কেমন তব ব্যবহার।
দিয়ে মন তোরে মন মন মেলা ভার ॥
নিরবধি মম হৃদি পুরে তুমি রও।
একি বাদ তিল আধ মম বশ নও ॥
আমি যারে স্মরিবারে দেই সুমন্ত্রণা।
আহা আহা তুমি তাহা ভাবহ যন্ত্রণা ॥
মম মতে জ্ঞানপথে নাহি কর গতি।
ভ্রমপথে ভ্রমরথে হইয়াছ রথী ॥
সুখভ্রমে দুখে ভ্রম শ্রমে হও সারা।
মোহ বিষে বিমরিষে হলে দিশে হারা ॥
বলি হিত বিপরীত তুমি বুঝ তায়।
আমার হইয়া মন মজালে আমায় ॥
এরূপ ৫ম "প্রকরণে" এই পরিচ্ছেদের শেষ।

তত্ত্ব প্রকরণ 'মনের প্রতি উক্তি' হইতে—

* * * *

কেন তবে হও আর মোহের অধীন।
ভাব ভাব ভাব সেই চরমের দিন ॥
আসন কালের যবে হবে আগমন।
তুলসী তলায় লয়ে করাবে শয়ন ॥
গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম শুনাইবে কানে।
শুনিতে না পাবে তাহা থাকিবে অজ্ঞানে ॥
অনন্তর প্রাণ গেলে দেহ পরিহরি।
শ্মশানেতে লয়ে যাবে হরিধ্বনি করি ॥
চিতায় সাজিয়া শেষ করিবে দাহন।
ছার খার করিবেক শরীর রতন ॥
তখন কোথায় রবে দেহের যতন।
পরিধান পট্টবাস মনের মতন ॥
তখনো তো হবে নাকো পালঙ্কে শয়ন।
তখনো তো হবে নাকো সুখাদ্য ভোজন ॥
যে দেহে লাগিলে ধুলা হৈতো বড় ক্লেশ।
সেই দেহ পুড়ে তব ভস্ম হবে শেষ ॥
হাহাকার করিবেক পরিবার যত।
প্রাণের প্রেয়সী তব কান্দিবেক তত ॥
তিলেক বিচ্ছেদ যার হারাইয়া জ্ঞান।
স্বকরে বধিতে যেতে আপনার প্রাণ ॥
তখন তাহার ব্যথী তুমি নাহি হবে।
ডাকিলে চীৎকার স্বরে কথা নাহি কবে ॥
তাই বলি ওরে মন জেনো এই সার।
ভবের সৃজিত ভব সব ফক্কিকার ॥
অতএব ওরে মন বিনয় আমার।
জরা রাগ দ্বেষ মোহে কর পরিহার ॥

শুধু কৃতাঞ্জলি পুটে ভাব সেই ভাবে।
অসার সংসারে তবে মুক্তি পদ পাবে॥

গ্রন্থের স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে উপরে যাহা উদ্ধৃত করা গিয়াছে তাহাই যথেষ্ট। পাঠকগণ দেখিয়াছেন, গ্রন্থের এক স্থানে মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু-ঘটনার উল্লেখ আছে। তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১ লা আগষ্ট তারিখে লণ্ডন নগরে দেহ ত্যাগ করেন। সুতরাং এই পুথিখানি যে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে রচিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না।

ইহাতে ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, দীর্ঘভঙ্গ ত্রিপদী, পয়ার চৌপদী ও ললিত ছন্দ ভিন্ন অন্য কোন ছন্দের ব্যবহার হয় নাই। "ঈশ্বরের স্তবে" পুঁথিখানি সমাপ্ত হইয়াছে। নিম্নে উহার শেষাংশ হইতে কতকটা উদ্ধৃত হইতেছে। তাহা হইতে দেখা যাইবে, দীনেশ নামক কোন ভক্ত কবি এই সুন্দর গ্রন্থখানি বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে দান করিয়া গিয়াছেন।

* * *

সকল কালের কাল তুমি মহাকাল।
তোমার নিকটে নাই এ কাল সে কাল॥
সকল কালের পতি তুমি কালের পাল।
প্রকাশি নিজ স্নেহ দেহ শুভ কাল॥
তোমার পুণ্যাহ আজি শুভ পুণ্য দিন।
চরণ স্মরণ করি হোয়ে অতি দীন॥
অরির শরীর দিয়া হরির নিবাসে।
রাখ পদে পদে পদানত দাসে॥
আপদ বিপদ যত করিয়া সংহার।
করুন ভারত ভূমে শান্তির সঞ্চার॥
শ্রীদীন দীনেশ করে এই নিবেদন।
করিব মনের সহ ঈশ্বর স্মরণ॥
কটাক্ষ করিলে কৃপা সেই কৃপাময়।
দুরাচার শত্রু সব শবে হবে ক্ষয়॥
চরণ স্মরণ করি কাটাইতে দিন।
এবার দীনের প্রতি না হবে কৃপীণ॥
হরি হরি মম মন করি হরি সঙ্গ।
এত দূরে এই গ্রন্থ হইলেক সাঙ্গ।

"ইতি শমাপ্তঃ। এহার মালিক শ্রীরসিক চন্দ্র দাস সাকিন পরৈকোরা থানে পটিয়া (জিলা চট্টগ্রাম)।"

"প্রতিভার" পাঠক বর্গের নিকট এই গ্রন্থের মামোদ্ধারে সহায়তা প্রার্থনা করিয়া এখানে আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

আবদুল করিম।

খর্জ্জুর

(সঙ্কলিত)

ভারতে সিন্ধুপ্রদেশে ও দক্ষিণ পাঞ্জাবে, বিশেষতঃ মুলতান ও মজঃফরগড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে এবং সিন্ধু ও সাগর দোয়াবে কৃষিজাত ও স্বতঃজাত প্রচুর খর্জ্জুর বৃক্ষ দেখা যায়। দেরাগাজী খাঁর নিকটবর্ত্তী উত্তর দক্ষিণে ১০।১২ মাইল দীর্ঘ ভূভাগে অসংখ্য খর্জ্জুর বৃক্ষ আছে। পূর্ব্ব পাঞ্জাব, সাহারণপুর, গঙ্গার দোয়াব ও বুন্দেল খণ্ডে কিছু খর্জ্জুর বৃক্ষ জন্মে। দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে খর্জ্জুর বৃক্ষ জন্মে, কিন্তু বঙ্গদেশে উৎকৃষ্ট জাতীয় খর্জ্জুর তেমন হয় না।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মুসলমানেরা যখন প্রথম সিন্ধু জয় করে বোধ হয় এই বৃক্ষ সেই সময় ভারতে প্রবেশ লাভ করে। উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকার বর্ষণহীন রৌদ্রতপ্ত স্থানসমূহে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। দিবাভাগে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ ও প্রায়শঃ রাত্রিকালে তুষার সংঘাত সহ্য করিতে হইলেও ইহার উৎপাদনে ভূমিতে সরসতা আবশ্যক। আরবগণ স্পেনদেশে লইয়া যাওয়ার পর হইতে ইউরোপে ইহার কৃষি আরম্ভ হইয়াছে এবং উৎপন্ন ফল ভোজনের উপযোগী হয়। নাইসের সন্নিকটবর্ত্তী রিবীরায় (the Riviera) সেণ্ট রেমোতে (St. Remo) ও উত্তরে ৪৪½, উত্তর দিগক্ষে জেনোয়াতে (Genoa) পর্য্যন্ত খর্জ্জুর বৃক্ষ জন্মে। সেণ্ট রেমোর নিকটস্থ বর্ডিঘেরায় (Bordighera) জাত ৪০০০ খর্জ্জুর বৃক্ষের ফল রোমের "পাম সণ্ডে" (Palm Sunday) পর্ব্বের জন্ত প্রয়োজন হয়। দক্ষিণ ইটালী, সিসিলি ও গ্রীসে খর্জ্জুর বৃক্ষ দেখা যায় বটে, কিন্তু এই সকল স্থানে বৃক্ষের ফল অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও ভোজনের অনুপযোগী। ফাল্গুনের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত খর্জ্জুর বৃক্ষে মুকুল হয় ও শ্রাবণের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ফল পক হয়।

ডি ক্যান্‌ডোল তাঁহার কৃষিজাত বৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় গ্রন্থে খর্জ্জুর বৃক্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

খর্জ্জুরের আদিম জন্মস্থান

আফ্রিকায় "সেনিগ্যাল হইতে সিন্ধুনদ বিধৌত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত গ্রীষ্মপ্রধান ভূভাগে ১৫—৩০ নিরক্ষরেখার মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রাগৈতিহাসিককাল হইতে খর্জ্জুর বৃক্ষ রহিয়াছে। বিশেষ কোন কারণ বশতঃ ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হইলে এই ভূভাগের উত্তরেও স্থানে স্থানে এই গাছ পাওয়া যায়। পৃথিবীর যে অংশে খর্জ্জুর বৃক্ষে বর্ষে বর্ষে ফল হইয়া পক হয়, তাহার বহির্ভাগে আরও কতক স্থানের খর্জ্জুর বৃক্ষে উৎপন্ন ফল প্রায়ই পক হয় না, অন্ততঃ সুপক হয় না। আরও কতদূর পর্য্যন্ত খর্জ্জুর বৃক্ষ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ফল বা ফুল হয় না। কোন কোন স্থানে যে খর্জ্জুর বৃক্ষ দেশজ বৃক্ষে, বন্যাবস্থায় স্বাভাবিক ভাবে জন্মিয়া থাকে এরূপ অল্লাধিক প্রমাণ পাওয়া গেলেও ইহার উপর নির্ভর করা যায় না। খর্জ্জুর অতি সহজেই স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়। কোন নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটে বা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে আর্দ্র ভূমিতে আঠি পড়িলে উহাতেই চারা হয়। ধরণীতে মানবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে অনেক দেশে খর্জ্জুর গাছ রহিয়াছে। তদ্বৎ দেশের মরুভূমির মধ্যবর্ত্তী উর্ব্বর স্থানে হয়ত দেশবাসিগণ খর্জ্জুর বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকিবে। মনুষ্যের বাসস্থান হইতে দূরে অল্প কয়েকটি খর্জ্জুর বৃক্ষ থাকিলেই উহা যে মরুভূমিবাহী বণিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ফল হইতে উৎপন্ন নহে, ইহা জানিবার উপায় নাই। কোথায়ও প্রাচীন ইতিহাসে বা ভাষায় উল্লেখ থাকিলে অবশ্য খর্জ্জুর যে তথাকার দেশজ বৃক্ষ এই প্রমাণ দৃঢ়তর হইতে পারে। কিন্তু খর্জ্জুর-কৃষি কত প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা বিবেচনা করিলে এই প্রমাণেও কোন সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নহে।

মিশরের ও আসিরীয়ার প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ সমূহ, জনপ্রবাদ ও পুরাতন গ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করিলে

আমরা জানিতে পারি যে ইউফ্রেটিস ও নাইল নদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে প্রচুর খর্জ্জুর বৃক্ষ জন্মিত। মিশরীয় প্রাচীন স্তম্ভ সমূহে এই বৃক্ষের ফল ও প্রতিকৃতি বিদ্যমান আছে। আরও পরবর্ত্তী সময়ে খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে হিরোডোটস বাবিলনীয়ার খর্জ্জুর বনের উল্লেখ করিয়াছেন। আরও পরে ষ্ট্রাবো আরবদেশ সম্বন্ধে ঐ প্রকার ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সকল হইতে বুঝা যায় যে পূর্ব্বকালে এই বৃক্ষ আরও অধিক পরিমাণ পাওয়া যাইত ও স্বভাবজ বন্য বৃক্ষ জাতীয় ছিল। পক্ষান্তরে কার্ল রিটার বলিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনতম হিব্রু গ্রন্থাদিতে খর্জ্জুর বৃক্ষের ফল মনুষ্যের ভাল খাদ্য বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। খৃষ্টের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ও মোজেসের (Moses) ৭০০ বৎসর পরে ডেভিড তাঁহার বাগানে যে সকল বৃক্ষ রোপণ করা হইবে তন্মধ্যে খর্জ্জুরের নাম করেন নাই। জেরিকো (Jericho) ব্যতীত প্যালেষ্টাইনের (Palestine) অন্য কোথায়ও খর্জ্জুর ফল পক্ক হয় না। হিরোডোটাসও ব্যাবিলনীয় খর্জ্জুর বৃক্ষ সম্বন্ধে বলেন যে, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই ফল খাইতে সুস্বাদু বটে কিন্তু সমস্তের নহে। ইহা হইতে বোধ হয় যে ঐ সময় ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিয়া ও স্ত্রীজাতীয় বৃক্ষের শাখা মধ্যে পুংজাতীয় বৃক্ষের ফুল স্থাপন করিয়া খর্জ্জুর কৃষি আরম্ভ হইয়াছিল ; কিন্তু ইহাও বোধ হয় যে, হিরোডোটাস এই পুং স্ত্রী প্রভেদ জ্ঞাত ছিলেন না। হিরোডোটাস কর্ত্তৃক উল্লেখের সময়ের শত সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বোধ হয় মিসরদেশের পশ্চিম প্রদেশ-সমূহে খর্জ্জুর বৃক্ষ ছিল। তিনি লিবীয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। সাহারা মরুভূমির উর্ব্বর স্থান-সমূহের কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ নাই, কিন্তু প্লিনী ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে খর্জ্জুরের উল্লেখ করিয়াছেন

খর্জ্জুরের নামের সংখ্যাধিক্য ও পার্থক্য দেখিয়া বোধ হয় যে, এসিয়া ও আফ্রিকায় ইহা অতি প্রাচীন বৃক্ষ। হিব্রুগণ খর্জ্জুরকে তামার ও প্রাচীন মিসরীয়গণ বেগ বলিতেন। এই দুই নামের পরস্পর সম্পূর্ণ পার্থক্য দৃষ্টে বোধ হয়, এই দুই জাতির লোকেরা এই বৃক্ষ তত্তদ্দেশের নিজস্ব অবস্থায়ই পাইয়াছিল ও নিশ্চয়ই সেই সময়েই পশ্চিম এসিয়ায় ও মিসরে ঐ বৃক্ষের নামকরণ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। পারস্য, আরব ও বার্ব্বারি ভাষায় খর্জ্জুরের নাম-পর্য্যায় অসংখ্য। ইহাদের কতকগুলি হিব্রু নামটি হইতে উদ্ভূত, আর কতকগুলির উৎপত্তি অজ্ঞাত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ফলের বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ হয় আর,কতকগুলি একই ফলের প্রকারভেদের বোধক। ইহা হইতেও পূর্ব্বে অন্যান্য দেশে চাষ দ্বারা প্রকারভেদ সম্ভব হইয়াছিল অনুমান হয়। গ্রীক ভাষায় খর্জ্জুরের নাম ফিনিকস্। ইহাতে ফিনিসীয়া বুঝায় ও তথায় খর্জ্জুর-কৃষি ছিল প্রমাণ হয়। এই ফলের কোন পুরাতন সংস্কৃত নাম পাওয়া যায় না। এতদ্দ্বারা বোধ হয় যে, পশ্চিম ভারতের খর্জ্জুর কৃষি খুব পুরাতন নহে। খর্জ্জুরের হিন্দী নাম পারস্য নাম হইতে লওয়া হইয়াছে। এই সকল স্থানের পূর্ব্বদিকস্থ দেশসমূহে খর্জ্জুর বহুদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। চীনারা খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে পারস্য হইতে এই বৃক্ষ প্রাপ্ত হয়। তৎপর বিভিন্ন সময়ে ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইহার চাষ ত্যাগ করা হইয়াছে। ইউফেটিস হইতে অ্যাটলাস পর্ব্বতের দক্ষিণ দিক ও ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রবিকরতপ্ত ভূভাগ ব্যতীত আর কোথাও খর্জ্জুরের প্রভূত বৃদ্ধি দেখা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া ও কেপকলনীতে ইহার চাষ হইতে পারে, কিন্তু তত্রত্য ইউরোপাগত ঔপনিবেশিকগণ খর্জ্জুর ফলকে প্রধান খাদ্যশস্য করিয়া লইতে নারাজ। পরিশেষে এই বোধ হয় যে, মিসরের প্রাচীনতম নৃপতিগণের রাজত্বকালের পূর্ব্বেই ইউফেটিস হইতে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত দীর্ঘ অল্প পরিসর ভূভাগে খর্জ্জুর বৃক্ষ বন্যাবস্থায় অথবা পর্য্যটক জাতিসমূহ কর্ত্তৃক রোপিতাবস্থায় বিদ্যমান ছিল। পরে একদিকে ভারতের পশ্চিমোত্তর ও অন্যদিকে কেপ ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত খর্জ্জুরের চাষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এতৎ পূর্ব্বে কি ছিল তাহা কেবল ভূগর্ভজাত প্রাচীনতর নিদর্শন হইতে কোন দিন জানা যাইতে পারে।

খর্জ্জুরের ব্যবহার অনেক প্রকারে হয়। মিশর, পারস্য ও আরবের বহু সংখ্যক লোক প্রধানতঃ খর্জ্জুর ভক্ষণেই জীবন ধারণ করে। তাহারা চিনি দিয়া ইহা হইতে এক প্রকার আচারের মত তৈয়ারি করে, তাহা অনেক দিন থাকে। উষ্ট্রের ভোজনের জন্য আঁঠিগুলি পর্য্যন্ত জাঁতায় পিশিয়া চূর্ণ করিয়া রাখিয়া দেয়। "ফেজানে'র সমস্ত লোক ও ট্রিপলীর অর্দ্ধেক অধিবাসী খর্জ্জুর বৃক্ষজাত দ্রব্য দ্বারা তাহাদের সমস্ত অভাব পূরণ করে। দরিদ্রগণের কুটীর খর্জ্জুর পত্রে নির্ম্মিত হয়; ধনিদিগের সাধের আবাসসমূহও ঐ একই দ্রব্যে প্রস্তুত হয়; গৃহের দ্বার, থাম সমস্তই খেজুরের কাঠে প্রস্তুত হয় এবং খেজুরের গাছের গুঁড়ি ব্যবহার হয়। এই বৃক্ষের শাখা সচরাচর জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয় এবং অনেক সময়ে ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া আনা হয়। খেজুর ফল দেশবাসী দ্বিপদ ও চতুষ্পদ উভয়েরই আহার। উট, ঘোড়া, কুকুর সকলেই এই ফল খাইয়া থাকে। আঁঠিগুলি পর্য্যন্ত জলে ভিজাইয়া রাখা হয়, পরে নরম হইলে পশু ভক্ষ্য পদার্থ হইয়া যায়।

খর্জ্জুরের ব্যবহার।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে আবদুল জলিল যখন সুকনা নগরে অবরোধ করেন তখন অধিবাসিগণকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিবার জন্য তিনি ৪৩,৮০০ খর্জ্জুর বৃক্ষ ধ্বংস করেন। কিন্তু এখনও তথায় ৭৫,০০০ বৃক্ষ রহিয়াছে। এই সকল বৃক্ষে জাত ফলের পরিমাণ বেশী। এক শত ভাল খেজুর গাছে ১০০ মণ আন্দাজ খেজুর হয়। এই ফল সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া শক্ত অবস্থায় বালুকারাশিতে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয়। এইরূপ অবস্থায় দুই বৎসরও থাকিতে পারে বটে; কিন্তু সাধারণতঃ আঠার মাস পরে ফলে পোকা ধরে ও তৃতীয় বর্ষের প্রারম্ভে আঁঠিমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

রোজ আহার করিলে খেজুরে শরীরে উত্তাপ [illegible]। এই কারণ বিশেষ তৃষ্ণা জন্মাইবে বলিয়া পথযাত্রায় খেজুর ভক্ষণ করা হয় না। যবের সহিত মিশাইয়া পিষ্টকের ন্যায় করিয়া ইহা খাইলে অত্যন্ত উপকারী ও খাইতেও সুস্বাদু হয়। বৃক্ষের অগ্রভাগে শাখার মূল দেশে খুঁড়িলে যে রস বাহির হয়, উহা শরীর শীতল করে ও বিরেচক গুণবিশিষ্ট। কয়েক ঘণ্টা পরে ঐ রস পচিতে আরম্ভ করে ও খাইতে বিস্বাদ হয় ও মত্ততা জন্মায়। পক্ক ফল হইতে এক প্রকার ঘন রস প্রস্তুত হয়। ইহা চামড়ার ব্যাগ ও পাইপের উপরে লাগাইলে ঐ সকল দ্রব্য শক্ত হয়। পঞ্জাব প্রদেশে কোন কোন স্থানে খেজুর খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে অত্যাবশ্যক বলিয়া পরিগণিত। গুণ ও প্রস্তুত প্রণালীর বিভিন্নতা অনুসারে ইহা বাজারে ভিন্ন ভিন্ন নামে বিক্রীত হয়। কোলড্ ষ্ট্রীম সাহেবের মতে অতি উচু দরের খেজুর মজঃফরগড় জিলায় চির্ণী নামে পরিচিত। সর্ব্বোত্তম খর্জ্জুর বৃক্ষের ফল মধ্যস্থলে দুই ভাগে চিরিয়া সূর্য্য কিরণে শুষ্ক করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। এই খেজুরের নিম্নশ্রেণীর খেজুর পিণ্ড নামে পরিচিত; কোন বিশেষ প্রস্তুত প্রণালী নাই; যেমন গাছ হইতে পাওয়া যায় তেমনই খাওয়া হয়। বগ্‌রী নামে পরিচিত খেজুরের আদর অতি অল্প। এইগুলি খারাপ জাতীয় গাছের ফল ও তেল ও জল সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করা হয়। আরব ও মিসর দেশজাত ফল হইতে অপকৃষ্ট হইলেও পঞ্জাব প্রদেশ জাত খর্জ্জুর অতি উপাদেয় বস্তু, বিশেষতঃ যদি শেষের দিকে বৃষ্টিপতন না হয়। যখন ফলগুলি পাকিতে আরম্ভ করে, তখন পাছে পাখীতে খাইয়া ফেলে এই ভয়ে খর্জ্জুর গুচ্ছের উপরে একখানি চাটাই দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। আঁঠিগুলিতে ঔষধের কায হয় বলিয়া লোকে বিবেচনা করে। খেজুর গাছের শাখা-পত্রের অন্তরাল হইতে কাটিয়া লইয়া খেজুরের "মাথি" অনেকে খাইয়া থাকে। খেজুর গাছে 'হুকম্ চিন' নামে এক প্রকার আঠা পাওয়া যায়। মুলতানের খেজুর গাছ কাটিয়াও সুমিষ্ট রস পাওয়া যায় নাই। পুরুষ জাতীয় বৃক্ষে অথবা যে সকল বৃক্ষে আর ফল হইবে না উহাদের কাষ্ঠে গৃহ, পয়ঃ প্রণালী, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়।

ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী ও অন্যান্য দেশে খর্জ্জুর নির্ম্মিত চাটাই ও পেটিকা ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে ইহার পত্রে চাটাই ও পাখা তৈয়ারি হয়। পত্রহীন শাখাগুলিতে বেশ পাতলা ছড়ি প্রস্তুত হয়, অথবা এইগুলি চিরিয়া দুই ভাগ করিয়া ঝুড়ি তৈয়ারি হয়। শাখাগুলি যে স্থান হইতে উঠে সেখানে কাবাল বা খাজুর বা ব্রোকলা নামে জালের ন্যায় অংশবিশেষে বলীবর্দ্দের পৃষ্ঠে ব্যবহার জন্য জিন অথবা তন্তুগুলি পৃথক করিয়া লইয়া দড়ি প্রস্তুত হয়।

বৃক্ষের শীর্ষদেশে কাটিয়া একটি গর্ত্ত করিলে রস উর্দ্ধে উঠিবার সময় ঐ স্থানে জমা হয়। ১০। ১৫ দিন পর্য্যন্ত বেশী পরিমাণে রস পাওয়া যায়। পরে পরিমাণে কম হইয়াও ১॥০ মাস ২ মাস পর্য্যন্ত থাকে। রস প্রথমাবস্থায় সুমিষ্ট থাকে, শীতল পানীয়রূপে ব্যবহার করা যায়; কিন্তু শীঘ্রই গাজলা হইয়া যায় ও তাহা হইতে এক প্রকার মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়।

খেজুর এত প্রকারে ব্যবহৃত হয়, ইহা ভাবিয়া দেখিলে কোন বিস্ময়ের কারণ নাই যে, আরবের ন্যায় কৃষিহীন উত্তপ্ত ভূভাগে গ্রন্থকারেরা ইহার বিষয়ে এত কথা বলিয়াছে। এই ভাষার খর্জ্জুর বাচক ৩০০ শত শব্দ আছে ইহাদের অনেকগুলি বৃক্ষের অংশবিশেষের নাম, আর কতকগুলি আ।।র ভিন্ন ভিন্ন বয়সে সেই নামে পরিচিত। মুসলমানগণ এই ফল লইয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, যে দেশে ইসলাম ধর্ম্ম নাই সে দেশে খর্জ্জুর বৃক্ষ ভাল বাড়িবে না। খর্জ্জুর বৃক্ষের অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে। সকল গুলি দেখিতে একই প্রকার বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ফল ধরে। এক বোগদাদেই ৪০।৫০ রকমের খেজুর গাছ আছে যাহাদের নাম জানা যায়। ইহাদের কতকগুলির নাম অতি মনোহর যথা রমণীর অঙ্গুলি, লাবণ্যময়ী ললনার নয়ন ইত্যাদি। বসরা বিভাগে এই বৃক্ষের সংখ্যা ও প্রকার ভেদ আরও বেশী। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস্ নদীর সঙ্গমস্থল হইতে মোহানা পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে লাখে লাখে খেজুর গাছ আছে। উহাদের প্রত্যেক গাছ হইতে বৎসরে ৩।৪ টাকা লাভ হয়।

ভারতবর্ষ হইতে যত টাকার খেজুর বৎসরে রপ্তানি হয় তাহা হইতে অনেক বেশী টাকার খেজুর আমদানী হয়। অধিকাংশ আসিরিক তুরুক, আরব ও পারস্য হইতে আসে ও বোম্বাই ও সিন্ধুপ্রদেশে গৃহীত হয়।

খেজুরে ফোড়া বা বোগ্‌দাদী ফোড়া নামে এক প্রকার রোগ অনেকের মতে খেজুর ফল খাওয়ার ফলে প্রসূত। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ক্ষুদ্র ব্রণরূপে আবির্ভূত হইয়া কয়েক মাস বাড়িতে থাকে; পরে ফুলিয়া উঠে ও গরম হইয়া খোলা ঘায়ের মত কয়েক মাস থাকিয়া ধীরে ধীরে শুষ্ক হয়। এই বিস্ফোটকগুলি যেরূপ ভীষণাকার ধারণ করে, তাহার তুলনায় অত্যন্ত কম যন্ত্রণা দেয়, তবে গ্রন্থিস্থলে বা আঘাত লাগিতে পারে এরূপ স্থানে হইলে স্বতন্ত্র কথা। বালকেরাই ইহা হইতে খুব বেশী ভোগে ও প্রায়ই তাহাদের মুখমণ্ডলে এইগুলির আবির্ভাব হয়। বোগ্‌দাদে ইউরোপীয় বা স্থানীয় এমন লোক পাওয়া কঠিন যাহার এইরূপ ফোড়া হয় নাই। কখনও কখনও রোগ কঠিন হইলে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি নাশ বা নাসিকা বা ওষ্ঠ ভাগের একটু অংশ-হানিও করিয়া ফেলে। এইগুলিকে খেজুরে দাগ কেন বলে বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। কোন ব্যাখ্যাই সন্তোষজনক হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, খেজুর খাইলে এই রোগ হয়। কেহ বলেন যে, যে দেশে খেজুর গাছ জন্মে সেই দেশের অধিবাসীদের এই রোগ হয়। কিন্তু এই মতও খাটে না, কারণ বসরাতে খেজুর বোগদাদ হইতে অনেক বেশী পরিমাণে জন্মে কিন্তু তথায় এই পীড়ার উৎপাত নাই। আর এক দলের মত এই যে, যখন খেজুর পাকিতে আরম্ভ করে তখন হয় বলিয়া ইহাদিগকে খেজুরে দাগ কহে। আরও এক মত এই যে, ফোড়া শুষ্ক হইলে যে চিহ্ন থাকে উহার আকৃতি অনুসারে এই ব্রণগুলিকে খেজুরে দাগ বা ফোড়া বলে। বাস্তবিকও এই চিহ্নগুলি দেখিতে কতকটা খেজুর ফলের মত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, খেজুরের সঙ্গে এই রোগের কোন সম্পর্ক নাই, মশক

দংশনেই এই ফোড়া হইয়া উঠে। বোধ হয় এই মতই ঠিক। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রাইট ক্ষুদ্র এক প্রকার কীটাণু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মশকের দংশনে ইহা মানবদেহে স্থানান্তরিত হয়। এই পরদেহপুষ্ট কীট হইতে প্রথমে অধিকৃত স্থান উত্তপ্ত পরে স্ফীত হয়, পরে স্ফোটকে পরিণত হয়।

খর্জ্জুরের চাষ

যে সমস্ত দেশে সাধারণতঃ খর্জ্জুরের চাষ দেখা যায় সে সমস্ত দেশে আর্দ্রভাব ও বৃষ্টিপতন অপেক্ষাকৃত কম এবং ইহা যত কম হইবে খর্জ্জুরের উৎকর্ষ ততই অধিক হইবে। অত্যধিক আর্দ্রভাব বোধ হয় সূর্য্য তাপের সমতা ঘটায়,পরন্তু ফুল হইবার সময় বৃষ্টি হইলে পরাগের ধ্বংস করে ও পাকিবার সময়ে হইলে ফলের অভ্যন্তরে গাজলা জন্মায়। খর্জ্জুর-কৃষি-প্রধান ভূভাগে ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ফুল হইবার কাল ও আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ফল পাকিবার সময়।

মোটের উপর ফুল ও ফল হইবার সময়ে বারিপতন পরিমাণে ৫ ইঞ্চির অধিক হওয়া উচিত নহে। ইহার উপর, খর্জ্জুরের চাষ করিতে হইলে জলসেচন একান্ত আবশ্যক। সাধারণ অবস্থায় ফারেণ হাইটের ২০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত বায়ুর উত্তাপ থাকিলেই গাছ বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু ফুল-ফল ধারণ করিতে হইলে ৬৪ ডিগ্রি অপেক্ষা অধিক উত্তাপ আবশ্যক। যে গাছগুলিতে শীঘ্র শীঘ্র ফল হয় তাহাদের ফলিবার সময় সাধারণতঃ ৭০ ডিগ্রি উত্তাপ থাকিলেই ফল পাকিবে, কিন্তু অন্ততঃ একমাস কাল ৮০ ডিগ্রি থাকা চাই। ইহা অপেক্ষা পরে যাহাদের ফল হয়, তাহাদের পক্ষে সাধারণতঃ ৭৫ ডিগ্রি ও মাসেক কাল ৪৫ ডিগ্রি থাকা দরকার। অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃক্ষের ফলিবার সময় সকলের পরে। এই সময় সাধারণতঃ ৮৪ ডিগ্রি ও মাসখানেক ৯৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ দরকার। গাছগুলি ঠিক সূর্য্যকিরণে থাকা দরকার। শিশু অবস্থায়ও ছায়ায় থাকিলে গাছ বাড়িবে না।

বালুকাময়, নরম বা কঠিন ইত্যাদি ভূমির প্রকার-ভেদে কিছু আসে যায় না; তবে, নরম জমিতে ফুলদল অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বেই বাড়িয়া উঠে। মোটের উপর বালুকাময় নরম স্থানেই খর্জ্জুরের চাষ খুব ভাল হয়। ভূমিতে ক্ষারের পরিমাণ বেশী কি কম থাকুক, তাহাতে খর্জ্জুর বৃক্ষের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আলজিরীয়া প্রদেশের খর্জ্জুরচাষাধিকৃত স্থানের জমি পরীক্ষা করিয়া যুক্তরাজ্যের কৃষিবিভাগ তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ক্ষারের পরিমাণ ওজনে শতকরা ৩।৪ ভাগ এরূপ জমিতে খর্জ্জুর বৃক্ষ যদিও জন্মে বাড়ে বটে, তথাপি শতকরা ১ ভাগেরও কম ক্ষারের পরিমাণ আছে এরূপ ভূমিস্তরে মূল যাইয়া না পৌঁছিলে বৃক্ষে ফল হয় না. আর নিয়মিত-রূপে ও প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মাইতে হইলে ভূমির স্তরে ক্ষারের পরিমাণ ওজনে শতকরা ½ ভাগেরও কম হওয়া আবশ্যক।

বীজ ও চারা রোপণ এই দুই প্রকারে খর্জ্জুরের বংশ-বিস্তার হয়। ফ্লেচার সাহেব চারা জন্মান সম্বন্ধে বলিয়া-ছেন, "সাধারণ সার ও খইল সহযোগে ক্ষারহীন ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক জমি প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হইবে। রেঁড়ি বা সরিষার খইল এজন্য খুব উপযোগী, কারণ ইহারা উইয়ের আক্রমণ রহিত করে।

বীজ বপনের জমি অনুগ্র ও ক্ষারহীন হওয়া নিতান্ত দরকার, কারণ যদিও বৃক্ষের শিশু বা বর্দ্ধিত অবস্থায় জমিতে ক্ষার অধিক থাকিলেও গাছের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু অল্প পরিমাণে ক্ষার থাকিলেও সদ্যোবিনির্ম্মুক্ত চারাগুলি মরিয়া যাইবে, এমন কি একেবারেই চারা নাও হইতে পারে।

এইরূপে জমি প্রস্তুত হইলে সেই জমিতে ফাল্গুন চৈত্র মাসে জল সেচন করিয়া দুই তিন দিন পরে বীজ বপন করিতে হইবে। পরস্পর দুই হাত ব্যবধান রাখিয়া সারিগুলির মধ্যেও পরস্পর দুই হাত ব্যবধান রাখিয়া সারি সারি করিয়া ২।১ ইঞ্চি মাটির নীচে বীজগুলি বপন করিতে হইবে। ইহার পরে

প্রথম ৩।৪ মাস একদিন অন্তর জমিতে জলসেচন করিতে হইবে। তৎপরে আরও ৩।৪ মাস সপ্তাহে এক বার করিয়া জলসেচন করা দরকার। আরও পরে বৃক্ষগুলিকেও গ্রীষ্মকালে মাসে এক বার ও শীতকালে দুই মাসে এক বার জলসিঞ্চন করিতে হইবে। তিন বৎসরের হইলে চারাগুলিকে বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস মধ্যে স্থানান্তরিত করা যায়। কিন্তু ফুল ধরা পর্য্যন্ত যেখানে বীজ বপন করা হইয়াছে সেই স্থানে রাখিয়া দিলেই বরং ভাল। ভূমি ভাল হইলে ৬ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যেই ইহা হইবে। স্থান একটু গ্রীষ্মপ্রধান হইলে ৬ বৎসরই যথেষ্ট। ফুল হইলেই বৃক্ষগুলির মধ্যে স্ত্রী পুরুষ প্রভেদ ঠিক করিয়া ধরা যায়। অতঃপর পুরুষজাতীয় বৃক্ষ অনাবশ্যক বলিয়া দূর করিয়া ফেলা যায়। গাছ স্থানান্তরিত করিবার সময় শাখাগুলি বৃক্ষ দেহ হইতে ১॥০ হাত দূরে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু এ কথারূপে বিশেষ স্মরণ রাখা দরকার যে, যদিও বৃক্ষ বড় হইলে জলসেচন দীর্ঘকাল পরে পরে দরকার, অথবা ভূমির নিম্নদেশ অন্তর্জলপ্রবাহে আর্দ্র রহিলে একেবারেই জলসেচন দরকার হয় না, তথাপি প্রচুর পরিমাণে জল না থাকিলে বীজ অঙ্কুরিত হইবে না বা অঙ্কুরিত চারাগুলি বাঁচিবে না।

চাষের কালে একটি পুরুষ জাতীয় খেজুর গাছ এক শত স্ত্রীজাতীয় খেজুর গাছের উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিতে পারে। অতএব বীজ বপন অপেক্ষা চারা রোপণ করিয়াই খেজুরের চাষ ভাল হইবে। কারণ বীজোদ্ভব অঙ্কুর অনাবশ্যক পরিমাণে পুরুষ বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। ৬ হইতে ১৬ বৎসরের গাছের গোড়ায় সেই গাছের মূল হইতে এইরূপ আরও গাছ আবির্ভূত হয়। স্ত্রীপুরুষ জাতীয় বৃক্ষের মূলে জাত বৃক্ষ তত্তদ্ জাতীয় হয় ও এই সকল বৃক্ষজাত ফলও মূলবৃক্ষের ফলের মতই হয়। ৩ হইতে ৬ বৎসরের মধ্যে সোজাসুজি কুঠার দ্বারা মূল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া যায়। বড় বড় শাখাগুলি কাটিয়া ফেলিলে কেবল ছোট শাখাগুলি ও নরম মাথাটি শিকড়বিহীন বৃক্ষকাণ্ডের উপরে থাকে। তখন এই গাছগুলি ১৬ হাত দূরে দূরে সারি সারি করিয়া স্থানান্তরে নিয়া রোপণ করা হয়। বৈশাখ হইতে আশ্বিন এই কয় মাসই ভারতবর্ষে এইরূপ স্থানান্তরিত করিবার প্রশস্ত সময়। দুই হাত প্রস্থে ও দুই হাত গভীর গোল করিয়া এক একটি গর্ত্ত খনন করিয়া উহার মধ্যভাগে বৃক্ষটি স্থাপন করিতে হইবে। গর্ত্ত করিবার সময় যে মাটি পাওয়া যাইবে উহার সহিত উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ সাধারণ সার ও ২কি২॥ সের খইল মিশাইয়া গর্ত্ত বুজাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে বৃক্ষ রোপণ করিবার সময় মনে রাখা দরকার যে, নরম শাখা-গুচ্ছ ও অন্তরালস্থিত কলির ন্যায় বৃক্ষের তরুণ অগ্রভাগটি যেন মাটির নীচে পড়িয়া বন্ধ হইয়া না যায়। এজন্য পুতিবার সময় দেখিতে হইবে যে, এই অগ্রভাগ যেন মাটির ২।৩ ইঞ্চি উপরেই থাকে। উহার চতুর্দ্দিকে জল সেচনের জন্য অর্দ্ধ হস্ত প্রস্থে গোল করিয়া একটি নালা কাটিয়া দেওয়া উচিত। প্রথম মাসে রোজ একবার, দ্বিতীয় মাসে সপ্তাহে দুই দিন, তৎপরে অন্ততঃ বৎসর খানেক পর্য্যন্ত মাসে একবার করিয়া জল সেচন দরকার। কত পরিমাণে জল দরকার সে সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম করিয়া দেওয়া যায় না। ইহা স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে। বৎসরের কোন সময় বেশী আর কোন সময় বা কম জল দরকার হয়। তবে সাধারণতঃ ফুল ধরিবার সময়ে মাঘ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত জল অতি অল্প অথবা একেবারেই না দেওয়া উচিত। বৈশাখের শেষ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ফল পক্ক হওয়া পর্য্যন্ত প্রচুর জল দেওয়া দরকার। কোন সময়ে ফুল ধরিবে, তাহা ভূমি, জলবায়ু ও গাছে কত জল সেচন করা হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ বলা যায়, বীজ হইতে লব্ধ চারা গাছে ৮ বৎসরে, আর বৃক্ষ-মূলবদ্ধ চারা হইতে জাত গাছে মূল বৃক্ষ হইতে ছাড়াইয়া লইবার ৪।৫ বৎসর পরেই যথেষ্ট পরিমাণে ফল পাওয়া যায়। পুরুষ জাতীয় বৃক্ষে ফুল হইলে 'চুমড়িটি' কাটিবার পূর্ব্বে বা ঠিক পরেই

কাটিয়া লওয়া যায়। ইহার একটিতে শতাধিক প্রশাখা থাকে। ইহাদের একটি কিম্বা দুইটিতে যত পরাগ থাকে তদ্দারা একটি স্ত্রী বৃক্ষের সমস্ত ফুলগুলিকে উৎপাদিকা গুণ প্রদান করিতে পারে। স্ত্রী-বৃক্ষের ফুলের চুমড়ি ফাটিয়া যখন স্থানে স্থানে ফুলগুলি দেখা যায়, এই সকল স্থানে পুরুষ গাছের ফুলের দুই একটি প্রশাখা তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া একটু দড়ি বা খেজুর পাতা দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। আরবদেশে নিয়মিত রূপে এরূপ করে, কিন্তু সিন্ধুদেশে এরূপ করা হয় না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি বৃক্ষ হইতে কতকগুলি ফলের ছড়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। উহাতে অবশিষ্ট ফলগুলির পোষক পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল। এক এক ফুল হইতে ৫ হইতে ২০ সের পাকা খেজুর পাওয়া যায়। একটি বৃক্ষ হইতে ১৫ সের হইতে ৬ মণ অন্ততঃ গড়ে ১৷৹ মণ খেজুর পাওয়া যায়। এক ছড়াস্থিত সমস্ত খেজুর এক সঙ্গে পাকে না। তথাপি ছড়ার অর্দ্ধেক ফল পাকিলেই সমস্তটা কাটিয়া লইয়া সমস্ত ফলগুলি না পাকা পর্য্যন্ত কোন উষ্ণ অথচ ছায়াবিশিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতীয় খেজুর যেমন পাকিতে থাকে একটি একটি করিয়া ফলগুলি সংগ্রহ করা হয়।

খর্জ্জুরের প্রকারভেদ সংখ্যায় সহস্র সহস্র হইবে। ফ্লেচার সাহেবের মতে ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

১ম শ্রেণী—নরম খেজুর। ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে বিক্রী হয়। ইহাতে চিনির অংশ এত বেশী (শত করা ৬০ ভাগ) যে ইহা সহজেই খাইতে মিষ্ট হয় ও নষ্ট হয় না। কোন কোন সময়ে চালান দিবার পূর্ব্বে রস কতকটা বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিস, মিসর, আরব, মেসোপটামিয়া, পারস্য, বেলুচিস্থানে এই শ্রেণীর ফল জন্মে।

২য় শ্রেণী—মাঝারি শ্রেণীর খেজুর। এইগুলিও নরম বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ চিনির অংশ যত থাকে তাহাতে বেশী দিন না পচিয়া থাকে না। এইগুলি শীঘ্র শুষ্ক হয় না, সুতরাং গাছ হইতে যেমন সংগ্রহ করা হয় তেমনই খাওয়া হয়। মিসর, আরব, মেসোপটামিয়া দেশে এই শ্রেণীর ফল হয়।

৩য় শ্রেণী—শুষ্ক খর্জ্জুর। কঠিন ও পক্কাবস্থায়ও এগুলির রস হাতে জড়াইয়া যায় না এবং গাছেই শুকাইতে দেওয়া যাইতে পারে। এগুলি 'রাখি' করিতে কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার দরকার হয় না। যদিও পূর্ব্ব দুই শ্রেণীর মত মিষ্ট নহে, তথাপি স্থানীয় ব্যবহারের জন্য এগুলির আদর আছে। এগুলি মিসর ও মেসোপটামিয়া দেশে জন্মে।

কবির প্রতি

আরও প্রেমের সুরে কেন বাঁধ বীণা?
থাম, কবি, থাম!
তোমার সে কুঞ্জবনে লেগেছে আগুন,
তাও কি না জান?
তখন গাহিতে গান, সে যে ছিল এক
গাহিবার দিন,
তব বাতায়ন পাশে কুহরিত পিক
বসি' শঙ্কাহীন!
তোমার সৌধের তলে পড়িত তারার
লক্ষ বিম্ব আসি,
দিঘীর সোপান ঘাটে জোছনায় বসি
বাজাইতে বাঁশী।
উদ্যানের পাশ দিয়া আসিত সে ঘাটে
জনপদ-বধূ,
অভিনব গন্ধ পেয়ে উড়িত ভ্রমর
ত্যজি ফুল-মধু!
অস্ত গগনের কোলে দিবসের শেষে
ডুবিলে তপন
তোমার ঘরের বুকে স্নেহের প্রদীপ
জ্বলিত তখন।

তোমার যতনে রোপা তুলসীর তলে
ধূপ দীপ জ্বালি
দুইটি কঙ্কন পরা রাঙ্গাবাহু নিতি
সাজাইত ডালি।
হায়, সে সৌধ যে আজ বজ্রের আঘাতে
পড়িয়াছে ভাঙ্গি,
ফুল রাঙ্গা সে উদ্যান আগুনের জিভে
উঠিয়াছে রাঙ্গি!'
ভূমিকম্পে নেমে গেছে নীল সরসীর
মর্ম্মর সোপান;
তবে কেন বাঁধ সুর? কোথা বসে আর
গাহিবে সে গান?
ওগো, যদি গে'তে চাও, ছিঁড়ে ফেল তবে
প্রেমের সে তার!
সেই সুরে বাঁধ বীণা কর্ম্মের স্নায়ুতে
দিবে যা ঝঙ্কার।
আজি যে গাহিতে হ'বে চলিয়া চলিয়া,
ওরে গৃহহারা—
সেই সুর বাঁধ যায় সর্ব্বাঙ্গে বহিবে
শকতির ধারা!
সেই সুর বাঁধ আজি, হে মুগ্ধ পথিক,
যাহার শ্রবণে
চেতনা উঠিবে জাগি' দেহে দেহে আর
ভবনে ভবনে।
তুমি যে বাজাবে বীণা চলিতে চলিতে,
শিখ সে কৌশল;
আমরা ছুটিব পাছে শুনিতে শুনিতে,
জাগাও সে বল।
ঠাঁই নাই! ঠাঁই নাই! বসিবে কোথায়?
কাল নাই, দাঁড়াবে কখন?
হে কবি, কর্ম্মের ভেরী বাজাও এবার—
ভেঙ্গে দাও প্রেমের স্বপন!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা।

[গৃহস্থ আজকাল শ্রেষ্ঠ মাসিকের আসন পাইয়াছে। প্রবন্ধ-গৌরবে গৃহস্থ অদ্বিতীয়। প্রতিভান্বিত সাহিত্যিকগণের পরিচালনাধীনে "গৃহস্থ" মাসিক সাহিত্যে এক নূতন বিশেষত্ব আনয়ন করিয়াছে। গৃহস্থের "আলোচনা" ভাগ পাঠ করিলে পাঠক মাত্রেই উপকৃত হইবেন। গৃহস্থ হইতে নিম্নোক্ত প্রবন্ধটি সঙ্কলিত হইল।]

মহাকবি অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ

(প্রথমাংশ)

নিম্নে যে সৌন্দরনন্দ নামক কাব্যের কথাভাগ নাতিসংক্ষিপ্ত ও নাতিবিস্তীর্ণ ভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহার রচয়িতার নাম অশ্বঘোষ। আলোচ্য কাব্যের সর্ব্বান্তিম অষ্টাদশ সর্গের শেষে কাব্যরীতি অনুসারে গ্রন্থ ও সর্গের নমোল্লেখের পর প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রণালী সম্বন্ধে দুইটি শ্লোক আছে, এবং তাহার পর ভণিতায় উক্ত হইয়াছে যে, "হা মহাবলী মহাকবি আর্য্য সুবর্ণাক্ষী পুত্র সাকেতক ভিক্ষু আচার্য্য ভদন্ত অশ্বঘোষের কৃত। দুইখানি হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের উভয়েরই মধ্যে এই উক্তি আছে। এই ভণিতা মূল গ্রন্থকারের হইতেও পারে, নাও পারে। অশ্বঘোষই যে এই কাব্যের রচয়িতা তৎসম্বন্ধে ঐ ভণিতাই একমাত্র বহিঃপ্রমাণ।

সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধচরিত কাব্যের রচয়িতা বলিয়া অশ্বঘোষ সকলেরই নিকট সুপরিচিত। প্রশ্ন হয় বুদ্ধচরিতকার ও সৌন্দরনন্দ-কার একই অশ্বঘোষ কিনা? জাপানী পণ্ডিত বুনিয়ো নান্‌জিয়ো (Bunyio Nunjio) সঙ্কলিত চীন ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধ ত্রিপিটক গ্রন্থমালার তালিকায় (P. 369) অশ্বঘোষ কৃত ছয়খানি * গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। সৌন্দরনন্দ তাহাদের মধ্যে নহে, ঐ সুবৃহৎ তালিকায় ইহার নামই নাই। আর একজন জাপান

* B. Nunjio সেখানে সাতখানির কথা বলিয়া আরও ছয় খানির নাম দিয়াছেন। মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র নামক গ্রন্থখানিকে তিনি দুইবার ধরিয়া সপ্ত সংখ্যা ঠিক করিয়াছেন।

পণ্ডিত সুজুকি অশ্বঘোষের নামে আটখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, † কিন্তু সৌন্দরনন্দের নাম এখানেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু তাহা হইলেও, পূর্ব্বোল্লিখিত ভণিতার প্রামাণ্য কে অস্বীকার করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ নাই। সেখানে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, আলোচ্য কাব্যের রচয়িতা অশ্বঘোষ, এবং কতকগুলি আভ্যন্তরিক প্রমাণে জানিতে পারা যায় যে, বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ একই অশ্বঘোষের লেখনী হইতে বহির্গত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, * সৌন্দরনন্দের শেষে পূর্ব্বোদ্ধৃত যে ভণিতা আছে, অশ্বঘোষরচিত বুদ্ধ চরিতের তিব্বতীয় অনুবাদেও ঠিক সেই ভণিতাই প্রদত্ত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থকারের অভেদ সম্বন্ধে ইহা একটি বলবৎ প্রমাণ বলিতে হইবে দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে পৌরাণিক ঘটনার বহুলভাবে উল্লেখ উভয় গ্রন্থেই প্রচুর ও একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কতকগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে :—

বুদ্ধচরিত

১

পুরাহি কাশিসুন্দর্য্যা বেশবধ্বা মহামুনিঃ।
তাড়িতোঽভূৎ পদথাস্তাদ্ দুর্দ্ধর্ষো দৈবতৈরপি ॥৪-১৬

২

ঋষ্যশৃঙ্গং মুনিসুতং তথৈব স্ত্রীষপণ্ডিতম্।
উপায়ৈর্বিবিধৈঃ শান্তা জগ্রাহ চ জহার চ ॥৪-১৯

৩

বিশ্বামিত্রো মহর্ষিশ্চ বিগাঢ়োঽপি মহত্তপঃ।
দশ বর্ষাণ্যরণ্যস্থো ঘৃতাচ্যাপ্সরসা হৃতঃ ॥৪-১৯

৪

কালীংচৈব পুরা কন্যাং জলপ্রভবসম্ভবাম্।
জগাম যমুনাতীরে জাতরাগঃ পরাশরঃ ॥ ৪-৭৬

৫

মাতঙ্গ্যামক্ষমালায়াং গর্হিতায়াঃ রিরংসয়া।
কপিঞ্জলাদং তনয়ং বশিষ্ঠোঽজনয়ন্ মুনিম্ ॥ ৪-৭৭

৬

স্ত্রীসংসর্গং বিনাশান্তং পাণ্ডুর্জ্ঞাত্বাপি কৌরব।
মাদ্রীরূপগুণাক্ষিপ্তঃ সিষেবে কামজং সুখম্ ॥ ৪-৭৯

৭

শক্রস্ত চার্দ্ধাসনমপ্যবাপ্য
মান্ধাতুরাসীদ্বিষয়েষ্বতৃপ্তিঃ ॥ ১১-১৩

৮

ভুক্ত্বাপি রাজ্যং দিবি দেবতানাং
শতক্রতৌ বৃত্র ভয়াৎ প্রণষ্টে।
দর্পান্ মহর্ষীনপি বাহয়িত্বা
কামেষ্বতৃপ্তো নহুষঃ পপাত ॥ ১১-১৪

সৌন্দরনন্দ

১

দ্বৈপায়নো ধর্ম্মপরায়ণশ্চ রেমে সমং কাশিষু বেশবধ্বা।
যযা হতোঽভূচ্চলনূপুরেণ পাদেন বিদ্যুল্লতয়েব মেঘঃ ॥ ৭-৩০

২

নিশাম্য শান্তাং নরদেব কন্যাং
বনেঽপি শান্তেঽপিচ বর্ত্তমানঃ।
চচাল ধৈর্য্যান মুনি ঋষ্যশৃঙ্গঃ
শৈলো মহীকম্প ইবোচ্চশৃঙ্গঃ ॥ ৭-৩৪

* সৌন্দরনন্দ (B. S. B.) Preface, page iii. শাস্ত্রী মহাশয় এখানে লিখিয়াছেন—

"Buddhacharita touches only on the conversion of Nanda, but it is expanded into a whole poem in Soundar-aNanda" কিন্তু বুদ্ধ চরিতে নন্দের নামও নাই।

† The Awakening of Faith, P P. 36-38.

* সৌন্দরনন্দের উল্লিখিত প্রথম শ্লোকটীর শেষ চরণে ("তাং যে তপোবনমপাস্য গৃহাণ্যতীয়ুঃ") "গৃহাণ্যতীয়ুঃ" পাঠ ঠিক হইতে পারে না, কেন না তাহাতে বিবক্ষিত অর্থ প্রকাশিত হয় না। কবি এখানে বলিতে চাহিতেছেন 'গৃহে গমন করিয়াছিলেন', কিন্তু "অতীয়ুঃ" শব্দে তাহা বুঝা যায় না, ইহার অর্থ 'অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন', অতএব লিপিকর, মুদ্রাকর বা সংস্কারকের দোষে যে, পাঠবিপর্য্যয় হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের এ ভ্রম সম্ভব নহে। তিনি বুদ্ধচরিতে লিখিয়াছেন (উল্লিখিত ৪র্থ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ দ্রষ্টব্য)—"বনানি হিত্বা ভবনান্যতীয়ুঃ।" উভয় কাব্যেই একই কথা। অতএব বুদ্ধচরিত অনুসারে সৌন্দর-

৩

ব্রহ্মবিভাবার্থমপাস্য রাজং
ভেজে বনং যো বিষয়েষনাস্থঃ।
স গাধিজশ্চাপহৃতো ঘৃতাচ্যা
সমা দশৈকং দিবসং বিবেদ ॥ ৭-৩৫

৪

পরাশরঃ শাপশরস্তথর্ষি
কালীং সিষেবে ঝষগর্ভযোনিং ॥ ৭-২৯

৫

ভেজে শ্বপাকীং মুনিরক্ষমালাং
কামাদ বশিষ্ঠশ্চ স সদ্বরিষ্টঃ।
যস্যাং বিবস্বানিব ভূজলাদঃ
সুতঃ প্রসূতোহস্য কপিঞ্জলাদঃ ॥ ৭-২৮

৬

শপ্তশ্চ পাণ্ডুর্মদনেন নূনং
স্ত্রীসঙ্গমে মৃত্যুমবাপ্স্যসীতি।
জগাম মাদ্রীং ন মহর্ষিশাপাদ্
অসেব্যসেবদ্ বিমমর্ষ (র্শ) মৃত্যুম্ ॥ ৭-৪

৭

শক্রস্যার্দ্ধাসনং গত্বা পূর্ব্ব পার্থিব এষ যঃ।
স দেবত্বং গতঃ কালে মান্ধাতরিঃ পুনর্যযৌ ॥১১-৪৩

৮

রাজ্যং কৃত্বাপি দেবানাং পপাত নহুষোভুবি।
প্রাপ্তঃ কিল ভুজঙ্গত্বং নাদ্যাপি পরিমুচ্যতে ॥ ১১-৪৪
শাস্বাধিপো হি সমুতোঽপি তথাম্বরীষো
রামোন্ধ (?) এব সচ সাঙ্কৃতিরন্তিদেবঃ।
চীরাণ্যপাস্য দধিরে পুনরংশুকানি
ছিত্ত্বা জটাশ্চ কুটিলা মুকুটানি বভ্রতঃ ॥ ৭.৫০-৫১

লিট-লকার প্রয়োগে উভয় কাব্যেই কবির বিশেষ প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায়; উভয় কাব্যেই প্রচুর ভাবে কবি ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। পাঠকগণ ইহা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন, কিঞ্চিন্মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ—

শমেহভিরেমে বিররাম পাপাদ্,
ভেজে দমং বিষভাজ সধূন্ ॥
নাধীরবৎ কাম সুখে সসঞ্জে,
ন সংররঞ্জে বিষম্ জনকং
ধৃত্যেন্দ্রিয়াংশ্চলান্ বিজিগ্যে
বন্ধুংশ্চ পৌরাংশ্চ গুণৈর্বিজিগ্যে ॥
"একং বিনিন্যে স জুগোপ সপ্ত
সপ্তৈব তত্যাজ ররক্ষ পঞ্চ।
বুদ্ধচরিত, ২.৩৩—৩৪, ৪১

প্রাপ ত্রিবর্গং বুবুধে ত্রিবর্গং জজ্ঞে
দ্বিবর্গং প্রজহৌ দ্বিবর্গং ॥"
"রুরোদ মম্লৌ বিরুরাব জগ্লৌ
বভ্রাম তস্থৌ বিললাপ দধ্যৌ
চকার রোষং বিচকারঃ মালাং
চকর্ত্ত বক্ত্রং বিচকর্ষ বস্ত্রম্ ॥ +
সৌন্দরনন্দ, ৬.৩৩

উভয় কাব্যেই দ্বিতীয় সর্গে কবির লুঙ্ লকারপ্রিয়তাও সমধিক দৃষ্ট হয়—

বুদ্ধচরিত ২.৪০,৪৩; সৌন্দরনন্দ, ২.১০-৪৪।
সৌন্দরনন্দে এই ভাব অধিকতর, এবং ইহাই অনুসরণ করায় কাব্যসৌন্দর্য্যের বিশেষ হানি হইয়াছে। উল্লিখিত স্থলে বুদ্ধচরিতেও এই দোষ ঘটিতেছে।

অনবীকৃততাদোষের ও উভয় কাব্যে বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

৯

ঐরশ্চ রাজা ত্রিদিবং বিগাহ্য
নীত্বাপি দেবীং বশমুর্ব্বশীং তাম্
লোভাদৃষিভ্যঃ কনকং জিহীর্ষুর্জগাম
নাশং বিষয়েষতৃপ্তঃ ॥ ১১-১৫

নন্দের "অতীযুঃ" স্থানে "অতীয়ুঃ" পাঠ করা উচিত। এইরূপ বুদ্ধচরিতের "নাগ ইবাবরুদ্ধঃ" (৩—২) এই পাঠ অনুসরণ করিয়া সৌন্দরনন্দে "নাগ ইবাববুদ্ধঃ" স্থলে (৭—৪) "নাগ ইবাবরুদ্ধঃ" পাঠ করাই সঙ্গত, অন্যথা বিবক্ষিত অর্থের প্রকাশ হয় না।

+ ইহা পাঠ করিয়া ভট্টিকাব্যের—
"বলিববন্ধে জলধির্মমন্থে জহ্রেঽমৃতং দৈত্যকুলং বিজিগ্যে।
কল্পান্তদুঃস্থা বসুধা তথোহে যেনৈষ ভারোঽভিগুরুর্ন তস্য ॥
এই শ্লোকটি স্মৃতিপথে উদিত হয়।

১০

পৃষ্টঃ স চানেন কপাকিদৈড়ঃ

সোমস্ত নপ্তাপ্যভবদ বিচিন্তঃ। ১৩-১২

৯

তথোর্কশীমপ্সরসং বিচিন্ত্য

রাজর্ষিরুন্মাদমগচ্ছদৈড। ৭-৩৮

১০

নপ্ত শশাঙ্কস্য যশোগুণাঙ্কঃ

*   *   *

রাজর্ষিরুন্মাদমগচ্ছদৈড়। ৭-৩৫

উদাহৃত শ্লোকসমূহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অনেক স্থানে উভয় কাব্যে একরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এবং ইহাও জানিতে পারা যাইবে যে, এক স্থানে যাহা সংক্ষিপ্ত, অপর কাব্যে তাহাই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

স্থানে স্থানে উভয় কাব্যে একই কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধচরিতে লিখিত হইয়াছে—

বিহগানাং যথা সায়ং তত্র তত্র সমাগমঃ।

জাতৌ জাতৌ তথা শ্লেষো জনস্য স্বজনস্য চ ॥ ১৯-৩৩

কোন কোন স্থানে উভয় কাব্যে একই শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—

"প্রাসাদ সোপান তল প্রণাদ।"

(বু.চ—৩-১৫ সৌ.ন—৬—৬)।

সৌন্দরনন্দে পরবর্ত্তী শ্লোকে (৭) পুনর্ব্বার "সোপান তল প্রণাদ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার "শাস্তমুর-স্বতন্ত্রঃ" (বু.চ—১৩-১২ ; সৌ.ন—৭—৪১)।

সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার গার্হস্থ্যগ্রহণ সম্বন্ধে উভয় কাব্যের যুক্তি ও দৃষ্টান্ত, এবং কতগুলি শব্দও একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

বুদ্ধচরিত

যা চ প্রবৃত্তা ভবদোষবুদ্ধি—

স্তপোবনেভ্যো ভবনং প্রবেষ্টুম্।

তত্রাপি চিন্তা তব তাত মাভূৎ

পূর্ব্বেঽপি জগ্মুঃ স্বগৃহং বনেভ্যঃ ॥

তপোবনস্থোঽপি বৃতঃ প্রজাভি—

র্জগাম রাজা পুরমম্বরীষঃ।

তথা মহীং বিপ্রকৃতামনার্য্যৈ—

স্তপোবনাদেত্য ররক্ষ রামঃ ॥

তথৈব শাল্বাধিপতিদ্রুমাখ্যো

বনাৎ সসূনুঃ স্বপুরং প্রবিশ্য।

ব্রহ্মর্ষিভূতশ্চ মুনের্বশিষ্ঠাদ্

দধে শ্রিয়ং সাংকৃতিরন্তিদেবঃ ॥

এবং বিধা ধর্ম্মযশঃ প্রদীপ্তাঃ

বনানি হিত্বা ভবনান্যভীয়ুঃ।

তস্মান্ন দোষোঽস্তি গৃহং প্রবেষ্টুং

তপোবনাদ্ ধর্ম্মনিমিত্তমেব ॥ * ৯০-৫৮—৬১

সৌন্দরনন্দ

স স্থাস্যমস্যব্রতঃ পরিগৃহ্য লিঙ্গং

ভূয়ো বিমোক্ষ্যমিতি সোঽপি মে বিচারঃ।

সোঽপি প্রণশ্যতি বিচিন্ত্য নৃপপ্রবীরাং

স্তান্ যে তপোবনমপাস্য গৃহাণ্যতীয়ুঃ ॥

বুদ্ধচরিতে

"বৈরাণ্যহাসীষ্টিরসম্ভূতানি,

রজাংস্যহাসীন্মলিনীকরাণি।" * ২-৪৩

"যথৈব পুত্রপ্রসবে ননন্দ

তথৈব পৌত্রপ্রসবে ননন্দ।" ১-৪৭

সৌন্দরনন্দে

"রমতে তৃষিতো ধনশ্রিয়া

রমতে কাম সুখেন বালিশঃ

রমতে প্রসমেন সজ্জনঃ

পরিভোগান্ পরিভূয় বিদ্যয়া ॥ ৮-২৬

"প্রদহন্ দহনোঽপিগৃহ্যতে

বিশরীর পবনোঽপি গৃহ্যতে।

কুপিতো ভুজগোঽপি গৃহ্যতে

প্রমদানাঞ্চ মনো ন গৃহ্যতে ॥ ৮-২৬

* পুণা হইতে শ্রীযুক্ত অগ্নাশাস্ত্রী বিদ্যাবাচস্পতির স্বকৃত টীকা সহিত সংস্করণে (৫ম সর্গ পর্য্যন্ত) এই শ্লোকের প্রথম চরণের পাঠ "আর্য্যাণ্যহাসীৎ পরমব্রতানি"; কাউয়েল সাহেবের পাঠ "আর্য্যাণ্যচারীৎ পরমব্রতানি।"

প্রদীপ্তে জীবলোকে হি • • •
প্রদীপ্ত ইব বেশ্মনি।" ১৪ ৩০
প্রবর্ত্তকানপ্যবগচ্ছ দোষান্ •••
নিবর্ত্তকঞ্চাপ্যবগচ্ছ মার্গম্ ॥

এই সমস্ত কারণেও মনে হয় যে, অশ্বঘোষই এই উভয় কাব্য রচনা করিয়াছেন।

অশ্বঘোষের সময় প্রভৃতি সম্বন্ধে অন্যান্য প্রাচীন ঘটনার ন্যায় বিবিধ কিংবদন্তী ও মত প্রচলিত আছে। চীনদেশীয় পুস্তকবিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের তিন শত বৎসর পরে পূর্ব্ব ভারতে ব্রাহ্মণ বংশে বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষের জন্ম হয়। তিনি তীর্থিকগণকে পরাজয় করিয়া মহালঙ্কারশাস্ত্র নামক গাথাময় এক গ্রন্থ রচনা করেন।

মহাপ্রজ্ঞাপারমিতার টীকায় কুমারজীবের প্রামাণ্যানুসারে উক্ত হইয়াছে যে, অশ্বঘোষ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ৩৭০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন।

বসুবন্ধুকৃত অশ্বঘোষের এক জীবনচরিত আছে, তাহাতে জানা যায় যে, তিনি বুদ্ধপরিনির্ব্বাণের পঞ্চম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রের চীন ভাষায় দ্বিতীয় অনুবাদের ভূমিকায় উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধ-পরিনির্ব্বাণের পঞ্চম শতাব্দীর পরে অশ্বঘোষের জন্ম হয়। ইনি জগতের আলোক চতুষ্টয়ের অন্যতম (অপর তিন জন নাগার্জ্জুন কুমারলব্ধ ও দেব)। মহাপ্রজ্ঞা পারমিতাশাস্ত্রের চীনানুবাদের ভূমিকাতেও এই কথা উক্ত হইয়াছে।

চীন ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণের ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রের অভিজ্ঞ ব্যাখ্যাকার ফা-সং (Fatsang) মহাশয়ও এই কথা স্বীকার করেন, এবং উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক পরমার্থর লিপিকরও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। এই লিপিকর লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধপরিনির্ব্বাণের ছয় শত বৎসর পরে তৈর্থিকগণ সদ্ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নানাবিধ স্ব স্ব মত প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় মহাযানদর্শনে পরমাভিজ্ঞ মহানুভব শ্রমণ অশ্বঘোষ এই মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র রচনা করেন। জাপান ও চীনের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ সাধারণতঃ এই ষষ্ঠশতাব্দীবাদই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মহামায়াসূত্রে উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের পর একদিন মহামায়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের ভবিষ্যৎ দশা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব তাঁহার নির্ব্বাণলাভের পর সাত শত বৎসর যাবৎ কিরূপ কি হইবে সমস্ত বলিয়া গিয়াছিলেন। আনন্দ তাহা বর্ণনা করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন যে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর ছয় শত বৎসর অতীত হইলে ৯০ নব্বইটি তৈর্থিক মত আবির্ভূত হইবে। ঐ সমস্ত মতে মিথ্যাধর্ম্ম প্রচারিত হইবে, এবং সদ্ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন হইবে। সেই সময়ে অশ্বঘোষ জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐ সকল তৈর্থিক মত খণ্ডন করিবেন। তাহার পর বুদ্ধনির্ব্বাণের ৭০০০ বৎসর অতীত হইলে নাগার্জ্জুন ধর্ম্মের সারতত্ত্ব প্রচার করিবেন, এবং মিথ্যাদৃষ্টির পতাকা উচ্ছিন্ন করিয়া সদ্ধর্ম্মের আলোক প্রজ্জ্বলিত করিবেন।*

অশ্বঘোষ সম্বন্ধে আরও বিবিধ আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। তৃতীয় † ধর্ম্মমহাসঙ্গীতির প্রবর্ত্তক কনিষ্কের সময় ইনি বর্ত্তমান ছিলেন, ইহার বিবিধ প্রমাণে জানিতে পারা যায়। কনিষ্কের সময় নির্দ্ধারণে বহু বহু পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিলে বলিতে হয় অশ্বঘোষ খ্রীষ্টপূর্ব্বে প্রথম শতাব্দীর পরভাগ হইতে খ্রীষ্টপরবর্ত্তী ৮০ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যেরূপেই হউক, তিনি যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন, তাহা নিশ্চয় করিয়াই বলিতে পারা যায়।

---

* নাগার্জ্জুন মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রের এক ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। তিনি সূত্র-সমূহে বুদ্ধের ভিন্ন-ভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী দর্শন করিয়া ছয় জন অশ্বঘোষের উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল আখ্যায়িকার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই মতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

† না চতুর্থ?—প্র, স।

অশ্বঘোষ এক সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সঙ্ঘগুহ্য। তাঁহার মাতা খোর্ত্ত নিবাসী এক বণিকের কনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। তিনি বিদ্যার্জ্জন জন্যে গৌড়, ত্রিহুত ও কামরূপ প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছিলেন। ভারতের পূর্ব্ব প্রদেশেই তাঁহার নিবাস ছিল। কোন স্থানে দেখা যায় অশ্বঘোষের নিবাস শ্রাবস্তীর অন্তর্গত ভাষিত নামক স্থানে ছিল। আবার কোন স্থানে লিখিত আছে, তাঁহার বাসস্থান পশ্চিম ভারতে, এবং তাহার পিতার নাম লোক ও মাতার নাম ঘোণা। আবার এক স্থানে আছে, তিনি বারাণসীবাসী। আর এক বিবরণে পাওয়া যায়, তাহার বাস দক্ষিণ ভারতে ছিল। কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আলোচ্য গ্রন্থের শেষ ভণিতায় গ্রন্থকারকে সাকেতক অর্থাৎ অযোধ্যাবাসী বলা হইয়াছে।

যেখানেই তাঁহার বাসস্থান হউক, চীন ও তিব্বতের বিবরণ-সমূহে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, অশ্বঘোষ মগধে যাত্রা করিয়াছিলেন, চীন বিবরণে দেখা যায় তিনি পাটলিপুত্রে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিব্বতীয় গ্রন্থানুসারে তিনি নালন্দায় গমন করেন। অশ্বঘোষের জীবন চরিতে দেখিতে পাওয়া যায়, পার্শ্ব যখন শ্রবণ করিলেন যে, মধ্য-ভারতে ব্রাহ্মণ তীর্থিক (অশ্বঘোষ) বৌদ্ধগণকে পরা-জিত করিয়া বিহারের ঘণ্টাকে নিঃশব্দ করিয়া দিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে পরাজয় করিবার জন্য উত্তর ভারত হইতে যাত্রা করেন। অশ্বঘোষ সেই সময়ে মধ্য-ভারতেই বাস করতেন। পার্শ্ব অশ্বঘোষকে পরাভব করিয়া স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। *

অশ্বঘোষ কিছুদিন পাটলিপুত্রেই ছিলেন, তাহার পর উত্তর ভারতে গান্ধাররাজ্যে রাজা কনিষ্কের নিকট গমন করেন।

স্থান বিশেষে অশ্বঘোষের পুণ্যাদিত্য (?) ও পুণ্য-শ্রীক (?) এই দুই নামও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া তারানাথ তাঁহার আর কয়েকটি নাম উল্লেখ করি-য়াছেন ; যথা, কাল, দুর্দ্দর্শ, দুর্দ্দর্শকাল, মাতৃচেট, পিতৃচেট, শূর, ধার্ম্মিক, সুভূতি, ও মতিচিত্র। অশ্বঘোষের প্রতিভা ও অন্যান্য নানাবিধ গুণকলাপ দর্শনেই এই সমস্ত নাম ও তৎসম্বন্ধে বিবিধ আখ্যায়িকার উৎপত্তি হইয়াছে।

আর একটি আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে জানিতে পারা যায়, অশ্বঘোষ সঙ্গীত-নিপুণ ছিলেন।

তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহ রচনা করিয়াছেন (১) মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র ; অশ্বঘোষের দার্শনিক রচনা-সমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাতে মহাযানি প্রতি-পাদ্য তত্ত্ব অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অশ্বঘোষ মহাযানের কিরূপ পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাহা ইহাতে বুঝিতে পারা যায়। (২) চরমমুক্তিলাভের উপযোগী আধ্যাত্মিক অবস্থা-সমূহের প্রতিপাদক মূলগ্রন্থ। (৩) মহালঙ্কার সূত্রশাস্ত্র, ইহাতে কর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প আছে। (৪) বুদ্ধচরিত। (৫) অনাত্মবাদ সম্বন্ধে কোন এক নির্গ্রন্থের (জৈনের) প্রশ্নবিষয়ক সূত্র। নাগার্জ্জুন প্রতিষ্ঠাপিত মাধ্যমিক দর্শনের মূলতত্ত্ব ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। (৬) দশ অকুশল বিষয়ক সূত্র। (৭) প্রভু বা উপাধ্যায়ের সেবাবিধি প্রতিপাদক পঞ্চাশৎ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ। (৮) জীবনের ষড়্‌বিধ অবস্থায় পুনর্জ্জন্ম-বিষয়ক সূত্র। (৯) সৌন্দরনন্দ।

সৌন্দরনন্দের নাম আজকাল অনেকেরই নিকট নূতন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পূর্ব্বে এই কাব্যখানি অপরিচিত ছিল না। অমরকোষের টীকায় ভরত চক্রবর্ত্তী শাক্য শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইতে গিয়া সৌন্দরনন্দের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।—

"শাকবৃক্ষ প্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাচ্চ চক্রিরে।
তস্মাদিক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি স্মৃতাঃ॥ ১-২৪ —

ভরত চক্রবর্ত্তীর মুদ্রিত টীকায় দেখিতে পাওয়া যায়,

---

* এ সম্বন্ধেও বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়—তারানাথ বলেন, আর্য্যদেব, এবং আর একখানি গ্রন্থ অনুসারে পুণ্যযশা অশ্বঘোষকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই সমস্ত মতেরই সমর্থক ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা আছে।

যে, গ্রন্থখানির নাম সুন্দরানন্দ লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা সংস্কারক বা লিপিকরের পরিবর্ত্তন হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি অল্প দিন হয় প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থান্তরে ইহার কোন কোন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এখনো উপযুক্তরূপে অন্বেষণ করা হয় নাই।

সৌন্দরনন্দ কাব্যখানিকে মধ্যম শ্রেণীর বলিতে পারা যায়। স্থানে স্থানে ইহাতে চমৎকার ভাববৈচিত্র্য দেখা যায়, ভাষা মার্জ্জিত ও প্রায়ই প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও মধুর।

"ততো মৃগেন্দ্রস্য মৃগেন্দ্রগামী
বধায় বধ্যস্য শরং শরণ্যঃ।
জাতাভিষঙ্গো নৃপতির্নিষঙ্গাদ্
উদ্ধর্ত্তুমৈচ্ছৎ প্রসভোদ্ধৃতারিঃ॥" রঘু - ২—৩০

ইত্যাদি স্থলে কালিদাসের যেমন একটি রমণীয় রীতি পরিলক্ষিত হয়, সৌন্দরনন্দেও বহু স্থলে সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়:—

ততো বিবিক্তঞ্চ বিবিক্তচেতাঃ
সন্মার্গবিন্ মার্গমভিপ্রতস্থে।
গত্বাগ্রতশ্চাগ্র্যতমায় তস্মৈ
নন্দী বিমুক্তায় ননাম নন্দঃ॥ ৫-৬
স চক্রবাকোব হি চক্রবাকঃ
যো সমেতঃ প্রিয়য়া প্রিয়ার্হঃ।" ৪-২
"তৎ সাধু সাধুপ্রিয় মৎপ্রিয়ার্থং
তত্রাস্তু ভিক্ষুত্বম ভৈক্ষকালঃ।" ৫—৯

নন্দ ও সুন্দরীর পরস্পর সম্মিলন-শোভা কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"সা হাসহংসা নয়নদ্বিরেফা
পীনস্তনাভ্যুন্নত পদ্মকোষা।
ভূয়ো বভাসে স্বকুলোদিতেন
স্ত্রীপদ্মিনী নন্দদিবাকরেণ॥
রূপেণ চাত্যন্তমনোহরেণ
রূপানুরূপেণ চ চেষ্টিতেন।
মনুষ্যলোকে হি তদা বভূব
সা সুন্দরী স্ত্রী পুরুষেষু নন্দঃ॥" ৪-৪৫

ইহার পরেই উক্ত হইয়াছে—

তাং সুন্দরীং চেন্ন লভেত নন্দঃ
সা বিবেবতে ন তং নতভ্রূঃ।
দ্বন্দ্বং ধ্রুবং তদ্ বিকলং
ন শোভেতান্যোন্যহীনাবিব রাত্রিচন্দ্রৌ॥ ৪-৭

ইহার সহিত কালিদাসের পদ্যটি তুলনীয়—

"পরস্পরেণ স্পৃহনীয়শোভং
ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ
পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ॥"

কান্তাসক্ত-নন্দ অনিচ্ছায় কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যখন বুদ্ধের নিকট গমন করিয়াছেন, কবি তখন তাঁহার সেই ভাব বর্ণনা করিয়াছেন—

তং গৌরবং বুদ্ধগতং চকর্ষ
ভার্য্যানুরাগ পুনরাচকর্ষ।
সোঽনিশ্চয়ান্ নাপি যযৌ
ন তস্থৌ তরং তরঙ্গেষ্বিব রাজহংসঃ॥ ৪-৪২

ইহার সহিত কুমারসম্ভবের (৪—৮৫) সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটি তুলনীয়—

"মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥"

বলা বাহুল্য অশ্বঘোষ এখানে কালিদাসকে পরাজয় করিয়াছেন। সৌন্দরনন্দকার আর একটি অতি চমৎকার উপমা দিয়াছেন। বুদ্ধদেব নন্দকে গ্রহণ করিয়া আকাশ পথে উত্থিত হইলেন, কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

কাষায়বস্ত্রৌ কনকাবদাতৌ
বিরেজতু র্যৌ নভসি প্রসন্নে।
অন্যোন্য সংশ্লিষ্টবিকীর্ণপক্ষৌ
সরঃ প্রকীর্ণাবিব চক্রবাকৌ॥' ১০-৪

পাঠকগণ সৌন্দরনন্দকারের আর একটি উপমা দর্শন করুন—

কাষায়বাসাঃ কনকাবদাত
ততঃ সমূর্দ্ধ্না গুরবে প্রণেমে।
বাতেরিতঃ পল্লবতাম্ররাগঃ
পুষ্পোজ্জ্বলশ্রীরিব কর্ণিকারঃ॥ ১৮-৫

সৌন্দরনন্দকার লিখিয়াছেন—

কিমত্র চিত্রং যদি বিতমোহো
বনং গতঃ স্বস্থমনা ন মুহ্যেৎ।
আক্ষিপ্যমাণো হৃদি তন্নিমিত্তৈঃ।
র্ন ক্ষোভ্যতে যঃ স কৃতী স ধীরঃ॥ ১৬·৮৪

আর কুমারসম্ভবকার বলিয়াছেন—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥ ১-৫৯

এখানে কালিদাসের উক্তি সংক্ষিপ্ত হইলেও সমগ্র ভাবকে প্রকাশিত করিয়াছে, এবং সেই জন্যই ইহা রমণীয়তর।

দশম সর্গের পর্ব্বত বর্ণনাটি অতি রমণীয় ও বিবিধ কবিত্বভাবের পরিচায়ক।

"সুলভাঃ পুরুষাঃ রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥"

রামায়ণের এই প্রসিদ্ধ শ্লোকের ভাব গ্রহণ করিয়া ভারবি "হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ," আর সৌন্দরনন্দকার লিখিয়াছেন—

"অপ্রিয়ং হি হিতং স্নিগ্ধম্ অস্নিগ্ধমহিতং প্রিয়ম্।
দুর্ল্লভং তু প্রিয়হিতং স্বাদুপথ্যমিবৌষধম্॥"
১১·১৬

সৌন্দরনন্দের—

"অহো প্রত্যবমর্শোঽয়ং শ্রেয়সস্তে পুরোজবঃ।
অরণ্যাং মথ্যমানায়াম্ অগ্নের্ধূম ইবোত্থিতঃ॥"
১২-১৯

এই শ্লোকটি পাঠ করিলে উত্তর চরিতের—

"অন্তর্লীনস্য দুঃখাগ্নেরদ্যোদ্দামং জ্বলিষ্যতঃ।
উৎপীড় ইব ধূমস্য মোহঃ প্রাগাবৃণোতি মাম্॥

এই শ্লোকটী স্মৃতিপথে উদিত হয়।

সৌন্দরনন্দের কয়েকটি বিলক্ষণ শব্দ কালিদাসের কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, "নরেন্দ্রমার্গ," সৌ '৫·৩; রঘু '৬' (সঞ্চারিণী দীপশিখেব ইত্যাদি শ্লোক); "স্পর্শক্ষম," সৌ 'ন' ১০·২৫; শকুন্তলা, "নবং বয়ঃ" সৌ 'ন' ৯·২৭; রঘু '২·৪৩; "প্রত্যয়নেয় বুদ্ধি," সৌ 'ন' ৫·১৭; মালবিকাগ্নি মিত্র, ১। "কণ্ঠঃ শাকুন্তলস্যেব ভরতস্য তরস্বিনঃ," ও "অনুচক্রুর্বনস্থস্য দৌষ্মন্তদৈবকর্ম্মণঃ," (১·২৬,৩৬) এই দুই চরণ শকুন্তলার কথা মনে করিয়া দেয়।

সৌন্দরনন্দে চ্যুতসংস্কৃতি দোষ অত্যন্ত অধিক। বুদ্ধচরিতেও এই দোষ আছে, কিন্তু সৌন্দরনন্দে তাহা অপেক্ষা বেশী। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিবিধ আলঙ্কারিক দোষও ইহাতে আছে। 'কবন্ধ' শব্দ জলবাচী হইলেও কবিগণ তাহা তদর্থে প্রয়োগ করেন না, কিন্তু সৌন্দরনন্দকার তাহা করিয়াছেন— "কবন্ধবায়ৃগ্নিদিবাকরাণাম্" (১৭·৫৯)। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাকে অপ্রযুক্ততা দোষ বলা হইয়া থাকে। "কুশেশয়ান্...কোকনদাংশ্চ" (১০-২৬) এখানে 'বিন্দতি' 'বেত্তি' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তদাদিগণীয় বিদ্ ধাতুর অর্থ লাভ করা। অতএব এখানে অবাচকতা দোষ হইয়াছে। "তস্মাৎ প্রবৃত্তিং পরিগচ্ছ দুঃখম্,...নিবৃত্তিমাগচ্ছ চ তন্নিরোধম্" (১৬ ৪২), এস্থানেও ঐ দোষ। পরি-পূর্ব্বক ও অভি-পূর্ব্বক গম্ ধাতু এখানে জ্ঞানার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঠিক হয় নাই। "দ্বিবিধ সমুদেতি বেদনা নিয়তং বেতসি দেহ এব চ" (৮.৩), এস্থলে এব শব্দের প্রয়োগের কোন আবশ্যকতা ছিল না, ইহা নিরর্থক হইয়াছে। "নিষ্ঠীব্য কামানুপশান্তিকামাঃ কামেষু নৈবং কৃপণেষু সক্তাঃ" (৫—৩৮), এখানে "কামেষু" স্থানে সর্ব্বনাম ব্যবহার কথা উচিৎ ছিল। এইরূপ ৩.২৭, ও ১০.৪২ শ্লোকেও হইয়াছে। "কেচিৎ স্বকেশাবসথেষু তস্থুঃ কৃতাঞ্জলীন্ বীক্ষণতৎপরাক্ষাঃ" (৫.২), এখানে কৃতাঞ্জলয়ঃ" (প্রথমান্তে) লেখা কর্ত্তব্য ছিল। কচিৎ ছন্দোদোষও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, ভ্রাতৃষিণা দ্বিগুরুণানুশিষ্টঃ (৭.১৭), এখানে উপজাতিছন্দঃ, অতএব পঞ্চমবর্ণ "দ্বি" গুরু হওয়া উচিত ছিল। "তথা নৃপর্ষের্দিলিপস্য" (৭.৩২), এখানে কেবল ছন্দোঽনুরোধে 'দিলীপস্য' লিখিত হয় নাই। "প্রব্রজ্যা ন ইহ স্থিতাঃ" (১৩.১৯) এখানে কেবল ছন্দোভঙ্গভয়ে সন্ধি করা হয় নাই। "সোঽত্যান্তিকং মোক্ষমবৈতি তেভ্যঃ" (১৬.৪৮), এখানেও কেবল ছন্দোভঙ্গ

ভয়ে "স+আত্যন্তিকং" সন্ধি করিয়া "সোঽত্যন্তিকং" করা হইয়াছে। সৌন্দরনন্দে এতাদৃশ অনেক দোষ দৃষ্টিগোচর নহে। *

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক

(ঢাকা সাহিত্যপরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীগণ পরস্পর বাক্যালাপের সময়ে প্রায়ই শ্লোক ব্যবহার করিয়া বক্তব্য বিষয়টি সুন্দর পরিস্ফুট করিয়া দেন।

এই শ্লোকগুলি কোথাও ভাবে ও সত্যে পূর্ণ, কোথাও স্নেহমাখা কৌতুকহাস্যে মুখরিত, কোথাও বা মধুর রসে সিক্ত, আবার কোথাও বা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা-ফলকের মত উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবেশক্ষম, অন্যত্র উজ্জ্বল হীরকখণ্ডবৎ আলোক-বিচ্ছুরণে অস্পষ্ট বাক্যকে সুস্পষ্ট করিতেও অদ্বিতীয়।

এই শ্লোকগুলির রচয়িতা স্বভাবতঃ সেই মাতৃজাতিই। ইঁহাদের সবগুলিরই যে মিল আছে তাহা নহে; কতক গুলি গদ্যের মত। অদ্য এরূপ শ্লোকের কয়েকটি মাত্র উপহার দিব। ভাষা যেমন তেমনই রাখিয়াছি। শুদ্ধ করিলে উহারা প্রাণহীন হইবে।

১। তোমার নাম রামদাস আমার নাম পাঁচু,
কিন্‌তে দিলাম গোষাইর, কলা কিনা আন্‌চ কচু!

২। বাড়ীতে আছেন শাল্‌গেরাম্,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে তল গেলাম্।

৩। এত রঙ্গ দেখলাম আমি বলাইর ঘরে যাইয়া,
বিয়ালে যে তুলা পিজে কলা বনে বৈয়া।

৪। অলি অলি অলি,
দমকা জ্বালে চিতৈ পিঠা, নিবা জ্বালে পুলি।

এখানে বোধহয় "অলি" শব্দটি সখী অর্থসূচক "আলি" শব্দের রূপান্তর মাত্র। এটি "চিতৈ পিঠা" ও "পুলি পিঠার" প্রস্তুত-প্রণালি সম্বন্ধে উপদেশে।

৫। দায়রে আছার, কুড়ালেরে খিল,
বাঁদীরে লাথি, গোলামেরে কিল।
আছার=হাতল।

৬। এই বেড়াঘেরা কার লিগা?
ঝির লিগা।
তারে গিয়া দেখ ঝাটখোলা! লিগা=জন্য।

৭। সম্মানে লো মরি—
ঘাটের থিকা জল আইনা বাড়ীতে সিনান করি!
থিকা=হইতে।

৮। আপ্‌নে থাক্‌তে খাই ঠাই
বৌর্‌ লগে সাত খাই!
লগে=সঙ্গে।

৯। জামাইর গোদে শয্যা জুড়ল
কন্যা শুইব কই?

১০। আগে হাটনী, পাণ বাটনী,—বৌ খাই;
এই তিন কর্ম্মে যশ নাই।

১১। গপ্প হাজারীর বাড়ী
টাকায় বিকায় ষোল খান সারী।

১২। ফেন দিয়া ভাত খায় গপ্প মারে দই,
মাইটা হুকায় তামুক খায়—গুড়গুড়িটা কই?

১৩। আপন আপন পর পর
যে না চিনে সে বর্ব্বর!

১৪। খাইয়া লইয়া বুইড়া নাচে,
বুইড়ার কাঁধে দান আছে।

১৫। যার লিগা খাটি আমি সেও কয় চোরা!
খাটুলে মায়না নাই, আমার বকৎই বুরা।
বকৎ=সময়। (পারশি শব্দ)।
বুরা=মন্দ। ঐ

১৬। লাজে বৌ ভাত খা'ন না
চা(ই)লতা হেন গেরাস।

---

* "গৃহস্থ", হইতে উদ্ধৃত।

১৭। যার পরণ খনি—
তার কথা লাগে ধ্বনি ধ্বনি!
যার পরণ তেনা,—
তার কথা লাগে ওনা প্যানা!
খনি=ক্ষৌম বাস।

১৮ যার প্রসাদে রামের মা—
তারেই তুমি চিন না!

১৯। মায় বলে পর পর!
মায় করে কার ঘর?

২০। মনের কথা কইয়া যারে লস্কইরার বাপ!

এই শ্লোকটির সঙ্গে একটু ইতিহাস জড়িত আছে। একদিন লস্করার বাপের শেষ দশা উপস্থিত। দেখিয়া তাহার স্ত্রী বড়ই কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধও তাহার শেষ পক্ষের স্ত্রীটিকে নানা কথা বলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতে সে সান্ত্বনা লাভ করে না। কেবল বলে, মনের কথা কইয়া যারে লস্কইরার বাপ! বৃদ্ধ আবার বলিল, তুমি কেন চিন্তা কর, লস্কর বাঁচিয়া থাকিতে তোমার কিসের ভাবনা? কিন্তু সবই বৃথা—তাহার মুখে ঐ এক কথা "মনের কথা কইয়া যারে লস্কইরার বাপ"। তখন বৃদ্ধ বুঝিতে পারিয়া বহু কষ্টে বলিল যে, আবশ্যক হইলে সে যেন নিকা বসে। তখন সে শান্ত হইল এবং বৃদ্ধও শান্তিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

২১। সেই মামা সেই মামী—পুকৈর পারে ঘর—
তখন কেন গো মামী হাতে রাখছিলা সর?

এক মামী ভাগিনেয়ের দুরবস্থার সময় দুধের সর তাহাকে খাইতে না দিয়া লুকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু ভাগিনেয়ের অবস্থা যখন ফিরিল—সে রীতিমত বড় মানুষ হইল, তখন মামী বড়ই আদর করিতে লাগিলেন। তার উপরেই এই কথা।

২২। আইয়র্ না পড়ল সিতায় পানি,
রাড়ীর হইল চাউল্ চাবানি!
আইয়=সধবা। সিতায়=সিঁথিতে।
রাড়ী=বিধবা।

২৩। কোম্বা সাধের বাড়ী
তার নাইলতা শাকে আদা!
নাইল্তা শাক=পাট শাক।

২৪। থাক্তে না দিল চুট্কি পুঠি,
মরলে্ দিব শ্রী-অঙ্গুরী!
থাক্তে=জীবিত থাকতে।

২৫। স্বাদ থাউক সোয়াদের মতন
প্যাট্ মত্তর ভরুক।
যেমুন তেমুন কাঠের পুতুল
ইন্দুর মত্তর মরুক। মত্তর=মাত্র, শুধু।

২৬। নাগর চাঁদের শোওয়নের পটি,
দুই ধারে দুই বাইলের আটী!
পটি=ঠাট। বাইল=সুপারীর আটী।

২৭। মা'র পোড়ে না পোড়ে মাসীর,
ঝাল খাইয়া মরে পাড়া পরসী!

২৮। আড়া কাঁদে, পাড়া কাঁদে চালের বাতা ধইরা,
ভাইর বৌ আভাগী কাঁদে চক্ষে মরিচ দিয়া!
বাতা=প্রান্তভাগ।

২৯। কেয়ইর নাম রামদাস, কেয়ইর নাম সৈয়া,
কেয়ইরে দেখ্লে ফালাফালি, কেয়ইরে যায় ডেইঙ্গা।
কেয়ই=কেহ। ডেইঙ্গা=ডিঙ্গাইয়া; লঙ্ঘন করিয়া।

৩০। চুল নাই মাগী চুলেরে কাঁদে,
কচু পাতার ঢিপ্লা দিয়া খোপ ডাঙ্গর বাধে!
চুলেরে=চুলের জন্য। ডাঙ্গর=ডাগর, বড়।

৩১। ওরে জিহ্বা লড়্বড়্
ওরে জিহ্বা সম্বর,
ওরে জিহ্বা পরের ঘর!

৩২। আ-দেখিলায় দেখ্ছে,
পুঠি মাছে লেখ্ছে!

৩৩। নাই নাই চাউলপাত—
চরাইয়া দে ঘী ভাত!

৩৪। রামদাসের মা,
কথার ছান্দনি জান, কাম জান না!

৩৫। কামে কুইড়া, ভোজনে দেইড়া,
বাক্যে খায় পুইড়া পুইড়া!

৩৬। বাইর বাড়ী বইসা শুনি সম্ভারের ঠাট্,
বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখি মূলা বঠি আর ভাত!
বঠি = চচ্চড়ি।

৩৭। বাইর বাড়ী লণ্ঠন, ভিতর বাড়ী ঠণ্ঠন!
(আগে পাছে লণ্ঠন, কাজের নামে ঠণ্ঠন)

৩৮। কাণ খোড় ভেঙ্গুর, হারামজাদার লেঙ্গুর।

৩৯। শীতকালে শীতকাটা, গ্রীষ্মকালে ঘামাচি,
কোন কালেই বা ছিলা তুমি রূপসী!

৪০। কিছুর লগে উদ্দিশ নাই, গান বাজ সার!

৪১। পাণি পরখতি ভক্ষণ, তবে সেন্ পুরুষের লক্ষণ,
মুই আভাগী তপ্ত খাই, কোন্ সন্ জানি মইরা যাই।
পানি পরখতি = পান্তা ভাত, বা জল দেওয়া ভাত।
কোন্ সন্ = কোন সময়।

৪২। সাধ্‌তে জামাই কাঠাল খান্ না
বোপা লইয়া টান্।

৪৩। ধানের মধ্যে আখালি,
কত রঙ্গ দেখালি!

৪৪। কামের মধ্যে দুই,—
খাই আর শুই!

৪৫। কাম নাই কামেরে কাঁদে,—
ধানে চাউলে মিশাইয়া একখানে বান্দে!
বান্দে = ভানে।

৪৬। ঠেলাঠেলির ঘর,
খোদায় রক্ষা কর!

৪৭। ওঠ্ ছেমরী তর বিয়া!
ছেমরী = ছুঁড়ী।

৪৮। গাছের শত্রু লতা,
মাইনুষের শত্রু কথা,
গোরুর শত্রু কাউয়া—
আর যদি কিছু কর্‌তে না পারে,
তবে খোচাইয়া করে ঘাউয়া ঘাউয়া!

৪৯। যম, জামাই, ভাইগ্না—
তিন নয় আপ্‌না।

৫০। মামা ভাইগ্না যেইখানে, আপদ নাই সেইখানে।

৫১। ধন্ সোহাগী মরে ক্ষুদের জাউ খাইয়া!

৫২। ঘী খায় পোলা উনাইতে উনাইতে যায়,—
আর ফেন্ খায় পোলা ফোপাইতে ফোপাইতে যায়।

৫৩। আপনা নাক কাইটা পরের যাত্রা ভঙ্গ!

৫৪। আপনা পাগল বান্ধি ছান্দি,
পরের পাগল হাত্‌তালি দেই!

৫৫। আপনা মান আপনে রাখি,
কাটা কান চুল দিয়া ঢাকি!

৫৬। কিসের মধ্যে কি, আগুন পোড়ায় ঘী!

৫৭। এমন্ ছাইও ভাল্ মাইনুষে খায়?
পান্তা ভাতে ঘী ভাস্‌তে ভাস্‌তে যায়!

৫৮। ডাইলের মধ্যে মুশুরী,
মাইনুষের মধ্যে শাশুরী।

৫৯। কত রবি জ্বলে?—কে বা আখি ম্যালে?

৬০। এক পা' দুধের ঢ্যাকানি,
বুইড়ার উঠ্‌লো ক্যাকানি!

৬১। ঘরের কথা পরেরে কয় তারে কয় পর,
চৈত্র মাসে কাথা গায়—তারে কয় জ্বর!
কাথা = কন্থা।

৬২। যার মনে যা ফাল দিয়া উঠে তা।
ফাল = লাফ।

৬৩। হৈল ভাত পরাণের বড়ি,
খাইয়া ফালা তড়াতড়ি।
হৈল = প্রস্তুত।

৬৪। নাইয়ার এক নাও,
নিনাইয়ার শতেক নাও।

৬৫। সাজো কাজো—ফেউচারাঙ্গা।

৬৬। পোলার হাড়ে বুড়ার চামে,
গইড়া দিছে দারুণ যমে।
পোলার = ছেলের। গইড়া = গড়িয়া।

৬৭। পোলার মুখে বুড়া কথা,
শুনতে লাগে মাথা ব্যথা।

৬৮। আমি বানি পরের বারা,
আমার বারা যায় দক্ষিণ পাড়া।
বানি = ভানি।

৬৯। আইতল মাইতল,
সেই বুড়ীর পায়ের তল।

৭০। আহ্লাদীলো ঢেপের খই,
এত আহ্লাদ পাইছিলি কই।
ঢেপ = 'সাঁপলার' ফল।

৭১। অর্দ্ধেক ষষ্ঠী,
অর্দ্ধেক ঘর গুষ্ঠী।

৭২। নূতন নূতন খইয়ের মোয়া মচ মচ্ করে,
পূরাণ হইলে খইয়ের মোয়া তেনাইয়া পড়ে।

৭৩। আহ্লাদে আটখান,
লেজা মুড়ায় দশখান।

৭৪। উপকাইরারে বাঘে খায়।

৭৫। মোটে মায় বান্ধে না তপ্ত আর পান্তা।

৭৬। সারা দিন যায় হাটে ঘাটে,
রাইত হলে বুড়ী সুতা কাটে।

৭৭। আর গুণ নাই ছার গুণ আছে।

৭৮। বাইরে কোচার পত্তন,
ভিতরে ছুতার গর্ত্তন।
গর্ত্তন = গর্ত্ত।

৭৯। বার বাড়ী তের খামার,
যেই বাড়ী যাই সেই বাড়ীই আমার।

৮০। পরের মাথায় বাড়ি দিয়া,
আপ্নে পড়লাম চিত্তর হইয়া।

৮১। পোলা পোলা কর তুমি,
এমন পোলা দিমু আমি,
যেমুন গলায় ঠেকে মর তুমি।

৮২। বদি কইল চোর,
উইঠা দিল লড়।

৮৩। দিয়া নেয় শিয়ালে,
কান কাটে বিড়ালে।

৮৪। আগে দেয় জলের ছিটা,
পাছে খায় চৈরের গুতা।

৮৫। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল,
মশা মারতে গালে চড়।

৮৬। পর হস্তে ধন,
পরের নায় গমন।

৮৭। কাল করলি লো ভবি অম্বলে দিলি আরা

৮৮। মনা,
অল্পে অল্পে পনা।

৮৯। জন্ম বয়সে কর্ম্ম নাই,
চৈত্র মাসে রাস।

৯০। আকলে খাইয়া মাটি,
বাপে পুতে কামলা খাটি।

৯১। খাই লই নাকে শোষে,
বাইর নাই আমার কর্ম্মদোষে।
বাইর = বুদ্ধি।

৯২। কার বা গোয়াইল,
কেবা দেয় ধুয়া।
গোয়াইল = গোশালা।

৯৩। দুধ দেয় গরুর লাথিও ভাল।

৯৪। দুষ্ট বলদের থেইকা শূন্য গোয়াইলও ভাল।

৯৫। টাকাও দিলাম আশি,
বিয়াও করলাম দাসী।

৯৬। হাতের কঙ্কন দিয়া কিন্‌লাম দাসী,
সে হইল ঠাইরাইন আমি হইলাম দাসী।

৯৭। মায়ের থিকা অধিক মায়া,
তারে কয় রাক্ষসী মায়া।

৯৮। ভাইর থিকা তাই বেশী,
মূলার থিকা থেইরা বেশী। থিকা = হইতে।

৯৯। সকলে মরে সকলের রঙ্গে,
কানী মরে তার দুই চক্ষের রঙ্গে।

১০০। মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।

১০১। আত্ম সুখী,
পর বৈরাগী।

১০২। মোটে নাই হালি, ঘন কইরা রো।

১০৩। নাইচা মরে নরসিংগা,
চৈতা চীড়া খায়।
নরসিংগা = নরসিংহ।
চৈতা = লোকের নাম।

১০৪। ভাত না কাপড়,
ঠাস্ কইরা চাপড়।

১০৫। পাপী যাইব গঙ্গা স্নান,
কাটা কুড়াইব কে।

১০৬। যারে না মারে ভাতারে,
সে আপ্‌নে আপ্‌নে আতরে।
আতরে = দাপাদাপি করে।

১০৭। আম পড়ব বাতাসে,
কাউয়া রইল প্রত্যাশে।
কাউয়া = কাক।

১০৮। দুই দিন ধইরা বৈরাগী হইছেন,
ভাতেরে কয় পস্‌সাদ।
পস্‌সাদ = প্রসাদ।

১০৯। পাইলাম থালে দিলাম গালে,
পাপপুণ্য নাই কোন কালে।

১১০। বাপের ভাতে যাতাযাতি,
ভাইয়ের ভাতে কাঁদাকাটি,
সোয়ামীর ভাতে অগর নগর,
পুত্রের ভাতে অতি বড় ঝগড়।
সোয়ামী = স্বামী।
ঝগড় = ঝগড়া।

১১১। অতি বাইরন যাইর না,
ঝড়ে ভাইঙ্গা পড়ব,
অতি নীচা হইওনা,
ছাগলে মুইড়া খাইব।

১১২। ঠাকুর ঘরে কে ?
কলা খাই না।

১১৩। সাইজা কাইজা রইলেন রাই,
এই লগ্নে বিয়া নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

গ্রন্থ সমালোচনা

১। গৃহিণীর কর্ত্তব্য—শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত—ষষ্ঠ সংস্করণ, আকার ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত, এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, ২২৪ পৃষ্ঠা। কাপড়ের বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা। এই গ্রন্থে গৃহিণীর যাবতীয় কর্ত্তব্য সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গৃহকে প্রকৃত শান্তি ও সুখের আবাস করিতে হইলে বঙ্গীয় গৃহিণিগণকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে দিন।

২। শ্রীদক্ষিণেশ্বর—শ্রীপ্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট ৬৫।১, ৬৫।২ নং। লক্ষ্মী-প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী ও রিডিং ক্লব হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০ চারি আনা। ছাপা উৎকৃষ্ট, কাগজ ভাল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দুই অবস্থার দুটি হাফটোন ব্লক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সরল ভাষায় রাণী রাসমণির জীবনী, তাঁহার স্বামীর দয়াশীলতা, দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠা ও ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত ও সিদ্ধিলাভ এবং দেহত্যাগ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তের বিশ্বাস "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার।"

শ্রীনারায়ণ।

রঞ্জনশালা স্থাপন *

আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিল্পসমূহের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রকৃত রাসায়নিক শিল্পজাতের (Chemical industries) প্রতি আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় নাই, এবং তজ্জন্যই উক্ত প্রকার কোনও শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই।

সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে মনে হয় যে মধ্যম রকমের একটী কারখানা স্থাপন পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে বস্ত্র ও সূত্ররঞ্জনের ব্যবসা চালাইলে, নিশ্চয়ই লাভজনক হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অত্যল্প পরিমাণেই সূত্র ও বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত কার্য্যে রঞ্জন কোনও ব্যবসায় প্রচলিত নাই এবং উহা একটী উচ্চ শিল্প বলিয়া পরিগণিত নহে। দেশের কোন কোন স্থানে অশিক্ষিত লোক দ্বারা অত্যল্প মাত্রায় বস্ত্র ও সূত্র রঞ্জিত হয় এবং কোন কোন কাপড়ের কলে ধুতি ও সাড়ির পাড়ের জন্য সূতা নীল ও লাল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সমস্ত রঞ্জিত সূতা ও বস্ত্রই ইউরোপ হইতে আমদানী করা হয়। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে, যে, (১) এদেশে প্রস্তুত সূতা ও বস্ত্র বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ব্যবসা চালাইলে ইউরোপ হইতে আনীত রঞ্জিত বস্ত্র ও সূতার সহিত প্রতিযোগিতায় লাভবান্ হওয়া যায় কিনা? (২) পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যবসা সম্ভবপর ও আশাপ্রদ হইলে বিদেশী সাদা সূতা এবং বস্ত্র এ দেশে রঞ্জিত করিয়া ব্যবসা চালাইলে লাভবান্ হওয়া যায় কিনা?

কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে যদি এইরূপ ব্যবসা সম্ভবপর ও লাভজনক হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান কাপড়ের কলসমূহ কর্ত্তৃক উহা গৃহীত হইত। বর্ত্তমান সময়ে কাপড়ের কলগুলি বস্ত্রবয়নে উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা করিতেছে, এবং ভবিষ্যতে পূর্ব্বোক্ত বিষয় নিশ্চয়ই তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। সম্প্রতি কোন কোন কলে সাধারণ প্রয়োজনীয় রঞ্জনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

যদি কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি ৫০০০০্ হইতে ১ লক্ষ টাকা মূলধনে একটী রঞ্জনশালা স্থাপন পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে বস্ত্র এবং সূত্র রঞ্জন করিয়া ব্যবসা চালান, তাহাতে লাভজনক হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই প্রমাণের প্রয়াস করা হইয়াছে।

গত বৎসর হইতে সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট শিবপুরে আধুনিক রঞ্জনবিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটী স্কুল স্থাপন করিয়া এ বিষয়ে একটি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছেন। আশা করা যায়, মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট যেরূপ "চর্ম্ম পরিষ্করণ" কার্য্য অল্প মূলধনে ছোট কারখানায় পরিচালন করিয়া কিরূপে লাভবান হওয়া যায় তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন, অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ একটী ছোট রঞ্জনশালা স্থাপন পূর্ব্বক কিরূপে উহা পরিচালনা করিয়া লাভবান্ হওয়া যাইতে পারে, শিক্ষার্থীদিগকে কার্য্যতঃ বুঝাইয়া দিবেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রতি বৎসর বহু টাকা মূল্যের রঞ্জিত সূত্র এবং বস্ত্র বিদেশ হইতে কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। ব্রিটিশ ভারতের বাৎসরিক অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য বিবরণী (Annual Report of the trade and navigation [illegible] British India) হইতে ১৯০৪—১৯০৫ সনে [illegible] টাকা মূল্যের সূত্র এবং বস্ত্র বিদেশ হইতে কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে নিম্নে তাহার সংখ্যাপাত করা গেল। অবশ্য উক্ত বৎসরে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক টাকা মূল্যের সূত্র বা বস্ত্র কলিকাতায় আমদানী হয় নাই, এবং এই বৎসরের সং[illegible]লিকে ঐ প্রকারে গড়ে বাৎসরিক হিসাব ধরা যাইতে পারে।

---

* অধ্যাপক ওয়াটসন্ সাহেব কর্ত্তৃক ঢাকা কলেজ সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত "An Opening for small Dye-works in Bengal" নামক প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত।

আমদানী জিনিষের বিবরণ।	পরিমাণ	মূল্য	মূল্যের পরিমাণ
রঞ্জিত সূত্র (লাল, কমলা এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার)			
১—২০ নং	১৪৯৫৭৫ পাউণ্ড	১১১৬০৮ টাকা	প্রতি পাউণ্ড ॥৶১০ পাই
২১—২৫ নং	১৮৪০ পাউণ্ড	১২০০ টাকা	,, ॥৵৫ পাই
২৬—৩০ নং	১১৯৯৫০ ,,	৮৬৫৭৬ টাকা	,, ॥৶৬ পাই
৩১—৪০ নং	৩৯৮১৩৭৪ ,,	৩০১২৫৪৪ টাকা	,, ৸০
৪১—৫০ নং	৭৩০ ,,	৫৭৬ টাকা	,, ৸২ পাই
৫০ নম্বরের উর্দ্ধে	৮৬৪০ ,,	১২০১০ টাকা	,, ১।৪ পাই
সাদা বস্ত্রাদি (Bleached piece goods)			
কেম্ব্রিক, টুইল, প্রভৃতি	৩৭৪৭৭১৪ গজ	৭২২৫১১ টাকা	প্রতি গজ গড়ে ৶১ পাই
চাদর ধুতি সাড়ী প্রভৃতি	৪৩০৩৬৪৪৮ গজ	৫৯০৪২৩০ টাকা	,, ৵৪ পাই
ডুড়িদার বস্ত্র, সাদা ছিট্ ইত্যাদি	৯৭৩৯২৫ ,,	১৫৮৯৩০ টাকা	,, ৵৭ পাই
ড্রিল ও জিন	২১৩১৬৩২ ,,	৪৯৭৪৪৯ ,,	,, ৶৭ পাই
সাদা থান কাপড়	১৫৯৬৯১৭৫ ,,	২৭৭৪৮৪৮ ,,	,, ৵৯ পাই
লং ক্লথ	৮২৫৯৪১ ,,	১৮৮০৮৪ ,,	,, ৶৫ পাই
মলমল	৪৬৪০০৭৭২ ,,	৬৬৭৫০০৫ ,,	,, ৵৪ পাই
নয়নসুক	৫২৫১১৬৮১ ,,	৬৯৬২২৭০ ,,	,, ৵২ পাই
সার্টের কাপড়	১৮৮০৭৪৮৭ ,,	৩০৮৮৫৫০ ,,	,, ৵৭ পাই
অন্যান্য প্রকারের	৪৭৭১১৭৮ ,,	৭২৪৯১৪ ,,	,, ৵৬ পাই
রঞ্জিত বস্ত্রাদি coloured, printed or dyed			
কেম্ব্রিক, টুইল ইত্যাদি	১৮১১৮৮১৫ গজ	২৩১৫৭০৯ টাকা	প্রতি গজ গড়ে ৵১ পাই
চাদর ধুতি সাড়ী প্রভৃতি	১৬৩০৩২০৬ ,,	৫৪৮৩৩৭৮ ,,	,, ৶৪ পাই
ড্রিল	৬৫৮৯৪৩ ,,	১৬৪৯০১ ,,	,, ।০
থান কাপড়	৪৮৭০২৩ ,,	৮৫৫৭৫ ,,	,, ৵৯ পাই
মলমল	৩১৪৭১৩ ,,	৪০৬২৬ ,,	,, ৵২ পাই
ছিট (Prints, Chintz)	৩১২৩২১১১৩ ,,	৫৫২০০৩৮ ,,	,, ৵৭ পাই
সার্টের কাপড়	৩৩০৫৩১৯৯ ,,	৪৫৪৫৯৩৩ ,,	,, ৵২ পাই
অন্যান্য কাপড়	২৮৪৯৩২৭৬ ,,	৭৪১৫১৯৭ ,,	,, ।২ পাই
রুমাল প্রভৃতি	২৪৩৩৯০৫ খণ্ড	১১৪৭৫৯৫ ,,	

পূর্ব্ব অঙ্কপাত হইতে দেখা যায় যে, প্রতি বৎসর কলিকাতায় ৩০লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের রঞ্জিত সূত্র, প্রায় আড়াই কোটি টাকা মূল্যের সাদা বস্ত্রাদি, প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের রঞ্জিত বস্ত্রাদি এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের ছিট্ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে যদি কেহ একটি রঞ্জনশালা স্থাপন পূর্ব্বক সূতা ও বস্ত্রাদি বিদেশজাত ঐ সমস্ত দ্রব্যের ন্যায় সুন্দররূপে রঞ্জিত করিয়া বিদেশী দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা কম মূল্যে বা সমান মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যবসায়ের যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃত পক্ষে রঞ্জিত সূত্র এবং বস্ত্রাদি অরঞ্জিত সূত্র এবং বস্ত্রাদি অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় কিনা—অর্থাৎ বস্ত্ররঞ্জন ব্যবসা লাভজনক কিনা, অথবা উক্ত প্রক্রিয়ায় কোনও লাভ না থাকিলেও অধিক পরিমাণ মাল কাটতি হইবার জন্যই বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইয়া থাকে।

রঞ্জিত ও অরঞ্জিত সূত্রের মূল্যের তুলনা—

নিম্নে রঞ্জিত এবং অরঞ্জিত সূত্রের মূল্যতালিকা দেওয়া গেল। পূর্ব্বোল্লিখিত ভারতের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের বাৎসরিক বিবরণী হইতে এই মূল্য তালিকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

সূত্রের নম্বর	অরঞ্জিত সূত্রের মূল্য (প্রতি পাউণ্ড)	রঞ্জিত সূত্রের মূল্য (প্রতি পাউণ্ড)
১—১০	॥৩ পাই	গড়ে ॥৵১০ পাই
১১—১৫	।৵১ পাই	
১৬—২০	॥৴০	
২১—২৫	॥৩ পাই	॥৵৫ ,,
২৫—৩০	॥৵৪ ,,	॥৵৬ ,,
৩১—৪০	॥৵১০ ,,	৸০
৪১—৫০	৸২	৸২ ,,
৫০ ঊর্দ্ধ	১৵৭ ,,	[illegible] ,,

এই মূল্যতালিকা হইতে দেখা যায় যে রঞ্জিত সূতার মূল্য অরঞ্জিত সূতার মূল্য অপেক্ষা গড়ে প্রতি পাউণ্ডে প্রায় ৵৬ অধিক। মিঃ কামিংএর * মতে এদেশে সূতা রঞ্জিত করিতে পারিলে প্রতি পাউণ্ডে (অর্দ্ধসের) গড়ে ৵০ আনা লাভ করা যায়। অন্যান্য প্রকার রঞ্জিত সূতা অপেক্ষা পাকা লাল সূতার (Turkey red) মূল্য অনেক অধিক। ১৯০৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর কেপিটাল (Capital) পত্রিকা হইতে অরঞ্জিত সূতা এবং পাকা লাল সূতার মূল্যতালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

অরঞ্জিত সূত্র ৪০ (Banner Mill) প্রতি পাউণ্ড ।৴০ আনা হইতে ।৵০ আনা।

পাকা লাল সূত্র ,, (Wilkinson) প্রতি পাউণ্ড ।৴০ আনা হইতে ।৶০ আনা।

সাধারণতঃ ৪০ এর উপরে পাকা লাল সূত্র বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। কাজেই পূর্ব্বোক্ত মূল্যের হার হইতে দেখা যায় যে সাদা সূত্রকে পাকা লালবর্ণে রঞ্জিত করিলে প্রতি পাউণ্ডে ৵০ হইতে ॥৴০ পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে।

রঞ্জিত ও অরঞ্জিত বস্ত্রাদির মূল্যের তুলনা—

কলিকাতার কোনও কাপড়ের কলের মূল্যতালিকা হইতে বিভিন্ন প্রকারের সাদা এবং রঞ্জিত ড্রিলের (Drill) যে মূল্য সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ড্রিল—

	প্রস্থ	প্রতিগজের মূল্য
,,	২৮½ ইঞ্চি	।৵০
১নং ,,	২৮½ ,,	।৴৯ পাই
২নং ,,	২৮½ ,,	।৴০
৩নং ,,	২৮½ ,,	।৩ পাই

ধোলাই ড্রিল লইতে হইলে প্রতি গজে ৵৬ অধিক পড়ে।

খ। পাকা খাকি ড্রিল (উৎকৃষ্ট)

	প্রস্থ	প্রতিগজের মূল্য
৮৮৮নং (millerained)	২৮ ,,	৸৵০
Warrington	২৭ ,,	॥৴৬ পাই
Kitchener	২৮ ,,	॥০
Medium	২৭ ,,	॥০

* J. G. Cumming "Review of the Indutsrial Position and Prospects in Bengal in 1908".

গ। খাকী (সাধারণ)

উৎকৃষ্ট	২৭ ইঞ্চি	।৶৬ পাই
১নং	২৭ ,,	।৶৩ ,,
২নং	২৭ ,,	।৵৬ ,,
৩নং	২৭ ,,	।/৯ ,,

ঘ। অন্যান্য রঙের ড্রিল

সবুজ	২৭ ,,	।৶৯ ,,
লাল	২৭ ,,	॥৩ ,,
বিবিধ	২৭ ,,	।৶৩ ,,

পূর্ব্বোক্ত মূল্য তালিকা হইতে দেখা যায় যে রঞ্জিত ড্রিলের মূল্য সাদা ড্রিলের মূল্য অপেক্ষা প্রতি গজ অন্ততঃ ৶০ আনা অধিক।

এস্থলে টুইলের (Twill) মূল্যও উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

সাদা টুইল	প্রস্থ ৩০ ইঞ্চি	মূল্য প্রতিগজ ।০
পাকা লাল টুইল	,, ২৯ ,,	,, ॥০

পাকা লাল রং (Turkey red) করায় প্রতিগজ টুইলের মূল্য ।০ আনা বাড়িয়াছে।

যে দুইটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে সূত্র বা বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিলে তাহার মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

বস্ত্রাদি প্রস্তুতের পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহা কলপ করা হয় পরে মসৃণ করিয়া ছাপ দিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। যদি ঐরূপ বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া রঞ্জন করিতে হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াসমূহে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা বৃথা নষ্ট হইবে। কারণ রঞ্জনক্রিয়ার পর পুনরায় উহা মসৃণ করিয়া নম্বরাদি ছাপ দিতে হইবে। কাজেই রঞ্জনশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া রঞ্জনকার্য্যের ব্যবসা করিতে হইলে কোনও কাপড়ের কলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যেন তাহারা বস্ত্রাদি প্রস্তুতের পরই রঞ্জনশালায় পাঠাইয়া দেন; ঐরূপ করিলে প্রথমোক্ত খরচটা সংক্ষেপ হইয়া যাইবে।

সাধারণ রঞ্জনকার্য্যের জন্য একটি রঞ্জনশালা স্থাপন করিতে হইলে নিম্নলিখিত কল এবং সরঞ্জামাদির প্রয়োজন :—

ক। কারখানা :—

১। দোচালা লম্বা ১ খানা টিনের ঘর (Dye-ing house).

২। দোচালা টিনের ছোট কলঘর (Engine house.)

৩। একচালা টিনের লম্বা অপ্রশস্ত ঘর (Dyeing shed.)

৪। ছোট খোলা ময়দান।

খ। কল ও সরঞ্জামাদি :—

১। মধ্যম রকমের একটী বয়লার (Six horse power)

২। ৬´×৪´×৩´, ৯´×২½´×২´ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রমাণের, উত্তপ্ত করিবার জন্য বাষ্প নল যুক্ত ৬।৭টী চতুষ্কোণ কাঠের গামলা।

৩। ৫ ফিট লম্বা ৩½ ফিট প্রশস্ত, বাষ্পদ্বারা উত্তপ্ত করিবার একটী মোটা চুঙ্গি (Steaming Cylinder.)

৪। ৪২ ইঞ্চি প্রস্ত বস্ত্র রঞ্জিত করিবার উপযোগী তিনটী পাত্র (Dyeing Jigger.)

৫। রঞ্জিত বস্ত্রাদির কলপ করিবার এবং ইস্ত্রী করিবার যন্ত্র একটী।

৬। রঞ্জিত বস্ত্রাদি শুকাইবার যন্ত্র একটী।

৭। যন্ত্রগুলি চালাইবার জন্য একটী ছোট কল।

৮। পূর্ব্বোল্লিখিত গামলায় জল তুলিবার জন্য একটী ছোট দমকল (Pump).

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই সমস্ত যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া একটী রঞ্জনশালা প্রতিষ্ঠা করিতে ৫০০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধে কোনও মতে লাগিতে পারে না।

পূর্ব্বোল্লিখিত যন্ত্রাদি ১৩০ জন লোকের সাহায্যে দৈনিক, কোনও সাধারণ রঞ্জন উপকরণ simple direct dye) দ্বারা ২৫০ পাউণ্ড সূতা এবং ১৫০ পাউণ্ড ওজনের

বস্ত্র, অথবা পাকা লালবর্ণে (Turkey red) ২০০ পাউণ্ড সূত্র রঞ্জিত করা যায়। প্রথমোক্ত সাধারণ রঞ্জনকার্য্যের জন্য বিশেষ কোনও রাসায়নিক উপাদানের প্রয়োজন হয় না। রঞ্জনের পূর্ব্বে বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার জন্য বস্ত্রের ওজনের উপর শতকরা ৫ ভাগ সোডা বা সর্জ্জিকাক্ষার (Sodium carbonate) এবং রঞ্জনের জন্য ঊর্দ্ধসংসার বস্ত্রের ওজনের উপর শতকরা ৩ ভাগ রঞ্জন উপকরণ (dye stuff) এবং ১০ ভাগ গ্লবার লবণ (Glauber's salt) লাগিবে মোটামুটি ধরা যাইতে পারে। এই হিসাবে একটি রঞ্জনশালার বাৎসরিক আনুমানিক ব্যয় ও আয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

ব্যয় :—

রাসায়নিক দ্রব্যাদি (chemicals)

২ টন সোডা (নিকৃষ্ট) প্রতি হন্দর ১১॥ হিঃ	৪৬০৲
২৪ হন্দর রঞ্জন উপকরণ (dye stuff) ১২০ হন্দর হিসাব	২০০০৲
৪ টন গ্লবার লবন (Glauber's salt) ১০ হন্দর হিঃ	৮০০৲
ইন্ধন মাসিক ৭৫৲ হিসাবে	৯০০৲
মজুরি মাসিক ৪০০৲ হিসাবে	৪৮০০৲
শতকরা ১০৲ হিসাবে ৫০০০০৲ টাকার উপর বাৎসরিক সুদ	৫০০০৲
বাৎসরিক মোট আনুমানিক ব্যয়	১৪৪৮০৲

আয় :—

দৈনিক ২৫০ পাউণ্ড সূত্র রঞ্জিত হইলে, ছুটি প্রভৃতি বাবদ ৬৫ দিন বাদ দিয়া, বৎসরে মোট ৩০৪ দিন রঞ্জনশালায় নিয়মিত কাজ চলিবে। এই হিসাব ধরিলে বৎসরে ২৫০ × ৩০০ পাউণ্ড সূত্র রঞ্জিত হইবে এবং প্রতি পাউণ্ডে /১০ হিসাবে লাভ ধরিলে, মোট লাভ — ৭০৩০৲

ঐরূপ, ১৫০ × ৩০০ পাউণ্ড বস্ত্রে প্রতি পাউণ্ডে ।৵০ লাভ ধরিলে মোট লাভ — ১৬৮৭৫৲

বাৎসরিক মোট আনুমানিক আয়	২৩,৯০৫৲
" " " ব্যয়	১৪৪৮০৲
বাৎসরিক মোট আনুমানিক লাভ	৯০৬৫৲

পাকা লাল রং করিতে হইলে অতিরিক্ত কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে। জর্ম্মেনির কোনও বিখ্যাত রঞ্জন উপকরণ প্রস্তুত কারক * মঞ্জিষ্ঠা (Alizarine) দ্বারা পাকা লাল বর্ণে রঞ্জিত করিতে হইলে যে যে রাসায়নিক উপাদানের ফর্দ্দ ও তাহাদের পরিমাণ, এবং রঞ্জন কার্য্য পরিচালনপ্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসারে হিসাবে উক্ত রূপ ব্যবসায়ের বাৎসরিক আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। রাসায়নিক উপাদান সমূহের মূল্য কোনও বিখ্যাত সংবাদপত্র হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। † অবশ্য ভারতবর্ষে রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের মূল্য এই হিসাবোক্ত মূল্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইবে, পক্ষান্তরে এদেশে তৈল সমূহের মূল্য তালিকাভুক্ত মূল্যের হার অপেক্ষা অনেক কম হইবে।

আনুমানিক বাৎসরিক ব্যয়—

রাসায়নিক দ্রব্যাদি (chemicals)

সাজিমাটি (soda ash) ২৬ হন্দর প্রতি টন ৬১৫ হিসাবে	৮৩৲
রেড়ির তৈল (Castor oil) ৭৫ হন্দর প্রতি টন ৩৬০৲ হিসাবে	১৩৫০৲
Sulphate of Alumina ১১২ হন্দর প্রতি টন ৭৮৸০ হিসাবে	৪৮০৲
সর্জ্জিকাক্ষার বা সোডা (Sodium Carbonate) ২৪ হন্দর প্রতি টন ১১২॥০ হি	১০৫৲
মঞ্জিষ্ঠা (Alizarine) শতকরা ২০ ভাগ হিঃ ৫৪০০ পাউণ্ড প্রতি পাউণ্ড ।৵০ হিঃ	২৩৬২৲
সাবান ২১ হন্দর প্রতিহন্দর ১০৸০ হি	৩২৯৲
খড়িমাটি (chalk) ৩৭ হন্দর প্রতি টন ২৪৲ টাকা হিঃ	৮৪৲
তিষির তৈল ( ) ৬১ হন্দর প্রতিটন ৭৫০৲ হিঃ	২৪৪৲
ইন্ধন	৯০০৲

* "Badische Aniline and Soda Fabrik" Company.

† Journal of the Society of Dyers and Colourists dated 21st oct. 1908.

মজুর	৪৮০০৲
শতকরা ১০৲ হিসাবে ৫০০০০৲ উপর বাৎসরিক সুদ	৫০০০৲
আনুমানিক বাৎসরিক ব্যয়	১৫৬৯২৲

মোট আয়—

দৈনিক ২০০ পাউণ্ড হিসাবে ৩০০×২০০ পাউণ্ড সূত্র বাৎসরিক রঞ্জিত হইলে প্রতি পাউণ্ডে ।৶১০ হিসাবে মোট

আনুমানিক বাৎসরিক লাভ	২৮১২৫৲
আনুমানিক বাৎসরিক ব্যয়	১৫৭৯২৲
আনুমানিক বাৎসরিক লাভ	১২৩৩৩৲

পূর্ব্বে যে দুইটি হিসাব দেওয়া গেল তাহা হইতে দেখা যায় যে ৫০০০০৲ ব্যয় করিয়া একটি মধ্যম রকমের রঞ্জনশালা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ব্যবসার চালাইলে, ঐ টাকার উপর শতকরা বাৎসরিক শতকরা ১০৲ হিসাবে সুদ ও অন্যান্য সমস্ত খরচ চালাইয়া বাৎসরিক অন্তত ১০।১২ হাজার টাকা লাভ হইতে পারে।

মধ্যম রকমের রঞ্জনশালায় নানাপ্রকার রঞ্জনকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া, বিশিষ্ট কয়েক প্রকার রঞ্জনের দিকে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। কলিকাতার বাজারে বস্ত্রের পাড় প্রস্তুতের জন্য পাকা লাল ও নীল সূত্র এবং পুলিশ, চৌকিদার প্রভৃতির পোষাক প্রস্তুতের জন্য নীল এবং খাকি রং এর বস্ত্রের সমধিক কাটতি হইবে। রঙ্গিন বুটাদার কাপড় এবং নানাপ্রকার ছাপ দেওয়া (Calico printed) বস্ত্র ও কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণ বিক্রিত হইয়া থাকে।

ব্যবসায়ে আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি জানিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

১। আমাদের দেশে কি কি প্রকার রঞ্জিত বস্ত্র এবং কাপড়ের পাড়ের জন্য কি কি প্রকার রঞ্জিত সূত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২। কোন প্রকারের রঞ্জিত বস্ত্র এবং সূত্র কি পরিমাণে কাটতি হইয়া থাকে। ৩। বিভিন্ন প্রকারের রঞ্জিত বস্ত্র এবং সূত্র কি প্রকার মূল্যে বিক্রিত হইয়া থাকে।

চেষ্টা করিলে গভর্ণমেণ্টের কোন কোন বিভাগ হইতে* এ সমুদায় তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। জাপানে পূর্ব্বোক্তরূপ তথ্যসংগ্রহের জন্য গভর্ণমেণ্টের একটি বিশেষ বিভাগ আছে। এবং ব্যবসায়ীগণ ঐ বিভাগ হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন। আমাদের দেশে ঐরূপ কোনও সুবিধা না থাকিলেও ব্যবসায়ীদিগকে যে প্রকারেই হউক এ সমস্ত সংবাদ পূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে মূল্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, স্থায়িত্ব হিসাবে দেশীয় রঞ্জন উপকরণ সমূহ প্রতিযোগিতায় কৃত্রিম রঞ্জন উপকরণ (artificial dye-stuffs) সমূহের সমকক্ষ কোনও মতেই হইতে পারে না। অথচ সুদূর ভবিষ্যতেও যে এ দেশে কৃত্রিম রঞ্জন উপকরণসমূহ প্রস্তুত হইবে সেরূপ আশা নাই। কাজেই বাধ্য হইয়া রঞ্জন উপকরণসমূহ জার্ম্মাণী হইতে ক্রয় করিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত রূপ একটি রঞ্জনশালা পরিচালনা করিতে হইলে কি প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন সে বিষয়ে ২। ১ টি কথা এস্থলে আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বোম্বাইতে আধুনিক প্রণালীতে রঞ্জন-প্রণালী কতকটা শিক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথমে এদেশে বিজ্ঞান পূর্ব্ব, এবং "রঞ্জন প্রণালী" সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু শিক্ষালাভ করিয়া ইউরূপে যাইয়া লিড্‌স (Leeds) মেনচেষ্টর (Manchester) বা ঐরূপ কোনও স্থানে কোনও প্রয়োগমূলক শিল্পবিদ্যালয়ে (Technical College) ভর্ত্তি হইয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পরে কোনও রঞ্জনশালায় ভর্ত্তি হইয়া কি প্রকারে ব্যবসায় চালাইতে হইবে তাহা শিক্ষা করিয়া আসা উচিত।

সূত্র বা বস্ত্র রঞ্জন করিতে কত রঞ্জন উপকরণ, ইন্ধন, মজুর ইত্যাদির দরকার সে বিষয়ে রঞ্জন-ব্যবসা সংশ্লিষ্ট যে কেহই একটা মোটামুট ধারণা দিতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণির লোকেরা ঐ রকমের কোনও হিসাব অপরের

* Commercial Intelligence Department: Economic Section of the Indian Museum.

নিকট দিতে সাধারণতঃ স্বীকার করে না। গভর্ণমেন্টের সাহায্যে যে সমুদায় জেলে (Jail) রঞ্জন কার্য্য হইয়া থাকে, ঐরূপ কোনও স্থান হইতে এ বিষয়ে অনেকটা সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

রঞ্জনশালা পরিচালনা সম্বন্ধে আমার কোনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই; কাজেই পূর্ব্বে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে ভুল ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে। সাধারণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, এ বিষয়টি যথোচিত আলোচিত হয় ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার।

বাউল ঠাকুর রামদাস

মহেশ্বরদী পরগণায় মেঘনা নদীর তীরে বহুবৃক্ষসমাচ্ছন্ন শান্ত-শীতল ছায়া-মণ্ডিত একটি বাউলের আখরা বা আশ্রম আছে। প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে রামদাস বাউল নামক এক জন সিদ্ধ পুরুষ বহু শিষ্য সহ বাস করিতেন। তিনি কোথা হইতে এই স্থানে আগমন করেন কেহ বলিতে পারে না। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সেই তিনি ঐ স্থানে আগমন করেন, এবং চতুর্দ্দিক হইতে শিষ্যবর্গ আসিয়া এই স্থানে উপস্থিত হয়।

বাউল রামদাস অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে কেহই তাঁহার ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারে না। বিক্রমপুরের সুধারাম বাউলের শিষ্য সম্প্রদায় ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের অন্যত্র কোথাও এ প্রকার বাউল সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয় না।

বাউল রামদাস একজন খুব উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন, তাহা তাঁহার জনশ্রুতি-সজীব ঘটনাবলির কথা শ্রবণ করিলেই বোঝা যায়। বাউল রামদাসকে তাঁহার শিষ্য সেবকেরা বাউল ঠাকুর বলিয়া থাকে এবং ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে ঠাকুরের স্থাপিত পীঠের পূজা অর্চ্চনা করে। প্রতিবৎসর উৎসবের সময় পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক ভক্ত শিষ্য সমাগত হইয়া গুরুর সমাধি পীঠ ও গুরুর স্থাপিত অন্যান্য পীঠের পূজা অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে।

বাউল ঠাকুরের স্থাপিত পীঠটী দেখিলেই মনে হয় তিনি হিন্দু ও মুসলমান আদর্শ সম্মিলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পীঠস্থানে গাজীর নিশানের মত লৌহ ও পিত্তলযুক্ত কয়েকটী ধ্বজা প্রোথিত আছে, ইহার পার্শ্বে শিবলিঙ্গ এবং ঘট ইত্যাদিও স্থাপিত আছে। শুনা যায় বাউল ঠাকুর পূর্ব্বে অনেক গুলি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একে একে সমস্ত মূর্ত্তিগুলিই নদীজলে বিসর্জ্জন করিয়া যান; একটী মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেটীর নাম জগবন্ধুর মূর্ত্তি। ইহা হইতে বুঝা যায় তিনি পূর্ব্বে প্রতিমারূপেরই সাধনা করিয়াছিলেন, তৎপর উচ্চাঙ্গ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ই বাউলধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্যোরই কয়েকজন বাউল ছিলেন এবং সেই সময় হইতেই বাউল ধর্ম্মের বিস্তার লাভ ঘটে; ইহা বাউল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। তাহারা বলিয়া থাকে বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তরঙ্গ এবং পূর্ণ অবস্থা বাউল ধর্ম্মে বিদ্যমান। বর্ত্তমান বাউল সম্প্রদায়ের অনেকেই তাহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত নহে। বর্ত্তমান বাউল সম্প্রদায় গুরু নাম ভজনই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে এবং জীবতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়।

মহেশ্বরদীর বাউল সম্প্রদায়ের একটু বিশেষত্ব আছে, তাহারা সময়োপযোগী গান গাহিয়া পল্লীবাসীর মনোরঞ্জন দ্বারা ভিক্ষা গ্রহণ করে। স্বদেশীর সময় স্বদেশী গান দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষের গান, ভূমিকম্পের সময় ভূমিকম্পের গান, ও ঝড়ের সময় ঝড়ের গান গাহিয়া থাকে। এমন কি বর্ত্তমানে সেটলমেন্টের সময় সেটলমেন্টের গানও বাদ যায় নাই। ভবিষ্যতে একজন বাউল কবির উৎকৃষ্ট কয়েকটী গান পাঠকবর্গকে উপহার দিবার বাসনা রহিল।

বাউল ঠাকুরের সমসাময়িক একজন লোকও বাউল পাড়ায় নাই, কাজেই তৎসম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব এক প্রকার অন্ধকারাচ্ছন্ন। সৌভাগ্যক্রমে এ বৎসর আমি আখরায় বাউল ঠাকুরের উৎসবের সময় উপস্থিত ছিলাম, এবং একজন ভৈরবী ধরণের বৈরাগিনী বা বাউলিনী প্রায় ৪০ ৫০ বৎসর পরে এই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমি দুএকবার আখরায় যাইয়া বাউল রামদাস ঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে জানিতে কৌতূহলী হইয়াছিলাম, কাজেই এবার যাইতেই একজন প্রাজ্ঞ বাউল আমাকে সেই জটাবিভূষিতা বৃদ্ধা ভৈরবীর নিকট লইয়া গেল। আমি ঠাকুরের জীবন সম্বন্ধে সেই ভৈরবীকে অনেক প্রশ্ন করিলাম, তিনি সংক্ষেপে ঠাকুরের জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

ভৈরবী বলিলেন, আমি তখন ছোট,বাউল ঠাকুর আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। কত সময় কত আদর করিতেন। যতই বেলা হইতে থাকিত ততই তাহার সেই তেজঃপুঞ্জ সুন্দর শরীরের কান্তি সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। অপরাহ্ণ আবার গুরুর দেহের বর্ণ অস্তগামী সূর্য্যের মতো লাল বর্ণ ধারণ করিত। সূর্য্য ডুবিয়া গেলেই তাহার দেহের বর্ণ ক্রমে মলিন হইয়া আসিত এবং গভীর রাত্রিতে তাহার দেহের বর্ণ সত্যই কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইত। আবার সূর্য্যোদয় হইলেই তাহার দেহ প্রভাত রবির মতো লাল টুকটুক দেখাইত। বাউলঠাকুরের কত রূপই যে দেখিলাম। তাহাকে কখনো দেখিয়াছি নধর যুবাপুরুষ কিছুক্ষণ পরেই স্থবির বৃদ্ধ, আবার কখনো প্রৌঢ় অবস্থা ধারণ করিতেন।

তিনি কখনো বলিতেন অমুক দেবতা আমার প্রতি বড় বক্র হইয়াছে, শীঘ্র গঙ্গার জাতের মেয়ে এসে আমার শরীর স্পর্শ করুক।

তখন সত্যই যেন তিনি অসুস্থ ভাব ধারণ করিতেন কে গঙ্গার জাতের মেয়ে কেহ জানিতেন না, তখন গুরুই বলিয়া দিত অমুকের মেয়েকে ডাক। আমিই গঙ্গার জাতের মেয়ে ছিলাম। আমি আসিয়া তাহার শরীর স্পর্শ করিলেই অত্যল্প ক্ষণের মধ্যেই তাহার শরীরের অসুস্থভাব বিদূরিত হইত। এই প্রকারে কখনো কালীর জাতের মেয়ে, কখনো ভগবতীর জাতের মেয়ে আসিয়া তাহার রোগ দূর করিত।

বাউল ঠাকুরের দুইখানি মাত্র আইরটের একখানি পুথি ছিল, ঠাকুর ঐ পুথিখানি লইয়া গভীর রাত্রিতে সাধনা করিতেন। বই খানিতে কি লেখা ছিল কেহ জানিত না। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই বইখানিও অন্তর্হিত হইয়াছে।

গুরু হয়তো কোন দিন মুখ ধুইতে বসিয়া বলিলেন ওরে তোরা কে আসিছ রে আরো বিশ জনের ভাত রান্না কর, বিক্রমপুর হইতে আমার শিষ্যেরা আসিতেছে। বিক্রমপুর হইতে আসিবার কোন খবরাখবর ছিল না।

রান্না বান্না শেষ হইতে অমনি ঘাটে শিষ্যদের নৌকা লাগিল, ঠিক বিশ জন শিষ্য উপস্থিত। এইভাবে পূর্ব্বেই তিনি সকল কথা বলিয়া দিতে পারিতেন।

আমার বয়স তখন ১২।১৩ বৎসর। আমার পিতা বিক্রমপুরের উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি হঠাৎ বিরাগী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া যান। অনেক অনুসন্ধানের পর সংবাদ পাওয়া গেল, তিনি বাউল ঠাকুরের আশ্রমে আছেন। মা এবং অনেক আত্মীয় স্বজনেরা বাবাকে এইস্থান হইতে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিল। তিনি সকলের পা ধরিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন না। অনেক সাধাসাধনায়ও পিতা গৃহে না ফিরিলে আত্মীয় স্বজনেরা চলিয়া গেলেন; মা সন্তানদিগকে লইয়া এই স্থানেই রহিলেন। পিতা যথারীতি বাউল ঠাকুরের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। এই স্থানেই আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম। আমার বাল্যকাল ১২।১৩ বৎসর পর্য্যন্ত আমি এখানেই কাটাইয়াছি।

পিতার মৃত্যুর পর মা আমাদের লইয়া বাড়ী গেলেন। আমাদের লইয়া সমাজে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। মা সমাজের সমাজের বড় সকলের সাধ্য সাধনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমাজে উঠিলেন। কেবল আমি তাহা হইতে বাদ পড়িলাম। পণ্ডিতেরা বলিলেন, মেয়েটী জন্ম বাউল, কাজেই আমার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ও সমাজে উঠিবার অধিকার নাই। পিতা বাউল দীক্ষা গ্রহণ করার পর জন্মগ্রহণ করায় আমি জন্ম বাউল হইলাম।

মা সর্ব্বদাই আমার জন্য ক্রন্দন করিতেন। আমি সমাজে উঠিতে পারিব না ও আমার বিবাহও হইবে না এই দুঃখ। অগত্যা মা সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাকে কলিকাতায় লেখা পড়া শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইলেন। আমি সেই স্থানে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মেয়ে ডাক্তারী স্কুলে ঢুকিলাম। কয়েক বৎসর পড়িয়া সেখানে মেম সাহেবের কাছে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিলাম। মেম সাহেব আমাকে চাকরী দিতে চাহিলেন, কিন্তু ইহার পর আমার কি রকম হইল বলিতে পারি না; হঠাৎ আমার বাউল ঠাকুরের মুখ মনে পড়িয়া গেল। সেই স্থান হইতে হঠাৎ উন্মাদের মতো বাহির হইয়া এই বেশে সারা দেশ ঘুরিলাম। কত সময় কত প্রলোভন আসিয়া আমার মনের মধ্যে উঁকি মারিত, কিন্তু যেই বাউল ঠাকুরের মুখখানি মনে আসিত, কোথায় কে অন্তর্হিত হইত। ঠাকুরই সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ঠাকুরের আরো কত কথা আছে বলিলে শেষ করা যায় না।

এই বৃদ্ধার সমস্ত কথা হইতে মনে হইল বাউল ঠাকুর একজন অলৌকিক মহাপুরুষ ছিলেন।

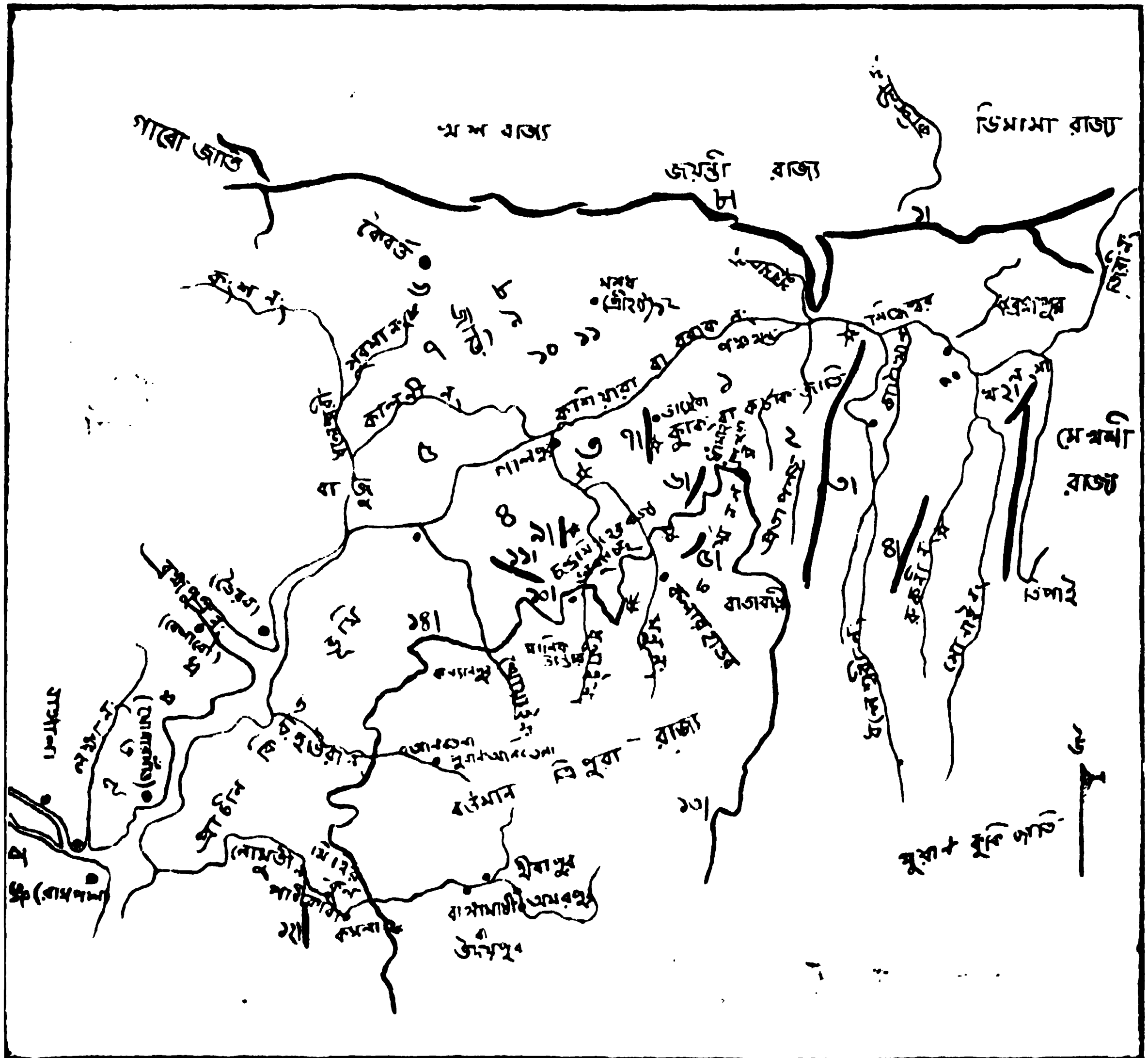
তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মের কথা কেহই বড় অবগত নহে। এই বৃদ্ধা যখন প্রাপ্তবয়স তখন ঠাকুর আর জীবিত ছিলেন না।

ঢাকার ইতিহাস লেখক যতীন্দ্র বাবুকে আমরা অনুরোধ করি তিনি যেন স্বীয় পুস্তকে এই প্রকার মহাপুরুষগণের স্মৃতি ও ঘটনা, যতই ক্ষুদ্র হউক না, স্থান দিতে সচেষ্ট হন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

ভবিষ্যতে মহেশ্বরদীর আরো কয়েকটী ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।





বর্ত্তমান সংখ্যার খাজে ওসমান ও ওসমান খাঁ

এবং

প্রতিভার ১৩১৯ সনের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত "চন্দ্রসিংহ" প্রবন্ধ এই মানচিত্র যোগে সহজ বোধ্য হইবে।

প্রতিভা

৩য় বর্ষ — জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ — ২য় সংখ্যা

বঙ্গের ওসমান খাঁ

ও

শ্রীহট্টের খাজে ওসমান

(প্রথমাংশ)

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত—২১শে বৈশাখ, ১৩২০)

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় ওসমান খাঁ বঙ্গীয় উপন্যাস-পাঠকবর্গের নিকট সুপরিচিত। এই প্রবন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ অনুসরণ করিয়া ওসমানের জীবনী লিখিত হইয়াছে। উপন্যাসের নায়ক ওসমানের চিত্র এবং বঙ্গের ইতিহাসের পাঠান বীর ওসমানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। চির পরিচিত চিত্রের ভিন্ন ছবি দেখিয়া উপন্যাস-পাঠক ক্ষোভিত হইবেন না।

ঐতিহাসিক ওসমান খাঁর বিষয় জানিতে হইলে নিম্নোক্ত কয়েকখানা * গ্রন্থ অতীব মূল্যবান—

১। "তোজক এ জাহাগীরী", বা সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী—জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক।

২। "মখ্জানে আফগানী—এই গ্রন্থে মোগল হস্তে পাঠানের পরাভব-কাহিনী বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রায় সমসাময়িক কালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৩। "একবাল্ নামা এ জাহাগীরী"—এই গ্রন্থ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের বক্সী মোতামদ্খান কর্ত্তৃক লিখিত। অধিকাংশ স্থলেই ইনি জাহাঙ্গীরের বর্ণনা অনুসরণ করিয়াছেন; সুতরাং যে যে স্থলে তিনি জাহাঙ্গীরের বর্ণনার ব্যতিক্রম করিয়াছেন কেবল মাত্র তাহাই উল্লিখিত হইবে।

ওসমানের সমসাময়িক দেশের অবস্থা সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিক-প্রদত্ত বিবরণ আলোচনার পূর্ব্বে তৎসমসাময়িক বঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা কার্য্যকরী হইবে।

তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ভূম্যধিকারিগণের প্রাধান্য ও পরস্পর বিরোধ, পর্ত্তুগীজ জলদস্যু এবং মগের আক্রমণ এবং পাঠানদিগের উপদ্রবে পূর্ব্ববঙ্গ দিন দিন শক্তিহীন ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিল। দেশময় অরাজকতা এবং

* পারস্য ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা ও তৎসমুদয়ের ভাব পরিগ্রহ করা, একত্বভয়ই সহজসাধ্য নহে। যাহা হউক, ঢাকার ইতিহাসজ্ঞ খান্ বাহাদুর ছইয়দ্ আলওয়াদ্ হোসেন সাহেবের আনুকূল্যে আমার কার্য্য অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়াছে।

দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার-স্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছিল।

সম্রাট আকবরের পরাক্রমে পাঠানগণ রাজ্যচ্যুত হইলেও তিনি ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে অসমর্থ হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও পাঠান দলপতি ওসমান খাঁর পরাক্রমে সুবা বাঙ্গালা সময় সময় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত! এক্ষণে আমরা মুসলমান ঐতিহাসিকগণের প্রদত্ত বিবরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মখ্‌জানে আফগানী——পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে আমরা সর্ব্বাগ্রেই মখ্‌জানে আফগানী নামক পুস্তকে প্রদত্ত বিবরণ উপস্থাপিত করিব; কারণ এই গ্রন্থেই বঙ্গে পাঠানদিগের ভাগ্য-বিপর্য্যয়-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে প্রদত্ত বিবরণের মর্ম্ম প্রদত্ত হইল—

সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি খান জাহান কর্ত্তৃক বাঙ্গালার শেষ পাঠান নৃপতি দায়ুদ কর্‌রাণী পাটনায় পরাজিত হন। পাঠানদিগের সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা সুদূরপরাহত হয়। এই সময়ে তাহাদের অধিকৃত ভূমি মাত্র ঘোড়াঘাট্ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

দায়ুদের বংশে উপযুক্ত নেতার অভাবে কতলু খাঁ দলপতি মনোনীত হন। কতলু খাঁ রাজা মানসিংহের সহিত সময় সময় যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর শাসন করিয়া তিনি নছিব খাঁ লোহানী, লোদী খাঁ এবং জামাল খাঁ নামক তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। *

অতঃপর ইসা খাঁ নামধের এক জন ক্ষমতাপন্ন আফ্‌গান ওমরাহকে পাঠান সৈন্যগণ মসনদে স্থাপন করে।

খাঁজে সুলেমান, খাঁজে ওসমান, খাঁজে ওয়ালি, খাঁজে মাল্‌হি এবং খাঁজে ইব্রাহিম নামে ইসাখাঁর পাঁচ পুত্র জন্মে। ইসাখাঁর পরলোক প্রাপ্তির পর খাঁজে সুলেমান এবং তৎপর খাঁজে ওসমান পাঠানদিগের নেতা হন। ওসমান মসনদে উপবেশন করিয়াই বুদ্ধি বিচক্ষণতা প্রভাবে আপন দলের পুষ্টি সাধন করিতে থাকেন। তিনি মানসিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক জায়গীর ও অন্যান্য অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হন, এবং কিয়ৎ কালের জন্য তাঁহার নিকট অবস্থান করেন, কিছুকাল গত হইলে বিদ্রোহী হইয়া মানসিংহকে রাজমহল দুর্গে তিন মাস কাল আবদ্ধ রাখেন। অতঃপর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি "কোহিস্থানে ঢাকা" বা ঢাকার পার্ব্বত্য অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন। এস্থলে তাহার আয় ৫।৬ লক্ষ টাকার অধিক ছিল না।

পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করার পর ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সেখ ইসলাম খাঁ তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য ওসমানের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন, * কিন্তু ওসমান অনভিপ্রায় জানাইয়া বাহক সঙ্গে কিছু সুগন্ধি পত্র, রবাব নামক একটি বাদ্যযন্ত্র এবং কয়েকটি অকর্ম্মণ্য হস্তী উপঢৌকন প্রেরণ করেন! মর্ম্ম ইসলাম খাঁ কেবল আমোদ উপভোগ করিতে জানেন যুদ্ধের বিষয় কি বুঝিবেন!

অচিরেই ওসমানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইল। ১০২১ হিজরী অব্দের ৯ই মহরম ওসমানের দুর্গের নিকট তাঁহার সহিত ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধস্থল ঢাকা হইতে শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। পাঠানদিগেরই জয়ী

* ষ্টুয়ার্ট অনুসারে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে কতলু খাঁর এবং ১৫৯১-২ খৃষ্টাব্দে ইসা খাঁর মৃত্যু ঘটে।

* ষ্টুয়াট প্রদত্ত বিবরণের মর্ম্ম—ওসমান কতলু খাঁর পুত্র। তিনি বিংশতি সহস্র পাঠান সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। ইসলাম খাঁর দূত ওসমানকে বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন যে, বহুকাল রাজত্ব করার পর অদৃষ্ট বশেই পাঠানদিগের অধঃপতন ঘটিয়াছে, সুতরাং ধীরভাবে অদৃষ্ট মানিয়া চলাই যুক্তিসঙ্গত; বিশেষতঃ মোগল-পাঠান উভয়েই ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং মোগল প্রাধান্য কখনই পাঠানদিগের পক্ষে অসহনীয় হইবে না। কিন্তু ওসমান যুদ্ধের অসি লাঙ্গল ফলকে পরিণত করিয়া নির্ব্বিবাদে বাস করা সমীচীন বোধ করিলেন না। সুবর্ণরেখা-তীরে তিনি নিহত হন। যুদ্ধে ওসমানের গজসৈন্য বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল।

হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল ; কিন্তু ওসমান দৈবক্রমে আহত হন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে, ৪০ বৎসর বয়সে ১৭ বৎসর শাসন করার পর ওসমানের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পরলোক গমনের পর মোগলগণ তাঁহার মৃত দেহ গোড়স্থান হইতে উঠাইয়া মস্তক কাটিয়া লন এবং উহা আগ্রায় প্রেরণ করেন। যুদ্ধান্তে সুজায়াৎ খাঁ ২৬ দিবসের মধ্যেই ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ওসমান সম্বন্ধে তুজাক এ জাহাঁগীরী প্রদত্ত বিবরণের মর্ম্ম †

১০২১ হিজরী অব্দের ২৯ মহরম (১লা এপ্রিল ১৬১২খৃঃ) ওসমানের বিজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জাহাঙ্গীর তৎপ্রণীত "আত্ম জীবনী"তে, ওসমানের উপদ্রব হইতে সুবা বাঙ্গালা মুক্ত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক পাঠানদিগের পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। পাঠানদিগের সময়ে বাঙ্গালায় ২০ সহস্র অশ্বারোহী, ১ লক্ষ পদাতিক ১ সহস্র গজারোহী এবং ৪।৫ সহস্র রণতরী ছিল। সেনাপতি খান জাহান দায়ুদ কররাণীকে পরাস্ত করিয়া সুবা বাঙ্গালা মোগল সম্রাজ্য ভুক্ত করেন।

পাঠান দিগের মধ্যে কেহ কেহ দূরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানে কিছুকাল পর্য্যন্ত ক্ষমতা বিস্তারে প্রয়াস পান, কিন্তু পরাক্রমশালী মোগলগণ অল্পকাল মধ্যেই একে একে তাহাদিগকে ধৃত করতঃ উপযুক্ত দণ্ড বিধানে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

আকবর কর্ত্তৃক বঙ্গের শেষ পাঠান শাসনকর্ত্তা দায়ুদ কররাণী পরাজিত হইলে পর, খান জাহান, মুজাফর খাঁন, রাজা টোডারমল্ল, খান আজিম এবং সাবাজখান যথাক্রমে বঙ্গের সুবাদারের পদে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন।

অতঃপর ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে (৯৯৭ হিজরী অব্দে) রাজা মানসিংহ সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক বাঙ্গালার সুবাদারের-পদে নিযুক্ত হইয়া রাজমহলে আগমন করেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা হইতে আগ্রায় যাইতে আদিষ্ট হন।

ইহার পরে কুৎবুদ্দিন খাঁ এবং জাহাঙ্গীর কুলীখাঁ যথাক্রমে বাঙ্গালায় প্রেরিত হন। অতঃপর ইসলাম খাঁ। ইনি পরিণতবয়স্ক না হইলেও রাজভক্তি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। বিদ্রোহী ওসমান আফগানকে বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত করা ইসলামখাঁর কার্য্যাবলীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁহার আগমন কালেই বিদ্রোহী ওসমান বঙ্গের সীমান্ত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আকবরের সময়েও ওসমান সময় সময় মোগল সৈন্যের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হইত। কেহই তৎকালে তাহাকে দমন করিতে বা তাড়াইয়া দিতে পারে নাই। ইস্‌লাম খাঁ ঢাকা নগরীতে বাস স্থাপন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভূম্যধিকারী দিগকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াই বিদ্রোহী ওস্‌মান এবং তাহার অধিকৃত প্রদেশের দিকে এক দল সৈন্য পাঠাইতে মনস্থ করেন।

তিনি স্থির করিলেন যে, যদি ওসমান বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন তাহা হইলে ভালই, নচেৎ রাজ দ্রোহী দিগের ন্যায় তাহাকে উৎসন্ন করিতে হইবে। সুজায়াৎ খাঁ এই সময়ে ইসলামখাঁর সহিত মিলিত হইলেন এবং এই অভিযানের ভার তাঁহার উপরই পতিত হইল। যে সকল পদস্থ সৈনিক পুরুষ সুজায়াৎ খাঁর সহিত গমন করেন তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল—

১। বেশওয়ার খাঁ ২। ইফ্‌তিয়ার খাঁ ৩। সইয়দ্ আদম্ বারহা ৪। সেখ আচ্ছে ৫। মক্‌ওয়ারেব খাঁর ভাগিনেয় ৬। মুতামদ্ খাঁ ৭। মুয়াজ্জম্ খাঁ ৮। ইতিমাম্ খাঁ এবং আরও কয়েকজন।

মির্জ্জামুরাদের পুত্র মিরকাশেম এই অভিযানে কোষা-

† কিছুকাল পূর্ব্বেও তুজাক এ জাহাঁগীরী গ্রন্থ বঙ্গবাসীর নিকট সুপরিচিত ছিল না। মেজর প্রাইস্ কর্ত্তৃক অনূদিত সংস্করণের উপরেই অধিকাংশ পাঠকের নির্ভর করিতে হইত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, এই ইংরেজী সংস্করণ নির্ভরযোগ্য নহে সম্প্রতি রজার্স্ ও বেভারিজ নামক দুই মহাত্মা কর্ত্তৃক অনূদিত, রয়েল এসিয়াটীক সোসাইটী হইতে তুজাকের একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং জনৈক বঙ্গমহিলার সাধনা-কলে তুজাকের বঙ্গানুবাদও কিছুকাল হইল বঙ্গ সাহিত্যের একটি অভাব পূরণ করিয়াছে।

ধ্যক্ষ ও সংবাদ-লিখকরূপে গমন করেন। কয়েক জন ভূম্যধিকারীও পথপ্রদর্শনার্থে তাঁহাদের সহিত গমন করিয়া ছিলেন। ওসমানের দুর্গ এবং অধিকৃত ভূমির সমীপবর্ত্তী হইলে পর মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে বিদ্রোহাচরণ পরিত্যাগ করিয়া রাজভক্তি অবলম্বনের যৌক্তিকতা বুঝাইয়া দিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু এই শেষ চেষ্টাও বিফল হইল।

ওসমানের দুর্গের নিকটে একটি নালার সন্নিধানে কর্দ্দমাক্ত স্থানে মোগল পাঠানের ভীষণ যুদ্ধ হয়।

৯ ই মহরম্ (১৬১২ খৃষ্টাব্দ, ১১ই মার্চ্চ, রবিবার) উভয় দলই সমর-সাজে সজ্জিত হইল। মোগল সৈন্য দিগকে নালার সন্নিকটে সজ্জিত দেখিয়া ওসমান দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোগল সৈন্যের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া শিবির স্থাপন করিলেন।

অবিলম্বে মোগল-পাঠানে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ওসমান তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণোন্মত্ত গজপৎ নামক হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রেই অগ্রগামী মোগল সৈন্যদলের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই দলের নেতা সৈয়দ্ আদম বারহা এবং সেখ আচ্ছে রণক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত ইফ্তিয়ার খান সসৈন্যে এবং বাম পার্শ্বস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ কেশোয়ার খাঁ, দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণের পরাক্রমে ভূশায়ী হইলেন।

একমাত্র মোগল কেন্দ্র স্থানই পূর্ব্বাপর অবিচলিত ছিল। গজারূঢ় ওসমান অতঃপর এই স্থানে সুজায়াৎ খাঁকে আক্রমণ করিলেন। সুজায়াৎ খাঁ অশ্বসহ ভূপতিত হইয়া, "জাহাঙ্গীর সাহ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘন ঘন চীৎকার করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই উত্তেজিত মোগল সৈনিকগণের অসি-প্রহারে ওসমানের হস্তী জর্জ্জরিত হইল। ওসমান ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অপর একটি হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক পতাকা-বাহককে অশ্ব ও পতাকা সহিত ভূপাতিত করিলেন। মোগলগণ বহু কষ্টে ইহাকে মুক্ত করিয়া প্রাণ রক্ষা করে। দৈবযোগে এই সময়ে কোনও অজ্ঞাত সৈনিকের নিক্ষিপ্ত গোলা ওসমানের ললাট দেশ ভেদ করে। আহত হইয়াও তিনি দুই প্রহর কাল আপন সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করেন। ওসমানের অবস্থা ক্রমে সৈন্য-মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় পাঠান সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া শিবিরাভিমুখে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায়ও তাহারা তীর এবং বন্দুকের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে বিরত ছিল না। দিবাভাগে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা বৃথা মনে করিয়া নিশাযোগে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করাই তাহারা যুক্তিযুক্ত মনে করিল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইলে পর ওসমানের মৃত্যু ঘটে। এই অবস্থায় রাত্রির তৃতীয় প্রহরে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করাই স্থিরীকৃত হয়। মোগল সৈন্যগণও রজনী সমাগত দেখিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত থাকে। মৃতদেহের সৎকার, আহত সৈনিকগণের শুশ্রূষা এবং যুদ্ধজনিত শ্রমে তাহারা একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

সোমবার দিবস মওগাজেম খাঁর পুত্র আবদুছ্ ছলাম্ ৩ শত অশ্বারোহী এবং ৪ শত বন্দুকধারী (তুপ্চী) সৈন্যসহ যুদ্ধ স্থলে উপনীত হইলেন। পাঠানগণ নূতন সৈন্য দলের আগমন বার্ত্তায় আরও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মধ্যে পলায়ন করিবার বাসনাই প্রবল হইয়া উঠে।

নিশা-শেষে তাহারা দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার প্রয়াস পায়। মোগলেরাও সুবিধা বুঝিয়া তাহাদের অনুসরণ করে। ওসমানের ভ্রাতা ওয়ালি পলায়নের চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া সুজায়াৎ খাঁর নিকট আত্মসমর্পণের বাসনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক দূত প্রেরণ করেন; এই প্রস্তাবে সুজায়াৎ খাঁ স্বীকৃত হইলেন। ওয়ালি, ওসমানে পুত্র মমরেজ, তাহার জামাতৃবর্গ ও অপরাপর আত্মীয় কুটুম্বগণ, উনপঞ্চাশটি হস্তী ও বিবিধ উপঢৌকন সহ আত্মসমর্পণ করেন। বিজয়লাভের পর "এটার" ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অল্পসংখ্যক মোগল সৈন্য রাখিয়া আসিয়া ছিলেন। যুদ্ধাবসানের ২৬ দিবসের

মধ্যেই (৬ই সফর) বিজয়ী বীরগণ জাহাঙ্গীর নগরীতে (ঢাকায়) প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইরূপে, মোগল সামন্তগণ যে সকল স্থান ইতিপূর্ব্বে অধিকার করেন নাই তন্মধ্যে বহু স্থান ইসলাম খাঁ সুবা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করেন।

প্রত্যেক পদস্থ সৈনিকই নিজ নিজ কার্য্যের অনুরূপ অল্পবিস্তর পুরস্কৃত হন। ইসলাম খাঁ ৬০০০ সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন এবং সুজায়াৎ খাঁ রুস্তম জমান উপাধিতে ভূষিত হন।

যুদ্ধস্থলের অবস্থিতি স্থান—

এ সম্বন্ধে বঙ্গের ঐতিহাসিকগণ অদ্যাপি একমত হইতে পারেন নাই। প্রায় প্রত্যেকেই আপন আপন অভিমত উপস্থিত করিয়াছেন। কোনও দুইটি প্রথিতনামা লেখককে এ বিষয়ে একটি নির্দ্দিষ্ট মতাবলম্বন করিতে দেখা যায় না। উড়িষ্যা হইতে সুন্দরবন এবং ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত, যেখানে কোন নালা এবং উহার নিকটে দল্ দল্ ভূমি, অথবা যেখানে পাঠান রাজত্বের কোনও স্মৃতি বিরাজ করিতেছে সে খানেই যেন ঐতিহাসিকগণ ওসমানের যুদ্ধস্থলের সন্ধান পাইয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের প্রদত্ত 'কোহিস্থানেই ঢাকা" * বা ঢাকার পার্ব্বত্য অঞ্চল ব্যক্তি বিশেষকে সুন্দরবন, রণভাওয়াল, ভাওয়াল ও মধুপুরের জঙ্গলে লইয়া গিয়াছে, যেন "কোহিস্থানে ঢাকা" একটি আলাদীনের বাতি।

অপর কয়েক জন পুরাতত্ত্ববিদ টাঙ্গাইল, সাভার, ধামরাই এবং বংশী নদীর তীরবর্ত্তী গণকপাড়া, গৌরীপাড়া স্থানসমূহে পাঠানদিগের বহুকীর্ত্তি কাহিনীর নিদর্শন পাইয়া, ইহাদের মধ্যে কোনও না কোন স্থানে ওসমানের পরাভব স্থল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ নির্দ্ধারণ করা বিশিষ্ট প্রমাণাদি সাপেক্ষ। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের বিবরণ অনুসারে যুদ্ধস্থল ঢাকা হইতে আনুমানিক ১০০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান। উপরোক্ত স্থান সমূহ কখনই ঢাকা হইতে ১০০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী নহে। দ্বিতীয়তঃ, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করার অব্যবহিত পরেই ওসমান খাঁ বঙ্গের সীমান্ত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৬১২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি নিহত হন নাই। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধামরাই অঞ্চলে ওসমানের অবস্থান তর্কস্থলে স্বীকৃত হইলেও ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের পর তাঁহার তথায় অবস্থান সম্ভবপর নহে। পরিত্যক্ত দুর্গ, শিবির এবং জনপদে নূতন রাজধানী স্থাপন অল্প আয়াসসাধ্য বলিয়াই ইসলাম খাঁ ঢাকা নগরী স্থাপনের পূর্ব্বে, এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত ঢাকার ইতিহাস লিখকের মতও আমাদের মতের পোষকতা করিবে।

ঢাকার ইতিহাস লেখক "Antiquities of Dacca" এবং তোয়ারীখ ই ঢাকা প্রভৃতি অবলম্বনে লিখিয়াছেন—

"পাঠানগণ বঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে বিতাড়িত হইলে ওসমানের অধীনে এই স্থানে (ধামরাইর সন্নিকটে, সমবেত হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে অনেক খণ্ডযুদ্ধ করিয়াছিল। ঢাকার প্রথম সুবাদার ইসলাম খাঁ এই স্থানেই (১৬০৮ খৃঃ) বঙ্গের রাজধানী স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু নিম্নভূমি বলিয়া তদীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন নাই। ইহার পর ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ধামরাইর নিকটে মোগল পাঠানের শেষ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় এইরূপ মনে করিবার কোনও বিশিষ্ট কারণ নাই।"

তৃতীয়তঃ, সুজায়াৎ খাঁ পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত কয়েকজন ভূম্যধিকারীকে সঙ্গে নিয়াছিলেন। প্রায় ৫ বৎসরকাল ঢাকায় অবস্থান পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গ শাসনের পর ঢাকার সমীপবর্ত্তী কোন স্থলে সৈন্য পরিচালনার নিমিত্ত, মগ ও পর্ত্তুগীজ দমনকারী, ঢাকা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গের

* মানসিংহের সময় ঢাকার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থান এই নামে পরিচিত থাকিলে ১৬০৮ হইতে ১৬১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওসমান খাঁর পক্ষে কোহিস্থানে ঢাকায় থাকা অসম্ভব। তিনি মানসিংহের ভয়ে এস্থানে আগমন করেন। ইসলাম খাঁর ভয়ে এই স্থান ত্যাগ করেন।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান সুবেদারের পক্ষে এইরূপ জমিদার নিযুক্ত করার আবশ্যকতা বুঝা যায় না। পক্ষান্তরে যুদ্ধ স্থল উড়িষ্যায় হইলে এইরূপ পথপ্রদর্শকের আবশ্যকতা নির্ণয় করা আরও দুরূহ।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধস্থলের অবস্থান সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেন নাই। কেহ কেহ 'নেক উজিয়ান' বা উজানভূমি নামক স্থানে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় এরূপ বলিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মতে "নেক উজিয়াল" এইরূপ পাঠই যুক্তিযুক্ত। পূর্ব্ববঙ্গে উজিয়ান নামীয় কয়েকটি স্থান দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটি মাত্র উজিয়ালের নাম আইনই আকবরী গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ইহা "সা উজিয়ালবাজু"।* ইহার পর আমরা অপর ওসমান সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

---

* উক্ত গ্রন্থে এই মহালের নাম "শেল-বরশ বাজুর" পরেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই বাজু শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্ভুক্ত।

কর্ণেল জেরেট প্রণীত আইনই আক্‌বরী গ্রন্থের অনুবাদ ১৩৭ পৃষ্ঠা হইতে সরকার বাজুহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

সরকার বাজুহা—

এই সরকারে ৩২টি মহাল, রাজস্ব ৩৯৫১৬৮৭১ দাম, বিভিন্ন জাতির বসবাস, অশ্বারোহী ১৭০০, যুদ্ধহস্তী ১০ পদাতিক ৫৩০০। বাজুগুলির নাম—

১। আলাপসাহী, ২। বাদমার, ৩। নসরৎসাহী, ৪। মেহেরেমা, ৫। কুহারওয়ালা, ৬। সিরালি, ৭। ভোরিয়া বাজু, ৮। ভাওয়াল বাজু, ৯। পরতাব বাজু, ১০। রাগরিয়া বাজু, ১১। হুসেন সাহী, ১২। দাক্ষাদিয়া বাজু, ১৩। ঢাকা বাজু, ১৪। ছলিমপ্রতাব বাজু, ১৫। চান্দপ্রতাব বাজু, ১৬। সুলতান বাজু, ১৭। সোনাবাটী বাজু, ১৮। সোনা বাজু, ১৯। শোলবরশ বাজু ২০। ২১। সা আজিয়াল বাজু, ২২। জাফর আজিয়াল, ২৩। কষ্টর মল, ২৪। ২৫। মিমনসাহী বাজু সেরপুর, ২৬। ময়মনসিংহ, ২৭। নসরৎ সাহী, ২৮। হুসেন সিং, ২৯। নসরৎ আজিয়াল বাজু, ৩০। মুবারক্ আজিয়াল, ৩১। হরিয়াল বাজু, ৩২। যুজুক বাজু।

সোনাবাজুর বর্ত্তমান রাজস্ব ৭১৭, এই মহালে বর্ত্তমানে কোন গ্রাম নাই। পূর্ব্বে ইহার রাজস্ব ১৯১০৪৪০ দাম নির্দ্দিষ্ট ছিল। শেল—

(দ্বিতীয় অংশ)

দক্ষিণ শ্রীহট্টের খাজে বা খোয়াজ ওসমান।

পীর সাহ্‌জালালের পরে * যে সকল মহাত্মা ইসলাম ধর্ম্মের বিস্তার কল্পে খ্যাতি লাভ করেন তন্মধ্যে দক্ষিণ শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু নৃপতি সুবিদনারায়ণের পরাভবকারী খাজে বা খোয়াজ ওসমান বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মোগল সৈন্য ভয়ে ভীত হইয়া তিনি দক্ষিণ শ্রীহট্টে শ্রীসূর্য্য দুর্গে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ছিলেন; কিন্তু কর্ম্মফলে এই স্থানেই পুনরায় মোগল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। দক্ষিণ শ্রীহট্টে দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের ফলে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তৎসমুদায়ের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

খাজে ওসমানের শেষ কর্ম্মক্ষেত্র শ্রীসূর্য্য দুর্গ।

দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত কমলগঞ্জ থানার এলাকাধীন ইটা পরগণায় শ্রীসূর্য্য নামক গ্রাম অবস্থিত। গ্রাম্য লোকে এই স্থানকে "ছিরি উজি" বলিয়া থাকে। শ্রীসূর্য্য গ্রামের দক্ষিণাংশ সমস্তের নগর কালীহাটী টীলা-ভূমির অন্তর্গত। উক্ত টীলা-ভূমি দক্ষিণে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্ব দিকে মনু নদী উত্তর বাহিনী। উত্তর পশ্চিম দিকে কেওলা বীল। এই জলা-ভূমির অনেক স্থান উপ্‌লা দল্‌ দল্‌ ভূমি। জলা ভূমির উত্তর পার্শ্ব দিয়া লাখাটা নামে একটি 'ছড়া' ভানুগাছ হইতে মনু নদীর দিকে প্রবাহিত। দক্ষিণে ব্রাহ্মণসার, শ্রীরামপুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের পরে করায়া হাওর।

বরশ বাজুর রাজস্ব পূর্ব্বে ১৪৪৪৩২০ দাম নির্দ্দিষ্ট ছিল। বর্ত্তমান রাজস্ব ১৫২৮৲ ও ১৭টি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। এই উক্ত স্থান সুনাম গঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। ১২নং মাহাল দাক্ষাদিয়া বাজুর সহিত শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না অবগত নহি।

* ঐতিহাসিকগণের মতে ১০৮৭ খৃঃ সাহ্‌জালালের অনুমানিক সময়। সাহ্‌জালাল সর্ব্বপ্রথমে শ্রীহট্টে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করেন। বর্ত্তমান (অর্থাৎ তাঁহার পরে ৫২৫বৎসরের মধ্যে) শ্রীহট্টের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা দ্বাদশ লক্ষেরও বেশী।

করায়া হইতে পরে পরে অপর কয়েকটি হাওর উত্তর-পশ্চিমে শেলবরশ বাজু, সোনা বাজু পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

এই স্থানেই খাজে ওসমানের দুর্গ অবস্থিত এবং ইহার চতুঃপার্শ্বে খাজে ওসমানের কীর্ত্তির অন্যান্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে। জীবনের শেষ তিন বৎসর কাল তিনি শ্রীসূর্য্য গ্রামে অবস্থান করিয়া ছিলেন।

ওসমান কর্ত্তৃক যে সকল হিন্দু পরিবার ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি এই স্থানের চতুর্দ্দিকে বাস করিতেছে। ইহারা প্রকাশ করিয়া থাকে যে, ৮। ৯ পুরুষ পূর্ব্বে জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

খাজে ওস্‌মানের দক্ষিণ শ্রীহট্ট আক্রমণ কালে নারায়ণ উপাধি ভূষিত বাৎস্য গোত্রজ সুবিদনারায়ণ নামে ত্রিপুরার এক সামন্ত নৃপতি ইটায় রাজত্ব করিতে ছিলেন।*

শ্রীসূর্য্য এবং ইহার ৬।৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত রাজনগর এই উভয় স্থানেই সুবিদ্‌নারায়ণের পুরী বা রাজধানী অবস্থিত ছিল। ইটার পাহাড় বা বাড়ুয়া পাহাড়ে এই রাজগণের একটি সুদৃঢ় দুর্গ অবস্থিত ছিল। তৎকালে শ্রীসূর্য্য এবং রাজনগর উভয়েই সমৃদ্ধিশালী জনপদরূপে পরিগণিত হইত। শ্রীসূর্য্যে কয়েকটি ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির রাজপুরীর শোভা বর্দ্ধন করিত। রাজনগর সুরক্ষিত ছিল না, সুতরাং এই রাজপুরী সুদৃঢ় করিয়া নূতন রাজধানী নির্ম্মাণের বাসনা সুবিদনারায়ণের হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। (গ)

এই পুরীর চতুর্দ্দিকে পরিখা নির্ম্মিত হয়। এই পরিখা বেষ্টিত স্থান বর্ত্তমানে গড়গাও নামে পরিচিত। দৈববশে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না। শত্রুর আক্রমণে তাঁহার সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়া গেল।

---

* নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ এই বংশের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল—

নিধিপতি (ক)
|
শুভরাজ খাঁ।
|
রাজা ভানুনারায়ণ (ত্রিপুরা হইতে রাজোপাধি প্রাপ্ত হন)
|
রাজা সুবিদনারায়ণ (খ) — রামচন্দ্র নাং (পরাভবের পর বরমচালে গমন করেন) — ধর্ম্ম নাং (ছয় চাড়ি) — বীর নাং (লংলায়)

রাজা সুবিদনারায়ণ (খ)
|
সূর্য্য নাং (ইসলাম ধর্ম্মে নাম জামাল খাঁ) (অপুত্রক) — চন্দ্র নাং (কামাল খাঁ) (অপুত্রক) — শিব নাং হাজি খাঁ (ইটায়) — কৃষ্ণ নাং ইস্রাইল খাঁ। (লংলায়)

বর্ত্তমানে সুবিদনারায়ণের পর তদ্বংশে গড়ে প্রায় ১১ পুরুষ চলিতেছে। সুতরাং ৩½ পুরুষে শতাব্দী হিসাবে নিম্নোক্ত সময় পাওয়া যায়।

ক। নিধিপতির সময়—১৯১৩ – ১৮ × ২৮ – ১৪০৯ খৃষ্টাব্দ।

খ। সুবিদনারায়ণের সময়—খাজে ওসমান কর্ত্তৃক পরাজিত ইনি নিধিপতির ৮ পুরুষ পরের লোক।

(১) পূর্ব্ব পুরুষের সময় হিসাবে—

১৪০৭ + ৮ × ২৮ = ১৬৩১ খৃষ্টাব্দ।

(২) পর পুরুষের সময় হিসাবে—

১৯১৩ ১১ × ২৮ = ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ।

রাজার সময় নির্দ্ধারণের এইরূপ উৎকৃষ্ট সুযোগ সত্ত্বেও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তলেখক রাজা সুবিদনারায়ণকে আরও প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে টানিয়া নিয়াছেন।

(গ) রাজনগরের উত্তর দিকে দুইটি বিস্তৃত দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দীঘিদ্বয় সাগর দীঘি ও কোদালধোয়া দীঘি নামে পরিচিত। তৎকর্ত্তৃক এই দুইটি দীঘি খননের বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থানীয় অবস্থা দৃষ্টে ইহাদিগকে আরও বহু প্রাচীন যুগের নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। নিকটে কোন রাজ বাড়ীর চিহ্ন দীঘির তীর পর্য্যন্ত দেখা যায় না। সংলগ্ন ফুলবাড়ী স্থাপন সম্বন্ধেও প্রামাণিক কোনও বিবরণ নাই। যাহা হউক কয়েকটি জনশ্রুতি এই স্থান সুবিদনারায়ণের অপর এক পুরী নির্ম্মাণের নিদর্শন বলিয়া প্রচার করিতেছে

রাজা সুবিদনারায়ণ * সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। তিনি নিশ্চিন্ত মনে রাজ্য শাসন করিতে ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার রাজ্য পাঠান সৈন্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইল। পাঠান দলপতি খাজে ওসমানের অধীন সাত আট হাজার কাবুলী সৈন্য ও বহু বাঙ্গালী সৈন্য ক্রমে শ্রীসূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হইল। কাবুলী সৈন্যের ভয়ে ও অত্যাচারে প্রজাবর্গ পলায়নপর হইল। অচিরে রাজ-পরিবার ও রাজ-সৈন্য দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইল। মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইবার ভয়ে রাণী লীলাবতী ও রাজ-কন্যা পদ্মিনী কূপ মধ্যে ঝম্ফ প্রদান পূর্ব্বক জাতি-ধর্ম্ম রক্ষায় সমর্থ হইলেন। রাজপুরী ওসমানের করতল গত হইল। তিনি রাজ-পরিবারের সঞ্চিত ধনরাশি প্রাপ্ত হইলেন। খাজে ওসমান কৃপা-পরবশ হইয়া রাজার জাতি ধ্বংস করিতে বিরত হইলেন, কিন্তু রাজপুত্রগণের জাতি ধ্বংস হইল। রাজার ভ্রাতৃগণ পলায়ন পূর্ব্বক জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষায় সমর্থ হইলেন মাত্র। এই বিপদের পর অল্পকাল মধ্যেই রাজা মানব লীলা সম্বরণ করেন। রাজ্য পাঠান দিগের মধ্যে বিভক্ত হইল। বল প্রয়োগে বহু লোকের ধর্ম্ম নাশ আরম্ভ হইল।

স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে খাজে ওসমান রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীসূর্য্য দুর্গ-প্রাকার সুদৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতেই তিনি নিরস্ত হইলেন না। নিজের ক্ষমতা দৃঢ় করিবার মানসে মধ্যবিত্ত ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি দিগকে তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে লাগিলেন। * এই ভাবে বিপদ কালে সর্ব্বথা নির্ভরযোগ্য এক শ্রেণীর লোকের সৃষ্টি হইল। সময় সময় যে সকল পরিবার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে বাধ্য হইত তন্মধ্যে ব্যক্তি বিশেষকে তিনি হিন্দু ধর্ম্মে অবস্থান করিবার অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক প্রচার কার্য্যের কঠোরতা লাঘব করিতেন। বল-প্রয়োগে ধর্ম্ম প্রচার ব্যতীত তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কোনও অত্যাচার সম্বন্ধে জনশ্রুতি পর্য্যন্ত নীরব। জন সাধারণ তাঁহার উদার চরিত্রে ক্রমেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। তিনি জনহিতকর কার্য্যেও উদাসীন ছিলেন না। অল্প সময়ে এবং নির্ব্বিঘ্নে নৌকাযোগে যাতায়াতের নিমিত্ত তিনি মনু নদী হইতে শ্রীসূর্য্যের সমীপবর্ত্তী লাখাটা ছড়া পর্য্যন্ত কাটা মনু নামক যে খাল খনন করান তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

খাজে ওসমান পীর সাহ্ জালালের ন্যায় প্রচার কার্য্যে সফলকাম হন নাই। হওয়া সম্ভবপরও ছিল না। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই প্রধানতঃ তিনি ইসলামধর্ম্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তিনি পীর সাহ্ জালালের ন্যায় ধর্ম্মানুপ্রাণিতও ছিলেন না।

পীর সাহ্ জালাল এবং খাজে ওসমানের কর্ম্ম ক্ষেত্র।

জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তনও এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সমান ভাবে সফলকাম হইতে দেয় নাই। কামরূপ এবং বঙ্গের আর্য্য শাসনে শ্রীহট্টের আদি অধিবাসী গণের জাতীয় ভাষা ও আদর্শের বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত

---

* শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুররাজমালা গ্রন্থে, ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা-রাজ ধর্ম্ম মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৪০৭-৩৯ খৃষ্টাব্দে) বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ত্রিপুরায় ভূমি ও ধনরত্ন দানের উল্লেখ রহিয়াছে। বৈদিক সংবাদিনী গ্রন্থেও নিধিপতি নামক কনোজ নিবাসী এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের ত্রিপুরা-রাজ ধর্ম্মফার রাজত্ব কালে ত্রিপুরা অধিকৃত ইটা অঞ্চলে এক ভূখণ্ড দানের বিবরণ দৃষ্ট হয়। ত্রিপুররাজমালার ধর্ম্মফা নামধেয় অপর কোনও নামের উল্লেখ না থাকাতে ধর্ম্মফা এবং ধর্ম্মমাণিক্য একই ব্যক্তি এবং নিধিপতির আনুমানিক সময় ১৪০৭ খৃষ্টাব্দ অনুমিত হইতেছে।

শ্রীহট্টে প্রচলিত বহু গ্রন্থে এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ নিধিপতির সময় রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই রূপ নির্দ্ধারণ নির্ভরযোগ্য নহে।

বীর নারাইনের দীঘি প্রাকৃতিক দৃশ্যে অতুলনীয়। সাধারণতঃ দীঘিতে রোহিত মৎস্যের ছানা হয় না, কিন্তু বিশাল ছয়চিড়ি দীঘিতে এই আশ্চর্য্য ঘটনাও দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মনারায়ণের বংশধরগণ মধ্যে শ্রদ্ধেয় ঈশান চন্দ্র চৌধুরী শ্রীহট্টে সুপরিচিত।

* ইটা পরগনার কাউকাপন গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং কানীহাটী পরগনার একটি প্রসিদ্ধ হিন্দু পরিবার খাজে ওসমানের এইরূপ প্রচার কলে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী।

হয়।* সাহ্ জালালের সময়ে ইহাদের প্রাচীন সমাজ-বন্ধন শিথিল এবং হিন্দু-সমাজ বন্ধনও দৃঢ়ীভূত হয় নাই। বস্তুতঃ ইহারা কিরূপ কুসংস্কারাপন্ন ছিল অপর এক প্রবন্ধে ইতঃ পূর্ব্বেই ইহা আলোচিত হইয়াছে।† ইহাদের মধ্যে সাহ্ জালাল নিজ সাধু জীবনের জলন্ত আদর্শ এবং সহজ বোধ্য সাম্য এক নব ধর্ম্ম মত লইয়া উপনীত হন। ইহার পর অজ্ঞ অর্দ্ধ হিন্দু জনসমূহের মধ্যে যখন প্রচারিত হইল যে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ কেবল মাত্র আসনে ভর করিয়াই ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং সাত বার করতালি প্রদান করিয়াই শ্রীহট্টস্থ মনারায়ের সপ্ততল প্রাসাদ ভূমিশায়ী করিয়াছেন তখন তাহাদের হৃদয় ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের জন্য কতদূর আগ্রহান্বিত হইয়াছিল সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে।

খাজে ওসমানের সময়ে জন সমূহের মধ্যে হিন্দু ভাব অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইয়া পড়ে। এক্ষণে এক বার মাত্র ওয়াজ শুনিয়াই তাহারা আর ধর্ম্মান্তর গ্রহণে ব্যগ্র নহে।

খাজে ওসমানের পরাভব

দীর্ঘ কাল নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করাও ওসমানের অদৃষ্টে ছিল না। তিন বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই তিনি মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। দক্ষিণ শ্রীহট্টে অনুসন্ধানের ফলে যাহা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়াছি তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

" ওসমান কর্ত্তৃক শ্রীহট্টে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিকূলাচরণের সংবাদ অবগত হইয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর তাহাকে দমন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। এক দল মোগল সৈন্য তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাহারা ওসমানের দুর্গের ন্যূনাধিক ৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে, লাঘাটা-তীরে কেওলা বিলের প্রান্তভাগে শিবির স্থাপন করে। নাসিরুদ্দিন খান নামক এক জন স্থানীয় প্রতাপশালী ব্যক্তি মোগল সৈন্যদিগকে এই সময়ে অযাচিত ভাবে বিস্তর সাহায্য করেন। মোগল সৈন্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ওসমান সসৈন্যে দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লাঘাটা-তীরে মোগলদিগের সম্মুখীন হইলেন। হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঠানদিগের পরাক্রমে ক্রমেই মোগল সৈন্য হটিয়া যাইতে লাগিল। বহু মোগল সৈন্য হতাহত হইল। দৈব দুর্ব্বিপাকে ওসমানের হস্তী আহত হয় এবং উন্মত্তের ন্যায় বেগে ধাবিত হওয়ার সময় উথ্‌লা দল দল্‌ ভূমিতে আবদ্ধ হইয়া যায়। অবসর বুঝিয়া এই সময় একটি আহত মোগল সৈনিক ওসমানের ললাটদেশ লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করে। তীর-বিদ্ধ হইয়া ওসমান ঢলিয়া পড়িলেন! পাঠান সৈন্য-মধ্যে এই দুঃসংবাদ প্রচারিত হইলে পর তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ওসমানকে লইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওসমান মৃত্যুই শ্রেয় মনে করিয়া দুর্গের মধ্যস্থিত একটি কূপে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ করেন। দুর্গে অবস্থান করা বিপজ্জনক ভাবিয়া অতঃপর পাঠানগণ পলায়নপর হয়। পাঠানদিগের মধ্যে অনেকে ত্রিপুরা পাহাড়ে পলায়ন করে। অনেকে মোগল হস্তে বন্দী হয়। কেহ কেহ শ্রীহট্টেই বাস স্থাপন করে। শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাথেল খাঁ এবং কালু খাঁর বংশধরগণ উল্লেখ যোগ্য।

মোগল বিজয়ের পর ইটা রাজ্য সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত হয়। নাসিরুদ্দিন খান তাহার অযাচিত সাহায্যের নিমিত্ত কানীহাটী পরগণার চৌধুরাই সহ এক বিস্তীর্ণ জায়গীর প্রাপ্ত হন, কিন্তু সুবিদনারায়ণের পুত্রগণও ইটা ও ইন্দেশ্বর পরগনা দ্বয়ের একাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

খাজে ওসমানের সময় নিরূপণ, নাসিরুদ্দিনের সনন্দ

কানীহাটী চৌধুরী বংশের কয়েকটি সনন্দ এবং দলীল পত্র খাজে ওসমানের সময় নিরূপণে বিশেষ সাহায্য করে।

* পৌরাণিক কালে ব্রহ্মপুত্রের মোহানা হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত ভূভাগে কিরাতগণের বসবাস থাকার বিবরণ তন্ত্র পুরাণে বর্ণিত আছে।

†.চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত—প্রতিভা ৬০১পৃঃ।

* পীর সাহ জালালের সঙ্গীয় সাহ হেলিম এই বংশের স্থাপয়িতা। সাহ হেলিমের বংশে নাসিরুদ্দিন নামক এক জন প্রতাপশালী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। খোয়াজ ওসমানের সহিত যুদ্ধ জয়ান্তে বাদসাহ জাহাঙ্গীর তাহাকে একটি সনন্দ দ্বারা কানীহাটী পরগনার চৌধুরাই সহ একটি* বিস্তীর্ণ জায়গীর প্রদান করেন। উক্ত সনন্দ আবুল মুজাফর নুরুদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদসাহের আদেশে সুবাদার ইসলাম খাঁ কর্ত্তৃক নাসিরুদ্দিন চৌধুরীকে প্রদত্ত হয়। সনন্দের সময় ১০১৪ হিজরী বলিয়া কেহ কেহ পাঠ করিয়াছেন। অবস্থা দৃষ্টে ১০২৪ হিজরী (১৬১৫ খৃঃ) হওয়াই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এ পর্য্যন্ত কেহই এই সনন্দের প্রামাণিকতা অস্বীকার করেন নাই। এই সনন্দ প্রদানের বিবরণ বর্ত্তমান আলোচনার পক্ষে অতীব মূল্যবান—কারণ ইহাতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে (ক) রাজা সুবিদনারায়ণ, নাসিরুদ্দিন চৌধুরী এবং খাজে ওসমান পরস্পর সমসাময়িক—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। (খ) খাজে ওসমান এবং বঙ্গের ওসমান খাঁ একই ব্যক্তি। পূর্ব্ববঙ্গে ইসলাম খাঁর আগমনে, ওসমান খাঁ বঙ্গের সীমান্তভাগে জীবনের শেষ তিন বৎসর কাল শ্রীহর্ষ্য গড়ে অতিবাহিত করেন, এবং মোগল হস্তে এই স্থানেই তিনি মানব লীলা সম্বরণ করেন।

অতঃপর অন্য প্রমাণ অনাবশ্যক হইলেও নিম্নে খাজে ওসমানের সময় নির্দ্ধারণ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১ নিধিপতি বংশ পত্রিকা এবং খাজে ওসমানের সময়

১—নিধিপতি* বংশপত্রিকা এবং তাঁহার সময় আলোচনায় ১৬০৫ এবং ১৬৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোনও সময়ে সুবিদনারায়ণের বর্ত্তমান থাকার যৌক্তিকতা ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনার ফলেও খাজে ওসমান সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক বলিয়া প্রমাণিত হইতেছেন।

২—আইন ই আকবরী গ্রন্থে সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত বিভিন্ন মহালের নামোল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু ইটার কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইটা ত্রিপুরার সামন্ত রাজ্য বলিয়া ত্রিপুরা এবং শ্রীহট্টের ইতিহাসেও স্বীকৃত। তৎকালিক ত্রিপুর নরপতি† বিজয় মাণিক্য এবং তৎপর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমর মাণিক্যের বিক্রমের কথা ইতিহাসে সুপরিচিত। ইঁহাদের সামন্ত নৃপতি এবং অভিজাতবর্গ ত্রিপুরার গৌরব জনক নারায়ণ এই উপাধিতে ভূষিত হইতেন।

নারায়ণ উপাধি বিশিষ্ট সুবিদ নারায়ণের অধিকৃত ইটা, আকবরের সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলিয়াই নিকটবর্ত্তী সরকার শ্রীহট্টের অন্যান্য মহালের ন্যায় ইটা সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত দেখান হয় নাই। সুতরাং আকবরের রাজত্বের পরে এই স্থান মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে। পাঠান রাজগণের কাগজ পত্র হইতে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক মহালের নাম আইন ই আকবরী গ্রন্থে স্থান পাইয়া থাকিলে পাঠান রাজত্বেও ইটা মুসলমানদিগের অধিকৃত ছিল না বলিয়া প্রমাণিত হয়।

---

* কানীহাটী পরিবারের অপর কয়েকটি সনন্দ ও দলিল—

(ক) নাসিরুদ্দিনের পুত্র যে দলিল দ্বারা সুবিদনারায়ণের পুত্র হাজিনীর নিকটে লাখাটী ছড়ার পূর্ব্ব এবং তারপাসা গ্রামের দক্ষিণস্থ কয়েকটি গ্রাম বিক্রয় করেন।

(খ) নাসিরুদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র হাজি মহম্মদ চৌধুরী ১১১০ পরগনাতি সনে সম্রাট আওরঙ্গজীব হইতে যে সনন্দ লাভ করেন।

(গ) এইরূপ ১০৭৭ হিজরীতে সম্রাট আওরঙ্গজীব হইতে অপর একখানা সনন্দ, ইত্যাদি।

* নাসিরুদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র হাজি মহম্মদ। ইহার নামানুসারে কানীহাটী চৌধুরীদিগের বাসস্থান হাজীপুর নামে পরিচিত। হাজি মহম্মদের পুত্র সেখ বাহাদুর। তিনি ১১৪২ হিজরী অব্দে (১৭২৮ খৃঃ) পরলোক গমন করেন।

† আইন ই আকবরী গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ হইতে নিম্নোক্ত বিবরণ উদ্ধৃত হইল—"The name of the ruler is Bejoy manik. Whosoever obtains the chieftainship, bears the title of Manik after his name and the nobles that of Narain. He has a force of 20000 foot-men and a thousand clephants."

৩—তরফিয়া চৌধুরাই ১০৩৪ সন বা ১৬২৯ খৃষ্টাব্দের একখানা দলীল। এই দলীলে ইটা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে পর সুবিদ নারায়ণের মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী পুত্র চতুষ্টয় ইটা ও ইন্দেশ্বর পরগণাদ্বয়ে পৈত্রিক সম্পত্তির একাংশ এবং চৌধুরী উপাধি লাভের বিবরণ প্রদত্ত রহিয়াছে।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে খাজে ওসমানের সময়

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই খাজে ওসমানপ্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, দক্ষিণ শ্রীহট্ট হইতে সংগৃহীত এবং অন্যান্য প্রমাণাবলী আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তেই লইয়া যায়; কিন্তু শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রকাশক * সম্ভবতঃ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া খাজে ওসমানকে আরও প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে টানিয়া নিয়াছেন। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বৈদিক শ্রেণীভুক্ত শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য রঘুনাথ শিরোমণিকে তাঁহাদের সম্প্রদায় ভুক্ত শ্রীহট্টের আদি বাসিন্দা বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। সাম্প্রদায়িক শ্রেণীভুক্ত শ্রীহট্টের অপর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বিশেষকেও এইরূপ দাবী করিতে দেখা যায়। শেষোক্ত মতের সমর্থনকল্পে রঘুনাথ এবং রাজা সুবিদনারায়ণের সময়ের সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক। সুবিদনারায়ণ এবং তৎসহ ওসমানের প্রকৃত সময় প্রদত্ত হইলে ওসমানদ্বয়ের ঐক্য স্থাপিত হয়, কিন্তু সুবিদনারায়ণ ও রঘুনাথের মধ্যে প্রায় শত বৎসরের গোলযোগ ঘটে।

এইরূপ নির্দ্ধারণে ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইবে কি না অনুসন্ধান যোগ্য। কোন বিশিষ্ট প্রমাণ বলে ঐতিহাসিক প্রমাণাবলী উপেক্ষা করিয়া সুবিদ নারায়ণকে (সঙ্গে সঙ্গে ওসমানকে) প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে টানিয়া নিয়াছেন বুঝিতে না পারায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে।

খাজে ওসমান এবং ওসমান খাঁ অভিন্ন ব্যক্তি

১। উভয়েই খাঁজে ওসমান, উভয়েই বিদ্রোহী পাঠান দলপতি, এবং সুবিদ নারায়ণের বংশাবলী আলোচনায় উহারা উভয়েই এক সময়ের লোক বলিয়া অনুমিত হয়।

২। ওসমান খাঁর পরাভব স্থল ঢাকা হইতে ১০০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। খাঁজে ওসমানের শ্রীসূর্য্য দুর্গও ঢাকা হইতে প্রায় ১০০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান। দলদল বিল নালার ধারে প্রভৃতি বর্ণনা লাখাটা ও কেওশা বিলের অনুরূপ।

৩। যুদ্ধ জয়ের উপক্রম কালে উভয়েই আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বঙ্গীয় ঐতিহাসিকদের কাহারও কাহারও মতে ওসমানের যুদ্ধ ক্ষেত্র উড়িষ্যা, কাহারও মতে সুন্দরবন, কাহারও মতে পাবনা, কাহারও মতে টাঙ্গাইল, কাহারও মতে মধুপুরের জঙ্গল, কাহারও মতে রণ ভাওয়াল, কাহারও মতে ধামরাই, কাহারও মতে সাভার, আবার কাহারও মতে ত্রিপুরা। অপূর্ব্ব পূর্ব্বায়ণ! ইহার পর এই স্থলে আবার আর একটা নূতন মতের অবতারণা হইল, পাঠকগণ সকল দিক বিচার করিয়া ইহাদের মধ্যে যে মতটি প্রামাণিক বলিয়া মনে করেন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

---

* শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রকাশক; শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ সাহায্য করেন। ভট্টাচার্য্য মহশয় এবং দাস মহাশয়ের গুরুবংশ শ্রীহট্টের কাত্যায়ন গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত।

তুমি

প্রেমেরি পসরা তুমি—
নয়নের ধারা,
মানস-পাথারে মম
তুমি ধ্রুবতারা।

আমার আতপে বিটপী তুমি,
অকূলেতে বেলা তুমি,
মুক্তি তুমি, টুটি ছন্দ
বদ্ধ ভব-কারা।
ওগো, অনাদির পার হ'তে
জন্ম জন্মান্তর পথে
অনন্তের যাত্রী আমি,
চির পথহারা।
হেরে, পথে পথে অন্ধকারে
বিভীষিকা বারে বারে,
থেকে থেকে বিরহের
ভয়ে হই সারা।
এই অনাদি অনন্ত রাতি—
তুমি এ প্রাণের সাথী,—
স্বর্গে কি নরকে রহি,
নহি তোমা ছাড়া।
শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

নির্ম্মাই শিব

(১)

নির্ম্মাই আর হর্ম্মাই ছিল তারা দুই ভগিনী ; আর তাদের পিতা মাতা—তাঁরা ছিলেন ত্রিপুরার রাজা-রাণী। বাড়ীর সংলগ্ন শিবমন্দির ছিল ; তার ভিতর নিত্যি শিবের পূজা হইত। পুরুত ঠাকুর পাঁচ সের ওজনের ঘণ্টা বাজাইয়া, পঞ্চমুখী শাঁখ বাজাইয়া সোনার দণ্ডে ঝাঁঝর বাজাইয়া শিবের পূজা করিতেন ; ভোগ হইয়া গেলে দুটি ভগিনীতে প্রসাদ পাইত।

পুরোহিত বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন—চোখেও কম দেখিতেন ; রাজকন্যা দুজন তার পূজার ফুল বেলপাতা বাছিয়া দিত, দুর্ব্বা তুলিয়া রাখিত, সোনার কটরায় শ্বেত চন্দন, রূপার কটরায় রক্ত চন্দন যোগাইত। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরও এমনি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, পূজার কালে এই দুইটি বালিকাকে দ্বারদেশে উপস্থিত না দেখিলে, তাঁর পূজাই সেদিন আর জমিয়া উঠিত না।

পূজা শেষ হইয়া গেলে পুরোহিত ঠাকুর রাজকন্যাদের কাছে হর পার্ব্বতীর গল্প করিতেন। সেই সে পার্ব্বতী শিবকে স্বামী পাইবার জন্য শিবের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তার পর দেবতাদের ধৃষ্টতায় মদন বেচারা ভস্ম হইয়া গেলে তপস্যায় রত হইয়াছিলেন—গ্রীষ্মে চারি দিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া,শীতে শীতল জলে পদ্মমুখখানি পদ্মের মত ভাসাইয়া রাখিয়া তপস্যা করিতেন ; বর্ষায় অনাবৃত বনদেশে ধ্যান করিতেন ; বাতাস অলক দুলাইয়া চলিয়া যাইত, বর্ষাবিন্দু মাথার উপর ঝরিয়া পড়িত, চোখের পাতায় আটকাইয়া থাকিত, রাঙ্গা ঠোঁট দুটিকে ব্যথিত করিয়া বুক বাহিয়া নাভিকুণ্ডে আশ্রয় লইত। তারপর সেই যে ছদ্মবেশে শিব আসিলেন, পার্ব্বতীকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'তুমি শিবকে চাও কেন? নীল সাগরতলে মুক্তারাজ্যে মুক্তার সিংহাসনে বরুণদেব আছেন, নন্দনের মন্দারগন্ধি কেলিবনে সমস্ত স্বর্গরাজ্যের রাজা ইন্দ্র আছেন, জ্যোৎস্নার রাজ্যে সাদা মেঘের সিংহাসনে হাসির আলোকপরা চন্দ্রদেব আছেন, আকাশের রাজ্যে সোনার আসনে সোনামাথা সূর্য্যদেব আছেন, ব্রহ্মালয়ে ব্রহ্মা আছেন, যমালয়ে ধর্ম্মরাজ আছেন, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আছেন, এত সব দেবতা থাকিতে তুমি এক ন্যাংটা ভস্মমাখা শ্মশানচারী ভোলাকে চাও কেন?"

গৌরী রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমার যাঁর প্রতি মন গিয়াছে, আমি তাকেই চাই! সন্ন্যাসী তুমি, তোমার ওসব খবরে প্রয়োজন কি? মহাদেবের মহিমা তুমি কী বুঝিবে? তিনি ন্যাংটা?—তা সত্য ; কারণ তিনি সামান্য সূতার কাপড় তুচ্ছ করিয়া দশ দিক্‌কে অম্বররূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; এই তৃণে শস্যে মণ্ডিত পৃথিবীতে, এই পাতায় লতায় জড়িত বনরাজিতে, এই ফলে ফুলে মণ্ডিত বৃক্ষমালাতে, দিক্‌হারা সাগরে অন্তহারা আকাশে, পথহারা পর্ব্বতে তিনি যে আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন, তাঁর আবার বেশ ভূষা কিসের? [illegible]?

ভস্মের মত পবিত্র আর কি আছে? ভস্ম জড় জগতের সত্য পরিণাম! আর তিনি যে ত্যাগী! ফুলের মালা, মুক্তার মালা, চন্দন কস্তুরী—যা কিছু সুখের, যা কিছু আরামের তাই যে তিনি সকলকে বিলাইয়া দিয়া নিজে কাঙ্গালেরও কাঙ্গাল সাজিয়াছেন! তুমি সন্ন্যাসী হইয়া বুঝিলে না, তিনি ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি, মঙ্গলের অবতার পুরুষের পুরুষার্থ! তারপর তিনি শ্মশানচারী? শ্মশানের মত পুণ্য ভূমি আর কোথায়? এখানে মান অপমান দূর হইয়া যায়, ভেদ বিদ্বেষ মিলাইয়া যায় উঁচু নীচু সমান হইয়া পড়ে! এই শ্মশানের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া পাপের কলঙ্ক ভস্ম হয়, আত্মার বন্ধন ছিন্ন হয়! এযে মহাকালের আনন্দ-কানন মঙ্গলের উৎস ভূমি!"—এই বলিয়াই গৌরী থামিয়া পড়িলেন, অভিমানের অশ্রুতে তাঁর কথা বাধিয়া যাইতেছিল।

এই সব কাব্যের ও পুরাণের গল্প পুরোহিত ঠাকুর নিত্যি নিত্যি নির্ম্মাই-হর্ম্মাইকে শুনাইতেন। প্রথম প্রথম বিশেষ কিছু তারা বুঝিত না। কেবল পার্ব্বতীর তপস্যা-কাননের একটা অস্পষ্ট ছায়া তাদের কল্পনাকে একটু দোলা দিয়া যাইত, এবং হরিণ-হরিণীর লম্ফ আর স্বচ্ছ নির্ঝর-পাড়ে হরিণ-শিশুর খেলা দেখিতে মন এক এক বার চঞ্চল হইয়া উঠিত। পরে, বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেই আনন্দ-কাননের একটা সজাগ সুস্পষ্ট ছবি তাদের চিত্তের উপর চাপিয়া বসিল; সেই ঝর ঝর বারিধারা, তর তর নদী-স্রোত—তার পাড়ে তপস্যা—গরমে আগুন জ্বালিয়া, শীতে জলে বসিয়া তপস্যা! কার তপস্যা? দেবের যিনি আদিদেব, কালের যিনি মহাকাল সাধকের যিনি সিদ্ধি! যিনি পৃথিবীর মত ধীর, আকাশের মত উদার, সাগরের মত প্রেমী! যিনি বিপুল—বিরাট—সুন্দর! তাঁর তপস্যা! বালিকা দুটির প্রাণে সেই বড় আশা জাগিয়া উঠিল। তারা এক দিন কোন ফুলগন্ধি বনের বেলতলায় বসিয়া কনক হাতে কনক ধুতুরার মালা লইয়া অভীষ্ট বরের প্রতীক্ষা করিবে; জ্যোৎস্নার চাঁদের কিরণ আর বর্ষায় বিদ্যুতের লেখা তাদের তপস্যা-রজনীতে আলো দিয়া যাইবে; অরুণ-বরণ গাছের বাকলে তরুণ দেহের সরম রক্ষা হইবে; আকাশের জলে স্নান করিয়া, হরিণ-শিশুর চোখে মুখ দেখিয়া, গাছের ফলে পেট ভরিয়া দিন কাটিবে; আর তারপর হঠাৎ ধ্যান ভাঙ্গিলে সেই রসিক সন্ন্যাসীর জটা পরা ভস্মমাখা মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁর চরণে তারা আত্মসমর্পণ করিবে—এই কল্পনা তাদের মনকে লইয়া খেলাইতে লাগিল।

রাজা দেখিলেন কন্যাদের স্বভাব কেমন গম্ভীর হইয়া আসিয়াছে। আর তারা ছুটি ছুটাছুটি করে না, হাসা-হাসি করে না পুতুল লইয়া ঝগড়া করে না। তাদের ছোট্ট হাতের খুঁটি নাটি কাজ এখন বন্ধ হইয়া গেছে। রুনু ঝুনু নূপুর বাজাইয়া বকুল তলায় ফুল কুড়ান থামিয়া গেছে। নীল জলে সাঁতার কাটিয়া পদ্মফুলের ভ্রমর উড়ান—সে দিন এখন স্বপ্নের মত মিলাইয়া গিয়াছে! তারা এখন চট্‌পট্ হাটে না, চট্‌পট্ কথা কয় না, কারও মুখে চোখ তুলিয়া চায় না। রাজা দেখিলেন, দেখিয়া দেশ বিদেশে পাত্র খুঁজিতে লোক পাঠাইলেন।

রাজ্যে রাজ্যে ঢোল পিটান হইল; কত রাজ-কুমারের নিকট হইতে সোনার থালায় হীরার কৌটায় রতন-মণি-শঙ্খ-সিন্দূর উপহার আসিল। নেপালের মহারাজকুমার তিন শত হাতী উপঢৌকন পাঠাইলেন—সে হাতী মেঘের মত কালো, পাহাড়ের মত উঁচু—আর দাঁতে সোনার বাঁধ। ত্রিপুররাজ বলিলেন "বড় মেয়ে নির্ম্মাইকে নেপালের মহারাজকুমারের হাতে সমর্পণ করিব।" নির্ম্মাই শুনিয়া কিছু বলিল না, কেবল হর্ম্মাইর সঙ্গে শিবমন্দিরে গিয়া একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আসিল। পরদিন যখন ব্রহ্মদেশের রাজকুমারের ভেট আসিল, উচিংড়ির মত ছটফটানো সাতটা ঘোড়ার পিঠে পান্না জড়ানো সাতটা গদীতে সাত ঝাঁপি রাঁধুনী-চিকণ ধান ও সাত ছড়া গজমুক্তার মালা আসিল, তখন রাজা বলিলেন, "আমার হর্ম্মাইর অদৃষ্টই দেখি সকলের চাইতে ভাল!"

(২)

বৃদ্ধ পুরোহিত শুনিলেন নির্ম্মাই হর্ম্মাইর বিবাহ ঠিক হইয়াছে ; শুনিয়া কহিলেন "হে মহাদেব, হে শিব, হে মঙ্গলময়—আমি সমস্ত জীবন তোমার আরাধনা করিয়া যদি তোমার তিলমাত্র অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকি তবে তা আজ কুমারী দুজনার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ অর্পণ করিলাম! তুমি কৃপা করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বমঙ্গলে রাখিও।"

পরদিন হইতে বৃদ্ধের শরীর হেলিয়া পড়িতে লাগিল! তাঁর মনে হইল, কে যেন তাঁর সমস্ত বল হরিয়া নিতেছে ; আর কেমন এক এক বার বুক ফাটিয়া কান্না ছুটিতে চাহিতেছে ; তিনি জোর করিয়া কান্নাকে ছুটিতে দিলেন না। কিন্তু তিন দিনের দিন শিব মন্দিরের দুয়ারে নির্ম্মাই-হর্ম্মাই গিয়া যখন দাঁড়াইল, তখন বৃদ্ধ আর কোন মতে নিজেকে থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না। ভবিষ্যতের একটি নিরানন্দ চিত্র তাঁর চোখের কাছে ভাসিয়া উঠিল। এই ঘর এমনি থাকিবে, শিবলিঙ্গ এমনি নিত্যি ফুলের চন্দনে ঢাকা পড়িবে, তাঁর শীর্ণ হাত এমনি করিয়া ঠাকুরের চরণে ফুল বেলপাতা অর্পণ করিবে, কিন্তু দরজার কাছে নির্ম্মাই-হর্ম্মাইর কচি মুখ দুটি আর দেখা যাইবে না। হয়ত ব্রাহ্মণ অভ্যাস মত ঠাকুরের প্রসাদ হাতে লইয়া পেছন ফিরিয়া চাহিবেন—চাহিয়া দেখিবেন পূজার আঙ্গিনা শূন্য! কারা আর বৃদ্ধের ফুল-দূর্ব্বা তুলিয়া দিবে? কারা আর বসিয়া ব্যাকুল মনে হরপার্ব্বতীর গল্প শুনিবে? কারা আসিয়া আর তাঁর বন্ধুহীন জীবনের সহচর হইবে? দিন আসিবে যাইবে, পৃথিবী ঘুরিবে ফিরিবে, সূর্য্য উঠিবে ডুবিবে, কিন্তু ভোর বেলাকার সোনা-মাখা ফুলতলার সাজি হাতে নির্ম্মাই-হর্ম্মাইকে দেখিয়া যে আনন্দ হইত, দুপোর বেলায় রোদের ঝাঁঝায় নির্ম্মাই-হর্ম্মাইর কচিকচি আঙ্গুল গুলি বৃদ্ধের পাকা চুলের মধ্যে যে অমৃত সিঁচিত, সন্ধ্যায় সে স্নেহময়ী দেববালা দুটি যখন ঠাকুরের ফুলবাগানে জল দিত, আর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীগুলি আসিয়া সে জল পান করিয়া চলিয়া যাইত, তখন বৃদ্ধ যে প্রেমের, যে সুখের, যে স্বর্গের স্বপ্ন দেখিতেন, তা আর ফিরিবে না! ভাবিয়া বৃদ্ধের দুই চোখ বহিয়া ধারা পড়িতে লাগিল। নির্ম্মাই জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর দেবতা, কাঁদ্‌ছেন কেন?" বৃদ্ধ কিছু বলিলেন না, কেবল সমস্ত শরীর দিয়া মনে মনে একবার নির্ম্মাই-হর্ম্মাইকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। কুমারী দুজনারও চোখ ভরিয়া উঠিয়াছিল—আর কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না।

সে দিন বৃদ্ধ পাঁচ সের ওজনের ঘণ্টাটা আর তুলিয়া বাজাইতে পারিলেন না।

(৩)

সন্ধ্যার সময় নির্ম্মাই মায়ের কাছে গিয়া বলিল "মা!"

রাজরাণী কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা?"

নির্ম্মাইর একটু বাঁধিতেছিল, হর্ম্মাই বলিল "মা, দিদির কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিও।"

রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা? বল!"

কুমারী এবার জোর করিয়া সকল সঙ্কোচ দূরে ঠেলিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন,—"মা, তোমরা বিবাহের আয়োজন করিতেছ, কিন্তু আমাদের বিবাহ যে আর হইতে পারে না!"

রাজরাণী দাঁতে জিভ্ কাটিয়া বলিলেন, "সে কি বাছা?" নির্ম্মাই বলিল "হাঁ মা! আমরা বাড়ীর দেব বিগ্রহের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছি ; আমাদের আর বিবাহ হইতে পারে না।" রাজরাণী কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন "বাছা, দেবতার কাছে সকলেই আত্মসমর্পণ করে ; তাই বলিয়া কি মানুষের সঙ্গে বিবাহ হইতে বাধা হয়?"

হর্ম্মাই বলিল "মা, এক প্রাণ কয় জনকে দেওয়া যায়? আমরা ভোলানাথকে আমাদের জীবন যৌবন

করিয়া ফেলিয়াছি; তিনিই আমাদের স্বামী, তিনিই আমাদের স্বর্গ!”

রাজরাণী কি উত্তর করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

ত্রিপুররাজ রাণীর মুখে সব বৃত্তান্ত জানিয়া শুনিয়া কুমারী দুজনকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন; বলিলেন “তোমাদের পাগলের মত কথা আমি কিছুতেই শুনিতে পারি না। বিবাহ তোমাদের হইবেই জানিয়া রাখিও।”

পরদিন হইতে রাজকুমারীদের ঠাকুর ঘরে যাওয়া নিষেধ হইয়া গেল।

বৃদ্ধ পুরোহিত এখন বিছানা হইতেই উঠিতে পারেন না—এসব সংবাদ কিছুই পাইলেন না।

ক্রমে বিবাহের দিন আসিল। বৃদ্ধ সেদিন পর্য্যন্ত কোন মতে বাঁচিয়া রহিয়াছিলেন। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণে কেমন একটা উল্লাস জন্মিল। তাঁর মনে হইল পুরাতন যৌবন যেন আবার নূতন হইয়া তাঁকে দেখা দিয়াছে; যেন বাতাসে বাতাসে আনন্দের সুর বাজিতেছে; যেন জীবনের সকল আশা সকল বাসনা, সকল সাধনা পূর্ণ হইবার জন্য যে মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা করিতেছিল, তাই আজ সাত রাজার ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত হইয়া আসিতেছে; ভোর বেলাকার এই অচেনা উল্লাস তারই শুভ সংবাদ লইয়া রাজদূতের মত উপস্থিত হইয়াছে। তাই পাখী আজ এমন সুন্দর গায়, সানাইর বাজনা এমন মধুর লাগে, ছেলে মেয়ের আনন্দ কোলাহল এমন প্রাণ কাড়িয়া নেয়।

বৃদ্ধ কোন মতেই হৃদয়ের এই নবীন উৎসাহকে থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তাই পূব আকাশের প্রথম লালিমাটুকু মিলাইতে না মিলাইতে, পদ্মপাতার শিশির বিন্দু শুকাইতে না শুকাইতে রাজবাড়ী নবাব মুরজ যখন সবেমাত্র বাজিয়া উঠিল, তখনই তিনি পাল্কি করিয়া আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

বেলা দুই প্রহরের পর চারি দিক্ হইতে মানুষের স্রোত আরম্ভ হইল। লাখে লাখে প্রজা ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর মত আসিয়া মাঠ মন্দিরে জড় হইতে লাগিল। নাচে, গানে, হাস্যে আমোদে, আহারে বিহারে রাজবাড়ী ইন্দ্রপ্রস্থ হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা হইল—আলোক জ্বলিল—সানাই বাজাইয়া মশাল সাজাইয়া নিশান উড়াইয়া বরের দল আসিয়া হাজির হইল সে ছোট দল নয়; এক হাজার বরযাত্র আর দশ হাজার বরকন্দাজ। রাজবাড়ী থই থই করিতে লাগিল।

শেষে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত। কুঞ্জ সাজাইয়া আসন সাজাইয়া বর সাজাইয়া মানুষ কনে আনিতে গেল; কনে কোথায়? দেখ দেখি এ ঘর? নাই! দেখ দেখি ও ঘর? নাই! সে ঘর? নাই! কোথাও কনে নাই! নির্ম্মাইও নাই হর্ম্মাইও নাই! একি সর্ব্বনাশ! বরের খাটে বর বোবা হইয়া বসিয়া রহিল—সিংহাসনে রাজা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন—মেয়েদের সভায় রাণী হায় রে হায়! বলিয়া মূর্চ্ছা গেলেন! রাজবাড়ীভরা আনন্দের বান ফুলিয়া উঠিতে উঠিতে হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল!

তখন যাহারা বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা কন্যা খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়িল। ঘাট, মাঠ, বাগান, বন চুল চুল করিয়া খোঁজা হইল; কিন্তু কুমারীদের সন্ধান মিলিল না। শেষে মানুষ শ্রান্ত হইয়া যার যার ঘরে ফিরিল।

রাজরাণী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আশা করিতে ছিলেন, কেউ বুঝিবা নির্ম্মাই হর্ম্মাইর খবর লইয়া আসিতেছে! কিন্তু প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তই বৃথা চলিয়া যাইতে লাগিল—দোর নড়িলে কাঁপিয়া উঠিয়া, পাতা নড়িলে চমকিয়া উঠিয়া, ঘরে কারো ছায়া পড়িলে লাফাইয়া উঠিয়া রাণী দণ্ডের পর দণ্ড—প্রহরের পর প্রহর কাটাইলেন—রাত্রি শেষ হইতে চলিল—তবু নির্ম্মাই-হর্ম্মাই আসিল না; কেউ তাদের খবরও আনিল না।

ঊষাকালে রাজপুরোহিত ইষ্টদেবের নামের সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মাই-হর্ম্মাইর নাম নিতে নিতে ভবের লীলা সাঙ্গ করিলেন। রাজার আদেশে তাঁর শ্মশানের পাশে মৃত্যু-শীলা রচিত হইল।

বড় যত্নে রাজবাড়ী সাজান হইয়াছিল, প্রজাগণ কাঁদিতে কাঁদিতে সে সব সাজ সজ্জা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আত্মীয় বান্ধব যাহারা আসিয়াছিল, বিদায় লইয়া যার যার বাড়ী চলিল। সন্ধ্যা আসিতে না আসিতে সে প্রকাণ্ড পুরী বিজয়া রজনীর দেবী ঘরের মত নীরব নির্জ্জন হইয়া গেল।

(৪)

এর পর বহু দিন চলিয়া গিয়াছে; লোকে নির্ম্মাই হর্ম্মাইর কথা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছে; তখন রাজা এক দিন শিকারে বাহির হইতে ইচ্ছা করিলেন। গাড়ী ঘোড়া পাইক নফর সৈন্য সামন্ত সব সাজিল। পথকাটুনিরা খন্তা কুড়াল লইয়া বাহির হইল। রাজার হাতী শিকারীদের আগে আগে চলিল।

সে দিন জঙ্গলে খুব হরিণ ছিল। রাজা শিকার করিতে করিতে দল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, এবং এক রাজ্য ছাড়িয়া আর এক রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন। সেখানে এক নিবিড় অরণ্যের ভিতরে দুখানা ঘর, আর তার কাছে একটি ছোট ফলের বাগান, আর সেই বাগানের মধ্যে একটি ছোট পুকুর। রাজার খুব তৃষ্ণা পাইয়াছিল, পুকুরে নামিয়া পেট ভরিয়া জল পান করিলেন, তার পর একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিলেন।

বাগানে জন প্রাণী নাই। ঘরের পাশে কেবল একটি হরিণ শিশু নির্ভয়ে ঘুমাইতেছিল, এবং ঘরের ভিতরে একটি ফুলবেলপাতা ঘেরা শিবলিঙ্গের চন্দনমাখা মাথাটি দেখা যাইতেছিল। রাজা লিঙ্গদেবকে প্রণাম করিলেন; তার পর হরিণ শিশুটির দিকে চাহিয়া ধনুতে হাত দিলেন। কিন্তু তথাপি আবার কি ভাবিয়া ধনুটি গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়া ছায়া-শীতল দূর্ব্বাঘাসের উপর শুইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ নির্ম্মাই-হর্ম্মাইর কথা তাঁর মনে পড়িয়া গেল। এমন এক দিন ছিল, যে দিন তিনি মৃগয়া করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া যখন বাড়ী ফিরিতেন, এবং পরিচারিকার হাতে শর-তীর-ধনু তুলিয়া দিয়া পালঙ্কের উপর শুইয়া পড়িতেন, তখন এই দুইটি আনন্দের পুতলি তাঁর পায়ে মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলাইয়া দিত, এবং তাঁর ঘর্ম্মাক্ত দেহে চন্দনের পাখায় বাতাস করিত। ইহারা তাঁহার আহারের সাথী ছিল, শয়নের সাথী ছিল, খেলার সাথী ছিল, আলাপের সাথী ছিল। ইহাদের সঙ্গে কত অর্থ-শূন্য কথা কহিতে কহিতে নিত্যি তাঁহার আধ রাত্রি কাটিয়া যাইত—অথচ সে কথা ফুরাইত না। একটুকু অন্য দিকে মন গেলে তারা যে তাদের কচি হাতের চাঁপার কলির মত আঙ্গুলে তাঁর চিবুক ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া লইত, হায়, কোথায় সেই দিন!

ভাবিতে ভাবিতে রাজার ঘুম পাইল। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি এক ঘোর যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া আসিয়া অট্টালিকায় শুইয়া আছেন, আর তাঁর দুই কন্যা তাঁর কাছে বসিয়া কল্যাণ করে বাতাস করিতেছে। স্বপ্ন দেখিয়া রাজা চমকিয়া উঠিলেন; চাহিয়া দেখেন—স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে! প্রথম উত্তেজনায় মৃগয়ার অরণ্যটাকে রাজ প্রাসাদ বলিয়াই মনে হইল; এবং এই দুঃখের দীর্ঘ বৎসর কটি দণ্ডেকের স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হইল। তার পর যখন তন্দ্রার আবেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল, তখন মনে করিতে লাগিলেন, বুঝি এ সমস্তটাই একটা বিরাট স্বপ্ন—এই সেই পাঁচ বছর হইতে আরম্ভ করিয়া এই মৃগয়া পর্য্যন্ত সমস্তটা! হঠাৎ নির্ম্মাই হর্ম্মাইর কথা ছাঁৎ করিয়া বুকে জাগিয়া উঠিল। অমনি কোথা হইতে যেন একটা আপ্‌সোসের সুর আসিয়া কানে বাজিতে লাগিল, কী একটা মস্ত অভাবের বেদনা অন্তরের মধ্যে হাহাকার করিয়া উঠিল! হায়, সে অভাব পূরিবার নয়, সে আপ্‌সোস্ মিটিবার নয়!

রাজা ভাবিলেন—এই মৃগয়াটা, এই সুখের ক্ষণটাই শুধু বুঝি স্বপ্ন! তাই অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন! নিশ্চল, নিস্তব্ধ পাথরের মূর্ত্তির মত শূন্য দৃষ্টিতে মেয়ে দুটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে যখন তারা আদরে তাঁকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তখন তাঁর দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ জল পড়িতে লাগিল। মেয়ে দুটি

বলিল—"আমাদের জন্য খেদ করো না, বাবা! এই দেখ আমাদের আশ্রম—এই আমাদের জীবনের আরাধ্য শিবলিঙ্গ—আর এই দূরে আমাদের জীবনের সাথী হরিণ শিশুগুলি! ঝরণার জল, গাছের ফল, পাখীর গান, এ সকল কী চমৎকার! পাহাড়ী বালকেরা কি সরল! আমরা সুখে ঘুমাই, সুখে জাগি! তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার সন্তান দুটি পরম আনন্দে আছে।"

রাজা মেয়ে দুটিকে রাজধানীতে লইয়া যাইতে বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁরা গেলেন না। তাঁরা যার আনন্দ পাইয়া মজিয়াছেন, সে যে রাজ-প্রাসাদে দুর্লভ!

অগত্যা তিনি সেখানে এক শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, আর একটি দীঘি খনন করাইয়া দিলেন। শিবপূজা করিয়া, পশু পাখীর আহার দিয়া, পাহাড়ী বালকদিগকে নীতি শিক্ষা দিয়া রাজকুমারী দুজনার দিন কাটিতে লাগিল।

অরণ্যের নবীন সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাজা তার নাম রাখিলেন বালশিরি—সংস্কৃতে যাকে বলে বালশ্রী। আজকাল সমস্ত পরগণাকে "বালিশিরা" পরগণা বলে। নির্ম্মাই-দুর্ম্মাইর স্থাপিত দেবতা অদ্যাবধি 'নির্ম্মাই' শিব বলিয়া পূজিত।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা।

প্রাপ্ত প্রেম

অনেক ভাবিয়া অনেক বুঝিয়া
অনেক বিচার করি'
নিয়েছিনু তারে আমি যে বরিয়া
হৃদয়-আসন 'পরি!

সাধ করে তারে ভালবেসেছিনু
আপন বাসনা মত,
মরমে সে কথা লুকায়ে রাখিনু
নানা ছলে অবিরত!

সারাটি দিবসে বারেক দরশ
তার বেশী নাহি চাই,—
সে যে পরাণের নিভৃত হরষ
বাহিরে খুঁজি না তাই!

জেনেছি তাহারে চিনেছি তাহারে
পেয়েছি তাহারে বুকে,—
উজল আলোকে দিনু আপনারে
আছি আজ সেই সুখে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

নামি-কো

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাবী বধূ

প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করিয়া য়্যামাকির কুরমা অলিন্দের সম্মুখে থামিল।

এক্ষণে স্নান সমাপনান্তে সে একখানি নরম আসনের উপর তোকোনোমার দিকে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া বেশ সচ্ছন্দে বসিয়াছিল। এখন সে নিজের প্রভু, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহার পশ্চাতে একটি ফুলদানিতে এক গুচ্ছ আইরিশ পুষ্প, সম্মুখে আহার্য্য সজ্জিত। প্রথমেই সে কিঞ্চিৎ সাকে পান করিল। পত্নী ওসুমি পরিবেশনার্থ বসিয়াছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি পাত করিল; সে দৃষ্টি অসন্তোষ জ্ঞাপন না করিলেও তাহার সাধাসিধা চেহারাটি লক্ষ্য করিতেছিল।

পরিচারিকা সন্ধ্যার সংবাদপত্র লইয়া আসিল। "এই যে, কোরিয়া সম্বন্ধে—গোলমাল বাড়ছে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—কি? চীন সৈন্য পাঠাচ্ছে? বেশ। তা হ'লে জাপানও সৈন্য পাঠাতে ছাড়বে না। লড়াই বাধবে। টাকা উপায়ের একটা ভারি সুযোগ হবে। ওসুমি এস তুমিও এক পেয়ালা খাও, খবর ভাল।"

"সত্যি লড়াই হবে নাকি?

"হাঁ। খুব মজা! তোমার জন্যে আর একটা ভালো খবর আছে। আজ চিজিওয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে বল্লে বিষয়টা বেশ অগ্রসর হচ্ছে।"

"তাই নাকি? তাকেও-সান মত দিয়েচে?"

"আরে না না। সে ত এখনো ফেরেনি, তার মত পাবে কেমন করে? তবে ওনামি-সানের আবার রক্ত বমি হয়েছিল তার শাশুড়ী সব আশা ত্যাগ করেচে, বলেছে তাকেওর অনুপস্থিতিতেই তার অভিপ্রায় সিদ্ধ করবে। এ ঠিক হবে চিজিওয়া যদি অনবরত তার কানে মন্তর দিতে থাকে। তাকেও বাড়ী থাকলে এ কাজটি করা একেবারেই সহজ হবে না, বিধবা তার অবর্ত্তমানে কাজ সারতে চায় আর কি। তারপর আমাদের সব সুবিধে হয়ে যাবে। এস পেয়ালা ভর্ত্তি কর।"

"আহা বেচারা ওনামি-সান!"

"তুমি ত মজার মেয়েমানুষ দেখচি। ওনামি-সানকে সরাতে চেয়েছিলে বেচারা ওতোয়োর দুঃখু দেখে, আর এখন, যখন সেই ইচ্ছেটা পূর্ণ হতে চলেছে তোমার কিনা দুঃখু হল নামিসানের জন্যে। ও সব ছেলেমানুষি ছেড়ে কি করে ওতোয়োকে তার গদিতে বসাবে তাই ভাবো।"

"তাকেও-সান যদি দেখে তার অনুপস্থিতেই নামিকে ত্যাগ করা হয়েছে তা হলে নিশ্চয়ই খুব রাগ করবে।"

"তা রাগ করুক আর যাই করুক এক বার ঠিক হয়ে গেলে আর কিছুতেই কিছু হবে না। আর তাকেও-সান ভালো ছেলে, মা একটু কান্নাকাটি করলেই চুপ করে যাবে। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যাক এ সব ত বেশ হল। এখন আসল কথা যা—আমাদের ওতোয়ো সুন্দরী—তাকেওর রাগটা খানিক পড়ে এলে তোয়োকে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে তা সে তাকে ডাকুক আর নাই ডাকুক। বলা যাবে এই আদবকায়দা শিখতে গেছে। খাবার খরচ ও আর আর খরচ যা লাগে তা নিশ্চয়ই আমরা দেব। প্রথমে যতটা শক্ত ভাবা গেসল আসলে ততটা নয়। সবই বিধবার মর্জ্জি। ওতোয়ো যদি ব্যারণেস কাওয়াশিমা হয় তা হলে তার ইচ্ছে পূর্ণ হবে, আর আমি ত শ্বশুর হব আমি কাওয়াশিমা পরিবারের জমিদারি দেখব, তাকেও একটা নিতান্ত ছেলেমানুষ কি না! ব্যস্ কেয়া মজা! কিন্তু গণ্ডগোলও হবে। তা হোক গণ্ডগোল। আপাততঃ আমাদের ভাববার বিষয় হচ্ছে ওতোয়ো।"

"কি তুমি খাবে না নাকি?"

"খাওয়ার জন্যে কে ভাবে এমন ফূর্ত্তির সময়। তুমি কিন্তু তার দিকে একটু নজর রেখ; স্বভাবটা যেন সে সোদরায়। না হলে সব মাটি করবে। চব্বিশ ঘণ্টা এরকম খিটখিট করলে এমন শাশুড়ী নেই যে চটবে না, হোক না কেন সে দয়ার অবতার।"

"আমি কিন্তু নিজে তাকে শেখাতে পারব না। তুমি সব সময়ে—" "থাম থাম। ও রকম ওজর আমার ভাল লাগে না। কথার চেয়ে কাজ ভালো। কেমন করে শেখাতে হয় দেখাচ্ছি। ডাক ত ওতোয়োকে।"

"দিদিমণি, কর্ত্তাবাবু তোমায় ডাকছেন।"

সেইমাত্র তোয়ো তাহার সায়ংকালীন সাজসজ্জা শেষ করিয়াছে, কিন্তু আয়নার সম্মুখ হইতে তখনো বিদায় গ্রহণ করিতে পারে নাই। পরিচারিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইল।

"আচ্ছা, এই হল ব'লে।" চুলে হাত দিয়া "আচ্ছা দেখ, এখানটা একটু খারাপ হয়ে গেছে না?"

"কিছু খারাপ হয় নি। তোমায় কি খাসা দেখাচ্ছে দিদিমণি!"

"সত্যি নাকি?" আয়নার দিকে চাহিয়া তোয়ো মৃদু হাস্য করিল।

মুখের উপর হইতে আস্তিন সরাইয়া হাস্য সংবরণ করিয়া পরিচারিকা কহিল, "কর্ত্তাবাবু বসে রয়েছেন তোমার জন্যে।"

"জানি গো জানি। যাচ্ছি।"

দর্পণের দিকে শেষ বার দৃষ্টিপাত করিয়া ত্বরিতগতিতে কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া সে পিতার কক্ষে হাজির হইল।

"এই যে ওতোয়ো, তোমার জন্মে আমরা বসেছিলুম। তোমার মার কাজটা তুমিই কর, পেয়ালা ভর্ত্তি কর। আহা, বোতলটা কি অমনি জোরে নাবিয়ে রাখতে হয়? চা পরিবেশণের শিক্ষাটা তবে কি রকম হয়েছে? হ্যাঁ এই বার ঠিক হয়েছে, অমনি আস্তে আস্তে করতে হয়।"

য়্যামাকি "চুর" হইয়া উঠিয়াছিল। পত্নীর নিষেধ সত্বেও সে পুনর্ব্বার পান করিয়া কহিতে লাগিল, "এই রকম সাজগোজ করলে ওতোয়োকে দিব্যি দেখায়, কি বল ওমুমি? রংটাও ওর ফর্শা।"

তোয়ো হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। আনন্দ আর ধরে না।

"সময় বিশেষে ওর চেহারাও সুশ্রী, কথাও মিষ্টি। কেবল ওর সামনের দাঁতটা ওর মারই মত একটু উঁচু।"

"দেখ!" ওমুমি ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া তিক্তের আস্বাদ পাইলে যেমন হয় ওতোয়োর ঠিক সেইরূপ বোধ হইল। মুখে তাহার তিক্তমধুর ভাব ফুটিয়া উঠিল।

"চোখের কোণ দুটো সামান্য—একটুখানি তোলো, আরো ভালো দেখাবে।"

"আবার!" স্বামীর মুখে একটা দরজা লাগান থাকিলে ওমুমি নিশ্চয়ই তাহা বন্ধ করিয়া দিত।

"ওই ত! চটো কেন ওতোয়ো? ওতে যে চেহারা মাটি হয়ে যাবে। অত রাগে দরকার নেই। শোন ভালো খবর আছে। আর এক বার পেয়ালা ভর্ত্তি করে দাও, তারপর বলছি।"

পরিপূর্ণ পেয়ালা নিঃশেষে পান করিয়া য়্যামাকি সহাস্যে কহিতে লাগিল—"এইমাত্র আমরা তাকেও-সানের কথা কইছিলুম।"

শুষ্ক গামলার ধারে বহু নিরানন্দ দিন কাটাইয়া অবশেষে বসন্তের নবীন তৃণগন্ধে অশ্ব যেমন করে তোয়োও তেমনি মাথা তুলিয়া কান খাড়া করিল।

"তুমি ওনামি-সানের ছবির ওপর আঁচড় কেটেছিলে সেই শাপ তাকে লেগেছে।"

"ফের!" ওমুমিঠাকরুণ তৃতীয় বার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।

"এখন কাজের কথা শোন। ওনামি-সানের খুব অসুখ সেই কারণে তাকে ত্যাগ করা হবে। না, তার মা বাপের কাছে কথাটা এখনো উথাপন করা হয় নি, ওনামি-সান নিজেও কিছুই জানে না তবে শীগ্‌গিরই সব স্থির হয়ে যাবে। এখন তার স্থানে দেওয়া যায় কা'কে? এখন কথা হচ্ছে এই; তোমার মার ও আমার ইচ্ছে হচ্ছে তুমিই সে স্থান অধিকার কর। না না, তা বলে এত শীগ্‌গির হতে পারে না। সেই জন্মে তোমায় কাওয়াশিমার বাড়ীতে চাকরি করতে পাঠাব—দাঁড়াও, অত অবাক হলে চলবে না—তদ্বিবৎ শেখবার ছল করে ঢুকবে, কি উদ্দেশ্য সে ত তোমার জানাই রইল। বিধবার সন্তুষ্টির ওপর তোমার সফলতা নির্ভর করছে। এইটি মনে রেখো।"

নিশ্বাস ফেলিবার জন্য সে থামিল। পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কন্যার মুখপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

"কথা এই, ওতোয়ো। সকাল সকাল হলেও কথাটা তোমায় বেশ করে বোঝাতে চাই। তুমি ত জান তাকেও-সানের মা স্বার্থপর, একগুঁয়ে খিট্‌খিটে মেজাজের লোক—কিছু মনে কোরো না, তিনি যে তোমার ভবিষ্যৎ মা সে কথা ভুলে যাচ্ছিলুম, কিন্তু যাই হোক, তিনি, এই যে তোমার মা বসে আছেন, ওর মত ভালমানুষ নন। কিন্তু তা বলে তিনি সাপও নন রাক্ষসীও নন, তিনি মানুষ। বুদ্ধি যদি থাকে ত এমন কি সাপ বা রাক্ষসকে বিয়ে করা যায়। আমি যদি মেয়েমানুষ হতুম ত তাকেওর মা বা ওরই মত আর কাউকে দুদিনে একেবারে জল করে দিতুম। যাক আমার ওমরে ত আর তোমার কিছু হবে না, কিন্তু কি রকম কর্তে হবে সে বিষয়ে উপদেশ দিতে পারি। যা বলি বেশ মন দিয়ে শোন ওতোয়ো। যদি তুমি ওখানে চাকরাণী রূপে যাও—তার মানে বউ হবার চেষ্টায় ছদ্মবেশ ধরে যাও ত এখনকার মত অত ঘুমে হলে চলবে না। ভোরে উঠতে হবে—বুড়ো

মানুষেরা সকাল সকাল ওঠে জান ত—অন্য কাজে মন না দিলেও বুড়ীর কাজ বেশ মন দিয়ে কর্ত্তে হবে। আর দ্বিতীয়তঃ আজকাল যেমন সহজেই রেগে ওঠ অমনটি কিছুতেই চলবে না—সব সময়েই হার মানতে হবে। বুঝেচ ?

"বকুনি খাবার সময় চুপটি করে থাকবে, কোনো অসঙ্গত দাবি হলেও 'না' বলবে না, এমন কি তুমি যখন যখন বুঝচ তোমার কথাই ঠিক তখনো তার উল্টোটাই মেনে নিতে হবে। তবে তারা কতক কতক তোমার কথা শুনবে। হেরে জেতা বলে' যে একটা কথা আছে তা এই। কখ্খনো চোটবে না, বুঝলে ? শেষ কথা,—যদিও একথা বলবার সময় এখনো হয়নি তবুও এই সুযোগে বলে ফেলি—ধর অবশেষে তোমার বিয়ে হল্। সাবধান, তাকেওসানের সঙ্গে যেন সুখে সচ্ছন্দে ঘরকন্না কোরো না।

"ভিতরে যাই কর কারো সাক্ষাতে খুব সাবধানে তার সঙ্গে ব্যাভার করবে। শাশুড়ীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্টতা রাখবে আর তাঁর সামনে স্বামীকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দেবার সাহস থাকা চাই। বৌ ছেলেকে ভালোবাসে দেখে মা'র আনন্দ হওয়া উচিত, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, সাধারণতঃ সে তা পছন্দ করে না। কারণ, হয় হিংসে নয় স্বার্থপরতা। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও, স্বামীকে খুব বেশী ভালোবাসলে শাশুড়ীর অযত্ন হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অন্ততঃ সে তাই ভাবে। ওনামি-সান তাকেও-সানের সঙ্গে সুখী হয়ে ঐ রকম একটা ভুল করে থাকবে। ওকি ? অত হিংসে কেন ? তোমাকে ত বল্লুম এ সব সইতে হবে। শাশুড়ী যাতে বোঝে যে তুমি তার বউ, তার ছেলের নয়। তরুণ দম্পতী খুব সুখে রয়েছে দেখলে ছেলের মা ভাবে সে একলা পড়ে গেছে—সাধারণতঃ এই কারণে শাশুড়ি-বৌতে বনিবনাও হয় না। তাই বলছি তুমি ভাববে তুমি যেন বুড়ীর স্ত্রী। সময়ে যখন সে 'পটল তুলবে' তখন তুমি তাকেও-সানের গলা জড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে পার। কিন্তু বিধবার সামনে তার দিকে ফিরে একটু হাসতেও পাবে না। আরো উপদেশ আছে, কিন্তু যত দিন না তুমি যাবার জন্যে প্রস্তুত হও তত দিন সে সব বলব না। আপাততঃ এই তিন বিষয়ই যথেষ্ট। তুমি যখন তোমার প্রিয়তম তাকেও-সানের স্ত্রী হতে চলেছ তখন তোমায় স্বার্থত্যাগ করতে হবে। এখন থেকে আরম্ভ ক'রে তোমার যথাসাধ্য কর।"

কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই পর্দা খুলিয়া একখানি চিঠি লইয়া পরিচারিকা প্রবেশ করিল। লেফাফা ছিঁড়িয়া য়্যামাকি একবার চিঠিখানির উপর চোখ বুলাইয়া লইল তারপর পত্নী ও কন্যার মুখের সামনে সেখানি ধরিয়া বলিল, "এই দেখ, বল্‌তে বল্‌তে। কাওয়াশিমা-গিন্নী আমার সঙ্গে এখুনি দেখা করতে চান।"

তাকেওর নৌ-প্রদর্শনীতে যাইবার দুই সপ্তাহ পরে এবং কাওয়াশিমা-গৃহে য়্যামাকির আহূত হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে নামির আর এক বার রক্ত বমন হওয়াতে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকা হইল। সৌভাগ্যক্রমে গুরুতর কিছু ঘটে নাই। আপাততঃ কোনো আশঙ্কা নাই চিকিৎসক এইরূপ মত দিলেন। কিন্তু এসংবাদে তাকেওর মাতা বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। দু' এক দিন পরে বিধবা কাওয়াশিমার যে বিপুল বপু ফটকের বাহিরে কদাচ দেখা যাইত—দেখা গেল ঈদামাচির কাতোদের বাটী অভিমুখে চলিয়াছে।

যে দিন সন্ধ্যাকালে মাতাপুত্রে নামিকে ত্যাগ করিবার প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছিল সে দিন পুত্রের অপ্রত্যাশিত বাধা প্রাপ্ত হইয়া বিধবা তাহার প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত এ বিষয়ের মীমাংসা স্থগিত রাখিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে সে রাজি হইবে কি না সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল; সে ভাবিত যতই দিন যাইবে নামির প্রতি পুত্রের অনুরাগ হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে, তারপর কখন কি ঘটে তাও ত বলা যায় না। তাই সে স্থির করিল পুত্রের অবর্ত্তমানে সব স্থির করিয়া ফেলিবে, কিন্তু কেমনধারা একটা ভয় এবং পুত্রের নিকট তাহার প্রতিজ্ঞা, চিজিওয়ার যাহাতে

সন্তোষ হয় এরূপ কোনো কার্য্য হইতে তাহাকে বিরত রাখিয়াছিল। নামির দ্বিতীয় বার রক্ত বমনের সংবাদ সমস্ত উল্টাইয়া দিল। পুত্রের বিবাহে যিনি ঘটকালি করিয়াছিলেন সেই কাতোর সঙ্গে বিধবা সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রতিবেশী হইলেও বিধবা কখনো কাওয়াশিমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত না। এক বার কেবল বিবাহে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়াছিল। তাই তাঁর অপ্রত্যাশিত আগমনে কাতো-গৃহিণী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন—নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। অভ্যাগতকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। বিধবার আগমনের কারণ যখন শুনিলেন তখন যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। যে হাতে কাতাওকা ও কাওয়াশিমা পরিবারকে যুক্ত করিয়াছিলেন কে ভাবিয়াছিল সেই হাতেই সে বাঁধন ভাঙ্গিবার নিমন্ত্রণ আসিবে!

কাতোগৃহিনী তাঁহার অভ্যাগতের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়াছিলেন। ভাবিতেছিলেন কি সাহসে সে তাঁহার নিকটে আসিয়া অম্লান বদনে এই সব নিষ্ঠুর কথা বলিতেছে। বিধবা কিন্তু হাঁটুর উপর হস্তদ্বয় বদ্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে বিপুল বপু খাড়া করিয়া বসিয়া রহিল। কাতোগৃহিণী ভাবিতেছিলেন, বিধবা পরিহাস করিতেছে না ত, মাথার নিশ্চয়ই গোলমাল হয় নাই? কিন্তু অবশেষে বিধবা যখন স্পষ্ট স্বীকার করিল যে, সে যাহা বলিতেছে তাহাই করিতে চাহে তখন দারুণ ক্রোধ আসিয়া বিস্ময়ের স্থান অধিকার করিল। ইচ্ছা হইল স্বার্থপর বিধবাটাকে বেশ কয়েকটা কড়া কথা শুনাইয়া দান। কিন্তু নামি যে তাঁর কাছে তাঁর কন্যারই মত প্রিয়, তার জন্য ভর্ৎসনার কথাগুলো মনে মনে চাপিয়া গেলেন; বিধবাকে বুঝাইতে লাগিলেন, তাহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, অবশেষে তাহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। সে সব কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে কাতোগৃহিণীকে সে বুঝাইয়া দিল যে, এ সব বাজে কথা শুনিবার অবসর নাই, সে যেন নামির পিতামাতার নিকট সংবাদটা লইয়া যায়। বিধবার কথা শুনিতে শুনিতে কাতোগৃহিণীর চোখের সামনে পীড়িতা ভগ্নী-কন্যা নামি, নামির মাতা ও তাহার ভগ্নীর মৃত্যুশয্যা, দুহিতার মঙ্গলেচ্ছু জেনারল—একে একে সকল ছবিগুলিই ভাসিয়া উঠিল। ক্রমে ভাবনার ভার বাড়িয়া উঠিল, চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন—পতির মতের অপেক্ষা না করিয়াই জবাব দিয়া দিলেন—কাতো-পরিবার প্রেমের বন্ধনে এই দুই পরিবারকে যুক্ত করিয়া দিলেও এই নিষ্ঠুর অন্যায় কার্য্যে তাহাদের হস্ত কলঙ্কিত করিবে না। কিছুতেই নয়।

বিধবা সরোষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই দিন সন্ধ্যাকালেই পত্রদ্বারা য়্যামাকিকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ভাবিলেন ভাল মানুষ তাজাকির দ্বারা এই অত্যাবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কাতোঠাকুরাণীর স্বামী উপস্থিত ছিলেন না, তাই তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া কন্যা চিজুর সাহায্যে তাকেওর জাহাজের ঠিকানা যোগাড় করিয়া তাহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন। বিধবা অন্য রূপ বলিলেও তাকেও যে এরূপ কাজের বিরোধী ইহাই তিনি বিশ্বাস করিতেন।

ইতিমধ্যে কুপিতা বৃদ্ধা একেবারে সোজাসুজি কথাবার্ত্তা কহা স্থির করিয়াছে। য়্যামাকি দূতরূপে প্রেরিত হইল, তাহার কুরুমা কাতাওকার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রত্যানয়ন

আকাশাকার লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল কাতাওকার বাটীর ফটক দিয়া য়্যামাকির কুরুমা যখন প্রবেশ করিতে-ছিল ঠিক সেই সময় অশ্বপৃষ্ঠে এক জন বলিষ্ঠ সামরিক কর্ম্মচারী বাহির হইয়া আসিলেন। কুরুমার শব্দে চকিত হইয়া ঘোড়াটা লাফাইয়া পিছনের দুই পায়ে ভর

দিয়া প্রায় সোজা হইয়া দাঁড়াইল। সৈনিক সহজেই ঘোড়াটিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া একটা চক্কর দিয়া ফটকের বাহির হইয়া গেলেন।

সৌম্যদর্শন অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়া গেল দেখিয়া য়্যামাকি গলা পরিষ্কার করিয়া জমকালো অলিন্দের দিকে অগ্রসর হইল। সে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে গিয়াছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য আজ তাহার সাহস একেবারেই কুলাইতেছে না। পূর্ব্বরাত্রে অস্তকার কার্য্যের জন্য যখন সে কাওয়াশিমা-গৃহিণী কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিল তখন সে একটু ঘাবরিয়া গিয়াছিল; কিন্তু আজ যখন সেই কার্য্যের সম্মুখীন হইল তখন স্বীয় হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যে নিজের উপর ধিকার জন্মিল। এই হৃদয়কেই সে ইতি-পূর্ব্বে কাংশ্যের মত দুর্দ্দমনীয় ভাবিত!

কার্ড পাঠানের পর ভৃত্য দ্বিতীয় বার আসিল ও য়্যামাকিকে বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গেল। একটা টেবিলের উপর চীন ও কোরিয়ার একখানা মানচিত্র বিস্তৃত, এবং তার ধারে পোড়া দেশালাইয়ের কাঠি ও ছাইদানে একগাদা ছাই অনতিকাল পূর্ব্বে যে বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল তার কথা স্মরণ করাইতেছিল। এই সময়ে কোরিয়ার বিদ্রোহ, চীন সৈন্যের সঞ্চালন ও জাপানী সেনাদল প্রেরণের গুজব সমস্ত সভ্য জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল। জেনারল পশ্চাতে রক্ষিত সেনাদলভুক্ত হইলেও তাঁর মাথা ঘামাইবার এত কথা ছিল যে, ইংরাজি পড়িবার সময়টি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

য়্যামাকি বসিয়া বসিয়া কৌতুহলের সহিত ঘরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমন সময় সুদূর বজ্র নিনাদের মত পদশব্দ অগ্রসর হইতেছে শুনা গেল এবং তৎপরে পাহাড়ের মত বিপুলকায় এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া অপর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। জেনারেলকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া য়্যামাকি চৌয়ারখানা ফেলিয়া দিল। থতমত খাইয়া দু চার কথায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে চেয়ারখান তুলিয়া ফেলিল ও তিন চার বার তাঁহাকে অভিবাদন করিল। হইতে পারে একই সময়ে সে অভিবাদন করিতেছিল ও অসভ্যতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করিতেছিল।

"বসুন বসুন। আপনিই য়্যামাকি-সান্? আমি আপনার নাম শুনেছিলুম কিন্তু—"

"আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে বড়ই সুখী হলুম। আমার নাম হ্যোকো য়্যামাকি," তারপর খুব বিনয় প্রকাশ করিবার চেষ্টায় কহিল, "মুখ্যুসুখ্যু লোক আমি।" প্রত্যেক কথার শেষে সে একবার করিয়া অভিবাদন করে, আর প্রত্যেক বারই চেয়ারটা ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ করে, যেন বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে, "ঠিক ঠিক"!

কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় কথা ও কোরিয়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর, জেনারল্ য়্যামাকির আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কথা বলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া য়্যামাকি প্রথমে গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইল। কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে আরো দুই বার এরূপ করিতে হইল। কি আশ্চর্য্য! তার মুখে এ কথা অনর্গল বাহির হয়! ঠিক এমনি সময়ে কি সেগুলো কণ্ঠে আটকাইয়া গেল!

অবশেষে য়্যামাকি কহিল, "আমি কাওয়াশিমাদের বাড়ী থেকে একটা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে প্রেরিত হয়েছি।" বিস্ময়ের সহিত জেনারল তাঁহার ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি য়্যামাকির উপর স্থাপন করিলেন।

"তাই না কি?"

"কাওয়াশিমা-গিন্নী নিজেই আসতেন কিন্তু শেষে আমাকে পাঠালেন।"

"বুঝেচি।"

য়্যামাকি কপাল মুছিলেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও দরদর্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। "ওঁরা ভায়কাউণ্টেস কাতোকে পাঠাচ্ছিলেন বলবার জন্যে, তিনি রাজি হলেন না, অগত্যা আমাকে পাঠালেন।"

"বুঝচি, কিন্তু বিষয়টা কি?"

"সেটা হচ্ছে এই—বলতে বাধ বাধ ঠেকচে, কিন্তু কাওয়াশিমা-গিন্নী, আপনার কন্যা—"

কিছুকালের জন্য নিমেষবিহীন চোখে জেনারল য়্যামাকির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"তারপর ?"

"কথাটা আপনার কন্যার বিষয়ে। বলতে বড় বাধ বাধ ঠেকচে, আমরা তাঁর পীড়ার জন্যে বিশেষ চিন্তিত ছিলুম তা তো আপনি জানেন; এখন তিনি কতকটা সেরে উঠেচেন খুব সুখের বিষয় যদিও—"

"হুঁ।"

"আমাদের নিজেদের বলাটা কেমন দেখায়, আর আপনার প্রতিও বড়ই অবিচার করা হয়, কিন্তু তার অসুখটা বড় গোলমেলে। কাওয়াশিমা পরিবারটিও ছোট আর সেখানে তাকেও-সান কেবল একমাত্র পুরুষ সেই জন্যেই গিন্নী তাঁর জন্যে এত ভাবেন। কি ক'রে বলি বলুন, আপনার প্রতি বড়ই অবিচার করা হয়, পীড়াটা এমনি যে যদি আর কারো হয়ে পড়ে—হয়ত নাও হতে পারে—কিন্তু সাবধানের মার নেই, যদি কোনো গতিকে বাড়ীর মালিক তাকেও-সানের হয়ে পড়ে ত কাওয়াশিমা বংশই লোপ পাবে। আজকাল অবশ্য বংশলোপ বিশেষ একটা কিছু নয়, যাই হোক—সত্য বলতে কি—বলাও মুস্কিল কিন্তু—তাঁর অসুখটা এমন যে—"

য়্যামাকি থতমত খাইয়া গেল। হোঁচট খাইয়া খাইয়া বক্তৃতায় অগ্রসর হইতে হইতে তাহার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়াছে। জেনারল নির্ব্বাক হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এক্ষণে দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন।

"ব্যস্। বুঝেচি। মোট কথাটা হচ্ছে, নামির ব্যারাম সাংঘাতিক, সেই জন্যে আপনারা তাকে ফিরিয়ে দিতে বলেন। বেশ।"

তিনি মস্তক নোয়াইলেন ও চুরুটের ভস্মাবশেষ ভস্মাধারে রাখিয়া হাত মুড়িয়া বসিলেন।

"আপনি ঠিকই বুঝেচেন। আমার পক্ষে বলাটা ভারি মুস্কিল আশা করি আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না।"

"তাকেও-সান ফিরেচেন ?"

"আজ্ঞে না, তিনি ফেরেন নি। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই সব কথাই জানেন। আশা করি আপনি কথাটা ভালো ভাবেই নেবেন।"

"আচ্ছা।"

জেনারল পুনরায় মাথা নোয়াইলেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া বুকের উপর হাত দুই খানি বদ্ধ করিয়া রহিলেন। এত সহজেই কার্য্যোদ্ধার হওয়াতে য়্যামাকি হৃষ্টচিত্তে মুখ তুলিয়া দেখিল জেনারল চোখ বুজিয়া অধর চাপিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে কি এক রুদ্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"য়্যামাকি-সান!"

চোখ খুলিয়া জেনারল নিবিষ্ট মনে য়্যামাকির মুখ দেখিতে লাগিলেন।

য়্যামাকি কহিল, "আজ্ঞে ?"

জেনারল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ছেলে পুলে আছে বোধ হয় ?"

য়্যামাকি প্রশ্নটির যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না, মাথা নোয়াইয়া বলিল, "আজ্ঞে, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।"

"য়্যামাকিসান, বোঝেন ত আপনার ছেলে মেয়ে আপনার কত আদরের ?"

"আজ্ঞে ?"

'আচ্ছা আমি সম্মত হলুম। কাওয়াশিমাগিন্নীকে বলবেন, কোনো ভাবনা নেই। নামিকে আজই নিয়ে আসা হবে। আপনাকে কষ্ট দিলুম কিছু মনে করবেন না।"

য়্যামাকি উঠিয়া অনেক বার অভিবাদন করিল। উদ্দেশ্য সফল হওয়াতে আনন্দ হইতেছিল, এবং তাহার আগমনে যে সব দুঃখের সৃষ্টি হইল তার জন্য কিছু দুঃখও যে হয় নাই তা নয়।

আগন্তুককে বাড়ীর অলিন্দ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া জেনারল দ্বার বদ্ধ করিলেন।

শ্রীহেমনলিনী রায়।

—

ভালবাসা

(ইংরাজী হইতে)

১

রূপে দেহ উজল করি
একই প্রীতি-নিকেতনে
একই মাতার বুকে,
একই পিতার স্নেহের ডোরে
বাঁধা ছিল সবাই জোরে,—

টুটি সবে সে বাঁধ এখন
সরিৎ-সাগর-বনে,
ঘুমায় পরম সুখে !

নিঠুর মরণ, ছিঁড়িয়া দিল
এমন বাঁধন কঠোর মনে
শ্মশান করি গেছে।

(২)

আঁধার রাতে কুঁড়ির মত
নয়ন দুটি মুদে শুয়ে
থাক্‌তো শয়ন 'পরে,
মুখের পানে চেয়ে চেয়ে
ঘুম পাড়ানী গানটি গেয়ে,

একই মাতা রাখ্‌তো ঘিরে
চুমোয় গড়া প্রাচীর দিয়ে—
কতই যতন ক'রে ;

এখন তারা নাইকো সেথা
সুখে আছে কোথায় গিয়ে—
নাইকো মিলন-ঘরে।

(৩)

কেউ বা আছে পাহাড় 'পরে
তুষার-ঘেরা আবাস করে',
কেউ বা আছে বনে ;—

কেউ বা আছে সাগর-তলে
ঘেরা সে যে অতল জলে,

কেউবা আবার ক্ষুব্ধ মনে
বিজয় মুকুট মাথায় ধরে
প্রাণ দিয়েছে রণে ;

যেথায় আছে তেমনি র'বে
ঘট্‌বে নাকো দিনের পরে
মিলন কারও সনে।

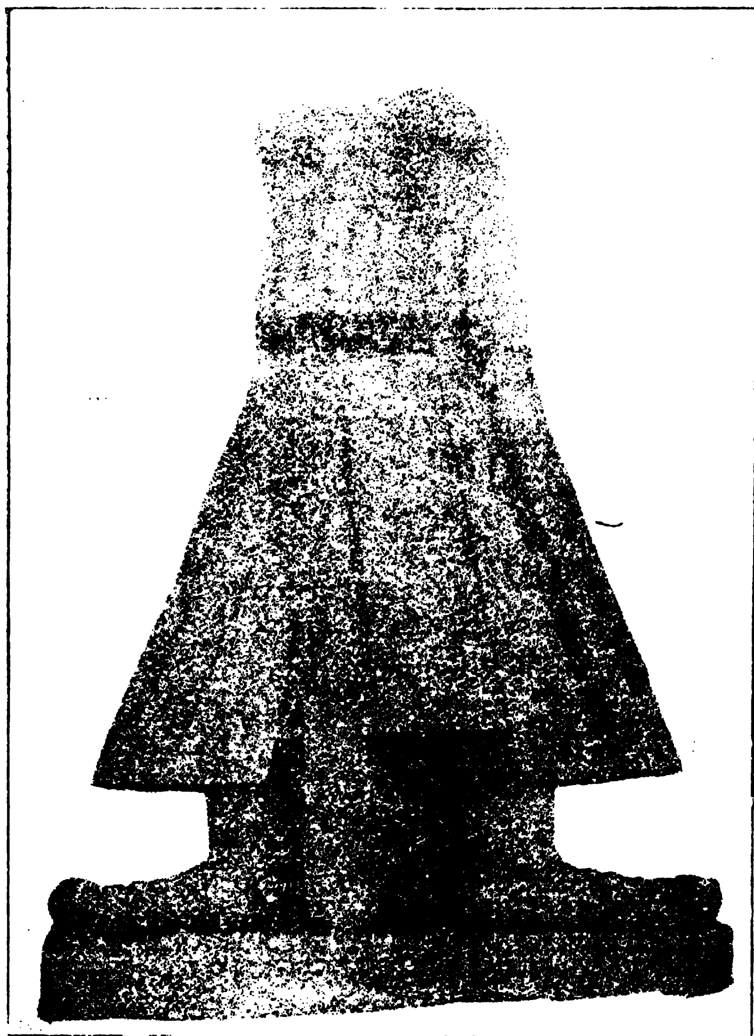
(৪)

ভালবাসা ! কোথায় তুমি ?
কোথায় তোমার বাঁধন-জোর ?
একি এ বিড়ম্বনা—
এই জগতে তোমার বাসা
শুধুই হেথা যাওয়া আসা,

পরলোকে বাড়ী তোমার—
আঁধার রাতি সদাই ভোর—
ঝরে আলোর কণা ;

চিরমিলন সেই জগতে,
অটুট সদা স্নেহের ডোর
নাই ভব যন্ত্রণা।

শ্রীরেণুকাবালা দাসী।



মথুরায় প্রাপ্ত রাজা কনিষ্কের প্রতিমূর্ত্তি



মথুরায় প্রাপ্ত রাজা কনিষ্কের প্রতিমূর্ত্তি সংশ্লিষ্ট শিলালিপি

গং আর্ট প্রেস, ঢাকা

মথুরায় প্রাপ্ত

রাজা কনিষ্কের প্রতিমূর্ত্তি *

মথুরা মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অবৈতনিক কিউরেটর রায় বাহাদুর পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ সম্প্রতি একটি আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। মথুরার নিকটবর্ত্তী 'মাঠ' নামক গ্রামে এক মৃত্তিকা-স্তূপের মধ্যে রাজা কনিষ্কের প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। বিগত ১৭ই জুন শিমলায় 'পঞ্চনদ ঐতিহাসিক সমিতির' এক বিশেষ অধিবেশনে ডাক্তার ফোগেল মথুরার এই আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে এক অতি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করেন। শকরাজ কনিষ্কের এই প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে অতি মূল্যবান্। বুদ্ধদেবের বহু মূর্ত্তি ভারতবর্ষ ও জাভা দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু কনিষ্কের ন্যায় এত বড় বৌদ্ধ রাজার প্রতিমূর্ত্তির আবিষ্ক্রিয়া ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে প্রথম বলিতে হইবে।

প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যীশুখৃষ্টের জীবন-সময়ে পেশোয়ারের (প্রাচীন গান্ধার দেশ) নিকট-বর্ত্তী স্থানে সম্রাট্ কনিষ্ক রাজত্ব করিতেন। *

ইনি কুষণবংশীয় ছিলেন। (ক) রাজা হোবিষ্ক ও কনিষ্কের মুদ্রা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে বৌদ্ধ ধর্ম্ম উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রাজধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। (খ) হোবিষ্ক প্রথমে কাবুলে রাজত্ব করিতেন; ঐস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া কাশ্মীরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন এবং পরিশেষে পার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র প্রদেশ জয় করিয়া মথুরা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

হোবিষ্ক মথুরায় একটি বিহার স্থাপন করেন। বিখ্যাত গ্রীসীয় ঐতিহাসিক আলেকজেন্দর পলিহিষ্টর (খৃঃ পূঃ ৮০—৬০) এই বিহারের বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হোবিষ্কের পর তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা হেষ্ক রাজত্ব করেন। ইনিও একটি বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই অগ্নি-উপাসক ছিলেন। হোবিষ্কের পর তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা কনিষ্ক খ্রীষ্ট-জন্মের দশ বৎসর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহার রাজ্য কাবুল হইতে হিন্দুকুশ ও বোলার পর্ব্বত, সমগ্র কাশ্মীর ও লাদক † এবং মধ্য হিমালয়, দক্ষিণে আগ্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের সংশয়মূলক বিবিধ শিক্ষা ও উপদেশে বিমূঢ়-চিত্ত সম্রাট্ কনিষ্ক শিক্ষাগুরু পার্শ্বিকের উপদেশ মত তৃতীয় মহা সঙ্গতি আহ্বান্ করেন। বসুমিত্র এই সভার সভাপতি ছিলেন; পাঁচ শত শিক্ষিত ভিক্ষু কাশ্মীর নগরীর এই বিরাট সভায় যোগ দান করেন। ভিক্ষুগণ বৌদ্ধ-বেদ সূত্রপিটক, বিনয় ও অভিধর্ম্ম বিভাষা শাস্ত্র নাম্নী সন্দীপনী প্রস্তুত করেন। রাজা কনিষ্ক এই গ্রন্থ তামার পাতে উৎকীর্ণ করিয়া একটি প্রস্তর নির্ম্মিত বাক্সের মধ্যে উহা সুরক্ষিত করেন, এবং এই পিটকত্রয় সন্দীপনীর পবিত্রাধারের উপর এক দাগোবা ‡ বা স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই স্তূপ এখনও

* এই সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের লিখিত গবেষণাপূর্ণ আর একটি প্রবন্ধ সত্বরেই প্রতিভাতে প্রকাশিত হইবে। প্রঃ সং।

(ক) কাহারও মতে কনিষ্কের পর হোবিষ্ক রাজত্ব করেন। কিন্তু বিখ্যাত বৌদ্ধতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত রিস্ ডেভিস্ বলেন,—

'Huvishka first reigned in Kabul * * His successor, Hushka built a Bihara. * * His successor, Kanishka, the third of the three brothers— * * *

(খ) Cunningham's Archæological Report P.p. 238. Dawson's Ancient Inscriptions from Mathura New Series. V P. P. 182.

† লাদক প্রদেশ কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত। এখানে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। ইহাদের মধ্যে রমণীর বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে।

‡ দাগোবা দক্ষিণ দেশের দ্রাবিড়ীয় শব্দ। উত্তর ভারতবর্ষে বৌদ্ধমন্দিরকে "দাগোবা" বলা হয় না। স্তূপাকার স্তূপকে দাগোবা বলে। এই দাগোবা শব্দ হইতেই দক্ষিণ দেশীয় পর্ত্তুগীজেরা "পেগোডা" শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত 'ধাতুগর্ভ' শব্দের অপভ্রংশ নয়।

আবিষ্কৃত হয় নাই, প্রত্নতত্ত্ববিদদের চেষ্টা ও যত্নের ফলে সত্বরই ইহা বাহির হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রাজা কনিষ্কের আবির্ভাব সময় লইয়া এখনও মতভেদ আছে। খ্রীষ্ট জন্মিবার ৫৭ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দ পর্য্যন্ত ইহার আবির্ভাব কাল বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। ইনি খ্রীষ্টের সমসাময়িক ছিলেন এই মতই অনেকে সমর্থন করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন এবং ইনি বৌদ্ধ সাহিত্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। সেই সময়ে বৌদ্ধ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে রাজা কনিষ্কের পৃষ্ঠ-পোষিত উত্তর ভারতবর্ষের বৌদ্ধ সাহিত্য শুধু চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্যারী নগরীর সুপ্রসিদ্ধ ভাষাবিৎ পণ্ডিত প্রফেসর সিলভেন্ লেভি চীন ভাষা হইতে কনিষ্ক সম্বন্ধে অনেক প্রচলিত কাহিনী ভাষান্তরিত করিয়াছেন। হুয়েনসাং বর্ণিত পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ হইতেই রাজা কনিষ্কের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সবিশেষ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। হুয়েনসাং রাজা কনিষ্কের বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের রাজধানী পুরুষপুরের পূর্ব্বদিকে এই বিরাট মন্দির ও মঠ অবস্থিত বলিয়া তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে উল্লেখ করিয়াছিলেন। বিগত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ মার্শাল ও ডাক্তার স্পুনারের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টার ফলে সেই লুপ্ত মন্দির ও মঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৌটা ও মুদ্রার উপর খোদিত মূর্ত্তিতে সম্রাট কনিষ্ককে চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে স্থাপিত দেখিয়া মনে হয় ইনি সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ ছিলেন না, হিন্দু দেবদেবীও মানিতেন।

'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে রাজা কনিষ্কের নামোল্লেখ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থানে লিখিত আছে 'তুরুষ্ক দেশীয় রাজা হুষ্ক, জুষ্ক এবং কনিষ্ক কাশ্মীরে নিজ নিজ নামে এক একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।' রাজা কনিষ্ক 'কনিষ্কপুর' নামে এক নগর নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান কাণীপুর গ্রাম কনিষ্কপুরের শেষ চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

মথুরায় আবিষ্কৃত সম্রাটের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ইতিহাস বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। মূর্ত্তিটি পাঁচ ফুট কুড়ি ইঞ্চি লম্বা। মস্তক ও বাহু নাই, তদ্ভিন্ন দেহের অন্যান্য অংশ অবিকৃত অবস্থায় আছে। রাজার পোষাক-পরিচ্ছদ একটু অদ্ভুত রকমের। বাম হস্তে তরবারি, দক্ষিণ হস্ত গদার উপর স্থাপিত। গায়ে জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত লম্বা চোগা চাপকান (ক), কোমরে কোমরবন্ধ ও পায়ে বড় বড় বুট। এই সাদাসিদে অদ্ভুত রকমের পোষাক দেখিয়া মনে হয় ইনি বিদেশী ছিলেন। দেহের পরিচ্ছদ সামান্য হইলেও তাঁহার তরবারি ও গদার মনোরম শিল্প-নৈপুণ্য বিদ্যমান। ইহা হইতে বুঝা যায় সম্রাট এক জন বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন। বৌদ্ধ জনশ্রুতি (খ) হইতে অবগত হওয়া যায় ইনি কান্যকুব্জের রাজাকে পরাজিত করেন, পার্থিয়ানদের (পারদ দেশবাসী) সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং উত্তর কালে যুদ্ধ বিগ্রহে অত্যন্ত আসক্তি বশতঃ ইনি নিজ প্রজার হস্তে নিহত হন।

নানা দিক দিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহাই মনে হয় সম্রাট্ কনিষ্কের উচ্চ হৃদয় এক দিকে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমন্ত্রে ও অপর দিকে বীরপুরুষের সাহস ও বীর্য্যে উদ্বোধিত হইয়াছিল। একাধারে এই দুইটি বিরুদ্ধভাবাপন্ন গুণের সমবায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে অতি বিরল।

মথুরায় রাজা কনিষ্কের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কি প্রয়োজন ছিল? মথুরাবাসী কি রাজভক্তিবশতঃ এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন? কাহারও মতে খৃষ্টীয় ৭৮

(ক) এই মূর্ত্তির চোগা-চাপ্‌কানের নিম্নাংশে জানু বরাবর সংস্কৃত ভাষায় এক লাইন লিপি উৎকীর্ণ আছে। ডাঃ—ফোগল ঐ শিলালিপির একখানি লিথো-প্রতিলিপি পাঠাইয়া দেন। এই এক পংক্তিতে লেখা আছে—'মহারাজা রাজাতিরাজা দেবপুত্রো কনিষ্ক।'

(খ) The war between Kanishka and the King of Kanouj is referred to in Chinese Buddhist meetings.

পরাদ্দে রাজা কনিষ্ক মথুরায় অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই মতাবলম্বীদের মতে রাজা কনিষ্কের অভিষেক ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য মথুরায় এই ধাতুময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু কথা এই কনিষ্কের রাজধানী কাশ্মীরে ছিল, কাশ্মীরেই অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার সমধিক সম্ভাবনা। মথুরায় কনিষ্ক রাজধানী স্থাপন অথবা স্থানান্তরিত করেন, ইহা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সমতল প্রদেশে—তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ বিহারের সন্নিকটে রাজার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই মনে হয়; বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ মথুরায় কনিষ্কের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্মরণীয় ঘটনার সহিত এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অভিষেক, শক-প্রবর্ত্তন অথবা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ এই তিনটি প্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কোনও না কোনও প্রকারের গৌণ অথবা মুখ্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

মূর্ত্তিটি মস্তকশূন্য অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক কোন ঘটনা বশতঃ উহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া থাকিলে ভগ্নস্তূপের নিকটবর্ত্তী কোনও না কোন স্থানে মস্তকটি পাওয়া যাইত। খুব সম্ভবতঃ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান সময়ে বৌদ্ধদ্বেষী কোনও হিন্দু অথবা মুসলমান রাজা এই স্মৃতি স্তম্ভের মস্তক ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

† হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির সমূহের অধ্যক্ষ (N. Circle) ডাঃ ফোগল সিমলা হইতে বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১২, আমাকে লিখিয়াছিলেন,—

"Dear Sir,

Dr. Marshall, D. G. of Archaeology has asked me to answer your letter to his address dated the 26th. ultimo. Allow me to combine my answer with a reply to your letter of the 29th. ult. addressed to me.

In the first place, I have much pleasure in sending you a photo of the Kanishka statue with permission to publish it in your book. × × × ×

All particulars regarding the statue you will find fully discussed in my paper which will appear in the journal of the Historical Society. I, may, however, briefly answer your queries at once.

(1) The inscription is in Sanskrit.

(2) It reads: "Maharaja Rajatiraja Devaputro Kanishko.

(3) The war between Kanishko and the king of Kanonj is referred to in Chinese Buddhist writings.

Thanking you for your kind wishes,

Yours faithfully,
Sd. J. P. Vogel,

মহাকবি অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ*

(দ্বিতীয়াংশ)

দ্বিতীয় সর্গে কবিকে ভট্টির ন্যায় ব্যাকরণ-প্রিয় দেখা যায়। এই সর্গের ১২ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ৫৫ শ্লোক পর্য্যন্ত লুঙ্ লকারের বিবিধ রূপাবলী পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখাইয়াছেন। এখানে তাহার কিঞ্চিৎ উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে—

> মাসক্তৎ কলিমপ্রাপ্তং নারক্ষমানমৈশ্বরম্।
> আগমেবুদ্ধিমাবিব্দদ্ ধর্ম্মায় ন তু কীর্ত্তয়ে॥ ২০
> অবর্দ্ধিষ্টগুণৈঃ শশ্বদ অবৃধন্মিত্রসম্পদা।
> অবর্ত্তিষ্ট চ বৃদ্ধেষু নাবৃতদ্ গর্হিতে পথি॥ ২৬

তাহার একই ধাতুকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর একরূপ পদকে একত্র প্রয়োগ করিবার আকাঙ্ক্ষাও এই সর্গে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়, ইহাতে অর্থবোধে বিলম্ব হয়, ও তজ্জন্যই তাহা দোষ বলিয়া পরিগণনীয়। যথা—

> "অশ্রান্তঃ সমরে যজ্বা যজ্ঞভূমিমমীমপৎ।
> পালনাচ্চ দ্বিজান্ ব্রহ্ম নিরুদ্বিগ্নানমীমপৎ॥
> গুরুভির্বিধিবিৎ কালে সৌম্যঃ সোমমমীমপৎ।
> তপসা তেজসা চৈব দ্বিষৎসৈন্যমমীমপৎ।"
> ৩৫ ৩৬

এস্থানে প্রথম 'মা ধাতুর অর্থ নির্ম্মাণ করা, দ্বিতীয়ের অর্থ শব্দ করা বা উচ্চারণ করা, এবং তৃতীয়ের অর্থ পরি-

* গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত—প্রথমাংশ বৈশাখে প্রকাশিত হইয়াছে।

মাণ করা; চতুর্থ "অমীমপৎ" পদ হিংসার্থক √মি ধাতু হইতে হইয়াছে।

সৌন্দরনন্দের স্থানে স্থানে কবির অনুপ্রাসপ্রিয়তারও পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে তাঁহার অন্ত্যানুপ্রাস বেশ রমণীয় হইয়াছে, যথা—

"তৌ দেবদারূত্তমগন্ধবন্তং
নদী সরঃ প্রস্রবণৌঘবন্তং।
আজগ্মতুঃ কাঞ্চনধাতুমন্তং
দেবর্ষিমন্তং হিমবন্ত মাশু॥"
১০॥৫

ইহা পড়িতে পড়িতে রামায়ণের বর্ষাবর্ণনার রচনার কথা মনে উদিত হয়। কোন কোন স্থলে এই অনুপ্রাসপ্রিয়তার জন্য অবনীকৃততা দোষ উপস্থিত হইয়াছে, যথা—

"কন্দর্পবত্যোরিব লক্ষভূতং
প্রমোদনাম্ন্যোরিব পাত্রভূতম্।
প্রহর্ষতুষ্ট্যোরিব নীড়ভূতম্॥"
দ্বন্দ্বং সহায়ন্ত মদান্ধভূতম্

অশ্বঘোষ গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন যে, রোগীকে মধুসংযোগে তিক্ত ঔষধ সেবন করণের ন্যায় সংসারীকে কাব্যচ্ছলে সংসার বাসনা হইতে নিবৃত্তি শিক্ষা, মোক্ষশিক্ষা দিবার জন্য তিনি এই আলোচ্য কাব্যখানি লিখিয়াছিলেন, রতি বা আনন্দের জন্যে নহে—

"ইত্যেষা ব্যুপশান্তয়ে
ন রতয়ে মোক্ষার্থ গর্ভাকৃতিঃ
শ্রোতৄণাং গ্রহণার্থ মন্যমনসাং
কাব্যোপচারাৎ কৃতা।
যন্মোক্ষাৎ কৃতমন্যদত্র হি ময়া
তৎ কাব্য ধর্মাৎ কৃতং
পাতুং তিক্তমিবৌষধং মধুযুতং
হৃদ্যং কথং স্যাদিতি॥"

তিনি যাহা লক্ষ্য করিয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মোক্ষকথাই তাঁহার উদ্দেশ্য হওয়ায় শান্তরস এই কাব্যের অঙ্গী, এবং তাহা সমুচিত রূপে পরিপুষ্ট হইয়াছে। দ্বাদশ হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্য্যন্ত ক্রমিক বৌদ্ধ শাসন পদ্ধতি অতি সুন্দর ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কি প্রকারে অমৃতপদ, মুক্তিপদ পাওয়া যাইতে পারে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এই জন্যই সপ্তদশ সর্গের নাম হইয়াছে 'অমৃতাধিগম'।

কবি আলোচ্য কাব্যের স্থানে স্থানে যেরূপ কবিত্ব-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বলিতে পারা যায়, যদি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য মোক্ষকথা না হইত, তিনি যদি কাব্যধর্মপ্রদর্শনই উদ্দেশ্য করিতেন তাহা হইলে অধিকতর সফলতা লাভ করিতেন। কিন্তু তাহা না হওয়ায় সৌন্দরনন্দে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই, কোন চরিত্র বিশেষের উৎকর্ষাপকর্ষ তেমন বিকশিত হয় নাই, সমস্ত কাব্যখানি একটি সাধারণ বৈচিত্র্যবিহীন ঘটনা।

কবি যে ঘটনাবস্তু অবলম্বন করিয়া এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের কি না ঠিক বলা যায় না। উদীচ্য ও অবাচ্য উভয় বৌদ্ধ সাহিত্যেই এই আখ্যায়িকাটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। বিনয়পিটকেও (মহাবগ্‌গ, ১৫৪) ইহার উল্লেখ আছে। অতএব তিনি পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ বৃত্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যের নায়ক নন্দ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইনি বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় মাতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা।

প্রথম সর্গ—গোতম কপিল নামে এক মুনি ছিলেন। হিমালয়ের পার্শ্বে তাঁহার আশ্রম ছিল। একদা ইক্ষ্বাকুবংশের কয়েকটি রাজকুমার সেখানে উপস্থিত হন। তাঁহাদের পিতা সমস্ত রাজ্য শুল্করূপে তাঁহাদের বিমাতাকে প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই রাজকুমারেরা সেখানে যান। গোতম কপিল তাঁহাদের উপাধ্যায় হন বলিয়া তাঁহারা গৌতম হইলেন। তাঁহারা শাক বৃক্ষপরিবৃত স্থানে বাস করায় তাঁহাদের শাক্য নাম হইল। কপিলের আদেশানুসারে তাঁহার মৃত্যুর পর সেখানে তাঁহারা এক নগর নির্ম্মাণ করেন। তাহার নাম কপিলবাস্তু হইল। ক্রমে তাহা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজপুত্রগণ নিজেদের জ্যেষ্ঠকে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ—সেই বংশে মহারাজ শুদ্ধোদনের জন্ম হয়। তিনি অতি ধার্ম্মিক ও সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষী মায়ার গর্ভে বুদ্ধদেব এবং কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভে নন্দ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। নন্দ দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল সুন্দর নন্দ। নন্দের বিষয়ভোগে অত্যন্ত আসক্তি ছিল। বুদ্ধদেব জন্ম-জরা-মৃত্যু দর্শন করিয়া সংসার ত্যাগ করেন।

তৃতীয় সর্গ—বুদ্ধদেব তপস্যার জন্য বনে গমন করিলেন। বিবিধ সম্প্রদায়ের মত শ্রবণ করিয়া অসমীচীন বোধ হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বোধিদ্রুমমূলে ধ্যান করিতে লাগিলেন, মারসেনা জয় করিলেন, এবং শিবময় পদ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তিনি বারাণসীতে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিলেন। কপিলবাস্তুতে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সেখানে বহুলোক তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সকলেই সৎপথ অবলম্বন করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

চতুর্থ সর্গ—তিনি যখন কপিলবাস্তুতে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, নন্দ তখন প্রিয়ার সহিত প্রাসাদের উপর ছিলেন। নন্দের স্ত্রী অতি সুশ্রী ছিলেন। লোকে তাঁহাকে সুন্দরী বলিয়া ডাকিত। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে লাভ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতেন। এক দিন সুন্দরী প্রসাধন করিতেছিলেন এবং নন্দ তাহাতে সহায়তা করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। সুন্দরী তমালপত্রের দ্বারা গণ্ডে তিলক রচনা করিতেছিলেন। বুদ্ধদেব সেই সময়ে ভিক্ষার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। অনবধানতায় তিনি ভিক্ষা পাইলেন না। তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া কোন পরিচারিকা নন্দকে সেই সংবাদ দিলে তিনি কম্পিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য প্রিয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি অনুমোদন করিয়া সেই তিলক শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এক দিকে প্রিয়ার আকর্ষণ ও অপর দিকে বুদ্ধদেবের আকর্ষণ এই উভয় আকর্ষণে ব্যথিত হইয়া তিনি কোনরূপে গমন করিয়া পথিমধ্যেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন।

পঞ্চম সর্গ—বুদ্ধ চলিয়াছেন, তাঁহার চারিদিকে মহান্ জনসঙ্ঘ সম্মিলিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই জনতার মধ্যে নন্দ তাহাকে প্রণাম করিতে না পারিয়া অগত্যা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে লোক কমিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি ইঙ্গিতে জানাইলেন তাঁহার ভিক্ষার প্রয়োজন নাই। অনন্তর নন্দ গৃহে গমনোন্মুখ হইলে বুদ্ধদেব তাঁহার হস্তে নিজের ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিলেন। তিনি ইহাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার অনুসরণে বাধ্য হইলেন। অনন্তর বিহারে আগমন করিয়া সংসার ভোগের আসক্তি হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলে নন্দ অনিচ্ছা হইলেও স্বীকার করিলেন যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। বুদ্ধদেব পুনর্ব্বার তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। সন্ন্যাসের জন্য তাঁহার কেশ ছেদন করা হইল। আর নয়ন-সলিলে তাঁহার হৃদয় ভাসিয়া গেল।

ষষ্ঠ সর্গ—পতির বিয়োগে সুন্দরী অত্যন্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সীমন্তিনিগণ তাহাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা প্রদান করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না।

সপ্তম সর্গ—এদিকে নন্দও প্রিয়া-বিরহে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। প্রাচীন বহু বহু দেব-মুনি-মানবের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি অবশেষে সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনই স্থির করিলেন।

অষ্টম সর্গ—নন্দকে গৃহ গমনে উৎসুক দেখিয়া কোন শ্রমণ তাঁহাকে তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সমস্ত অবগত হইয়া ঐ সকল হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য তাঁহাকে বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন।

নবম সর্গ—নন্দ তাঁহার কথা শ্রবণ করিলেন দেখিয়া তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাকে রূপ যৌবন ও বলের অভিমান ত্যাগ করিবার জন্য নানারূপ উপদেশ দিলেন। নন্দ তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তখন শ্রমণ সমস্ত কথা বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলেন।

দশম সর্গ—বুদ্ধদেব তাঁহাকে করতলে ধারণ করিয়া সহসা গগনপথে উত্থিত হইলেন। তাঁহারা হিমালয়ে অবতরণ করিলেন। সেখানে এককাণচক্ষু বানরীকে দেখাইয়া বুদ্ধদেব নন্দকে বলিলেন যে, সেই বানরী ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে কে বেশী সুন্দর। বলা বাহুল্য নন্দ নিজের স্ত্রীর সৌন্দর্য্যকেই বেশী বলিলেন। বুদ্ধদেব কোন উত্তর না দিয়া তাঁহাকে লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। স্বর্গ ও স্বর্গাঙ্গনার সৌন্দর্য্যে নন্দ মুগ্ধ হইয়া গেলেন, সংসার ও সুন্দরীকে আর তিনি ভাল বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তিনি পৃষ্ট হইয়া বুদ্ধদেবকে বলিলেন সেই বানরীর সহিত সুন্দরীর যে প্রভেদ, সুন্দরীর সহিত দিব্যাঙ্গনারও সেই প্রভেদ। অনন্তর তিনি দিব্যাঙ্গনা লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। বুদ্ধ বলিলেন কেবল তপস্যারূপ শুল্কদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যাইতে পারে। নন্দ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার ভূতলে আগমন করিলেন।

একাদশ সর্গ—নন্দ যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন। আনন্দ ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং কৌশলে প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন যে, তিনি দিব্যাঙ্গনা লাভেরই জন্য নিয়মানুষ্ঠান করিতেছেন। ইহা যে অনুচিত আনন্দ তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন যে, স্বর্গের আশা পরিত্যাগ করিয়া অমর, অজর, অভয় পদের জন্য চেষ্টা করাই উচিত।

দ্বাদশ সর্গ—আনন্দের কথায় তাঁহার লজ্জা ও জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি তখন পরম মঙ্গল পাইবার আশায় বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিলেন। তিনি সমস্ত অবগত হইয়া ও স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছে জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং ঐ শ্রদ্ধাকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ—অনন্তর বুদ্ধদেব নন্দকে মঙ্গল লাভের উপায় নির্দেশ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, শীল ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতির সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ—অতঃপর তিনি পরিমিত ভোজন পরিমিত বিশ্রাম, প্রত্যেক কর্ম্মেই সতর্কতা, নির্জ্জন স্থান ও সন্তোষের আবশ্যকতা প্রতিপালন করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ—অনন্তর তিনি চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন ও বিরুদ্ধচিন্তার অপনোদনের জন্য শিক্ষা প্রদান করিলেন।

ষোড়শ সর্গ—ইহার পর কি প্রকারে ধ্যানসমূহকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ও কামাদি তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় তাহা বলিয়া তিনি চতুর্ব্বিধ আর্য্যসত্য, নির্ব্বাণ ও আষ্টাঙ্গিক মার্গের সবিশেষ বর্ণনা করিলেন, এবং যথাকালে ও যথোচিতভাবে উৎসাহের সহিত যোগানুষ্ঠান করিতে বলিলেন।

সপ্তদশ সর্গ—নন্দ উপদেশ লাভ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য বনে গমন পূর্ব্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ক্রমশঃ বোধি লাভ করিয়া অর্হৎ হইলেন। তখন গুরুর কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধির উদয় হইল।

অষ্টাদশ সর্গ—অতঃপর নন্দ গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া নিজের সফলতা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলেন। গুরুও সময়োচিত বাক্যে অভিনন্দন করিয়া তাঁহাকে সদ্ধর্ম্মপ্রচারের আদেশ করিলেন, এবং তিনিও তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতায় (১০ম পাঠে) এই উপাখ্যানটি ক্ষেমেন্দ্র এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

বুদ্ধদেব ন্যগ্রোধারামে ছিলেন। নন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে

বলেন। তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া গৃহে আসিলে কয়েক দিন পরে বুদ্ধদেব তাঁহার গৃহে আগমন করেন। যথোচিত সৎকারের পর তিনি যাইবার জন্য উত্থিত হইলে নন্দ কনক-পাত্রে পূজোপকরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করেন, এবং নয়ন-সঙ্কেতে প্রিয়াকে জানান যে, তিনি এখনই ফিরিয়া আসিবেন। বুদ্ধদেব আশ্রমে উপস্থিত হইলে নন্দ গৃহে ফিরিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে পুনর্ব্বার সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বলিলেন। তাঁহার কথার গৌরবে ও সংস্কার বাসনায় নন্দের চিত্ত উভয় দিকেই দুলিতে লাগিল। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু হৃদয়ে প্রিয়াকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিরহে হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। অবশেষে শিলাফলকে সুন্দরীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুরা ইহা দেখিয়া ভগবানকে নিবেদন করিল। তিনি তাহাকে ডাকাইয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং তিনিও তাহা স্বীকার করিয়া সংসারে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভগবান্ তাহা করিতে নিষেধ করিয়া উপদেশ দিলেন এবং তদনুসারে চলিবার জন্য আদেশ করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। নন্দও অবসর পাইয়া সুন্দরীকে দর্শন করিবার জন্য চলিলেন। ভগবান্ তাহা জানিয়া বাধা দিলেন। তাঁহার উপদেশে নন্দ আবার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এক দিন আবার তিনি চলিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন জানিয়া ভগবান্ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি এক দাবানলদগ্ধ কুৎসিতাঙ্গী কোন বানরীকে দেখাইয়া নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার ও সুন্দরীর লাবণ্যের পার্থক্য কি? নন্দ যথোচিত উত্তরে সুন্দরীর প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, তাদৃশ প্রশ্নই অনুচিত। ভগবান্ তখন তাঁহাকে লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। নন্দ দিব্যাঙ্গনাগণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ভগবান তখন প্রশ্ন করিলেন যে, ইহাদের ও সুন্দরীর লাবণ্যের ভেদ কিরূপ। যদি সৌন্দর্য্য অধিক হয়, তাহা হইলে তিনি ইহাঁদিগকে নন্দের অধীন করিয়া দিবেন, সে জন্য তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে। নন্দ স্বীকার করিলেন। ভগবান্ তাহাকে লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। নন্দ ব্রহ্মচর্য্য করিতে লাগিলেন। সুন্দরীর কথা আর তাঁহার মনে থাকিল না। এক দিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কুম্ভীপাক নরকের দৃশ্যে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—ঐ যে উত্তপ্ত কুম্ভী (জালা)-গুলি রহিয়াছে তাহা সংসারাসক্ত চিত্ত নন্দের জন্য কেন না সে স্বর্গস্ত্রীর কামনায় ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে। ভয়ে তিনি ঐ বাসনা ত্যাগ করিয়া যথার্থভাবে ব্রহ্মচর্য্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর চিত্ত শান্ত হইলে তিনি বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে, আর তাঁহার স্বর্গস্ত্রীর প্রয়োজন নাই। অনন্তর তিনি নির্ব্বাণ সিদ্ধিলাভ করিলেন। ভিক্ষুরা তাঁহার ঐ ফললাভ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ জানাইলেন যে, পূর্ব্ব জন্মে স্তূপের নির্ম্মাণাদি সৎকার্য্যের পুণ্যে নন্দ শাক্যকুলে জাত হইয়া এই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ধর্ম্মপদের (যমকবগ্গ, ১৩, ১৪) অর্থকথার উপাখ্যানটি এইরূপ :—

* * * *

* দ্বিতীয় দিবসে নন্দের রাজ্যাভিষেক ও বিবাহ মঙ্গলাদি হইতেছে এমন সময়ে ভগবান্ ভিক্ষাচর্য্যায় সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং কুমার নন্দের হস্তে নিজের ভিক্ষাপাত্র প্রদানপূর্ব্বক মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি আর পাত্র গ্রহণ করিলেন না। নন্দও তাঁহার গৌরবে কিছু না বলিয়া ঐ পাত্র হস্তে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। নন্দপত্নী তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র ফিরিবার জন্য বলিলেন। নন্দ ও বুদ্ধদেব বিহারে আসিলেন বুদ্ধদেব তাঁহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে বলিলেন। নন্দ অস্বীকার করিতে না পারিয়া সম্মত হইলেন। তাঁহার প্রব্রজ্যা হইল।

* * * *

অনন্তর এক দিন নন্দ প্রিয়ার কথা মনে করিয়া ভিক্ষুগণকে মনের ভাব জানাইলেন যে, তিনি ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারিবেন না। তিনি গৃহে গমন করিবেন। ভগবান্ শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া সমস্ত অবগত হইলেন। অনন্তর তিনি নন্দকে গ্রহণ করিয়া বিভূতিবলে 'ত্রাবতিংস'-দেব-লোকে গমন করিলেন, পথে তিনি নন্দকে এক ছিন্ননাসাকর্ণ ছিন্নলাঙ্গুল দগ্ধ বানরী দেখাইয়াছিলেন। দেবভবনে উপস্থিত হইয়া নন্দ শত শত অপ্সরা দেখিলেন অতঃপর ভগবান্ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী ও অপ্সরার মধ্যে কে ভাল। নন্দ বলিলেন অপ্সরাদের নিকট তাঁহার স্ত্রী ঐ বানরীর মত। স্থির হইল ভগবান্ ঐ পঞ্চশত অপ্সরা দিবেন, আর তিনি যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য করিবেন। তাঁহারা তেজোবলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য শুনিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু নন্দ অবশেষে মহত্ব লাভ করিলেন। তিনি ভগবানকে বলিলেন আর তাঁহাকে অপ্সরার জন্ত প্রতিভূ হইতে হইবে না।

নন্দ যে বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ও মাতৃস্বসেয় ভ্রাতা ছিলেন তাহা বিনয়পিটকের মধ্যেও দেখা যায়। শুদ্ধোধন একস্থানে (মহাবগ্‌গ, ১, ৫৪, ৫) বুদ্ধদেবকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার, নন্দের ও রাহুলের প্রব্রজ্যাগ্রহণে তাঁহার বিরূপ কষ্ট হইয়াছে। অপর একস্থানে (সুত্তবিভঙ্গ পাচিত্তিয়, ৯২) নন্দের পূর্ব্বোক্ত পরিচয় দিয়া উক্ত হইয়াছে যে, তিনি অতি সুন্দর ছিলেন।

ধর্ম্মপদের অর্থকথার একস্থানে (১৫১ ; জরাবগ্‌গ, ৫) রূপনন্দা বা নন্দার সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা পাওয়া যায়।

এক দিন রূপনন্দা ভাবিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে সকলেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, একাকিনী তিনি গৃহে থাকিয়া কি করিবেন। তিনি অবশেষে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি অতি রূপবতী ছিলেন, তাঁহার, আত্মসৌন্দর্য্যে অত্যন্ত অভিমান ছিল। বুদ্ধদেব রূপকে অনিত্য ও দুঃখ বলিয়া নিন্দা করিতেন। এই জন্ত তিনি সাধারণতঃ তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে যাইতেন না। এক দিন তিনি ভিক্ষুণীগণের পশ্চাতে পশ্চাতে ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে গমন করিলেন। বুদ্ধদেব বিভূতিবলে তাঁহার হৃদয়ের ভাব সমস্তই জানিতে পারিয়া কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি একটি ষোড়শী সর্ব্বরূপসম্পন্না নারী বিভূতিবলে উৎপাদন করিয়া নিজের পার্শ্বে স্থাপন করিলেন ঐ নারী তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। রূপনন্দা ও বুদ্ধদেব ভিন্ন আর কেহই তাহাকে দেখিতে পাইতেছিল না। তাহাকে দেখিয়া রূপনন্দার রূপাভিমান নষ্ট হইল। রূপনন্দার তখন চৈতন্য সঞ্চার হইল যে, তাঁহারও রূপের ঐ পরিণাম হইবে। অতঃপর ভগবান্ যথোচিত উপদেশ প্রদান করিলেন এবং তিনিও তদনুসারে কার্য্য করিয়া শ্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

এই রূপনন্দা বা নন্দাকে নন্দপত্নী মনে করা যাইতে পারে ; কেন না সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি ভাবিয়াছিলেন—"আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও (ইহা এখানে নন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বুদ্ধদেবকে বুঝাইতেছে) রাজ্যশ্রী ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ বুদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহার পুত্র রাহুল কুমারও প্রব্রজিত হইয়াছে। আমার স্বামীও প্রব্রজিত হইয়াছেন। মাতাও প্রব্রজিত হইয়াছেন।" সৌন্দরনন্দের সুন্দরীও প্রব্রজিত হইয়াছিলেন।

বিনয়ের সুত্তবিভঙ্গে (ভিক্খুণী বিভঙ্গ, পারা, ১, ১ ; ২, ১ ; সঙ্ঘ ৫, ১ ; ৬, ১ ;) চারিস্থলে সুন্দরী নন্দা নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের এক স্থান ভিন্ন সর্ব্বত্রই তাঁহার চরিত্র কলুষিত দেখা যায়। ইনিও ভিক্ষুণী ছিলেন। নন্দপত্নীর সহিত ইঁহার সম্বন্ধ কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই। ইঁহার তিনটি ভগিনী ছিল, যথা, নন্দা, নন্দবতী ও থুল্লনন্দা। ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, নন্দের পত্নী বলিয়া সুন্দরীনন্দা নাম হয় নাই।*

* See Rhys David's Budhist Birth Stories, P. 128 ; Hardy's Mannal, P. 204 Seq. ; Beal's Romantic Legend, P. 369 Vinaya, Mahavagga I. 545 ; Pacittiya, 92. 1. ; Milindapauha, IV. 3. 12.

থেরীগাথার কয়েকটি কবিতা (দ্রষ্টব্য—৮২—৮৬) নন্দার রচিত বলিয়া পাওয়া যায়। থেরীগাথার পরমাত্থদীপনী নামক অর্থকথার রচয়িতা ধর্ম্মপাল জাত কবিতার ব্যাখ্যায় ধর্ম্মপদের অর্থকথার পূর্ব্বোল্লিখিত আখ্যায়িকাটিই ঈষৎ পরিবর্ত্তনে বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য কবিতা পাঁচটির প্রথম তিনটি ভগবানের, এবং অবশিষ্ট তিনটি নন্দার।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

উপেক্ষিতা

আজিকে সেজেছ কেন এ বেশে মরি!
আঁখি কোণে হাসিটুকু কে নিল হরি?
কেন লো রতন সাজ
ফেলেছ ধূলার মাঝ,
দু'নয়নে কেন আজ
ঝরিছে বারি?
কেন লো বিষাদ-সাজে সেজেছ নারি?

কোথা সে মরমভেদী হেলার হাসি?
কোথায় টুটিয়া গেছে গরব-রাশি?
কঠিন শিলার 'পরে
লুটিছ বেদনা ভরে,
গুমরি' কাহার তরে
মরিছ বালা?
কখন তেয়াগি' এলে প্রমোদ-শালা?

একি লো কঠিন পণে বেঁধেছ হিয়া
জীবনের সুখ দূরে সরা'য়ে দিয়া
এলায়ে অলক-রাশ,
শিথিল নিচোল-বাস,
সরম গরব পাশ
সবলে টুটি',
কেন লো পথ-মাঝে এসেছ ছুটি'?

একেলা সৌধশিরে বসিয়া বুঝি,
করুণ চাহনি কার বেড়াতে খুঁজি;
অজানা পথিক কত
নয়ন করিয়া নত
তোমার সে পান্থ মত
গিয়াছে ধীরে,—
বৃথাই চমকি' সুধু চাহিতে ফিরে।

আজি বুঝি পথে তা'রে প্রভাত বেলা,
তন্দ্রা-জড়িত চোখে দেখেছ বালা;—
তেমনই নম্র শিরে
পলকে চাহিয়া ধীরে,
নীরবে নদীর তীরে
গিয়াছে চলে;
রহে নি' ক্ষণেক তব সৌধ-তলে।

রহিয়াছ পথ চাহি' সজল চোখে,
বেদনা চাপিয়া বৃথা রুদ্ধ বুকে;
বৃথাই ব্যাকুল চিতে
পথিকে বরিয়া নিতে
সুদূর তটিনী-পথে
রয়েছ চাহি',
বৃথাই কেটেছে বেলা বেদনা বহি'।

দীর্ঘ দিবস বুঝি আশায় যাপি',
রুদ্ধ বেদনা হিয়া উঠেছে ছাপি',—
অঙ্গ-ভূষণ কাড়ি'
ফেলেছ হায় লো নারি!
বাতায়ন তল ছাড়ি'
আপনা হারা,
এসেছ ছুটিয়া পথে পাগল-পারা।

শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ।

বিশ্‌করমের ব্রত *

১লা বৈশাখ আমাদের দেশের নাপিতেরা বিশ্‌করমের পূজা করিয়া থাকে। এই পূজায় ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। বাড়ীর কর্ত্তাই ক্ষৌর কর্ম্মের অস্ত্রাদি পূজা করিয়া থাকে। ধোপারাও তাহাদের 'পাটের' পূজা করিয়া থাকে। যে তক্তা বা কাষ্ঠখণ্ডের উপর কাপড় কাচা হয় তাহাকেই 'পাট' বলে। বিশ্‌করমের পূজার পর সাত দিন ধোপা-নাপিতেরা তাহাদের পাট বা অস্ত্রাদি ব্যবহার করে না।

যে সকল পরিবারে স্ত্রীলোকেরা চড়কা ব্যবহার করে সেই সকল পরিবারেও রমণিগণ ১লা বৈশাখ বিশ্‌করমের পূজা করিয়া থাকে। এই পূজায়ও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। মহিলাগণই চড়কাটিকে চিত্রিত ও পুষ্প-শোভিত করিয়া গোময় লিপ্ত স্থানে রাখিয়া দেয় ও উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসিয়া চড়কাটির পূজা করিয়া থাকে। খৈ, চিড়া, দৈ ও দুধ এই পূজার উপকরণ, আর আট রকমের কলাই ভাজিয়া স্ত্রীলোকেরা খৈ-চিড়ার সঙ্গে মিশাইয়া দেয়। এই পূজায় নৈবেদ্য দেওয়ার বিধান নাই।

ব্রতের কথা।

(ত্রিপুরা জেলায় প্রচলিত কথার অনুসরণে লিখিত)

এক সওদাগরের শুধু মেয়ে হইত। একে একে সাতটি মেয়ে হইল। আবার সওদাগর-পত্নীর সন্তান সম্ভাবনা হইল। সওদাগর পত্নীকে বলিল, "যদি এই বার মেয়ে হয় তবে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।"

যথাসময়ে সওদাগর-পত্নী সন্তান প্রসব করিল। জীবন-মরণ ভগবানের হাতে। এবারও সওদাগরের স্ত্রীর একটি মেয়ে হইল। সূতিকা-গৃহে ধাত্রিগণ সওদাগরকে বলিল, "রাণীর গর্ভ মিথ্যা।" পরে মেয়েটিকে একটা হাঁড়িতে পুরিয়া ও সরা দিয়া হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিল।

হাঁড়িটা ভাসিতে ভাসিতে একটা বড় নদীতে গিয়া পড়িল, ও একটা প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে নদীর কিনারায় লাগিল। গাছে একটা চিল বসিয়াছিল, মুখ-ঢাকা হাঁড়ি দেখিয়া ছোঁ মারিয়া মেয়েটিকে বটগাছে তুলিয়া লইল।

যে শিশুর উপর জননীর দয়া হয় নাই, ধাত্রীর দয়া হয় নাই সেই শিশুর উপর একটা পাখীর দয়া হইল। চিলটা কন্যাটিকে যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া বড় করিতে লাগিল। একটু বড় হইলে মনুষ্য-সমাগম-রহিত এক গভীর বনে লইয়া গেল। একটা খুব উঁচু গাছে একটা বড় বাসা করিয়া মেয়েটিকে রাখিয়া দিল, ও আগের মত যত্ন করিতে লাগিল।

মেয়েটির বয়স এখন আট বৎসর। ইহার রূপে বন আলোকিত হইয়াছে। বালিকার কজ্জল-কাল চুলগুলি নিবিড় ভাবে হাঁটু ছাড়াইয়া পড়িয়াছে। কাল, ঘন চুলে ঢাকা মুখখানি দেখিয়া মনে হয়, নিবিড় মেঘ-মালার অন্তরালে বিদ্যুৎ যেন অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে।

এক দিন রাজার ও কোতোয়ালের ছেলে শিকারে আসিয়া পথ হারাইয়া সেই বনে আশ্রয় লইল, এবং যে গাছটায় মেয়েটি ছিল তাহারই নীচে রাত্রি কাটাইল। সকালে রাজ-পুত্র দেখিল তাহার গায়ে একগাছি লম্বা চুল। দেখিয়া উভয়ের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

* বিশ্বকর্ম্মার ব্রত। বিশ্বকর্ম্মা দেব-শিল্পী। তিনি দেবগণের আদেশানুসারে শিল্প-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেন। সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ করিতে হইলেই বিশ্বকর্ম্মার উপর আদেশ হইত। জগন্নাথ দেবের মন্দির ও মূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মার গঠিত বলিয়া আজিও প্রসিদ্ধি আছে। বিশ্বকর্ম্মাই সোনার সীতা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মার পূজা আমাদের দেশে প্রায় লোপ পাইয়াছে, মাত্র সূত্রধর ও নাপিতেরাই বৎসরে এক বার বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া থাকে।—লেখক।

"সমাজের লোকের এই নীরব ঔদাসীন্য বিশ্বকর্ম্মা অথবা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি নয়; ইহা ভারতবর্ষীয় শিল্প-কলার প্রতি জন সাধারণের অনাদরের ভাবই প্রকাশ করিতেছে।"

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৌরাণিকী কথা—বস্তুহ।

পরে অনেক অনুসন্ধানের পর গাছের উপর মেয়েটিকে দেখিল। প্রথমে তাহারা ভীত হইল, পরে বালিকাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"কন্যা তুমি কি দেবদা না মনুষ্য।"

"আমি মনুষ্য।"

"তুমি ইথান্ (অ) আইলা কেম্‌নে?"

"কৈতাম্ পার্তাম্ না।"

"তোমারে পালে কে?"

"চিলে।"

"তুমি বিয়া করবা?"

"আমি কিচ্ছু জানি না।"

মেয়েটি আর জীবনে মানুষ দেখে নাই। মানুষের চেহারা দেখিয়া তাহার মনে ভারি আনন্দ হইল। সে ভাবিল পৃথিবীতে বুঝি এমন সুন্দর প্রাণী আর নাই। কিন্তু এই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভয়ও হইল। সে যেন কেমন আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

ক্ষণপরে চিলটা আসিল। আসিয়া সব কথা শুনিয়া কন্যার বিবাহে সম্মতি দিল। মেয়েটি মানুষের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিল, ইহাদের হাত আছে, পা আছে, কান আছে কিন্তু কি দিয়া যেন শরীর ঢাকা, তাই তাহার বড় ভয় হইয়াছে।

পাখীটা আবার উড়িয়া গেল। দেখিয়া কোতোয়ালের পুত্র আবার গাছে চড়িল। এবার মেয়েটির জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইল। বালিকা বলিল, "যদি রাজ-পুত্রে বিয়া করে তবে বিয়া বয়াম্।"

চিলটা মেয়েটিকে বলিয়া দিল, "মা, মনুষ্যের দেশ্ (অ) যাও। বিপদ্ (অ) পড়লে আমারে স্মরণ কইর (অ)।"

রাজ-পুত্র মেয়েটিকে বাড়ীতে আনিল। সকলে ইহার সরল সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল; পরে এক শুভ দিনে রাজ-পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইল।

বিবাহের পর বালিকা ভারি বিপদে পড়িল। সে কাহারও কথা বুঝে না, এবং কোনও কাজ কর্ম্ম করিতে পারে না। ইহাতে যাহারা তাহাকে হিংসা করিত তাহারা তাহাকে উৎপীড়ন করিবার একটা সুযোগ পাইল। বালিকা যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিলে চিল-মাকে স্মরণ করিত—

"চিলোনী লো মা, উড়চ্ (অ) না, পড়চ্ (অ) না, আমি আবাগ্যা (১) ঝির (২) তালাস্ (অ) করছ্ না।"

চিল্‌টা মাঝে মাঝে আসিয়া কন্যার দুঃখের কথা শুনে ও উপদেশ দিয়া যায়। রাণী ও রাজা মেয়েটিকে বরাবর ভালবাসে কিন্তু তার ছয় জা' তাহাকে বড় হিংসা করে ও সর্ব্বদা উৎপীড়ন করে। কিন্তু বুদ্ধিমান পাখী তাহাদের দুরভিসন্ধি সব নষ্ট করিয়া দেয়; সুতরাং ইহারা সকলে পরামর্শ করিল আর এক দিন আসিলে চিলটাকে মারিয়া ফেলিবে।

চিল্‌টা আর এক দিন আসিল। মেয়েটি কাঁদিয়া আকুল হইল ও তাহার ছয় জা'র দুরভিসন্ধির কথা চিল্-মাকে বলিয়া দিল। চিল্-মা কন্যাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, "মা, কিচ্ছু ভয় নাই। যদি আমারে মারে তবে তুমি আমার মাংস খাই (অ) না। আমার পাখ্‌না টাখ্‌না একটা গাতার মধ্যে মাটি দিয়া ঢাইক্যা রাইখ্যা জি-অ, জি-অ, কৈয়া তিন কোষ জল দি (অ), তা অইলে আমি জিয়া উইট্যাম্!"

চিল্‌টা আর এক দিন আসিয়া মেয়ের খাশুড়ীকে সব কথা বুঝাইতে লাগিল। খাশুড়ীও মেয়েটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিল। কিন্তু সকল জা' আসিয়া বলিতে লাগিল, "কিচ্ছু কাজ কর্ম্ম কর্‌তে পারে না, বনের অলক্ষী কৈন্যা বন্ (অ) দিয়া আইঅউক।" পরে ইহারা চিল্‌টাকে ধরিয়া ফেলিয়া ইহার মাংস রাঁধিয়া মেয়েটিকে খাইতে দিল। মেয়েটি কিন্তু মাংস খাইল না। মা-র কথা মত পালখ্‌গুলি কুড়াইয়া গর্ত্তে রাখিয়া উপদেশ মত কাজ

---

(১) অভাগা—অভাগিনী।

(২) ঝি—ঝি, কন্যা।

করিল। পাখীটা বাঁচিয়া উঠিয়া উড়িয়া গেল। ইহার পর হইতে চিলটা গোপনে আসিতে লাগিল।

জা' এরা সুতা কাটে, কাপড় বোনে। নূতন বৌকেও সুতা আনিয়া দিল ও বলিল, "যদি এই সুতা কাটিতা না পার, তবে বন্নের কন্তা বন্ (অ) দিব (দিবে)!" সে কোন দিন সুতা কাটে নাই, কেহ তাহাকে দেখাইয়াও দেয় না। চিল-কন্যা নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিল। অমনি চিল-মা উড়িয়া আসিল, আসিয়া বলিল, "মা, তুমি কাইন্দ্য না; তোমার চড়কা, নাটাই, টাউকা, ঝাকি, তানার খুটা (খুঁটি), ধেনু আর চড়কি * সমস্ত একটা ডোলের মইধ্যে রাইখ্যা মুখ লেইপ্যা রাখ।"

সকলেই সুতা কাটে চিলের মেয়ে কাটে না। তাই জা'-এরা তাহাকে বড়ই উৎপীড়ন করিতে লাগিল। কেহ লাথি মারে, কেহ ঠোনা মারে। দুঃখিনী বালিকা তখন অত্যন্ত কাতর ভাবে কাঁদিতে লাগিল। চিল-মা আবার আসিল; আসিয়া বলিল, "মা তোমার শ্বশুররে কও দেশ বিদেশ নিমন্তন্ন করউক্; ধল, পাড়া, ধল কৈতর, (কবুতর) দিয়া বিশ্ করমের পূজা কৈরা ডোলের মুখ খুলউক্।"

বৌ শ্বশুরের পায়ে পড়িয়া এই প্রার্থনা জানাইল। শ্বশুর রাজি হইল।

বৎসর শেষ হইল। ১লা বৈশাখ আবার ফিরিয়া আসিল। চিলটার কথা মত বিশ্ করমের পূজা দিয়া মেয়ের স্বামী ডোলের মুখ খুলিল। খুলিয়া দেখিল ডোলটা শাল, বনাত সাড়ী প্রভৃতি নানা রকম কাপড়ে ভরা। যত বাহির করে ততই বাহির হয়, ডোল আর খালি হয় না। শ্বশুর সন্তুষ্ট হইয়া সকল ব্রাহ্মণকে শাল ও যোড়ায় যোড়ায় কাপড় দিয়া বিদায় করিল। ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিল। ব্রাহ্মণের বরে রাজার ঐশ্বর্য্য শত গুণ বাড়িয়া গেল, এবং বিশ্ করমের পূজা এই রূপে মর্ত্ত্যে প্রচলিত হইল।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

* সুতা কাটার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।

প্রার্থনা

আমার জীবন কর পবিত্র, সুন্দর,
নিরমল, পুষ্পের মতন।
তোমার আলোক দাও মঙ্গল, মধুর;
ভরে দাও মোর প্রাণ মন!

ঢেকে রাখ সদা মোরে হৃদয়ে তোমার
করুণার পুণ্য আবরণে!
সংসারের পাপ, তাপ, বেদনা, বিবাদ,
যেন নাহি লাগে এ জীবনে।

সত্য যাহা, পুণ্য যাহা, যা কিছু মঙ্গল
তাহে যেন সদা রহে রুচি,
ঘৃণা ভরে দ'লে যাই চরণের তলে
অন্যায় যা, যা কিছু অশুচি।

পবিত্র মঙ্গল কর্ম্ম, চিন্তা নিরমল
হোক এই জীবনের ব্রত,
জগতের সেবা তরে প্রাণ যেন সদা
রহে মোর উন্মুখ জাগ্রত।

শক্তি দাও বহিবারে জীবনের ভার,
ভক্তি দাও তোমার চরণে—
নির্ম্মল আনন্দ দাও অন্তরে আমার
সুখে, দুখে, জীবনে, মরণে!

বাঁধা রব যত দিন এ সংসার-ঘরে,
থাকে যেন আমার অন্তর
ঊর্দ্ধমুখে, অচঞ্চল, যুক্ত তোমা সাথে
অনধীন মুক্ত নিরন্তর।

শ্রীপুষ্পকুন্তলা দত্ত।

শালিক *

শালিক আমাদের দেশে প্রধানতঃ তিন প্রকার দৃষ্ট হয়—(১) ভাট শালিক (২) ঝুঁটি শালিক (৩) গো শালিক।

(১) ভাট শালিক।

ভাট শালিক দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের গায়ের রঙ্গ উজ্জ্বল তাম্রাভ। মাথা ও গলার রং পাতলা ও পরিষ্কার কালো। চক্ষু দুইটির পশ্চাদ্দিক উজ্জ্বল হলুদে পাতলা চর্ম্ম দ্বারা আকর্ণ বিশ্রান্ত মানব চক্ষুর মত করিয়া গঠিত এবং ইহারই সম্মুখবর্ত্তী অংশ হইতে একটি সরু হলুদে রেখা চক্ষুর নিম্ন দিক দিয়া ঠোঁটের মূলদেশে আসিয়াছে। ঠোঁট ফিকে হলুদে রঙ্গের, প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা, সোজা, সূক্ষ্মাগ্র এবং ধারাল প্রান্ত। জিহ্বার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, ভিতরের দিক ক্রমে একটু বিস্তৃত ও সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মত; কিন্তু দুই প্রান্ত ভিতরের দিকে একটু সূক্ষ্মাগ্র। পদদ্বয় ৪ ইঞ্চির একটু বেশী লম্বা। হাঁটু পর্য্যন্ত মেটে সাদা পালখে আবৃত। নিম্নের অবশিষ্টাংশ হলুদে। নখ তীক্ষ্ণ কিন্তু কোমল। পেটের মাঝামাঝি হইতে লেজের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সমুদয় নিম্নাঙ্গ সাদা। ঐ অংশ পুচ্ছ হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া বুকের প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছে। লেজের শেষ দুই প্রান্ত হইতে দুইটি কাল রেখা ঊর্দ্ধ দিকে আসিয়া লেজ-মূলে মিলিত হইয়াছে। উড্ডীয়মান শালিকের এই কাল পালখ গুলি বড়ই সুন্দর দেখায়।

এই শালিকের লেজের উপরিভাগ ঈষৎ কাল। সুশৃঙ্খল শ্রেণীবদ্ধ এই পুচ্ছের শেষ প্রান্তে নিম্ন দিকের পালখের সাদা অগ্রভাগ ঈষৎ বর্দ্ধিত থাকে। উড্ডীয়মান শালিকের প্রসারিত পুচ্ছপুটের পশ্চাতে ঐ সাদা পালখগুলি চন্দ্রকলার মত সুন্দর দেখায়।

ভাট শালিকের ডানা মজবুত এবং প্রায় ১ ফুট লম্বা। ডানা মেলিলে তাহার ঠিক মাঝামাঝি প্রায় ⅓ অংশ নিম্ন দিকে ক্রমসূক্ষ্ম হইয়া এক সমবাহু ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়। ডানার গোড়ার দিকের পালখ অনেকাংশে দেহের বর্ণের মত। পালখের অগ্রভাগের দিক ক্রমে ঈষৎ কালো। ডানার মাথার পালখ কালোমিশ্রিত পিঙ্গল। ডানা ঈষৎ বক্র। ভাটশালিক পাখা গুটাইয়া বসিলে ডানার শ্বেত পালখগুলি উভয় পার্শ্বে অতি সুন্দর দেখায়। ইহারা পাপিয়ার চেয়ে একটু ছোট পাখী। লম্বা ধরণের বেশ গোল চেহারা।

ভাট শালিক অপেক্ষাকৃত সরলপ্রকৃতি। ইহারা আমাদের উঠানে বেড়ায়, সুবিধা পাইলে ঘরে প্রবেশ করিতেও বড় বেশী ইতস্ততঃ করে না। মানুষের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভীত হয় না। ঘরের কানাচে কলসী ঝুলাইয়া রাখিলে ইহার ভিতরও ভাট শালিক বাসা বাঁধিয়া ডিম পাড়ে। দালানের কার্ণিসে, ফাটালে, ঘরের পাটাতনের উপরও ইহারা বাসা করে। মানুষ হিংসাপ্রবৃত্তির তাড়নায় এই নিরীহ পাখীগুলিরও ভীতির কারণ হইয়া পড়িয়াছে। ভাট শালিক আমাদের আশে পাশে আসিলেও অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে; কারণ ইহারা মানব জাতিকে শ্বাপদ অপেক্ষা হিংস্র মনে করে। আশঙ্কার সন্দেহ হওয়া মাত্রই শালিক সঙ্কেতসূচক মৃদু শিস দিয়া আপন সঙ্গীকে সতর্ক করে। সঙ্গীও প্রত্যুত্তরে সঙ্গীকে নিজ সতর্কতা জ্ঞাপন করে। কারণে বা অকারণে ইহারা স্থানান্তরে উড়িয়া গেলেও ভাট শালিক শিস্ দিয়া যায় এবং অনেক সময়ই সঙ্গীও তাহার অনুসরণ করে।

ভাট শালিক আনন্দ প্রকাশ করিবার সময় যেন হাঃ হাঃ করে; বোধ হয় যেন হাসে। কখন কখন শালিক পরমানন্দে সঙ্গীত চর্চ্চা করে। ইহারা কয়েকটি একত্রে মিলিয়া আনন্দ-কোলাহল করে, কখনও বা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়। সামান্য কারণে ইহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না। অনেক সময়েই অমার্জ্জনীয় অপরাধে যুদ্ধ উপ-

---

* চট্টল নিবাসী সুকবি বন্ধু শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয় বলিয়াছেন চট্টগ্রামে নাকি স্বর্ণ শালিক দৃষ্ট হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় বহু সন্ধানেও স্বর্ণ শালিক দেখিতে পাই নাই।

স্থিত হয়। শালিক প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের উপর পতিত হইয়া দুই পা দিয়া তাহাকে সাপটিয়া ধরিয়া নখের আঁচড়, ঠোকর ও পাখার ঝাপটা মারে। ইহাদের কোলাহলে জ্ঞাতিবর্গ আসিয়া কোনও না কোনও পক্ষে যোগ দান করে এবং কলহটা বিরাট কুরুক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তুলে। এই যুদ্ধে সময় সময় দুই একটি শালিকের প্রাণান্তও ঘটে। প্রায় কেহই অক্ষত দেহে ফিরিয়া যায় না। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া যখন ইহারা কলহ আরম্ভ করে, তখন ইহাদিগকে ধরা যায়। ইহারা কদাচিৎ অন্য পক্ষীর দলে মিশিয়া থাকে।

শালিক সকালে উঠিয়া খানিক উড়িয়া বেড়ায়; বেশ রৌদ্র উঠিলে পর আহারের সন্ধানে বাহির হয়। ইহারা পতঙ্গ ও ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। লোকালয়ে পালিত শালিক প্রাথমিক জীবনে কীট পতঙ্গ খায়, পরে দুধ, চাউল, ছাতু ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়। প্রতিপালক গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে হলুদ মাখিয়া মধ্যে মধ্যে শালিককে স্নান করায়। খাঁচায় আবদ্ধ থাকিয়া নাকি ইহাদের গায় এক রকম পোকা জন্মে। হলুদই নাকি ইহার একমাত্র প্রতিষেধক। শালিক প্রায় ১৪। ১৫। ২০ বৎসর বাঁচে। কিন্তু পালিত শালিক সাধারণতঃ ৭। ৮ বৎসরের বেশী বাঁচে না। মুক্ত বায়ুতে স্বাধীন ভাবে বিচরণ ও স্বেচ্ছামত আহার বিহারের অভাবেই এরূপ ঘটিয়া থাকে!

ভাট শালিকের দাম্পত্য প্রণয়ও ঘুঘুর মত উল্লেখযোগ্য। প্রায় সর্ব্বাদাই ইহারা জোড়া বাঁধিয়া বিচরণ করে। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, একই বাসায় এক জোড়া শালিক কয়েক বৎসর ধরিয়া ঘরকন্না করিয়াছে। ইহারা হেমন্ত কালের শেষ বা শীতের প্রারম্ভে বাসা নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কোন কোন ভাট শালিক ফাল্গুনের প্রথম ভাগেই ডিম্ব প্রসব করে। কোনও কোনও ভাট শালিককে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে ডিম্ব প্রসব করিতেও দেখা যায়। বৈশাখ মাসই ইহাদের ডিম্ব প্রসবের প্রধান সময়। ১৫।২০ দিন ডিমে তা দিলে পর ডিম ফুটিয়া ছানা হয়। ইহাদের ডিম নীলবর্ণের ও কুল অপেক্ষা ছোট। শালিকের ছানাগুলি প্রথম কয়েক দিন কলসীর মত থাকে, অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র মস্তক আর বৃহৎ উদর মাত্র দৃষ্ট হয়। তৎসংলগ্ন অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত দুইটি ক্ষুদ্র ডানা, পালখ্‌শূন্য লম্বা লম্বা দুইটি পা, ইহাদিগকে একটা 'কিম্ভূত কিমাকার' জীবের ন্যায় দেখায়। এক মাস কাল প্রতিপালনের পর শালিক এই ছানাগুলিকে উড়াইয়া লইবার যোগ্য মনে করে। শালিক এক কালে দুইটি হইতে পাঁচটি পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। কোনও কোনও শালিক ফাল্গুনে এক বার এবং আষাঢ়ে এক বার এই দুই বারও ডিম্ব প্রসব করে। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল বটে।

ইহারা সহজেই পোষ মানে। এক বার পোষ মানিলে পর খাঁচা খুলিয়া ছাড়িয়া দিলেও পলাইয়া যায় না। ভাট শালিক অত্যন্ত স্পষ্ট স্বরে মানুষের মত কথা কহিতে পারে এবং অতি সুন্দর শিস্ দিতে শিখে। পুরুষ শালিকই এ কার্য্যে বেশী পারগ। রাত্রিতে এবং ঊষাগমের পূর্ব্বে শিক্ষা দিলেই সহজে "রাধাকৃষ্ণ" বুলি শিখিয়া থাকে।

সাপ, চেলা প্রভৃতি এই সকল পক্ষীর বিশেষ শত্রু। এ জন্য রাত্রিতে অনেকেই খাঁচা যত্ন পূর্ব্বক ঢাকিয়া রাখে।

ভাটশালিক মাঘ মাস হইতেই পুকুরে বা নদীতে স্নান করিয়া থাকে। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গ বিশেষ ভাবে ধৌত করতঃ স্নান কার্য্য সমাধা করে। ঠোঁট দিয়া প্রত্যেকটি পাখা আঁচড়াইয়া ধুইয়া লয়।

ভাট শালিক গাছের ডালে ঘরের চালে, কখন বা উঠানে বসিয়া মনের আনন্দে নানারূপ গান করিয়া থাকে। ইহাদের স্বর অনুচ্চ। ইহারা উচ্চ শ্রেণীর গায়ক না হইলেও ইহাদিগকে শ্রেণী হইতে বাদ দেওয়া চলে না।

(২) ঝুঁটি শালিক।

ইহারা ভাট শালিক অপেক্ষা লম্বে একটু খাট। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গের বর্ণ পরিষ্কার ধূসর। পেটের নীচের অর্দ্ধাংশ হইতে পুচ্ছের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নিম্ন দিকের পালখগুলি ঈষৎ শ্বেতাভ। পুচ্ছের উপরিভাগ কালো আভাযুক্ত ধূসর। ডানার পালখও এইরূপ বর্ণ বিশিষ্ট। ভাট শালিক অপেক্ষা ইহাদের দেহ বেশী মজবুত। গলা হইতে ধূসরের উপর ঈষৎ কাল বং ক্রমে গাঢ় হইয়া মাথা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ঠোঁট লালের আভাযুক্ত হলদে, এবং ভাট শালিকের ঠোঁটের মত সূক্ষ্মাগ্র ও ধারাল-প্রান্ত। ঠোটের গোড়ার উপর ঠিক কপালের সম্মুখে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিকণ পালক উর্দ্ধ মুখে একটু উন্নত। এই ঝুঁটি আছে বলিয়া ইহাকে ঝুঁটিওয়ালা শালিক টিকে শালিক (টিকিওয়ালা কি?), টিকে ময়না, প্রভৃতি বলা হয়। ইহাদের চক্ষু দুটি বড়ই মনোহর। পাটনাই মশুরীর মত বড়—তপ্ত কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল। এমন সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট পাখী খুব কমই দেখা যায়। ঝুঁটে শালিক ও ভাট শালিকের আওয়াজে একটু পার্থক্য আছে। ঝুঁটে শালিকের আওয়াজ একটু মিহি ধরণের—এইমাত্র। ইহারা প্রায়শঃ লোকালয়ে আইসে না। এমন কি ঘরের চালে বসিয়া বেশী সময় বিশ্রাম করাও ইহাদের অভিপ্রেত নহে। ইহাদের প্রকৃতি ভাট শালিকের অনুরূপ হইলেও অনেকটা সংশোধিত ও চাতুর্য্যময়।

ঝুঁটে শালিক এক বারে দুইটি হইতে ৪।৫টি ডিম্ব প্রসব করে। গাছের কোটরে ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের ডিম নীলবর্ণের এবং ভাট-শালিকের ডিমের মতই বড়। উভয় শালিকই প্রায় এক সময় ডিম পাড়ে। ঝুঁটে শালিক তত সহজে পোষ মানে না। পোষ মানিলে ইহারাও সুন্দর কথা কহিতে ও শিস্ দিতে পারে। ইহাদের মধ্যে আত্মকলহ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ঝুঁটে শালিক কখন কখন বলাকা-শ্রেণীর ন্যায় পংক্তিক্রমে উড়িয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে। আহারাদি বিষয়ে ইহারা ভাট শালিকেরই মত।

(৩) গো শালিক।

ইহাদিগকে গো-শালিক, গোচন্দনা বা "গু-চন্না" বলে। বিষ্ঠাই ইহাদের স্পৃহনীয় খাদ্য। আওয়াজ অনেকাংশে ভাট শালিকের মত হইলেও বড় চাঁশ চাঁশ করে একটুকুও মিষ্টি নয়। দলে দলে গোশালিক কোলাহল করিয়া অপ্রীতি উৎপাদন করে। ইহাদিগকে গায়কপাখীর শ্রেণীভুক্ত করা সমীচীন বোধ করি না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কালু ঝম্ ঝম্

এই অদ্ভুত নাম শুনিয়া পাঠকগণের মধ্যে অনেকেরই বোধ হয় গা' ছম ছম করিয়া উঠিবে; কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই! ইহা মানুষের নাম নহে; একটি কামান বা তোপের নাম। এই প্রকাণ্ড কামানটি মুসলমান রাজত্বের স্মৃতি নিদর্শনস্বরূপ পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকা সহরস্থ চক বাজারের চবুতারার উপর লম্বমান থাকিয়া বিস্ময়-বিহ্বল দর্শকগণের কৌতুহল উদ্দীপিত করিয়া থাকে। মুসলমান সম্রাট্ ও শাসন-কর্ত্তৃগণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের চিহ্নজ্ঞাপক এই কামানটি বঙ্গদেশের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় বস্তু। "প্রতিভা"র পাঠক মহোদগণয়কে এই কামান সম্বন্ধে মোটামুটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাই উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গীয় স্বল্পবিশ্বাসী অনভিজ্ঞ হিন্দু-মুসলমান প্রকাশ করিয়া থাকে যে, এই প্রকাণ্ড কামান মানুষের দ্বারা কখনই নির্ম্মিত হয় নাই। ইহা বিশ্বকর্ত্তার নিয়োজিত বিশ্বকর্ম্মা নামক দেবশিল্পী দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। মহা-প্রলয়ের দিন এই কামানের ভীষণ নিনাদে মৃত্তিকা, আকাশ, তরু, লতা ও পর্ব্বতমালা বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।

এই কুসংস্কার ও অন্যায় ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাসের পক্ষপাতী হইয়া বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান সকলেই এই কামানের নিকটবর্ত্তী হইলেই যেন ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়ে। ঢাকার হিন্দুগণ, শুধু ঢাকার কেন, বঙ্গের অনেক হিন্দু ধর্ম্মপরায়ণ তীর্থযাত্রী যাহারা ঢাকেশ্বরীর মন্দির দর্শনার্থে ঢাকায় পদার্পণ করেন, তাঁহারা চক বাজারের এই কামান সন্নিধানে উপনীত হইয়া তৈল, সিন্দুর, আতপ তণ্ডুল, কলা, ধান, দুর্ব্বা ইত্যাদি দ্বারা এই কামানের পূজা করিয়া থাকে। ইহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রত্যহ বহু হিন্দু-মুসলমান নরনারী অতি প্রত্যুষে আর্দ্র বস্ত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে কামানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আরাধনা ও মানস আদায় করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস যে, কামানের নামে মানস করিয়া কোন প্রার্থনা করিলে তাহা পূর্ণ হয়। মুসলমানগণকেও বাতাসা চিনি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া সেখানে "সিন্নি" বলিয়া বালকগণকে বণ্টন করিয়া দিতে দেখিয়াছি। প্রত্যহ নানাজাতি নানাধর্ম্মাবলম্বী বহু লোক কামান দর্শনার্থে ঢাকার চক বাজার সমবেত হয়। ঢাকা সহরের প্রাচীন কীর্ত্তিনিচয়ের মধ্যে আজকাল সর্ব্বপ্রধান দর্শনীয় বস্তু এই কামান ও লাল বাগের কেল্লা।

কালু ঝম্ ঝম্ ত ঢাকা চক বাজারেই আছে। এতদ্ব্যতীত "বিবি মরিয়েম" নাম্নী আর একটি কামানও নাকি ছিল। সেটি বুড়িগঙ্গা নদীর অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। বর্ষাকালে বুড়িগঙ্গা নদীতে কামান গর্জ্জনের ন্যায় একপ্রকার ভীষণ শব্দ হইয়া থাকে। আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের ধারণা যে, "কালু ঝম্ ঝম্" কামানের "বিবি মরিয়েম" নাম্নী কামানরূপিণী এক স্ত্রী ছিল। সেই "বিবি মরিয়েম" নাম্নী কামান বুড়িগঙ্গার জলে নিমজ্জিত হওয়ায় পতি-বিরহে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া এইরূপ বিকট শব্দ করিয়া থাকে। এই কামান সম্বন্ধে এতাদৃশ বহুবিধ অলৌকিক গল্প শুনা যায়। তাহার কয়টার উল্লেখ করিব? এই সমস্ত খাস গল্প পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

অরুস্থান পারস্য রাজ্যের একটি সুবা। সেই অরুস্থানের অধিবাসী সৈয়দ মোহাম্মেদ সাইদ এক জন ধী-শক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিত ও বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি অর্থোপার্জ্জন মানসে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। প্রথমতঃ হায়দ্রাবাদ রাজ্যে উপনীত হইয়া সুলতান আবদুল্লা কুতুব শাহের সরকারে একটি ক্ষুদ্র চাকুরীতে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে স্বীয় প্রতিভা ও বিশ্বস্ততা এবং কার্য্যদক্ষতা গুণে ক্রমোন্নতি লাভ করতঃ কুতুব শাহের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। দাক্ষিণাত্য রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীকে "মীরজুম্লা" অর্থাৎ সমস্তের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই উপাধি প্রদান করা হইত। তদনুযায়ী আমাদের সৈয়দ মোহাম্মদ সাইদ সাহেবকেও "মীরজুম্লা" উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। অতঃপর হায়দ্রাবাদের মন্ত্রিত্ব-পদ পরিত্যাগ করিবার পরও তিনি এই "মীরজুম্লা" উপাধিতেই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন দক্ষতার সহিত হায়দ্রাবাদের রাজ কার্য্য পরিচালনা করিয়া কোন কোন বিষয়ে সুলতানের সহিত মীরজুম্লার মতান্তর ও মনান্তর উপস্থিত হওয়ায় তিনি মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়া মহানগরী আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। সম্রাট শাহ জাহান তখন অতি শান্ত ও ধীর ভাবে ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিতে ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর তখন শাহাজাদা মির্জ্জা মহিউদ্দিন। মীরজুম্লা আগ্রা নগরীতে উপনীত হইয়া কিছুদিন অবস্থান করতঃ যুবরাজ আওরঙ্গজেবকে স্বীয় প্রণয়-পাশে আবদ্ধ করিলেন। শাহাজাদা দারা তখন সম্পূর্ণরূপে শাহজাহানের হৃদয় অধিকার করিতে পারেন নাই। তখন কনিষ্ঠ আওরঙ্গজেবই শাহজাহানের অতি স্নেহের সামগ্রী। আওরঙ্গজেব পিতৃ-সন্নিধানে বন্ধু মীরজুম্লার সম্যক পরিচয় প্রদান করিলেন ও শাহাজাদার অনুরোধে মীরজুম্লা উমরায়ে আজমের বা অমাত্যের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ঘটনা-বৈচিত্র্যে ও নানা কারণে পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া যুবরাজ আওরঙ্গজেব সম্রাট "আলমগীর" উপাধি

গ্রহণ করিলেন, এবং ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময় মীরজুম্লা আওরঙ্গজেবের অনেক সহায়তা করিয়া ছিলেন, তাই উপকারের প্রতিদান ও পূর্ব্বকৃত বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ সম্রাট বন্ধুকে সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, ভারত সাম্রাজ্যের সুবা সমূহের শীর্ষস্থানীয় বঙ্গদেশের সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। বঙ্গদেশ তখন এক প্রকার মহাবিপ্লবের লীলা-নিকেতন—কারণ ভারত সম্রাট পুত্র কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ; সম্রাট-পুত্রগণের পরস্পরের সহিত ভীষণ সংগ্রাম। বঙ্গাধিপতি শাহাসুজা পলায়ন করিয়াছেন; সুতরাং বঙ্গের মসনদ তখন অনেক দিন পর্য্যন্ত বাহন শূন্য। কাজেই দেশীয় রাজন্যবর্গ ও দস্যু তস্করেরা সুযোগ পাইয়া ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। আত্মকলহে মোগল রাজত্ব বুঝি ধ্বংস হইল, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দেশীয় রাজন্যবর্গ আপন আপন অধিকার বিস্তার করিবার মানসে পরস্পর আহবে লিপ্ত হইয়া ছিলেন। মীরজুম্লা বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই অতি ক্ষিপ্রতার সহিত অবিলম্বে বিপ্লবাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম হইলেন, এবং প্রবল পরাক্রান্ত কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করতঃ রাজাকে পরাজিত করিয়া কোচবিহার রাজ্য মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া আলমগীর নগর নামক এক সহর স্থাপন করিলেন। অতঃপর মীরজুম্লা আসামের দিকে অগ্রসর হইয়া আসামের অনেকাংশ জয় করতঃ মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত করিলেন। কিছু দিন পর গারো-পর্ব্বতের পাদ-দেশে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্গের কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করিলেন, সুতরাং আর দুর্গের কার্য্য শেষ হইল না। আজ পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সীমায় জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত গারো হিলের অতি নিকটে বক্সীগঞ্জ বন্দরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে কাকিলাকুড়া গ্রামের পশ্চিমে ও বাট্টাজুড় গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান থাকিয়া দর্শকগণের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া থাকে। যেরূপ বিস্তৃত স্থান লইয়া দুর্গ-নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, যদি ইহার কার্য্য সম্পূর্ণ হইত, তবে আজ এই দুর্গের নিকট ঢাকা লালবাগের দুর্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইত। মৃগয়া উপলক্ষে গারোহিলে গিয়া ঐ দুর্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে কয়েক দিন বসবাস করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ইহা মীরজুম্লাই নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। স্থানীয় অশিক্ষিত কৃষক, গারো, হাজং, বংশী, প্রভৃতি সকলেই এই দুর্গকে "মীরজুম্লার কেল্লা" "মীরজুম্লার বাড়ী" ইত্যাদি নামকরণ করিয়া থাকে।

মীরজুম্লার সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশীয় করদ রাজ্যের রাজগণ সকলেই শাহজাহানের পক্ষভুক্ত। শাহজাহানের শিষ্টাচার ও প্রজাবাৎসল্য কেহই ভুলিতে পারিয়াছিল না, সুতরাং আওরঙ্গজেবের কুটিলতা ও স্বার্থপরতায় সকলেই ব্যথিত ও মর্ম্মাহত। বিলাসী সুজা বিলাস-ব্যসন ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিলেও প্রজাবাৎসল্য তাঁহার অপরিসীম ছিল। কাজেই তাঁহার পরাজয়েও প্রকৃতিপুঞ্জ শোকাকুল। কখন আরাকান, কখন পর্ত্তুগীজ, কখন ব্রহ্মরাজ, কখন বা বিহারের রাজা বীর দর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দিলেন কিন্তু মীরজুম্লার অসীম সাহস ও অতুল বীর্য্যবত্তার নিকট কেহই তিষ্ঠিতে পারিলেন না। এই সমস্ত শত্রুর হস্ত হইতে রাজধানী ঢাকা নগরীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই কামান দুইটি ঢালাই করিয়া ইহাদের "কালু ঝম্ ঝম্" ও "বিবি মরিয়েম" নামকরণ করা হইয়াছিল। মীরজুম্লার সময়ে এই কামানের ব্যবহার হইয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু মীরজুম্লা পরলোক গমন করিবার পর হইতে এই কামান বেকার অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

"তারিখই নছরজ্জঙ্গ" নামক পার্শী ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, "ঢাকার লালবাগ বা আওরঙ্গাবাদ দুর্গের অস্ত্র নির্ম্মাতা ও কর্ম্মকারগণের অধ্যক্ষ ও প্রধান কর্ম্মকারের নাম কালু এবং তাহার সহধর্ম্মিণীর নাম "বিবি মরিয়েম" ছিল। সংসারে তাহারা

সিঃসন্তান হওয়ায় বিবি মরিয়েম কালুকে বলি "আমাদের যখন সন্তান সন্ততি কিছুই নাই এবং হইবারও সম্ভাবনা অতি অল্প তখন আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ দ্বারা আমাদের নাম ও স্মৃতি রক্ষার কোন উপায় নাই। অতএব পৃথিবীতে এমন একটি কার্য্য ও স্মৃতি চিহ্ন রাখিয়া যাও যদ্দ্বারা আমাদের অভাবের পরেও জনসাধারণের মধ্যে আমাদের নাম বিঘোষিত হয় ও জাগরুক থাকে।" ইহা শুনিয়া অনেক চিন্তার পর কালু বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া এই অদ্বিতীয় কামান দুইটি নির্ম্মাণ করতঃ তাঁহার পত্নীর ও নিজের নামানুযায়ী "কালু ঝম ঝম" ও "বিবি মরিয়েম" নাম দিয়া বঙ্গাধিপতি মীরজুম্লাকে উপহার প্রদান করেন। "ঝম ঝম" বেহার দেশের ভাষা; ইহার অর্থ অতি বৃদ্ধ। পূর্ব্ববঙ্গেও "ঝম ঝম" শব্দের অল্প বিস্তর ব্যবহার আছে। ইহাও অতি বৃদ্ধ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কামান দ্বয় বহন করিবার নিমিত্ত কালু অতি আশ্চর্য্য রকমের দুইখানি লৌহ-নির্ম্মিত যান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াও "রুকাতে আলমগিরী" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে (১)। আজকাল ঐ লৌহ যান কোথায় আছে তাহার নির্ণয় নাই। মীরজুম্লা এই কামান প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কামানের নাম ঠিক রাখিয়া রাজ সরকারে জমা করিয়া লইলেন। পুরস্কার স্বরূপ কালুকে বিস্তৃত জায়গীর প্রদান করিলেন। এই কামান দুটির একটি ঢাকার চক বাজারে থাকিয়া দর্শকগণের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে; অন্যটি বুড়িগঙ্গার অতল জলে কোথায় নিরুদ্দেশ ভাবে পতিত রহিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না।

নবাব নছরৎ জঙ্গ বাহাদুর তদীয় "তারিখ ই নছরৎজঙ্গে" আরও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, "এই কামান দ্বয়ের একটি মোগলানীর চরে অপরটি ঢাকার সোয়ারীঘাটে অরক্ষিতাবস্থায় পড়িয়া আছে। "এই কামান দুইটি সম্রাট আলমগীরের সময় ও সৈয়দ মোহাম্মদ মীরজুম্লার সময় কালু ঝম ঝম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কামান যে দিন আওরঙ্গাবাদ দুর্গ প্রাকারে রক্ষা করা হইয়াছিল; সেই দিন নবাব মীরজুম্লার প্রিয়তমা কন্যা পরী বেগমের মৃত্যু হয়, তাই কামান দুইটিকে অমঙ্গল জনক মনে করতঃ দুর্গে রক্ষা না করিয়া বুড়িগঙ্গা নদীর ধারে স্থাপন করা হইয়াছিল। ইহার এক বৎসর একাদশ মাস পরে নবাব মীরজুম্লাও পরলোক গমন করেন, ইহাতে সকলে মনে করিল যে, নিশ্চয়ই এই কামান দুইটি নিতান্ত অমঙ্গল জনক। তাই পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণ কেহই এই কামান দ্বয়ের ব্যবহার বা যত্ন করেন নাই।"

মিঃ ওয়াল্টার যখন ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে আসিয়া ঢাকার "লোহার সেতু" নির্ম্মাণ করেন তখন সেতু নির্ম্মাণ শেষ হইলে, তাহার উপর দিয়া প্রথম গাড়ী, ঘোড়া ও লোক চলাচলের দিন তিনি ঢাকার হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, আর্ম্মাণী প্রভৃতি অধিবাসীগণকে এক ভোজের সভায় আহ্বান করেন। আহারান্তে মিঃ ওয়াল্টার এক বেদির উপর দণ্ডায়মান হইয়া উর্দু ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে তিনি লোহার পুলের অতিরিক্ত প্রশংসা ও ইহার সুদৃঢ়তার গুণ কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বলিলেন যে, ঢাকা সহরে তাঁহার নির্ম্মিত লৌহ সেতু ব্যতীত আর লৌহ নির্ম্মিত কোন আশ্চর্য্যজনক ও সুদৃঢ় জিনিষ নাই। সকলেই কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় সাহেবের উক্তির অনুমোদন করিলেন, কিন্তু মাওলা বক্স নামক বর্ণজ্ঞানবিবর্জ্জিত জনৈক বৃদ্ধ নির্ভীক অন্তঃকরণে বলিয়া উঠিল যে, "সাহেব,

---

(১) "রুকাতে আলমগিরী"তে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের পত্রাবলি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার জীবিতাবস্থায় তিনি যে সমস্ত পত্র নানা স্থানে নানা জনের নিকট লিখিয়া ছিলেন তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের নাম "রুকাতে আলমগিরী" ভাষা পার্শী—৪ খণ্ডে সমাপ্ত—লেখক।

কালু বুড়া এই ঢাকা নগরীতে যে কামান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহার এক ক্ষুদ্র গোলার আঘাতেই এ রূপ শত সেতু চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।"

"কালু ঝম্ ঝম্" সম্বন্ধে মিঃ ওয়াল্টার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। এখন বুড়ার মুখে কালু ঝম্ ঝম্ কামানের তত্ত্ব অবগত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, ঐ কামানটি ঢাকার সোয়ারী ঘাটে মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত আছে, সামান্য অংশ মাত্র মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। পরদিন সাহেব সদলবলে সোয়ারী ঘাটে উপস্থিত হইয়া কামানটি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উত্থিত করিবার নিমিত্ত কুলি নিযুক্ত করিলেন। কামানের চতুঃপার্শ্ব খোদিত হইলে মিঃ ওয়াল্টার তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ভীষণ কামান দর্শন করিয়া স্বীকার করিলেন যে, এই কামানের একটি গোলার আঘাতে ঢাকার লোহার পুলের ন্যায় শত শত সেতু চূর্ণীকৃত হইতে পারে, ইহা মিথ্যা নহে, এত বড় কামান ভারতেই সম্ভবে।

এ দিকে মিঃ ওয়াল্টার ঢাকার চকবাজার নির্ম্মাণ করিয়া তথায় একটি চবুতারা প্রস্তুত করতঃ তদুপরি এই অদ্বিতীয় কামানরাজকে রাখিবার মানস করিলেন। বহু সংখ্যক হস্তী লইয়া কামানের দড়িতে শিকল বাঁধিয়া হস্তী দ্বারা কামান উঠাইতে চেষ্টা করিলেন। এক দুই বার করিয়া বহুসংখ্যক হস্তী দ্বারা টানাইলেন, কামানের একটি কড়ি ভগ্ন হইল, শিকল ছিন্ন হইল, কিন্তু কামান নড়িল না। অনেক সাধ্য সাধনা ও চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই কামান উঠাইতে পারিলেন না। অতঃপর কলিকাতা হইতে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আনয়ন করিয়া কামান উঠাইবার আয়োজন করিলেন। তখন পূর্ব্ববঙ্গে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আসে নাই, কেহ ইঞ্জিন দেখে নাই, কাজেই "ইঞ্জিন, ইঞ্জিন" বলিয়া দেশময় একটা হলস্থূল পড়িয়া গেল; অসংখ্য লোক এ দৃশ্য দেখিবার জন্য সমবেত হইল। পুলিশ জনসঙ্ঘ তাড়াইয়া দিবার জন্য বহু চেষ্টা করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। লোক সমাচলে রাস্তা ঘাট বন্ধ হইল, ইঞ্জিন চালাইবার কোন উপায় রহিল না। অতঃপর উপস্থিত জনমণ্ডলীকে কৌশলে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত ঘোষণা করা হইল যে, ইঞ্জিন দ্বারাও কামান উত্তোলন করা গেল না। জনমণ্ডলী নানারূপ গুজব শুনিয়া ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িল। অতঃপর গভীর নিশাতে সকলের অজ্ঞাতসারে ইঞ্জিনের সাহায্যে কামানটা সোয়ারীঘাট হইতে চক বাজারের চবুতারার উপর আনিয়া রাখা হইল।

প্রাতে উঠিয়া সহর-বাসীরা দেখিল চক বাজারের চবুতারার উপর কামান লম্বমান আছে। তখন দেশময় রাষ্ট্র হইল যে, সাহেব বাহাদুর অনেক সাধ্য সাধনায় কামান উঠাইতে সক্ষম হন নাই; কিন্তু ৮সিন্নি মানস করিলে দেব-শক্তিবলে আপনা আপনিই কামান চকবাজারের চবুতারার উপর উঠিয়া আছে। নিশ্চয় এই কামান মানুষে নির্ম্মাণ করে নাই, ইহা বিধাতার নিয়োজিত শিল্পী দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ইহাতে জীবনী শক্তি আছে। যাঁহারা কামান আনয়ন সম্বন্ধীয় আসল কথা অবগত ছিলেন, তাঁহারা চিহ্ন ও প্রমাণ দ্বারা ভ্রমান্ধদিগের অলীক ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কেহ আস্থা স্থাপন করিল না। সকলেই বিশ্বাস করিল যে, কামানে দৈব শক্তি বর্ত্তমান আছে। এই ঘটনার পর হইতেই কামানটি ভ্রমান্ধদিগের নিকট দেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে। কামানের গাত্রে কোন রূপ কিছু লিখা নাই।

শ্রীনুরুলহোসেন কাশিমপুরী।

গোসাই ও ভকত

কামরূপ প্রদেশ ভারতের সর্ব্বত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ৮ কামাখ্যার নামে সুপরিচিত হইলেও এখানে অধিকাংশ হিন্দুই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। বৈষ্ণবগণও অন্যান্য স্থানের

স্থায় এখানে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে মহাপুরুষীয়গণের নাম প্রসিদ্ধতর হইলেও সংখ্যায় ও প্রভুত্বে দামোদরীয় সম্প্রদায়েরই আধিক্য। আসামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক শঙ্করদেবের দুই জন সহকর্ম্মী ছিলেন, এক ব্রাহ্মণ দেবদামোদর; অপর শঙ্করের স্বজাতীয় কায়স্থ মাধবদেব। দামোদরের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই দামোদরীয়া বা দামুদীয়া নামে প্রখ্যাত; এবং মাধবদেবের সম্প্রদায়ই মহাপুরুষীয়া নামে অভিহিত। মহাপুরুষীয়া ও দামোদরীয়ায় পার্থক্য প্রধানতঃ এই যে, মহাপুরুষীয়াগণ গোঁড়া বৈষ্ণব, অন্য দেবদেবী মানে না; কিন্তু দামোদরীয়াগণ এ বিষয়ে খুবই উদার।

নদরাজ ব্রহ্মপুত্র লক্ষীমপুর জেলার প্রায় তিনচতুর্থাংশ ছাড়াইয়া এবং শিবসাগর জেলার কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া স্বীয় বিশাল কলেবর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দুইটি খাতে প্রবাহিত হইয়াছেন; উত্তরের খাতটি প্রাচীন লৌহিত্যের অপভ্রংশে লোহিত নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে। যাহা হউক এই দুই প্রবাহ পুনশ্চ অর্দ্ধশত মাইল আন্দাজ গিয়া মিলিত হওয়াতে একটি বিশাল দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। আসামীয়া ভাষায় দ্বীপের সাধারণ নাম 'মাজুলি' এই দ্বীপের নামও 'মাজুলি'।

দেবদামোদর স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারার্থে চারি দিকে শিষ্য পাঠাইয়া নানা সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। অন্যতম শিষ্য বংশীদেব মাজুলিতে একটি সত্র * স্থাপন করেন—ইহা এইক্ষণে সমগ্র আসাম প্রদেশে প্রধানতম সত্র মধ্যে পরিগণিত—ইহাই আউনিআটি সত্র। এই সত্রের সহস্র সহস্র শিষ্য—অনেকেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। অতএব ইহার আয়ও প্রচুর। যিনি অধিকারী গোস্বামী তাঁহার যেমন দেবোপম সম্মান তেমনই রাজোপম ঐশ্বর্য্য। এক কথায়ই তাঁহার প্রভুত্বের পরিমাণ অনুমিত হইবে যে, তাঁহার সেবা করিবার জন্য একত্রিশ জন কর্ম্মচারী সর্ব্বদা মোতায়েন থাকে। এই গোস্বামীকে চিরকৌমার্য্য ব্রত ধারণ করিতে হয় কিন্তু যদিও ইঁহারা ঈদৃশ ঐশ্বর্য্য মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন, তথাপি ইঁহাদের আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এতই বাঁধাবাঁধি নিয়ম যে, ইঁহারা বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া পদের অমর্য্যাদা করিয়াছেন এই রূপ শুনা যায় নাই। উদাহরণ স্বরূপ একটি নিয়মের উল্লেখ করিতেছি। ইঁহাদিগকে আপনার হাতে পাক করিয়া খাইতে হয়—এই পাকের সামগ্রী এবং রীতিও বিশেষ ভাবে নিয়ম-নির্দ্দিষ্ট—হাঁড়ি ও চুলা রোজ রোজ নূতন হইবে—এবং জ্বালাইবার কাঠগুলি পর্য্যন্ত ধুইয়া শুকাইয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

বংশীদেব হইতে শিষ্য-পরম্পরা এই সম্মানিত পদে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে স্বর্গগত দত্তদেব গোস্বামী এবং তাঁহার একটি সামান্য মন্ত্রশিষ্য—নাম আজলী ভকত *—সম্বন্ধে এতৎ প্রবন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

৺ দত্তদেব গোস্বামী ১৭৪০ শকাব্দের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন; যে সকল নির্দ্দিষ্ট প্রকাশ্য পরিবার হইতে এই সত্রের (এবং তাদৃশ অপর সত্রের) গোস্বামী পদাধিকারী নির্ব্বাচিত হইয়া সত্রাধিকারী কর্ত্তৃক দত্তকরূপে (পুত্রেষ্টি যাগ সম্পাদন পূর্ব্বক) গৃহীত হইয়া থাকেন ইনিও এতাদৃশ পরিবারেই জাত হইয়াছিলেন। শকাব্দ ১৭৪৫ সালে তদানীন্তন আউনিআটির অধিকারী ৺ কৃষ্ণদেব গোস্বামী ইহাকে যথানিয়মে দত্তক গ্রহণপূর্ব্বক ডেকা (অর্থাৎ যুবক) অধিকারীরূপে আনিয়া সত্রে স্থাপন করেন। ১৭৬০ শকাব্দে বিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি সত্রাধিকার প্রাপ্ত হন এবং আজ প্রায় নয় বৎসর হইল বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছেন। এত দীর্ঘকাল—শতাব্দীর দুই তৃতীয়াংশ—অধিকারী-পদ ভোগ করা অসামান্যত্বের পরিচায়ক; ফলতঃ বিদ্যা বুদ্ধি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রকৃতই তিনি এতদঞ্চলে এক জন মহাপুরুষরূপে পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় এতাদৃশ ব্যক্তির জীবন-কাহিনীর বেশী

* বাঙ্গালা দেশে আখড়া বলিতে যাহা বুঝায় আসামে সত্র শব্দেও তাহাই বুঝিতে হয়।

* আজলী অর্থ সোজা; ভকত অর্থ ভক্ত।

কিছু জানিতে পারা যায় নাই। তাঁহাকে বাল্য বা যৌবনাবস্থায় দেখিয়াছে এতাদৃশ লোকও পাওয়া দুর্ঘট। তদীয় কোনও ভক্ত শিষ্য অসমীয়া ভাষায় তাঁহার দেহ ত্যাগের সময়ে দুই একটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক * রচনা করিয়াছেন—তাহা হইতে এবং তাঁহাদের অনুরাগী আরও দুই এক জন ব্যক্তি হইতে বক্ষ্যমাণ বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

৺দত্তদেব গোস্বামী পরম পণ্ডিত ছিলেন। অধ্যাত্ম শাস্ত্রে তাহার অসামান্য অধিকার ছিল। ঐ জ্ঞান কেবল পুস্তকগত ছিল না; তিনি একাধারে এক জন ভগবদ্ভক্ত ও পরম যোগী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও স্বয়ং সত্রের বিগ্রহ গোবিন্দের পূজার্চ্চনা করিতেন। এই পূজা করিতে তাঁহার অনেক সময় লাগিত; কখনও বা বহুক্ষণ তাঁহাকে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় দেখা যাইত; আবার কখনও বা দেখা যাইত যে, তিনি যেন ভাবে বিভোর হইয়া আছেন, চক্ষু হইতে দরদরিত ধারে অশ্রু বর্ষণ হইতেছে। অনবরত সৎপ্রসঙ্গে তাঁহার রতি ছিল। আমাদের পণ্ডিতরত্ন মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বর কবিরত্ন মহাশয় বহুদিন তাঁহার নিকটে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন এবং আউনিআটি সত্রের টোলে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। আজিও তিনি পঞ্চমুখে ৺দত্তদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

সমাজের নানাবিধ উন্নতিকল্পেও তাঁহার প্রযত্ন ছিল। তিনি আউনি-আটিতে "ধর্ম্ম প্রকাশ যন্ত্র" নামে একটি প্রেস্ সংস্থাপন করিয়া "আসাম বিলাসিনী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচলিত করিয়াছিলেন। ১৮৭১ অব্দ হইতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পত্রিকাখানি চলিয়াছিল। প্রধানতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইলেও সাধারণের জ্ঞাতব্য অন্যান্য বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইতে। পত্রিকার ভাষা বাঙ্গালা ছিল। আসামবাসীর দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা ইহাই সর্ব্বপ্রথম।

এদিকে যেমন ধর্ম্মপ্রসঙ্গে সাধু সজ্জনের এবং দেশ-হিতকর নানা কার্য্য লোকসাধারণের ভক্তিভাজন ছিলেন, তেমনই গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ শাসনকর্ত্তৃবর্গেরও তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। যখন লর্ড কর্জ্জন আসাম প্রদেশে পরিদর্শনার্থ আসিয়া ছিলেন তখন এই গোস্বামী মহোদয়ও তাঁহার অভ্যর্থনা কার্য্যে অগ্রণী স্বরূপ ছিলেন। প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে "কেসরি হিন্দ্" মেডেল প্রদান করা হইয়াছিল। * গোস্বামী স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন সংবাদ পাইয়াই তদানীন্তন চিফ্ কমিশনার (পরে সার্ বাম্ফিল্ড্) ফুলার বাহাদুর আসাম গেজেটের প্রথম পৃষ্ঠায় শোকপ্রকাশক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মানার্থ শিবসাগর জেলার সমস্ত আফিস্ আদালত তাঁহার শ্রাদ্ধের দিনে বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রচার করিয়া ছিলেন।

জীবিত কালে কে কিরূপে জীবন কর্ত্তন করিয়াছে, তাহা তদীয় মৃত্যুকালীন অবস্থায় সূচিত হইয়া থাকে। পরলোক প্রস্থান সময়ে ৺দত্তদেব গোস্বামীর বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল; তথাপি তিনি মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত কর্ম্মপটু ছিলেন। তাহার দেহে জ্বর ছিল তথাপি নিয়ম মত প্রাত্যহিক স্নান পূজাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিয়া ছিলেন। পঞ্জিকা দেখাইয়া পূর্ণিমা (মৃত্যুর দিন ঐ তিথি ছিল) কতক্ষণ জানিয়া লইয়া ঠিক্ যে মুহূর্ত্তে পূর্ণিমা শেষ হইল তার মিনিট খানিক বাকী থাকিতে দেহ ত্যাগ করিলেন। মৃত্যু-কালে সম্মুখে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি এবং জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার চিত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে একবার মাত্র ইষ্টনাম উচ্চারণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক সৌম্যকান্ত শরীরের বিন্দুমাত্র বিকৃতি বা বিবর্ণতা দৃষ্ট হইল না।

* ৺দত্তদেব চরিত্র শ্রীবাচারাম আউল প্রণীত।

* অভ্যর্থনা কার্য্যে আউনি আটির সমকক্ষ দক্ষিণ পাট সত্রাধিকারী গোস্বামীও যোগ দিয়া ছিলেন এবং তিনিও ঐ মেডেল পাইয়া ছিলেন।

ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের জল হইতে অনেকট। উপরিভাগে ৺ দত্তদেবের দেহ অগ্নিসাৎ করা হয়; দাহান্তে যখন ভক্তেরা চিতাভস্ম ব্রহ্মপুত্রের জলে নিক্ষেপ করিবার জন্য উপক্রম করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ ব্রহ্মপুত্রের জল সোঁ সোঁ করিয়া উথলিয়া দাহ-স্থানে আসিয়া ভস্মাবশেষ বহন করিয়া লইয়া গেল। ভক্তবৃন্দ এতক্ষণ শোকে মুহ্যমান ছিলেন—এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া গুরু-মাহাত্ম্যের এক অভিনব পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং সংকীর্ত্তন লইয়া নৃত্য করিতে করিতে সত্রে ফিরিয়া গেলেন।

শিষ্যের দ্বারাও অনেক সময় গুরুর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। আমরা যে ভকতের কথা বলিতেছি সেই ব্যক্তি জাতিতে শুঁড়ী ছিল। তাহার নামটি জানিতে পারি নাই; কিন্তু স্বভাব নিতান্ত সরল ছিল বলিয়া তাহাকে সকলে 'আজাল ভকত' বলিয়া ডাকিত।

ইহার নাকি প্রথম অবস্থায় স্বভাব চরিত্র বড় ভাল ছিল না। কিন্তু ইহার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, মনটা বড়ই সাদা ছিল। যাহা হউক ভগবান কাহাকে যে কখন কোন বুদ্ধি দেন, তাহা বলা যায় না। ইহার বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে কোনও সুকৃতি ছিল, তাই সহসা তাহার মনে হইল যে, আউনিআটির সত্রাধিকারী গোস্বামীর নিকট 'শরণ' (দীক্ষা) নিবে।

৺ দত্তদেব গোস্বামীও বোধ হয় ইহার ক্ষেত্রটা ভাল দেখিয়া ইহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। সেই অবধি ভকত গোসাইকে "পরম বান্ধব" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল এবং প্রাণপণে ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপদেশ পালন করিতে লাগিল। এমন কি অনেক সময় এতই তন্ময় হইয়া পড়িত যে, বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া যাইত।

একদা গোসাইর পাকশালার দ্বারে ইহাকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া ভৃত্যেরা স্থানান্তরে গমন করিলে সত্রের একটি গরু আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং গোসাইর আহারের সমস্ত সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া চলিয়া গেল। ভৃত্যেরা ফিরিয়া আসিয়া দেখে ভকত দ্বারে বসিয়া জপে নিরত—আর গৃহের খাদ্য সামগ্রী তাবৎ নিঃশেষ ভক্ষিত। পদচিহ্নে তাহারা গরুর কাণ্ড বুঝিতে পারিল। গোসাই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে ভকত উত্তর করিল আমি এখানে বরাবরই ছিলাম কখন যে গরু আসিল ও গেল, কিছুই বলিতে পারি না।

এইরূপ যাহার একাগ্রতা তাহার সিদ্ধি অদুরবর্ত্তিনী। ফলতঃ "পরম বান্ধব" গোসাইর কৃপায় ভকত অচিরেই সাধনা-মার্গে সবিশেষ উন্নত হইয়া উঠিল। ভগবৎ-কৃপায় তাহার অশ্রু, কম্প, পুলক এমন কি মহাভাব সমাধি পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। গুরু গোস্বামীও ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে করিতে লাগিলেন।

সত্রে সর্ব্বদাই কীর্ত্তন হইত। তাবৎ কীর্ত্তন তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। কীর্ত্তনে তাহার নৃত্য ও ক্রন্দন—তাহার ভাব মহাভাব ইত্যাদি অনবরতই হইতে লাগিল। গোসাই তাহার ঈদৃশী সিদ্ধাবস্থা দেখিয়া তাহাকে গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন।

ইহার বাড়ী শিবসাগর জেলায় যোড়হাট সব্-ডিভিশনের মধ্যেই কোথায় ছিল। বাড়ীতে গিয়া বিবাহ করিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্ম সাধনা করিতে লাগিল। একে সরল বুদ্ধি ইহার উপর বিদ্যা বা ধনসম্পত্তি কোনও কিছু ছিল না; আবার দারপরিগ্রহ করাতে স্ত্রী ও শিশু সন্তানের ভরণপোষণও করিতে হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, ইহার সংসার যাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। লোকে তাহার নিষ্কপট ধর্ম্মভাব দেখিয়া আগ্রহ করিয়া 'নামকীর্ত্তন' করিবার জন্য তাহাকে আপন আপন আলয়ে নিয়া যাইত—তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইহাতে সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইবে—এবং প্রায়শঃ বিশ্বাস অনুযায়ী ফল লাভও করিত। এইরূপ করিয়া যাহা কিছু চাউল পয়সা ইত্যাদি পাওয়া যাইত ইহাতেই এই ভকত পরিবারের বেশ চলিয়া যাইত।

পরিবারে ভকতের স্ত্রী এবং দুইটি ছেলে ছিল। বড় ছেলেটি এবং স্ত্রীকে নিয়া রোজ রোজ গৃহে কীর্ত্তন হইত

এবং প্রায়শঃ ছেলেটি সহ কীর্ত্তন করিয়া নাচিতে নাচিতে সত্রে গিয়া "পরমবান্ধবের" সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিত। আর যে একটি ছেলে ছিল—সেটি ছোট এবং মূক ও বধির ছিল। সে যে নামকীর্ত্তন করিতে পারিত না ভকতের ইহা এক দারুণ দুঃখ ছিল।

সত্রে আসিয়া গুরু দর্শন করা উহার নিত্য কর্ত্তব্য না হইলেও নৈমিত্তিক ছিল; এতদর্থে মধ্যে মধ্যে তাহাকে বড়ই বেগ পাইতে হইত। একটি ঘটনা এস্থলে বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আউনিআটি সত্র যে স্থানে স্থাপিত, সেইটা একটা দ্বীপ; ঐ দ্বীপ এবং যোড়হাটের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র প্রবহমান। হেমন্তে ব্রহ্মপুত্র পার হইতে বিশেষ অসুবিধা নাই। কোকিলামুখ ষ্টীমার ষ্টেশনের ঘাটে খেয়া নৌকা অনায়াসে মিলে। বর্ষায় যখন নদরাজ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন, তখনই বড় অসুবিধা ঘটিত—সকল সময়ে খেয়া নৌকা মিলিত না। আবার ভকতটিরও সময়াসময় জ্ঞান ছিল না। একদা সন্ধ্যা হইয়াছে; কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি আগত; প্রাবৃটকালীন নভোমণ্ডল জলদপটলে সমাবৃত। ঘাটে খেয়ানি বান্ধব (ভকতের সংসারময় সকলেই 'বান্ধব' ছিল) কোনও মতে পাড়ি দিতে স্বীকৃত হইতেছে না—অথচ ভকতের প্রবল বাসনা 'পরম বান্ধবের' চরণ সন্দর্শন করিতেই হইবে। এখন উপায়?

বর্ষা-কালে ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোতে নীয়মান হইয়া নলখাগড়া প্রভৃতির ঝাঁঝরি (ভোরা) ভাসিয়া যায়। এইরূপ একটা ভোরা কূল ঘেঁসিয়া যাইতেছিল; ভকত বলিয়া উঠিল, "এই যে আমার 'পরম বান্ধব' পারের ভেলা পাঠাইয়া দিয়াছেন।" অমনি জলে নামিয়া গিয়া উহার উপর চড়িয়া বসিল এবং এরূপ ডাক নাম সংকীর্ত্তনে রত হইল যে, ভোরায় যে তাহাকে কোথায় নিয়া চলিয়াছে তদ্বিষয়ে চিন্তামাত্রও করিবার অবসর তাহার ছিল না।

রাত্রি কালে গোসাই শুইয়াছেন; স্বপ্নে সত্রাধিষ্ঠাতা গোবিন্দ তাঁহাকে জানাইলেন "ভকত ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাসিয়া যাইতেছে।" তখনই গোসাই গাত্রোত্থান করিয়া সত্রের কতিপয় লোক সহ সেই রাত্রিতেই ব্রহ্মপুত্রে ভক্তানুসন্ধানে নৌকা প্রেরণ করিলেন। নৌকার লোকেরা তাহাকে কোকিলামুখ হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ ভাটিতে নিগ্রেটিং নামক স্থানের নিকট ভোরার উপরে উপবিষ্ট থাকিয়া নাম গানে তন্ময় অবস্থায় দেখিতে পাইল। যখন তাহাকে নৌকায় উঠিতে উহারা বলিল, তখন যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভকত বলিল—"এ আমি কোথায় আসিয়াছি? এখনও কি সত্রের ঘাটে পৌঁছিতে পারি নাই?" সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া ভকত বলিল "তাইতো, 'পরম-বান্ধব' আজি রক্ষা না করিলে তো মারাই যাইতাম।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভকত জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া প্রায়শঃ নৃত্য সহকারে কীর্ত্তন করিয়া সত্রে যাইত। এক দিন একাকীই নাচিতে নাচিতে গান করিয়া ভকত সত্রে আসিয়া উপস্থিত। 'পরম বান্ধবের' নিকট দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিল "প্রভো আজি আমার সংকীর্ত্তনের সহচর বড় ছেলেটি বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। ভকতানীর আর্ত্তনাদে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না—আমি কতই বলিতেছি, সে বৈকুণ্ঠে গেল ইহাতে তোমার আমার দুঃখ করিবার কি আছে? প্রত্যহ আমার কেবল মনে এই ক্লেশ যে, কীর্ত্তনের সঙ্গী একটি ছিল—ইহাকে নিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সত্রে আসিতাম তা আর পারিব না।" গোসাই এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলেরই ভকতের এমন পুত্রবিয়োগ বার্ত্তায় নয়নে অশ্রুজল উদ্গত হইল—কিন্তু তাহার বদন মণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন কিছুই নাই বরং নামকীর্ত্তনে প্রেমোৎফুল্লতাই দৃষ্ট হইল। *

* সে দিন একখানি বিশিষ্ট পত্রিকায় জনৈক লেখক মহাশয় এতাদৃশ একটি ঘটনার প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন—একজন কাশী-বাসী বাঙ্গালী পুত্রের মৃত্যুর পর হাসিয়া হাসিয়া গান গাহিতে গাহিতে শ্মশান ঘাটে যাইতেছেন দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। তখন আর এক জন কাশীবাসী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কাশীতে মরিলে শিব হয় বলিয়া সকলকেই আনন্দ প্রকাশ করিতে হয়। যে মরিয়া যায় সে শিব হয় বুঝিলাম, কিন্তু যাহারা বাঁচিয়া থাকে

এই রূপে ভগবান্ এই ভকতের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া যখন দেখিলেন যে, ভকত সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছে তখন তাহার পুরস্কারেরও বিধান করিলেন। ভকতের অপর যে একটি মূক ছেলে ছিল কিয়দ্দিন পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া গান করিতে করিতে ভকত সত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বলিল "পরম-বান্ধব" বলিয়াছেন ভগবৎ-কৃপায় মূক বাচাল হয়। আজ আমার ছেলেকে কথা বলাইতেই হইবে। এই বলিয়া সে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। রাম নামে শিলা জলে ভাসে, অসম্ভব সম্ভব হয়—এই বলিয়া রাম চন্দ্রের লীলা কীর্ত্তন করিতে লাগিল আর এক এক বার ছেলের কাণের কাছে বলিতে লাগিল "বল রাম রাম হরি হরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ।" বালকটি পিতা যে ভাবে মুখ ব্যাদান করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া এ সকল কথা বলিতে-ছিল, আবেগ ভরে তাহাই অনুকরণ করিতে লাগিল—কিন্তু চেষ্টা করিয়াও যেন ফল পাইতেছিল না—তথাপি ব্যগ্রতা সহকারে প্রাণপণে আয়াস করিতেছিল। অবশেষে ভগবানের কৃপা হইল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ন মহাশয় এই ব্যাপারের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। তিনি যে ভাবে বলিয়াছেন যথাস্মৃতি তাহাই এস্থলে বলিতেছি।

হঠাৎ বাঁশের চোঙ্গা হইতে কতকগুলি রুদ্ধ বায়ু নির্গত হইয়া আসিলে যেরূপ একটা ধ্বনি হয় সেই রূপ অর্থাৎ বাঁশীর শব্দের ন্যায় একটা আওয়াজ বালকের গলদেশ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। তৎপরক্ষণেই সে পিতার সঙ্গে সঙ্গে "রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি" বলিতে লাগিল। এবং সেই সময় হইতেই সে পিতার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ভকতের "কীর্ত্তনের সাথী" চলিয়া গিয়াছিল—ভগবান তাহার ঐ দুঃখ দূর করিয়া দিলেন। "মূকং করোতি বাচালং' এই বাণী প্রমাণিত হইল।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলই একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত, নিস্পন্দ এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাখেলা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত। স্বয়ং গোসাই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভকতকে "ধন্য ধন্য" বলিতে লাগিলেন। আর ভকত "পরম বান্ধবের" চরণে লুটাইয়া বলিতে লাগিল—"প্রভো এ যে তোমারই কৃপা—তুমি গুরু ঈশ্বর—তুমি কি না করিতে পার?"

গুরু ৺দত্তদেব গোস্বামীর প্রায় সমকালেই এই সরল ভক্ত শিষ্যও দেহ ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠবাসী হইয়াছেন। তাঁহাদের পুণ্য কাহিনীর অতি সামান্য কয়েকটি কথা মাত্র জানিতে পারিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া ধন্যম্মন্য হইলাম। কিন্তু এইরূপ ব্যক্তিগণের জীবন চরিত্রের ঈদৃশ সামান্য দুই চারিটি কথায় প্রাণের পিপাসা মিটে না। বিশেষতঃ এই কালে—গুরু, শাস্ত্র, ভগবৎ-সত্তা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষিত সাধারণের প্রবল অবিশ্বাসের যুগে—এতাদৃশ কাহিনীর প্রয়োজনীয়তাও খুবই। এই রূপ গোসাই ও ভকতের কাহিনী খুঁজিলে এ দেশে আরও যে না মিলিতে পারে তাও নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই ক্ষেত্রে কর্ম্মীর একান্তই অভাব।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

তাহারা 'পণ্ড' হয় কেন? আমার এ কথার কোনও উত্তর তিনি দেন নাই।" তা' লেখক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন নাই বোধ হয় আরসিকে রসস্য নিবেদনম্ মনে করিয়া। ভগবান্ ঈদৃশ শিক্ষাভিমানীর এই সকল ভাব বুঝিবার ক্ষমতা দিউন।

গ্রন্থ সমালোচনা

৩। ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার, প্রথম খণ্ড, কুমার শ্রীসৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত—আকার ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত, ২০৫ পৃষ্ঠা, কলিকাতা সাথী প্রেসে মুদ্রিত—উত্তম এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা—সুন্দর বাঁধাই, রূপার কালীতে নাম লেখা। চারিখানি হাফটোন ব্লক, ও দুইখানি সনন্দের অনুলিপি ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বিস্তৃত বংশ-

তালিকা সন্নিবিষ্ট হওয়ায় পুস্তকের উপাদেয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে।

সম্ভ্রান্ত বংশাবলীর এই রূপ বিস্তৃত ইতিহাস বঙ্গ ভাষায় বোধ হয় আর নাই। জমিদার বংশের প্রাচীন ইতিহাস নানা হিসাবে মূল্যবান। ইহাতে অনেক সহৃদয়তা, বদান্যতা ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত আছে। বিশেষতঃ অনেক স্থলেই কঠোর কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মপরায়ণতার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ময়মনসিংহের ব্রাহ্মণ জমিদারগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের সদ্‌গুণাবলীর দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া সদনুষ্ঠান-তৎপর হইবেন সন্দেহ নাই। আর সাধারণ পাঠক সম্প্রদায়েরও যে উপকার না হইবে এমন নহে। কুমার সৌরীন্দ্রমোহন এই কার্য্যে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের কার্য্য করিয়া ব্রাহ্মণ জমিদার বর্গের ও বঙ্গীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব-প্রেমিকগণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

৪। সাবিত্রী—শ্রীরসিকচন্দ্র বসু প্রণীত, শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ঢাকা কটন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত; মূল্য পাঁচ আনা—আকার ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত, ৪০ পৃষ্ঠা, ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসে মুদ্রিত। এই পুস্তকখানি বঙ্গীয় কুল-বধূগণের পাঠ্য; ভাষা যথাসম্ভব সরল। একখানি তিন রঙ্গের ও তিনখানি এক রঙ্গের ছবিতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির চেষ্টা হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তক বঙ্গ বধূগণের আদরের সামগ্রী। মূল্য আরও কম হইলে ভাল হইত না কি?

৫। আদর্শ লিপি-মালা—শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত, ৬০ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে বণিক প্রেসে মুদ্রিত, আকার ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত, ২২৮ পৃষ্ঠা, এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা। মূল্য ১৲ এক টাকা। নাম হইতেই গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়ের উপলব্ধি হইবে। আদর্শ সম্বন্ধে পূর্ণতা লাভ করিতে গ্রন্থকার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; এবং আলোচ্য গ্রন্থে বঙ্গ সাহিত্যের প্রথিতনামা ও কৃতী লেখক, কবি ও লেখকগণের লিখিত পত্রাবলী পাঠ করিয়া উপদেশ ও আমোদ উপভোগ করা যায়। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কতিপয় লিপিও গ্রন্থকে পুণ্যময় করিয়াছে।

শ্রীন্যায়শরণ।

৬। নূতন মাসিক পত্র—শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ হইতে এই নামীয় একটি নূতন মাসিক পত্রের আবির্ভাবে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। 'সূচনা' নামক প্রবন্ধে পত্রিকার উদ্দেশ্যের আভাস আছে। একত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধের সমাবেশ-পূর্ণ পত্রিকা বোধ হয় আর নাই। আমরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-লাভের উদ্দেশ্যমূলক এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

নিদাঘের গান

তপ্ত-শীতল ললিত-রুদ্র নিদাঘ এসেছে ফিরে,
নিদাঘের গান গাও আজি ওগো দীঘির শীতল নীরে।
অঙ্গ এলায়ে শ্রান্ত তাপিত পান্থ অশ্বথ-মূলে
উন্মনা আজি অলস পবনে যাত্রা গিয়াছে ভুলে,
আজিকে গোধন ধূধূ করা মাঠে না পেয়ে শষ্পদল
নয়ন মুদিয়া করিতেছে ভোগ বট-ছায়া সুশীতল।
আজিকে বুকের অঞ্চলে ঢাকা, দস্যুর হাত হ'তে
যে ধন বাঁচায়ে রেখেছে যতনে কূপ-মাতা কোনো মতে—
প্রেমিকার পানে বিদেশী প্রেমিকে, জুটায়ে বুকের কাছে
কৌতুকে ঢালি দেয় ঘট ভরি যে ধন বক্ষে আছে।
ইন্দ্রনীলের মত সুন্দর চঞ্চল ঢেউ তুলি
কূজন-ব্যাকুল স্ফীত-কম্পিত কপোত-কণ্ঠগুলি,
স্ফটিক-স্তম্ভ উপরে বসিয়া ধারা-যন্ত্রের পাশে
অভিমানিনীরে করে চঞ্চল নিঠুর পরিহাসে।
অমৃতাঞ্জন শলাকার মত প্রিয়ের আঙুলগুলি
পরশে প্রিয়ার আলাময় আঁখি ঘুমে ভ'রে পড়ে ঢুলি।

কাতর অঙ্গ—ঢলে ঢলে পড়ে খলিত মেখলা-হার
প্রিয়-করে রচা মেখলা মালিকা ধরে রাখে বার বার।
ব্যজন করিছে প্রিয় যে সুপ্ত প্রিয়ার শিয়র 'পরে,
শৈত্য-পরশে সহসা প্রেয়সী আঁখি মেলে লাজে মরে।
শ্যামা রমণীর অলস লুলিত দুর্ব্বল দেহ-লতা.
অশিথিল পরিরম্ভে আজি কে লভিছে সার্থকতা।
সুনীল আকাশ তারাদীপ ভরা চন্দ্রাতপের তলে
রচিয়া রেখেছে নিশার আগার শীতল শষ্পদলে।
শরীর ছাড়িয়া প্রাণ মন সব বেড়ায় পরীর দেশে
অবসাদ আসি ভিতর বাহির জয় করে হেসে হেসে।
বাঁধি অঞ্জলি বনবালিকার ভৃঙ্গার জল আশে
তরুণ শিকারী রাজার তনয় দাঁড়ায়েছে পথ-পাশে।
নদী-হ্রদে আজি নামে নি চাতকী তারে আজি দুষিও না,
বারি-কণা সাথে দিতে কি পারিবে আর কেহ প্রেম-কণা?
হেলা ভরে সেও ঘুরে না আকাশে ত্যজি গিরি-নদী-বন,
নিয়ে গেছে সে যে কণ্ঠে ভরিয়া জগতের আবেদন।
প্রিয়ের সকাশে হতাশ হলেও প্রার্থনা জল তবু,
অন্যের কাছে না চাহিতে পাওয়া জানে ভাল নহে কভু।
কাঠঠোকড়াটি ঠোঁটের ঠোকরে গণিছে দণ্ড পল,
গগনের ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে বাজিছে ফটিক জল।
আজিকার দিনে কোন সে তাপিত ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বুকে,
সুর-তটিনীরে তাই জননী সেই হতে কয় লোকে।
ভারতের নদী পুণ্য-সলিলা বুঝে প্রত্যয় হীন,
আর বুঝে সেগো অশথের মাঝে কি দেবতা আছে লীন।
যে দেব জুড়ায় দাহজ্বালা তারে দেবতার রাজা কয়,
গিরি হিমবাস গুরুর গুরু যে আজি তার পরিচয়।
প্রথম পুণ্য বলিয়া গণ্য হলো আজিকার দিনে,
তীর্থ সরসী,—অবিশ্বাসীরা পাত্রে বলি চিনে।
কোন্ সে ভক্ত প্রাণের ঠাকুরে ফুল-চন্দন দিয়া,
অভিষেক করি জুড়াল তাহার শিলার তপ্ত হিয়া।
আজো সুশীতল পাষাণ দেউলে চামর ব্যজন সনে,
চলিতেছে পূজা হরিচন্দন উশীরের বিলেপনে।

শ্রীকালিদাস রায়।

অতীতের একপৃষ্ঠা

(রাজাবাড়ী)

বর্ত্তমান আলোচনার যুগে চাঁদরায় কেদার রায়ের নাম অনেক বাঙ্গালী পাঠকের নিকট পরিচিত। উক্ত নামীয়দের ব্যক্তিত্ব বিষয়ে মত-দ্বৈধ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ উক্ত নামে একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করেন; কাহারও মতে ইহারা পিতা-পুত্র আবার কেহ কেহ ইঁহাদিগকে দুই ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সাধারণের নিকট চাঁদরায় কেদার রায় 'বার ভূঞার এক ভূঞা' বলিয়া অভিহিত। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে 'রাজাবাড়ী মঠ' সংস্কার-কালে উক্ত মঠের দরজার উর্দ্ধ দেশে যে লিপি সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে চাঁদরায় কেদার রায়কে দুই ভ্রাতা বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। প্রায় ৩০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহাদের মাতার শ্মশানোপরি ইহা নির্ম্মিতা হইয়া ছিল। কালের অপ্রতিহত গতি প্রভাবে তাঁহারা আর ইহ জগতে নাই। তাঁহাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান, গরিমা, তাঁহাদের সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের কোন কথাই ইতিহাস ভালরূপ প্রমাণ দেয় না। তাঁহাদের রাসগৃহের কোন চিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। দুই একটি সামান্য সূত্র অবলম্বনে, কল্পনা ও অনুমানের সাহচর্য্যে গঠিত ইতিবৃত্ত তাঁহাদের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দেয় মাত্র। উহাদের বহু কীর্ত্তির নিদর্শন ধ্বংসের অবতার কীর্ত্তিনাশার করাল কবলে নিপতিত হইয়া চিরতরে কালের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; দুই একটি মাত্র গল্পচ্ছলে সাধারণের মুখে মুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্রোতার বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সম্ভবপর নয় কিন্তু এখনও যাহা আছে আমরা এস্থলে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চাই। কীর্ত্তিনাশা যেরূপ করাল বদন ব্যাদান করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, বোধ হয় আর কিছু কাল পরে এ চিহ্নও উহার কুক্ষিগত হইয়া চিরদিনের জন্য লোক-লোচনের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইবে। বহুদূর হইতেই বিক্রমপুরের দক্ষিণ

পূর্ব্বাংশে অবস্থিত চাঁদরায়-কেদার রায়-প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ 'রাজাবাড়ী মঠ' দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহা পূর্ব্ববঙ্গের একমাত্র অটুট ঐতিহাসিক কীর্ত্তিরূপে বিরাজমান থাকিয়া স্থানীয় ও আগন্তুক দর্শক বৃন্দের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করিতেছে। ইহার নিম্নাংশের বেষ্টন ৮০ হাতের কম হইবে না। ইহা অত্যন্ত উচ্চ। ভূকম্পাদি প্রাকৃতিক বিপ্লবে ও প্রাচীনত্ব হেতু ইহার অনেক অংশ মাটিতে বসিয়া গিয়াছে। এই মঠে একটি মাত্র দরজা, এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও জানালা বা ছিদ্র পথ উহাতে নাই। পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়। ভিতরে সবেমাত্র একটি গোল কুঠরী। কক্ষটির উচ্চতা বর্ত্তমানে ৯।১০ হাতের অধিক হইবে না। শোভন কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক দ্বারা মঠের বহির্দ্দেশ পরিশোভিত।

সংস্কার কালে ভগ্ন স্থানে চুণ-সুরকি আঁটিয়া দেওয়ায় পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বরং লাঘব ঘটিয়াছে। শ্রীপুরের যাবতীয় কীর্ত্তি বিনষ্ট করায় 'পদ্মা' এখানে কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিত হয়। রাজা রাজবল্লভের রাজনগর-সংস্থিত কীর্ত্তি সমূহ সমূল ধ্বংস করিয়া উক্ত নামের সার্থকতা সম্পাদন করে। এই বার বুঝি চাঁদরায়ের অতীত কীর্ত্তির ধ্বংসাবশিষ্ট 'রাজাবাড়ী মঠ' গ্রাস করিয়া উক্ত নামের ষোল কলা পূর্ণ করিবার প্রয়াসে উগ্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে পদ্মা ইহার অতি নিকটবর্ত্তী—মঠ হইতে নদীর দূরত্ব ৭০।৮০ গজের অধিক হইবে কি না সন্দেহ, * না জানি কখন অতর্কিতে উহা গ্রাস করিয়া ফেলে।

কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে 'রামপাল' নামক গ্রন্থে এই মঠ সম্বন্ধে লিখিত বিষয় পড়িয়া আমরা এক সন্দেহ-রাজ্যে উপনীত হই এবং উক্ত সন্দেহ অপনোদন মানসে অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকি; কিন্তু এপর্য্যন্ত উক্ত বিষয় নিরাকরণের কোনও সূত্র খুঁজিয়া পাই নাই। গ্রন্থখানা আমাদের নিকট না থাকায় আমরা এখানে বর্ণিত বিষয়ের চুম্বকের আভাস দিয়া গেলাম। জনৈক বিজেতা মুসলমান স্বীয় অনুচর বর্গ সহ এই স্থান দিয়া যাইতে ঘটনা চক্রে এক অশীতিপর হিন্দু বৃদ্ধার সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং উভয়েই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা মাতা ও পুত্র। পুত্র শৈশবে ছেলে-ধরার হাতে পড়িয়া মাতৃকোল বিচ্যুত হওয়ায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মুসলমান বলিয়া পরিচিত হইতেছে। বহুকাল পরে একমাত্র পুত্রের এতাদৃশ সাক্ষাৎ লাভে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের তুমুল বেগ সম্বরণে অসমর্থ বৃদ্ধার প্রাণপাখী ভগ্ন প্রায় দেহ পিঞ্জর ভেদ করিয়া তন্মুহুর্ত্তে পলায়ন করে। ঐ বৃদ্ধার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর উক্ত মুসলমান কর্ত্তৃক মাতৃজ্ঞানে তাঁহার শ্মশানোপরি এই মঠ স্থাপন করা হয়। এরূপ ধারণার ভিত্তি কিন্তু আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে এখানে সাধারণ লোকের মুখে শুনা যায়—ইহা অবশ্য তাহাদের আনুমানিক ধারণা —যে, যদি ইহা হিন্দু কর্ত্তৃক হিন্দুর সমাধি স্থলে প্রতিষ্ঠিত, তবে ইহার দরজা পূর্ব্ব দিকে কেন? জানি না গ্রন্থকার উক্ত মতের পোষকতা করিয়া এ মত লিখিয়াছেন কি না। আমাদের দেশে সচরাচর এরূপ দরজা দৃষ্ট না হইলেও হিন্দু তীর্থ স্থান সকলে ঐরূপ মন্দির দুষ্প্রাপ্য নহে। 'জনশ্রুতি'ই যখন এই মতের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া বোধ হইতেছে তখন ইহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইহা চাঁদরায়-কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত মঠ, অধিকাংশের সহিত আমরাও এ মতেরই পক্ষপাতী।

উক্ত মঠ সম্বন্ধে যে একটি গল্প আমরা সচরাচর প্রবীণ বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়া আসিতেছি তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। চাঁদরায় এক সুদক্ষ রাজমিস্ত্রির হস্তে এই মঠ নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করেন। চাঁদরায়ের বাস্তভূমি শ্রীপুরে ছিল। রাজাবাড়ীও যে, তাঁহাদের এক আবাসস্থল ছিল অনুসন্ধানে আমরা তাহার অনেক নিদর্শনও পাইয়াছি। মঠ নির্ম্মাণ সমা-

* সৌভাগ্যক্রমে কিছু দিন হইল রাজাবাড়ীর মঠের সম্মুখ ভাগ দিয়া পদ্মাতে একাণ্ড চর পড়িয়াছে। তাহাতে রাজাবাড়ী গামী ষ্টীমারকে আর এক মাইল ঘুরিয়া আসিতে হয়। প্র, সং।

পনাস্তে মিস্ত্রি ভ্রাতৃদ্বয়কে তাহা পরিদর্শনার্থ আহ্বান করেন। যথাসময়ে ভ্রাতৃদ্বয় উপনীত হইয়া এই মঠ দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হন এবং কথা প্রসঙ্গে এতদপেক্ষা উচ্চ ও সুন্দর মঠ নির্ম্মাণ সম্ভবপর কি না জিজ্ঞাসা করেন। হতভাগ্য মিস্ত্রি গৌরব বর্দ্ধনার্থ বলিল যে, মাল মসলার যোগাড় থাকিলে সবই সম্ভবপর। এবংবিধ উত্তরে ভ্রাতৃদ্বয় আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া মিস্ত্রির শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। ঘাতুক-হস্তে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া উক্ত মিস্ত্রি যুগ্মকরে এই প্রার্থনা করিল যে, যখন তাহার প্রাণনাশ অবশ্যম্ভাবী তখন অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে উক্ত মঠের শিরোভাগের কাজ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া দিতে অনুমতি দেওয়া হউক। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে মিস্ত্রি ত্রস্ত গতিতে মঠের চূড়ায় উঠিয়া তৎসংশ্লিষ্ট লৌহশলাকা ধরিয়া বলিল "পরহস্তে জীবন নাশ অপেক্ষা স্বেচ্ছা-মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। আপনারা জয়ধ্বনি করিয়া বলুন 'রাজাবাড়ী মঠ'।" পরমুহূর্ত্তেই রাজমিস্ত্রি উক্ত শলাকা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল এবং শলাকা ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া প্রাণ হারাইল। ঐ অবধিই নাকি এই গ্রামের নাম 'রাজাবাড়ী' হইয়াছে। মঠের অগ্রভাগে একটি বক্র ভগ্ন লৌহশলাকা অল্পদিন পূর্ব্বেও ছিল, কাজেই কাহিনীটি একেবারে অলীক বলিয়া বোধ হয় না। মঠের সংস্কার কালীন উক্ত ভগ্ন শলাকা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে এবং চক্র সমন্বিত একটি নূতন শলাকা প্রান্তভাগে স্থাপন করা হইয়াছে।

মঠের অনতিদূরে উত্তর দিকে একটি পুকুর আছে। 'মিঠাপুকুর' নামে উহা পরিচিত। উক্ত পুকুর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ এখানে সন্নিবেশ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি প্রবল প্রতাপান্বিত চাঁদরায়ের মায়ের মনে হঠাৎ এক দিন এক খেয়াল উঠিল। তিনি আব্দার করিয়া পুত্রদ্বয়কে বলিলেন যে, যদি একটি পুকুর কাটিয়া দুধ ও নারিকেল জলে পূর্ণ করিয়া দেয় তবে তাঁহাদের বৃদ্ধা মা উক্ত পুকুরে নামিয়া মনের সাধে একটু সাঁতার খেলিতে এবং হাবুডুবু খাইতে খাইতে মিশ্রিত দুধ ও নারিকেল জল পান করেন। অনতিবিলম্বে মাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। বৃদ্ধা মা আকাঙ্ক্ষা পুরাইয়া সাঁতার কাটিয়া পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কালের কি অদ্ভুত শক্তি! আজ আর উক্ত পুকুর চিনিবার জো নাই। বর্ত্তমানে পুকুরের যে অবস্থা তাহা ভাবিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই চিত্ত বিষাদের ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়। পুকুরের চারিধারেই বাঁশ-ঝাড় ও নানাপ্রকার গাছগাছড়ায় আচ্ছন্ন। নল-তারা প্রভৃতি লতাগুল্ম প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া 'ভিট' বাঁধিয়া জল ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বড় বড় গাছ পুকুরের মধ্যে স্থানে স্থানে সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জঙ্গলের জন্য পুকুরের মধ্যে প্রবেশ করা অসাধ্য। যদি গাছগাছড়ায় বাধা না দেয়, তবে হাঁটিয়া পুকুর পার হওয়া যায়। এক পার হইতে অপর পারে দৃষ্টি চলে না। পুকুর বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাছের কথা ভাবিয়া থাকি কিন্তু এখানে তৎপরিবর্ত্তে সময়ে সময়ে দুই একটা বৃহৎ সর্প ও বন্য হিংস্র পশুর অবস্থান দেখিতে পাই। বিশেষরূপে লক্ষ্য না করিলে আগন্তুকের পক্ষে উহাকে পুকুর বলিয়া ধারণা করা একরূপ অসম্ভব। পুকুরের চারিপাশেই বর্ত্তমানে লোকের বাস কিন্তু কেহই ইহা পরিষ্কার করে না, কেহই ইহার জল ব্যবহার করে না, বরং সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়া থাকে এবং এই পুকুরই তাহাদের পায়খানার জায়গা। এ পুকুর সম্বন্ধে আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা সেই সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম।

রাজাবাড়ীতে চাঁদরায়ের যে এক বাড়ী ছিল এই মিঠা পুকুরটি সেই বাড়ীর অন্দর মহলে ছিল। এই পুকুরের পূর্ব্বপারে একটি পাকা বাঁধা ঘাট ছিল। উক্ত স্থানে একটি ইষ্টকস্তূপ এখন সেই লুপ্ত ঘাটের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। এই পুকুরের চারিপাশের গৃহ প্রাঙ্গনাদি বেষ্টন করিয়া যে একটি প্রাচীর ছিল তাহার নিম্নভাগ এনখও ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। মৃত্তিকা খুঁড়িলেই

উহা বাহির হইয়া পড়ে। এই পুকুরের কিছু পূর্ব্বে একটী বিস্তীর্ণ দীঘি বিদ্যমান। ইহার অনেক স্থলই ভরিয়া যাওয়ায় শস্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। তবুও দৃষ্টিমাত্রেই দীঘি বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহাই বহির্বাটী বা পুরুষ মহলের ব্যবহার্য্য পুকুর বলিয়া কথিত। এই উভয় পুকুরের সংশ্লিষ্ট চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী মৃত্তিকা-গর্ভে বহু ইষ্টক দৃষ্ট হয়। এ সব ইষ্টকখণ্ডগুলিই বাটীর ধ্বংসাবশেষ রূপে বিরাজ করিতেছে।

'মিঠা পুকুরের' উত্তর পশ্চিম কোণে কিছু দূরে আর একটি দীঘি ছিল। বর্ত্তমানে উহা ভরিয়া যাওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানের নাম দীঘি বলিয়াই বিখ্যাত। এই দীঘির পশ্চিম পাড় একটি ভরট বাঁধা উচ্চ জায়গা। ইহা 'কাচারী বাড়ী' নামে পরিচিত। দীঘি ও তৎসংলগ্ন স্থানের অবস্থান চিন্তা করিলে এখানে চাঁদরায়ের কাচারী থাকা সম্ভব পর বলিয়াই অনুমান হয়। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বে এখানে 'কাচারু'দের বাড়ী ছিল এবং তদনুসারে এই-স্থানটুকু উক্ত নামে অভিহিত হইতেছে। বর্ত্তমানে কিন্তু এ গ্রামে বা ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে 'কাচারু' জাতীয় কোনও লোকের বাস নাই।

উক্ত বহির্ব্বাটীর দীঘির উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অল্প দূরে আরও একটি দীঘি আছে। ইহাও প্রায় ভরিয়া গিয়া অনেক স্থলেই ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই দীঘির পশ্চিম ও দক্ষিণ পাড় পূর্ব্বোক্ত দীঘির উত্তর ও পূর্ব্ব পাড়ের সহিত সংলগ্ন। ইহার পশ্চিম পাড় একটি বিস্তীর্ণ চত্তর বিশেষ। ইহার উত্তর প্রান্তে এক মৃত্তিকা-স্তূপ এখনও বর্ত্তমান আছে। উক্ত স্থানের দখলকার উহা কাটিয়া অনেক স্থলে নষ্ট করিয়াছে সত্য কিন্তু এখনও যাহা আছে তাহার উচ্চতা প্রায় ৯।১০ হাতের কম নয়। পূর্ব্ব পশ্চিমে একটি শলাকা প্রবেশ করাইলে উহার দৈর্ঘ্যও ১০।১২ হাতের কম হইবে না। এই 'স্তূপের' উত্তর অংশে অনেকস্থানব্যাপী প্রাচীর দৃষ্ট হয়। চত্তর সহ এই উচ্চ স্থানটুকুর নাম "বুরবুর"। জনৈক অভিজ্ঞ মৌলবী সাহেব "বুরবুর" শব্দের অর্থ 'সৈন্যদের লক্ষ্যভেদ শিক্ষার স্থান' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। এই শব্দ নাকি 'ইউনানী' ভাষা হইতে গৃহীত। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার মধ্যবর্ত্তী রেল পথপার্শ্বস্থ লক্ষ্যভেদ শিক্ষার স্থল 'চাঁদমারীর', সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্য আছে। আমরা ইহাকেই চাঁদরায়ের সৈন্যগণের ক্রীড়াঙ্গনরূপে নির্দ্দেশ করিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম। যদি কোনও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এ বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা করিয়া দেন তবে আমরা বড়ই প্রীত হইব। প্রবীণ বৃদ্ধদের মুখে এ স্থানে অনেক দীঘির উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা বর্ত্তমানে শুধু প্রায় ৫।৬টি মাত্র নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই গ্রাম বেষ্টন করিয়া একটি পরিখা বিদ্যমান ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ কীর্ত্তিনাশার গর্ভে লুকাইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর অংশের পরিখা স্রোতোবেগে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে আয়তনে বর্দ্ধিত হইয়া 'বড়খাল বা বারুই বাড়ীর' খাল নামে পরিচিত হইতেছে। এই পরিখার পশ্চিম ও উত্তর পাড়স্থিত গ্রাম সমূহের নাম যথাক্রমে নগর, বুরুঙ্গবাড়ী ও নগরবাড়ী। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, রাজাবাড়ীতে এক সময়ে প্রকাণ্ড নগর বর্ত্তমান ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টি-পাত বাঞ্ছনীয়। ইতিবৃত্ত সংগ্রহের সাহায্যকল্পে যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম; জানি না ইহা কোনও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কোনও উপকারে আসিবে কি না।

শ্রীগোপী নাথ দত্ত।

সন্তান-পালন

(ছয় মাস হইতে দুই বৎসর)

এখন আর শিশুটি একান্ত অসহায় জীব নহে। এখন হয় তো সে হামাগুড়ি দেয়, নয় তো দাঁড়াইবার চেষ্টা করে; হয় তো দুই এক পা হাঁটিতেও না পারে এমন নহে। এখন তাহার দাঁত উঠিয়াছে সুতরাং কঠিন জিনিস একটু আধটু দিলে, তাহা খাইতে পারে। বুদ্ধিও একটু না

হইয়াছে এমন নহে। আহার, মনের ভাব বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে। যা দেখে তাহার বিষয় জানিবার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। তাহার শরীরের হাড় মাংসগুলি কতকটা দৃঢ় হইয়াছে ইন্দ্রিয়াদির কতকটা পরিণতি হইয়াছে। আবার চুলগুলি বেশ বড় হইয়াছে।

সাত মাস বয়স হইতে শিশুকে একটু আধটু ভাতের মাড় কি অন্য কিছু না দেওয়া যায় এমন নহে। ৭ মাস বয়সের পূর্ব্বে শিশুর একমাত্র খাদ্য হইতেছে দুগ্ধ; এ সময় দুধ ছাড়া অন্য কিছু দিলে, সে তাহা ঠিক জীর্ণ করিতে পারে না। এ সময়, তাহাকে পেটেন্ট ফুড কি সাগু, বার্লি, ভাত, রুটি প্রভৃতি দেওয়া উচিত নহে; দিলে, তাহার অনিষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা। ৭ মাস বয়সে কোন শিশুকে যদি কোন পেটেন্ট ফুড্ ব্যবস্থা করার একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, দেখিতে হইবে উক্ত পেটেন্ট-ফুডে কোন প্রকার শ্বেতসার (starch) আছে কি না; যদি থাকে, তাহা হইলে, তাহা ব্যবস্থা না করাই উচিত। ৯।১০ মাস বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে প্রধানতঃ স্তন-দুগ্ধ দিয়া রাখিবে; যে সকল শিশু মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত তাহাদিগকে বোতল করিয়া গোদুগ্ধ খাওয়াইয়া রাখিবে। ১০ মাস বয়স হইলে স্তন ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে হয়। গ্রীষ্ম-কালে মাই ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে নাই। শীতকালে মাই ছাড়ানের চেষ্টা করা বিধেয়। গ্রীষ্মকালে অতি সামান্য কারণেই শিশুর পেটের গোল হয়; শীতকালে তাহা হয় না। যে সকল শিশুকে বোতলে করিয়া দুধ খাওয়াইয়া মানুষ করা হয়, তাহাদিগকে এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঐ ভাবেই দুধ খাওয়াইতে হয়। ইহার পর বাটিতে চুমুক দিয়া দুধ খাওয়ার অভ্যাস করাইতে হয়।

৬ মাসের শিশুকে দিনে রাতে সর্ব্বসুদ্ধ ৬ বার খাওয়ানের আবশ্যক। ২।১ দিন অন্তর এক আধটা আঙ্গুরের রস কিংবা সুমিষ্ট কমলা লেবুর রসও না দেওয়া যায় এমন নহে। রসের সঙ্গে ছিব্‌ড়ে কিম্বা বীচি যাহাতে উহার পেটের মধ্যে না যাইতে পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার আবশ্যক। ৭ মাস বয়সেও দিবা রাত্রে ৬ বার খাওয়ানের আবশ্যক বটে তবে এসময় প্রত্যেক বারে ৩ ছটাক, ৩।০ ছটাক পরিমাণে খাওয়াইতে হয়। এ সময় দুধের সঙ্গে ৩ নম্বর এলেন্‌বেরি ফুড্ (Allenbary's Food no. 3) কিম্বা বেন্‌জার্‌স্ ফুড্ (Benger's Food) প্রভৃতি দিলে বিশেষ ফল হয়। এগুলি প্রস্তুত করা একটু কঠিন ব্যাপার। ভাল করিয়া প্রস্তুত না করিলে ইহা দুধের সঙ্গে ডেলা বাঁধিয়া যায়। পেটেন্ট ফুডের সহিত দুধটা একবারে মিশাইতে নাই। একটু একটু করিয়া মিশাইতে হয় আর চামচে দ্বারা নাড়িতে চাড়িতে হয়, তাহা হইলে চাপ বাঁধিতে পারে না। সাধারণতঃ ৭ মাস বয়স হইতেই শিশুর দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে। এ সময় শিশুর মাড়ি গুড় গুড় করে। এই সময় সে যাহা পায় তাহাই কামড়াইতে চায়। একটু পাঁউরুটির ছাল কিম্বা রুটির টুকরা কি এইরূপ কোন জিনিস মুখে ধরিলে সে তাহা কাটিতে থাকে এবং তাহাতে সুখও পায়। কিন্তু সাবধান এগুলি যেন তাহার পেটের মধ্যে না যায়। কাটা হইলে এগুলি মুখের মধ্যে হইতে বাহির করিয়া ফেলিবে। ৯ মাস বয়স হইলে, উহাকে একটু আলুসিদ্ধ, কি ফুলকপিসিদ্ধ কি এইরূপ কোন জিনিস যে দেওয়া না যাইতে পারে এমন নহে। ১০ মাস বয়সে একটু আধটু ডিম্ সিদ্ধও দেওয়া যাইতে পারে। ডিমটা যেন বেশ টাটকা হয় আর উহার যেন দেড়মিনিটের অধিক কাল ধরিয়া সিদ্ধ না করা হয়। ডিমের হরিদ্রাংশই দিতে হয় কিন্তু আরও একটু বড় হইলে শ্বেতাংশও দিতে পারা যায়। এক বৎসরের শিশুকে একটি ডিমের আধখানি দেওয়া যাইতে পারে; দেড় বৎসরের শিশুকে ডিমটির ১২ আনা অংশ দেওয়া যাইতে পারে। ইহার পর একটি ডিম অবাধে দেওয়া চলে। এক বছরের শিশুকে একটু আধটু মাছের সুপও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ভাল দইও অবাধে দেওয়া যাইতে পারে। ডিম খুব পুষ্টিকর খাদ্য, শিশুদের পেটে ইহা বেশ সহও হইতে দেখা যায়।

দুধ ভাত, দুধ রুটি—একবৎসরের শিশুকে দুধ

ভাত,দুধ রুটি প্রভৃতিও ধরাইতে পারা যায়। অনেক শিশু ১০ মাস বয়স হইতেই ভাত ধরে। কেহ কেহ আবার ১॥০ বৎসর ২ বৎসর বয়স না হইলে ভাত ধরিতে পারে না।

মুড়ি, পাঁউরুটি—এক বৎসর বয়সেই শিশুর উপর, নীচু উভয় পাটিতেই কয়েকটি করিয়া দাঁত দেখা দেয়। এ সময় তাহাকে একটু পাঁউরুটির শাঁস এক আধখানি বিস্কুট কিম্বা মুড়ি দিলে, সে তাহা খাইয়া জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়।

সূজী, সাগু প্রভৃতির পায়শ—এ সময় তাহাকে সূজী, সাগু প্রভৃতির পায়শ দিলে সে তাহা তৃপ্তি সহকারে খাইতে পারে এবং তাহাতে কোন অনিষ্টও হয় না।

মাছ, ভাত—১৮ মাস বয়স না হইলে শিশুকে মাছ ভাত দিতে নাই। শিশুকে যে মাছ দিবে তাহাতে যেন কাঁটা না থাকে। তরকারীর মধ্যে আলুসিদ্ধ, কপিসিদ্ধ, কাঁচকলাসিদ্ধ, পেঁপেসিদ্ধ এই রকম গরম তরকারীই শিশুর পক্ষে উপযোগী। মাছ তরকারী দিয়া ভাত খাওয়া হইলে, তাহাকে দুধ বা দই খাইতে দিবে।

১০ মাস বয়স হইতে ২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে যে সকল খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে, তাহার তালিকা—

১০ মাস ;—সকাল ৬টা-৭টা—১ পোয়া দুধ ; বেলা ১২টা-১টা—আলু বা কপিসিদ্ধ, ডিমসিদ্ধ, চারিটা ভাত, মাছের সুপ, কিঞ্চিৎ পরে আধপোয়া দুধ। বেলা ৩, ৫টা— এক পোয়া দুধ, রাত্রি ৭।৮টা—৩ ছটাক দুধ, ইহার সহিত এলেন্‌বেরীর ফুড্‌ কিংবা বেন্‌জারস্‌ ফুড্‌ও দেওয়া যাইতে পারে।

১২ মাস ;—বেলা ৭টা—১ পোয়া দুধ ; বেলা ১০টা— দুধের সঙ্গে চারিটা ভাত অথবা রুটি ; পাঁউরুটি দিতে হইলে তাহা যেন এক দিনের বাসী হয়। টাট্‌কা পাঁউরুটি শীঘ্র জীর্ণ হয় না। বেলা ১টা—একটু আলু, কপি বা পেঁপেসিদ্ধ, একটু সূজী বা সাগুর পায়শ এবং আধ পোয়া দুধ কিংবা আধখানি ডিমসিদ্ধ ও দুধ রুটি ; বেলা ৪টা— একপোয়া দুধ, কিংবা দুধ ও এক ঝিনুক ভাত বা রুটি। রাত্রি ৭।৮টা—৩ ছটাক বা ১ পোয়া দুধ।

১৫ মাস ;—বেলা ৭টা—এক পোয়া দুধ, বেলা ১০টা— রুটি-মাখন, দুধ ভাত ; বেলা ১টা—আলুসিদ্ধ, কপি প্রভৃতি সিদ্ধ পায়শ, ডিমসিদ্ধ অথবা দুধ এবং একটু একটু রুটি। বেলা ৪টা—দুধ রুটি। ৭.৮টা—দুধ।

১৮ মাস ;—৭টা—দুধ ১ পোয়া ; বেলা ১০টা—রুটি মাখন কিম্বা ভাত তরকারী ; একটু দালের ঝোল প্রভৃতি; বেলা ১টা—আলুসিদ্ধ, কপিসিদ্ধ, ডিমসিদ্ধ প্রভৃতি, সঙ্গে একটু একটু দুধ। বেলা ৪টা—একটু রুটি ও দুধ ; রাত্রি ৮টা এক পোয়া দুধ।

২৪ মাস ;—বেলা ৭টা—মুড়ি, বা বিস্কুট, পরে দুধ ; বেলা ১০টা, ভাত, মাছ তরি-তরকারী দুধ কিম্বা দই। বেলা ১টা—রুটি ডিম,দুধ প্রভৃতি; বেলা ৪টা—একটু সন্দেশ ও দুধ। রাত্রি ৮টা—দুধ-রুটি প্রভৃতি। এ কথা খুবই ঠিক যে, এক প্রকার খাদ্য যে সকল শিশুর পক্ষে উপযোগী হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। উপরের প্রণালী মত খাদ্যের ব্যবস্থা করিলে, অধিকাংশ শিশুরই পক্ষে উপযোগী হওয়া সম্ভব। শিশুকে ফুলকপিসিদ্ধ দিতে হইলে, উহার ফুল অংশ বেশ সিদ্ধ করিয়া দিবে, সবুজ অংশ দিতে নাই। এক বৎসর, দেড় বৎসরের শিশুর দুধে জল মিশাইবার কোন আবশ্যক নাই। ২ বৎসর বয়স না হইলে শিশুকে মুড়ি, বিস্কুট প্রভৃতি দিতে নাই। ২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুধই শিশুর প্রধান খাদ্য মনে করিতে হইবে। ৬ মাস বয়স হইতে তাহার বয়সানুসারে একটু একটু করিয়া আঙ্গুরের রস, কমলালেবুর রস, আমের রস প্রভৃতি দিতে থাকিবে। সকল শিশুর উপযোগী হইতে পারে, এরূপ একটা খাদ্যের তালিকা বাঁধিয়া দেওয়া একেবারে অসম্ভব। সকল শিশুর রুচি সমান নহে ; আবার সকল খাদ্যই সব শিশু সমান সহ করিতে পারে না। ছেলেরা যাহাতে তাড়াতাড়ি করিয়া না খায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। খাওয়ার সময় বেশী কথাবার্ত্তাও কহিতে নাই। পেটুকতা দোষ শিশুর যাহাতে না জন্মায় সে দিকে পিতামাতার দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখিলে, তাহার হস্তে কোন

খাদ্য দ্রব্য দিবার পূর্ব্বে তাহার হাত বেশ করিয়া ধুইয়া দিবে। আহারের পূর্ব্বে সকলেরই হাত মুখ ধোয়া উচিত। হাত মুখ যদি অপরিষ্কার থাকে, সেই অবস্থায় কিছু খাইলে পেটের গোলযোগ ঘটিতে পারে। আহারের পরে হাত মুখ ধুইতে হয় এ অবশ্য সকলেই অবগত আছেন, এবং সকল দেশেই এ প্রকার প্রচলন আছে।

শিশুকে প্রতিদিনই স্নান করান আবশ্যক। সকালে বিকালে তাহাকে বাড়ীর বাহিরে একটু হাওয়া খাওয়ান উচিত। শিশুর বয়স ২১ মাস হইলে, সেই সময় হইতে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় তাহার দাঁতগুলি মাজিয়া দেওয়া উচিত। এ অভিপ্রায়ে চক্ খড়ি-চূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। শিশু যদি দিবসে দুই বারের অধিক মল ত্যাগ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার পেটের অবস্থা ভাল নহে। শিশুকে জোলাপ দিতে হইলে, ফ্লুইড্ ম্যাগনেসিয়া বা সীরাপ্ অব্ ফিগ্ ব্যবস্থা করাই ভাল। প্রবল বিরেচক কদাপি ইহাদের ব্যবস্থা করিতে নাই।

শিশুদের পক্ষে অধিক নিদ্রার আবশ্যক। দিবা নিদ্রায় বয়স্ক ব্যক্তিদের শরীরের হানি হয় সত্য কিন্তু শিশুদের পক্ষে দিবা নিদ্রারও আবশ্যক আছে। শিশুদের বেশীক্ষণ ধরিয়া পায়ের উপর থাকিতে দিতে নাই। এ সময় তাহাদের হাড়গুলি তেমন শক্ত ও দৃঢ় হয় নাই সারা দিন পায়ের উপর থাকিতে দিলে, পায়ের হাড়গুলি বাঁকাইয়া যাইতে পারে। শিশুদের কেমন স্বভাব হাঁটিতে শিখিল তো আর বসিতে চাহে না; আছাড় খায় তবুও হাঁটিবে। ফুলের বাগানে শিশুদের বেড়াইতে দেওয়া মন্দ নহে। বিচিত্র বর্ণের বিবিধ পুষ্পের সৌন্দর্য্যে তাহার চিত্তে আনন্দের সঞ্চার হয় এবং সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার শক্তিটি বিকশিত হয়। শিশু যাহাতে ফুল গাছে হাত না দেয় কিংবা ফুল না ছিঁড়ে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শিশু যত দিন দুই বৎসরের না হয়, তত দিন তাহাকে রাস্তায় ছাড়িয়া দিতে নাই। শিশুকে খুব বেশী সংখ্যক খেলেনা কিনিয়া দিতে নাই ইহাতে খেলেনা পাওয়ার যে সুখ সে তাহা কখনও উপলব্ধি করিতে পারে না; উপরন্তু প্রত্যহ নূতন নূতন খেলেনার জন্য বায়না ধরে মাত্র।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগ্‌চি।

প্রত্নানুসন্ধানের

সুখ দুঃখ

সুখও অনেক, দুঃখও খুব; গত মাসে প্রায় দ্বাদশ দিন ধরিয়া সেই সুখদুঃখ প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করা গিয়াছে। তাহার স্মৃতি মনে টাট্‌কা থাকিতে থাকিতে সে কাহিনী আপনাদিগকে শুনাইব মনে করিতেছি।

কয়েক বৎসর হয় এক পাগলের কাছে গান শুনিয়াছিলাম —

মদের নেশা ছুটে যায় রে দুচার দণ্ড পরে,
নামের নেশায় যারে ধরে তারে পাগল করে!

আপনারা হয়ত শুনিয়া হাসিবেন, তবু সলজ্জে স্বীকার করিতেছি যে, এ অধম এক দিন কবি যশঃপ্রার্থী হইয়াও বাণী মন্দিরের দ্বারে উপনীত হইয়াছিল,—তাহার রচিত দুই একটা ছোট গল্প এবং সাহিত্য সমালোচনাও পুরাতন মাসিকের পৃষ্ঠা খুঁজিলে দুর্লভ-দর্শন হইবে না। কিন্তু সে সকল "মদের নেশা" দুচার দণ্ড পর ছুটিয়া গিয়া এখন যে নেশায় ধরিয়াছে তাহাতে, আর কিছু লাভ হউক না হউক, পাগল করিবারই যোগাড় করিয়া তুলিয়াছে। Pickwick Papers এর Bill এর কথা তুলিয়া এবং কান্ত কবির "প্রত্নতাত্বিক" হইতে বাছা বাছা অংশ আওড়াইয়া অনেক হিতৈষী ওঝা এই দুর্জ্জয় ভূত তাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ফলতঃ কিছু হয় নাই, বরং দুই এক স্থলে ভূত ফিরিয়া ওঝাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এমন দুই একটি ভূতপূর্ব্ব, বর্ত্তমানে ভূতগ্রস্ত ওঝা এই পত্রিকার পাঠক শ্রেণীতে আছেন।

মনে অহরহঃ ইচ্ছা জাগিতেছে যে, খন্তে কোদাল ধরিয়া দেশের সমস্ত উচ্চ ভূমি খুঁড়িয়া সমভূমি করিয়া

দিই, প্রাচীন পুকুরগুলিকে প্রাচীন কটাহের মত ধরিয়া তুলি এবং উল্টাইয়া ফেলিয়া দেখি তাহাদের অভ্যন্তরে কি আছে। কিন্তু দুর্বৃত্ত উদর দুই বেলা যথাসময়ে চোঁ চোঁ করিয়া জানাইয়া দেয় যে, "রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী" তাহা না জানিলেও পৃথিবীর বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। তথাপি নেশা "যারে ধরে তারে পাগল করে।" প্রত্নতত্ত্বের নেশাগ্রস্ত হতভাগ্যগণ আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের গত অধিবেশনে পঠিত আমার প্রবন্ধ "পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ" পাঠ উপলক্ষে একখানি অপূর্ব্ব প্রকাশিত শিলালিপির ছাপ উপস্থিত করিয়াছিলাম এবং জানাইয়াছিলাম যে, কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে স্থিত একটি নটেশ শিবমূর্ত্তির পাদপীঠে লিপিটি উৎকীর্ণ, চেষ্টা করিলে মূর্ত্তিটি ঢাকা সাহিত্য পরিষদে আনান যাইতে পারে। ইহা শুনিয়া পরিষদের অনেক সভ্য মূর্ত্তিটি আনাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, পরিষদের সম্পাদক মহাশয় আমি নিজে যাহাতে এই কার্য্যভার গ্রহণ করি সে জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন,—কার্য্য সফল হইলে পরিষদের পক্ষ হইতে ব্যয়ভার দেওয়াইতে চেষ্টা করিবেন এমন আশ্বাসও দিলেন। শরীর ভাল ছিল না, মনও নানাকারণে নিতান্ত অবসন্ন তথাপি অর্দ্ধ অনিচ্ছায় এই ভার গ্রহণ করিলাম,—তার কারণ "নেশা"।

একটা প্রাচীন ধরণের কেম্বিশের ব্যাগের মধ্যে, ব্রাস, কালি, বিশেষরূপে প্রস্তুত কাগজ ইত্যাদি শিলালিপির ছাপ তুলিবার সমস্ত উপকরণ এবং পরিব্রাজক জীবনের ছোটখাট জিনিষপত্র বোঝাই ভরিয়া দুর্গা বলিয়া যাত্রা করা গেল। কুমিল্লা অবস্থান কালীন আমার পরম সুহৃদ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত মহাশয় আমাকে এই খোদিত লিপিযুক্ত মূর্ত্তিখানার সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। আমার অনুরোধে তিনি বর্ষাকালের জল কাদা ভাঙ্গিয়া দুই বার গিয়া লিপিখানার ছাপ লিয়া আসিয়াছিলেন। আমার জন্য এবং প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের জন্য তাহার এই নিঃস্বার্থ পরিশ্রম অত্যন্ত প্রসংশার্হ এবং চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত আমার স্মরণীয়। বাড়ী হইতে রওনা হইবার কালেই ভাবিয়া গেলাম, কুমিল্লা গিয়া এক বার বৈকুণ্ঠ বাবুর দেখা পাইলেই সমস্ত ব্যাপার সহজ হইয়া আসিবে।

নারায়ণগঞ্জ হইতে কুমিল্লাস্থিত কোন পদস্থ বন্ধুর নিকট টেলিগ্রাম করিলাম যে, কুমিল্লা ভ্রমণের জন্য আসিতেছি, রাত্রিটার জন্য যেন তাঁহার বাসায় আশ্রয় পাই। কুমিল্লা পৌঁছছিতে প্রায় রাত্রি ১১৷৷০ টা হইল। পৌষ মাসের শীতের রাত্রি, প্রবাদ শুনিয়াছিলাম পৌষের শীতে না কি মহিষ পর্য্যন্ত কাঁপিতে বাধ্য হয়। গ্যাসালোকিত এবং বহু যাত্রী সমাকীর্ণ গাড়ীর কক্ষ হইতে বাহিরে পদার্পণ করিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম যে,প্রবাদটিতে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। যে বন্ধুর নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম তাঁহার বাসা ষ্টেশনের অতি নিকটস্থ, সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কুমিল্লার ধূলিবহুল পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু হায়—"শীতল বলিয়া জলদে সেবিনু বরজ পড়িয়া গেল।" বন্ধুবরের বাসায় ঢুকিয়া তাহাতে দ্বিপদ জীবনিবাসের কোন লক্ষণই দেখিলাম না, কেবল কয়েকটি চতুষ্পদ ভীষণ দর্শন সারমেয় প্রবল আপত্তি করিয়া জানাইয়া দিল যে, স্থানটি বর্ত্তমানে তাঁহাদের "স্বায়ত্ত শাসনের" অন্তর্গত। চিন্তাকুলচিত্তে ফিরিয়া আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইলাম।

জ্যোৎস্না রাত্রি, চারি দিক সুপ্ত সুষুপ্তিতে স্তব্ধ। শীতসঞ্চারী চন্দ্রকিরণে বৃক্ষ লতা নিঃশব্দে রোদন করিতে ছিল। রাস্তার দুধারে রুদ্ধদ্বার গৃহগুলির দিকে চাহিয়া এবং তাহাদের অভ্যন্তরে লেপের নীচে শয়িত অধিবাসীদের আরাম কল্পনা করিয়া আমার ঈর্ষা হইতে লাগিল। রাস্তায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিতে লাগিলাম "কোথা যাই ?" কুমিল্লা পরিচিত লোকের অভাব ছিল না, দুই চারি জন বন্ধুও যে না ছিল এমন নহে। কিন্তু পৌষের রাত্রি দুপ্রহরে ডাকাডাকি হাঙ্গামা করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করা,—বন্ধু অত টান সহিবে কি না তাহাই ভাবিতে

লাগিলাম। প্রায় মাইল খানিক দূরে এক আত্মীয়ের বাসা ছিল, অবশেষে ভাবিলাম, তাঁহার স্কন্ধেই চাপিব।

রাস্তার চারি ধারে সারমেয়কুল জাগ্রত করিয়া ক্লান্ত-পদে যাইয়া আত্মীয়ের বাসায় উঠিলাম। আবার বিপদ! গেট বন্ধ,—আসল বাড়ী গেট হইতে এত দূরে যে ডাকা-ডাকি করিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইবে না। দেওয়াল বিশেষ উঁচু ছিল না, এদিক ওদিক চাহিয়া দেওয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। অশেষ কণ্ঠব্যায়া-মের পর আত্মীয় মহাশয়কে জাগ্রত করিলাম। তিনি অসময়ে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অবশেষে যখন তিনি শুনিলেন যে, একটা পাথরের মূর্ত্তি দেখিবার জন্য আমি ঢাকা হইতে কুমিল্লা আসিয়া পৌষের শীতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছি তখন তাঁহার বিস্ময়ের মাত্রা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল। যাহা হউক তাঁহার আদর অভ্যর্থনায় শীঘ্রই পথ কষ্ট ভুলিয়া আরামে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলাম।

প্রাতে উঠিয়া কুমিল্লাস্থ বন্ধুবর্গের সহিত দেখা করিতে বাহির হইলাম। প্রথম যাঁহার সহিত দেখা হইল তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিয়াই জানিতে পারিলাম যে, যে বন্ধুর নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, তিনি কুমিল্লাই আছেন এবং পূর্ব্ব বাসাই আছেন। শুনিয়া যে সকল ভাব মনে হইল তাহা উদরতাপূর্ণ নহে, এবং তাঁহার জন্য বর্ত্তমানে লজ্জিত হইতেছি। কারণ পরে শুনিয়া-ছিলাম, ভদ্রলোকের কিছুমাত্র দোষ ছিল না। দোষ পর্য্যটকের কপালের। তিনি তাঁহার এক কর্ম্মচারীকে আমার জন্য ষ্টেশনে যাইতে আদেশ দিয়া এবং আমার আহার ও শয়নের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া ট্রেইন আসিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। কর্ম্মক্লান্ত কর্ম্মচারী মহাশয়ও আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ নিদ্রা-গ্রস্ত হইয়া পড়ায় আমি সেই বৃহৎ বাসায় মনুষ্য নিবাসের কোন চিহ্নই পাই নাই। পরদিন প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কর্ম্মচারী প্রবরকে আমার খোঁজে সমস্ত সহর বেড়াইতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত বন্ধুবর বৈকুণ্ঠ বাবু বড়দিনের বন্ধে বাড়ী গিয়াছেন কি কুমিল্লাই আছেন, এবং বাড়ী গিয়া থাকিলে তাঁহার বাড়ী কোথায়, কুমিল্লা পৌঁছিয়াই এসকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। অনুসন্ধানে জানিতে পারি-লাম, তিনি বাড়ী গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার বাড়ী কোথায় কেহই বলিতে পারিল না। তবে এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম যে, আমার গন্তব্য স্থান বড়কামতা হইতে তাঁহার বাড়ী বিশেষ দূরবর্ত্তী নহে। ভাবিলাম,—প্রত্না-নুসন্ধানে বাহির হইয়াছি, না হয় বৈকুণ্ঠ বাবুর বাড়ীও খুঁজিয়া লইব।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে ঘোড়ার গাড়ীতে বড়-কামতা রওনা হইলাম। আমাদের গ্রামের শ্রীযুক্ত চিন্তা-হরণ খাশনবিশ বি, এ, মহাশয় স্কুল সবইন্সপেক্টারের কর্ম্ম উপলক্ষে বড়কামতায় অবস্থান করিতেছিলেন। ভাবিলাম, তাঁহারই স্কন্ধে যাইয়া ভর করিব। প্রায় এক ঘণ্টা বেলা থাকিতে যাইয়া বড়কামতা পৌঁছিলাম। পথের দুই ধারে দেখিলাম চারি পাঁচটি লোক মরিয়া পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। বড়কামতা হইতে কয়েক মাইল দূরে পাঁচপুকুরিয়া নামক স্থানে না কি একটা বড় মেলা বসিয়াছিল, সেই মেলায় পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত না থাকাতে যাত্রীদের মধ্যে ভয়ঙ্কর কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়। অনেক যাত্রী ঐ স্থানেই মারা গিয়াছে, অনেকে দুধারে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে অনেকে গ্রামে ফিরিয়া গিয়া গ্রামে গ্রামে কলেরার বিস্তৃতির সহায়তা করিয়াছে। বড়কামতার থানার নিকট দেখিলাম একটি মুসলমান কলেরায় আক্রান্ত হইয়া একটা অশ্বথ গাছের তলায় পড়িয়া রহিয়াছে। স্থানীয় সরকারী ডাক্তার থানার ডাক্তার মহাশয় তাহাকে চিকিৎসা করিতেছেন কিন্তু রোগীকে গৃহাভ্যন্তরে স্থান দিবার মত স্থান তাহার ডাক্তার খানায় নাই। অনুসন্ধের স্থানের এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া এক এক বার ভাবিতে লাগিলাম যে, যে গাড়ীতে আসিয়াছি, তাহাতেই আবার কুমিল্লা ফিরিয়া যাই। "অনাহারী" প্রত্নানুসন্ধানে আসিয়া বিদেশে প্রাণটা দেওয়া

বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কিন্তু বড়কামতায় কলিকাতার ঘোষাল বাবুদের জমীদারী কাছাড়ীতে পৌঁছিয়া চিন্তাহরণ বাবুর আশ্বাসে ও কাছাড়ীর সদাশয় নায়েব মহাশয়ের অভ্যর্থনায় পলায়নের ইচ্ছা পলায়ন করিল। চিন্তাহরণ বাবু আমাকে নায়েব মহাশয়ের হাতে সমর্পণ করিয়া সেই দিনই বাড়ী রওনা হইলেন, আমি তাঁহার পরিত্যক্ত বিছানা ও চেয়ার দখল করিয়া বসিলাম।

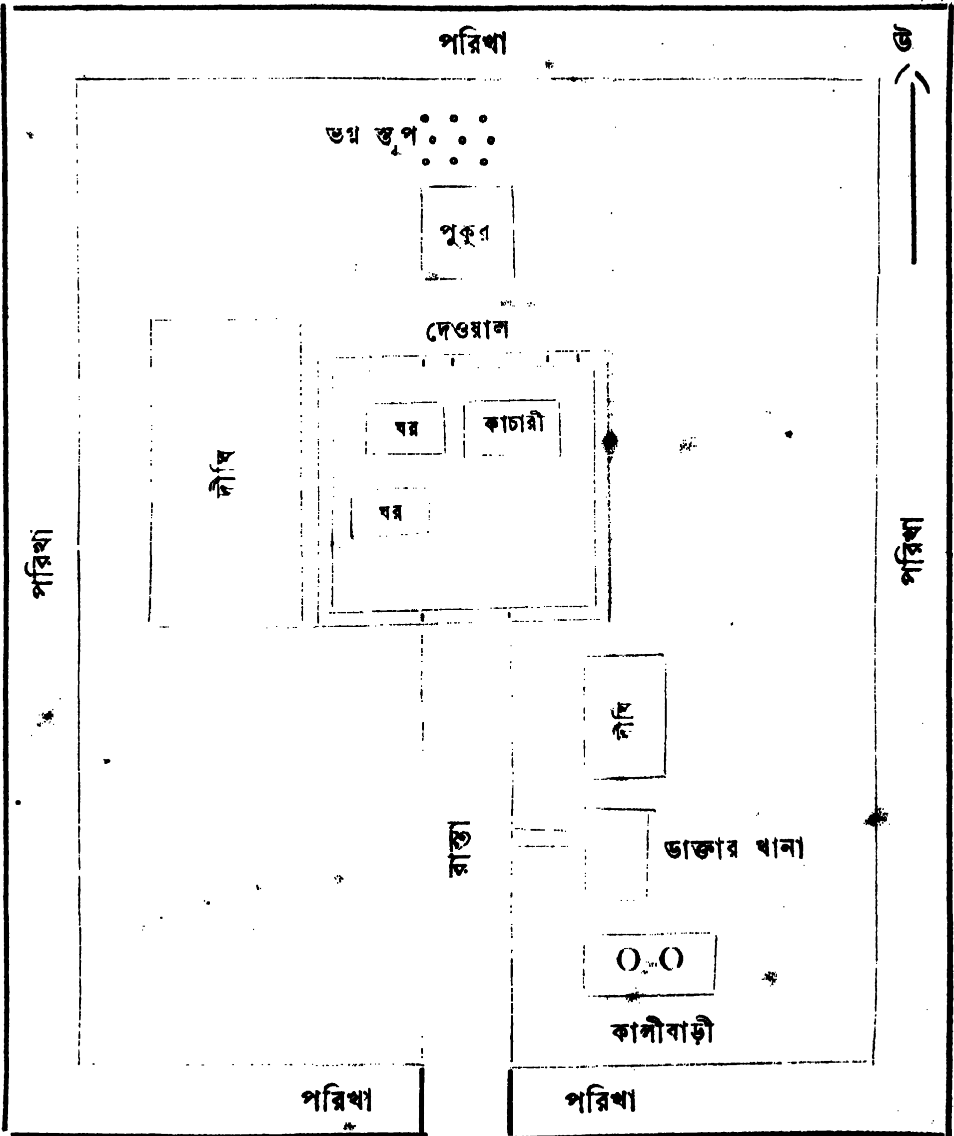
নায়েব মহাশয় তহশিলের কার্য্যে বিব্রত ছিলেন, তাহা সারিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমাকে কাছাড়ী বাড়ীর চারি দিকের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইতে লইয়া চলিলেন। কাছাড়ী বাড়ীটি প্রাচীন রাজবাটির অভ্যন্তরে স্থিত। অনতিবিস্তৃত পরিখা এখনও বর্ত্তমান আছে, স্থানে স্থানে উহা ভরিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে এখনও উহাতে গভীর জল থাকে। পরিখা বেষ্টিত বৃহৎ রাজবাটির ভগ্নাবশেষ অসংখ্য ইষ্টকে ও মৃৎস্তূপে সমাকীর্ণ। অতি প্রাচীন দালানেরই দুই একখানা মেরামত করিয়া তাহাতে কাছাড়ী বাড়ী স্থাপিত হইয়াছে। কাছাড়ী বাড়ীর উত্তরে এবং পরিখার দক্ষিণে একটি নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী; পুনঃ সংস্কৃত হওয়ায় ইহার জল পানের যোগ্য হইয়াছে। পুষ্করিণী এবং পরিখার মধ্যবর্ত্তী স্থান ইষ্টকের কঠিন গাঁথুনিযুক্ত ভগ্ন স্তূপে সমাকীর্ণ। প্রবাদ, এখানে অন্তঃপুরের বিলাস বাটিকা অবস্থিত ছিল। কাছাড়ী বাড়ীর পশ্চিমে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা। ইহার জলই এখন সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য। অন্তঃপুরের পুকুরটির চারি পাড় পুকুরের তলদেশ পর্য্যন্ত ইষ্টক দিয়া বাঁধান। ইহার পঙ্কোদ্ধারের সময় ইহার মধ্য হইতে কয়েকখানি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। তাহার মধ্যে দুইখানা স্থানীয় কালী মন্দিরে রক্ষিত আছে, আর একখানা অনেক দিন পর্য্যন্ত অনাবৃত ভাবে এক অশ্বথ গাছের তলে পড়িয়াছিল, এবং মেঘামেঘী নামে অভিহিত হইয়া পল্লী বৃদ্ধাগণ কর্ত্তৃক তৈল সিন্দূরে লিপ্ত হইতেছিল।

একবার বড়কামতা অঞ্চলে ঘোর অনাবৃষ্টি হয়। তখন সকলে বলিল যে, মেঘামেঘীকে জল হইতে উত্তোলন করাতেই এরূপ অনাবৃষ্টি হইয়াছে। ইহাকে পুনরায় জলে ডুবাইলেই বৃষ্টি হইবে। কাছাড়ীর সেই সময়ের নায়েব মহাশয় অনেক লোকজন দিয়া মেঘামেঘীকে আনিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ দীর্ঘিকায় ডুবাইয়া দেন। তাহাতে বৃষ্টি হইয়াছিল কি না ইতিহাসে সে কথা লিখে না, কিন্তু মেঘামেঘী সেই হইতে ঐ দীঘিতেই নিমজ্জিত আছে।

কালী বাড়ীর মূর্ত্তি দুখানি যাইয়া দেখিয়া আসিলাম। তাহার একখানা বৃহৎ আকারের বাসুদেব মূর্ত্তি অপরখানা প্রায় এক হাত দীর্ঘ ছোট একটি সূর্য্য মূর্ত্তি। এই দুই খানা দেখিয়া মেঘামেঘীর মূর্ত্তি খানা দেখিবার জন্য আগ্রহ হইতে লাগিল। এক জন বৃদ্ধ বলিলেন, মেঘামেঘীর নীচে কি যেন লেখার মত আছে। ইহা শুনিয়া আমার আগ্রহ চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল। নায়েব মহাশয়কে বিশেষ করিয়া বলিলাম, তিনি আশ্বাস দিলেন যে, তিনি মেঘামেঘীকে সলিল-শয্যা হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবেন। লোকে সাধারণতঃ প্রত্যেক পাথরের মূর্ত্তিকেই বাসুদেব বলে, এমতাবস্থায় যখন এখানি মেঘামেঘী এই অদ্ভুত আখ্যা পাইয়াছে তখন আমি অনুমান করিলাম যে, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন বিশেষত্ব আছে, এবং খুব সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধ মূর্ত্তি হইবে। মেঘামেঘী জল হইতে উত্তোলিত হইলে পরে দেখিয়াছিলাম যে, আমি মিথ্যা অনুমান করি নাই।

স্থানীয় বৃদ্ধগণ বলিল যে, এই রাজবাটি, পরিখা এবং দীঘি পুষ্করিণী ইত্যাদি বর্ত্তমান অধিকারীদের পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান জমিদারগণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু এসকল যে মুসলমান জমিদারগণের কীর্ত্তি নহে, তাহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুরাজগণের কীর্ত্তি, অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর অভ্যন্তরে তিনখানা প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তির আবিষ্কারই তাহার প্রমাণ। দীঘিগুলিও সমস্তই উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ, মুসলমান কর্ত্তৃক খনিত পুকুর সাধারণতঃ পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ হইয়া থাকে।

অনুসন্ধানে জানিলাম, যেখানে লিপিযুক্ত নটেশ মূর্ত্তিখানা আছে তাহা বড়কামতা হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী। পরদিন প্রাতে এক জন পাইক লইয়া আমি সেখানে রওনা হইব এবং দুপুরের মধ্যে ফিরিয়া আসিব, নায়েব মহাশয় এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। জানিলাম বড়কামতার চারি দিকে অনেক গ্রামে এইরূপ পাথরের মূর্ত্তি আছে। বৈকুণ্ঠ বাবুর বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, বৈকুণ্ঠ দত্ত নামক কোন ব্যক্তি চারিপারের কোন গ্রামে বিদ্যমান নাই। হতাশ চিত্তে ভাবিতে লাগিলাম যে, একটি জীবন্ত মানুষকেই যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারি তবে জড় পাথরের মূর্ত্তির খোঁজে বৃথাই বাহির হইয়াছি।



বড়কামতা রাজবাড়ী

আমার "পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ" প্রবন্ধে প্রাচীন সমতট এবং বড়কামতা বা কর্ম্মান্ত রাজ্য, সমতট রাজ্যের রাজধানী কর্ম্মান্ত নগরীর ধ্বংসাবশেষ যে একই ছিল, এবং বর্ত্তমান বড়কামতাই যে প্রাচীন তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। হিউয়েন সাঙ

সমতট রাজ্যের রাজধানীর যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, সমতটের রাজধানীর একটু বাহিরে অশোকরাজনির্ম্মিত এক বৃহৎ স্তূপ ছিল এবং তাহার অনতিদূরেই একটি সঙ্ঘারামে সবুজ বসনে ভূষিত একটি বৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তি ছিল।

পরদিন খুব ভোরে যখন পাইক লইয়া লিপিযুক্ত মূর্ত্তিটি দেখিতে রওনা হইলাম, তখন নিজ বড়কামতা গ্রামের উপর দিয়া যাইতে হইল। পাইকের নিকটই জানিলাম যে, বড়কামতার একটু পশ্চিমে একটি বৃহৎ মৃৎস্তূপ বিদ্যমান আছে। পৌষ সংক্রান্তির দিবস তাহার চারি দিকে এখনও বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। স্তূপটি প্রাচীন ইষ্টকে সমাকীর্ণ, স্তূপের সর্ব্বোচ্চ ভাগে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

সঙ্ঘারামের বিষয় অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিতে পরিলাম যে, বড়কামতা গ্রামের কিছু উত্তরে বিহারমণ্ডল নামক এক গ্রাম বর্ত্তমান আছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ কখনও ভোরের বেলা সেই গ্রামের নাম লয় না, পূবের গ্রাম, কি পশ্চিমের গ্রাম ইত্যাদি বলিয়া দরকার হইলে ইহার উল্লেখ করিয়া থাকে। আরও শুনিলাম যে, বিহারমণ্ডলে এক প্রাচীন পুকুরের পাড়ে অনেক ভগ্নাবশেষ আছে, এবং সেই পুকুর হইতে মাটি উঠাইবার কালে একখানা কৃষ্ণদেবের বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এখন উক্ত গ্রামেই এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল বিবরণ শুনিয়া এবং বিহারমণ্ডল নামটির বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, হিউয়েন সাঙ কর্ত্তৃক উল্লিখিত সঙ্ঘারাম এই বিহারমণ্ডল গ্রামেই অবস্থিত ছিল, কর্ম্মান্তাধিপ দেবখড়্গ ও তাহার ছেলে রাজভট্ট যে বিহারে তাম্রশাসনে লিখিয়া ভূমি দান করিয়া ছিলেন তাহাও খুব সম্ভবতঃ এই বিহারই। আমার "বিষ্ণুভজন-পদ" প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, হিউয়েন সাঙ-কথিত স্তূপ ও সঙ্ঘারাম বড়কামতার নিকটে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। এই স্তূপ ও বিহারমণ্ডলের সন্ধান পাইয়া বর্ত্তমান বড়কামতাই যে প্রাচীন সমতটের রাজধানী কর্ম্মান্ত নগরী এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, বিহার-মণ্ডলে প্রাপ্ত এবং কৃষ্ণদেব বলিয়া পূজিত মূর্ত্তিখানা বৌদ্ধ জম্ভল মূর্ত্তি। লম্বোদর অর্দ্ধোপবিষ্ট জম্ভল প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া মুরলীধর কৃষ্ণ বলিয়া কি করিয়া পূজা পাইয়াছে, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

পাইকের সঙ্গে কর্ষিত মাঠের উপর দিয়া চলিতে চলিতে পাইক বলিল যে, সামনের গ্রামে এক পুরাতন রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। গ্রামের নাম ফাগুণ্ডা। এই গ্রামে বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বসতি আছে শুনিয়া ভাবিলাম যে, বন্ধুবর বৈকুণ্ঠবাবুর সন্ধান হয়ত এখানে মিলিতে পারে। গ্রামে প্রবেশ করিয়া জানিলাম যে, বৈকুণ্ঠ দত্ত কেহ নাই বটে কিন্তু বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তী নামক এক ভদ্রলোকের বাড়ী এই গ্রামেই। সন্ধান করিয়া তাঁহারই বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, এবং আলাপ পরিচয়ের পরে জানিতে পারিলাম যে, তাহা আমারই এক বিশেষ বন্ধুর নিজ আত্মীয় বাড়ী। বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে, তাঁহাদের ঘরে অনেক প্রাচীন পুঁথি আছে এবং চারিধারের প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক হিন্দু বাড়ীতে এমন কি মুসলমান বাড়ীতেও প্রাচীন পুঁথির অভাব নাই। দীনেশবাবু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য অবশ্য অনেক করিয়াছেন, কিন্তু উদ্যোগী ও অধ্যবসায়শীল কর্ম্মীর জন্য এখনও কি বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

আমার অনুরোধে বৈকুণ্ঠবাবু তাঁহাদের ঘরের প্রাচীন পুঁথিগুলি আমাকে আনিয়া দেখাইলেন। আমি তাড়াতাড়ি পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম, তাহাতে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, মঙ্গলচণ্ডী, সত্যনারায়ণ ইত্যাদির পাঁচালী এবং অন্যান্য কয়েকখানা সাধারণ বহি রহিয়াছে। বৈকুণ্ঠবাবু বলিলেন যে, নিকটেই এক সূত্রধরের বাড়ীতে একখানা "ইতিহাস" আছে। কি রকম ইতিহাস, তাহা দেখিবার জন্য চলিলাম।

সূত্রধর অনেক আপত্তি ও অনিচ্ছার পরে পুস্তকখানি আনিয়া দেখাইল। পড়িয়া দেখিলাম, তাহা একখানি মহাভারতের বন পর্ব্ব, কাহার ভনিতাযুক্ত তাড়াতাড়ি দেখিয়া তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। সূত্রধর সন্দিগ্ধ নেত্রে আমার পানে বারে বারে চাহিতেছিল, পুস্তকখানা তাহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া তাহাকে শান্ত করিয়া সেই খান হইতে রওনা হইলাম। বৈকুণ্ঠবাবু কতদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত রাজবাটির ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া গেলেন। দেখিবার কিছুই নাই। একটা প্রকাণ্ড দীঘির পাড়ে একটা অনতিবিস্তৃত ভগ্নাবশেষের স্তূপ। রাজার নাম ছিল না কি নল রাজা—সাধারণ লোকে দীঘিটাকে বলে হখন রাজার দীঘি। নিকটেই একত্র অবস্থিত পাঁচটি পুকুর, মধ্যস্থলে একটি, তাহার চারি কোণায় চারিটি—উক্ত নল রাজারই কীর্ত্তি।

পুস্তক ইত্যাদি দেখিতে অত্যন্ত দেরী হইয়া গেল, প্রায় ১২টার সময় যাইয়া আমাদের গন্তব্য স্থান ভারেল্লার বাজারে পৌঁছিলাম। লিপিযুক্ত মূর্ত্তিখানা এই খানেই পাওয়া গিয়াছিল। যাইয়া দেখি মূর্ত্তিখানাকে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, লিপিযুক্ত অংশটি কেবল অভগ্ন আছে দেখিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। মূর্ত্তিখানা বাজারের বট গাছটির গায় হেলান দেওয়ান ছিল, স্থানীয় মুসলমানগণ উহা হইতে নানা অংশ ভাঙ্গিয়া লইয়া ওজন করিবার বাটখারা বানাইয়াছে। বট গাছের তলায় আর একখানা মূর্ত্তিরও ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। সেখানি বোধ হয় সিংহবাহিনীর মূর্ত্তি ছিল, বাহন সিংহ এবং তাহার পীঠে দেবীর পা দু'খানা মাত্র আছে, আর সমস্তটাই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই ভগ্ন অংশ কোথায়, অনেক খোঁজ করিয়াও তাহা জানিতে পারিলাম না। নিকটেই এক বৃহৎ দেবালয় বা রাজবাটির ভগ্নাবশেষ আছে। তাহার সংলগ্ন পুকুর হইতে মাটি তুলিতেই নাকি এই সকল মূর্ত্তি উঠিয়াছিল, তাহাদের কতকগুলি পুকুর পাড়েই পড়িয়াছিল, এখন মাটির নীচে পড়িয়া গিয়াছে, যেগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট তাহা নানা স্থানের লোকে লইয়া গিয়াছে, সকলের চেয়ে বড় দুইখানা মাত্র বাজারের গাছ তলায় পড়িয়া রহিয়াছে। এক জন বৃদ্ধ বলিল যে, লাকশামের জমিদার কালী বাবু না কি একখানা মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছিলেন তাহার নীচে নাকি লেখা আছে। আমি যত্ন করিয়া এ কথা নোট বুকে টুকিয়া রাখিলাম, ভাবিলাম, ফিরিবার সময় লাকসামে নামিয়া ইহার অনুসন্ধান করিয়া যাইব। যে স্থান হইতে এই মূর্ত্তিগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহাকে স্থানীয় লোকে পাল রাজার বাড়ী বলে।

নটেশ মূর্ত্তির লিপস্তে লিখিত আছে যে, কর্ম্মান্তের রাজা কুসুমদেবের ছেলে ভারুদেব এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়া ছিলেন। স্থানটির ভারেল্লা নাম বোধ হয় ভারুদেবের নাম হইতেই হইয়া থাকিবে।

আমি সাড়ম্বরে নটেশ্বর-লিপির ছাপ লইতে বসিলাম, চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেরই এক প্রশ্ন এই মূর্ত্তির মধ্যে এমন কি থাকিতে পারে যাহার জন্য আমি ঢাকা হইতে এত দূর আসিয়াছি। কেহ কেহ সন্দেহ করিতে লাগিল যে, লিপিটিতে কোন গুপ্ত ধনের বিবরণ লিখিত আছে, তাহারই খোঁজে আমি আসিয়াছি. অবশেষে একটি মোল্লা গোছের লোক দেখিয়া আমি তাঁহাকে কাছে ডাকাইয়া লিপিটির প্রত্যেক অক্ষর ধরিয়া পড়াইলাম এবং লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে এই লিপিটি কিরূপে সহায়তা করিবে তাহা বুঝাইয়া দিলাম। এই লিপির সাহায্যে ইতিহাস লিখিত হইবে শুনিয়া স্থানীয় মধ্যবাঙ্গালা স্কুলের একটি ছেলে সভয়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, সেই ইতিহাস তাহাদের পড়িতে হইবে কি না। আমি জানাইলাম যে, ইতিহাস লিখিত হইলে আর রক্ষা নাই, তাহাদের পড়িতেই হইবে। ইহার পরে আবার যখন ভারেল্লার উপর দিয়া যাই তখন ছেলেটির সঙ্গে [illegible] হইয়াছিল। সেলাম করিয়া ম্লান মুখে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, ইতিহাস কতদূর লেখা হইয়াছে? আমি আশ্বাস দিলাম যে, এখনও তাহা আরম্ভ করিতে পারি নাই।

প্রথম ছাপাখানা ভাল উঠিল না, জল বেশী পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেল। একটি বেশ বলবান মুসলমান বলিল, যে একটু চেষ্টা করিলেই ত আমি খোদ, মূর্ত্তিখানাই লইয়া যাইতে পারি। সে আরও বলিল যে, গত বৎসর "দত্তের পুত বৈখণ্ড" আসিয়া এই লিপিটির ছাপ লইয়া গিয়াছে। "দত্তের পুত বৈখণ্ড!" শুনিয়া আমি হাতে আকাশ পাইলাম। এই "দত্তের পুত বৈখণ্ড" নিশ্চয়ই গত বৎসর আমা-কর্ত্তৃক প্রেরিত বন্ধুবর বৈকুণ্ঠ বাবু! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার বাড়ী প্রায় তিন মাইল দূরে, বড় রাস্তার ধারে। মূর্ত্তিখানা সেই যায়গা পর্য্যন্ত বহিয়া দিয়া আসিতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করায় অনেক গোলমালের পরে অনেক মজুরি কবুল করায় দুই জন মুসলমান এই কার্য্যে স্বীকৃত হইল। আমি মুসলমানদ্বয়কে দুই আনা বায়না দিলাম এবং পাইককে বৈকালে কাছাড়ীতে ফিরিব বলিয়া বিদায় দিয়া সানন্দে "দত্তেরপুত বৈখণ্ডের" বাড়ী অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় একটা বাজিয়াছিল, তখন পর্য্যন্ত জলবিন্দুও মুখে পড়ে নাই। সম্মুখে কর্ষিত এবং কর্ত্তিত ধান্যের মাঠ সকল প্রখর সূর্য্য কিরণে তাতিয়া ভীষণ মরুভূমির ক্ষেত্র দেখাইতেছে,তাহার মধ্য দিয়া আমি একাকী অপরিচিত দেশে "দত্তের পুত বৈখণ্ডের" বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে চলিয়াছি। অবশেষে মূর্ত্তিখানা পাইলাম, এবং বৈকুণ্ঠ বাবুরও খোঁজ পাইলাম এই আনন্দে পথশ্রম ও ক্ষুধা তৃষ্ণার মোটেই বোধ হইতেছিল না। প্রত্নানুসন্ধানের সুখ এটুকুই।

অনেক ঘুরিয়া অনেক খুঁজিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যাইয়া বৈকুণ্ঠ দত্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। দূর হইতে বাড়ী দেখিয়াই আমার কি রকম সন্দেহ হইল। আমি শুনিয়াছিলাম বৈকুণ্ঠ বাবুর অবস্থা তত ভাল নহে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া যে বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম তাহা বেশ সমৃদ্ধ।

বাহির বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠানে অনেক ধান রৌদ্রে শুকাইবার জন্য ছড়ান, এক কোণে একটা খালি জায়গায় চারিটি বলদ ও একটা বকনা বাছুর ধান্য মাড়াই করিতেছে। একটি চাকর বলদগুলির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত, বলদগুলি ঘুরিতে ঘুরিতে দুই এক ছড়া ধান্য তুলিয়া মুখে দিতেছে। দেখিয়াই আমার সিংহ মহাশয়ের "ধ্রুবতারায়" বর্ণিত দত্তের বাড়ীর কথা মনে পড়িল। ঠিক যেন এই বাড়ী খানিরই চিত্র ধ্রুবতারায় অঙ্কিত হইয়াছে।

বৈকুণ্ঠ বাবুকে ডাকাইলাম, তিনি আসিলেন, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই ত আমার চক্ষু স্থির। ইনি ত আমার বন্ধু বৈকুণ্ঠ দত্ত নহেন। হতবুদ্ধি হইয়া বলিলাম,—"মশায়, আগা-গোড়া ভুল হইয়া গিয়াছে।" সমস্ত বিবরণ বলিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি একেবারে যে ভুল করিয়াছেন এমন নহে। আপনি যাঁহাকে খুঁজিতেছেন, তিনিও আমার পরিচিত এবং বিশেষ বন্ধু; গত বৎসর লিপিটির ছাপ তুলিবার জন্য আমরা দুজনেই একত্র গিয়াছিলাম এবং তখনই আপনার কথা শুনিয়াছিলাম। আপনার পরিচিত বৈকুণ্ঠ দত্তের বাড়ী বড়-কামতার রাস্তার ধারে ফেলিয়া আসিয়াছেন।" যাহা হউক, অতঃপর সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল, দেখিলাম সৌভাগ্য ক্রমে ভুল করিয়া অতি উৎকৃষ্ট স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। দুবেলা এখানে ছিলাম, অবশ্য নিজের হাতে পাক করিয়াই খাইতে হইয়াছিল; কিন্তু আদর যত্ন ও সেবা যাহা পাইয়াছিলাম তাহা নিজের বাড়ীতেও দুর্লভ এবং তাহা চিরকাল মনে থাকিবে। বৈকুণ্ঠ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান নিশি অনুক্ষণ অনুজের মত আমার অনুগত থাকিয়া সকল বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছিল।

এক ঘণ্টার মধ্যে মুসলমান দ্বয়ের মূর্ত্তি লইয়া আসিবার কথা ছিল কিন্তু আমি পাক করিয়া খাইলাম, বিশ্রাম করিলাম, প্রায় সন্ধ্যা হইল তবু তাহারা মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল না দেখিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইলাম! সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিশিকে বলিলাম,—"চল একটু অগ্রসর হইয়া দেখিয়া আসি।" নিশি সানন্দে সম্মত হইল। তাহাকে লইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলাম, কিন্তু বহুক্ষণ

অপেক্ষা করিয়া এবং বহুদূর পর্য্যন্ত চাহিয়াও কোন ফল হইল না, তাহারা আসিল না। অবশেষে হতাশ হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, বেটারা ফাঁকি দিয়াছে। প্রায় মাইল খানি দূরে ময়নামতির পশ্চিমে বেহারাদের আড্ডা ছিল,—নিশি পরামর্শ দিল, সেখানে গিয়া মুটে ঠিক করিয়া আসি, সঙ্গে সঙ্গে ময়নামতিও দেখা হইবে। তদনুসারে ময়নামতি চলিলাম। কিছু দিন হয় ত্রিপুরা হইতে ময়নামতির গান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।*

প্রায় পাঁচ ছয়টা টিলার মাথা সমতল করিয়া তাহার উপরে যেন রাজবাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উঠিবার সময় লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু নামিবার সময় দেখিলাম, টিলার পার্শ্বদেশ কাটিয়া সঙ্কীর্ণ পয়ঃপ্রণালীর মত যে রাস্তা করা হইয়াছে তাহার দুই ধারে বহুদূর পর্য্যন্ত অভগ্ন ইষ্টকের গাঁথনী। দেখিলে মনে হয় যেন গাঁথনী প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া আর। হইয়া গিয়াছে কিন্তু অর্দ্ধেক বাহির হইয়া রহিয়াছে এমন ইষ্টকখানিও প্রাণপণে টানিয়া স্থানচ্যুত করিতে পারিলাম না। শুনিলাম, নিকটেই নাকি দুটি বৃহৎ প্রস্তরের স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ময়নামতির টিলার নিম্নদেশেই ত্রিপুরা রাজের কাছাড়ী প্রতিষ্ঠিত। নায়েব মহাশয় অতি সদাশয় লোক, তাঁহাকে গিয়া অনুরোধ করা মাত্রই তিনি বেহারা ঠিক করিয়া দিবার জন্য আমার সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু বেহারাদের নিকট মূর্ত্তি আনিবার প্রস্তাব করা মাত্র তাহারা বলিল যে, এ শিবের মূরত, তাহারা একশ টাকা পাইলেও স্পর্শ করিবে না। কোন এক সাহা নাকি মূর্ত্তিগুলি তুলিয়া গোমতী নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসিবার জন্য তাহাদিগকে ৫০৲ সাধিয়াছিল তাহারা তাতে পর্য্যন্ত সম্মত হয় নাই। আমি তাহাদিগকে এই শেষ অসম্মতির জন্য ধন্যবাদ দিয়া হতাশচিত্তে ফিরিয়া আসিলাম। পাক প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে, রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে আটটা, এমন সময় মুসলমানদ্বয় মূর্ত্তি লইয়া আসিল।

পরদিন প্রায় বেলা নয়টার সময় গরুর গাড়ীতে মূর্ত্তি লইয়া রওনা হইলাম। বেলা প্রায় দুটার সময়, গাড়ী কুমিল্লার রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট পৌঁছিল। আমি গাড়োয়ানকে বাসার ঠিকানা এবং পরিচয় দিয়া তাহাকে আসিতে বলিয়া বাসায় চলিয়া গেলাম, কারণ ধূলিধূসরিত শরীরে কুমিল্লার রাস্তায় আর্য্য-ঋষিদের উদ্ভাবিত অদ্ভুত শকটে লোকলোচনের লক্ষ্যীভূত হইবার মোটেই আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আমি দ্রুত হাটিয়া বাসায় যাইয়া পৌঁছিলাম। বাসায় যাইয়া স্নান করিলাম খাওয়া দাওয়া করিলাম--গাড়োয়ান এবং গাড়ী কোথায়? একটু বিশ্রামান্তে গাড়োয়ানের খোঁজে লোক পাঠাইলাম এবং নিজেও বাহির হইলাম। অনেক খোঁজের পরে জানা গেল যে, গাড়োয়ান আমার প্রদত্ত বাসার ঠিকানা ও পরিচয় সমস্ত ভুলিয়া হতবুদ্ধি হইয়া কলেজ হোষ্টেলের নিকটে গাড়ী থামাইয়াছিল। হোষ্টেলের ছেলেরা গাড়ী চড়াও করিয়া মূর্ত্তি নামাইয়া ফেলে এবং বলিতে থাকে যে মূর্ত্তি তাহারাই রাখিয়া দিবে। "ইস্কুইল্যা বাবু"দের এ সকল কাণ্ড দেখিয়া গাড়োয়ানের অবশিষ্ট বুদ্ধিটুকুও হারাইয়া যায় এবং সে নিশ্চেষ্ট হইয়া তাহাদের কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে। এই অবস্থায় আমা-কর্ত্তৃক প্রেরিত লোক যাইয়া "ইস্কুইল্যা বাবু"দের হাত হইতে বেচারাকে উদ্ধার করিয়া আনে।

মূর্ত্তি বাসায় উপনীত হইলে দলে দলে স্কুল কলেজের ছেলে ও কুমিল্লার ভদ্রলোকগণ তাহা দেখিতে আসিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত অনবরত আমার মূর্ত্তিতে কি লেখা আছে তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইল। এই উপলক্ষে অনেকের নিকট আরও অনেক মূর্ত্তিরও অনুসন্ধান মিলিল।

পরদিন ভোরে আবার ঘোড়ার গাড়ীতে রওনা হইয়া বন্ধুবর বৈকুণ্ঠ বাবুর বাড়ীতে পৌঁছিলাম, এবার আর কোন ভুল হয় নাই।

শ্রীনলিনী কান্ত ভট্টশালী।

---

* প্রতিভা—ফাল্গুন, ১৩১৯

প্রতিভা

৩য় বর্ষ   আষাঢ় ১৩২০   ৩য় সংখ্যা

ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক যুগে যে কয়েকটি অব্দ প্রচলিত হইয়াছে 'বিক্রম সংবৎ' তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। কিন্তু ইহার উৎপত্তির সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহ কোন সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, কালিদাসাদি নবরত্ন যাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন এবং যিনি শক-জাতিকে পরাজিত করিয়া শকারি এই গৌরবসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উজ্জয়িনীর মহারাজ সেই বিক্রমাদিত্যই এই অব্দের প্রবর্ত্তক। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য নামক কোন রাজা বিদ্যমান ছিলেন, ইহা বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণ একবাক্যে অস্বীকার করিয়াছেন, এবং উক্ত অব্দের উৎপত্তিনির্ণয়োদ্দেশে সম্ভব অসম্ভব নানারূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজা বিক্রমাদিত্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা এবং বিক্রম সংবতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি ইত্যাদি প্রশ্ন আমরা নিম্নলিখিত তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিব।

১। এই সংবতের উৎপত্তি কবে তাহার নির্ণয়।

২। বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে উহার ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ।

৩। বিক্রমাদিত্যের সহিত এই অব্দের সম্বন্ধ বিচার।

১। সংবতের উৎপত্তি

বিক্রম সংবৎ অব্দটি এখনও প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান খৃঃ ১৯১৩ সালে সংবৎ অব্দের ১৯৬৯ বৎসর চলিতেছে। সুতরাং সহজেই অনুমিত হয় যে, খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দে ইহার উৎপত্তি। কিন্তু ফার্গুসন সাহেব বলেন যে এইরূপ অনুমান করা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তিনি বলেন, "৫৪১ খৃঃ অব্দে বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী একজন রাজা কারোরের যুদ্ধে হূণদিগকে পরাজিত করেন। সেই বিজয়-কাহিনী চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই এই অব্দের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ, এই অব্দকে প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার মানসে, ইহার প্রারম্ভকাল ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে ধার্য্য করিয়াছেন।"

ফার্গুসনের মত

১৮৮০ খৃঃ অব্দে ফার্গুসন সাহেবের এই অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশিত হয় এবং তৎপরে অনেকেই ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলর তাঁহার "Renaissance of Sanskrit Literature" নামক সংস্কৃত সাহিত্যের উৎপত্তি ও গতি সম্বন্ধে অভিনব মত প্রতিপাদন করিতে উদ্যত হইয়া দেখিলেন যে, খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, তাঁহার এই মত সম্পূর্ণ বদলাইতে হয়। সুতরাং তিনিও বিশেষ

আগ্রহ সহকারে ফার্গুসন সাহেবের মতকে সত্য বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ডাক্তার বুলার ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মোক্ষমূলরের উক্ত মতটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। স্বয়ং মোক্ষমূলর তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা এবং স্বকীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ এই যে, "India, What It Teaches Us" নামক যে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ প্রবন্ধটি একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বিক্রম সংবতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ফার্গুসনের মতও যে একেবারে ভ্রমাত্মক তাহার অবিসংবাদি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মান্দাসোর নামক স্থানে দুইখানি অনুশাসন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে মালবাব্দ ৫২৯, মা ৪৯৩, মা ৫৮৯ এই তিনটি বর্ষের উল্লেখ আছে। এই মালবাব্দ যে বিক্রম সংবৎ হইতে অভিন্ন ডাক্তার ফ্লীট এবং অন্যান্য সকলে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন। ডাক্তার কীলহর্ণের মতে বিষ্ণুবর্দ্ধনের বিজয়গড় স্তম্ভলিপি, বিশ্ববর্ম্মার গংধার লিপিতে যে যথাক্রমে ১২৮ ও ১৮০ বর্ষের উল্লেখ আছে তাহাও এই মালবাব্দ অনুসারে গণনা করিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ৫৪৪ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেও সংবতের ব্যবহার ছিল। সুতরাং এই অব্দ যে ৫৪৪ খৃঃ অব্দে কারোরের যুদ্ধজয় চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ফার্গুসনের এই অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন। খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দেই যে সংবতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে বিষয়ে এখন আর কেহ কোন সন্দেহ করেন না।

২। রাজা বিক্রমাদিত্য

বিক্রমাদিত্যের সম্বন্ধীয় কাহিনী

রাজা বিক্রমাদিত্যের সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী বা কিংবদন্তীগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বেতাল পঞ্চবিংশতি ও দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকায় রাজা বিক্রমাদিত্যের দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক যে সকল গল্প লিখিত আছে, তৎসমুদয় এক শ্রেণীর অন্তর্গত; কিন্তু জৈন সাহিত্য ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে যে সমুদয় কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রথম শ্রেণীর গল্পগুলিতে রাজা বিক্রমাদিত্য আদর্শ পুরুষ রূপে কল্পিত হইয়াছেন, এবং নানারূপ কল্পিত ঘটনার নায়করূপে তাহার এই আদর্শত্ব ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বেতাল পঞ্চবিংশতি এবং দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার গল্পগুলি সকলের পরিচিত; সুতরাং তৎসম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। এগুলি পড়িলেই বুঝা যায় যে এগুলি গল্পমাত্র, ইতিহাস নহে।

কিন্তু জৈন সাহিত্য পাঠে বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য জানিতে পারা যায়, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। তাহার মধ্যে কিছুই অলৌকিক বা অস্বাভাবিক নাই। পুরাণে যেরূপ মগধের রাজবংশ বর্ণিত হইয়াছে, জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে ও সাহিত্যেও সেইরূপ অবন্তীর রাজবংশ বর্ণিত হইয়াছে। মগধে কোন্ বংশের পর কোন্ বংশ রাজত্ব করে, কোন্ নৃপতি কত কাল রাজত্ব করেন, রাজগণের নামের তালিকা প্রভৃতি বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে দৃষ্ট হয়। তেমনি জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাহিত্যেও অবন্তীর রাজবংশের বিষয় বিবৃত আছে।

প্রথমে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পুরাণের এই তালিকায় আস্থাস্থাপন করেন নাই। কিন্তু যতই শিলালিপির আবিষ্কার ও অন্যান্য উপায়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার হইতে লাগিল, ততই পুরাণ-বর্ণিত প্রাচীন রাজবংশের তালিকার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইতে লাগিল। অবশ্য এই তালিকায় যে কোন ভ্রম নাই এমন নহে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পুরাণগুলি হস্তলিখিত পুথিতে নিবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে যাহা কিছু ধর্ম্মসম্পর্কীয় কেবল তাহাই পূর্ব্বকালে সযত্নে রক্ষিত হইত; কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যগুলির প্রতি কদাচ সেরূপ যত্ন করা হয় নাই। জ্ঞানহীন পুথিলেখকের হস্তে পড়িয়া যে এই তালিকাগুলি বিকৃত আকার ধারণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এখন অনেকেই এ কথা স্বীকার

করেন যে, মূল পুরাণে রাজবংশের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত ছিল; যাহা কিছু ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয়, পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা পুথি নকল করিয়াছেন, তাঁহারাই তজ্জন্য দায়ী।

কিন্তু পুরাণ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইলেও জৈন-গ্রন্থোক্ত তালিকা সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্ব্ব ধারণাই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাঁহারা এগুলির উপর কোন আস্থাই স্থাপন করেন না। তাঁহারা বিক্রমাদিত্যকে Legendary বা Mythical King আখ্যা প্রদান করিয়া লোক-কাহিনীর নায়কমাত্র বিবেচনা করেন। বিক্রমাদিত্যের নামে legend বা অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে এরূপ প্রমাণ হয় না যে বিক্রমাদিত্য কেবলমাত্র legendary বা mythical king.

অশোকের নামেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে কিন্তু তাই বলিয়া অশোক Legendary King নহেন। অশোকাবদান, দীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে অশোকের সম্বন্ধে বহু অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে; কিন্তু পুরাণ-বর্ণিত রাজবংশের তালিকায়ও তাঁহার নামোল্লেখ আছে। সেইরূপ বেতাল পঞ্চবিংশতি, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক উপাখ্যান আছে; কিন্তু জৈন গ্রন্থাদিতে অবন্তীর রাজবংশের তালিকায়ও তাঁহার নাম ও অন্যান্য বিবরণ উল্লিখিত আছে। ঐতিহাসিকগণ প্রায়শঃ বিক্রমাদিত্য-সম্পর্কীয় এই দুই শ্রেণীর কাহিনীর মধ্যে কোন প্রভেদ স্থাপন করেন না। সমস্তগুলিকেই legend বা কল্পিত গল্প বলিয়া ধরিয়া লইয়া, বিক্রমাদিত্যকে Legendary বা Mythical King বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় ইহা কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে ও সাহিত্যে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের বর্ণনা আছে—তাহা legend বা কাহিনীমাত্র নহে, আংশিক পরিমাণেও ঐতিহাসিক সত্যঘটিত।

আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত করিবার জন্য, যে সমুদয় জৈন গ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের বিষয় লিখিত হইয়াছে, অতঃপর সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধারের রীতি সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ সূত্রের উল্লেখ করা আবশ্যক।

প্রাচীন গ্রন্থের ঐতিহাসিকত্ব বিচারপদ্ধতি

প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ প্রত্যেক কাহিনী বা কিংবদন্তীই যে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এরূপ নহে। কোন কাহিনী বা কিংবদন্তীতে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে সমালোচ্য কাহিনী বা কিংবদন্তীটি বিভিন্ন প্রণালীতে পরীক্ষা করিতে হইবে। এই প্রণালীগুলি কি তাহা নিঃশেষে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। কয়েকটি সাধারণ প্রণালীমাত্র আমরা এ স্থলে উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ, কাহিনী বা জনশ্রুতিটি যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেই গ্রন্থের প্রকৃতি অনুসারে কাহিনীটির ঐতিহাসিক মূল্য বেশী বা কম হইয়া থাকে। বিদেশীয় পরিব্রাজক এদেশে আসিয়া লোকমুখে শুনিয়া যে জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থে প্রাপ্ত আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক।

দ্বিতীয়তঃ, লোকরঞ্জন করা, পাঠকের মনে ভয় বা বিস্ময় উৎপাদন করা, অথবা গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা প্রদান করাই যে গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য, তদ্বর্ণিত কাহিনীর সত্যতায় বিশেষ কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না। অপর পক্ষে, যদি এরূপ বুঝা যায় যে, ঘটনাগুলি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা ব্যতীত গ্রন্থকারের অন্য কোন উদ্দেশ্য বর্ত্তমান ছিল না, এবং তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ও অপর সুপরিচিত ঘটনার কোন প্রকার বিরোধী নহে, তাহা হইলে অন্ততঃ কোন বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এরূপ বর্ণনা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ যে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য আছে কি না দেখিতে হইবে। বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত অশোকের বাল্যজীবনের ইতিহাস দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে। বৌদ্ধগ্রন্থ মতে অশোক বাল্যজীবনে অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃগণের শোণিতপাত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এখানে বুঝা যাইবে যে, গ্রন্থকারের স্পষ্ট উদ্দেশ্য বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন,—অশোকের ন্যায় চণ্ড প্রকৃতিকেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কিরূপ কোমল ও সুমধুর করিয়া তুলিতে পারে তাহার প্রদর্শন। সুতরাং অশোকের বাল্য জীবনের এই সমুদয় কাহিনী সত্য কিনা সে সম্বন্ধে স্বভাবতঃই যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে।

গ্রন্থের প্রাচীনত্ব তদ্বর্ণিত কাহিনীর সত্যতা-নিরূপণে আর একটি প্রধান সহায়। যে গ্রন্থ যত প্রাচীন এবং এবং বর্ণিত ঘটনাকালের যত অধিকতর নিকটবর্ত্তী সেইগ্রন্থ তত অধিকতর প্রামাণিক।

যে গ্রন্থোক্ত ঘটনাবলী অন্যবিধ ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় তাহার ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী। গ্রন্থোক্ত কোন ঘটনা যদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর কোন গ্রন্থের দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে কোন বিপরীত প্রমাণ বিদ্যমান না থাকিলে আমরা উহাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

অতঃপর উপরে যে কয়েকটি সাধারণ সূত্রের উল্লেখ করা হইল তদ্দ্বারা এবং অন্য উপায়ে, জৈন গ্রন্থোক্ত বিক্রমাদিত্যের সম্পর্কীয় কাহিনীগুলির ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধীয় জৈন গ্রন্থ

সুপ্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত মেরুতুঙ্গ "থেরাবলী" নামক গ্রন্থের প্রণেতা। এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত হয়! এই গ্রন্থে মেরুতুঙ্গ কয়েকটি প্রাচীন 'গাথার' টীকা করিয়াছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে এই গাথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গাথাগুলির ভাষা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে এগুলি অতি প্রাচীন—খৃষ্টীয় অব্দারম্ভকাল হইতে পাঁচ শত বৎসরের পরবর্ত্তী হইবে না। এই সমুদয় প্রাচীন গাথা মিলাইয়া মেরুতুঙ্গ উজ্জয়িনীর রাজবংশের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল।

"অবন্তীরাজ চন্দ্র-প্রদ্যোত এবং তীর্থঙ্কর মহাবীর এক রাত্রিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রদ্যোত-পুত্র পালক ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে পাটলি-পুত্রে নন্দবংশীয়গণ রাজা হন, এবং উজ্জয়িনী তাঁহাদের হস্তে পতিত হয়। নন্দবংশীয় নয়জন রাজা ক্রমান্বয়ে ১৫৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে মৌর্য্যগণ ১০৮ বৎসর রাজত্ব করেন। মৌর্য্যগণের পরে পুষ্যমিত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল ৩০ বৎসর। তৎপরে বলমিত্র এবং ভানুমিত্র এই দুইজনে ৬০ বৎসর, এবং নভোবাহন ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর গর্দ্দভিল্লবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এবং এই বংশের রাজত্বকাল ১৫২ বৎসর। ১৩ বৎসর রাজত্ব করিবার পর গর্দ্দভিল্ল শকরাজগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। চারি বৎসর পরে গর্দ্দভিল্লের পুত্র বিক্রমাদিত্য পিতৃরাজ্য পুনরায় অধিকার করেন এবং ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার পর আর চারিজন রাজা যথাক্রমে ৪০, ১১, ১৪ ও ১০ বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর শকাব্দ আরম্ভ হয়।"

মেরুতুঙ্গ প্রদত্ত উল্লিখিত কালাঙ্কগুলি যে কেবল উপাখ্যান নহে, পরন্তু ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার নানাবিধ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা সেগুলি যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছি।

(১) বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে বুদ্ধদেবের সময়ের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে অবন্তী নামে একটি স্বাধীন রাজ্য এবং তাহার রাজা প্রদ্যোতের নামের উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহা দ্বারা মেরুতুঙ্গের বর্ণনা সমর্থিত হয়।

(২) মেরুতুঙ্গ পাটলীপুত্রাধিপ নন্দ ও মৌর্য্য এই দুই রাজবংশের উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণেও এই দুই

বংশের বিবরণ আছে, এবং মেরুতুঙ্গের বর্ণনার সহিত তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

মেরুতুঙ্গের গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নন্দবংশের রাজ্য অবন্তী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পুরাণে এ কথা নাই বটে; কিন্তু মেরুতুঙ্গের বিবরণ যে সত্য, আলেকজাণ্ডারের অভিযানের বিবরণ হইতে আমরা তাহার কতক আভাস পাই। শতদ্রু-পারে আসিয়াই আলেকজাণ্ডার নন্দবংশীয় মগধ-রাজের প্রভাব ও বীরত্বের বিষয় অবগত হইলেন। শতদ্রুর পূর্ব্ব পারে মগধরাজ ভিন্ন অন্য কোন রাজার উল্লেখ নাই। সুতরাং মগধের রাজ্য-সীমা শতদ্রুর নিকটেই ছিল বলিয়া অনুমিত হয়, এবং মেরুতুঙ্গের বর্ণনা হইতেও আমরা তাহাই জানিতে পারি।

মেরুতুঙ্গের বর্ণনা অনুসারে খৃঃপূঃ ৩১২অব্দে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং গ্রীক ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ৩২৬ হইতে ৩১২ অব্দের মধ্যে নিশ্চয়ই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। এই ঘটনাগুলির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে মেরুতুঙ্গের গ্রন্থোক্ত অবন্তীর রাজ-বংশের পরিচয় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই রাজবংশের তালিকার মধ্যে মেরুতুঙ্গ স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দে বিক্রমাদিত্য শকদিগকে পরাজিত করিয়া পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পিতা ও বংশধরগণের নামও আমরা মেরুতুঙ্গের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। এ সকলই কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সুতরাং অন্যরূপ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা বিক্রমাদিত্যকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।

মেরুতুঙ্গের থেরাবলী ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থেও গাথা শ্লোকে বিক্রমাদিত্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে সিসিল বেণ্ডাল (Cecil Bendall) জয়পুরে কয়েকখানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করেন। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী (Indian Antiquary) পত্রিকায় হর্ণলি (Hoernle) সাহেব তাহার একখানির অনুবাদ করেন। ইহার অষ্টাদশ ও উনবিংশ গাথা দুইটির মর্ম্ম এই—

"মহাবীরের মৃত্যুর ৪৭০ বৎসর পরে বিক্রমের জন্ম হয়। ৮ বৎসর তিনি বাড়ীতে থাকেন, তৎপরে ১৬ বৎসর দেশ পর্য্যটন করেন। ১৫ বৎসর ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন, পরে ৪০ বৎসর জৈনধর্ম্মের উপাসক ছিলেন।"

এতদ্ভিন্ন হর্ণলি সাহেব ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারীতে পণ্ডিত হরিদাস শাস্ত্রী প্রেরিত একখানি পট্টাবলীর অনুবাদ প্রকাশিত করেন, তাহাতে বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।"

"মহাবীরের মৃত্যুর ৪৭০ বৎসর পরে রাজা বিক্রমের জন্ম হয়। তিনি আট বৎসর কাল বালসুলভ ক্রীড়ায় অতিবাহিত করিয়া ১৬ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন দেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। পরে ৫৬ বৎসর তিনি নিজ রাজ্য শাসন করেন। প্রথমে তিনি বিধর্ম্মী ছিলেন, পরে ৪০ বৎসর জৈনধর্ম্মের উপাসক থাকিয়া দেবলোকে গমন করেন।"

মেরুতুঙ্গের থেরাবলীতে লিখিত হইয়াছে যে বিক্রমাদিত্যের পিতা গর্দ্দভিল্ল শকজাতীয়গণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন; পরে বিক্রমাদিত্য শকদিগকে পরাস্ত করিয়া, পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করেন। "কালকাচার্য্য কথা" নামক জৈনগুরু কালকাচার্য্যের উপাখ্যানে আমরা ইহার সবিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হই। নিম্নে ইহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত হইল।

"গুরু কালকাচার্য্যের ভগ্নী সরস্বতী ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করেন। উজ্জয়িনীর রাজা গর্দ্দভিল্ল তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহার প্রতি বলপ্রকাশ করেন। অপমানিত ও ক্রুদ্ধ কালকাচার্য্য সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারে এক সাহ রাজার আশ্রয়ে যাইয়া বাস করেন, এবং জ্যোতিষিক বিদ্যা দ্বারা তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। কালকাচার্য্য ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, এই রাজার

ন্যায় আরও ৯৫ জন রাজা সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারে আছেন, এবং ইহারা সকলেই এক মহারাজার অধীন। কালকাচার্য্যের উত্তেজনায় তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজা অপর ৯৫ জনের সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনী আক্রমণ ও অধিকার করিয়া মালবদেশে রাজ্যবিস্তার করেন। চারি বৎসর পরে গর্দ্দভিল্ল-পুত্র বিক্রমাদিত্য শকগণকে বিতাড়িত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন, এবং এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটি অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন কালকাচার্য্য প্রতিষ্ঠান-পুরীতে শাতযান রাজার সভায় গমন করিলেন।"

কালকাচার্য্য সম্বন্ধে এই আখ্যানটি অন্যান্য অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার ভাউদাজী ব্রোচ নগরের একটি প্রাচীন পুস্তকাগারে একখানি পট্টাবলী প্রাপ্ত হন। তাহাতে উপরি উক্ত কালকাচার্য্যের আখ্যান বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর ১৩৫ বৎসর পরে শকগণ পুনরায় বিক্রমাদিত্যের বংশধরগণকে পরাস্ত করিয়া উজ্জয়িনা রাজ্য অধিকার করিল।" এতদ্ভিন্ন জৈন কল্পসূত্রের ভাষ্যে এবং শুভসিলগনি কৃত ভরহেশ্বর বৃত্তি নামক গ্রন্থেও কালকাচার্য্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সমুদয় আখ্যায়িকা পাঠ করিলে স্বভাবতঃই বিক্রম সংবৎ প্রবর্ত্তক রাজা বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহার বিরুদ্ধে তর্ক উপস্থাপিত করেন যে, খৃঃ পূঃ ৫৮-৫৭ অব্দে বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজা থাকিলে অবশ্যই তাহার কোন মুদ্রা বা অনুশাসন-লিপি পাওয়া যাইত। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার এখনও শৈশবাবস্থা। যে সমুদয় স্থানে বিক্রমাদিত্যের মুদ্রা বা অনুশাসন-লিপি পাওয়ার সম্ভাবনা সে সমুদয় স্থানে এখনও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন ও অনুসন্ধান কার্য্য আরব্ধ হয় নাই। আর, কোন রাজার মুদ্রা বা অনুশাসন-লিপি না পাইলেই যে তাহার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হইল এরূপ নহে। কুশান রাজা বাসিস্কের আবিষ্কার ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। ১৯০৩ সালে ডাক্তার ফ্লীট মত প্রচার করেন যে, কণিষ্কের পরে ও হুবিষ্কের পূর্ব্বে বাসিষ্ক নামে একজন রাজা ছিলেন। তৎকালে ভিন্সেণ্ট স্মিথ (Vincent Smith) বলেন, "বাস্তবিকই এইরূপ কোন রাজা বর্ত্তমান থাকিলে, তিনি যে কোন মুদ্রা প্রচার করেন নাই ইহা অসম্ভব, এবং মুদ্রা প্রচার করিয়া থাকিলে তাহা যে পাওয়া যাইত না, তাহা আরও অসম্ভব।" কিন্তু দুই বৎসর পূর্ব্বে মথুরায় বাসিষ্কের অনুশাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং জানিতে পারা গিয়াছে যে, বাস্তবিকই কণিষ্ক ও হুবিষ্কের মধ্যে বাসিষ্ক নামে একজন রাজা ছিলেন। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত ও সুঙ্গ পুষ্যমিত্র প্রবল-প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের কাহারও কোন মুদ্রা বা অনুশাসনলিপি পাওয়া যায় নাই। এমত অবস্থায় কেবল কোন মুদ্রা ও অনুশাসন লিপি পাওয়া যায় নাই বলিয়া বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। ঐতিহাসিকগণ কিন্তু এই কারণেই খৃঃ পূঃ ৫৮অব্দে বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া সম্ভব অসম্ভব নানাস্থানে বিক্রমাদিত্যের নামের প্রয়োগ করিয়া বেড়াইতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

সন্তান পালন

২ বৎসর হইতে ১২ বৎসর।

শিশুটি যখন দুই বৎসরের হয়, তখন মায়ের মনে আর আনন্দ ধরে না। এখন তার দুধে দাঁতগুলি সব (২০টা) দেখা দিয়াছে। মাথার হার্ড আর তুল্ তুল্ করে না—সে বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং না পড়িয়া কিছু দূর হাঁটিতেও পারে। এখন আর তাহাকে শুধু দুধের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না। সে ভাত খায়—রুটি লুচি তরিতরকারী সন্দেশ মিঠাই

প্রভৃতিও একটু একটু করিয়া খাইয়া জীর্ণ করিতে পারে। দিনের বেলাটা সে খেলাধূলা করিয়া কাটাইয়া দেয়—রাত্রে সুনিদ্রা ভোগ করে। সে এখন মনের ভাব কথাতে প্রকাশ করিতে পারে—অপরে যাহা বলে তাহাও বুঝিতে পারে।

শিশুর শিক্ষা

এইরূপে সে যখন ৬।৭ বৎসরে পড়ে তখন একটি একটি করিয়া তাহার দুধে দাঁত পড়িয়া তাহার স্থানে স্থায়ী দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে। এ সময় হইতে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। অতি সহজ সহজ বিষয় মুখে মুখে শিখাইতে হয়। ৭ বৎসর বয়ক্রম কালে তাহাকে শিশু বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারা যায়। ১১।১২ বৎসর বয়স হইলে, তাহাকে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারা যায়। এ সময় হইতে তাহার নিয়ম মত শারীরিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করারও একান্ত আবশ্যক, কেবল পড়াশুনা লইয়া থাকিলে চলিবে না। এ সময় তাহার মন অতিশয় কোমল ও নমনীয় থাকে। এ সময় হইতে তাহাকে কর্ত্তব্যপরায়ণতা, গুরুজনে ভক্তি, সত্যবাদিতা, আত্মসংযম প্রভৃতি সৎবৃত্তিগুলির অনুশীলন না করাইলে, পরে আর কোন ফল হয় না। সকল বাপ মা-ই মনে করেন, বড় হইয়া তাঁহাদের ছেলেটি যেন বেশ কাযের লোক হয়। তাহাকে কাযের লোক করিয়া তোলা তাঁহাদের নিজেরই হাতে; শৈশবে শিক্ষায় ঔদাস্য করিলে পরে সহস্র চেষ্টা করিলেও ফল না হইবারই কথা।

শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ হইবে না হইবে, তাহা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সে দুটি বিষয় এই (১ম) বংশানুক্রম; (২য়) শিশুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয়। এই কারণে পিতামাতা সন্তানের সম্মুখে কেবল সৎ দৃষ্টান্তই উপস্থিত করিবেন—তাহারা যাহাতে সৎ বই অসৎ সঙ্গ না করে, ইহার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। শৈশবে মনের উপর যে ভাবটি শিকড় গাড়িয়া বসে, পরে আর উহাকে উৎপাটন করিতে পারা যায় না—এ সময় যদি তাহারা ভাল দৃষ্টান্ত এবং ভাল সঙ্গ পায়, তাহা হইলে, তাহাদের ভাল হইবারই কথা। ছেলে মানুষ করিতে হইলে পিতামাতার দায়িত্ব বড় সামান্য নহে। এ সময় নিজেদের কর্ত্তব্যপালনে যাঁহারা অবহেলা করেন—ভবিষ্যতে তাঁহাদের সন্তানগণ যে তাঁহাদের মনঃকষ্ট ও অশান্তির কারণ হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে?

ছেলেরা বড়ই মিষ্টপ্রিয়। যাহা তাহাদের একান্ত প্রিয় তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা উচিত নহে। তাই বলিয়া তাহাদের অধিক পরিমাণে মিষ্ট দিতে নাই—অধিক মিষ্ট খাইলে পেট ফাঁপে—গা গরম হয়—রাত্রে ভাল ঘুম হয় না—এবং দাঁতে পোকা হয়। গুড়, চিনি, মিছরী, সন্দেশ প্রভৃতি, শিশুর বয়স হিসাবে, একটু আদটু ব্যবস্থা করিতে না পারা যায় এমন নহে।

শিশুদের চিত্তবিনোদনের জন্য তাহাদের খেলেনা কিনিয়া দেওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু একবারে একাধিক খেলেনা যাহাতে তাহাদের হাতে না পড়ে, সে দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এক সঙ্গেই অধিক সংখ্যক খেলেনা দিলে, সে কোনটি লইয়া খেলা করিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারে না—যেন গোলকধাঁধায় পড়িয়া যায়, সুতরাং খেলেনা দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্যটি সফলতা লাভ করিতে পারে না। শিশুর বয়স হিসাবে খেলেনারও তারতম্য ও প্রকারভেদ হওয়ার আবশ্যক। একটু বয়স্ক শিশুকে রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী প্রভৃতি দিতে হয়। এ সকল খেলেনায় তাহাদের বেশ আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি হয়। ইহাদিগকে চালাইতে একটু বুদ্ধিরও আবশ্যক হয়, তাহাতে তাহাদের কতকটা শিক্ষাও হয়। খেলেনা সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। আমরা অনেক স্থলেই দেখিতে পাই শিশুর খেলেনা সামান্য একটু খারাপ বা বিকল হইলে, পিতামাতা তাহাকে নূতন খেলেনা কিনিয়া দেন। ইহা আমাদের নিকট অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। খেলেনাটি যদি শিশুর দ্বারা মেরামত করা অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে, সে যাহাতে নিজ হস্তে তাহা

মেরামত করে বাপমার সে বিষয়ে সন্তানকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে শিশুর দ্রব্যের প্রকৃত মর্য্যাদার জ্ঞান জন্মে।

শিশুর দন্ত

মানুষের দুবার দাঁত উঠে। একবার ৭ মাস বয়সে আরম্ভ করিয়া দু বৎসর বয়সের মধ্যে। ইহাদিগকে দুধে দাঁত বলে। ইহারা সংখ্যায় কুড়িটি। আর একবার ৬ বৎসরে হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে—এগুলিকে স্থায়ী দাঁত বলে; ইহারা সংখ্যায় ৩২টি।

দুধে দাঁত অনেকের বেলায় ঠিক নিয়মানুসারে উঠে না। এক একটি শিশুর এক বৎসর বয়স না হইলে দাঁত উঠিতে দেখা যায় না। কাহার কাহার আবার ৩ মাস বয়স হইতেই দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে। সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রথমে নীচেকার পাটীর মধ্যেকার দাঁত দুটি দেখা দেয়। কাহার কাহার আবার সর্ব্বপ্রথমে কষের দাঁত উঠিতে দেখা যায়।

দাঁত উঠিবার সময় অনেক শিশুর শরীরের ভাবান্তর হইতে দেখা যায়—বিশেষতঃ পেটের বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। দাঁত উঠিবার কালে শিশুর পেট খারাপ হওয়া যে স্বাভাবিক, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আহারের দোষই পেটের গোলযোগের প্রধানতম কারণ মনে করিতে হইবে। এই কারণে দাঁত উঠিবার সময় শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। শিশুর ৭৮ মাস বয়স হইলে, আমরা সাধারণতঃ বিশেষ বিচার না করিয়া, শিশুকে এটা সেটা খাওয়াইতে আরম্ভ করি সেই কারণেই তাহার পেটে দোষ জন্মায়। শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হইলে, দাঁত উঠিবার সময় পেটের গোলযোগ না হইবারই কথা। তবুও একথা আমরা স্বীকার করি যে, দুই একটি শিশু দাঁত উঠিবার সময় বিশেষ কষ্ট পায়; তাহাদের এ কষ্ট বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও নিবারিত করিতে পারা যায় না। দাঁত উঠিবার সময় শিশুর মুখ দিয়া লালা পড়িতে থাকে—সে সর্ব্বদা মুখের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া দেয়। এ সময় যদি তাহার কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, কি পেট কামড়ায়, তাহা হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবে। এক একটি শিশুর এ সময় জ্বরভাব অথবা স্পষ্ট জ্বর হইতে দেখা যায়। কাহার কাহার আবার সর্দ্দি ভাব হয়। কেহ কেহ আবার অতিশয় অস্থির ও চঞ্চল হইয়া পড়ে—দুই একটি শিশুর আবার তড়কা দেখা দেয়। এ সকল উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তার ডাকা উচিত। এসব সামান্য ব্যাপার মনে করিয়া উপেক্ষা করিতে নাই। দাঁত উঠিবার সময় অনেক শিশুর প্রথম কয়েক দিন কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিয়া, পরে পাতলা দাস্ত হইতে আরম্ভ করে। এ সময় অনেকের অরুচি দেখা দেয়—তাহারা কিছু খাইতে চাহে না। দাঁত উঠিবার সময় অনেক শিশু কতকটা রুগ্ন হইয়া পড়ে—তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা কৃশতর দেখায়। সুখের বিষয় এই যে, এই কৃশতা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। দাঁত উঠার উপসর্গগুলি দূর করিবা মাত্র ৭।৮ দিনের মধ্যে তাহার পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসে। দাঁত উঠিবার সময় হইলে, শিশুর আহার সম্বন্ধে যাহাতে কোনরূপ অনিয়ম ঘটিতে না পায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহাতেও যদি তাহার কোষ্ঠবদ্ধ অক্ষুধা প্রভৃতি না যায়, তাহা হইলে তাহাকে এক কি দুই চামচ ক্যাষ্টার অইল্ খাওয়াইয়া দিবে। ইহার পর ২।৩ দিন ধরিয়া দিবসে ২।৩ বার করিয়া ৬০ ফোটা আন্দাজ ফ্লুইড্ ম্যাগনেসিয়া নামক ঔষধ খাওয়াইতে থাকিবে। এরূপ করিলে সর্ব্বপ্রকার পেটের গোলযোগ বিদূরিত হইয়া যাইবে। শিশুদের পেট ফাঁপা রোগে, ডিল ওয়াটার (Dill water) খুব ভাল ঔষধ। দাঁত উঠিবার সময় শিশুকে খাঁটি দুধ না দিয়া জল-মিশ্রিত দুগ্ধের ব্যবস্থা করিবে—পেটের দোষ বিদূরিত হইলে, পরে খাঁটি দুধের ব্যবস্থা করিবে। এ সকল করিয়াও যদি শিশুর পেটের গোল না যায়, তাহা হইলে ডাক্তার ডাকা উচিত। দাঁতের মাড়ি একটু ছাড়াইয়া দিলে, অনেক সময় সকল উপসর্গ—এমন কি—জ্বর, তড়কা, অনিদ্রা প্রভৃতিও সঙ্গে সঙ্গে বিদূরিত হয়।

দুধে দাঁতগুলি উঠা শেষ হইলে, সেগুলিকে প্রতিদিন সকালে পরিষ্কার করা উচিত।

দাঁতের যত্ন

এ বিষয়ে অবহেলা করিলে দাঁতগুলিতে পোকা লাগে আর শিশু অকারণ যন্ত্রণা ভোগ করে। দুধে দাঁতের যত্ন না করিলে, স্থায়ী দাঁতগুলিও ভাল হয় না। এই কারণে ২ বৎসর বয়স হইতেই দাঁত মাজা উচিৎ। দু বৎসরের শিশু অবশ্য নিজে দাঁত মাজিতে পারে না। মাতা যেন নিজ হস্তে তাহার দাঁত মাজিয়া দেন। দাঁত মাজার জন্য একটা মাজন ও খুব নরম 'টুথ ব্রাসের' আবশ্যক। মাজন ঘরেই প্রস্তুত হইতে পারে ;—সম পরিমাণ প্রেসিপিটেটেড্ চক্ (precipitated chalk) ও ম্যাগনেশিয়া (magnesia) মিশ্রিত করিলে দিব্য মাজন হয়। ঔষধ দুইটি যে কোন ডাক্তার খানায় কিনিতে পাওয়া যায়। চারি বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুদের পক্ষে নিম্নের মাজনটি মন্দ নহে :—প্রেসিপিটেটেড্ চক্ (precipitated chalk) ৬ ড্রাম, ক্যাষ্টাইল সোপ (castile soap) ১০ গ্রেন, হেভি কার্ব্বনেট অব্ ম্যাগনেশিয়া (heavy carbonate of magnesia) ২ ড্রাম মিশ্রিত করিয়া লইবে। দাঁতের পক্ষে কর্পূর ভাল নহে, তাহাতে দাঁতের অনিষ্ট হয়। এই কারণে মাজনের সহিত কখনও কর্পূর মিশ্রিত করিতে নাই। নিম্ন বর্ণিত ভাবে শিশুর দাঁত মাজিয়া দিবে। প্রথমে জল দিয়া মুখ ধুয়াইয়া দিবে, তাহার পর বুরুষগাছি জলে ভিজাইয়া, উহাতে মাজনটি লাগাইয়া দাঁতের সামনের দিকটা মাজিয়া দিবে, পরে পিছনের দিক দিবে, তাহার পর মুখে জল দিয়া কুলী করাইবে। দাঁত মাজিতে ২ মিনিটের বেশী সময় দেওয়া উচিত নহে এবং ইহা অতি ধীরতা ও সাবধানতা পূর্ব্বক করিতে হয়।

যে সকল শিশু খুব বেশি মিষ্ট খায়, তাহাদের দাঁতে অতি শীঘ্র পোকা লাগে। পেট ভাল না থাকিলেও দাঁত ভাল থাকে না।

ছয় বৎসর বয়স হইতে দুধে দাঁত বাড়িতে আরম্ভ করে এবং তাহার স্থানে নূতন দাঁত উঠিতে থাকে। যে দাঁতটি পড়িবে, প্রথমে সেটি নড়িতে আরম্ভ করে—অনেক সময় এমন ঘটিতে দেখা যায় যে, নড়া দাঁতটি পড়িবার পূর্ব্বেই, তাহার পাশ দিয়া অথবা সম্মুখ দিয়া নূতন দাঁতটি বাহির হইয়া পড়ে ; এরূপ হইলে ডাক্তার দেখাইবে। দুধে দাঁত পোকা লাগিয়া নষ্ট হইলে, তাহার স্থানে যে নূতন দাঁতটি বাহির হয়, সেটিও যে "পোকাখেকো" হয়, তাহার কোন অর্থ নাই তবে বিশেষ যত্ন না করিলে, এ দাঁতটিতেও যে পোকা লাগে, এ কথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। দাঁতে পোকা লাগিলে, শিশু রাত্রে নিদ্রাবস্থায় অনেক সময় দাঁত কিড়্ মিড়্ করে। পেটে ক্রিমি হইলেও এমন করিতে পারে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগছি।

বঙ্গদেশে হিন্দুর জাতীয় হ্রাস

নিবারণের উপায়

বঙ্গদেশে হিন্দুর জাতীয় ক্ষয় যে একদিনে বা এক কারণে সঙ্ঘটিত হইতেছে তাহা নহে— সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে

ক্ষয়ের লক্ষণ।

দেখা যাইবে এই ক্ষয়ের লক্ষণ অতি পুরাকাল হইতেই জাতীয় জীবন আক্রমণ করিয়াছে এবং অশেষ কারণ পরম্পরা ইহার উৎপাদনে সহায়তা করিয়াছে।

যেমন রোগের প্রতীকার করিতে হইলে কেবল তাহার নিদান নির্ণয় করিলেই হয় না, কিন্তু সুস্থ প্রকৃতির তত্ত্ব

প্রতীকারের প্রণালী।

অবগত হওয়াও আবশ্যক, কারণ তাহা না হইলে রোগীকে প্রকৃতিস্থ করা সম্ভবপর হইবে না ; তেমনই হিন্দুর জাতীয় ক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে হিন্দুর জাতীয় পুষ্টির তথ্যও আয়ত্ত করিতে হইবে। হিন্দুগণ যে পুণ্যতম সিন্ধুদেশাধ্যুষিত মানবশ্রেষ্ঠ আর্য্যজাতির বংশধর 'হিন্দু' এই নামই তাহার পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু হিন্দুর জাতীয়

জীবনের মূল-প্রবাহ আর্য্যরক্তের ব্রহ্মসরোবর হইতে উৎপন্ন হইলেও, পবিত্র সুরধুনীস্রোতের ন্যায় ইহা ভারতের সমস্ত অনার্য্য-জীবনের উপনদী আত্মসাৎ করিয়া বিশাল কলেবরে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে ও ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি করিয়া ইহার সমস্তপ্রদেশ অপূর্ব্ব সভ্যতা, শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরবের ফুলফল-শস্যে হাস্যযুক্ত করিয়াছে।

হিন্দুর জাতীয় গঠন।

আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মিলন বন্ধন হইতেই হিন্দুজাতির উৎপত্তি হইয়াছে; এবং আর্য্যজাতির অনন্য-সাধারণ উদারতা দ্বারাই এই মিলনভাব প্রণোদিত হইয়াছে। আপনার উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য আর্য্য অনার্য্যকে * সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাকে বন্ধুভাবে ও ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে ও বন্ধন করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই; প্রত্যুত তাহার নিকট আপনার সমাজদ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের চণ্ডাল গুহক, বানর সুগ্রীব, রাক্ষস বিভীষণ প্রভৃতির সহিত মিত্রতা; অর্জ্জুনের উলুপী-পরিণয় ও ভীমের হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ ইহারই ইতিহাস প্রচার করিতেছে। অনার্য্যের মধ্যে আত্মপ্রসার করিয়া সমাজের বিস্তার ও বলবিধান আর্য্যদিগের অনার্য্য-সংস্রবের মূল-লক্ষ্য দেখা যায়। সমগ্রভারতে আর্য্যভাব সংক্রামিত করিবার জন্য আর্য্যগণ যেরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, অনার্য্যদিগকে উন্মূলিত করিবার জন্য তেমন ব্যগ্র হন নাই। অনার্য্যদিগের সহিত মিত্রতাবন্ধন ও সমাজবন্ধন করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের অঙ্গীভূত করতঃ এক অপূর্ব্ব একতাভাব স্থাপন করিয়া আর্য্যগণ কেবল যে আপনাদের লোকোত্তর উদারতারই পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু আপনাদের স্বাধিকার রক্ষার জন্য প্রকৃষ্টনীতিজ্ঞানেরও পরিচয় দিয়াছেন। আর্য্যগণ ধ্বংসনীতি অপেক্ষা রক্ষানীতিরই অধিক পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র চিরদিন সমাজকেই প্রাধান্য দিয়াছে, যথা মনু—"সাম্নাদানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্ বিজেতুম্ প্রযতেতারীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন।" সাম (শান্তি), দান (উৎকোচপ্রদান), আত্মবিরোধ উৎপাদন এই কয়েকটীর দ্বারা সমগ্রভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে শত্রুজয়ের চেষ্টা করিবে, কিন্তু যুদ্ধের দ্বারায় কখনও শত্রুজয়ের চেষ্টা করিবে না। এই সামনীতিকে মূলমন্ত্র করিয়া আর্য্য কেবল যে অনার্য্যদের দেশই জয় করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাহাদের মনোরাজ্যও জয় করিয়াছিলেন। তাহাতেই বহু শতাব্দী হইল হিন্দুর রাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলেও, নৈতিক সাম্রাজ্য এখনও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

যে সামকে আমরা হিন্দু সাম্রাজ্যের মূলনীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা একদিকে যেমন রাজনীতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে অপরদিকে তেমনই সমাজ-নীতিতেও প্রদর্শিত হইয়াছে। আর্য্যসমাজে বর্ণসঙ্করোৎপত্তিতে আমরা আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে প্রথম রক্ত-সম্বন্ধের ইতিহাস প্রাপ্ত হই। আর্য্যদিগের মধ্যে এই বর্ণসঙ্করদিগের স্থান ও অধিকার নির্দ্দেশ প্রভৃতিতে আমরা আর্য্যসমাজের সংস্কার দ্বারা নূতনসমাজ গঠনের মহান্ উদ্যোগ দেখিতে পাই। এই উদারভাব-প্রণোদিত নবগঠিত সমাজই হিন্দুজাতি নামে এখন আত্মপরিচয় দিয়া থাকে। সার উইলিয়াম্ হাণ্টার (Sir William Hunter) সম্পাদিত 'দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার' ('The Indian Empire)' নামক গ্রন্থে আমরা এই বিষয়ের এই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই :—

'ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধ এই সকল (বৌদ্ধ, জৈন) আন্দোলন, বর্দ্ধিষ্ণু আদিম জাতিসঙ্ঘ যে আর্য্যপ্রাধান্যবিস্তারের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাথমিক ধর্ম্মমতের সংস্কার সাধন করিল। ইহারই ফল বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম। ইহা কর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যূনাধিক বৈলক্ষণ্যযুক্ত হইয়া বর্ত্তমানে দেশের বিপুল প্রধান জনভাগেরই ধর্ম্মমত হইয়াছে।·····এই প্রকারে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের

* "প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উতশূদ্র উতার্য্যে।" অথর্ব্ববেদ সংহিতা। ১৯।৬২।১॥

সংস্কার চলিতে লাগিল এবং আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের বিকাশে এই আন্দোলনত্রয়ই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র।' *

যে সমস্ত উপকরণের উপচয়ে হিন্দুর জাতীয় গঠন দৃঢ় হইয়াছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে কি প্রকারে সে সকলের অপচয় দ্বারা তাহার শিথিলতা সঙ্ঘটিত হইতেছে তাহাই আমরা পর্য্যালোচনা করিব। বক্তব্য-বিষয়ের বৈশদ্য সম্পাদনার্থ আমাদের আলোচনা নিম্ন-নির্দ্দিষ্ট বিভাগক্রম অনুসরণ করিবে:—(১) বিবাহ ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা; (২) জাতিবিভাগ ও বর্ণবিভাগের মধ্যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিচ্ছেদ স্থাপন, (৩) বাল্য-বিবাহ প্রথার অনুচিতবিধি; (৪) বিধবা বিবাহের অনুচিত নিষেধ; (৫) পাশ্চাত্য বণিক জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় ব্যবসায়িক জাতির পরাভব, (৬) বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী সকলের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রে পরস্পরের অনধিকার প্রবেশ; (৭) রোগে মৃত্যু; (৮) অভাব হেতু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ; (৯) পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার দ্বারা হিন্দুধর্ম্মে অশ্রদ্ধা ও তাহা পরিত্যাগ; (১০) হিন্দুধর্ম্মপ্রচারের উদাসীনতা ও অনুদারতা; (১১) শাস্ত্রের সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত ব্যাখ্যা হেতু সম্প্রদায় ও জাত্যন্তরের সৃষ্টি।

ক্ষয়ের প্রকার ও প্রতীকারের উপায়।

(১) **বিবাহক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা**—পূর্ব্বে হিন্দুদিগের মধ্যে দ্বাদশ প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল। উচ্চবর্ণসকলের পক্ষে নিম্নবর্ণ সকল হইতে ইচ্ছানুরূপ স্ত্রীগ্রহণে কোন বাধা ছিল না। ইহারই জন্য "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" এই শাস্ত্রবাক্যটি প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে সমাজের উচ্চস্তরের সহিত নিম্নস্তরের ঘনিষ্ঠ সংস্রবের কিরূপ সুযোগ হইয়াছিল, ও পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপনের কিরূপ উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যগণ যে আপনাদের উচ্চবর্ণের সদ্গুণাবলী, উন্নত আদর্শ, উদার ভাবে স্বকীয় জাত্যন্তর্গত নিম্নশ্রেণীতে এবং আর্য্যেতর জাতির মধ্যেও সংক্রামিত করিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহারই বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

এবম্বিধ ব্যবস্থায় পূর্ব্বোক্ত নৈতিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উৎকর্ষও যে তুল্যরূপে সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্যবিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে। ক্রমবিকাশের মতের উদ্ভাবয়িতা মহামনীষী ডারুইন ক্রম বিকাশের একটী মূলসূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "প্রকৃতি স্বতঃজননবিমুখ" (Nature abhors self-fertilisation) অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী যৌনসম্বন্ধ অপেক্ষা দূরবর্ত্তী যৌনসম্বন্ধই ইঁহার মতে কেবল বংশবৃদ্ধির কারণ তাহা নহে, কিন্তু আকৃতি, প্রকৃতি, বল, পুষ্টি সমস্ত সমৃদ্ধিরই কারণ। যৌন সম্বন্ধ আবার উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট দুই প্রকারেরই হইতে পারে। দেখা যায় যে উৎকৃষ্ট ফল প্রসবের জন্য ক্ষেত্রের উৎকৃষ্টতা অপেক্ষা বীজের উৎকৃষ্টতাই অধিক প্রয়োজনীয়: সুতরাং উচ্চ-বর্ণের পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণের স্ত্রীর সংযোগেই হিন্দুর শাস্ত্রসম্মত বিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই শাস্ত্রবিহিত বিবাহপদ্ধতিই অনুলোম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত বিবাহপ্রথার উল্লেখও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইহা প্রতিলোম বিবাহ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু উহা প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। এবম্প্রকার বিবাহজাত সন্তান সকল হীনগুণসম্পন্ন হইয়া নিকৃষ্টবর্ণ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, শাস্ত্রে উভয় প্রকার বিবাহেরই

*These movements (Budhism and Jainism) in opposition to Brahmanism, combined with the extension of Aryan supremacy which involved the absorption of increasing masses of the aboriginal races, led to a modification of the primitive belief. The result of this was the Hinduism of the present day, which, with more or less variance of practice is now the creed of the vast majority of the people.................Thus the reform of Brahmanism went side by side with the growth of Budhism and Jainism and the three movements are but differing phases in the evolution of modern Hinduism.—The Indian Empire Vol I p 417.

উল্লেখ থাকায় আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে বিবাহ সম্বন্ধে তখন হিন্দু সমাজ যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করিত। এই স্বাধীনতা হেতু যে হিন্দুদিগের বিশেষ রূপে বংশ-বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি। এই সময়েই হিন্দুর জাতীয় জীবনে যেন অপূর্ব্ব বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে স্বদেশ প্লাবিত করিয়া বিদেশে পর্য্যন্ত হিন্দুর জনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। বর্দ্ধিষ্ণু জনসংখ্যা চতুর্দ্দিকে বসতি-বিস্তার ও অধিকার স্থাপনের দ্বারা স্বদেশে অত্যধিক জনতা নিবারিত করিয়াছিল। এই প্রকারে দেশদেশান্তরে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া হিন্দুর বিশাল জাতীয় জীবন, বিপুল লোক-বল, অতুলনীয় বিক্রম ও উন্নত সভ্যতার পরিচয় দিতে লাগিল। দুইজন বৈদেশিক ঐতিহাসিকের উক্তি হইতেই আমরা এই বিষয়ের প্রমাণ দিতেছি।

"ভারতবর্ষ অন্তর্ব্বিবাদ বশতঃ (যেমন বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী-দিগের নির্ব্বাসন), উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য না হইলেও ইহার ন্যায় ঘন বসতি-বিশিষ্ট ও স্থলবিশেষে অতিরিক্ত জনপূর্ণ দেশ উপনিবেশ-সন্নিবেশ ব্যতীত আর কোন্ উপায়ে অত্যধিক জনতার সমাবেশ করিতে পারিত?" *

"এখানে (অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তে) আমরা কেবল ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের শৈশব জীবনেরই অনুসন্ধান করিব তাহা নহে কিন্তু হিন্দুর উন্নত সভ্যতার বাল্যজীবনেরও অনুসন্ধান এই খানেই করিতে হইবে। এই সভ্যতা ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে ইথিওপিয়া, মিশর, ফিনিসিয়া, পূর্ব্বে শ্যাম, চীন, জাপান; দক্ষিণে লঙ্কা, যাবা, সুমাত্রা; উত্তরে পারস্য, কেল্‌ডিয়া, কল্‌কিস্ এবং তথা হইতে গ্রীস্, রোম ও পরি-শেষে উত্তরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।" †

সেই অনুলোম ও প্রতিলোমবিবাহ এত দীর্ঘকাল হইল বর্জ্জিত হইয়াছে যে শাস্ত্রে ও সাহিত্যেই মাত্র ইহা-দের স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে ‡। যে দিন হইতে বংশ-বৃদ্ধির অনুকূল পূর্ব্বোক্ত প্রথা রহিত হইয়াছে সেই দিন হইতেই হিন্দুর জাতীয় জীবনের পূর্ণ জোয়াড়ে ভাটা পড়িয়াছে। সেই দিন হইতেই হিন্দুর জাতীয় জীবনের স্রোত সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর খাতে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বের অসবর্ণ বিবাহ কেবল যে সবর্ণের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া আবদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, ইহার মধ্যেও আবার শ্রেণী (রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি) মেল, পালটীঘর (কুলীনদিগের) সম্প্রদায় প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র গণ্ডীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে বিবাহ-ক্ষেত্র বিশেষরূপে সীমা-বদ্ধ হওয়ায় বিবাহ-যোগ্য স্ত্রী পুরুষ সংখ্যার অনুপাতে সাতিশয় বৈষম্য হইয়াছে। কোথায়ও যেমন কুলীন-দিগের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হইয়াছে, ইতরজাতির মধ্যে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম হইয়াছে। প্রথম স্থলে বহুবিবাহ প্রচলিত হইয়াছে শেষোক্ত স্থলে বিবাহ-লোপ হইয়াছে। উভয় প্রকারেই সমাজের অমঙ্গল বই মঙ্গল হয় নাই; কারণ প্রথম স্থলে যথোচিত বংশবৃদ্ধির অন্তরায় ঘটিয়াছে, দ্বিতীয় স্থলে বংশ লোপ হইয়াছে। যেমন বিশাল জল-রাশির মধ্যেই বিপুলকায় জলজীবের উৎপত্তি হইয়া

---

* 'How could such a thickly-peopled and in some parts over-peopled country as India have disposed of her superabundant population except by planting colonies, even though intestine broils (witness the expulsion of the Baudhists) had not obliged her to have recourse to such an expedient."—Historical Researches by Heeren Vol II p 310.

† It is here (Aryavarta) we must seek not only for the cradle of the Brahmin religion, but for the cradle of the high civilisation of the Hindus, which gradually extended itself in the West to Ethiopia, to Egypt, to Phoenicia; in the East to Siam, to China and to Japan; in the South to Ceylon, to Java, and to Sumatra; in the North to Persia, to Chaldea, to Colchis, whence it came to Greece and to Rome and at length to the remote abode of the Hyperboreans.—"Theogony of the Hindus" by Count Bjornshjerne p 168.

‡ মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এখনও বিকৃতভাবে প্রাচীন অনু-লোম প্রথার প্রচলন দেখা যায় বটে। Peoples of India by H. H. Risley ২০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

থাকে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে ক্ষুদ্র ব্যতীত বৃহৎকায় জলজীবের সম্ভাবনা কখনও হইতে পারে না তেমন হিন্দুর এই সীমাবদ্ধ সমাজ জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্ফূর্ত্তি ও সমৃদ্ধি কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? এই প্রকারের বদ্ধজীবনের রুদ্ধবায়ুতে হিন্দুর জাতীয় বিকাশ যে প্রকৃতির নিয়মানুসারেই বাধাপ্রাপ্ত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয় ! পুরাকালের অসবর্ণ বিবাহ পুনঃ প্রচলিত হইতে না পারিলেও পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী, মেল, সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া বিবাহক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধি করা উচিত। দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সবর্ণদিগের মধ্যেও পরস্পর যৌন সম্বন্ধ প্রবর্ত্তিত হওয়া বিশেষরূপে বিধেয়।

(২) জাতিবিভাগ ও বর্ণবিভাগের মধ্যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিচ্ছেদ স্থাপন— পূর্ব্বোক্তরূপে যৌন-সম্বন্ধ-পরিধির সঙ্কোচন হওয়ায় কেবল যে এক জাতি বা বর্ণ অপর জাতি বা বর্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু একই জাতি বা বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন বংশও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। জাতি বা বর্ণ সকলের পরস্পর যৌন-সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহাদের মধ্যে স্বতঃই ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ব্যবধান ক্রমে২ বর্দ্ধিত হইয়া পান ভোজন-দর্শন-স্পর্শনে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে! এই প্রকারে যৌন-সম্বন্ধের সহিত অন্যান্য সংস্রব পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়া সমাজ শতধা ছিন্ন হইয়া দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গের সংযোগ না থাকায় সমাজ যেন পক্ষাঘাতে নিশ্চলভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। পক্ষাঘাত গ্রস্ত রোগীর সর্ব্বশরীরে সম্পূর্ণরূপে রক্তসঞ্চালন হইতে না পারায় যেমন তাহার পুষ্টি ও বল কখনই সম্ভাবিত নহে, তেমন হিন্দু সমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বা একই জাতির বিভিন্ন অংশে রক্ত সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হওয়ায় জাতীয় পুষ্টি ও বল অসম্ভাবিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, রক্ত সম্বন্ধের দ্বারা ঘনিষ্ঠতা হইতে যে একপ্রাণতা সঞ্জাত হয় সমাজে পূর্ব্ববর্ণিত ব্যবধানের দ্বারা তাহা নষ্ট ও তিরোহিত হইয়া সমাজ এখন নির্জ্জীব অসাড় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। 'হিন্দুর অনৈক্য' প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। পুনর্ব্বার জাতীয় সঞ্জীবতা সঞ্চারিত করিতে হইলে পান-ভোজন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবধানের কঠোর বিধি পরিহার করিয়া ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের উপায় দেখিতে হইবে। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রের প্রাচীন উদার অনুশাসন সকলের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। এই প্রকার বর্ত্তমান জাতীয় ব্যবধানের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভগ্ন হইলে তবেই সহানুভূতির মুক্তপ্রান্তরে সমগ্র জাতি মিলিত হইতে পারিবে।

(৩) বাল্যবিবাহের অনুচিতবিধি- সমাজে বিবাহের স্বাধীনতালোপ হইতেই বাল্যবিবাহ রূপ কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। মনুসংহিতায় বিবাহের বয়স সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে—"ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্॥" ত্রিংশৎ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া মনোরমা ভার্য্যা গ্রহণ করিবে। "কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি। নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।" 'ঋতুমতি হইয়া কন্যা চিরকাল গৃহে থাকাও ভাল তথাপি তাহাকে নির্গুণপাত্রে দান করিবে না।* কিন্তু তৎস্থলে আমরা অপ্রাপ্তবয়স্ক

* পালরাজদিগের সময়ে জাতিভেদের কঠোরতা অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। আর্য্য, শক, অনার্য্য সকলে একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সেনরাজদিগের আবির্ভাবে পুনরায় জাতিভেদ হিন্দুসমাজে দৃঢ়মূল হয় ও বাঙ্গালীর উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। "বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত"-পরেশ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ৩০২ পৃঃ॥

* সম্প্রতি মান্দ্রাজ হিন্দু এসোসিয়েন হইতে Marriage after Puberty according to Hindu Sastras, (হিন্দু শাস্ত্র সম্মত প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ) নামক একখানা পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অপ্রাপ্তবয়া কন্যার বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ না হইলেও, প্রাপ্তবয়া কন্যার বিবাহ সর্ব্বদাই অনুমোদিত হইয়া আসিয়াছে। Risley সাহেব তদীয় People of India নামক গ্রন্থের ১৮১ পৃঃ Nesfield সাহেবের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে বৈদিক সময়ে গান্ধর্ব্ব-

যুবার সহিত অষ্টবর্ষীয়া "গৌরী"দানের নিয়ম প্রচারিত করিয়াছি। এরূপ অপরিণত বয়সে বিবাহের অবশ্যম্ভাবী-ফল অপরিণত সন্তানলাভ। বিশেষরূপে বঙ্গদেশকেই এই প্রথা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইহার প্রভাবে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালী জাতির এরূপ অধোগতি ও ধ্বংস সাধিত হইয়াছে যে, নৌবলের দ্বারা দিগ্বিজয়ী রঘুর প্রতিপক্ষ, প্রবল পরাক্রমের দ্বারা সিংহল বিজয়ী, অসীমসাহসিকতার দ্বারা যাবা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপনকারী, প্রবল উদ্যমের দ্বারা সমুদ্রবাণিজ্যব্যবসায়ী বাঙ্গালী এক্ষণে ভীরু বাঙ্গালীতে পরিণত হইয়াছে। অকালমৃত্যু, ক্ষীণদেহ, ক্ষীণায়ু প্রভৃতি বাল্যবিবাহের নিত্যসহচর বঙ্গদেশে করালমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালীর বংশনাশের কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে, বাঙ্গালীকে উৎসন্নের পথে প্রেরণ করিতেছে। এই আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা হইতে হইলে, বাঙ্গালীর বিবাহ-প্রথার সংস্কার একান্ত আবশ্যক।* পূর্ব্বকার ১২ বৎসর ও ৩০ বৎসরের বয়োনিয়ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যেরূপ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের নিয়ম ছিল। সেরূপ শিক্ষাসমাপ্তির পূর্ব্বে বিবাহ হইতে না দিলে অভীষ্টফল লাভের অনেকটা সহায়তা হইতে পারে। সম্প্রতি মহীশুর ও বরদা রাজ্যে রাজকীয় বিধানের দ্বারা বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং ইতোমধ্যেই তাহার সুফলও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আমাদের মধ্যে অনুরূপ বিধান সামাজিক শাসনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রথা অনুকরণ করিলেও আমাদের ঈপ্সিত সংস্কার শাস্ত্র ও আচার উভয় রক্ষা করিয়া সহজেই সাধিত হইতে পারে। বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হইলেও বালিকা বয়ঃপ্রাপ্তা না হওয়া পর্য্যন্ত যদি পিতৃগৃহে রক্ষিত হয় এবং তাহাকে পতিসহবাস করিতে না দেওয়া যায়, তবেই কার্য্যতঃ তাহাতে বাল্যবিবাহের দোষস্পর্শ হইবে না অথচ যৌবন-বিবাহের ফলও লাভ হইবে। পক্ষান্তরে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যখন যুবতী বিবাহ দোষের বলিয়া বিবেচিত হয় না তখন সকলের পক্ষেই তাহা প্রচলিত হইতে বাধা কি? এই প্রকারে বাল্যবিবাহের সংস্কার হইলেই সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী সন্তান দ্বারা বংশরক্ষা হইয়া জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(৪) বিধবাবিবাহের অনুচিত নিষেধ—বাল্যবিবাহের বিষময় ফলেই বঙ্গগৃহসকল বালবিধবার বিষাদময়ী মূর্ত্তিতে অন্ধকার হইয়াছে। বিবাহের সংস্কার হইলে বাল-বিধবার সম্ভাবনা যেমন কমিয়া যাইবে বিধবার সংখ্যারও অনেক হ্রাস হইবে। বিবাহের পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য ধারণই অধিক প্রশংসিত হইয়াছে, কিন্তু বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে একেবারে অননুমোদিত * বা দেশাচারবিরুদ্ধ নহে। বংশরক্ষার জন্য স্বয়ং ব্যাসদেব কর্ত্তৃক বিধবাতে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, ও বিদুরের জন্মদান স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। "উৎকলে দেবরঃ-পতিঃ" ইহা সকলেরই সুবিদিত! হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের অনেক জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ সর্ব্বদাই প্রচলিত আছে। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতেপতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥" এই প্রসিদ্ধ পরাশর বচন ও অন্যান্য শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ

বিবাহেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে বালিকার অধিক বয়সে বিবাহ হওয়াই তদানীন্তন রীতি দেখা যায়॥

* People of India নামক গ্রন্থের ২০৮ পৃঃ Risley সাহেব লিখিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান বালিকার তুলনায়, যেখানে ৫ হইতে ১০ বৎসরের মুসলমান বালিকা শতকরায় ৭টী বিবাহিতা তৎস্থলে হিন্দু বালিকা শতকরা ১২টী বিবাহিতা ; সুতরাং বিবাহিতা অপ্রাপ্তবয়া হিন্দুবালিকার অনুপাতে মুসলমান বালিকার সংখ্যা প্রায় অধিক। •

* ঋগ্বেদের স্থলবিশেষ হইতে অনুমান করা যায় যে বৈদিক সময়ে বিধবার দেবরের সহিত তাহার পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত ছিল— People of India by Risley P 174.

শাস্ত্রসম্মত ইহাই তদীয় সিদ্ধান্তের সারমর্ম্ম। বিবাহের উদ্দেশ্য পুত্র লাভ 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'। যেখানে সেই পবিত্র উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই, সেখানেই যেন শাস্ত্র ও দেশাচার বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ অনুমোদন করিয়াছে, কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য অনুমোদন করে নাই। যখন বংশরক্ষার্থ উচ্চবর্ণের মধ্যেও বিধবার পত্যন্তরগ্রহণ অনুমোদিত হইয়াছে, তখন জাতিরক্ষার্থ নিম্নবর্ণের মধ্যে যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ উচ্চবর্ণের মধ্যে বর্ত্তমানে বিধবা-বিবাহ রহিত হইলেও ইতর জাতির মধ্যে এখনও আংশিকভাবে ইহার প্রচলন রহিয়াছে। বিবাহের পবিত্রতা ও সতীত্বের উচ্চ আদর্শ-রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াই হিন্দুসমাজ শাস্ত্রের স্পষ্টনির্দ্দেশ সত্ত্বেও প্রায় সর্ব্বশ্রেণীতেই বিধবা-বিবাহ একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে যে ব্যভিচারের দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা সমাজের অঙ্গে লিপ্ত হইবে তাহা তাঁহারা ভাবেন নাই। সুতরাং যাহাতে সামাজিক নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারিত হওয়ার সঙ্গে২ লোকবল বৃদ্ধি হইতে পারে তদ্রূপ ব্যবস্থা হইতে পারিলে, জাতিবিলোপকারী যথেচ্ছাচরিতাপোষক ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত। যাঁহারা ইহাতে জাতীয় নৈতিক অবনতির কারণ দেখিতে পান তাঁহাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, যে সকল সভ্য সমাজে বিধবা বিবাহ সাধারণবিধিরূপে প্রচলিত আছে, তথায়ও ইহার সহিত একটু হেয়তার ভাব সংযুক্ত থাকায় সম্ভ্রান্ত উচ্চ বংশীয়দিগের দ্বারা ইহা বহুস্থলেই উপেক্ষিত হইয়া থাকে। সেই সাধারণবিধির স্থলে আমাদের শাস্ত্রের বিশেষবিধি প্রবর্ত্তিত হইলে তাহার শাসন, হিন্দু বিবাহের পবিত্রতা বৈধব্য ব্রতের অধিক স্বার্থত্যাগ ও গৌরব প্রভৃতি দ্বারা হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরে বিধবা-বিবাহ এরূপ বিরলপ্রচার হইবে যে তাহাতে সমাজের উচ্চশ্রেণীতে পূর্ব্বাবস্থার অতি সামান্য পরিবর্ত্তনই সঙ্ঘটিত হইবে।* পরন্তু সেই পরিবর্ত্তনও অমঙ্গলের জন্য না হইয়া মঙ্গলের জন্যই হইবে। পক্ষান্তরে নিম্নশ্রেণী সকলে যেখানে শিক্ষা, দীক্ষা, বৈধব্য-ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল নহে, যেখানে প্রকৃতি বৈধব্যের কঠোরতা পালনের উপযুক্ত নহে, তথায় বিধবা-বিবাহের বহুলপ্রচার হইয়া সমাজের অধঃপতন নিবারণ করতঃ তাহা লোকবৃদ্ধির মূলীভূত হইবে। এই রূপে জাতীয় নৈতিক বল ও লোকবল উভয়ই একসঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্য-বিবাহের প্রচলন ও বিধবা বিবাহের অপ্রচলনে যে কিরূপ জাতীয় ক্ষয় হইতেছে ও মুসলমানদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহের অপ্রচলনে ও বিধবা-বিবাহের প্রচলনে যে কিরূপ লোকবৃদ্ধি হইতেছে তাহা আমরা গত লোক সংখ্যা গণনার পূর্ব্ব লোকসংখ্যাগণনার (Census) প্রধানাধ্যক্ষ ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রধান সচিব সুপণ্ডিত রিজলি সাহেবের মন্তব্য হইতে প্রতিপাদন করিব। তিনি তদীয় People of India নামক গ্রন্থের ২৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে "গত লোকসংখ্যাগণনার হিসাবে দেখা যায় যে, দশবৎসরব্যাপী দুর্ভিক্ষ সময়েও, যে স্থলে ভারতে মোট জনসংখ্যা শতকরা ৩ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তৎস্থলে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ৯ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য দেশের যে ভাগে মুসলমান জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্পতম তথায় দুর্ভিক্ষের উগ্রতা

* এ সম্বন্ধে বঙ্গের লেখকাগ্রণী বঙ্কিম বাবু তদীয় 'সাম্য' নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন 'যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না, যে সকল জাতির বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্র স্বভাবা রমণীরা বিধবা হইলে কদাপি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না'।

People of India নামক গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠায় রিজলি সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন যে মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহের বিধি থাকায় হিন্দু বিধবা সংখ্যায় তুলনায় মুসলমান বিধবা-সংখ্যার গড়পরতায় নিম্নরূপ পার্থক্য হইয়াছে; ১৫ হইতে ৫০ বৎসরের মুসলমান বিধবার সংখ্যা যেখানে শতকরা ১০ সে স্থলে হিন্দু বিধবার সংখ্যা শতকরা ১৪।

প্রকাশিত হওয়ায় অনুপাতে এরূপ বৈষম্য ঘটিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের যে উর্ব্বর ও সমৃদ্ধ প্রদেশ প্রকৃত দুর্ভিক্ষ স্পর্শও করিতে পারে নাই সেখানেও নির্দ্দিষ্ট আয়সম্পন্ন লোকসকলের মহার্ঘ্য বশতঃ কষ্ট হইলেও, মুসলমানদিগের লোকবৃদ্ধি শতকরা ১২৩ অর্থাৎ হিন্দুদিগের প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। শিশুদিগের অনুপাত প্রদর্শক সংখ্যাও এই কথাই বলে, এবং ইহাই প্রকাশ করে যে ভারতের এই অংশে মুসলমানগণ কেবল অধিক সাহসোদ্যোগসম্পন্ন ও তজ্জন্য তাহাদিগের হিন্দু প্রতিবেশীদিগের অপেক্ষা স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন তাহা নহে, কিন্তু ইহারা অধিক বংশবৃদ্ধিকারী ও সন্তান সম্বন্ধে অধিক যত্নশীল। ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য অধিক দূর যাইতে হয় না। মুসলমানদিগের খাদ্য অধিক পুষ্টিকর ও বৈচিত্র্যযুক্ত, ইহারা বাল্য-বিবাহ দিতে বাধ্য নয়, বালিকা শিশুর হত্যা করিবার জন্য ইহাদের কোন প্রলোভন নাই। ইহারা উপযুক্ত বয়সে কন্যার বিবাহ দেয়; সন্তান জনন-যোগ্যা স্বল্প স্ত্রীলোকই বিধবা হয়। মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারকগণের উপদেশে হিন্দু সমাজের অনুকরণে বিধবা-বিবাহ নিবারণ-প্রবৃত্তি উন্মূলিত হইতেছে এবং হিন্দু যুবতী-বিধবাকে যে সকল পরীক্ষা ও প্রলোভনে পড়িতে হয় মুসলমান বিধবারা তাহা হইতে অব্যাহতি পায়। হিন্দু বিধবা অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়া গর্ব্ভবতী হইলে তাহাকে গর্ব্ভপাত করিতে হয়, কিন্তু মুসলমান বিধবা গর্ব্ভবতী হইলে তদ্দ্বারা সে প্রণয়ীকে তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বর্ষায়।

মুক্ত বাতায়ন পাশে নিঃশব্দে একেলা বসি আজ
প্রকৃতি লো, হেরিতেছি তব ওই অপরূপ সাজ!
নিবিড় কুন্তলদাম স্তরে স্তরে দূর-নভ-বুকে
কি আনন্দে প্রেমময়ী, বিস্তারিয়া দিয়েছ কৌতুকে!
অলক-স্তবকে ওই উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক সমীরণ
আত্ম-হারা ক্রীড়াসক্ত ফুলদলে ভ্রমর যেমন!
মদির-পরশে তার রবি-শশী-গ্রহ-তারাগণ
যেন কি সুপ্তিতে ডুবি হেরিতেছে সুখের স্বপন!

সদা হাস্যময়ী অয়ি, আজি কি করেছ অভিমান—
অশ্রুসিক্ত চারু আঁখি—সুগম্ভীর সুস্মিত বয়ান!
প্রেমের পীযুষ-ধারা বিশুষ্ক হৃদয়ে বসুধার
কি মহা জীবনী-বন্যা অলক্ষিতে করিছে সঞ্চার!
নব কিশলয়ে আজি তব পূত শ্যামল অঞ্চল
শোভিতেছে—ঝলকিছে মণিমালা ফুল্ল ফুলফল!

চরণ-পঙ্কজ কার স্নেহভরে করিতে স্থাপন
শস্য-ক্ষেতে কি বিচিত্র শ্যাম-শয্যা করেছ রচন!
সমীরের মৃদু স্পর্শে গাঢ়তম প্রেম-আলিঙ্গনে
কি তরঙ্গ জেগে উঠে সাধ যথা মনুষ্য-জীবনে!
উচ্ছ্বসিত তটিনীর কল-স্বনে মিলাইয়ে তান
অয়ি বিশ্ব-মনোরমা, আজি তুমি কি গাইছ গান!

সারা অঙ্গে উথলিছে যৌবনের উদ্দাম লহরী
এ কার পূজার অর্ঘ্য অয়ি প্রিয়ে, অয়ি লো সুন্দরী!
এ কি লীলা, এ কি খেলা, বুঝিতে যে নাহি পারি কিছু,
সৌন্দর্য্য উথলি উঠে সৌন্দর্য্যের শুধু পিছু পিছু!
কি অদৃশ্য শক্তি বলে সমগ্র হৃদয়-মন মম
করিতেছে আকর্ষণ তব পানে আজি নিরুপম!

একান্ত তোমার করি এ বিশাল বসুন্ধরা মাঝ
বল, বল প্রাণময়ী, আমারে কি নিতে চাহ আজ!
এ দগ্ধ হৃদয়-জ্বালা—পরাণের তীব্র তুষানল—
ও অক্ষয় প্রেম দানে করিবে কি স্নিগ্ধ সুশীতল!
এ ব্যর্থ জীবনখানি আজি কিগো প্রেমভরে চুমি'
রচিবে কি চিরতরে সাফল্যের রম্য পীঠ-ভূমি!

এ ভগ্ন বীণায় মোর যে সুর ফুটেনি সাধনায়,
যে গীতি ছুটেনি কণ্ঠে বুকভরা শত আকাঙ্ক্ষায়,

সেই সুর, সেই গান, শিখাইয়ে আমারে কি আজ
ভাসাইবে অফুরন্ত আনন্দের অর্থসিদ্ধি মাঝ!
লও তবে, লও তবে, অর্পিতেছি তোমারে আমায়—
তোমারি হাতের যন্ত্র হব আমি আজি হতে হায়!
গন্ধ যথা ফুলদলে সংগোপনে রহে জড়াইয়া
তেমতি তোমার বক্ষে চিরদিন রব আমি প্রিয়া!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

নামিকো

নবম পরিচ্ছেদ

গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন।

তাকেও চলিয়া যাইবার পর নামির বড়ই একলা বোধ হইতে লাগিল, জুশির বাড়ীতে দিনগুলা যেন আর কাটে না। কোন প্রকারে সেখানে পাঁচ সপ্তাহ কাটাইল, অবশেষে গোধূম কাটা হইয়া গেল, পদ্ম ফোটার সময় আসিল! শরীরের অবস্থায় কিছুকালের জন্য সে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে চিকিৎসক অভয় দেওয়ায় শীঘ্রই আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সম্প্রতি হাকোদাতে হইতে স্বামীর একখানি পত্র পাইয়া সে আশ্বস্ত হইয়াছে। চিকিৎসকের উপদেশ মত সারিয়া উঠিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে তাকেওর প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করিয়া রহিল। গত কয়েক দিন যাবৎ কিন্তু তোকিওর সহিত সকল যোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, বাড়ী হইতে পিতামাতার চিঠি বা ঈদামাচি হইতে মাসীমাতার কোন চিঠি আসে নাই।

সময় কাটাইবার জন্যে সে একটা ফুলদানিতে বন্য পদ্ম সাজাইতেছিল। পরিচারিকা জল লইয়া প্রবেশ করিলে তাহাকে কহিল, "আচ্ছা ইকু চিঠি আসবে না কেন বল্ দেখি?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "হয়ত তাঁরা সবাই ভালো আছেন, লেখবার মত কিছু নেই। শীগ্‌গিরই চিঠি পাবে'খন! হয়ত আজই সকালে কেউ এসে পড়বে। বাঃ চমৎকার ফুল! আহা এগুলো শুকিয়ে যাবার আগে কর্ত্তা যদি ফিরতেন!"

নামি হস্তস্থিত পদ্মগুলির দিকে চাহিয়া কহিল, "চমৎকার নয়? আমার কিন্তু মনে হয় এগুলি যেখানে ছিল, সেখানেই থাকতে দেওয়া ভালো। এমনি ক'রে কেটে ফেলা ভারি নিষ্ঠুর বলে বোধ হয়।"

এমন সময়ে বাড়ীর ফটকাভিমুখে কুরুমা আসার শব্দ শোনা গেল। ভায়কাউণ্টেস কাতো আসিতেছিলেন। বিধবা কাওয়াশিমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিবার পর দিন তাঁহার ভাবনা হওয়াতে তিনি কাতাওকার বাড়ী গিয়াছিলেন। সেখানে বিস্ময়ের সহিত শুনিলেন যে ইতিপূর্ব্বেই কাওয়াশিমার দূত আসিয়া জেনারলের সম্মতি লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে! তাকেওর প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার মতলবটি ব্যর্থ হইয়া গেল! শুধু তাহাই নয়, ব্যাপারটা তাঁহার আয়ত্তের এত বাহিরে চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি যারপরনাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উপায় যখন নাই, তখন তিনি জুশিতে গিয়া বোনঝির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে লইয়া আসা মনস্থ করিলেন; কারণ নামির পিতা ভাবিতে ছিলেন যে বাড়ী হইতে এত দূরে এ সংবাদ শুনিয়া নামি বড়ই বিচলিত হইবে। "এই যে মাসীমা এসেচ, বড় খুসী হলুম তোমায় দেখে। এখুনি তোমার কথা হচ্ছিল।"

ইকু নামির দিকে ফিরিয়া কহিল, "দেখলেন ত ঠাকরুণ, ইকুর কথাই ঠিক?"

"কেমন আছ মা নামি? সেবারের পর আর বিশেষ কিছু হয়নি ত?" তিনি মুখ তুলিয়া নামির মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না।

নামি কহিল, "না কিছু না, ধন্যবাদ। আমি সেরে উঠচি। তুমি কেমন আছ মাসীমা? তোমায় ত ভালো দেখাচ্ছে না।"

"আমি? আমার মাথা ধরেচে। যে সময় পড়েচে! সম্প্রতি তাকেওর চিঠি পেয়েছ না কি?"

"হ্যাঁ পরশু তিনি হাকোদাতে থেকে লিখেচেন। শীগ্‌গিরই ফিরবেন। না, আসবার দিন এখনো ঠিক হয় নি। আমার জন্যে কিছু আনবেন, লিখেচেন।" কাতোগৃহিণী কহিলেন, "তাই নাকি? এখন আর কেন, দেরী হয়ে গেছে—ছ'টা বেজেছে, না?"

নামি জিজ্ঞাসা করিল, "এত তাড়াতাড়ি কেন? বসুন, জিরুন ভালো ক'রে। ওচিজুসান কেমন আছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সে তোমায় ভালোবাসা জানিয়েছে।" এই কথা বলিয়া তাহার মাসীমা ইকুর নিকট হইতে এক পেয়ালা চা লইলেন, কিন্তু এতই অন্যমনা যে উহা পান করিতে ভুলিয়া গেলেন।

ইকু কহিল, "কোনো রকম সঙ্কোচ করবেন না এখানে। আপনার জন্যে ভালো মাছ নিয়ে আসি।"

"হ্যাঁ আন।"

মাসীমার যেন ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন, মুহূর্ত্তকাল নামির মুখপানে চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন।

"না, না এনো না। আজ আমার সময় নেই। নামিসান তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।" "আমাকে? কোথায়?" নামি বিস্মিত হইয়া গেল। "হ্যাঁ, ডাক্তারের পরামর্শে তোমার বাবা তোমায় দেখতে চান। তোমার শাশুড়ীও সম্মত আছেন।" "তিনি আমায় দেখতে চান? কেন?"

"এই ত বললুম তোমার অসুখের জন্যে। আর তোমার বাবা, তিনি তোমায় অনেকদিন দেখেন নি কি না।"

"তাই না কি?"

নামি সন্দেহের ভাব প্রকাশ করিল, ইকুও তাহাই করিল। ইকু কহিল, "আজ সন্ধ্যাবেলা ত এখানে থাকচেন?" "না, তা পারি না। ডাক্তার বসে আছেন কি না, অন্ধকার হবার আগেই যাওয়া ভালো। এর পরের গাড়িতেই যেতে হবে।"

"তাই নাকি!"

বৃদ্ধা ইকু বিস্মিত হইয়া গেল। নামিও ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু মাসীমা সংবাদ আনিয়াছেন, পিতা তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, শাশুড়ী ঠাকরুণও এ আহ্বানের বিষয় অবগত আছেন। সে আর জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া যাত্রার আয়োজনে লাগিয়া গেল।

"মাসীমা এত জবচ কি? 'না'শর' যাবার কোনো দরকার নেই, আমি ত শীগ্‌গিরই ফিরব।"

মাসীমা আসন ত্যাগ করিয়া নামিকে কাপড় পরাইতে পরাইতে কহিলেন, "ওকে সঙ্গে নাও; দরকার হবে।"

চারিটার সময় ফটকে তিনখানি কুরুমা উপস্থিত। তখনি তাঁহারা সকলে বাহিরে আসিলেন। নামির পরিধানে রূপালি ধূসর বর্ণের হালকা ক্রেপের পরিচ্ছদ, আসমানি রঙের সাটিনের একটি কোমরবন্ধ ও দক্ষিণ হস্তে একটি ছোট ছাতা। কাশিতে কাশিতে রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিয়া সে কহিল, "তা হলে ইকু আমি চল্লুম দিনকতকের জন্যে। সেখান থেকে এসেচি সে আজ ত কম দিন হল না। ঐ যে পোশাকটা আমি তৈরি করছিলুম—সেটা একটুখানি এখনো বাকি আছে। যাক, আমি ফিরে এসে নিজেই তৈরি করব এখন। তিনি ফেরবার আগে নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যাবে।"

মাসীমা ছাতায় মুখ ঢাকিলেন। চোখে অশ্রু নামিয়া আসিয়াছিল।

অদৃষ্টের গহ্বর আমাদের আগমনের প্রতীক্ষায় সদাই সংগোপনে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। অতর্কিতে আমরা ইহার মধ্যে গিয়া পড়ি, এড়াইবার শক্তি নাই। কিন্তু যখন নিকটে আসি তখন একটা অবর্ণনীয় ভীতি আমাদের হৃদয়ের মাঝে শীতের কম্পন জাগাইয়া তোলে।

মাসীমার প্রতি বিশ্বাসবশতঃ এবং পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রশ্ন না করিয়াই নামি বাটী যাত্রা করিয়াছিল। কুরুমায় চড়িয়াই তাহার অন্তঃকরণ অজানা আশঙ্কায় ধুক্ ধুক্

করিতে লাগিল। নিজের অবস্থার বিষয় যতই চিন্তা করে ততই যেন কিছুরই কূলকিনারা করিতে পারে না। মাসীমার বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ জন্মিল। ট্রেনের মধ্যেও তাহার মনের ভার লাঘব হইল না। শিন-বাশি ষ্টেসনে যখন সে পৌঁছিল, তখন তাহার মন অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার ভারে এত পীড়িত যে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর গৃহ প্রত্যাগমনের আনন্দ সে একরকম ভুলিয়াই গেল।

ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া সেবিকার স্কন্ধে ভর দিয়া লোকের ভিড় চলিয়া গেলে নামি ধীরে ধীরে মাসীমাতার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। ফটক পার হইবার সময় দেখে নিকটেই একজন সামরিক কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া, সে কথা কহিতেছিল, হঠাৎ নামির দিকে ফেরাতে তাহার সহিত চোখোচোখি হইল। সে চিজিওয়া, নামির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সে ইচ্ছাপূর্ব্বক টুপি খুলিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। সে চাহনি ও হাসি নামির হৃদয়ে একটা অননুভূতপূর্ব্ব কম্পন জাগাইয়া তুলিল, সে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাহার শীত বোধ হইতে লাগিল। সে শীত তাহার পীড়াহেতু নহে,—গাড়ীতে চড়িবার বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত এ শীত তাহাকে ছাড়িল না।

মাসীমাতা কথা কহিলেন না, নামিও স্তব্ধ হইয়া রহিল। গাড়ীর জানালায় যে সন্ধ্যাসূর্য্য রশ্মিপাত করিতেছিল, তাহাও অস্তাচলে ডুবিয়া গেল। গোধূলির সময় তাহারা কাতাওকার বাড়ী পৌঁছিল। চেসনট ফুলের মৃদু সুরভিতে বাতাস আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। ফটকের নিকট ঘোটবোঝাই গাড়ী, পার্শ্বের একটি অলিন্দে উজ্জল আলো জ্বলিতেছিল। ভিতরে কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল। সমস্ত দৃশ্যটা দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন কেহ স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। এসব ব্যাপারের অর্থ কি ভাবিতে ভাবিতে নামি মাসীমাতা ও সেবিকার সাহায্যে গাড়ি হইতে অবতরণ করিতেই কাতাওকাগৃহিণী তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারে আবির্ভূত হইলেন। কহিলেন, "এই যে, এত শীগ্‌গির! আপনাকে কষ্ট দিলুম।"

কাতাওকাগৃহিণীর চোখ দুটি নামির মুখ হইতে সরিয়া গিয়া কাতো-গৃহিণীর মুখের উপর রক্ষিত হইল।

নামি জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ মা? বাবা কোথায়"?

কাতাওকাগৃহিণী সংক্ষেপে উত্তর দিলেন "তিনি পড়বার ঘরে রয়েছেন।"

সেই মুহূর্ত্তে শোনা গেল, নামির ছোট ভাই বোন সানন্দে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। মাতার নিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহারা নামির দিকে ছুটিয়া আসিল। তাহাদের পশ্চাতে কোমাও বাহির হইয়া আসিল।

"এই যে মীচান কীচান; কেমন আছে তোমরা? আর এই যে কোমাচান্!"

ভগ্নীর আস্তীন ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে মিচি কহিল, "আমার খুব আমোদ হচ্ছে। এবার থেকে বরাবর তুমি কেমন আমাদের সঙ্গে এখানে থাকবে! তোমার জিনিসপত্তর সব এসে গেছে।"

শিশুটিকে চুপ করিতে বলিবার সাহস কাহারো হইল না। বিমাতা, মাসীমা, কোমা ও পরিচারিকাগণ সকলেরই দৃষ্টি নামির মুখের উপর স্থাপিত হইল।

"কি?"

নামি বিস্মিত হইয়াছিল। বিমাতার ও মাসীমার মুখের উপর চোখ বুলাইয়া অবশেষে অলিন্দের পাশে একটা ঘরে জড়ো করা জিনিসগুলির উপর চোখ পড়িল। সে বাড়ীতে যে সব আয়না, দেরাজ, পোশাকের বাক্স প্রভৃতি রাখিয়া আসিয়াছিল নিঃসন্দেহ সেগুলিই জড় করা রহিয়াছে!

নামির সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, পড়িতে পড়িতে সে মাসীমাতার হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ফেলিল। সকলেই কাঁদিতে লাগিল।

গুরু পদশব্দ শোনা গেল, এইবার পিতা আসিলেন।

"বাবা!"

"এস মা, তোমায় দেখবার জন্যে বড় ব্যাকুল

হয়েছিলুম।” জেনারল নামির ক্ষীণ কম্পিত তনু নিজ বিশাল বক্ষে টানিয়া লইলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইয়াছে, বাড়ী নিঃস্তব্ধ। জেনারলের পাঠাগারে দুটি লোক—পিতাপুত্রী। যে দিন নামি আর কখনো ফিরিবে না মনে করিয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, ও যে দিন সে পিতার শেষ উপদেশ শুনিতেছিল, সে দিন যেমন আজও তেমনি অবস্থা তাহাদের—কন্যা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পিতার জানুর উপর মাথা রাখিয়া রোদন করিতেছিল ও পিতা রোরুদ্যমানা কন্যার মস্তকে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

তাকেও ও তাহার মাতা।

“খবর! খবর! কোরিয়ার খবর!”—চীৎকার করিতে করিতে কাগজওয়ালা ছোকরা ঘণ্টা বাজাইয়া চলিয়া গেল। তারপরেই দেখা গেল কাওয়াশিমার বাড়ীর দ্বারে একখানি কুরুমা আসিয়া দাঁড়াইল। তাকেও বাড়ী ফিরিল।

তাহার অনুপস্থিতিকালে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা যখন তাকেও জানিতে পারিবে, তখন সে যে ক্রুদ্ধ হইবে এ কথা বিধবা জানিত। কিন্তু তরবারির আঘাত যে প্রথমে করে তাহারই জিত হয়; তাই সুখবরটা য়্যামাকি যে দিন আনিল সেই দিনই অবিলম্বে তিনি নামির যা, কিছু জিনিসপত্র সমস্তই কাতাওকার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। মনে হইল কাজটা একটু নিষ্ঠুর হইতেছে; কিন্তু একটা হেস্তনেস্ত না হইলে চলে না—তাই কাজটা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন, পরের দুই তিন দিন বেশ মনের আনন্দেই ছিলেন। এদিকে ভৃত্যেরা স্বভাবতঃই তরুণ দম্পতীর পক্ষালম্বন করিয়াছিল। তাহারা এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়া গেল ও তাকেও প্রত্যাবর্ত্তন করিলে একটা বিষম কাণ্ড হইবে আশঙ্কা করিতে লাগিল। এমন সময় তাকেও ফিরিয়া আসিল। কাতো গৃহিণী তাহাকে তাড়াতাড়ি যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তা ফিরিবার পথে সে পায় নাই, মাতা তো পত্রে এ বিষয়ের কোনো উল্লেখই করেন নাই। সেই হেতু প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞই রহিল ও য়োকোসুকা পৌঁছিয়া প্রথম সুযোগেই বাড়ী চলিয়া আসিল।

বৈঠকখানার দিক হইতে জনৈক পরিচারিকা আসিয়া চা প্রস্তুত করিতে রত অন্য একজন পরিচারিকাকে কহিল—“ওলো মাচ্চান্ শুনছিস্! বাবুকে দেখে ত বোধ হয় না তিনি ব্যাপারটার কিছু জানেন। আহা! গিন্নীর জন্যে উপহার পর্য্যন্ত এনেছেন।”

মাৎসু সবিস্ময়ে কহিল—“তাই নাকি! ছেলেকে না জানিয়ে বউকে ত্যাগ করে এমন মা কি পিরথিমিতে আছে গা? রোস্নে না দেখবে'খন বাবু কত রাগ করেন। মাগী যেন ডাইনী!”

পরিচারিকা কহিল—নিশ্চয়ই। আমি ত বাপু জন্মে কখনো এমন খিটখিটে, কিপ্টে, অবুঝ মেয়েমানুষ দেখি নি। আমাদের খুব বকতে পারে, নিজে কিন্তু জানে না কিছুই। সাৎসুমার একটা গরীব চাষার মেয়ে বইত নয়! সাত জন্ম এমন জায়গায় থাকতে নেই।”

“আচ্ছা বাবুর বউকে যে ত্যাগ করা হয়েছে সে কথা বুঝতে বাবুর এত দেরীই বা হচ্ছে কেন?”

“সেতো আর আশ্চর্য্যি নয়, উনি কোন্ মুলুকে ছিলেন একবার ভাব্ না। মা যে ছেলেকে জিজ্ঞেস না করে সামান্য একটা চাকরাণীর মত বউকে খেদিয়ে দেবে, এ কথা আর কে ভাবতে পারে বল্? আর বাবুও ছেলে মানুষ বইত নয়! ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়, কিন্তু ওর স্ত্রীর জন্যে হয় আরো। তাঁর কি দুঃখু—ঐ যে! বুড়ী চেঁচাতে আরম্ভ করেচে। কাজে মন দে মাচ্চান্, কাজে মন দে! নইলে মরবি বকুনি খেয়ে।”

ভিতরের একটা ঘরে বিধবা ও তাহার পুত্রের কণ্ঠস্বর উত্তরোত্তর উচ্চে উঠিতেছিল।

তাকেও বলিতেছিল—“কিন্তু তুমি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমি ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে ব'লে। তা তুমি আমায় একবার লিখলে না পর্য্যন্ত, নিজের মতঅবে

সব মেরে বসে আছ। আমি এ সহ্য করতে পারবো না। এখানে আসবার সময় জুশিতে নেমেছিলুম, নামিকে দেখতে না পেয়ে ইকুকে জিজ্ঞেস করলুম। সে বল্লে কার্য্যগতিকে নামিকে তোকিও যেতে হয়েছে। তখনি কেমন আশ্চর্য্য ঠেকেছিল. কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তুমি—এসব ভারি বাড়াবাড়ি।”

বিধবা কহিল—“ভুল হয়েছিল, মাপ চাইচি। আমি, নামিকে যে পছন্দ করি না তা তো নয়, তবে তোমায় ভালোবাসি ভাই—”

“তুমি সদাই কেবল আমার কথা ভাবছ” কিন্তু সম্মান, সুনাম বা হৃদয়ের দিকে তোমার কোনো দৃষ্টিই নেই।”

“তাকেও! তুই পুরুষ না মেয়ে? এখনো তুই ভাবছিস নামির কথা, আমি যে তোর মা হয়ে নিজকে এতটা ছোট করলুম সে কথা ভাবা নেই।”

তাকেও কহিল—“কিন্তু তুমি যা করেছ তা সহ্য করা যায় না।”

“যাই হোক, এখন আর উপায় নেই। ওঁরা সম্মত হয়েছেন, সব পাকাপাকি স্থির হয়ে গেছে। এখন আর তুমি কি করবে বল? বলে রাখচি, না ভেবে চিন্তে যদি কিছু করে বস, তো কেবল তোমার মার লজ্জা নয়, তোমারও।”

তাকেও স্থির হইয়া শুনিতেছিল, সে ক্রোধে অধর দংশন করিল। সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুগ্না পত্নীর জন্য যে আপেলের চুবড়ি আনিয়াছিল তাহা আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কহিল,—“মা, তুমি নামিকেও মারলে আর আমাকেও মারলে তার সঙ্গে। তোমার আমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না।”

তৎক্ষণাৎ তাকেও য়োকোসুকায় তাহার যুদ্ধজাহাজে ফিরিয়া গেল।

কোরিয়ার ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া ওঠাতে জুলাই মাসের মাঝামাঝি চীনের বিরুদ্ধে জাপান সমর ঘোষণা করিল। সেই মাসের আঠারই তারিখে তাকেওর যুদ্ধজাহাজ মাৎসুশিমা সাসেবোতে অন্যান্য যুদ্ধজাহাজের সহিত সম্মিলিত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইল। ব্যর্থ নিরানন্দ জীবন বহন করা অপেক্ষা গোলার আঘাতে মৃত্যু বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া তাকেও তৎক্ষণাৎ কার্য্য গ্রহণ করিয়া পশ্চিমে যাত্রা করিল।

জেনারল কাতাওকা অবিলম্বে তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারির এক নিভৃত কোণে নামির জন্য ছোটখাট একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন ও বৃদ্ধা ইকুকে জুশি হইতে আনাইয়া তাঁহাকে কন্যার সহিত থাকিতে আদেশ দিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি রাজ কার্য্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং নামিকে সস্নেহে পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তেরই তারিখে হিরোশিমায় সামরিক বিভাগের সদর আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পর মাসে জেনারল ওয়ামা, য়্যামাজি প্রভৃতির সহিত জাহাজে লায়োটাং যাত্রা করিলেন।

এ পর্য্যন্ত আমরা যাহাদের বৃত্তান্ত অনুসরণ করিয়া আসিলাম তাহাদের সকল সুখদুঃখ দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কিছু-কালের জন্য চীন-জাপান যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিপুল জাতীয় আন্দোলনে ঢাকা পড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীহেমনলিনী রায়।

টুনটুনি *

টুনটুনি ক্ষুদ্র পাখী। একটা হাঁসের ডিমের অপেক্ষা বড় নহে। মাথা ও লেজ বাদ দিলে টুনি পক্ষী হাঁসের ডিম অপেক্ষা বড় ত হইবেই না; বরং একটু আধটু ছোট হইতে পারে।

টুনটুনি আমরা এ পর্য্যন্ত তিন শ্রেণীর দেখিয়াছি। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর টুনি অপেক্ষাকৃত একটু বড়। ইহাদের পালকের বর্ণ ধূসর। ডানা দুইটী ক্ষুদ্র এবং মজবুত। ডানার পালকের ভিতরের দিক ঈষৎ সাদা।

* “গায়ক পাখী”

টুন্‌টুনির গায়ের রঙ্গ মেটে সাদা মিশানো ধূসর বর্ণ। ইহাদের ডানা অনধিক ২ ইঞ্চি লম্বা। পেটের তলদেশের বর্ণ ঈষৎ সাদা—উপরের বর্ণ গায়ের বর্ণের অনুরূপ। পা দুইটী সরু—কাঠির মত। হাঁটুর নীচের রং মেটে এবং উপরের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকে বেষ্টিত। পায়ের নখগুলি বাঁকানো এবং ধারাল। আঙ্গুলের পর্ব্বগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে টুন্‌টুনি অতি সরু ডালও জড়াইয়া ধরিয়া তাহার উপর নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে।

টুনটুনির লেজ, তাহার দেহায়তনের অনুপাতে একটু বেশী দীর্ঘ বোধ হয়। অন্যান্য পাখীর লেজ সাধারণতঃ শরীরের সহিত ক্রমনিম্ন হইয়া পশ্চাদ্দিকে প্রসারিত থাকে; কিন্তু টুনি ক্ষুদ্র পাখী হইলেও সে লেজ খাড়া রাখে। কিম্বদন্তী এই, যে টুনি পক্ষী কাহাকেও বড় বলিয়া মনে করে না, তাই সে লেজ খাড়া করিয়া নির্ভীক ভাবে বিচরণ করে। ইহা নাকি বিজয়চিহ্ন!

টুন্‌টুনির মাথা গোল, চক্ষু দুটী ক্ষুদ্র কিন্তু বড়ই উজ্জ্বল। চক্ষুর উভয় পার্শ্বে শ্বেতমিশ্রিত পীতাভ দুইটী প্রায় অস্পষ্ট রেখা আছে। মাথার নিম্নদেশ এবং গলা মেটে সাদা। ঠোঁট ক্ষুদ্র কিন্তু শক্ত, সূক্ষ্মাগ্র এবং ধারাল পার্শ্ববিশিষ্ট।

ক্ষুদ্র হইলেও টুন্‌টুনির সাহস খুব বেশী। ইহাদের বাসার নিকট কোন মানুষ বা পক্ষী আসিলেই ইহারা অনবরত এখানে সেখানে উড়িয়া বেড়ায় এবং কেবল টক্‌টক্ করিয়া জালাতন করে। অনেক সময় ইহাতে বিরক্তিই জন্মে।

মাঝারি জাতীয় টুনী ঈষৎ কপিল বর্ণের, ইহাদের ঠোঁট একটু বেশী লম্বা। সর্ব্বাপেক্ষা ছোট জাতীয় টুনী আর বড় টুনীর মধ্যে আকৃতি প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য নাই। তিন জাতীয় টুনীরই বাসার ধারে গেলে অসঙ্গত রকম গালাগালি করিয়া থাকে। ইহাদের ডালে ডালে ঘুরিবার ভঙ্গি, চক্ষুর ভঙ্গি এবং ক্রোধপ্রকাশক স্বর বাস্তবিকই একটু উপভোগ্য বটে।

টুন্‌টুনি ঘরের কানাচে, ঝোপের মধ্যে, গোয়ালের পাশে বাসা নির্ম্মাণ করে। তুলা, সুতা, পালক প্রভৃতিই ইহাদের বাসা নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ। এজন্য আমাদের দেশে ইহারা "সুতাটুনী" নামে অভিহিত। টুনী কোনও ঝুলান সরু রজ্জু বা ডালে আপন বাসা বুনিয়া রাখে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলি এলোমেলো পালক বা সুতা বা পাট ঝুলিতেছে। বাসার এই বাহ্যাবয়ব টুনীর স্বেচ্ছাকৃত, কেবল শত্রুর মনে ধোকা দিবার ফন্দী মাত্র। বাসার ভিতরের অবস্থা অতি চমৎকার। এমন মোলায়েম এবং উত্তমরূপে পালিস করা যে দেখিলে তারিফ না করিয়া পারা যায় না।

এই বাসায় ফাল্গুন মাসে টুনী এক জোড়া ডিম পাড়ে। কখন কখন তিনটী ডিমও পাড়িতে দেখা যায়। ডিমটি কুলের বীচি অপেক্ষা বড় নহে। উহার বর্ণ সাদা তাহাতে নীল রঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁটা দেওয়া আছে। মাতা ডিমের উপর পড়িয়া ডিমে তা দেয়। পুরুষ টুনী খাবারের যোগাড় করে এবং বাসা পাহাড়া দেয়। বিপদাশঙ্কা হওয়ামাত্র যখন পুরুষ টুনী টক্‌টক্ আরম্ভ করে, তখনই মাদী টুনী নিমেষ মধ্যে বাহিরে আসিয়া রণরঙ্গিণীমূর্ত্তিতে স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়ায়। এমন ভাবে ইহাদের বাসা নির্ম্মিত, যে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া ডিম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নাই।

১০।১৫ দিন তা দিবার পর ডিম ফুটিয়া ছোট ছোট ছানা বাহির হয়। ছানাগুলি মাথা ও উদর সর্ব্বস্ব। বাবা মায়ের পাহারা ও যত্নে লালিত পালিত হইয়া বৈশাখ মাস মধ্যেই টুনী পক্ষীর শাবক উড়িতে শিখে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে উড়িতে না শিখিলে টুনী শাবককে লোকচক্ষুর গোচরীভূত করে না। কেবল ঝোপে ঝোপে লইয়া বেড়ায়।

ইহাদের ডিম্ব ও শাবকের প্রধান শত্রু ক্ষুদ্র পিপীলিকা। বাসা প্রস্তুত করিতে ইহারা কখন কখন ক্ষুদ্র পালক ব্যবহার করে। ঐ সকল পালকের ক্ষুদ্র মূলে যদি তৈলবৎ পদার্থ তখনও সঞ্চিত থাকে, তবেই পিপীলিকা টুনির বাসায় খাদ্যসংগ্রহ জন্য গমন করিয়া থাকে।

পিপীলিকার সারি টুনির বাসায় পৌঁছিয়া যদি ডিমের বা ছোট শাবকের সন্ধান পায় তবে তাহাদের যথেষ্ট লাভই হয়। কিন্তু পিপীলিকার জাঙ্গাল টুনির বাসা আক্রমণ করিবার পূর্ব্বাহ্নে যদি উহা টুনি জানিতে পারে, তবে পিপীলিকা শ্রেণী তাহাদেরই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে।

যৌন-সম্মিলনের সময় উপস্থিত হইলে স্ত্রীটুনি ঝোপের অন্তরালে অন্তরালে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর এক প্রকার কর্কশ ধ্বনি করিতে থাকে। পুরুষ টুনিও তাহার পাছে পাছে ঘুরিয়া মধুর শীস্ দিতে থাকে। এই সময় টুনির শীস্ সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। উভয়েই উদ্দাম বাসনার স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, কিন্তু কেহই—অন্ততঃ স্ত্রী-টুনি আপনাকে খাটো করিতে চাহি না। সুধু বিহঙ্গম কেন, বোধ হয় জীব-জগৎই এই নিয়মে পরিচালিত।

টুনি অন্য পাখীর সঙ্গে মিশিতে বড় ভালবাসে না। অনেক সময়ই যেন বিরলে থাকা তাহার বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

টুনি গাছে গাছে ডালে ডালে ঘুরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা ও মাকড় ভক্ষণ করে। কাহাকেও বেশী ভয় করা উহার অভ্যাস নাই। এমন কি কখন কখন মানুষের ২।১ হাত ব্যবধানে বসিয়াও টুনি নির্ভয়ে গালাগালি করিতে থাকে।

টুনি পাখী ৮।১০ বৎসর বাঁচে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ একই বাসায় (অবশ্য প্রত্যেক বৎসর সেই বাসার লোপ হয় এবং পর বৎসর সেই স্থানেই স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া নুতন বাসা নির্ম্মাণ করিয়া) যেন এক জোড়া টুনিকে ৬।৭ বৎসর ধরিয়া ডিম পাড়িতে দেখিয়াছি। এবার দেখিলাম, বেচারী টুনির লেজের ও ডানার পালক স্থানে স্থানে খসিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহারা বৃদ্ধ হইয়া শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

টুনি পক্ষীকে ৩০।৪০ হাতের উপরে উড়িতে দেখি নাই। অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ পাখীর আক্রমণের আশঙ্কাই ইহাদিগের ঊর্দ্ধ গগনে বিচরণের প্রতিবন্ধকতা জন্মায় কিনা কে জানে?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নিরাশা

"গাছে মাঠে সোনা ঢেলে কে গেছে চ'লে?—
আধ ফোটা কমলেরে কে গেছে দ'লে।
গগনের দিকে দিকে কার তরে ঝাঁকে ঝাঁকে,
পাখীরা চলেছে ডেকে, কে দিবে ব'লে!"

২

ভগ্নশাখ বটমূলে একটি বালা
নীরবে গাঁথিতেছিল বকুল মালা।
দূরে দুটি কচি ছেলে ঝড়া ফুল তুলে তুলে
হেসে নেচে দুলে দুলে করিছে খেলা;
কল্ কলে নদীজলে গিয়াছে বেলা।

৩

খেয়া ল'য়ে মাঝ গাঙে যায় পাটনী;
পার ঘেসে যায় ভেসে কার তরণী!
দলে দলে ধীরে ধীরে কলসী ভরিয়া নীরে
হাসিয়া চলেছে ফিরে কার ঘরণী?
খেয়া ল'য়ে পর পারে গেছে পাটনী।

৪

"কেউ নাই? তবে কেন এ মালা গাঁথা?
জুড়াইবে কার ইহা হৃদয়-ব্যথা!"
"নাহি জানি।—তবু তাই মালা গেঁথে সুখ পাই
আর মোর কাজ নাই জীবনে হেথা।
আমি শুধু রব বসে ল'য়ে এ গাঁথা!"

৫

"ওই শুন কোথা হ'তে কে ডাকে কারে!
কত কাল রব আর বিজনপারে?
বাতাসের গায়ে মিশে আঁধার আসিছে ভেসে
পূরবী উঠেছে বেজে রাজার দ্বারে;
এ কথা কি কেউ বোন বলেনি তারে!"

৬

"থাক ভাই তার কথা আর তুল না;
আমার সাধের মালা ছিঁড়ে ফেল না।
এই বটতরুতলে, যদি কেহ এসে বলে,
'সে গেছে কোথায় চলে' কিছু বল না।
আমারে না ডেকে তারে মালা দিও না।"

৭

এই ক'য়ে মালা থু'য়ে নীরবে ধীরে
সাঁঝের আঁধারে বালা নামিল নীরে!
বসে সেই তরুতলে ভাই দুটি আঁখিজলে
বোনেরে ডাকিয়া বলে "এস গো ফিরে!"—
কেউ নাই! সে ডুবেছে আঁধার নীরে।

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জ্জাতিক কর্ম্মক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা *

বিষয়কর্ম্মরত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ আন্তর্জ্জাতিক একতা ও শান্তির উদার আদর্শকে কেবল কল্পনার সামগ্রী মনে করিয়া থাকেন। ইতিহাস মানবজাতিকে জাতীয় জীবনের উৎকর্ষের মধ্যেই মানবীয় সভ্যতার পূর্ণ পরিণতির ধারণা করিতে প্রবৃত্ত রাখিয়াছে। জাতীয় স্বাতন্ত্র্য সত্য সত্যই মানব প্রকৃতির মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং এই স্বাতন্ত্র্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে; সুতরাং সার্ব্বজাতিক সম্মিলনের কল্পনার সহিত প্রকৃত কর্ম্মের সুদৃঢ় সম্বন্ধ নাই। তথাপি এই মহতী আশার কল্পনায়, এই উচ্চ আদর্শের প্রেরণায় আন্তর্জ্জাতিক দ্বন্দ্ববিরোধের কঠোরতা সাধারণ সময়ে কিয়ৎ পরিমাণেও হ্রাস পাইতে পারে। কিন্তু এমন কি যাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধস্থাপন কার্য্যে আহূত হন, তাঁহারাও এই বিশ্বশান্তির কল্পনাকে "আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র" বলিয়া বিবেচনা করেন; "ইহার আলোক আমাদিগকে চিরকাল সম্মুখে চালিত করিবে মাত্র, কিন্তু আমরা কখনও ইহার সামীপ্যলাভে সমর্থ হইব না।" এইরূপ নিশ্চেষ্ট উৎসাহ যে কর্ম্মিগণের মধ্যে কখনও কখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহাদের প্রকৃতির শিক্ষালব্ধ স্থিতিশীলতা ইহার একটী কারণ। এই স্থিতিশীলতা সময়ে সময়ে পদৈকমাত্র অগ্রসর হইতে প্রেরণা দিতে পারে বটে, কিন্তু কখনও আদর্শের দিকে বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক ধাবিত হইবার শক্তি প্রদান করে না। আদর্শ তাঁহাদের হৃদয়প্রসূত হইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ মাত্র তাঁহারা ইহার দিকে সতর্ক ও সন্দেহযুক্ত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন।

এইরূপ হইবার বিশেষ কারণ এই যে, অতীত কালে এই শান্তির আদর্শ কবি-কল্পনায় এবং মবজগতের ভ্রমাত্মক ভবিষ্য ভাষণায় পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার সহিত জীবন্ত সত্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদে নির্দ্ধারিত মানবদের কাল্পনিক ও ব্যবহারিক সংস্কারসাধনোদ্দেশ্যে প্রভাবিত হইয়া এই আদর্শ অনুমান করিয়া লইয়াছিল যে, মনুষ্য জাতি আবহমান জীবনের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের গণ্ডীভেদে সমর্থ; তাহারা চিন্তাশীল বলিয়া এই বিশ্বব্যাপী সম্মিলনে প্রত্যক্ষভাবে প্রণোদিত হইয়াছে। উপরে বিশ্ব-সাম্রাজ্য, নিম্নে বিবেকবান্ মানব, এবং উভয়ের মধ্যস্থলে শান্তিসৌধধারণের নিমিত্ত অদম্য উৎসাহ! মানবের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে মহাকর্ম্মের উদার আহ্বানে তাহার নিভৃত হৃদয়কন্দরনিহিত শক্তি জাগ্রত ও উন্মাদিত হইয়া উঠে। কিন্তু জন্মগত বিধি-সংস্কার ও প্রচলন-প্রতিষ্ঠানের পাশ ছিন্ন করিয়া জীবনের সর্ব্ববিধ অবস্থাকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতে হইলে কেবল সহজ বুদ্ধির সাহায্যে উদার ও উন্নত চিন্তাকে গ্রহণ

* অনুমত্যনুসারে অধ্যাপক Paul S. Reinsch এর "The New Internationalism" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে।

করিয়া লইলে চলিবে না। বিবিধ পরিবর্ত্তন ও বিচিত্র শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়াসকে বিপুল ও বেগবান করিয়া তুলিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে সার্ব্বরাষ্ট্রীয় একতাস্থাপনের জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে গঠনশক্তির অভাব ছিল এবং যে সকল সম্বন্ধ, শক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকিয়া মানবের গ্রাম্য ও জাতীয় জীবন উন্মেষিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে, সেগুলিকে মানবজীবনের এই নূতন ভিত্তি নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতে অপসারিত ও অবজ্ঞাত করা হইয়াছিল। নিজকে বিশুদ্ধ যুক্তিপূর্ণ আদর্শের উচ্চভূমির উপর স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখিবার শক্তি মানবের মধ্যে স্থির ও একাগ্র হইয়া উঠে নাই; ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীভেদ করিয়া সভ্যতার উদার আদর্শ লাভ করিতে হইলে তাহাকে আনুষ্ঠানিক বাস্তব জীবনের বহু অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া গমন করিতে হইবে।

অদূর অতীতের আন্তর্জাতিক ও সার্ব্বরাষ্ট্রীয় শান্তি স্থাপনের প্রয়াসের সহিত আধুনিক বিশ্বশান্তিস্থাপনের আন্দোলনের তুলনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে বর্ত্তমান যুগের ধ্যানধারণা বাস্তবতা ও কর্ম্মমূলক, এবং সুদৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মহান আদর্শ আকাশকুসুম নহে; ইহা নির্ম্মল সৌন্দর্য্যমণ্ডিত অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ। মানবজীবনের বিপুল বিস্তার ও ঘনজটিলতার বিচার করিলে আমাদের উপলব্ধি হয় যে অতীতের আয়াসোদ্ভূত স্থানীয় ও জাতীয় বিবিধ সভাসম্মিলনগুলির মূল্য আছে, ইহাদিগকে অম্লানবদনে জীর্ণ অকর্ম্মণ্য পদার্থের গলিতস্তূপে নিক্ষেপ করিয়া দিতে পারি না। ইহারা নবযুগের মতামত ও কল্পনা-গবেষণার অপেক্ষা না করিয়া বিভিন্ন আকারে জীবনগ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং, আমাদিগকে ইহাদের সারবত্তা স্বীকার করিতেই হইবে এবং এইরূপে কেন্দ্রীভূত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তিপুঞ্জকে মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনার্থে নূতন নূতন আকার প্রদান করিতে হইবে। যে আদর্শে মানবকল্যাণ সংগ্রামে উদ্দীপিত না হইয়া জড়তাযুক্ত থাকে, যে আদর্শ মানবচিত্তকে স্বদেশপ্রেমে সিক্ত করে না, তাহাকে স্বীয় সমাজের কল্যাণচিন্তায় পরাঙ্মুখ রাখে, সেই শূন্যগর্ভ আদর্শ কখনও মানবকে আপন সমাজের কেন্দ্রানুগ শক্তির প্রভাব ছাড়াইয়া বিশাল বিশ্বকর্ম্মক্ষেত্রে ধাবিত হইবার সামর্থ্য প্রদান করিবে না।

আমরা সম্মিলিতভাবে কর্ম্মসাধনের এমন এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছি, যে উহার পরিধি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বসমবায়ে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কেবল কল্পনায় আমাদের আদর্শের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শক্তি ক্ষয় না করিয়া এখন আমরা মানবের বিবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে ইহাকে নানামূর্ত্তিতে আকারিত করিবার পন্থান্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছি। বিশ্ব-সমবায়ের বিস্তৃতি-সাধনই বর্ত্তমানে মানবজাতির সমগ্র চিন্তা অধিকার করিয়াছে এবং ইহাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা দ্বারা মানবজীবনের সত্য সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিবে। আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপকে জল্পনা কল্পনার ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া আনিয়া মানবজীবনের সত্যাংশরূপে দাঁড় করাইবার জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত আয়োজন অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপে ব্যক্তি ও জাতি, জাতি ও মানবসমাজের মধ্যস্থ ব্যবধান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে।

সর্ব্বরাষ্ট্রীয় একতা যে সত্যমূলক, বর্ত্তমানযুগে এই ধারণা ক্রমশঃ দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। দূরবর্ত্তী দেশসমূহের মধ্যে নানাপ্রকারে নৈকট্য বিধান করা হইতেছে। অর্থবিজ্ঞান ও রাজস্বনীতি ভূনিহিত ধনরত্নোদ্ধারের পথ উত্তরোত্তর সরল করিয়া দিতেছে। বাষ্পীয় শকট, অর্ণবপোত ও তড়িৎবার্ত্তাবহ মানবসমাজের বিবিধ সংবাদ অত্যল্প কালমধ্যে দেশবিদেশে প্রচার করিয়া মানবজাতির মনোরাজ্যে একতার ভাব বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে। একই রাজনৈতিক নাট্যাভিনয় [illegible] কৌতূহল উদ্দীপিত করে, একই রাষ্ট্রীয় বিপদ [illegible] সমবেদনা আকর্ষণ করে, একই বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় সকলে আনন্দিত হয় এবং পৃথিবীর একটী [illegible]

আমাদের সকলের চিন্তা ও আলোচনার বিষয়ীভূত হন। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের সুখদুঃখ আমাদিগকেও তরঙ্গায়িত করে। যদি কোনও বৃহৎ জাতীয় বিপদ ও যুদ্ধবিগ্রহে এই সকল দূরবর্ত্তী মানবসমাজ প্রপীড়িত হয়, তবে আমরাও উহার অংশগ্রহণে দুঃস্থ জাতির সহায়তায় চেষ্টিত হই। যে শিল্প, কলা ও সভ্যতা মানবজীবনকে সুখময় করিয়া তুলে, উহাদের এমন কোনও উন্নতি সাধিত হইতে পারে না যাহাতে আমরাও ফলভাগী হই না। বিজ্ঞানের বিচারে জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর অস্তিত্ব লোপ পায়। বার্লিন, রোম অথবা পারিসে কোনও নবজ্ঞানের আবিষ্কার হইলে, অমনি তাহা সমগ্র পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ভুবনের অংশভূত হয়।

সমগ্র জগতের কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং সমগ্র মানবজাতির সমবেত শ্রমের লভ্যাংশে প্রত্যেক জাতির অধিকার থাকিবে—ইহাই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ। সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের এই নব ব্যবস্থায় জাতীয় জীবনের বিকাশের পথ রুদ্ধ হইবে না, অথচ মানবজাতির সাধারণ কর্ম্মগুলি উচ্চতর শক্তি ও আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বিশ্ব-শান্তির পথ সরল ও সুগম করিয়া দিবে। কারণ, যৌথকর্ম্মই সমাজ ও জীবনের মুক্তিদ্বারস্বরূপ। ব্যক্তি ও জাতি কোনটাই স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ নহে এবং মানবজীবন আরও বিস্তারবিশিষ্ট। ব্যক্তির ও জাতির জীবন চারিদিকে উদারতর স্বার্থ ও বিশালতর কর্ম্ম-রাশিতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বিবিধ অভাবের পূরণ করিয়া জীবনকে পুষ্ট ও পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে, ব্যক্তি ও জাতিকে এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে অভিনিক্রমণ করিতে হইবে। ব্যক্তি যেমন সমাজের নিকট হইতে আশ্রয় ও উদ্দীপনা প্রাপ্ত হয়, জাতিও তদ্রূপ বিশ্বসংসারের সম্বন্ধ হইতে নিজের জাতীয় জীবন বিস্তারের বহু সুবিধা পাইয়া থাকে। সার্ব্বরাষ্ট্রীয়তা সংস্থাপনের কল্পনা এখন আর আকাশকুসুম নহে; উহা এক্ষণে বিশ্ব ব্যাপিয়া বহু সংখ্যক সভা ও সম্মেলনে প্রকাশমান। এই সকল অনুষ্ঠানও কেবল মানব-জীবনের বিচিত্রগতি ও উদ্দেশ্যের আলোচনা ও নির্দ্ধারণ জন্য মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। এই সমস্ত সম্মিলনী সাময়িক উন্মাদনার অস্থায়ী ফলমাত্র নহে, পরন্ত ধর্ম্মাধিকরণ ও নিয়মব্যবস্থাপক সমিতিরূপে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

এই সকল সার্ব্বরাষ্ট্রীয় সঙ্ঘসমূহের মধ্যে শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে অনেকগুলি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটীতে কার্য্য পরি-চালনার্থে স্থায়ী ব্যবস্থান রহিয়াছে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের রাজশক্তিও সার্ব্বরাষ্ট্রীয় সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছে। বিচ্ছিন্ন শক্তিসমূহের দ্বারা যে উদ্যম সংরক্ষিত ও সংবর্দ্ধিত হইতে পারে না, মিলিত শক্তির দ্বারা উত্তরোত্তর তাহার পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত বিভিন্ন রাজশক্তি বদ্ধপরিকর হইয়াছে। যুক্তরাজ্যান্তর্গত খণ্ডরাজ্যসমূহের দ্বারা সম্প্রতি পঁয়তাল্লিশটি সার্ব্বরাষ্ট্রীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ত্রিশটি সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক কেন্দ্র আছে। সংবাদ ও অন্যান্য বিষয়ের নিরাপদে ও স্বল্পসময়ে আদানপ্রদান করিবার উদ্দেশ্যে সার্ব্বরাষ্ট্রীয় মিলনের প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং এই আন্দোলন বিশ্বের সকল জাতির মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হওয়া স্বাভাবিক, এবং উহার সাধনভূত ডাকঘর তড়িৎ-বার্ত্তাবহ ও লৌহবর্ত্ম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এই আন্দোলনের প্রভাববিস্তার ও উপযুক্ত প্রণালীর অবলম্বনও স্বাভাবিক।

কোন রাজ্যই অন্য রাজশক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে দেশ মধ্যে সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি রোধ বা বিদ্রোহ দমন করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্ররক্ষা ও সার্ব্বজাতিক স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত বিশ্বমহামিলনের স্থাপন আবশ্যক। শ্রমজীবী ও শিল্পিগণের অবস্থার স্থায়িত্ব সাধন করিতে হইলে শিল্পক্ষেত্রের উন্নতি বিধান করিবার নিমিত্ত জগতের বিভিন্ন রাজ্যসমূহের সম্মিলিত চেষ্টা ও একই অর্থনৈতিক ও শ্রমতাত্ত্বিক প্রণালীর অনুধাবন আবশ্যক হইবে। এইরূপ উন্নতিকল্পে সার্ব্বরাষ্ট্রীয় কৃষিভাণ্ডার ও

শ্রমবিধানসমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে; এবং অর্থনীতির বিষয়ে বিশ্বসম্মিলনের সূত্রসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যও বহুসংখ্যক সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। একাধিক জাতির সম্মিলিত চেষ্টায় ইহারা অংশতঃ পরিচালিত হয়। এই সকল জীবন্ত আন্দোলন যে এই যুগে প্রয়োজনীয় উহা নির্দ্দেশ করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সকল ব্যাপারের নিয়ামক শক্তিকে বারেক হৃদয়ঙ্গম করিলেই স্বতঃই আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, বিশ্বতান্ত্রিকতার আন্দোলন আর কাল্পনিক নহে; ইহা এক্ষণে সুপ্রতিষ্ঠ কর্ম্মরূপে প্রকাশমান। সার্ব্বরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ক্রমফলস্বরূপ, এবং পরোক্ষভাবে মানবপ্রকৃতির ভাবপুঞ্জপরিচালিত; সেই জন্যই ইহাদের স্থাপনে মানবহৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে মানবজীবনের প্রয়োজনসমূহ উদ্ঘাটিত হইতেছে ও তত্তুষ্টিসাধনের নিমিত্ত আমাদিগকে প্রবৃত্তি প্রদান করিতেছে।

আধুনিক রাজশক্তিবিশেষ যেমন তদন্তর্গত নগর ও প্রদেশসমূহের এবং তদিতর রাজশক্তিসমূহের স্বায়ত্তশাসনক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় তত্ত্ব শ্রদ্ধেয় হয় ও সীমাবদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে আখ্যাত হইয়া থাকে। জাতীয় কার্য্যকারিতার ভিন্ন ভিন্ন উদ্যমে যে বিশ্বের সমবায় বাঞ্ছনীয়, তাহা সকল জাতির নিকটই সুপ্রকাশ। কেবলমাত্র জাতীয় আত্মপোষকতাই স্বাধীনতাজ্ঞাপক নহে; কিম্বা অপরাপর জাতির সাহায্য ব্যতীত স্বেচ্ছানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বরাজস্থাপনকেও আমরা স্বাধীনতাসূচক বলিয়া গ্রহণ করিব না। এরূপ ক্ষমতা বিধিব্যবস্থার পরিচালনে বা ভবিষ্যদ্দর্শীর স্বাধীন চিন্তায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে বটে, পরন্তু ঐরূপ স্বাধীনতা অসৎ। বিশ্বসমবায়েই বর্ত্তমান যুগের সৎস্বাধীনতা অস্তিত্ব ধারণ করিবে। যদি কোন জাতি আপনাকে বিশ্বের আলিঙ্গন হইতে দূরে রাখিয়া স্বীয় স্বাধীনতা-গর্ব্বে [illegible] জগতের বর্ণধর্ম্মের নিয়মানুসারে এরূপ জাতি বাস্তবিক আত্মস্বাধীনতার মূলেই কুঠারাঘাত করিবে। বিশ্বস্থ অপরাপর জাতিকে উপেক্ষা করিয়া কোনও জাতিরই আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। এইরূপে ইহা সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে যে আত্মসংস্থাপনও পরনির্ভরশীল। আন্তর্জাতিকতা এই পরস্পর অধীনতারই প্রকাশ মাত্র; এবং এতদর্থে বর্ত্তমানকালের মহান্দোলন পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিকের সহিত সংযোগবিধানের পরিচায়ক। গত দশ বৎসরে বিভিন্ন রাজশক্তির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ও যৌথকর্ম্মাদির সদিচ্ছা পরিলক্ষিত হইতেছে। বাস্তবিকই তাহা অনুধাবন করিলে চিত্ত আকৃষ্ট হয়। অতীত কালের সম্মিলন একমাত্র সমরাগ্নির লোলজিহ্বায় শান্তিবারি প্রদানার্থ বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল; ভবিষ্যতে ইহা অধিকাংশ লোকেরই চিন্তাকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে শান্তিরাজ্য সংস্থাপন করিবে। এই বিশ্বসমবায়ের কল্পনা সত্য সত্যই ভাবোদ্দীপক ও মঙ্গলময়। এই মহাপ্রসাদলাভের নিমিত্ত কত লক্ষ লোক নীরবকর্ম্মে জীবনাতিপাত করিতেছে। কর্ম্মজীবনের এই নীরবতাই মহামিলনের সৌন্দর্য্য ও শক্তি অধিকতর প্রকাশিত করে। এই কর্ম্মপ্রবৃত্তি কোন বাহুশক্তি বা দম্ভ্য জগতের অত্যুচ্চ যুক্তিবাদ দ্বারা চালিত নহে—ইহা মানবহৃদয়ের স্বতঃপ্রসূত উচ্ছ্বাস। হৃদয়গঙ্গার এই উচ্ছ্বাসবারি আজ বিশ্বাভিষেকের নিমিত্ত শতধা প্রবহমাণা।

যে যুগে এই মহান্দোলন চলিতেছে সেই যুগেই আবার সামরিক উন্মত্ততার লীলাখেলা দৃষ্ট হয়, ইহা আশ্চর্য্যজনক হইলেও অস্বাভাবিক নয়। জাপানের সম্রাট একটি কবিতায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "বর্ত্তমান যুগে আমরা পরস্পর সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করি, তবে কেন আবার আত্মবিপ্লবের করাল মূর্ত্তি দেখা যায়?" বাহ্যতঃ এই বৈষম্য থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার অস্তিত্ব নাই। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও কর্ম্মানুষ্ঠানই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ। নব নব চিন্তা ও কর্ম্মে ইহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই আদর্শ শক্তি-

হীন তামসিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে না; চারিত্র্য, শক্তি ও কর্ম্মসাধনই ইহার প্রধান লক্ষণ। ইহারই গতি অনুসারে জগৎ জাতিসংরক্ষণার্থ সংগ্রামের উৎকট লাঞ্ছনা ভোগ করে আবার ইহারই গতিক্রমে মহামিলনের পীযূষও পান করে। আধুনিক জগতে পৌরাণিক শান্তিবাদ, দুর্ব্বলদিগেরই প্রিয়। পৌরাণিক স্বাচ্ছন্দ্যবাদ, শান্তিবাদ, শস্ত্রহীনতা ও অসামরিকতা কর্ম্মহীনতার লক্ষণ; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের মিশ্রিত কর্ম্মের আহ্বানই উক্ত আদর্শসমূহের প্রসূতি। অতএব এই সৃষ্টিবিধায়িনী শক্তির সাহায্যে শোণিতলোলুপ, ধ্বংসকারী সভ্যতার ভাব মানবহৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য আমাদের সকলকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

পরস্পরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাই জাতিবিশেষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। মানবভ্রাতৃগণের অধর্ম্মাচরণ, স্বেচ্ছাচারিতা, নীতিভ্রষ্টতা, নির্দ্দয়তা এক কথায় সভ্যতা-বৈরিতার দ্বারা উত্তেজিত না হইলে আমরা কিরূপে তাহাদের প্রাণবধের ভীষণ কল্পনার প্রশ্রয় দিতে পারি? কিন্তু একজন বণিক ভিন্নদেশীয় বণিকের সহিত শিল্পবাণিজ্যের আলোচনা কালে, একজন চিকিৎসক সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে দেশরক্ষার জন্য ভিন্নদেশীয় চিকিৎসকগণের সহিত পরামর্শ অথবা এক জন বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানরত ভিন্নদেশীয় বৈজ্ঞানিকগণের সহিত ভাবের আদানপ্রদানকালে ঐ সকল নৃশংস ধারণাকে মনোমধ্যে স্থান দিতে পারে কি? যদি পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এরূপ যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা মানব জীবন কলুষিত ও নির্য্যাতিত হইবেই। কিন্তু বিশ্বকে সুখ ও শান্তির আগার করিয়া তুলিবার জন্য আমরা যাহাদের সহিত মিলিতভাবে কার্য্য করিতেছি তাহাদের নির্য্যাতনমূলে কোনও সদভিপ্রায় বিদ্যমান থাকিতে পারে না।

পৌরাণিক শান্তিবাদের মধ্যে মানবের প্রকৃত কর্ম্ম ও শক্তির স্থান ছিল না। এই নীতি অনুসারে যুদ্ধবিগ্রহাদি অসৎ বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইত এবং সম্মুখ সংগ্রামই ইহাদের নিরাকরণের একমাত্র পন্থাস্বরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছিল। কিন্তু যে অবস্থায় জাতীয় ও স্থানীয় স্বার্থকে অতি উচ্চে স্থান দেওয়া হয়, যুদ্ধবিগ্রহ সেই অবস্থারই বাহ্য লক্ষণ মাত্র। জাতীয় বিদ্বেষের সৃষ্টিবিধায়ক ও সংগ্রামের প্রবর্ত্তক অবস্থারাশির উন্নতিসাধন অথবা অপনয়ন করিতে হইলে মানব জাতির মধ্যে সার্ব্বরাষ্ট্রীয়তার বোধ সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু এই বোধসঞ্চার শূন্যতা ও শক্তিহীনতার মধ্যে হইতে পারে না। ইহার মূলে সার্ব্বজাতিক স্বার্থ ও ভাবের ঐক্যের ক্রমোন্নতি থাকা প্রয়োজন। জীবনের প্রকৃত কর্ম্মপ্রয়োজনে আমাদিগকে পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবেই। মানবজীবনের বিবিধ প্রয়োজন সাধনার্থে সার্ব্বরাষ্ট্রীয় বিচিত্র কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের গঠনে এই ঐক্যবোধের বাহ্য প্রকাশ হয়। অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে এইরূপ একতাবর্দ্ধক কতিপয় প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে দেখা দিয়াছে এবং ইহাদের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতই সাম্যের ভাব পুষ্ট ও বিশ্বমানবত্বের বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে, যুদ্ধবিগ্রহের ভীষণতা ততই শান্ত হইয়া আসিতেছে। এই সকল মঙ্গলময় শক্তি, সম্বন্ধ ও কর্ম্মের বিরুদ্ধ কল্পনা করিতেই বিশেষ কষ্ট হয়। আমাদের এই সুখময়ী কল্পনার দ্বিবিধ গতি সম্ভব। হয় এই একত্বের বন্ধন কালক্রমে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া এমন এক অবস্থায় পৌঁছিবে যে কোন জাতিরই এই বন্ধনপাশ ছিন্ন করিবার শক্তি থাকিবে না, আর যদি নিতান্তই বিগ্রহের নিবৃত্তি না হয়, তবুও একত্ববন্ধনের ফলে উহার করালতার ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে।

বিশ্বসমবায় আদর্শের ফলনকাল ভবিষ্যতের গর্ভে। পৃথিবী এরূপ কর্ম্ম ও অবস্থারাশিতে পূর্ণ যে কোন জাতিই স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই কর্ম্ম ও অবস্থারাশির মধ্যে থাকিয়া আমরা স্বভাবতঃই জাতীয়তার সীমার বহির্দ্দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হই। যে জাতি বিচ্ছিন্নতার মধ্যে স্বাধীনতাসুখ প্রত্যাশা করিবে

তাহাকে সমগ্র মানবজাতির সমভোগ্য সাধারণ সভ্যতার সুফল হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবেই। ব্যক্তি যেমন স্বকীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া নিজের শক্তিপুঞ্জকে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট করিয়া তুলে, জাতিও তেমনি পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া স্বীয় জাতীয় জীবনকে বিবিধ প্রকারে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। যে পথে চলিলে মানবজাতি নিজ শক্তিরাশির অপব্যয় না করিয়া ও মত্ত সামরিকতার ঘূর্ণাবর্ত্তে না পড়িয়া ক্রমশঃ বিকাশলাভ করিবে, সার্ব্বজাতিক কর্ম্ম-মিলন সেই পথই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই মঙ্গলময় মহামিলনের সত্য-পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানব চিরকালই সামরিক প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ধ্বংসপথ ধরিয়া চলিবে, ইহা আর বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। একপথে বর্ব্বরতা, অপর পথে নিশ্চিত ক্রমোন্নতি।

বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রবিষয়ক চিন্তার বিকাশের আলোচনা করিলে আমরা দুইটী দল দেখিতে পাই। একদল ম্যাকিভিলির অনুবর্ত্তন করিয়া বলে যে, রাষ্ট্র স্বতন্ত্রভাবেই পূর্ণ এবং স্বাতন্ত্র্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের চরম উদ্দেশ্য। অপর দল গ্রোটীয়াসের মতের সমর্থন করে। গ্রোটীয়াসের রাষ্ট্রনীতি মানবজাতির একতাবাদের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। হব্‌স, বার্ক প্রভৃতি ম্যাকিভিলি এবং লক, রুসো প্রভৃতি গ্রোটীয়াসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই দুই দলের বিরোধ প্রবল হইয়া উঠে। এই বিরোধের মূলে ম্যাকিভিলির চাতুরী ও মানব-বিদ্বেষের প্রকোপ বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এখন এই রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্যবাদ বিশ্ব-সমবায়ের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছে এবং শীঘ্রই উদারতর মানব-জীবনের নবালোক এই সকল দ্বন্দ্বের অপনয়ন করিবে।

যে যুগে বিবিধ সার্ব্বরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সাধারণ মানবত্বের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে, সেই যুগে আবার আমরা জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আন্তর্জাতিক প্রতি-যোগিতার বিচিত্র লীলাখেলাও দেখিতে পাইব। কিন্তু এই বৈষম্যের মধ্যে গভীরতর সাম্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই দুই শক্তি চিরকালই পরস্পরবিরোধী থাকিবে না, পরন্তু ইহাদের একের উন্নতি অপরের উন্নতির উপর নির্ভর করে। দৃশ্যতঃ বিরোধ থাকিলেও ইহারা পরস্পর এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ যে বিশ্ব ইতিহাসের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাদের উন্নতি পরস্পরসাপেক্ষ। জাতীয়তার শ্রীবৃদ্ধির মধ্যেই মানবত্বের ঊষালোক দৃষ্ট হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রীস বর্ত্তমান সভ্যদেশের অনেক পশ্চাতে থাকিলেও কেবল জাতীয়তার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই এই আলোকের ক্ষীণালোক দেখিতে পাইয়াছিল। জাতীয়তার শক্তি মানবত্বকে ব্যক্তিত্বের আকার প্রদান ও আত্মসীমাবন্ধনে নিহিত থাকিলেও ইহারও চরম উদ্দেশ্য মানবত্বের উপলব্ধি।

পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বগুলি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দৃষ্ট হইবে যে জাতিসমূহের বিধিনিয়ম মূলতঃ জাতীয় শক্তিরই উন্নতিবিধায়ক, এবং বাহ্যতঃ তাহাদের এই বিধিনিয়মের লঙ্ঘনের ভয় থাকিলেও কালক্রমে ইহার পালন তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। পরিপূর্ণ জাতীয় জীবনের আদর্শ জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করিয়াই সিদ্ধিলাভ করে। বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিসমূহ স্বতন্ত্র ও মিলিতভাবে মধ্যযুগ ও রোমের বিশ্বসাম্রাজ্যের স্বপ্নের উত্তরাধিকারী হইয়াছে। মানবীয় কর্ম্মের প্রাচীন কেন্দ্র-গুলি হইতে আমরা যে সাধারণ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছি ইহারা তাহারও উত্তরাধিকারী। মানবত্বের সাধারণভিত্তির উপর সম্পূর্ণ জীবন স্থাপন করিয়া উহার ক্রম-বিকাশ সাধন করিবার প্রয়াসের দ্বারাই এই সকল রাষ্ট্রের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের যাথার্থ্য সম্পাদিত হইবে। এইরূপ আপন আপন উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে পৃথিবীর প্রত্যেক বৃহৎজাতির স্কন্ধে এমন কতকগুলি বিধি ও কর্ম্ম আরোপিত হইতেছে যাহার মর্ম্মকথা—মানবসেবা। কেবল অনুন্নত, অর্দ্ধসভ্য রাজ্যগুলিই এই বিশ্বব্যাপী সার্ব্বজাতিক মহামিলনের শক্তি অনুভব করিতে পারিতেছে না। সুবৃহৎ ও সমুন্নত জাতিসকল তাহাদের জাতীয় জীবনের এমন এক স্তরে

উন্নীত হইয়াছে যে তাহারা আর নিজ নিজ রাজ্যের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারিতেছে না, তাহারা বিস্তৃততর সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্যের প্রেরণা অনুভব করিতেছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সার্ব্বজাতিক বিধিনিয়ম কেবল সমবেত কর্ম্মের সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয় না, ইহার অন্তরতম কথা মানব-সেবা। অতএব যাঁহারা ক্রমবর্দ্ধনশীল সার্ব্বজাতিক মহামিলনের উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করেন, বর্ত্তমান জাতীয় শক্তি ও উত্তেজনায় তাঁহাদের কোন আশঙ্কার কারণ নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলি ক্রমোন্নতির দ্বারা যতই তাহাদের প্রকৃত নিয়তির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই তাহাদের মধ্যে এই মহামিলনের ভাব অঙ্কুরিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস।
উইস্‌কন্‌সিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়
আমেরিকা।

পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজি

যশ বা অর্থ কামনা না করিয়া এবং লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যে সকল মহাত্মা দেশের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মনস্বী দীনতার আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নিঃস্বার্থভাবে ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধারকল্পে প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ বুলার (G. Buhler) ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যার ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারিতে (Indian Antiquary) ইঁহার জীবনী নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে ইন্দ্রজির জীবনকথা সঙ্কলিত হইল।

পণ্ডিত ভগবান লাল জুনাগড়ের অতি সম্ভ্রান্ত এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই ব্রাহ্মণ পরিবার চিরকালই জুনাগড়ের নবাবগণের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া আসিতেছিল। পণ্ডিত ভগবান লালের জ্যেষ্ঠ সহোদর নবাব দরবারের সাহায্যে পরিচালিত একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।

বাল্যকালে ভগবান লাল মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করিলেও দুরূহ শাস্ত্রের দুর্ব্বোধ্য ব্যাখ্যাগুলি আয়ত্ত করিতে তিনি বিশেষ যত্ন করেন নাই। কিন্তু গিরণার পর্ব্বতের উপত্যকা-বাসী অন্যান্য কতিপয় স্বদেশবৎসল ব্যক্তির ন্যায় পণ্ডিত ভগবান লালেরও স্বদেশের ঐতিহাসিক কিংবদন্তীর প্রতি একটা অনুরাগ ছিল।

গিরণার পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী প্রদেশে বহু প্রাচীন মন্দির ও স্তম্ভাদি দৃষ্ট হয়, এবং ইহাদের গাত্রে লেখাদিও অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সমস্ত দৃষ্টে পুরাতত্ত্বের নিদর্শন জীবন্ত ভাবে ভগবান লালের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিল, সুতরাং অল্পবয়সেই তাঁহার ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে। গিরণারের পথে পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত অশোকের অনুশাসনলিপি এবং রুদ্রদমন ও স্কন্দগুপ্তের সেনাপতি-গণ কর্ত্তৃক খোদিত শিলালেখসমূহ (inscriptions) তিনি বাল্যকালেই দেখিতে যাইতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়া উঠে এবং প্রিন্সেপ (Prinsep) সাহেবের রচিত ভারতীয় বর্ণমালা-সমূহের তালিকাগ্রন্থের এবং লেখবিদ্যাবিদ্‌গণের (Epigraphist) প্রাচীন লেখসমূহের প্রতিলিপির সাহায্যে ইন্দ্রজি সেই শিলালেখগুলির মর্ম্মানুবাদকার্য্যে ব্রতী হন। ফলে ফর্‌বস্‌ সাহেব (Mr. Kinlock Forbes) ভগবান লালের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, প্রত্নবিৎ ডাক্তার ভাউদা-জির সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন।

সেই সময়ে ভাউদাজি লেখবিদ্যার গবেষণায় প্রবৃত্ত ছিলেন। এই কার্য্যের সাহায্যার্থ তাঁহার একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভগবানলাল আহ্লাদসহকারে ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ভাউদাজির সহকারীর কার্য্য গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে বার বৎসর কাল ভগবানলাল ভাউদাজীর অধীনে শিক্ষানবিশ রূপে প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চায় নানা স্থানে ভ্রমণ

করিয়া কাটাইয়াছিলেন। অজন্তাগুহা-লেখমালা এবং রুদ্রদমন ও স্কন্দগুপ্ত লেখমালা বিষয়ক প্রবন্ধের মুখবন্ধে ভাউদাজি ও তাঁহার শিক্ষার্থিগণের কার্য্যপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, ভগবানলাল প্রকাশ-যোগ্য লেখ-সমূহের দৃষ্টি-লিপি (eye-copies) এবং ছাপ (rubbings) তুলিয়া দিতেন; পরে স্বয়ং ভাউদাজি এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গোপাল পাণ্ডুরাং পাঢ্যে এই সকল প্রতিলিপির বিচার করিতেন। পাঠোদ্ধারে সন্দেহ উপস্থিত হইলে ভগবান লাল পুনরায় প্রাপ্তিস্থানে যাইয়া প্রতিলিপিগুলি মিলাইয়া ভাউদাজির প্রস্তাবিত পাঠ পরীক্ষা করিতেন। কখন কখন সেই স্থানে থাকিয়াই তিনি নূতন পাঠের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতেন এবং ভাউদাজির সমালোচনা বা মীমাংসার প্রতীক্ষায় সেখানেই বহুদিন কাটাইয়া দিতেন। ভাউদাজি প্রবন্ধলিখনার্থে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখবিদ্যাবিদ্‌গণের গ্রন্থাদি এবং চৈনিক ও গ্রীক পরিব্রাজকগণের লিখিত প্রাচীন ভারতের বিবরণসমূহ আলোচনা করিতেন। নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি পুরাতত্ত্ব বিষয়ক কতিপয় ফরাসী ও জর্ম্মাণ গ্রন্থেরও * হস্তলিপিতে অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদগণের অভিমতেরও গবেষণাকার্য্যে কিরূপে বিদেশীয় পর্য্যটকগণের প্রদত্ত বিবরণের সদ্ব্যবহার হইতে পারে, ভাউদাজি তদ্বিষয়েও আলোচনা করিতেন। তাঁহার অধীনে প্রথম শিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমশঃ ভগবানলাল লেখমালার বিচারকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন, পুরাতত্ত্বের ইতিহাস আয়ত্ত করিলেন এবং ভারতেতিহাসে বিদেশীয় পর্য্যটকগণের বিবরণসমূহ কি পরিমাণ আলোকপাত করিতে পারে, সম্যক্ রূপে তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন।

ভূমিদানবিষয়ক বহুসংখ্যক তাম্রপট্টাদি ভাউদাজির হস্তগত হইয়াছিল। পুরাতত্ত্বের আলোচনায় ভগবান-লালের একান্ত অনুরাগ ও উৎসাহ দর্শন করিয়া প্রতিলিপির জন্য তিনি এগুলি ভগবান লালের হস্তে সমর্পণ করেন। ভগবানলালও এতৎ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের জন্য ভারতের নানা স্থানে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ভগবানলাল সমগ্র বোম্বাই প্রদেশ, গুজরাট, কাঠিয়াবার, উজ্জয়িনী, বিদিসা, এলাহাবাদ,ভিতরি, সারনাথ, ও নেপাল প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া তত্তদ্দেশস্থ অনুশাসন-গুলির সত্যতা নিরূপণ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব ও পশ্চিম রাজপুতনার বহুস্থানে গমনপূর্ব্বক তিনি অন্যান্য অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। রাজপুতনার মরুপ্রদেশেও তিনি গমন করিয়াছিলেন। মালব, ভূপাল, সিন্ধিয়ার রাজ্য এবং মধ্যপ্রদেশের নানা স্থানেও তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর উল্লেখ আছে। আগরা, মথুরা, এলাহাবাদ ও বারাণসীতে গমন করিয়া তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। পণ্ডিত ভগবানলাল একাধিকবার বিহার প্রদেশস্থ গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণ উপকূলভাগে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশেও আসিয়াছিলেন এবং উড়িষ্যার গুহাগুলি সমস্তই পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতের বহির্ভাগেও তাঁহার ভ্রমণের উল্লেখ আছে। ইউসফজাই জেলায় এবং নেপালের উত্তর প্রান্তে গমন করিয়া তিনি সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করেন। আজকালকার মত সে সময়ে ভ্রমণের এতটা সুবিধা ছিল না, বিশেষতঃ তাঁহাকে অনেক স্থানে পদব্রজেই ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহার ক্লেশ-সহিষ্ণুতা ও স্থৈর্য্যের মাত্রা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ।

এই সকল স্থানে তিনি অবিশ্রান্ত ভাবে ভ্রমণ করেন নাই। বোম্বাই প্রদেশে অবস্থান করিয়া মাঝে মাঝে ভ্রমণে বাহির হইতেন এবং ভ্রমণকালে তিনি বহু সংখ্যক অনুশাসনলিপির [সাদা] ও কাল ছাপ গ্রহণ করিতেন। এতদুপলক্ষে তিনি অনেকগুলি খোদিত

* বার্ণফ রচিত বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের উপক্রমণিকা, জুলিয়েন কৃত হিউয়েন্ সাঙের জীবন ও ভ্রমণ কাহিনী, লাসেন প্রণীত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি।

লিপির আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সময়ে তিনি অসংখ্য মুদ্রা ও হস্তলিখিত প্রচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ বিষয়ক বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য, জাতিতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক বিবরণ ও কিংবদন্তী সংগ্রহ করেন। তিনি শুধু খোদিত লিপির অনুলিপি গ্রহণ করিয়াই নিরস্ত হন নাই, গুজরাতি ভাষায় এগুলির অনুবাদ ও প্রতিলিপি (transcripts) প্রকাশ পূর্ব্বক ইহাদের শ্রেণী বিভাগ করিয়া বিভিন্ন লিপির বর্ণমালাসমূহের তালিকা প্রস্তুত করেন। এই সময়ে তিনি ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করিয়া ঐ ভাষায় প্রকাশিত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থগুলি পাঠ করিবার উপযোগী জ্ঞান লাভ করেন এবং একজন জৈন গুরুজির নিকট প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন। তিনি ভ্রমণকালে ও গৃহে অবস্থান কালে যে সকল আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার ফল গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল এবং সুন্দর সূচীসহ সেই সকল তথ্য ১৮৭৬খৃঃ অব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপ ক্লেশসহ গবেষণা ও বহুমুখী আলোচনার ফলে তিনি লেখবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ভবিষ্যতে স্বাধীন ভাবে প্রত্নতত্ত্বে আলোচনার উপযোগী শিক্ষা লাভ করেন।

১৭৮৪খৃঃঅব্দে ভগবানলাল নেপাল হইতে ফিরিয়া আসেন এবং ভাউদাজির মৃত্যু ঘটে। ভাউদাজির বংশধরগণের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, সুতরাং তাহারা ভগবানলালকে আর মাসিক বেতন দিয়া রাখিতে পারিল না এবং তাহাদিগকে ভাউদাজির সংগৃহীত তথ্যাদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করার আশাও ত্যাগ করিতে হইল। ভগবানলাল তাঁহার অধীনে যে সকল তাম্রশাসন ও শিলালিপি প্রভৃতির অনুলিপি বা প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগুলি নিজে ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন পশ্চিম ভারতে লেখ-বিদ্যাবিষয়ক গবেষণার সূচনামাত্র হইয়াছে। ডাক্তার বার্‌গেস (Burgess) ভগবান লালের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির সাহায্য পাইলে উপকৃত হইতেন। কিন্তু দারিদ্র্য, ইংরেজী শাস্ত্রে মনের ভাব প্রকাশ করার অক্ষমতা এবং ইয়ুরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত পরিচয়ের একান্ত অভাব বশতঃ ভগবানলাল এই ক্ষেত্রে তখনও পরিচিত হন নাই। কিন্তু পরিশেষে গুণীর আদর হইল। ১৮৭৬খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রবন্ধ মহাত্মা বুলার কর্ত্তৃক "ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারিতে" প্রেরিত হইল। তৎপরে পণ্ডিত ভগবান লালের অন্যান্য প্রবন্ধ ডাক্তার কড্রিংটন (Dr. O. Codrington) বোম্বাই রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে উপস্থাপিত করেন। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে বুলার সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে বোম্বাই নগরে আগমন করিলে, তাঁহার সহিত পণ্ডিত ভগবানলালের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কথাপ্রসঙ্গে বুলার সাহেবের নিকট পণ্ডিত ভগবানলাল প্রকাশ করেন যে, তৎকালে লোকে যাহাকে "গুহা-সংখ্যা" (cave-numerals) বলিত সে বিষয়ের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন; বুলার সাহেব কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া আসিলে পুনরায় এ বিষয়ে পণ্ডিত ভগবান লালের চিত্র প্রভৃতি দেখিয়া ও তাহার মতের ব্যাখ্যা শুনিয়া একান্ত বিমুগ্ধ হইলেন। ভগবান লালের সংগৃহীত উপকরণে তাঁহাদের উভয়ের রচিত প্রবন্ধ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারিতে প্রকাশিত হইল। ইতিমধ্যে পণ্ডিত ভগবানলাল বোম্বাই রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সেক্রেটারী কড্রিংটন সাহেবের সহিত পরিচিত হন। তাঁহার সাহায্য লইয়া মুদ্রা, লেখামালা, ও সংখ্যাচিহ্ন (numeral signs) বিষয়ক চারিটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করেন। ভগবান লালের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর জে গিব্‌স্ (Mr. J. Gibbs) মহোদয়ের প্রস্তাবক্রমে তিনি বিনা চাঁদায় বোম্বাই এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ডাক্তার কড্রিংটন এবং মিঃ বুলার এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। এখন হইতে ভগবান লাল এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারের গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ পাইলেন, এবং এইরূপ উৎসাহ লাভ করিয়া দ্বিগুণ আগ্রহে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন।

সোসাইটি সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া ভগবান লালের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সোসাইটির পত্রিকায় তথ্যপূর্ণ গবেষণামূলক ২৮টি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া ভগবান লাল এই অনুগ্রহের প্রতিদান করিয়াছিলেন এবং আমরণ অবিশ্রান্ত বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা স্বকীয় যোগ্যতারও যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তৎপ্রদত্ত বহু বিস্তৃত বিবরণে বোম্বাই গেজেটিয়ারের কলেবর পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার লিখিত কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ কানিংহাম সাহেবের আর্কিয়লজিকেল রিপোর্টেরও অঙ্গীভূত হইয়াছে। পণ্ডিত ভগবানলালের প্রবন্ধনিচয় এরূপ মূল্যবান ও সারগর্ভ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে পূর্ণ যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই কৃতী লেখতত্ত্ববিদের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

প্রাচীন-অক্ষর-বিজ্ঞানেও (Paleography) ভগবান লালের গবেষণা অসাধারণ। প্রাচীন সংখ্যালিখন পদ্ধতিতে (Numerical system) যে যে চিহ্নাদি ব্যবহৃত হইত, পণ্ডিত ভগবান লালই উহাদের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হন। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারিতে এবং বম্বে ব্রাঞ্চ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকাতে ইন্দ্রজি কর্ত্তৃক সম্পাদিত কতিপয় অনুশাসনলিপির পাঠ ও প্রতিকৃতি প্রকাশিত হওয়ার পরে "গুহা-সংখ্যা" * (cave-numerals) দ্বারা লিখিত তারিখের পাঠোদ্ধারে আর মতবৈষম্য উপস্থিত হয় নাই। এই গুহাসংখ্যাগুলি সংখ্যা-বাচক অক্ষর-মন্ত্র, ইন্দ্রজীর এই অভিনব তত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতই সাধারণ্যে আদরণীয় হইতেছে।

এই সকল সঙ্কেতচিহ্নের মূল যাহাই হউক, ঐতিহাসিক যুগের ভারতের হিন্দুবর্গ এগুলিকে শব্দাংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বিভিন্ন লেখ্য-সমূহে (documents) এই সকল চিহ্নের যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, বর্ণমালার বিভিন্নতাই ইহার কারণ।

ভাউদাজি তাঁহার গুহা-সংখ্যা বিষয়ক প্রবন্ধে ইন্দ্রজির নামের উল্লেখ না করিয়া তাঁহার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন। বুলার সাহেবের বিশ্বাস যে, ভাউদাজি যে সকল তথ্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ইন্দ্রজির পরিশ্রম ও বুদ্ধিকৌশলের ফল।

দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় প্রাচীনতম বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি চিহ্নের যথার্থ মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া ইন্দ্রজি লিপিবিজ্ঞানের আর এক বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনিই প্রথমে রুদ্রদমন ও পুলুমায়ির * অনুশাসনলিপির মধ্যে 'ঌ' এই অক্ষরটির পাঠোদ্ধার করেন। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারিতে সাবাজগড়ির প্রথম অনুশাসনলিপির যে প্রতিকৃতি তিনি প্রকাশ করেন, তাহাতেই সর্ব্বপ্রথমে 'ঠি' ও 'ম্' এই দুইটি অক্ষর বিশুদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছিল। অনেকগুলি, বিশেষতঃ নাসিকগুহাগাত্রে খোদিত, অনুশাসনলিপির সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকৃতির জন্যও আমরা এই সুদক্ষ পণ্ডিতের নিকট ঋণী।

তারপরে তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা। এই ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রত্নানুসন্ধান বহুমুখী ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুপারায় অশোকের প্রস্তরোৎকীর্ণ ৮ম অনুশাসনলিপির যে ক্ষুদ্র অংশ তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ভারতের পূর্ব্ব উপকূলের ন্যায় ভারতের পশ্চিম উপকূলভাগও অশোকের শাসনাধীনে ছিল। সুদূর কঙ্কণ প্রদেশেও অশোকের বহু পরে কিরূপে এক মৌর্য্যবংশের উদ্ভব হইল তাহাও ইহা হইতে সহজে বুঝিতে পারা যায়। রাজা খারবেলের উদয়গিরি অনুশাসনলিপিতে তিনি যে মৌর্য্য সংবতের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাও ঐতিহাসিকের পক্ষে একান্ত মূল্যবান। এই আবিষ্কার দ্বারা ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় যে, রাজা অশোক স্বীয় রাজ্যকাল হইতে বর্ষ গণনা করিয়া থাকিলেও মৌর্য্যগণের স্বতন্ত্র একটি

* গুহা-গাত্রে উৎকীর্ণ কতকগুলি অনুশাসনলিপিতে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বর্ণ দৃষ্ট হয়। প্রথমে ইহাদের প্রকৃত অর্থ নিরূপিত হয় নাই। ইন্দ্রজি এগুলি সংখ্যাবাচক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন।

সংবৎ ছিল, এবং তাঁহারা সেই অনুসারে বর্ষ গণনা করিতেন।

সংপ্রতি ডাক্তার ফ্লীট এই প্রকার কোন মৌর্য্য সংবতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন এবং ইন্দ্রজি উদ্ধৃত পাঠের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, (J. R. A. S. 1910) কিন্তু তাঁহার মত অন্য কেহ সমর্থন করে নাই, এবং ইন্দ্রজির মতই এখনও প্রচলিত আছে।

যে হাতিগুম্ফার অনুশাসনলিপি হইতে তিনি মৌর্য্য সংবতের আবিষ্কার করেন, তাহা হইতেই তিনি প্রথম দেখাইয়া দেন যে, খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে কলিঙ্গ দেশে চেতবংশ রাজত্ব করিত। এই প্রবন্ধ হইতেই অবগত হওয়া যায় যে, চেতবংশীয় রাজা খারবেল অন্ধ্র বংশীয় শাতকর্ণী রাজার সমসাময়িক ছিলেন। ভগবান লালের প্রত্নানুসন্ধানের ফলে অন্ধ্র নৃপতিগণ সম্বন্ধে বহুবিধ নূতন ও জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে। ভগবান-লালই নানাঘাট ও পাণ্ডুলেনা লেখমালার ঐতিহাসিক মূল্য প্রথম উপলব্ধি করেন এবং ইহাদের প্রকৃত পাঠোদ্ধার-কল্পে বিস্তর চেষ্টা করেন। তিনি, শকসেন ও চতুরপণ, অন্ধ্র বংশীয় ঐ দুই জন নূতন রাজার নাম আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার অন্ধ্র ভৃত্য মুদ্রা বিষয়ক প্রবন্ধ অন্ধ্র বংশের শেষ নৃপতিগণের ক্রমনির্দ্দেশ বিষয়ে বিশেষ সাহায্যকারী হইয়াছে। তিনিই নেপালের ইতিহাসের প্রথম পথ প্রদর্শক। তাঁহার আবিষ্কৃত ২১টি অনুশাসনলিপি এই ইতিহাস রচনার ভিত্তি হইয়াছে। তৎকর্ত্তৃক এলোরা লেখমালার আবিষ্কারের ফলে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের তালিকায় কতিপয় নূতন রাজার নাম সংযোজিত হইয়াছে।

ইন্দ্রজি লিখিত ধরসেনের অনুশাসনলিপি বিষয়ক প্রবন্ধ ও তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত ডাঃ বার্ডের কানহেরী তাম্রশাসন হইতেই পশ্চিম ভারতীয় অতি প্রবল ত্রৈকূটক বংশের প্রথম পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইন্দ্রজিই দাক্ষিণাত্য ও কঙ্কণ প্রদেশের শিলাহার রাজগণের সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারীতে প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধের ফলে গুর্জ্জর ও চালুক্য রাজগণের ইতিহাস আমাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে।

বরোচের গুর্জ্জর জাতীয় সামন্ত বংশ অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিল এরূপ ধারণা এখন স্পষ্টই ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। বরং ইহাই সত্য যে তাহারা মধ্য গুজরাট প্রদেশে চার কি পাঁচ শতাব্দী ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছেন। আর, এই বংশে যে কেবল তিন জন রাজা ছিলেন তাহাও নহে। ইন্দ্রজি দেখাইয়াছেন যে, যে সময় চালুক্যরাজগণ প্রবল হইয়া পশ্চিম উপকূলে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করেন, চালুক্য বংশীয় বিজয়রাজের খেড়া শাসনগুলি সেই সময়ের। সুতরাং এই শাসনগুলি লইয়া যে গোল বাধিয়াছিল তাহা দূর হইয়াছে। পণ্ডিত ভগবান লাল ইহাও সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, চালুক্যরাজগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া দক্ষিণ গুজরাটে রাজত্ব করেন, এবং রাঠোরগণ কর্ত্তৃক সেই প্রদেশ বিজিত হইলে তাঁহাদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। তাঁহারই গবেষণার ফলে ৩য় খৃষ্টাব্দে গুজরাটে প্রচলিত একটি অব্দের আবিষ্কার হইয়াছে ; এই অব্দ ৭ম ও ৮ম খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। তিনি এই অব্দের অস্তিত্বের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ দিতে পারিয়াছেন ; কারণ দক্ষিণ গুজরাটে চালুক্য বংশের দ্বিতীয় অধিপতি মঙ্গলরাজের অধুনা-বিলুপ্ত দানপত্রখানির প্রতিকৃতি সৌভাগ্যক্রমে ইন্দ্রজি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। এই দানপত্রে তিনি শকাব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদর সচরাচর উল্লিখিত অব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

কানিংহাম ও ফ্লীট সাহেব পরে দেখাইয়াছিলেন যে, এই অব্দ মধ্য ভারতের হৈহয় রাজগণ প্রবর্ত্তিত চেদি সংবৎ। পণ্ডিত ভগবানলালও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবানলাল অনুমান করিয়াছিলেন যে, আভীর রাজ ঈশ্বর দত্ত গুজরাটে চেদি সংবৎ প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তাঁহার মতে, গুজরাট ও নাসিকের আভীরগণ ও চেদি-রাজ্যের ত্রৈকূটক ও হৈহয়গণ অভিন্ন। অবশ্য তাঁহার এই মত এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ, কিন্তু ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে

হয় না। ক্ষত্রপগণ সম্বন্ধেও ইন্দ্রজি পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিত ভগবানলাল অতি প্রাচীন কাল হইতে ১৩০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গুজরাটের ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত ছিলেন।

রাজনৈতিক ইতিহাস ছাড়া বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে জৈন সম্প্রদায়ের ইতিহাসের আলোচনাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে জৈনগণ এক বিশিষ্ট ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। বুদ্ধের সময় হইতে এই সম্প্রদায়ের সর্ব্বশেষ পরিবর্ত্তন যুগের প্রারম্ভ। এই বিষয়ে পণ্ডিত ভগবানলাল বুলার সাহেবের সহিত একমত হইয়াছিলেন। বুলার ভগবানলালকে বলিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে তীর্থঙ্কর মহাবীরের উল্লেখ আছে।

পণ্ডিত ভগবানলাল আরও দেখাইয়াছেন যে, জৈনগণ হুয়েন্ সাংএর আগমনকালে যেরূপ কলিঙ্গ শাসন করিতেন চেতবংশের শাসনসময়েও সেইরূপ কলিঙ্গ শাসন করিতেন। তবে জৈনগণের ন্যায় অন্য কোনও সম্প্রদায় যে সে সময়ে কলিঙ্গে শাসনদণ্ড পরিচালন করিত না তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। উদয়গিরি ও হাতিগুম্ফার লেখসমূহ জৈনধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকগণেরই কীর্ত্তি।

পণ্ডিত ভগবান লালই মথুরায় জৈন অনুশাসনের প্রতি পুরাতত্ত্ববিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে, খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে মথুরা নগরীতে জৈন মন্দির বিদ্যমান ছিল। কাহৌম স্তম্ভের উৎকীর্ণলিপি হইতে পণ্ডিত ভগবানলালই দেখাইয়া দেন যে, এই স্মৃতিস্তম্ভ ১৪১ গুপ্ত সংবতে (৪৬০-৬১খৃঃ) জৈনগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্বন্ধে পণ্ডিত ভগবানলাল মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত আলোচনামাত্র করিয়াছেন। এই সকল আলোচনা হইতে অনুমিত হয় যে, যাঁহারা মনে করেন যে, বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এবং হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম ক্রমশঃ পর পর বিকাশ ও উন্নতি লাভ করিয়াছে, ভগবান লাল তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি বুলার সাহেবের সহিত কথোপকথনেও তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলি এরূপ শৃঙ্খলার সহিত প্রবাহিত হয় নাই; পরন্তু বর্ত্তমান বিভিন্ন ধর্ম্মমতের অনেকগুলি প্রায় এই আকারেই ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেও বিদ্যমান ছিল, এবং বহু বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রাচীন কাল হইতেই পাশাপাশি ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

তাঁহার লিখিত প্রবন্ধসমূহে প্রাচীন ভারতবর্ষের বহু ভৌগোলিক তথ্যেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি প্রাচীন লেখমালায় উল্লিখিত বহু গ্রামনগরাদির আধুনিক নাম নিশ্চিতরূপে আবিষ্কার করিয়াছেন।

সুপারা ও পদাণা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তি-বিষয়ক এবং পাণ্ডুলেণা ও হাতিগুম্ফা লেখ মালা শীর্ষক সারগর্ভ প্রবন্ধনিচয় হইতে দেখা যায় যে, পণ্ডিত ভগবানলাল ধ্বংসপ্রায় প্রাচীনকীর্ত্তির অনুসন্ধানকার্য্যেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং স্থাপত্য শিল্পের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সুপারা স্তূপ আবিষ্কার দ্বারা ভগবানলাল প্রাচীন কীর্ত্তিরাজির আবিষ্কারকগণের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণার ফলে পণ্ডিত ভগবানলালকে লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যাপক কার্ণ সাহেবের প্রস্তাবানুসারে 'ডাক্তার অব ফিলসফি' (Doctor of Philosophy) উপাধি প্রদানে সম্মানিত করা হয়। তিনি গ্রেট ব্রিটেনের এসিয়াটিক সোসাইটি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিত সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কাথিয়াবাড়ের রাজন্যবর্গ তাঁহাকে সপ্তম 'ইণ্টার ন্যাশনেল অরিএণ্টেল কংগ্রেসের' প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তাঁহাকে এই সম্মানের পদ প্রত্যাখ্যান করিতে হয়।

ভারত এবং ইয়ুরোপের বহু প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণের সহিত ইন্দ্রজি পরিচিত হন। ইয়ুরোপ হইতে সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী যে সকল পণ্ডিত ভারতে আসিতেন, তাঁহারা

সকলেই বোম্বাইতে ইন্দ্রজির ভবনে গমন করিতেন। এই আগন্তুকবর্গ ভগবান লালের পাণ্ডিত্যের প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁহার সংগৃহীত লেখমালা প্রভৃতি অমূল্য সম্পদ্ দেখাইয়া গবেষণাকার্য্যে যেরূপ ভাবে তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ-দানে সহায়তা করিতেন, তাহাতে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। অন্য সম্মান লাভ অপেক্ষা এই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাগমে পণ্ডিত ভগবান লালও নিজকে সর্ব্বাধিক সম্মানিত মনে করিতেন। ডাক্তার বুলারের সাহায্যে বহু বিশিষ্ট পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্রজি মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন।

বুলার সাহেব লিখিয়াছেন যে প্রথম পরিচয়ে ইয়ুরোপীয়দিগের প্রতি পণ্ডিতের যে একটু অবিশ্বাসের আভাস দেখা যাইত, উহা তাঁহার স্বভাবগত ছিল না; এবং একবার এই অবিশ্বাস দূরীভূত হইলে, তিনি প্রাণ খুলিয়া ভারতীয় ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার, রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এমন কি, যে সকল বিষয়ে হিন্দুগণ সাধারণতঃ স্পষ্ট আলোচনা বা মত প্রকাশ করে না, বুলার সাহেবের সঙ্গে পণ্ডিত সে সকল বিষয়েও খোলাখুলী আলাপ করিতেন। এ কারণে ইন্দ্রজির উপর বুলার সাহেবের শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া যায়। ১৮৭৬ হইতে ১৮৭৯ খৃঃ পর্য্যন্ত ভগবান লাল বুলার সাহেবের সঙ্গে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত তাঁহার সংখ্যাবিবরক প্রবন্ধের ও উৎকীর্ণ নেপালী লিপির ইংরেজী অনুবাদে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই সময়ে তাঁহাদের পরস্পর "অন্তর কথায়" অনেক সময় ব্যয় হইত। তাঁহারা যে এই সময়ে শুধু প্রত্নতত্ত্বালোচনা করিতেন তাহা নহে, পরন্তু ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু চর্চ্চাও হইত। ন্যায়ের প্রতি ভক্তি ও পক্ষপাতিত্বের প্রতি বিরাগ দেখিয়া বহু ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত ভগবানলালের শত মুখে প্রশংসা করিয়াছেন।

অন্যের গুণ দেখিলে তাঁহার মনে হিংসা হইত না, জাতীয়তার নামে তিনি অসার দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতেন না, এবং কদাপি সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেন না। যাঁহারা প্রশংসার যোগ্য, তাঁহারা কদাপি তাঁহার প্রশংসা হইতে বঞ্চিত হইতেন না।

ভগবান লালের গুরুভক্তি আদর্শ স্থানীয়। কোন কোন বিষয়ে ডাক্তার ভাউদাজি ভগবান লালের কৃতিত্ব স্বীকার করেন নাই তথাপি মৃত্যুর পরও গুরুর প্রতি শিষ্যের কায়মনে ভক্তির অণুমাত্র লাঘব হয় নাই। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য দেশে এরূপ গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত বিরল।

ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে বুলার সাহেবের সহিত অনেক সময় তাঁহার ঘোর তর্ক উপস্থিত হইলেও তর্ককালে তিনি উত্তেজিত হইতেন না, এবং কদাপি অশিষ্ট ব্যবহার করিতেন না। কোনও পোষিত ধারণা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা কঠিন ব্যাপার হইলেও, স্বীয় ভ্রম বুঝিলে তিনি তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে ভগবান লাল ডাক্তার বুলারকে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা নির্ভরযোগ্য বলিয়া তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এবং অন্য কাহারও বিবরণ তিনি সত্য বলিয়া মনে করেন নাই। ভগবান লালের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সরল ও অমায়িক ব্যবহার এবং অগাধ পাণ্ডিত্য তাহাকে বুলার সাহেবের এরূপ প্রীতির পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল যে, অনেক সময়ে ডাক্তার বুলার আকুল ভাবে পণ্ডিতজির আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। ডাক্তার বুলারের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিও অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে তিনি পণ্ডিত ইন্দ্রজির নিকট অনেক বিষয় শিখিয়াছেন।

ভগবান লালের সাংসারিক অবস্থা আদৌ স্বচ্ছল ছিল না। বুলার সাহেবের সহিত যখন তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি বোম্বাই নগরে কোনও সওদাগরের আফিসে কর্ম্মচারী কিম্বা অংশীদাররূপে কার্য্য

করিতেন। পরে সময় সময় সুবিখ্যাত বোম্বাই গেজেটিয়ারের সঙ্কলন ব্যাপারে ডাক্তার বার্গেস (Dr. Burgess) এবং ডাক্তার কেম্পবেল (Dr. Campbell) সাহেবের সহকারিত্বে নিযুক্ত হইতেন।

বুলার সাহেব ভগবান লালকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অনেক বার চেষ্টা করেন, কিন্তু নানা-কারণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংরেজি ভাষায় পণ্ডিত ইন্দ্রজির বিশেষ অধিকার ছিল না, তিনি অল্প বেতনে চাকুরী করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, এবং যে পদে স্বাধীনতার লাঘব হইবে সেইরূপ চাকুরী গ্রহণ করা তিনি আত্মসম্মানের হানিকর মনে করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া পণ্ডিতজির প্রতিভার মর্য্যাদা ও গৌরবের প্রতি একেবারেই অযত্ন হইয়াছে এরূপ ধারণা ঠিক নহে।

ডাক্তার বার্গেস ও ডাক্তার কেম্পবেলের সহকারী রূপে পণ্ডিত ভগবান লাল যে কার্য্য করিতেন, তজ্জন্য তিনি উপযুক্ত বেতন পাইতেন, এবং কাথিয়াবাড় প্রদেশের রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য গুণগ্রাহী ব্যক্তিবর্গও সময় সময় তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। নেপালের লেখমালার পাঠোদ্ধার প্রভৃতি কার্য্যের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ২০০০৲ টাকা মধ্যে উদ্বৃত্ত ১০০০৲ টাকা গবর্ণমেণ্ট পুরস্কারস্বরূপ পণ্ডিত ভগবান লালকেই প্রদান করেন।

এইরূপ সময়ে সময়ে সাহায্য লাভ করিয়া ভগবানলাল এক প্রকার বিনাক্লেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষ দশায় তাঁহাকে আর্থিক কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছিল। তখন তিনি একেবারে সামর্থ্যবিহীন ও উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তিনি বুলার সাহেবকে যে পত্র লেখেন সেই পত্রে এই দুঃখকাহিনীর আভাস ছিল। তখন তাঁহার বয়স ৪৯ বৎসর, কিন্তু দীর্ঘ চারি বৎসর ব্যাপী রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া এই বয়সেই তিনি সম্পূর্ণ জরাগ্রস্ত ও জীবিকার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং জুনাগড়ের দেওয়ান বাহাদুরের নিকট পেন্‌সনের আবেদন করার জন্য পণ্ডিতজি বুলার সাহেবকে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, বুলার সাহেবও অকুণ্ঠিত চিত্তে পণ্ডিতজির অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যুত্তরে তিনি মিঃ হরিদাস বেহারীদাস হইতে যে পত্র পান তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পণ্ডিতজির এত শীঘ্র মৃত্যু না ঘটিলে তাঁহার প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত অভাব ও মানসিক ক্লেশ সত্বেও জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি প্রত্ন-চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। ২৭শে জানুয়ারীর পত্রে পণ্ডিতজি লিখিয়াছিলেন—

"এ সকল দুর্দ্দশার মধ্যেও আমার মানসিক শক্তি অব্যাহত ও প্রখর রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এক ব্যক্তিকে আমার সাহায্যার্থ নিযুক্ত করিয়াছি। বিশেষ কষ্টে তাহাকে শিখাইয়া তাহাকে দিয়াই আমার প্রবন্ধগুলি লিখাইতেছি।"

মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে উইল করিয়া পণ্ডিতজি তাঁহার সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রা ও তাম্রপট্টগুলি বৃটিশ মিউজিয়ামে এবং প্রাচীন তথ্যপূর্ণ লেখ্যাদি ও পাণ্ডুলিপিনিচয় বোম্বাই এসিয়াটিক সোসাইটিকে দান করিয়া যান।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

রজনীশেষে

উঠ সখি জাগ, জাগ, রজনী পোহায়!
বিহগ-কাকলী সনে, আঙিনার 'পরে
শিশুদল কলরোল ঐ শুনা যায়!
দুয়ারের ফাঁকে আলো উঁকি দেয় ঘরে।
নম্র সুষমার দেশ স্বপ্নপুরী হতে,
গৃহকুঞ্জে ফিরে এস, ওগো মায়াময়ী;
ভিড়াও মানসতরী :কর্ম্মতটপথে,
চমকি জাগিয়া উঠি অসম্বৃতা অয়ি!
ধীরে খোল আবরণ—পরীর পালক,
এলায়িত যৌবনেরে বাঁধ চেতনার,

মুছি রাগালস আঁখি গুছায়ে অলক,
আপনা সম্বরি তোলো লাজরক্তিমায়।
ধীরে ফেলি পাদযুগ, লো অবগুণ্ঠিতা,
গৃহের বাহির হও সলজ্জ কুণ্ঠিতা।

শ্রীকালিদাস রায়।

বীরের দান

খোলা তরবারি হাতে করিয়া বীরবর যখন মহারাজ শূদ্রকের দরবারে গিয়া হাজির হইলেন, তখন লোকে বলিল "ও কে গো? কোন বাড়ীর পূজার ঘর আঁধার করে' কার্ত্তিক ঠাকুর নেমে এলেন?"

তা বীরবরের ছবিখানা ঠিক কার্ত্তিকেরই মতন ছিল বটে। পরিষ্কার গৌরবর্ণ দেহ—উঁচুতে প্রায় পাঁচ হাত। লাল টুকটুকে ঠোঁট দুখানির উপর কাল কুচকুচে গোঁফ, তার উপর খাঁড়ার মতন নাসা। চুলের রাশি কোঁকড়াইয়া কোঁকড়াইয়া কাঁধের উপর এলিয়া পড়িয়াছে—আর বুকের উপর ছায়া করিয়াছে। দুর্গদ্বারের কবাট সে বুকের পাটা; তাতে চন্দনের পত্ররচনা। অঙ্গদপরা বাহু দুখানিতে কর্ম্মের সজীবতা, চরণ দুখানিতে অভ্যস্ত সুখের কোমলতা; সে কোমলতা ইন্দ্রনীল বসান জুতার ভিতর হইতে ভ্রমর ঘেরা শতদলশ্রীর মত ফুটিয়া উঠিতেছে।

রাজা যখন তাঁর ধনুর মত ভুরুর তলে তারার মতন চোখ দুটির দিকে চাহিলেন, যখন তাঁর চাঁদের মত স্নিগ্ধ, আর্শীর মত পরিষ্কার, পদ্মপত্রের মত চৌড়া কপালখানি দেখিলেন, তখন তাঁর ইচ্ছা হইল—লোকটিকে ডাকিয়া আনিয়া পাশে বসাই। কিন্তু তা আর কি করিয়া হয়? তিনি যে রাজা, রাজার ও রকম করিতে নাই! কাজেই হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুপুরুষ, তুমি কে?"

আগন্তুক মাটী ছুঁইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি বঙ্গদেশের রাজা নরবরের পুত্র বীরবর।" "বঙ্গদেশ? সে আবার কেমন দেশ?"—রাজা প্রশ্ন করিলেন। বীরবর বলিল, "কি বলিব মহারাজ, সে কেমন দেশ? সেখানে শ্যামল ধরা, সুনীল গগন—পূর্ণ দিঘী, তূর্ণ নদী! উষায় সেখানে সোনাগালা আকাশ ও সোনাঢালা ক্ষেতের মধ্যে কর্ম্মের কোলাহল ঢেউ খেলিয়া বেড়ায়, দ্বিপ্রহরে সেখানে শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ায় শ্রান্ত কর্ম্মী প্রীতির কথা কয়, রাত্রে সেখানে ফুলময় বাগান আর হাস্যময় জ্যোৎস্নার মধ্যে সুখের স্বপ্ন ঢুলিয়া ঢুলিয়া বাঁশী বাজায়। সেখানে বৈশাখের নবীন মেঘের তলে শুভ্র বলাকাশ্রেণী কবির কল্পনারাজ্য রচিয়া রাখে; সেখানে বিচিত্র মেঘের মালা সারা আকাশ ছুটিতে ছুটিতে নীলপর্ব্বত কোলে ঘুমাইয়া পড়ে—তেমনি করিয়া আসিয়া ঘুমাইয়া পড়ে, যেমন শান্তির কোলে কর্ম্ম ঘুমায়, যেমন আঁধারের কোলে আলোক ঘুমায়! হায়, মহারাজ! তোমাকে কি করিয়া বলিব, কেমন সে দেশ?—যেখানে চাঁপার গন্ধে গ্রীষ্ম, কদম্বের গন্ধে বর্ষা, পদ্মের গন্ধে শরৎ মাতিয়া উঠে; যেখানে শেফালির গন্ধে হেমন্ত, আম্র-মুকুলের গন্ধে শীত, আর বকুলের গন্ধে বসন্ত আকুল হইয়া উঠে! যেখানে ভাঁড়ার ভরা ধান, তোরা ভরা ধন, ঘর ভরা প্রীতি! কিন্তু হায়, শত্রু আসিয়া আমার বৃদ্ধ পিতাকে প্রাণে মারিয়া আমার লক্ষ্মী প্রজাদের ঘরদরজা জ্বালাইয়া দিয়া অমন সোনার রাজ্য ছারখার করিয়াছে!" বলিতে বলিতে বীরবরের কথা বাধিয়া গেল—সভার সকল লোকের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

তখন মন্ত্রী বলিলেন, "রাজপুত্র, তোমার অমন শাল গাছের মত বাহু, পাথরের মত বুক থাকিতে শত্রু রাজ্য দখল করিয়া নিল?"

"আমি ছিলাম না মন্ত্রী মশায়, আমি রাজ্যে ছিলাম না। বাবা আমাকে শীলাহট্টে পাঠাইয়া ছিলেন আরাকানী দস্যুদের তাড়াইয়া দিতে; ফিরিয়া দেখি, আমার পিতা নাই, মাতা নাই, রাজ্য নাই,—আমার স্ত্রীপুত্রকে সাঁওতাল প্রজারা পাহাড়ের গুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। তাদের লইয়া আজ আমি পথের ভিখারী।" বীরবর চক্ষু মুছিল—অনেকক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন।

তারপর মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি তবে কি করিতে চাও ?"

"কি আর চাব ? এমন আপনাদের কীর্ত্তিকাহিনী, এত বড় আপনাদের সংসার, ইহাতে যদি একটি চাকুরী মিলে, দরিদ্রের স্ত্রীপুত্র বাঁচিয়া যায়।

"তোমার বেতন কত ?"

"বেতনের কথা আমি কি বলিব ? যে ব্যক্তি দাসত্ব ভিক্ষা করে, বেতনের কথা বলিবার তার অধিকার নাই।

"তবু শুনি ?"

"যদি কিছু দেন, তবে দিন হাজার মুদ্রা।" "দিন হাজার মুদ্রা ? অসম্ভব !" রাজা সাদা ভ্রূযুগলে দ্বিতীয় বঙ্কনী রচনা করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব !" তখন বীরবর আর করেন কি ? একবার কাতর চোখে বুড়ার মুখের দিকে চাহিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

তিনি বিদায় হইলেন বটে। কিন্তু তাঁর বিদায় কালের কাতর দৃষ্টি এক জনের বুকে বড় বাজিল। প্রাসাদের সপ্তম তলে সাতটা সোনার ময়ূরের পিঠে মুক্তার আসনে হাওয়ার গদীতে সাত সখীর মাঝখানে যে রাজ-বধূ বসিয়াছিলেন, তাঁর। যখন বাতায়নপথে তিনি দেখিলেন রাজপুত্র ভোরের কালের স্বপ্নের মত নিরাশ বদনে বিদায় লইলেন, তখন তিনি সহিতে পারিলেন না। দৌড়াইয়া পরিচারিকা পাঠাইয়া দিলেন। পরিচারিকা রাজসভায় আসিয়া জোড় হাতে নিবেদন করিল "মহারাজ! ভয়ে বলিব, না নির্ভয়ে বলিব ?" "নির্ভয়ে বল।"

"এই নূতন অতিথিকে বিরস মুখে বিদায় লইতে দেখিয়া রাজবধূর প্রাণে বড় লাগিয়াছে।"

তখন মন্ত্রী বলিলেন। "উনি অতিথি নন, চাকুরী করিতে চান, আর বেতন চান সহস্র মুদ্রা।"

পরিচারিকা দৌড়িয়া গিয়া রাজবধূকে খবর দিল। রাজবধূ আবার পরিচারিকা পাঠাইয়া দিলেন। পরিচারিকা বলিল,নূতন রাজবধূর ইচ্ছা ওকে দু'মাসের জন্য রাখা হউক, দেখা যাক সহস্র মুদ্রার উপযুক্ত কি না।"

আর কথা কি ? নূতন রাজবধূর ইচ্ছাই বৃদ্ধ রাজার পক্ষে আদেশ। তখন বীরবরকে অনুসন্ধান করিয়া আনান হইল—রাজ বাড়ীর কাছে এক পাথরের অট্টালিকায় হাতীর দাঁতের চৌকাঠ করা দরজা জানালার ধূলি ঝাড়িয়া এই নূতন ভৃত্যের স্থান করা হইল; রাজ্যহারা স্ত্রীপুত্র সমেত রক্ষা পাইল।

২

বীরবর আছে। আছে দিন যায়—দিন সহস্র মুদ্রা বেতন নেয়—খায় খাওয়ায়, কিন্তু কোনই বিলাসের লক্ষণ তার বাড়ীতে, তার পোষাকে তার আহারে বিহারে দেখা যায় না। রাজা গুপ্তচর লাগাইলেন—ও টাকা নিয়া করে কি ? চর ঘোরে ফেরে দেখে, কোনই অনুসন্ধান পায় না।

একদিন রাজ্যের রাজ বৈদ্য সহরের উপকণ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, পথে গুপ্তচরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হইল। চর জিজ্ঞাসা করিল, "বৈদ্য মহাশয়, বৈদ্যমহাশয়, কোথায় পদার্পণ হইয়াছিল ?"

"ঝেলু সর্দ্দারের বাড়ী।"

"ঝেলু সর্দ্দারের বাড়ী ? সেখানে কেন গিয়াছিলেন ? আহা বেচারীর অটাল সম্পত্তি ছিল, ঘরে আগুন লাগিয়া সব জ্বলিয়া পুড়িয়া পথের ভিখারী হইয়াছে।"

"পথের ভিখারী বল কি ? এই না তার সাত বছরের কন্যাটীর সন্নিপাত জ্বর আরাম করিয়া, এক স্বুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক পাইলাম ?"

হঠাৎ গুপ্তচরের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কালবিলম্ব না করিয়া ঝেলু সর্দ্দারের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

"সর্দ্দার ভাই—সর্দ্দার ভাই রাজবৈদ্য কি তোকে জুলুম করে টাকা নিয়েছে ?"

"না ভাই, জুলুম নয় আমি ইচ্ছা কোরেই তাকে একশো মুদ্রা দিয়েছি—আমার মেয়েটা যমের বাড়ীর আধপথ থেকে ফিরে এসেছে গো! আমি সাত জন্মেও কবিরাজের ঋণ শোধ্‌তে পার্‌ব না।"

"কিন্তু একশত মুদ্রা তুই কোত্থেকে জুটালি ভাই ?"

"সে আর এক দেবতা—তাঁর কাছেও আমি জন্ম জন্মান্তর ঋণী থাক্‌ব।

"কে সে ?"

কে জানি না—পরিচয় দেয় না। কোত্থেকে দেবতার মত এসে দাঁড়াল—আমার কাঁন্না দেখে কাঁদ্‌ল, আর চিকিৎসার জন্য একশ মুদ্রা দিয়ে গেল।

গুপ্তচর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কিছু না বলিয়া আসিল।

পথে আসিতে আসিতে—একি ও ? নারায়ণজীর বাড়ী না ? এ বাড়ী দালান হলো কবে ? "গোঁসাইজী গোঁসাইজী ? মন্দির দিলেন কবে ?"

"ওকি আর আমি দিয়েছি ভাই ? আমার কি সাধ্যি, নারায়ণজী নিজে।"

"নারায়ণজী নিজে কেমন ?"

"একদিন ভাঙ্গা ঘরে তাঁর পূজায় ছিলাম। তিনি ভক্তের বেশ ধরে এসে দুয়ারে দাঁড়াইলেন—তার পর ভাঙ্গাঘরের জন্য খেদ জানিয়ে মন্দির কর্‌বার আদেশ দিলেন—আর ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য দুই হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে গেলেন।"

গুপ্তচর চুপ করিয়া শুনিল, তার পর একেবারে রাজার কাছে হাজির হইয়া কানে কানে কি জানি মন্ত্র পাঠ করিল। রাজা বলিলেন, "আরো খবর কর।"

দিন আসে দিন যায়, রাত্রি আসে রাত্রি যায়, রাজা ভাবেন, রাণী বেশভূষা করেন, গুপ্তচর অনুসন্ধান করে—সবই স্বচ্ছন্দে চলিতেছে ; কিন্তু রাজ্যময় একটা পরিবর্ত্তনের ছায়া পড়িয়াছে। হাটে মাঠে ঘাটে যেখানে যাও, সকলেরই মুখে এক গল্প—এক দেবতার গল্প—কবে জানি সে দেবতা এ রাজ্যে অধিষ্ঠান লাভ করিয়াছেন। মানুষে সে মহিমাময় মূর্ত্তি স্বপ্নের মত দেখে, সুখের মত অনুভব করে, বিদ্যুতের মত হারাইয়া ফেলে। যে কাঁদিতেছে, কোথা হইতে কে আসিয়া তার চক্ষু মুছিয়া দিয়া নিমেষে মিলাইয়া যায় ; যে পুত্রকন্যার শীর্ণ মুখ বুকে করিয়া অন্নচিন্তায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে, কোথা হইতে কে তার কোলের উপর সুবর্ণমুদ্রাটী গলাইয়া দিয়া যায় ; যে রোগযন্ত্রণায় ভুগিতেছে, কে কোথা হইতে তার ঘরে বৈদ্য ডাকিয়া পাঠায়। রাজা ক্ষুদ্রকের রাজ্যে আর দুঃখী নাই, রোগাতুর নাই কাঙ্গাল নাই অনাথ নাই ! কোন দেবতার এ অনুগ্রহ ? গুপ্তচর গিয়া রাজার কানে কানে বলিল. "এ আর কেহ নয়—আমাদের বীরবর !"

৩

পৌষের অমাবস্যা, দুই প্রহর রাত্রি, কন্‌কনে শীত, ফিন্‌ফিনে অন্ধকার ! রাজধানী শুদ্ধ লোক আরামে ঘুমাইতেছে ! হিরার পালঙ্কে দুধের ফেনার মত সাদা বিছানায় রাজা ঘুমাইতেছেন, মণির পালঙ্কে চন্দনমাখা পদ্মফুলের বিছানায় কাশ্মিরী শাল বিছাইয়া তার উপর রাজরাণী ঘুমাইতেছেন, কুড়ে ঘরের মেটে মেজের উপর মাদুর বিছাইয়া তার উপর কাঁথা মুড়ি দিয়া দরিদ্র ঘুমাইতেছে। হাতীশালায় হাতী, গোশালায় গরু, আস্তাবলে ঘোড়া ঘুমাইতেছে। আকাশ পাতাল, পাহাড় জল, পুকুর নদী, পথ ঘাট মাঠ এক কুয়াশামাখা স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে। অন্ধকার দানবী প্রকৃতির মাথার কাছে পায়ের কাছে রূপার কাঠি সোনার কাঠি ফেলিয়া রাখিয়াছে। এমন সময় ওকি ও ? কে কাঁদে ওই ? ত্রিতল অট্টালিকায় রাজা চম্‌কিয়া উঠিলেন। গোপাল জলে ভিজা রেশমী গামছায় মুখ মুছিয়া মণিমুক্তা জড়ানো জুতার উপর লাফাইয়া পড়িয়া একচোটে একেবারে বাতায়নের কাছে আসিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ ফটকে কে জাগে ?"

"হাতী জাগে, ঘোড়া জাগে, ধারাল দাঁতো ডালকুত্তা জাগে—আর খোলা অসি হাতে নূতন ভৃত্য বীরবর জাগে।"

"বীরবর জাগে ? বীরবর শুনিতে পাইতেছেন, ওই কান্নার মত কি শুনা যায় ?

"ভৃত্য শুনিতেছে—কোন স্ত্রীলোকের কান্না অনুমান হয়, এখনি সে খবর নিয়া আসিবে।"

বীরবর ছুটিয়া চলিলেন। রাজা ভাবিলেন—ওকে একলা পাঠানটা ঠিক নয় ; আমিও পাছে পাছে দৌড়ি।

কালো শালের মুরেঠা বাঁধিয়া, কালো শালের আঙ্গরাখা গায়ে আঁটিয়া, কালো শালের ইজার পরিয়া, কালো চামড়ার জুতা পায়ে দিয়া, কালো মেহেগণি কাঠের দরজা ঠেলিয়া, রাজা সেই কালো আঁধারে বাহির হইয়া পড়িলেন; অনুকূল অদৃষ্ট-দেবতার মত অলক্ষিতে বীরবরের পাছে পাছে ছুটিলেন।

দুইজন চলিয়াছেন—আগে আগে বীরবর পাছে পাছে গাঢাকা দিয়া রাজা। অন্ধকার রাত্রি, ইট কাঠ পাথরের হুচট্ খাইয়া, তবু দুইজন চলিয়াছেন। কই কে কাঁদে. কই কে কাঁদে—আর একটু গেলেই পাওয়া যাবে—হাঁ, ঠিক এই দিকে—না, একটুকু ডাইনে—এই, এই, এই বার পাওয়া যাইবে—আর দশ বারো পা। না না, একটুকু যেন বামদিকে শুনা যায়—বাঁয়ে যাইতে হইল। হাঁ, এইবার ঠিক, আর বারো চৌদ্দ পা—কই, দূর ছাই! চলিতে চলিতে রাজা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; তবু কোন মতে পা টানিয়া টানিয়া বীরবরের পাছে পাছে চলিতেছেন। জঙ্গলের ভিতর দিয়া, জলার উপর দিয়া, খাল ডিঙ্গাইয়া,বেড়া লাফাইয়া চলিতেছেন। জরির জুতা কাদায় আটকাইয়া গিয়াছে, রিক্ত পদ কাঁটার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, গায়ের লক্ষ মুদ্রা দামের হীরাজড়ানো কুর্ত্তা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তবু চলিয়াছেন। শেষে এক খরধারা নদীর তটে দুজনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে প্রকাণ্ড, নদী এপার হইতে ওপার দেখা যায় না। জলের বুকে আঁধার চাপিয়াছে, আঁধারের বুকে এক আলোক পড়িয়াছে। এক দেবীমুখের বিমল আলো! চমৎকার সে আলো! দেবী এক পা জলে আর এক পা তীরে রাখিয়া, দূরের রাজপ্রাসাদের চূড়ার দিকে চাহিয়া আছেন, আর করুণ কণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন। তাঁহার বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল এক একটী মুক্তা হইয়া ঝড়িয়া পড়িতেছে। বীরবর অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে মা?"

"কেন বাছা? দেখ্‌ছই ত আমি মানুষ!"

"মানুষ হও, আর দেবতা হও—জিজ্ঞেস কর্ত্তে পারি কি—তোমার চোখে জল কেন?

"দুঃখে।"

"কিসের দুঃখ তোমার? দেখ্‌তে পাচ্ছি. তোমার বসনভূষণের ঐশ্বর্য্য রাজরাণীর সদৃশ, রূপের ঐশ্বর্য্য ততোধিক! তোমার মুখের জ্যোতি অমানুষী! তুমি এই নিশাকালে নদীর ঘাটে কেন, আর তোমার দুঃখই বা কিসের?"

"আমি বাছা এ রাজ্যের রাজলক্ষ্মী! বড় সুখে এখানে ছিলেম। রাজারাণীর পূজো পেয়ে, নিত্যি নিত্যি ভোগ পেয়ে বড় সুখে ছিলেম। কিন্তু আজ—আজ আমাকে এ রাজ্য ছেড়ে যেতে হবে, তাই দুঃখে কাঁদ্‌ছি!"

"রাজ্য কেন ছেড়ে যাবে মা?"

"ছেড়ে যাব—ঐ যে দেবীমন্দিরে মঙ্গলচণ্ডীর রূপার আসন, তার চারটী হীরার পায়া; তার দক্ষিণপূর্ব্ব দিকের পায়াটীর নীচে যেখানে দক্ষিণপূর্ব্ব দিকের মুক্তাটীর ছায়া পড়েছে, সেখানে একটী ধানের মতন ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রে একটী সোনার বরণ সাপ থাকে। সে সুঁচের মতন চিকণ, সূতার মতন লম্বা—রাজপরিবারেরই কারো দোষে কাল সেই সাপ রাজাকে কাম্‌ড়াবে—কামড়ালে রাজার জীবন থাক্‌বে না—তাই আমি রাজলক্ষ্মী আজ রাজ্য ছেড়ে পালাচ্ছি।"

"সাপটী কি মার্‌তে পার্‌ব না?"

"কে মারবে? যার দিকে ও চাবে, সেই ঢ'লে পড়বে।"

"হীরার গুঁড়ায় গর্ত্তের মুখ বন্ধ করো দিলে হবে না?"

"ওর নিশ্বাসে হীরা ছাই হয়ে উড়ে যাবে।"

"তবে উপায়? এ বিপদ এড়াবার কি কোন পন্থা নেই মা?"

"এক পন্থা আছে—কিন্তু তা হবার নয়।"

"কি শুনি।"

"হাতের আর পায়ের তলায় পদ্ম আঁকা, আর কপালে রাজটীকা আঁকা যদি কোন আট বছরের শিশু থাকে, আর তার রক্ত ঐ গর্ত্তের মুখে ঢেলে দেওয়া যায়, তবেই ঐ সাপটী মর্‌তে পারে!"

"এমন শিশু কোথায় পাওয়া যায় মা ?"

"একটী মাত্র এমন শিশু আছে—রাজবাড়ীর নূতন ভৃত্য বীরবরের শিশু !"

বীরবর খানিক চুপ করিয়া মুখ নোয়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর কি ভাবিয়া সোজা হইয়া সম্মুখের দিকে চাহিলেন—দেখিলেন দূর প্রান্তরের উল্কার আলোর মত রাজলক্ষ্মী কোথায় মিলাইয়া গিয়াছেন। তখন বীরবর ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী মুখে ছুটিলেন।

"জেগে আছো ? জেগে আছো ? জেগে আছো ?"

"কে ডাক্‌ছ ?"

"ডাক্‌ছে বীরবর !"

"রাজবাড়ীর ফটকের কাজ হ'তে কি অবসর মিলেছে ?"

"সত্বরই মিলবে, একবার বেরোও।"

দরজা খুলিল—আলো জ্বলিল।

বীরবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "রথী কোথায়, অপর্ণা ?"

অপর্ণা বীরবরের স্ত্রী, রথী তাঁর পুত্র। "রথী ঘুমিয়ে আছে। একি ? তুমি এমন ক'চ্ছ কেন ? তোমার চোখ লাল কেন ?—মাথায়—মুখে, শরীরে কাদা কেন ? ও হরি! কাপড় চোপড় একেবারে ছিঁড়ে গেছে যে! দেখি দেখি! আহা! গালখানা যে চিরে গেছে! ইঃ! বুক চিরে রক্ত পড়্‌ছে ?"

"না, না, ও কিছু না! আস্‌তে আস্‌তে ভুল ক'রে এক বনের ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়েছিলুম। রথী কোথায় ?"

"এই যে রথী ঘুমে! কিন্তু তুমি অমন ক'রে কথা কচ্ছ কেন ? তোমার স্বর কাঁপ্‌ছে কেন ? না—বল কি হয়েছে; আমার মন বড় কেমন কচ্ছে।"

"অপর্ণা! আমি পিশাচ, নিষ্ঠুর, আমায় মার্জ্জনা করবে কি ?"

"ওগো, খুলে বল না কি হয়েছে ?"

"খুলে আর কি বল্‌ব হতভাগিনী! আমার কথা শুন্‌বার আগে তুমি মর—ঈশ্বর কেহ থাকলে তাঁর কাছে আমার এই প্রার্থনা !"

"হায় হায়! তুমি কি আমায় জীয়ন্তে পোড়াবে ?"

"অপর্ণা—আমি রথীকে দান করে এসেছি! মা মঙ্গলচণ্ডীকে রথীকে দান করে এসেছি! মা মঙ্গলচণ্ডী রাজরক্ত চেয়েছিলেন—তার পর রাজরক্তের পরিবর্ত্তে রথীর রক্ত চাইলেন, আমি তাই দান করতে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি।"

"ষাট্ ষাট্, ও কি বল্‌ছ ?—আমার সাগরছেঁচা মাণিক !" বলিয়া মাতা পুত্রের ঘুমে-ঘেরা দেহখানি কোলের কাছে টানিয়া ধরিলেন। বীরবর একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, একবারের জন্য সৃষ্টিটা চোখের কাছে ধূঁয়ার মত ঠেকিল, একবারের জন্য দুই বিন্দু অশ্রু গালের দিকে ছুটিয়া চলিতে চাহিল—কিন্তু চকিতে তিনি আপনাকে সম্‌লাইয়া লইলেন, বলিলেন, "অপর্ণা—ক্ষত্রিয় নারী, বীর নারী হ'য়ে, তোমার এ দুর্ব্বলতা সাজে না! জীবন ত প্রিয়তমে, দু দিনের—এ জীবন পরের জন্য—রাজার জন্য—একটা রাজ্যের জন্য যদি দিতে পারি, তবে তার চেয়ে সার্থকতা আর কি হ'তে পারে অপর্ণা ?

অপর্ণা উঠিয়া বসিলেন—বীরবরের মুখের দিকে চাহিলেন, সে মুখ শান্ত স্থির! সে চক্ষু শুষ্ক! পুত্রের প্রাণ লইয়া যেখানে কথা, সেখানে অত ধৈর্য্য মায়ের চক্ষুতে সহিল না; তিনি চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন—চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘরের দেয়ালগুলি ক্ষুদ্র আলোকে কারা-গৃহের প্রাচীরের মত দেখাইতেছে—আলোক বন্ধ করিয়া, আকাশ বন্ধ করিয়া বাতাস বন্ধ করিয়া সেগুলি দাঁড়াইয়া আছে—ধীরে ধীরে কাছে ঘেঁসিয়া যেন নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে। অপর্ণা ছুটিয়া বাহিরে যাইতে চাহিলেন, মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। বীরবর তখন আর কি করিবেন!—একবার দুই হাত বুকের উপর জোরে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া সমস্ত সংসারটা দেখিয়া লইলেন—"রাজার যেন মৃত্যু হইয়াছে, রাজলক্ষ্মী যেন রাজ্য ছাড়িয়াছেন, আকাশে যেন আর মেঘ নাই, ক্ষেতে যেন আর ধান নাই! যেন সকল মানুষে হাহাকার

করিতেছে, যেন ডাকাত ডাকাতি করিতেছে, চোর চুরি করিতেছে, বিদেশী রাজা আসিয়া রাজ্যের ঘরদরজা জ্বালাইয়া দিতেছে—যেন রক্তে নদী হইয়াছে, হাড়ে পাহাড় হইয়াছে, অশ্রুতে বৃষ্টি হইতেছে; ঝঞ্ঝার মত ক্ষুব্ধ অথচ শ্মশানের মত স্তব্ধ সে ভীষণ দৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বীরবর যেন শুনিলেন, বাতাসে বাতাসে আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছে। তাঁহার মনে হইল, এই কলকল্লোলের মধ্যে দাঁড়াইয়াও তিনি নিতান্তই একা, নিতান্তই অসহায়! হায়, কোথায় সেই রাজ্য—যেখানে তাঁর স্নেহ বুকে বুকে আসন পাইয়াছিল; যেখানে তাঁর বহু যত্নে মুছিয়া দেওয়া চোখের কোণে হাসি ফুটিয়া ফুটিয়াছিল—যেখানে ঘরে ঘরে প্রাণে প্রাণে তাঁর জন্য প্রীতি সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছিল; কোথায় সেই সব বালকের দল, যারা তাঁকে দেখিলে পঙ্গপালের মত ছুটিয়া আসিত—আর একি বজ্র সে আনন্দের মাঝখানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, করুণার উচ্ছ্বাসে পত্নীপুত্র ভাসিয়া গেল! বীরবর নিদ্রিত রথীকে কোলে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের দিকে ছুটিলেন।

বাঁ হাতে পুত্রকে কাঁধের উপর ধরিয়া রাখিয়া ডান হাতে চন্দন কাঠের কবাট ঠেলিয়া বীরবর যখন দেবী-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তখন পূজক ঠাকুর গভীর নিদ্রামগ্ন। দেবীর পাশে একটী সোনার পাত্রে ঘৃতের দীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে। বীরবর ঘুমন্ত শিশুকে দেবীর সাক্ষাতে স্থাপন করিলেন, দেবীর চরণামৃত লইয়া তার মুখে বুকে চোখে মাখাইয়া দিলেন, তারপর সেই সর্ব্বনাশী গর্ত্তটি খুঁজিয়া বাহির করিলেন। আর তার পর? তার পর কি করিলেন বলিতে আমার সাহসে কুলাইতেছে না—তোমরা দশজনে অনুমান করিয়া লিও।

রাত্রি পোহাইতে আর দুই দণ্ড বাকী আছে, বীরবর তখন বাড়ী ফিরিলেন; বাহির হইতে ডাকিলেন, "অপর্ণা! অপর্ণা!" কিন্তু কোথায় অপর্ণা? জনহীন প্রাঙ্গনের স্তব্ধ অন্ধকার তাঁহার কম্পিত আহ্বানকে ফুটিতেই গিলিয়া ফেলিল। কাঁপিয়া কাঁপিয়া দরজায় টান দিলেন—দরজা ত আটকান ছিল না, প্রথম টানেই খুলিয়া গেল—কোথায়? কাহারই ত কোন সাড়া শব্দ নাই! কেবল তাঁহার বুকের হাহাকারটাই যেন জমাট বাঁধিয়া ঘরভরা অন্ধকারের মত পড়িয়া আছে! বীরবর আবার ডাকিলেন, "অপর্ণা!" তাঁহার বিকৃত কণ্ঠস্বরের উত্তরে একটা কাল পেঁচা ঘরের কোণের তেতুল গাছ হইতে "নিম নিম" করিয়া উঠিল। তবে এই কি সকল শেষ? যে দিনের ভোর বেলায় ভরা মুখ ও ভরা শান্তি লইয়া এই ঘরখানি জাগিয়া উঠিয়াছিল, যে দিনের ভোর বেলায় ফুটন্ত বাগানের চাঁপাগাছের তলাতে দাঁড়াইয়া স্বামী স্ত্রীর মুখে, পিতা পুত্রের মুখে পরিপূর্ণ স্নেহের ছবি দেখিয়াছিল, চাঁপাকলি আঙ্গুলে চাঁপার রাশিতে মালা গাঁথিয়া স্ত্রী স্বামীর গলায় পরাইয়া দিয়াছিল, সেই দিনেরই ত এই রাত্রি—সেই ঘরখানাই ত এই! কিন্তু কই সেই পুত্র? কই সেই পত্নী? কই সেই সুখ? কই সেই আনন্দ? স্বপ্নও কি এমন খেলা খেলে?—অমন বজ্রের মত হুড়মুড়, বনবাসের মত নিষ্ঠুর, বিধাতার শাসনের মত কঠোর খেলা? বীরবর অন্ধকার দাওয়ায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তার পর সহসা চমকিয়া উঠিয়া মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির অভিমুখে আবার ছুটিলেন।

দরজা খোলাই ছিল; ঢুকিয়া দেখেন—দুর্গা দুর্গা! পুত্রের পাশে ছিন্ন লতার মত মা—আর তার পাশে রাজা—যে রাজার জন্য এত, সেই রাজা! বীরবর বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। কিছুকাল মাথার সকল ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রহিল। তার পর কত কথা ধীরে ধীরে মনে পড়িতে লাগিল। কোথায় ছিল বাড়ী! কোথায় ছিল ঘর! কি সুখে কাটিত সেই শৈশব! সমপাঠী মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে মিলিয়া নাচিতে নাচিতে পাঠশালায় যাওয়া! নীল পুকুরের আয়নাপরা জলে সাঁতার কাটা! পদ্মবনে পদ্মফুল, কেয়া বনে কেয়া ফুল, বকুলতলায় বকুল ফুল লইয়া কাড়াকাড়ি! বাপের কোলে পঠন—মায়ের কোলে শয়ন! আর আজ? হায় রে হায়! আজ সব

হারাইয়া—পিতা হারাইয়া,মাতা হারাইয়া, দেশ হারাইয়া, সর্ব্বশেষ স্ত্রী হারাইয়া পুত্র হারাইয়া, বিভুঁই বিদেশে এ শ্মশানে পড়িয়া কাঁদা! ওগো, মানুষের কপালে এমনও কি থাকে?

বীরবর একলা বসিয়া যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই কথার পর কথা ঝড়ের ঝাপটের মত তাঁহার মনে ফুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কবে রথী একদিন ভাঙ্গা বাঁশীতে গান বাজাইয়া বনের হরিণীকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, কবে সে তার পদ্মহাতে তীর ছুড়িয়া এক তীরে দিঘীর ওপারে তিনটী পদ্মের নাল কাটিয়া দিয়াছিল, কবে অপর্ণা কোন যুদ্ধে যাইবার কালে তাঁকে নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছিলেন; যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিলে কবে তাঁর বুকের অস্ত্রক্ষতগুলিতে স্নেহের হাতে ঔষধ লাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁদের অন্দর মহলের বাগানখানার মধ্যে যে গোল দিঘী, শরতে আর বসন্তে যা পদ্মগন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিত, বর্ষায় যার কুমুদ ফুলের সাদা পাপড়িগুলি চাঁদের দিকে চাহিয়া খুলিয়া যাইত, কতদিন ভোরে তার নীল জলে তাঁরা স্বামীস্ত্রীতে ভোমরা উড়াইয়া সাঁতার কাটিয়াছেন—কত দিনের কথা সে! আজ কোথায় সেই দিঘী, কোথায় সেই অপর্ণা, কোথায় সেই রথী! এ কী হইল? ভোজবাজীর মত অদ্ভুত, স্বপ্নের মত খামখেয়ালী, ঝড়ের মত বিষম এ কী হইল? বীরবর বুঝিতে পারিলেন না, তিনি বাঁচিয়া আছেন, না বাঁচিয়া নাই।

পরে, মেয়েরা যখন গোয়ালঘরে গাই দোঁহাইতে গেল, আর তারি শব্দ শুনিয়া চাঁপাগাছের উঁচু ডালটিতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল, বীরবর তখন চমকিয়া দাঁড়াইলেন। যেন কেহ তাঁহাকে ডাকিয়াছে, যেন কে তাঁহাকে আঘাত করিয়াছে। ভোরের বাতাস তাঁহার কপাল ছুঁইয়া চুল উড়াইয়া পাগলের মত বহিয়া গেল; আকাশে একটা পাখী চোখ গেল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; বীরবর বলিলেন, "তবে আর কেন? যে রাজার জন্য এত, সেও যদি গেল, তবে আর কেন? বলিয়া খড়্গ লইয়া আপন গলার কাছে তুলিতেছেন—এমন সময় মা মঙ্গলচণ্ডী খপ্ করিয়া তাঁর হাত ধরিয়া ফেলিলেন, আর বলিলেন, "থাম বাছা, আমি তুষ্ট হইয়াছি। এই নাও আমার চরণামৃত। মড়ার উপর ছিটাইয়া দাও—বাঁচিয়া উঠিবে।"

এতক্ষণে বীরবরের চোখের জলধারা ছুটিয়া বহিল! সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তিনি মায়ের আদেশ পালন করিলেন—রাজ্যের লক্ষ্মী রাজভাণ্ডারে ফিরিয়া গেলেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা।

চট্টলা

সিন্ধু-মেখলা ভূধর-স্তনী রম্যা নগরী চট্টলা!
অয়ি বরাঙ্গী! শ্যামলা, শোভনা, নিবিড়-কানন কুন্তলা!
বাড়ব ঘোড়ারে বাঁধিয়া রেখেছ দুয়ারে তোমার সুন্দরী!
বক্ষে পুষিছ দিব্য অনল করাল শিখাটি সংবরি।

সুন্দরী তুমি কোমলে-কঠিন, বিরাজিছ কিবা গৌরবে,
কঠিনতা তুমি ঢেকেছ সবুজে—সবুজ বনের সৌরভে
নীলিমা-শ্যামলে কঠিনে-কোমলে অপরূপ রূপস্ফুর্ত্তি গো,
চট্টলা! তুমি বঙ্গভূমির ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি গো।

জগতের যত পণ্য-তরণী ভিড়াও তোমার বন্দরে
পাঠাও তোমার নিপুণ নাবিক মথিতে সাগর-মন্দরে;
অন্দরে তব কণকোজ্জ্বলা কুন্দ-হাসিনী সুন্দরী,
পরী-পাহাড়েরে বিজন করিয়া গৃহবাসী কি গো হয় পরী?

কবি রচে তব বন্দনা-গীতি, সাগর শোনায় সূক্ত গো,
কর্ণফুলীর পাঠশালা তব হোক্ চির-জয়-যুক্ত গো।
হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের অভেদ-ধাত্রী চট্টলা!
কমনীয়া! তুমি নহ নমনীয়া রূপসী! কপাল-কুণ্ডলা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সৌন্দরনন্দ

সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ *

গৌতম বংশে—কক্ষীবানের ন্যায় কপিল নামে এক মহাতেজা মুনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নিজের তপো-মহিমায় মুনি দীর্ঘতপার দ্বিতীয়, এবং বুদ্ধিপ্রভাবে শুক্র এবং বৃহস্পতির তৃতীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ইনি তপস্যার জন্য হিমাচলপার্শ্বে একটি স্থান আশ্রয় করেন। তাঁহার সেই মৃদুস্নিগ্ধ-নবতৃণাচ্ছন্ন আশ্রমভূমি অতি রমণীয় ছিল। আশ্রমের লতা ও তরুশ্রেণী মনোহর, সরোবরসমূহ পদ্মযুক্ত, এবং চারিদিকেই ফলকুসুমসমৃদ্ধ সুশোভন বনরাজি; ধূম উদ্গত হইতেছে ও শিখিকুল কেকাধ্বনি করিতেছে, হরিণেরা মেধাবেদির উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃগেরা অপরাপর মৃগের সহিত শান্তভাবে বিচরণ করিতেছে; এবং ধর্ম্মকেই নিজের মনে করিয়া শরীর-নিরপেক্ষ তাপসেরা যত্ন পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন।

একদা কয়েকটি ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজপুত্র বাস করিবার ইচ্ছায় সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজপুত্রেরা দেখিতে অতি সুন্দর; তাঁহাদের দেহ সুবর্ণ স্তম্ভের ন্যায়, বক্ষঃস্থল সিংহের ন্যায়, এবং ভুজযুগল দীর্ঘ। তাঁহাদের এক কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা যেরূপ গুণসম্পন্ন ছিলেন, ইনি সেরূপ ছিলেন না। পিতা তাঁহাদের বিমাতাকে শুল্করূপে সমস্ত রাজ্যশ্রী প্রদান করায়, তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই ঐ রাজ্যশ্রীর অধিকারী হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে না পারিলেও পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রাজ্য-সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৌতম কপিল তাঁহাদের উপাধ্যায় হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত গুরুর গোত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহারা, বস্তুতঃ কৌৎসগোত্রীয় হইলেও, তখন হইতে গৌতম গোত্রীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। এই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজকুমারগণ সেই স্থানে শাকবৃক্ষপরিবৃত বাসস্থানে বসতি করিয়াছিলেন বলিয়া শাক্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। ভার্গব ঊর্ব্ব যেমন কুমার সগরের, কাণ্ব যেরূপ শকুন্তলা-নন্দন ভরতের, অথবা বাল্মীকি যেমন জানকীর তনয়-যুগলের স্ব স্ব বংশানুরূপ সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করিয়াছিলেন, গৌতমও সেইরূপ ঐ সমস্ত রাজকুমারের সকল সংস্কার নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

একদা তিনি তাঁহাদের অভ্যুদয়চিকির্ষায় এক জল পূর্ণ কলস হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'এই কলসের জল শেষ হইবার নহে; ইহার ধারা পৃথিবীতে পতিত হইবে, এবং তোমরা তাহা অতিক্রম না করিয়া যথাক্রমে আমার অনুসরণ করিয়া চলিবে'। কুমারেরা প্রণিপাত পূর্ব্বক তাহা স্বীকার করিয়া রথারোহণে ভূমি-পতিত সেই জলধারাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। মুনিবর আকাশ হইতে জল-ধারা নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহা দ্বারা সেই আশ্রম ভূমিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাজপুত্রগণকে বলিলেন যে তিনি স্বর্গ-লোকে গমন করিলে তাঁহারা যেন সেই জল-ধারাবেষ্টিত স্থানে এক নগর নির্ম্মাণ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর যৌবনোদ্দাম রাজকুমারগণ নিরঙ্কুশ গজের ন্যায় উদ্ধত-বৃত্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা হস্তে শর ও কার্ম্মুক, এবং পৃষ্ঠে তূণীর ধারণ করিয়া দুষ্মন্ত পুত্র ভরতের ন্যায় বনস্থিত নাগ ও শ্বাপদবৃন্দের বল পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাপসগণ তাঁহাদিগকে বয়ঃক্রমানুসারে প্রকৃতিপ্রাপ্ত ব্যাঘ্রশিশু মনে করিয়া সেই বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা আশ্রমভূমি শূন্য দেখিয়া শূন্য হৃদয়ে দুঃখিত ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন তাঁহাদের পুণ্যফলে উন্নতির সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা সেই স্থানে প্রভূত নিধি লাভ করিলেন এবং

* ১৩১৯ চৈত্র মাসের "গৃহস্থ" হইতে উদ্ধৃত

অচিরেই শ্রীসমুজ্জল পরমরমণীয় নগর স্থাপন করিলেন। নগরে শান্তি ও বৃদ্ধির জন্য বেদবেদাঙ্গবিদ্ স্বকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণগণ স্থাপিত হইলেন. চারিত্রধনসম্পন্ন পরিবারবর্গ আনীত হইল। দেখিতে দেখিতেই তাহা সমস্ত বিদ্যার নিকেতন, সমস্ত সম্পদের মিলনস্থান, ও সমস্ত অর্থের সঞ্চয়ভূমি হইয়া উঠিল।

বিবিধ উৎসব, বিবিধ দান ও বিবিধ কর্ম্মে তাহা পরম শোভা ধারণ করিল। রাজকুমারেরা এই নগরের নাম রাখিলেন কপিলবাস্তু, কেন না তাহা তাহা মহর্ষি কপিলের বাস্তু অর্থাৎ বাস ভূমিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সহস্র সহস্র সহস্র দীপ্তিময় তারকারাজি উদিত হইলেও যেমন চন্দ্রের অনুদয়ে গগনমণ্ডলের শোভা হয় না, সেইরূপ বহু রাজকুমার থাকিলেও একজন রাজার অভাবে নগরের বিশেষ শোভা হয় নাই। এই দেখিয়া তাঁহারা সর্ব্বগুণাধিক ও বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই নগরের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ধর্ম্মের জন্য তাঁহার উপর রাজছত্র ধারণ করা হইয়াছিল, ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে; তিনি আচারবান্ বিনয়বান্, ন্যায়বান্ ও ক্রিয়াবান্ ছিলেন; তিনি অমরগণানুগত ইন্দ্রের ন্যায় ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কালক্রমে সেই বংশে রাজা শুদ্ধোদন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীলাভ করিলেও গর্ব্বিত হন নাই, সমৃদ্ধি দ্বারা অন্যকে অবজ্ঞাও করেন নাই, এবং অন্যের নিকট হইতে ব্যথাও প্রাপ্ত হন নাই। তিনি অতি বলবান্, বুদ্ধিমান্ ও নীতিবিৎ ছিলেন। তিনি তেজস্বী হইলেও ক্ষমাশীল ছিলেন, এবং কোন কার্য্য করিলেও তজ্জন্য গর্ব্ব করিতেন না। তাঁহার সদ্ব্যবহার ও পালন গুণে প্রজাবৃন্দ নিরুদ্বেগে যেন পিতার অঙ্কগত হইয়া শয়ন করিত। অপ্রিয় হইলেও তিনি হিতবাক্য শ্রবণ করিতেন, এবং অপরে বহু অপকার করিলেও তিনি তাহা বিস্মৃত হইয়া তাহাদের কৃত স্বল্পমাত্রও উপকার স্মরণ করিতেন। লোকেরা তাঁহার চরিত্র অনুসরণ করিয়া ধনের ন্যায় গুণসমূহও অর্জ্জন করিত। তিনি ধৈর্য্য ও বীর্য্যের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ ও প্রজাগণ উভয়কেই রক্ষা করিয়াছিলেন, আর্ত্তগণের দুঃখ ও শত্রুবৃন্দের যশ উভয়ই তিনি হরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কোনও কলহ সৃষ্টি করিতেন না, এবং ঐশ্বর্য্যের অভিমানও রাখিতেন না। তিনি আগমসমূহের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে বর্দ্ধিত করিতেন, কিন্তু তাহা ধর্ম্মের জন্য, কীর্ত্তির জন্য নহে। তিনি এরূপ আর্য্যস্বভাব ছিলেন যে, শত্রুরও সদ্গুণের দ্বেষ করিতেন না, এবং মহাবিষ উরগের ন্যায় পরধনকে স্পর্শ করিতেন না। বিষয়সম্ভোগে তাঁহার উৎসাহ ছিল না এবং কৃচ্ছ্র সময় উপস্থিত হইলেও তিনি ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতেন না। তিনি ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া ভৃত্যগণকে (কার্য্যে) প্রেরণ করিতেন না, এবং প্রজাগণকেও করভারে পীড়িত করিতেন না। তিনি অজস্র বিপুল দানে বিপ্রগণকে সোমযাগে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, চক্রবর্ত্তীর ন্যায় অন্যকে ধর্ম্মে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, এবং স্বকীয় গুণসমূহ দ্বারাই বংশকে ভূয়োভূয়ঃ শোধিত করিয়াছিলেন। কাম, দ্বেষ বা ভয় হেতু তিনি কখন মর্য্যাদা ভেদ করেন নাই, এবং বিবিধ ভোগসম্ভার বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রিয়বৃত্তিতা সেবন করেন নাই। তিনি যথাবিধি সোমপান করিয়াছিলেন, বেদ অভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং বেদোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে দেবগণ সংসারের ধর্ম্মচর্য্যা দর্শন করিবার ইচ্ছায় দিকে দিকে বিচরণ করিতে করিতে সেই নরপতিকেই ধর্ম্মাত্মা বলিয়া মনে করিলেন। বোধিসত্ত্ব সেই সময় তুষিত দেবগণের মধ্যে ছিলেন; তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য সেই বংশ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন।

মহারাজা শুদ্ধোদনের জ্যেষ্ঠা মহিষীর নাম মায়া। তিনি একদিন স্বপ্নে দর্শন করিলেন যে, একটি ষড়্-দন্ত শ্বেত হস্তী তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। স্বপ্নজ্ঞেরা সেই স্বপ্নের ফলাফল নির্দ্দেশ করিলেন। মায়ার এক কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার জন্মগ্রহণে তরঙ্গাভিহিত নৌকার ন্যায় অচলা উর্ব্বী প্রচলিত হইয়া উঠিল,

দিগ্‌বারণকরকম্পিত চৈত্ররথ বনের ন্যায় আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল.দ্যুলোকে দুন্দুভি-সমূহ ধ্বনিত হইতে লাগিল, সূর্য্য অধিকতর দীপ্ত হইয়া উঠিল, পবন শিব হইয়া বহিতে লাগিল, তুষিত ও শুদ্ধাবাস দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইল, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র লক্ষ্মীর দ্বারা যেন সশরীর হইয়া শোভিত হইতে লাগিল।

নরপতির কনিষ্ঠা মহিষীতেও অরণিতে পাবকের ন্যায় নন্দ নামে এক পুত্র জাত হইলেন। তিনি সমাগত মধুমাসের ন্যায়,সমুদিত চন্দ্রের ন্যায়, এবং অঙ্গবান্ অনঙ্গের ন্যায় রমণীয় লক্ষ্মীতে শোভিত হইয়াছিলেন। তিনি সৌন্দর্য্যের জন্যই 'সুন্দর' এই বিশেষণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সজ্জন হস্তগত অর্থরাশি যেরূপ ধর্ম্ম ও কাম উভয়কেই সংবর্দ্ধিত করে, নরেন্দ্রও সেইরূপ পরমানন্দে পুত্রদ্বয়কে সংবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। হিমবান্ ও পারিপাত্র পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী মধ্যদেশের ন্যায় শাক্যরাজ সেই সৎপুত্রদ্বয়ের মধ্যগত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন।

উভয় কুমারই কৃতবিদ্য হইলেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে নন্দ বিষয়সম্ভোগে অত্যন্ত প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ সেরূপ ছিলেন না, তাঁহার তাহাতে আসক্তি ছিল না।

তিনি একদা একটি জীর্ণ বৃদ্ধ, একটি রোগ সুতুরাং ও একটি মৃত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া আর্ত্তহৃদয় হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বিষয়ানুরাগ বিগত হইল, তিনি চারি-দিকে জন্মমৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন; ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে তাহার নিবারণ করিতে পারেন। তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হইল; রাজপ্রাসাদে বরাঙ্গনা শুইয়া থাকিলেন, তিনি মথিতপদ্ম সরোবর হইতে কলহংসের ন্যায় সেই প্রাসাদ হইতে রাত্রিতে বহির্গত হইয়া পড়িলেন।

তিনি কপিলবাস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া বনে প্রস্থান করিলেন। বিবিধ সম্প্র-দায়ের বিবিধ নিয়মাশ্রিত বহু মুনির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল, কিন্তু তাঁহাদিগকে বিষয়তৃষ্ণাধীন দেখিয়া তিনি তাঁহাদের নিকট থাকিতে পারিলেন না। মোক্ষবাদী অরাড় (আলার) ও উপশমমতি উদ্রকের উপাসনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের আশ্রিত মার্গও ঠিক নহে, অতএব তিনি তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ইহার পর বিচার করিয়া অনাহারে দুষ্কর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু দেখিলেন যে, তাহা উপযুক্ত মার্গ নহে। তিনি তখন তাহাও বর্জ্জন করিয়া অন্ন ভোজন করিলেন।

অনন্তর তিনি প্রকৃতরু মূলে উপবেশন করিয়া পর্ব্বত-রাজের ন্যায় অচল ধৈর্য্যের সহিত মার-বলকে পরাভূত করিয়া শিবময় অব্যয় পদ অবগত হইলেন। তাঁহাকে কৃতকার্য্য দর্শন করিয়া দেবতারা সন্তুষ্ট হইল, মারসেনা ক্ষুব্ধ হইল, সপর্ব্বত পৃথিবী কম্পিত হইল, শিব বায়ু প্রবাহিত হইল ও সুরদুন্দুভি ধ্বনিত হইল।

তিনি পরমার্থ অবগত হইয়া জনগণকে সেই নিত্য অমৃত সন্দর্শন করাইবার জন্য বারাণসী গমন করিলেন, এবং সেখানে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি দেখাই-লেন—এই দুঃখ, এই দুঃখের কারণ, এই দুঃখের শান্তি, এবং এই দুঃখ শান্তির উপায়! তিনি কাশী ও গয়া প্রদেশে বহুজনকে উপদেশ প্রদান করিয়া গিরিব্রজে, ও সেখানে হইতে কপিলবাস্তুতে আগমন করেন। তখন তিনি সম্মান-সৎকারেও হৃষ্ট হইতেন না, এবং অবজ্ঞাতেও দুঃখিত হইতেন না, তিনি অসি:চন্দনকে সমান বলিয়া মনে করিতেন, সুখদুঃখের বিকার তাঁহার ছিল না।

নরপতি শুনিতে পাইলেন, পুত্র নগরে আসিয়াছেন। তিনি দর্শনোৎসুক হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন; নগরের বহুলোক অশ্রুমুখ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। তিনি সেই সময়ে নিজের বহুবিধ অদ্ভুত বিভূতি প্রভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সকলকেই ধর্ম্ম ও বিনয় উপদেশ করিলেন। জনম-মরণবেদনার ভয়ে শাক্যবংশের অনেকেই প্রসন্নমানসে প্রব্রজিত হইলেন; যাঁহারা পিতা, মাতার বা তনয়াদির অপেক্ষায়

গৃহত্যাগ করিতে পারিলেন না, তাঁহারাও আ-মরণ নিয়ম-বিধি গ্রহণ করিলেন। তখন হিংসাজীবী অতিক্ষুদ্র জন্তুকেও হিংসা করা পরিত্যাগ করিল, নির্ধন হইলেও পরদ্রব্য অপহরণে কেহ প্রবৃত্ত হইল না; সধন যুবকও পরস্ত্রীকে অগ্নির ন্যায় বলিয়া মনে করিতে লাগিল; কেহই অনৃত বাক্য উচ্চারণ করে নহি, কেহই অপ্রিয় সত্য বলে নাই, এবং কেহই অহিত প্রিয় বাক্য মুখে আনয়ন করে নাই; পরকীয় বস্তুতে কেহ লোভ করে নাই; কামসুখকে সকলেই অসুখ বলিয়া মনে করিতে লাগিল; সকলেই জানিল, কর্ম্মফল অব্যর্থ, তাহা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; কোন ব্যক্তিই তখন জন্মসুখকে অভিলাষ করিল না; সকলেই জানিল সংসার অশিব, তাহারা সংসার-ক্ষয়ের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল, জন্মের জন্য নহে। গৃহিগণের সন্দেহ বিগত হইল, এবং তাহাদের দৃষ্টি পরিশুদ্ধ হইল। যে ব্যক্তি বিভবের ন্যায় বিষম স্থলে অবস্থান করিতেছিল, সেও ত্যাগ, বিনয় ও নিয়মে অভিনিবিষ্ট হইয়া বিহরণ করিতে লাগিল; সৎপথ হইতে কেহই বিচলিত হইত না। স্বতঃ, পরতঃ, বা দৈবতঃ কোনরূপেই কোন ভয়ের উদ্ভব হয় নাই, সত্যযুগে মনুর প্রজার ন্যায় জনগণ তখন সুখ-সুভিক্ষগুণে আনন্দের সহিত বিহার করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ।)

কাণ্ডারী

কে বাহে পারের তরী
আকাশের পারাবারে ?
মায়ার কুয়াশা-ঘোরে
নাহি পারি দেখিবারে !
আমি, ধরণীর কূলে কূলে
কাঁদি সদা ফু'লে ফু'লে,—
তরণীর মাঝে তু'লে
নিয়ে যাবে কে আমারে ?
আজি সর্ব্বহারা শূন্য প্রাণে
চেয়ে আছি শূন্য পানে,—
কারে চাহি কেবা জানে,
কারে ডাকি বারে বারে।
তাঁরে মা বলিয়ে ডাকি কভু,
কভু পিতা, কভু প্রভু,—
জানি না তাঁহারে, তবু
স'পিয়াছি প্রাণ তাঁরে।

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

গ্রন্থ সমালোচনা

গিরি কাহিনী—শ্রী প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ঢাকা, এলেকজাণ্ডার ষ্টীম প্রেসে মুদ্রিত, প্রাপ্তিস্থান ঢাকা ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, আকার ডবল ক্রাউন ষোড়-শাংশিত, ৯৬ পৃষ্ঠা, উত্তম কাগজ, পরিষ্কার ছাপা, সুন্দর বাঁধাই সোণার জলে নাম লিখা—মূল্যের উল্লেখ নাই। দশখানি হাফটোন চিত্র আছে।

গিরি-কাহিনী শিলং শৈলের আংশিক বিবরণ। বস্তুতঃ পুস্তকখানি গ্রন্থকারের ভ্রমণ কাহিনী। তিনি শিলংএ অবস্থান কালে যাহা করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন তাহাই অতি সামান্য ভাবে শিলং শৈলের ও শৈলবাসী পার্ব্বত্য জাতির সমাজ ইতিহাসের বিবরণের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কি না বুঝিলাম না। ইতিহাস বা সমাজ চিত্রের দিক দিয়া দেখিলে পুস্তক খানির বিশেষ মূল্য আছে বলা যায় না।

শ্রীজ্ঞানশরণ।

প্রতিভা

৩য় বর্ষ | শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২০ | ৪র্থ সংখ্যা

দ্বিজেন্দ্রলাল। *

বঙ্গ-সাহিত্য এবং বাঙ্গালী অদৃষ্টের অমাগগন হইতে একটি প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্রপাত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মধুর কণ্ঠ চিরকালের জন্য নীরব; আমরা অদ্য তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমবেত। গভীর শোক এবং পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের যুগ সাহিত্যের এবং জাতীয় জীবন সাধনার একজন বলিষ্ঠ কর্ম্মী পুরুষ এবং গুরুকে অকালেই বিদায় দিতে হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিশেষ ভাব পূরণ করিবার জন্য আমাদের মধ্যে কে আছেন? বঙ্গসাহিত্য-গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি, কেহই নাই! দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীর আধুনিক বঙ্গ-মঞ্চের রাজা; সুতরাং জাতীয় শিক্ষা-সাধনার প্রধান নেতা, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; বাঙ্গালীর হাস্য-কৌতুকের সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ আসন; সঙ্গীত সাহিত্যের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের পদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারগণের সমস্থানীয়; সাহিত্য-সাধনার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান এ দেশের কোন সাহিত্যসেবীর পশ্চাতে নহে। এ হেন দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা অকালে হারাইয়াছি!

সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে পাইয়াছিলাম; এবং কেবল স্মৃতি-সভার মামুলি কথা বা কতকগুলি চলনসই প্রশস্তি-বাক্য উচ্চারণ করিয়াই অদ্যকার কর্ত্তব্য শেষ করিতে হইবে না। আমরা নিঃসঙ্কোচে যথার্থ কথা বলিতে পারিব, এবং সত্য কথার দ্বারা এই ক্ষণজন্মা এবং সুকর্ম্মা পুরুষের গৌরব বই অগৌরব হইবে না। সে দেশের সৌভাগ্য, যে দেশে এমন লোক জন্মায়, যাহার নাম আপামর সাধারণের পরিচিত; এবং মৃত্যুর পরেও যাঁহার স্মৃতিসভায় সমবেত হইয়া যথার্থ কথা বলিয়াই পরিতুষ্টি লাভ করিতে পারা যায়। দ্বিজেন্দ্র সমগ্র বঙ্গদেশের অধিবাসী। বাঙ্গালার এমন গ্রাম নাই যেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্যে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধুবাদ পড়ে নাই; যেখানে তাঁহার "আমার দেশ" বা "আমার জন্মভূমি" বাঙ্গালীর হৃদয়তন্ত্রী নবস্পন্দনে ঝঙ্কৃত করে নাই; তাঁহার নন্দলাল বাঙ্গালীর মনকে পরমশিক্ষাপ্রদ সরস কৌতুকদণ্ডে মথিত করে নাই! এমন ভদ্র-গ্রাম নাই, যেখানে তাঁহার রাজস্থানের বীর-কাহিনীগুলি অভিনীত হইয়া, গ্রামীণগণের অন্তর্লোকে এক অভিনব স্থান স্পর্শ করিয়া, তাহাদিগকে অভিনব 'স্বদেশ' এবং 'মনুষ্যত্ব' আদর্শে উৎসাহিত করে নাই। এই সমস্ত অবিসংবাদিত সত্য কথা, এবং

* এই প্রবন্ধের মূল অংশ চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক আহুত স্মৃতি-সভার বক্তৃতারূপে রচিত। উহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া দ্বিজেন্দ্রের কবি-কার্য্যের প্রশস্তি (appreciation) রূপে উপস্থিত করা হইল।—লেখক।

সামান্য গৌরবের কথা নহে! কয় জন বাঙ্গালী এই গৌরব লাভ করিয়াছেন? গত দশ বৎসর হইতে বাঙ্গালীর জীবনে এক নব চরিত্ররেখা উজ্জ্বল হইয়া পড়িতেছে। এই জাতি চিরকাল ভাবুক; এবং ভাবুকতার দিক হইতে আবেগলাভ ব্যতীত ইহার চরিত্র কখনও বিকাশ লাভ করে না। কয়েক বৎসর হইতে ইহার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ দৃঢ়তা, এবং কর্ম্মনিষ্ঠ স্বাদেশিকতা দেখা দিয়াছে; এই অনন্ত ভেদ-আদর্শের দেশে জাতীয়তা বলিয়া একটা আদর্শের স্বপ্ন এবং কর্ম্মানুবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। যাঁহারা এই পরিক্লিষ্ট দেশে এই যৎকিঞ্চিৎ সমতার এবং বিশ্বমনুষ্যের সহিত সমগতিক আদর্শ-সাধনার দীক্ষা আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে—সেই লোকশিক্ষক এবং লোক-চরিত্র-নিয়ামক, প্রাচীন এবং আধুনিক স্বল্পপরিমিত বাঙ্গালীর মধ্যে—দ্বিজেন্দ্রলাল একতম। তাঁহার নাম এ দেশের প্রাচীন কিংবা আধুনিক শিক্ষাগুরুগণের কাহারও নিম্নে নহে।

এই দ্বিজেন্দ্রলাল কে ছিলেন এবং কি ছিলেন, অদ্যকার শ্রাদ্ধবাসরে তাহা চিন্তা করা আমাদের একটা বিশেষ কর্ত্তব্য। তিনি আমাদের মধ্যে একজন চির-দিনের মানুষ! তাঁহার এই মূর্ত্তি কি পরিমাণে বাঙ্গালীর বা কি পরিমাণে সমগ্র পৃথিবীর, কি পরিমাণে বর্ত্তমানের কিংবা চিরকালের, তাহার বিচার-নির্ণয়ে অদ্য নিবিষ্টভাবে অবহিত হইবার সময় নহে। তবু, উত্তরাধিকারী আমরা, সমাজের পক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তীর দায়-সম্পত্তির হিসাব যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-সম্পর্কিত জীবন-বৃত্তান্ত আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কার্ত্তিকের চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান ছিলেন। সুতরাং আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সমুন্নত সামাজিক প্রতিষ্ঠা বলিতে যাহা বুঝা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল জন্ম-স্বত্বেই তাহার ভাগী হইয়াছিলেন। দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাসুবিধা দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্ণমাত্রায় লাভ করেন,এবং ইংরাজি ভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে চীরেনচেষ্টর কৃষিকলেজের ডিগ্রী লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হন। গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডিপুটী কালেক্টর ও ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিজেন্দ্রলাল সন্তোষজনকরূপে নিজের পদ-কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া আসিতেছিলেন; সংপ্রতি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর লওয়ার উপক্রম স্বরূপ ফার্লো ভোগ করিতেছিলেন; পঞ্চাশতে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন।

বাল্যবয়সেই দ্বিজেন্দ্রলালের অপরূপ বাক্‌পটুতা স্ফূর্ত্তিলাভ করে! কথিত আছে, প্রথিতনামা বিদ্যাসাগর এই বালক একদিন দেশে একজন বড়লোক হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিতা-রচনার ঝোঁক ছিল। বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বেই ১৮৮২ সনে, তাঁহার আর্য্যগাথা নামক সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয়; এই গ্রন্থে তাঁহার দশম বর্ষের রচনাও গুটীকতক আছে বলিয়া তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। বিলাতে অবস্থানকালে, ১৮৮৩ সনে, তিনি লিরিক্‌স্ অব্ ইণ্ড্ (Lyrics of Ind) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ কবি এডুইন আর্ণল্ড্ (Edwin Arnold) এর নামে উৎসর্গিত এবং তৎকালে ইংরাজমহলে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করে। বিলাত হইতে ফিরিয়াও তিনি বহুদিন ইংরাজীতেই কবিতা লিখিতেন; কিন্তু এই সমস্ত কখনও মুদ্রিত করেন নাই। পরে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের প্ররোচনাতেই বঙ্গসাহিত্যের দিকে তাঁহার শক্তি পরিচালিত হয় বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

বিলাত হইতে ফিরিয়া, এবং সম্ভবতঃ এদেশের সমাজ-নির্য্যাতনের ভাগী হইয়া কবি 'একঘরে' নামক ব্যঙ্গ-নাট্য রচনা করিয়াছিলেন; উহা ১৮৮৭ সনে প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় কৌতুকানন্দের মাত্রায় পরিপূর্ণ ছিল। এই স্বভাব-শক্তির প্রেরণাবলেই তিনি বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে অপূর্ব্ব কৌতুক কবিতা এবং

সঙ্গীতের জনক হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের এই অপরূপ কৌতুকচ্ছন্দকে নানাবিধ বাক্যচ্ছন্দে প্রমূর্ত্ত করিয়া ১৮৯০ সনে 'আষাঢ়ে', ১৭৯২ সনে আর্য্যগাথার ২য় ভাগ, ১৮৯৬ সনে কল্কি অবতার, এবং ১৯০০ সনে 'বিরহ' প্রকাশিত হয়। এই সকল রচনায় বঙ্গভাষা এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব দেশে শক্তিপ্রসার লাভ করিয়া অপরূপ রসতারল্যে বিলসিত হইয়াছে। এই কল্কিঅবতার বা বিরহ প্রভৃতির বৃত্তান্ত-ভিত্তি প্রকৃত প্রস্তাবে কতকগুলি ভাবোজ্জ্বল কৌতুক-কবিতার সূত্র-সমষ্টি বই নহে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ এবং বিদ্বেষবিহীন হাস্যরস সাধনার দৃষ্টান্ত বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তি হয় না। এই ঘটনা ভারতীয় সাহিত্য-তন্ত্রেও বোধ করি প্রথম! ভারতীয় আর্য্যমন তাহার সাহিত্যে এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে চিরকাল তত্ত্ব-ভাব বা Seriousness অবলম্বনেই সবিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মানসীতে কয়েকটি ব্যঙ্গকবিতার নমুনা দেখাইয়াছেন। কিন্তু সঙ্গীতে হাস্য! উহা সহজকৌতুক-প্রবণ হৃদয় লইয়া স্বয়ং গায়ক না হইলে অসম্ভব ছিল। সহজাত শক্তির ইঙ্গিত-বশেই দ্বিজেন্দ্র এই পথে পরিচালিত হইয়াছিলেন।

এই সূত্রে নিজের সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। দ্বিজেন্দ্রলালের নাম, কিংবা রচনার সঙ্গে তখনও পরিচয় ঘটে নাই—পাঠ্যাবস্থায়, সম্ভবতঃ ১৮৯৪ সনের 'সাধনায়,' দুইটি কবিতা পড়িয়া কুতুহল এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম—'কেরাণী' এবং 'গার্গী'; দুটিই সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের রচনা, নিম্নে রচয়িতার নাম ছিল না; কেরাণীর মধ্যে এমন একটা অস্তুতীক্ষ্ণ মিষ্ট কৌতুকের মর্ম্মভেদী দংশন ছিল, এবং 'গার্গীর' ১৪টা পংক্তির মধ্যে এমন একটা উদাত্ত-মধুর অথচ গম্ভীর ধ্বনি ছিল যে, পাঠমাত্রেই প্রশ্ন জাগিয়াছিল—এই অজ্ঞাত কবি কে? রচয়িতা স্বয়ং সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ না হইলে, বঙ্গসাহিত্যের আসরে যে এক নবতন্ত্রের স্বাধীন কণ্ঠ এবং বাক্যশিল্পী অবতীর্ণ হইতেছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সাহিত্যিক জীবনের আদিম কৌতূহল বশে তখন মাতৃ-ভাষার সাহিত্যগগনের দিকে নিয়ত দৃষ্টি রাখিতাম। কোন দিকে কোন নূতন আলোক বা আলোকের আভাস দেখা দিল, কোন দিকে মিলাইল, কোন নক্ষত্র কোন রাশি বা বর্ণধর্ম্ম অবলম্বনে উদ্গত হইতেছে—এই জিজ্ঞাসা লইয়া আশৈশব ঘুরিতাম বলিয়া, তখন এই অ-পূর্ব্বপরিচিত নব জ্যোতিষ্কের উদয়াভাস লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম।

১৯০১ সনে 'পাষাণী' এবং 'ত্র্যহস্পর্শ'। পাষাণী এই কবির প্রথম তত্ত্ব-ভাবক রচনা। উহার প্রকাশমাত্র বঙ্গের সমালোচক মহল হইতে উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ উদ্গীরিত হইতে থাকে। অন্যদিকে স্থিতিশীল আদর্শবাদীগণের তরফ হইতে, উহার অংশবিশেষ লইয়া সাহিত্য-আলোচনার নামধারী বিদ্রূপাস্ত্রও অনর্গল পরিবৃষ্ট হইতে আরম্ভ করে! পাষাণী নানাদিক হইতে বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম নাট্য বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এবং ৯ বৎসর পূর্ব্বে 'সাহিত্যে' 'বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা' নামক প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। কোনরূপ সাংপ্রদায়িক আদর্শের কবল হইতে চিত্তকে স্বাধীন করিতে পারিলে, নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে, পাষাণীর মাহাত্ম্য এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। বঙ্গীয় কাব্য-ছন্দের রাজ্যে এইরূপ সুদৃঢ় বস্তু-ভিত্তি, ভাব-গতি, এবং সংযত নাট্য-সমাধান ইতিপূর্ব্বকার কোন নাটকে দেখা যায় নাই; এখনও উক্ত মত কোন অংশে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় কিনা সন্দেহ। পাষাণীর কবিত্ব-সম্পদ্ সর্ব্বথা প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, উহা একটা পরিপূর্ণ হৃদয় এবং পরিণত সাহিত্য-বুদ্ধির দৃষ্টান্ত লইয়াই উপস্থিত আছে। আমাদের কবি-ভারতী সঙ্গীত কিংবা গীতি কবিতার নিরালম্ব নিরাশ্রয় আকাশ-মার্গে 'বহুতর' চলিতে জানিলেও, বাস্তবজীবনের রুক্ষ-বন্ধুর উর্ব্বী-বক্ষে কেবল 'স্তোক' মাত্রায় চলিতে পারিতেছেন; আমাদের ভরত-শিষ্যগণের দৈন্য-দোষও সম্যক্ ঘুচিয়াছে বলিয়া ধারণা করিতে পারি না।

পাষাণীর পর ১৯০২ সনে 'হাসির গান,' এবং ১৯০৩

সনে ক্রমান্বয়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' 'সীতা' এবং 'মন্দ্র' প্রকাশিত হয়। পাষাণীর কবি আর একটি মাত্র কাব্য লিখিয়াছিলেন—সীতা। এই কাব্যদ্বয় দ্বিজেন্দ্রলালের নাম বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে বলিয়াই আশা করিতেছি। ইহাদের শিল্প-আত্মা দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে দুর্লভ এবং দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকিবে। আমরা এখন কেবল সঙ্গীত সাধনাতেই অবস্থিত; ছন্দের সাহায্যে নাটকীয় জীবন কিংবা ভাব-সাধনের শক্তিটুকু সুলভ হইয়া পড়িতে, কিংবা উহার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতেও দীর্ঘ-পথ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে।

পাষাণী প্রকাশিত হইবার পর বঙ্গের সাময়িক পত্রমহলে যে কোলাহল উঠে, তদ্দ্বারা দ্বিজেন্দ্রের হৃদয় এক অভিনব দিকেই উৎসাহ লাভ করে। দেশের হৃদয় এবং জীবনের কাছাকাছি আসিয়া উহাকে গভীরভাবে আঘাত করিতে পারে, দৃশ্য-ঘটনা এবং সঙ্গীত। একটি বস্তু-গত, দ্বিতীয়টি ভাব-গত; সুতরাং নানাদিকে পরস্পরের বিরোধী। কবি দ্বিজেন্দ্র এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের সমান অনুপাত এবং সমন্বয়ের উপকরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন—এই ঘটনা আমাদের সাহিত্য-ইতিহাসে বিস্মৃত হইতে পারিবে না। এই সমস্ত সাময়িক বাদানুবাদের শেষ-ফলে কবির আত্মবোধ জাগরিত হইয়াছিল; এবং অতঃপর তিনি একান্ত ভাবে কেবল দৃশ্য-কাব্যের দিকে বিশেষতঃ অভিনেয় নাটকের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়েন।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, ভারতবাসীর বিশেষতঃ হিন্দুর পক্ষে দেশানুরাগ একটা পরম সমস্যা এবং সাধনার জিনিষ। এদেশের সামাজিক অবস্থা-গতিকে, আধুনিক আদর্শের 'দেশ' বলিয়া কোন কথা আমাদের ছিল না; হিন্দুর পক্ষে নিজের প্রাচীন এবং সনাতন সংস্কার জাতি-ধর্ম্ম কুলধর্ম্ম, এবং এই সমস্তের নিরূপক কতকগুলি আচারের মূর্ত্তিই সারাৎসার ছিল। জন্মভূমি বলিতে পৈতৃক বাস্তুভিটা এবং বিস্তারিত পক্ষে নিজের গ্রাম বা গ্রাম-সমাজই পর্য্যাপ্ত,—জাতীয় স্বার্থ বলিতে নিজনিজ গোত্রগোষ্ঠী, ব্যাপক-পক্ষে কুলের ব্যবসারগত স্বত্ব-স্বার্থ ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ ভাব আমাদের মধ্যে বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই। আমাদের 'লোকহিত' 'পরার্থতা' বা 'পঞ্চ-ঋণের' আদর্শও বরং এই জাতি-স্বার্থ-নিষ্ঠ ধর্ম্মের আদর্শকে ভিত্তি করিয়াই প্রসারিত হইয়াছিল। ইয়োরোপীয় জাতি-সমূহের মধ্যেই, তাহাদের বিশেষ সমাজ-অবস্থা গতিকে, গত তিন শত বৎসরের মধ্যে এই অপরূপ স্বদেশ এবং জাতি (nation) আদর্শ মূর্ত্তিমান্ হইয়া পৃথিবীর চক্ষে দিগ্বিজয়ী হইয়া চলিয়াছে। বহু মনুষ্যকে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একই 'পোলিটিকেল' (political) স্বত্ব-স্বার্থে সংমিলিত করিয়া, একপ্রাণ করিয়া, মনুষ্য-সভ্যতার মধ্যে একটা পরম কার্য্যকরী মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটনা করিয়াছে। মুসলমান জাতির, বিশেষতঃ ইংরাজের সম্পর্কে আসা অবধি, ভারতের মনুষ্য এই সংহতি-সাধনার আদর্শের দিকে লোলুপতা দেখাইয়া আসিতেছে; নানাদিকে নানা পথে উহার প্রণালী খুঁজিতেছে। অথচ ভারতীয় আর্য্য-সমূহের যুগযুগান্তর-সঞ্চিত জাতিভেদবুদ্ধি অচল আচার-ধর্ম্ম এবং স্পর্শাস্পর্শ-বিচারের আদর্শই—তথাকথিত 'সনাতন' ধর্ম্মই, উহার বিপক্ষে প্রধান অন্তরায়। তবু ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী, ইয়োরোপীয় আদর্শের এই জাতীয়তা, রাষ্ট্র-আদর্শের এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, বা একই দেশসীমার অন্তর্গত মনুষ্য-নিবহের মধ্যে এই সমতা এবং সম-স্বত্ব ও স্বার্থের আদর্শকেই খুঁজিতেছেন। অনেক অটল-বিশ্বাসী হিন্দুও—স্বীকার করুন, আর নাই করুন—উহাকে জীবনরক্ষা-বিষয়ে অপরিহার্য্য জানিয়াই স্বধর্ম্মের ভেদ-আদর্শের বিপরীত পথে এই সমতাকেই খুঁজিতেছেন। বাঙ্গালী কবির হৃদয়ও প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক—চিরকাল এই স্বদেশ এবং জাতি আদর্শের দিকে তৃষিত দৃষ্টিপাত করিয়া আসিতেছে। ভূগোল-সীমার অন্তর্গত ভূ-পৃষ্ঠকে তাঁহারা দেশ-মাতা, ভারত-মাতা বঙ্গ-মাতা জন্মভূমি প্রভৃতি নামে লক্ষ্য করিয়া, বর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকলেরই 'জনক-জননী জননী' আখ্যা

প্রদান পূর্ব্বক উহার দিকে দেশবাসী মাত্রেরই প্রীতিস্নেহ মমতার উচ্ছ্বাস জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; এই 'পোলিটিকেল' সীমা-মূর্ত্তিকে ভারতীয় হিন্দুর চিরন্তন শক্তি সাধনা—মাতৃসাধনার সহিত সঙ্গত এবং সম্মিলিত করিয়া, উহাতে পরম গরীয়সী পদবী প্রদান করিয়াছেন। এই দেশমাতার উপাসনা, উহা বর্ত্তমান সভ্যতাসূত্রে আমাদের সর্ব্বপ্রধান অভাব; সুতরাং আমাদের সাহিত্যের মধ্যেও এই স্বদেশ-রস সমতা-রস এবং ঐক্য-রসের জন্য পিপাসাও অত্যধিক। দ্বিজেন্দ্র অতঃপর এই স্বদেশ এবং জাতি-আদর্শকেই নিজের সাহিত্যজীবনের প্রধান সাধনা-কার্য্যে বরণ করিলেন। রাজস্থানের ক্ষাত্র ইতিহাস বীর্য্যপূর্ণ প্রতিশোধ-স্পৃহা, কুলগর্ব্ব, কুলগৌরব এবং কুলধর্ম্মের রক্ষাকল্পে অক্লান্ত ধর্ম্মযুদ্ধ এবং অনাকুল আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। উহা আধুনিক পোলিটিকেল দেশানুরাগ এবং দেশপ্রাণতা এবং জাতিপ্রাণতার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী; এবং অনায়াসেই উহাকে আধুনিক আদর্শে পরিণামিত করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালী লেখক রাজপুতের বীরত্বকাহিনীকে এই আদর্শসাধনার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছেন; দ্বিজেন্দ্রলালও তাহাই করিলেন। ১৯০৪ সনে তারাবাই প্রকাশিত হয়; উহার পর দ্রুতবেগে, ১৯০৫ সনে প্রতাপসিংহ, ১৯০৬ সালে দুর্গাদাস, ১৯০৭ সালে নুরজাহান, ১৯০৮ সালে মেবারপতন আলেখ্য ও শোরাব-রুস্তম, ১৯০৯ সালে সাজাহান, এবং ইতিমধ্যে চন্দ্রগুপ্ত, আনন্দবিদায়, এবং তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটক "পরপারে" প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কবি মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বেই তাঁহার সিংহল-বিজয়ের 'প্রেসকাপি' পরিদর্শন করিতেছিলেন বলিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং নিজের সারস্বত সাধনার সাজে-পোষাকেই এই অক্লান্তকর্ম্মা পুরুষ আমাদের মধ্য হইতে পরপারে চলিয়া গিয়াছেন।

নাটকের দিকে, বিশেষতঃ বঙ্গ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা-উপযোগী অভিনেয় নাটকের দিকে, এই কবির জীবন আকৃষ্ট হওয়া বঙ্গসাহিত্যের একটা স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া অনেকে মনে করেন। বাস্তবিক দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্বশক্তি এবং সামর্থ্য লইয়া ইতিপূর্ব্বে আর কেহ বঙ্গ-রঙ্গে অবতরণ করেন নাই। এই ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ নানাদিকে তাঁহার সমান-কর্ম্মা এবং সহযোগী থাকিলেও, কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অভ্যুদয়েই যে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে প্রকৃত যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জোরের সহিত নির্দ্দেশ করা যায়।

এই সমস্ত নাটক ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দীর ইংরাজী নাটকের আদর্শেই বিরচিত। প্রবল দেশানুরাগ বা প্রবল ব্যক্তিত্বনিষ্ঠ বীর্য্যকথা, আত্মোৎসর্গ, ব্যক্তিগত চরিত্রের সদাত্ম বা দুরাত্ম ভাবের সরল এবং উজ্জ্বল চিত্র সাহায্যে মনুষ্যহৃদয়ের হ্লাদিনী বৃত্তির তৃপ্তি সাধন করাই এই সকল নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। আপামর সাধারণের হৃদয়কে লক্ষ্য রাখার দরুণ উহারা গদ্যে রচিত হইয়াছে। সুতরাং তন্মধ্যে আধুনিক সাহিত্যের তাত্ত্বিকতা, তত্ত্ববুদ্ধি বা ঐ বুদ্ধির গহনা মতি-গতি কদাচিৎ অনুসৃত হইতে পারিয়াছে। ঘটনাচক্রের কিংবা নাটকীয় উদ্দেশ্যের সমাধান বিষয়েও তাই উহারা কোনরূপ তত্ত্ব-আদর্শকে লক্ষ্য করে না; না করিয়াও, কেবল মনুষ্যহৃদয়ের সাধারণ বা সহজাত ভাব (Passion) গুলির উপর নির্ভর করিয়াই উহারা সর্ব্বত্র তরল-মধুর এবং মনোমদ হইয়াছে, বাঙ্গালী রঙ্গ-চরগণকে একচ্ছত্রে অধিকার করিয়াছে।

এই ক্ষেত্রে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে দ্বিজেন্দ্রের আমাদের একবার মাত্র চাক্ষুষ পরিচয় এবং আলাপের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। প্রথম আলাপের দিনেই, তাঁহার সঙ্গে বেগতিক তর্কযুদ্ধে মাতিয়া যাইতে বাধ্য হই। তাঁহার মত এই ছিল যে—কাব্য স্বভাবের অনুকরণ বই নহে—Poetry is imitation of nature; সুতরাং পদ্য-নাটক তিনি অস্বাভাবিক বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক

ইয়োরোপেও অনেকে এই আদর্শ পোষণ করেন। স্বয়ং ঈবসেন, মধ্যজীবনের সমাজের নাট্যলেখক ঈবসেন, এই আদর্শ খ্যাপন পূর্ব্বক তাঁহার প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিয়াছেন। অতএব দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে গদ্যাত্মক এবং অভিনেয় নাটকের দিকে আকৃষ্ট হওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং অপারহার্য্য ছিল বলিয়াই মনে করিতেছি।

অবশ্য, বলিতে হয় যে, রীতিবিষয়ে উভয়ে এক মত হইলেও ঈবসেনের সহিত দ্বিজেন্দ্রের অন্য কোন বিষয়ে সাধর্ম্য নাই। উভয়ের দৃষ্টিস্থান, শক্তি, আদর্শ, এবং প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সমাজের দোষোদ্‌ঘাটন, সামাজিক সমস্যা-পূরণ, ও ইয়োরোপীয় আধুনিক মনস্তত্ত্ব এবং মানসিকতা (intellectuality) আদর্শের বশীভূত হইয়া নরোয়ের কবি বিপরীত বর্ণ-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ ভাবে মনুষ্য চরিত্রের কেবল মহনীয় অংশে এবং মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টি করিয়াই বিভোর! দ্বিজেন্দ্রের শেষ (প্রথম?) সামাজিক নাটক 'পরপারে' সামাজিক আদর্শকে সম্মুখে রাখিলেও উহা ইউরোপীয় আদর্শের সমস্যামূলক problem drama নহে; তাহার রচনা কোন রূপ প্রতিজ্ঞা কিংবা প্রতিপাদ্য লইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। বঙ্গের আধুনিক বিবাহ-পদ্ধতি এবং দম্পতির মিলন-সমস্যাকে প্রকাশ্যতঃ গ্রহণ করিলেও উহার 'ফলশ্রুতির' মধ্যে কোনরূপ তত্ত্ব-প্রতিপাদক আদর্শ যথোচিত মতে প্রবল হয় নাই। হয়ত, প্রথম রচনা বলিয়াই, তন্মধ্যে এদেশীয় সমাজ সমস্যার কোনরূপ গভীর ধারণাও বিশিষ্টতা লাভ করে নাই। এই সমস্তই সর্ব্বোতোভাবে 'ভাবুক' আদর্শের নাটক (passior drama); পাত্রগণকে বিশেষ বিশেষ ঘটনা-চক্রে আবর্ত্তিত করিয়া আনন্দ বিধান করাই উহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নানাদিকে অতুলনীয় ভাবে সিদ্ধ করিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গের আধুনিক নাট্যরসিকের হৃদয় জয় করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

বরিষার প্রতি

লো বরিষা, তুই বুঝি আমার সে পাগলিনী,
বিরহিণী প্রিয়া;
এসেছিস্ সন্তাপিতহিয়া।
ছুটে এসেছিস আজ ছিঁড়ে ফেলে ভূষা সাজ,
দীর্ঘশ্বাস তেয়াগিয়া করি হা হুতাশ।
গণ্ড বেয়ে আঁখি-ধার ঝরে শুধু অনিবার
হেলায় এলায়ে দিয়ে কালো কেশপাশ।
মোর দরশন ছলে এলি বাতায়ন তলে
বরিষা হইয়া,
ওরে মোর বিরহিণী প্রিয়া।

বিদ্যুতে চমকি উঠে তোর ঐ রাঙা আঁখি,
রজনী জাগিয়া,
নিশিদিন আমারে মাগিয়া।
বিস্রস্ত বসন তোর টুটিয়া লাজের ডোর,
লুটিয়া লুটিয়া পড়ে আজি যথা তথা।
বক্ষ তোর দুরুদুরু মর্ম্ম ভাঙি গুরুগুরু,
গুমরি গুমরি কাঁদে বিরহের ব্যথা।
বরিষার রূপ ধরি পার হয়ে গিরিদরী
একেবারে প'ড়িলি আসিয়া,
ওরে মোর বিরহিণী প্রিয়া।

এলি যদি পাগলিনী আয় তবে বুকে আয়,
বাতায়ন দিয়া,
ওরে মোর বিরহিণী প্রিয়া।
একবার নিজ সাজে নিভৃত এ গৃহ মাঝে
আসিয়া জুড়াও সখি তাপিত এ বুক,
অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকেতে লইয়া টানি
চুমিয়া চুমিয়া আনি মিলনের সুখ।

লভিব মিলনানন্দ কল্পনার বৃন্দাবনে
ঝুলনে মাতিয়া,
এস মোর বিরহিণী প্রিয়া।

শ্রীকালিদাস রায়।

বঙ্গদেশে হিন্দুর জাতীয় হ্রাস নিবারণের উপায় চিন্তা।

গতবারে আমরা বঙ্গীয় হিন্দুদিগের জাতীয় ক্ষয়ের সামাজিক কারণেরই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা বাণিজ্য ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অন্যান্য কারণের আলোচনায়ও প্রবৃত্ত হইব।

(৫) **পাশ্চাত্য বণিক্ জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় ব্যবসায়িক জাতির পরাভব।** ইংরাজ বণিক্‌দিগের দ্বারাই ইংরেজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং বাণিজ্যের স্বার্থই ইংরেজ-রাজত্বের প্রধান স্বার্থ হইয়াছিল। বণিক্‌বেশধারী রাজা যখন দেশীয় বাণিজ্যের প্রতি উদাসীন হইলেন তখন দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্য যে বহুল পরিমাণে বিনষ্ট হইবে তাহা আর বলিতে হয় না। তখন আশ্রয়ভ্রষ্ট হইয়া "তাতি কর্ম্মকার করে হাহাকার সুতা যাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা 'ভার' এই অবস্থা দাঁড়াইল। এই প্রকার পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণের সহিত প্রতিযোগিতায় বহু ব্যবসায়িক জাতি জীবিকা হারাইয়া নিরুপায় হইয়া অন্নাভাবে উৎসন্ন হইতে লাগিল। এই কঠোর অভাবে সমৃদ্ধ গ্রামসকল অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের যে একটু আদর হইয়াছে তাহাতে অনেক ব্যবসায়িক জাতি মৃতদেহে প্রাণ পাইয়াছে। এই ভাবের দৃঢ়তা, গাঢ়তা, ও বিস্তারই ব্যবসায়িক জাতির মধ্যে নবজীবন-সঞ্চার করিবে, তাহাদের লুপ্ত প্রবংশকে আবার প্রকাশ করিবে।

(৬) **জীবিকার পথ রুদ্ধ হওয়ায় বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী সকলের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রে পরস্পরের অনধিকার প্রবেশ**—দেশীয় ব্যবসায়িক জাতি সকল স্বস্থানচ্যুত হইয়া আত্মরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে সমাজ-শৃঙ্খলা বিশেষরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এবং এইরূপ ঘোর জীবন-সংগ্রামে অনেকেরই দেহপাত অনিবার্য্য হইয়াছে। হিন্দু ব্যবসায়ী অনেকেই শিল্পাদির দ্বারা জীবনোপায়ে বঞ্চিত হইয়া কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়াস পাইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানদিগের দ্বারা পূর্ব্বেই কৃষিকার্য্য অধিকৃত থাকায় ইহারা তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় নাই। এই প্রকার বহু হিন্দু ক্রমে ভাতে মারা গিয়াছে, কিন্তু মুসলমানেরা কৃষি দ্বারা পুষ্ট হইয়া শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। দেশের নষ্ট শিল্পবাণিজ্যের উদ্ধার দ্বারাই বিপর্য্যস্ত সমাজ-শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এবং তৎফলে লোকক্ষয়-কর জীবন-সংগ্রামের শান্তি হইয়া সমাজ-গঠনে লোকের মন ব্যাপৃত ও শক্তি নিয়োজিত হইতে পারে ও বংশবিস্তারের সুযোগ উপস্থিত হইতে পারে।

(৭) **রোগে মৃত্যু**—দরিদ্রতা-নিবন্ধন অল্লাহার ও অপুষ্টিকর আহারে জীবনী-শক্তিগ্রাস ও আয়ুক্ষয় অপরিহার্য্য। সুতরাং এমতাবস্থায় সহজেই যে রোগে আক্রমণ করিবে ও বিনাশ সাধন করিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বাপেক্ষা লোকসকল অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ও বঙ্গদেশ নানা রোগের ক্রীড়াভূমি হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রাকৃতিক কারণে সম্প্রতি দুইটী ভীষণ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে —ইহার একটী ম্যালেরিয়া জর ও অপরটী ওলাউঠা।

অসংখ্য উচ্চ রাস্তা, বিশেষতঃ দেশব্যাপী রেলপথ বিস্তারের দ্বারা স্বাভাবিক জলনির্গমের পথ রুদ্ধ হওয়ায় আবদ্ধ জল নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়া ভূমির আর্দ্রতা সম্পাদন ও পচিয়া বায়ুকে দূষিত করতঃ ম্যালেরিয়া অর্থাৎ দূষিত বায়ু-জনিত জ্বরোৎপত্তির কারণ হইয়াছে। পুরাতন খাল সকল অনেক স্থলে ভরিয়া গিয়াছে। সেই সকলের পঙ্কোদ্ধার ও নূতন বৃহৎ খাল খননের দ্বারাই মাত্র ইহার প্রতিকার হইতে পারে। অনেক গ্রামে জঙ্গল পচিয়াও বায়ু দূষিত হয়, সেই সকল জঙ্গল পরিষ্কৃত হওয়াও আবশ্যক। স্থানীয় লোক ও প্রধানতঃ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড দ্বারাই এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে। আজ কাল সম্পন্ন ও শিক্ষিত লোকসকল গ্রামে বাস পরিত্যাগ করিয়া সহরে আকৃষ্ট হওয়াতে গ্রামদেশের প্রতি তাঁহাদের উদাসীনভাব হইয়াছে ও তাহাতেই গ্রাম দেশে স্বাস্থ্যের ঈদৃশ অবনতি হইয়াছে। জন্মভূমির প্রকৃত সেবা ইঁহারা যতদিন না করিবেন ততদিন ইহার দুর্দ্দশা মোচন হইবার কথা নাই। সন্তানের প্রকৃত ভক্তি না থাকিলে মাতাকে কিরূপে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিবে?

পুরাতন জলাশয় সকল ভরিয়া যাওয়ায় এবং নূতন জলাশয় অতি অল্প সংখ্যায় খনিত হওয়ায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের বিশেষ অভাব প্রায় সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতেছে। তাহাতেই প্রতি বৎসরই অসংখ্য লোক ওলাউঠা রোগের করাল কবলে পতিত হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে এই বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব দূরীভূত করিতে সকলের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। জল ও বায়ু জীবনের এই দুইটী প্রধান উপকরণই যখন দূষিত হইয়াছে, তখন আমাদের জীবন যে ক্রমে ক্রমে অন্তঃসারশূন্য হইতেছে ও আমরা ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছি, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহি না। এই জন্যই আমরা আমাদের মধ্যে এরূপ মহামারী উপস্থিত দেখিয়াও উদাসীন রহিতে পারিয়াছি। স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের প্রাণ-রক্ষার চেষ্টাই দেশহিতৈষিতার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ, ইহা হৃদয়ঙ্গম না হইলে দেশোদ্ধার কখনও হইতে পারে না।

এতদুপলক্ষে রোগ অপেক্ষাও আয়ুঃ ও বলক্ষয়কর অপর একটী ভয়ঙ্কর শত্রুর কথা না বলিলে আমাদের প্রসঙ্গটী সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া আমরা মনে করি। সুরা-বিষে হিন্দুসমাজ ক্রমেই অধিকতর জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতেছে। মুসলমান ধর্ম্মের শাসনে মদ্য বিশেষরূপে নিষিদ্ধ থাকায় ধর্ম্মহানিকর বলিয়া ইহারা মদ্য স্পর্শও করে না; কেবল হিন্দুগণই সুরামায়াবিনীর কুহকে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেছে। মাদকনিবারিনী সভা করিয়া বিলাতে ও আমাদের দেশে কেবল উপদেশ ও প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দ্বারা ইহাকে বিতাড়িত করিবার বিফল চেষ্টা হইতেছে।

(৮) অভাবহেতু ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ—যখন দেশ জয় করিয়া করাল দুর্ভিক্ষ রাক্ষস ও ভীষণ মহামারী অসুর আসন স্থাপন করিয়া বসিল, তখন একহস্তে অন্ন ও অপর হস্তে বাইবেল লইয়া করুণপ্রাণ ধর্ম্মপ্রচারকগণ অন্নের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ভিক্ষহেতু ওষ্ঠাগতপ্রাণ নিঃস্ব হিন্দুগণ আবশ্যক বোধ না করিলেও অন্নের জন্য বাইবেলধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। ইহাতে আর কিছু হউক না হউক খ্রীষ্টভক্তের তালিকায় কয়েকটী সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের বিজয়দুন্দুভি দিগন্তনিনাদিত হইল। কিন্তু এই অভাবগ্রস্ত লোকসকল যে হিন্দুর কেবল ধর্ম্ম নহে কিন্তু হিন্দুর জাতীয়তা হইতেও, চিরদিনের জন্য ভ্রষ্ট হইল, তাহা ভাবিয়া একটি হিন্দুর প্রাণও ব্যাকুল হয় না। যতদিন হিন্দুর মনে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব জাগরিত না হইবে—যথার্থ সমবেদনা উদ্রিক্ত না হইবে, একতা বন্ধনের প্রবল আকর্ষণ অনুভূত না হইবে, স্বজাতীয়ের সহিত বিচ্ছেদ প্রাণবিচ্ছেদের তুল্য কষ্টকর বিবেচিত না হইবে, ততদিন অভাববশতঃ স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে দেখিয়া হিন্দুগণ সম্পূর্ণ উদাসীনই থাকিবেন। আপৎকালে হীনজাতির অন্ন গ্রহণে যে জাতি নষ্ট হয় না, ছান্দোগ্য উপনিষদে তাহার উপাখ্যান আমরা প্রাপ্ত হই। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে আপদ্

ধর্ম্মের উল্লেখ ও ব্যবস্থা আছে, তবে অভাবহেতু প্রাণসঙ্কটে যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিতে চেষ্টা হয় না কেন?

আমরা শুনিয়াছি, দুর্ভিক্ষপীড়িত কোন স্থানের লোকদিগকে দুর্ভিক্ষ সাহায্যের বিনিময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া খ্রীষ্টভজনার উপদেশ প্রদান করতঃ কোন ধর্ম্মপ্রচারকবর প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাহারা পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ পূর্ব্ববৎ স্বধর্ম্ম পালন করিতে থাকে। ধর্ম্মপ্রচারকবর পুনর্ব্বার তথায় প্রত্যাগত হইয়া তাহাদিগকে এবংবিধ অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া কারণজিজ্ঞাসু হইলে তাহারা অতি সরল ভাবে এই উত্তর দেয় "প্রভো! আমরা ইহাও (হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান) করি এবং উহাও (খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুষ্ঠান) করি!" ইহা অবশ্যই প্রভুর তুষ্টিকর হয় নাই, কিন্তু আমাদের কি ইহা মর্ম্মস্পর্শী নহে? যাহারা বিপাকে বিপদে পড়িয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তাহাদিগকে উদ্ধার না করা বা তাহাদিগকে যথা সময়ে সাহায্য না করা কি আমাদের পবিত্র জাতীয় কর্ত্তব্যের অবহেলা হয় না?

এতৎপ্রসঙ্গে রিজ্‌লি সাহেব তদীয় ভারতের জাতিসমূহ বিষয়ক People of India নামক গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের উপর মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব ও তৎপ্রযুক্ত হিন্দুধর্ম্মের ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এখানে প্রকাশিত হইতেছে।

"গেইট সাহেব ১৯০১ ইং সনের বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা গণনাবিবরণীর দ্বিতীয় পরিশিষ্টে হিন্দুদিগের মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণের দ্বারা মুসলমান লোকসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন—তৎসমস্ত নিম্নোক্তক্রমে উল্লিখিত হইতে পারে।—

(ক) মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ বা মৌলবীদিগের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মের পবিত্রতা ও সরলতা সম্বন্ধে আন্তরিক বিশ্বাসই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণ হিন্দুর মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণ।

(খ) নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে আপনাদের সামাজিক অবস্থা উন্নত করিবার জায়মান প্রবলাকাঙ্ক্ষা তাহাদিগের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষকে, যে ধর্ম্মবিশ্বাসের দ্বারা তাহাদের জীবনের অধিকতর সুবিধা লাভ হইবে বলিয়া বোধ হয়, সেই বিশ্বাস অবলম্বন করিতে প্ররোচিত করে। মালী, কাহার, গোয়ালা, নাপিত প্রভৃতি জাতি সকল এই প্রকার প্রবৃত্তির ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে।

(গ) "যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম" এই প্রবাদ বহুতর ধর্ম্মান্তরগ্রহণস্থলে প্রযুজ্য। হিন্দু যেমন সুন্দরী মুসলমান বালিকার রূপে মুগ্ধ হয়, তদ্রূপ মুসলমানও রূপসী হিন্দু যুবতীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়। হিন্দু-বিধবা আপনার বিষাদময় অদৃষ্ট এড়াইবার জন্য মুসলমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে হিন্দু, নিম্নজাতীয় বালিকার প্রণয়ে আসক্ত হইয়া সমাজের দ্বারা নিগৃহীত হইলে কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিশ্র সংস্রব অপেক্ষা বরঞ্চ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ দ্বারা মুসলমান সমাজে সম্মান-লাভেরই অধিক পক্ষপাতী হয়। ঈদৃশ অবস্থায় হিন্দুরই ক্ষতি হয় এবং মুসলমানেরই লাভ হয়—কারণ হিন্দুর কঠোর জাতিভেদের নিয়মে আর কেহই হিন্দু হইতে পারে না।

(ঘ) খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে নিষেধ এবং জাতিভেদ নিয়মের বহুতর ব্যভিচার সংক্রান্ত কারণ সকলও বিবেচিত হওয়া আবশ্যক। রুগ্নাবস্থায় মুসলমান কোন হিন্দুর পরিচর্য্যা করিলে ও মুসলমানের হাত হইতে সে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিলে সমাজ হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট হইতে হয়। তখন সে অধিকতর কৃপালু সমাজেই যোগদান করে।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ সমাজে যেরূপ হেয় ও ঘৃণিত ভাবে দৃষ্ট হয় এবং কোন প্রকার উন্নতির চেষ্টা করিলেই যেরূপ নিগৃহীত হয়, তাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি ও সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য ইহারা স্বতঃই প্রণোদিত হয়। রিজলি সাহেব লিখিয়াছেন:—

'দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের সবিশেষ সংখ্যাধিক্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের আত্ম অবস্থার প্রতি স্বাভাবিক ও শ্লাঘনীয় অসন্তোষের ভাব হইতে বহুল রূপে ঘটিয়া থাকে'।*

কিন্তু এই সকল প্রতিকূল ঘটনা সত্ত্বেও রিজলি সাহেব মুসলমান কি খ্রীষ্টধর্ম্মের দ্বারা হিন্দুর ধ্বংসসাধন আশঙ্কা করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ—"ইহা সম্ভাবিত নহে যে, গেইট্ সাহেব প্রদর্শিত কারণ সকল পৃথক্ বা মিলিত ভাবে এরূপ প্রবল ও বিস্তৃত প্রভাব প্রখ্যাপিত করিবে যে মুসলমান ধর্ম্মের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। দলে দলে মুসলমান হওয়ার দিনও আর নাই"। †

হিন্দু ক্রমে খাদ্যাদি সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে।

"খাদ্য পানীয় ও ভ্রমণ সম্বন্ধীয় অবান্তর বাধা সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর গুরুভার স্বরূপ ছিল। সেই সকল লাঘব করিবার বর্ত্তমান প্রবৃত্তি দ্বারা জাতিভেদের অত্যাচার হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণের প্রলোভন যে সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল কমিয়াছে, তাহা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। এই সমস্ত বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া একজন উন্নত ভারতবাসী যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন, এবং তাহাতেই বিরক্তিকর সামাজিক দণ্ড হইতে মুক্তি পাইবার জন্য খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সম্ভাবনা তাঁহার পক্ষে যে দূরবর্ত্তী হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার রূপেই বুঝিতে পারা যায়।"*

হিন্দুধর্ম্মের বিলোপ সম্বন্ধেও আশঙ্কার কারণ নাই বলিয়া রিজলি সাহেব এই প্রকারে মত প্রকাশ করিতেছেন—

"যে ধর্ম্ম দর্শন ও হৃদয়বৃত্তি উভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা ভারতীয় মানসিক প্রকৃতির মূলতঃ কোন পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ স্বস্থানচ্যুত হইবে না।"†

(৯) পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা হিন্দুধর্ম্মে অশ্রদ্ধা ও তাহা পরিত্যাগ—ইংরেজী জ্ঞানের প্রবর্ত্তন আমাদের সমাজে ও ধর্ম্মে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। অনেকে স্বধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাবান্ ও স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অদ্ভুত সময়োপযোগিতা দ্বারা বিপ্লবের প্রথম প্রবল বেগ অনেক প্রশমিত হইয়াছে—হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম আশ্চর্য্যরূপে প্রাগুক্ত মহাবিপ্লবে আত্মরক্ষা করিয়া উঠিয়াছে। রিজলি সাহেব হিন্দুর আত্মরক্ষার অমোঘ উপায় সম্বন্ধে যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া ক ব্য মনে করিতেছি।

"ইহা অনেক সময়ই বলা হইয়া থাকে যে ইংরেজী শিক্ষার বিশেষতঃ বিজ্ঞানের বিস্তার হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ

---

* "The remarkable growth in the number of the Native Christians thus largely proceeds from the natural and laudable discontent with their lot which possesses the lower classes of the Hindus".

† "It is needless to observe that none of these causes, nor all of them taken together, exercise an influence wide or potent enough to bring a great Islamic revival in India. The day of convertion en masse has passed and there are no signs of its return."—Peoples of India pp. 238-39.

* "But the inducement to seek in Christianity a refuge from the tyranny of caste has of late years been sensibly weakened by the modern tendency to relax these minor restrictions relating to food, drink and travel which weighed heavily upon the educated classes. Within certain limitations an advanced Indian can now do pretty much what he pleases in respect of such matters, and the probability of turning Christian in order to escape vexatious social penalties has thereby become appreciably more remote."—People of India pp. 241-42.

† "And a religion which rests both on philosophy and sentiment is likely to hold its ground until the Indian temperament itself undergoes some essential charge."—People of India pp. 246.

সাধন করিবে এবং নাস্তিকতার অরণ্যে দিশাহারা হইয়া ঘুরাই উন্নতিশীল হিন্দুর অদৃষ্টে আছে। এই মতে কয়েকটী সারবান্ বিষয় লক্ষ্য করা হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। যাঁহাদের সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধে তাহাদিগকে দ্বিবিধ জীবনযাপনে বাধ্য করে—তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও বৈজ্ঞানিক ধারণা বিভিন্ন মানসিক প্রকোষ্ঠে স্থাপন করিতে কোন কষ্ট বোধ করিবে না। হিন্দুধর্ম্মের উপযোগিতা সম্বন্ধে যথার্থ ভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে হিন্দুধর্ম্ম প্রাথমিক ইন্দ্রজাল (?) মূলক ধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিয়াছে সেই হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে বিজ্ঞানকে গ্রাস করিতে কোন প্রয়াস পাইবার কথা নয়।" *

(১০) **এতৎ প্রসঙ্গে আমাদের ধর্ম্মপ্রচারের উদাসীনতা ও অনুদারতার কথা** স্বতঃই আসিয়া পড়ে। আমরা প্রাচীন হিন্দুজাতির লোকসংখ্যাধিক্য ও তদ্ধেতু উপনিবেশ স্থাপনের আবশ্যকতার কথা বলিয়াছি। যে হিন্দু দূরদূরান্তর দেশে সভ্যতাবিস্তার করিয়াছিল সে হিন্দু যে ধর্ম্মপ্রচারও করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। হিন্দুধর্ম্মের বিবিধ নিদর্শন নানাদেশে আবিষ্কৃত হইয়া ইহার প্রমাণ দিতেছে। হিন্দুর ধর্ম্মপ্রচারপদ্ধতি কিন্তু প্রলোভন, কুটীলতা, বল, বা অপর ধর্ম্মের নিন্দামূলক নহে; প্রত্যুত বিচার ও প্রবৃত্তিমূলক—কারণ এই হিন্দধর্ম্মই ঘোষণা করিতেছে, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥" হিন্দু কখনই নিজের ধর্ম্ম পরের উপরে চাপাইতে যায় নাই। আপনার ধর্ম্ম অন্যের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছে; অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়াছে; তাহাতেই লোকে এই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া ইহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কোথায় বা লোকসকল হিন্দুধর্ম্মের অপূর্ব্ব মহিমাশ্রবণে এই ধর্ম্মগ্রহণের প্রবল আগ্রহ দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রচারকদিগকে আপনাদের দেশে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই প্রকারে চীন তিব্বত ও জাপানে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের প্রচার ধর্ম্মের শান্ত ও উদার ভাব প্রণোদিত; বলপ্রয়োগের লেশমাত্র ইহাতে নাই। মহাপ্রভু চৈতন্য দেব আধুনিক কালেও ধর্ম্মপ্রচারে এই উদার ভাবেরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বের সহিত মুসলমান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে হিন্দু যে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল, চৈতন্যের ধর্ম্মপ্রচার সেই স্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু ইহাতে প্রবল রাজশক্তি তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। তথাপি চৈতন্যদেব বিচলিত হইলেন না। কারণ ধর্ম্মের শক্তির নিকট অপর সকল শক্তিই মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। চৈতন্য এই ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া কেবল স্বজাতিকে আসন্ন ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিলেন তাহা নহে, কিন্তু বিজাতীয় ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত স্বকীয় ধর্ম্মভাবের দ্বারায় অনুপ্রাণিত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব প্রদর্শন করিলেন। চৈতন্য হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচারের সেই প্রাচীন উদার ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুসলমানকে পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। হরিদাস মুসলমান হইলেও পরম বৈষ্ণব হইয়া চৈতন্যের ভক্তবৃন্দ মধ্যে 'হরিদাস সাধু' নামে উচ্চাসন লাভ করিলেন। চৈতন্যদেব "আচণ্ডাল কোল দিয়া" হিন্দুধর্ম্মের বিশ্ব-প্রেম ভাব দেখাইয়া সকলকে অভিভূত করিলেন। তদীয় প্রেম-ধর্ম্মের বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল। পর্ব্বত কানন

---

* "It has often been said that the advance of English education, and more especially of science, will make short work of the Hindu religion, and that the rising generation of Hindus is doomed to wander without guidance in the wilderness of agnosticism. This opinion seems to lose sight of some material considerations............Men whose social and family relations compel them to lead a double life, will find little difficulty in keeping religious beliefs and their scientific convictions in separate mental compartments. ....It may fairly be said in justice to the adaptability of Hinduism that a religion which has succeeded in absorbing Animism is not likely to strain at swallowing science."—People of India.

ভেদ করিয়া এই বন্যা প্রবাহিত হইল। ইহাতে নিমজ্জিত হইয়া পাপী তাপী সকলেরই দেহ শীতল হইল, ধর্ম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত হইল। এই প্রকার বঙ্গদেশের বন্যজাতি পর্য্যন্ত চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্মের দীক্ষায় প্রাপ্ত হইল। এইরূপে চৈতন্য ধর্ম্মের প্রচারে বঙ্গদেশে হিন্দু জাতির অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয় হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বের পর যেরূপ ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা তদ্রূপ মুসলমান ধর্ম্মের পর খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব। খ্রীষ্টধর্ম্মের চাকচিক্য ও স্বাধীন ভাব এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার চমৎকারিত্ব যেন হিন্দুর নিকট স্বর্গরাজ্যের সংবাদ আনিয়া দিল। ইংরেজী শিক্ষা এই বার্ত্তাবহনব্যাপারে দূতের কার্য্য করিল। শিক্ষিত হিন্দু যুবক আপনার জাতি-ধর্ম্ম ভুলিয়া সেই দিকেই আকৃষ্ট ও ধাবিত হইল। ইহাতে হিন্দু-সমাজে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল—দলে দলে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। এই বিপ্লবকালে হিন্দুকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পুরাণ প্রতিপাদিত ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত করিয়া জাতীয় জীবন অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রামমোহন রায় উপনিষদ্ প্রতিপাদিত ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত করিয়া জাতীয় জীবন অনুপ্রাণিত করিলেন। চৈতন্য মুসলমান ধর্ম্মের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন, রামমোহন খ্রীষ্টধর্ম্মের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিকরিলেন। চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রশস্ততে যেমন মুসলমানের স্থান হইয়াছিল—রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রশস্ততেও খ্রীষ্টানের স্থান হইল। চৈতন্যের ধর্ম্ম স্বদেশেই প্রচারিত হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদেশেও প্রচারিত হইয়াছে।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানমূলক বলিয়া ও ইহাতে যাবনিক ভাবের সংমিশ্রণ থাকায়, ইহা খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতায় অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইলেও, দেশের পক্ষে তেমন উপযোগী হইতে পারে নাই। তাহাতেই পরমহংস রামকৃষ্ণদেব হইতে মার্জ্জিত বেদান্ত ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে। তদীয় ধর্ম্মে বিশুদ্ধ হিন্দুভাব ও পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান ভাবের এমনই অপূর্ব্ব সুন্দর মিলন হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, শিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজও, তদ্রূপ তৃপ্তিই লাভ করিতে পারে। চিকাগো মহাধর্ম্মসম্মিলনীতে মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামীর প্রভাব ও প্রচারে যে ইহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে ও তৎপর হইতে মার্কিন দেশে যে ইহার বহুল প্রচার হইতেছে, তাহাতে অনেকেই আশা করেন যে প্রাচ্যদেশের দ্বারাই পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হইবে ও প্রাচ্যদেশই ধর্ম্মগুরুর পদে বরিত হইবে। রামকৃষ্ণ প্রচার সম্প্রদায় শিক্ষিত হিন্দুসমাজ সংরক্ষণ কল্পে সবিশেষ সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু ইহাদের ধর্ম্মও জ্ঞানীরই ধর্ম্ম, সাধারণ সমাজের আয়ত্ত নয়। লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকার্য্য কখনও কেহ গ্রহণ করে নাই। সুতরাং অপরাপর ধর্ম্মের প্রচারকের প্রলোভন, প্ররোচনা, কুতর্ক প্রভৃতি দ্বারা হিন্দুসমাজের অংশ বিশেষে সময়বিশেষে ধর্ম্মবন্ধন যে শিথিল হইয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এই উদাসীন ভাব পরিত্যক্ত হইয়া রীতিমত প্রচার সম্প্রদায় গঠিত হইলে হিন্দুসমাজ কেবল যে রক্ষিত হইবে তাহা নহে, কিন্তু ইহার বিস্তারও সাধিত হইতে পারিবে। কিন্তু এই প্রচার ও সমাজ বিস্তার জন্য প্রচারকদিগকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া উদার ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। তখন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, এখনও অনেক অসভ্য বন্যজাতি আগ্রহের সহিত হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে। হিন্দু ধর্ম্মের হস্তাবলম্বন পাইলেই ইহারা আসিয়া সমাজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়।* রামায়ণ, মহাভারতাদিতে আর্য্য জাতির

---

* The Manipuris for example were converted from Nagas into Hindus only a century or two ago"—People of India, p. 262. 'দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, নাগাজাতি হইতে এক কি দুই শতাব্দী হইল মণিপুরিগণ হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

সহিত অনার্য্য জাতির সংমিশ্রণের ইতিহাস সংরক্ষিত হইয়াছে। সেই পূর্ব্বসম্বন্ধের ফলেই যেন হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অনার্য্যদিগের একটী স্বাভাবিক আকর্ষণ দৃষ্ট হয় এবং হিন্দু জাতির সহিত অনার্য্য জাতির একপ্রকার সহজাত ঘনিষ্ঠতা সঙ্ঘটিত হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্ব্বকার সেই প্রচার ও তাহাদের সহিত সেই সংস্রব নিবৃত্ত হওয়াতেই তাহারা পুনর্ব্বার কুসংস্কারান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে—সুতরাং তাহাদের মধ্যে পুনর্ব্বার হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অধুনাতন সময়েও, দেখা গিয়াছে যে বঙ্গদেশেই অনেক অনার্য্য জাতি হিন্দুর সমাজভুক্ত হইবার জন্য একান্ত উৎসুক, হিন্দুর রীতিনীতি অনুকরণে নিতান্ত ব্যগ্র। † হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য এমন কি নিজের মাতৃভাষা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। পশ্চিম বঙ্গের "ভূমিজ" জাতির মধ্যেই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ‡

হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকার্য্য যথারীতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আবার একধর্ম্মের বন্ধনে মিলিত হইয়া হিন্দু তখন আপন সমাজের বিশালতা, অতুল বল দর্শন করিয়া মহাশক্তির সঞ্চার আপনার মধ্যে অনুভব করিবে।

(১১) শাস্ত্রের সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত ব্যাখ্যাহেতু সম্প্রদায় ও জাত্যন্তরের সৃষ্টি—কিন্তু ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন সমাজকে দীক্ষিত করিবার পূর্ব্বে হিন্দুকে নিজের দীক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। নিজের গৃহ ঠিক না করিয়া পরের গৃহ ঠিক করিতে যাইয়া কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সাম্প্রদায়িক বিসম্বাদে বলক্ষয় করিতে হইলে, প্রচার কার্য্য কখনই সুচারুরূপে চলিবে না। বিশেষতঃ আমরা নিজেদের মধ্যে যদি উদারতা দেখাইতে না পারি, তবে পরের মধ্যে উদারতা দেখাইতে কখনই সমর্থ হইব না। সুতরাং যে উদারতাকে আমাদের প্রচারের সাধনমন্ত্র করিতে হইবে—তাহাকে পূর্ব্বে আমাদের সম্প্রদায় সমন্বয়ের সিদ্ধ মন্ত্র করা চাই। পার্থক্যই জগতের নিয়ম, বৈচিত্র্যই জগতের স্থিতি—হিন্দু সকল বিষয়েই ইহা বুঝিয়াছিলেন; ধর্ম্মসমাজ আরও অধিক বুঝিয়াছিলেন, তাহাতেই হিন্দুর দেবতার অন্ত নাই, মতের অন্ত নাই—"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" তবে ধর্ম্মের সামান্য বিরোধে হিন্দু অসহিষ্ণু হয় কেন? ইহার কারণ এইযে সাম্প্রদায়িতার ক্ষুদ্র কূপে বদ্ধ হইয়া হিন্দুর সেই দূরদর্শনশক্তি নষ্ট হইয়াছে। হিন্দু 'ব্রাহ্ম'নাম শুনিলেই তাহাকে আপনার শত্রু বলিয়া মনে করিয়া লয়—নূতন ধর্ম্মের নাম শুনিলেই ইহাকে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। আপনাদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখিলে বাদপ্রতিবাদের দ্বারা তাহাকে পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করে। শাস্ত্রের সমর্থন না পাইলে অন্ততঃ শাস্ত্রের বিকৃত বিপরীত ব্যাখ্যার খড়্গ লইয়া হইলেও বিরুদ্ধবাদীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। এইপ্রকার কেবল বিরোধের দিকে দৃষ্টি করিতেই হিন্দু অভ্যস্ত হইয়া নিতান্ত সঙ্কীর্ণমনা হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে হিন্দুর মধ্যে জাতিবিরোধ অনিবার্য্য হইয়াছে। ধর্ম্মমতের সামান্য ভেদে, সামাজিক মতের সামান্যভেদে, হিন্দুর ভ্রাতৃগণ হিন্দুজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্নজাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে * বা ভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। শিক্ষা ও উন্নতির জন্য হিন্দুর কোন ভ্রাতা সমুদ্রপার হইয়া বিদেশে গমন করিলে

† "The Chutiya, Koch, and Rajbansi have accepted Hinduism. The Madhahi, Mahalia, Robha, Sarania, Totila, are semi-Hinduized; but the Garo, Hajong, Kachari, Lalung, and Mech remain in their own faiths" —Cyclopoedia of India by Balfour p 250.

‡ A whole tribe of aborigines or a section of a tribe, becomes gradually converted to Hinduism without abandoning their tribal designation. This is what has happened among the Bhumij of Western Bengal. Here a pure Dravidian race have lost their original language and now speak only Bengali; they worship Hindu gods in addition to their own and the more advanced among them employ Brahmans as family priests"—The Imperial Gazetteer of India—The Indian Empire. vol. I, p. 316.

* "In Southern India whole castes have been known to have become Mahammadans been are the Brahmans

তাহাকে কিরূপে সমাজচ্যুত করিয়া নিগৃহীত করিতে হইবে, তাহাই হিন্দুর একমাত্র ধ্যান ও চেষ্টা হয়, তদর্থে শাস্ত্রব্যবস্থা সংগৃহীত হয়; কিন্তু তাহাকে সমাজে গ্রহণ করার কোন আগ্রহই পরিলক্ষিত হয় না। ইহাতে সমাজ হইতে সুশিক্ষিত, সুমার্জ্জিত উন্নত লোকসকল বর্জ্জিত হওয়াতে হিন্দু সমাজের যে সবিশেষ ক্ষতি সাধিত হইতেছে—তাহা ভাবিবার কাহারও অবসর হয় না। জাতি রক্ষা করিতে হইলে, সমাজের বলবৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন করিতে হইলে প্রাগুক্ত সঙ্কীর্ণ নীতি অনুসরণ করিলে চলিবে না। বিরোধের সম্ভাবনা দেখিলেই সামঞ্জস্যের কথা ভাবিতে হইবে—বিচ্ছেদের আশঙ্কা দেখিলেই মিলনের প্রয়াস করিতে হইবে। শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক অনুদার মতসমস্তের সুদৃঢ় প্রাচীর সকল ভগ্ন করিয়া সর্ব্বজনীন উদার মতের সুবিশাল ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার উজ্জ্বল আলোকে, মুক্ত বায়ুতে, প্রশস্ত-বক্ষে পুনর্ব্বার হিন্দুর জাতীয়-সমৃদ্ধি পূর্ব্ববিকাশ লাভ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার মহত্ব ও সভ্যতার গৌরব-মুকুট প্রদান করিবে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সন্তান-পালন

পোষাক পরিচ্ছদঃ—বস্ত্রপরিধানের প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য শরীরের তাপ রক্ষা করা, শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করা, এবং দেহকে সুশোভিত করা। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এখানে অধিক বস্ত্রের আবশ্যক করে না। শীতপ্রধান দেশবাসী সাহেবদিগের অনুকরণে আমাদের বেশভূষার কতকটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। এখন আর সুধু ধুতিচাদরে আমাদের মন উঠে না। এখন আমাদের টাইট্ কোট্, নেক্‌টাই, কলার্ প্রভৃতি বহুতর অনাবশ্যক দ্রব্য না হইলে যেন ভদ্রতা রক্ষা হয় না। ইংরাজদিগের বসনভূষণ যে আমাদের দেশের উপযোগী নয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; তাই বলিয়া আমাদের দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত বসনভূষণের যে কোনরূপ সংস্কারের আবশ্যক নাই, এ কথা যেন কেহ মনে না করিয়া বসেন। আপনার ছেলেমেয়েদের পোষাকপরিচ্ছদাদির ব্যবস্থা করিবার সময় এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে, যে সকল বস্ত্রাদি পরিধান করিলে, উহাদের হস্তপদাদির অবাধ সঞ্চালনে বিঘ্ন উপস্থিত হয় সেগুলি কোন মতেই তাহাদের উপযোগী হইতে পারে না। উহাদের বসন-ভূষণগুলি বেশ ঢিলা গোছ হওয়ার আবশ্যক। ছেলেদের গেঞ্জি ফ্রক কি কথা কোট দিতে নাই। এ সকল পরিলে নিশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়। খুব ভারি কাপড়ও উহাদের ব্যবহার করিতে নাই। যে সকল বস্ত্র পরিধান করিলে, আপনা হইতে ঘর্ম্ম হয় সেগুলিও তাহাদের পরিধান করিতে দিতে নাই।

সদ্যোজাত শিশুদের বস্ত্রাদি কিরূপ হওয়া উচিত, এ বিষয় ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুল্লেখের কোন আবশ্যক দেখি না। দু-বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়ের কাপড়চোপড়ের কোনরূপ পার্থক্য করিতে নাই। ইহার পর ছেলেমেয়ের কাপড় চোপড় বিভিন্ন-রূপ হওয়া উচিৎ। আমাদের দেশে পুরুষের জাতীয় বেশ হইতেছে ধুতি ও উড়নি। স্ত্রীলোকদের পক্ষে আবার উত্তরীয়েরও কোন ব্যবস্থা নাই। তাহাদের পক্ষে সুধু এক খানি সাড়িই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে আমাদের জাতীয় বেশের অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এখন আর মেয়েদের সুধু একখানি

---

would not allow them to enter Hindu temples and compelled them to worship outside."—People of India p 259.

"ব্রাহ্মণগণ দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় ও মন্দিরের বাহিরে পূজাদিতে বাধ্য করায় দক্ষিণ ভারতে জাতিকে জাতি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সাড়িই যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন না। এখন তাঁহারা মেয়েদের সেমিজ বডিস্ প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থাটি আমাদের নিকট অতিশয় সুরুচিসঙ্গতই বলিয়াই মনে হয়।

দু-বৎসরের শিশুদের পক্ষে ধুতি ঠিক উপযোগী বলিয়া বলিয়া মনে হয় না—ধুতির পরিবর্ত্তে ইহাদিগকে ইজার সার্ট্ কিম্বা ঢিলা কোটের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। যাঁহারা ইজার পরাইতে অনিচ্ছুক তাঁহারা ধুতি পরাইতে পারেন, কিন্তু তাহা "মাল কোঁচা" করিয়া পরাণ উচিৎ। ছেলেদের কোঁচা করিয়া কাপড় না পরানই ভাল। একটু বয়স্ক ছেলেদের কাপড়ের নীচে একটি করিয়া ড্রয়ার (drawer) পরান খুবই ভাল। এ দেশে সদাসর্ব্বদা জামাজোড়া জড়াইয়া থাকিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। শিশুকাল হইতে শীতাতপ সহ্য করান উচিৎ। এরূপ করিলে অতি সহজে সর্দ্দি-লাগার সম্ভাবনা থাকে না। গ্রীষ্মকালের অপেক্ষা শীতকালে অধিক বস্ত্রের আবশ্যক হয়। আমাদের দেশে শীতকালে ছেলেদের র‍্যাপার দেওয়া হয়। ইহা উহাদের পক্ষে ঠিক উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। ফ্লানেলের পেণ্টালুনই আমাদের নিকট অধিকতর উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। গলাবন্ধ, টুপি একান্তই অনাবশ্যক জিনিস। ইহাদের কোন অবস্থাতেই ব্যবস্থা করিতে নাই। ছেলেদের জুতা যেন অতিরিক্ত কষা না হয়। উহার অগ্র ভাগ যেন বেশ প্রশস্ত হয়। বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশুদের বুট জুতা দিতে নাই, ইহাদের পক্ষে (shoe) শুই ভাল। অষ্টপ্রহর জুতা পায়ে দিয়া থাকা উচিত নহে।

দুই বৎসর বয়সের পর ছেলেমেয়েদের বেশভূষা বিভিন্ন হওয়া উচিত। যে সকল মেয়ে একটু বড় হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে শেমিজের উপর সাড়ি ও বডিস ব্যবস্থা করা মন্দ নহে। খুব ছোট মেয়েদের পক্ষে সাড়ি সামলান সম্ভবপর নহে। ইহাদের পক্ষে ড্রয়ার, শেমিজ্ ও বডিস মন্দ পরিচ্ছদ নহে।

বাল্যকালের খাদ্য—খাদ্যসম্বন্ধে সকলেরই একটু আধটুকু জানা থাকা কর্ত্তব্য। খাদ্য ও আহারের দোষে প্রতি বৎসর কতগুলি করিয়া শিশুর যে প্রাণ নষ্ট হইতেছে, তাহার স্থিরতা নাই। অনেকের বাড়ীর কেমন কুপ্রথা, গৃহে যাহা হয়, কিছুমাত্র বিচার না করিয়া এক বৎসরের শিশুকে তাহা খাইতে দেওয়া হয়। ইহার ফলে; তাহার বদহজম হয়, দেহ শুকাইয়া যায়, অনেক সময় তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়া যায়। অজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ। খাদ্যবিষয়ে সামান্যমাত্র জ্ঞান থাকিলে এরূপ ঘটনা কদাচ ঘটিবার সম্ভাবনা।

বাল্যকালই শরীরের গঠন ও বৃদ্ধির সময়। খাদ্য দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি ও গঠন হয়। উপযুক্ত খাদ্য না হইলে, শরীরের অস্থি মাংস স্নায়ু প্রভৃতির পরিণতি হইতে পারে না। বাল্য ও শৈশবের অনেক রোগই খাদ্যদোষজাত বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সুদক্ষ মালী, রৌদ্র, বাতাস, জল, এবং সারের দ্বারা বৃক্ষ ও ফলফুলের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে উৎকর্ষ ত দূরের কথা, বরঞ্চ অপকর্ষই ঘটিয়া থাকে। বৃক্ষ সম্বন্ধে যে নিয়ম খাটে, বালকবালিকাদের পক্ষেও তাহা তুল্য ভাবেই খাটিয়া থাকে। উপযুক্ত খাদ্য, জল ও বাতাস না পাইলে, খুব হৃষ্টপুষ্ট শিশুও শুকাইয়া যায় এবং রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

পশুসন্তান ও মানবশিশুতে প্রভেদ এই যে, পশু শিশু গোড়া হইতেই, তাহার পক্ষে কি আবশ্যক বা অনাবশ্যক, তাহা বেশ বুঝিতে পারে, মানবশিশু তাহা পারে না। মানবশিশুকে বহুদিন ধরিয়া সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। খাদ্যের দোষগুণ সে বহুদিন ধরিয়া বুঝিতে পারে না, তাহাকে যাহাই খাওয়ান যায়, সে তাহাই গিলিয়া বসে। এরূপ অবস্থায় যদি মাতার খাদ্যবিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে সন্তানের মঙ্গল আশা কি করিয়া করা যায়?

আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহেই ছেলে বুড়া

একই সঙ্গে আহারে বসিয়া থাকে, এবং একই দ্রব্য আহার করিয়া থাকে। ইহা আমাদের নিকট নিতান্ত কুপ্রথা বলিয়া মনে হয়। বয়স্কদিগের জন্য যে সকল খাদ্য প্রস্তুত হয় ছেলেদের পক্ষে সে সকল হজম করা খুব সহজ ব্যাপার নহে।

খাদ্যের উদ্দেশ্য অবশ্য শরীরের প্রত্যেক অংশ প্রত্যংশের পরিণতি ও ক্ষয়পূরণ করা। এ ছাড়া খাদ্যের আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। খাদ্য না হইলে শরীরের প্রত্যেক অংশের যাহা স্বাভাবিক ক্রিয়া তাহা হইতে পারে না। খাদ্য না হইলে মানুষ কোন কাজ করিতে পারে না, শরীরের তাপ রক্ষা হয় না। মোটামুটি বলিতে গেলে খাদ্যকে নিম্নের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) প্রোটিড্ (Proteid) খাদ্য, যেমন মৎস্য মাংস, ডিম্ব, ছানা, দাইল প্রভৃতি।

(খ) কার্ব্বোহাইড্রেট (carbohydrate) খাদ্য যেমন—চিনি, আলু, বার্লি, ভাত প্রভৃতি।

(গ) হাইড্রোকার্ব্বন্ (hydro carbon) খাদ্য, যথা তৈল, ঘৃত, বসা (fat) প্রভৃতি।

(ঘ) লবণ, মশলা প্রভৃতি।

(ঙ) জল।

ইহাদের মধ্যে প্রোটিড্ জাতীয় খাদ্য দ্বারা শরীরের গঠন ও পরিপোষণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই কারণে খাদ্যের মধ্যে এই জাতীয় খাদ্যই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া বিবেচিত হয়। কার্ব্বোহাইড্রেট্ ও হাইড্রোকার্ব্বন জাতীয় খাদ্যের শরীর পোষণের অথবা শরীরের ক্ষয় পূরণের কোন ক্ষমতা নাই। ইহাদের প্রধান কায আমাদের শরীরের তাপ রক্ষা করা, এবং কায করিবার শক্তি প্রদান করা। লবণ ও জলের শরীর পোষণ অথবা শরীরের তাপরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে কোনই ক্ষমতা নাই বটে, তথাপি এ সকল না হইলে আমাদের চলিতে পারে না। আমাদের শরীর যে সকল দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত আহাদের মধ্যে লবণ ও জল বড় অল্প স্থল অধিকার করে না। শরীররক্ষায় মশলার কোন আবশ্যক নাই। ইহাদের দ্বারা খাদ্যদ্রব্য মুখপ্রিয় করা হয় মাত্র।

বালকবালিকাদিগের খাদ্যতালিকায় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির উল্লেখ করিতে পারা যায়।

(অ) মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ এবং দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ও দাইল। এ সকল বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহাদের দ্বারা শরীরের গঠন ও ক্ষয়পূরণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

(আ) ভাত, রুটি, মিষ্ট খাদ্যাদি ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ কার্ব্বোহাইড্রেট্ আছে। ইহারা প্রধানতঃ শরীরে শক্তি দেয় এবং তাপ রক্ষা করিয়া থাকে।

(ই) ঘৃত তৈল। ইহাদের ক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য গুলিরই ন্যায়। প্রভেদ এই যে, এক ছটাক চিনিতে যতটা তাপ উৎপন্ন করিতে সমর্থ এক ছটাক ঘৃত কি তৈল তাহার ২॥।৩ গুণ তাপ সৃষ্টি করিতে পারে।

(ঈ) তরি তরকারি, ফলফুলারি।

(উ) জল, লবণ।

রন্ধনের উদ্দেশ্যঃ—অধিকাংশ খাদ্য দ্রব্যই রন্ধনের দ্বারা গ্রহণের উপযোগী হয়। চাউল, দাইল, মাছ, মাংস, তরি তরকারী প্রভৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় খাইলে জীর্ণ হয় না। কোন খাদ্য কি ভাবে রাঁধিলে আহারের উপযোগী হয়, সে বিষয়ে কতকটা জানা না থাকিলে উত্তম পাচক হওয়া যায় না। রন্ধনের দোষে খুব সহজপাচ্য দ্রব্য অতিশয় গুরুপাক হইয়া পড়ে। রন্ধনবিদ্যা সামান্য বিদ্যা নহে। সকল মেয়েদের এ বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

খাদ্যের পরিপাকঃ—আমরা যে সকল খাদ্য খাই তাহার শেষ কি হয় তাহারই আলোচনা করা যাউক। খাদ্য মুখে দিয়া আমরা উহা বেশ করিয়া চর্ব্বণ করিতে থাকি। ইহাতে উহা চূর্ণবিচূর্ণ হয়। তাহার ফলে, পাচক রস উহার উপর সহজে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। খাদ্য যতক্ষণ মুখের মধ্যে থাকে, মুখ হইতে

লালা নিঃসৃত হইয়া উহার সহিত মিশ্রিত হয়। এই লালা দ্বারা খাদ্যের শ্বেতসার অংশ জীর্ণ হইতে থাকে। মাংস ডিম্ব প্রভৃতির উপর লালা কোন কাজ করে না। সে যাহা হউক, চর্ব্বণক্রিয়া শেষ হইলে আমরা খাদ্য-গ্রাসটি গিলিয়া ফেলি, ইহা তখন আমাদের পাকস্থলীতে গিয়া পড়ে। পাকস্থলীর গাত্র হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়, ইংরাজীতে ইহাকে গ্যাষ্ট্রীক যুস্ (gastric juice) কহে। এই রস মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, দাইল্ প্রভৃতি প্রোটিড্ (proteid) জাতীয় খাদ্যের উপর ক্রিয়া করিতে থাকে। শ্বেতসার, চিনি, ঘৃত তৈল প্রভৃতির উপর পাকস্থলীর রসের কোন ক্রিয়া হয় না। পাকস্থলী হইতে খাদ্যদ্রব্য ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রান্ত্রে (small intestines) নীত হয়। এখানে ত্রিবিধ পাচক রস দ্বারা ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। সে তিনটি পাচক রস এই ঃ—(১) পিত্ত ; ইহা ঘৃত, তৈল, বসাকে (fat) জীর্ণ করিয়া থাকে। (২) ক্লোমরস (pancreatic juice); ইহা কার্ব্বোহাইড্রেট্ ও প্রোটিড্ উভয়বিধ খাদ্যের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। (৩) অন্ত্রের রস ; ইহা দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য সম্পূর্ণভাবে জল হইয়া শোষণের উপযোগী হয়। ব্লটিং পেপার যেমন কালী শুষিয়া লয় অন্ত্রের গা দিয়াও তেমনি খাদ্যের সারাংশ শোষিত হয়। শেষে রক্তের মধ্যে গিয়া, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পুষ্টি সাধন করিতে থাকে। খাদ্যের যে অংশটি অসার, তাহা শোষিত হয় না. কালক্রমে মল আকারে দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়।

জন্ম হইতে দু বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। দুধই শিশুদের প্রধান খাদ্য। ৭ মাস বয়স হইতে দুধ ব্যতীত একটু আধ্ টু অন্য দ্রব্যাদিও দিতে পারা যায়। দু বৎসর বয়সের পর শিশুর খাদ্য-তালিকা মাসে মাসে বৃদ্ধি হইতে থাকে। এখন তাহাকে একটু মাছ, মাংস, আলু, চিনি সন্দেশ, মিঠাই প্রভৃতিও দেওয়া যাইতে পারে। ছেলের জন্য প্রতি দিনই মাংসের ব্যবস্থা করিতে নাই। শিশু যত বড় হইতে থাকিবে, উহার খাদ্যের পরিমাণ একটু একটু বাড়াইতে হইবে। তিন বৎসর বয়স হইলে, সপ্তাহে ৩।৪ দিন করিয়া একটু পাকা কলা, আতা প্রভৃতি ফল দেওয়া যাইতে পারে। শিশুদের ফলফুলারি অধিক খাইতে দিলে প্রায়ই পেটের দোষ জন্মাইতে দেখা যায়।

আহারে বসিয়া জল খাওয়া উচিত নয়; আহারের ২।১ ঘণ্টা পরে জলপান করিতে হয়। ভোজনের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা উচিত। খাবার দেখ্‌লেই যে লোভ হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। ইহা ভারি কু অভ্যাস। তাড়াতাড়ি করিয়া না খাইয়া ধীরে ধীরে খাওয়া উচিত। শৈশব হইতেই যাহাতে ভাল করিয়া চর্ব্বণ করা অভ্যাসটি জন্মায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। অনেক ছেলেমেয়ে আছে, তাহারা আহারে বসিয়া অকারণ বিলম্ব করে ইহাও ভাল নহে। অনেকে আবার খাদ্য লইয়া খেলা জুড়িয়া দেয়। ইহাতে খাদ্য ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এই ঠাণ্ডা খাদ্য সহজে জীর্ণ হয় না। আহারে বসিবার পূর্ব্বে ছেলেমেয়েদের হাতমুখ পরিষ্কার করা উচিত।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগচী।

বিশ্বজলের দেবী *

১

আপনি উঠে থেকে থেকে অঙ্গ সরসিয়া
শ্রাবণ-জল-সজল-রজনীতে ;
ছল ছলিয়ে মুক্তি মাখা বিশ্বরসের গীতি
আপনি বাজে আত্মহারা চিতে।

---

* অনতিবিলম্বে প্রকাশিতব্য কবিতাগ্রন্থ "পল্লী" হইতে গৃহীত।

২

হয়ত মনে কোথায় আছে আজি
বিশ্বজনের দেবী,
কেমন করে একলা কোথা বসে
তাঁহার চরণ সেবি :
আধেক ফোটা এই জোছনা মাঝে
কোন তরণী-বুকে,
কমল-ফোটা মুক্ত সে কোন বিলে
ভাসব দোঁহে সুখে ;
কুমুদ-ফোটা কোন খালেতে আজি
বসব ধরে হাল,
মন্দ বায়ে বাতাস ভ'রে ভ'রে
উড়বে সাদা পাল।
পাটির মত কোন্ তটিনী মোরা
বদর ব'লে শেষে
পাড়ি দিয়ে উত্তরিব যেয়ে
কোন্ অজানা দেশে।
ভরা জলে ধানের মাঠের ধারে,
হিজল গাছের কাছে
রাখ্‌ব তরী পাট-কাটা যে ক্ষেতে
স্বচ্ছ সলিল নাচে।
গভীর ভাবের কণ্ঠ-খোলা গানে
আকাশ দিব ভরি,—
বস্‌বে রাণী ভাবের সমুদ্‌রে
আমার হস্ত ধরি।
নিরাকারের মুক্ত বাতাসেরি
পরশ লভি' লভি'
অন্ধতা ও বন্ধ্যাতা এ মনের
টুটবে আমার সবি।

৩

আবার কখন রাখব তরী
বাঁশ বাগানের ধারে—
গাব বনেরি কালো ছায়ায়
নিবিড় ঝোপে ঝাড়ে।
অন্ধকারে বলব তাঁরে
গোপন যত কথা ;—
কক্ষ হারা তারার যত
মৃত্যু ব্যাকুলতা।
মর্ত্ত্যজীবের প্রেম কাহিনী
বলব আমি তারে,—
সতীর দুঃখে কাঁদবে সতী
পুণ্য অশ্রু ধারে !
বলব আরো কত কথা
উঠ্‌ছে জেগে মনে ;
এমনি মোরা কাটব নিশি
মাঠে, খালে, বনে।
ছুট্‌ব মোরা সকল খানে
ভাবেতে বিহ্বল ;
তরী বেয়ে ছুটব লুটে
পল্লা ভরা জল।

৪

কোন ভাষাতে বলব আমি,
কেমন হ'ল আজকে আমার
অজানা আহ্লাদ,—
সরসিত অঙ্গ হ'ল,
হরষিত চিত্তে আমার
কিসের হ'ল সাধ।
এই বরষা, এই যামিনী,
সজল নভে ঐ যে ভাসে
অভ্র মাখা শশী—
আমার প্রাণে জাগায় ওরা
সজল যত সপ্ন কেন,
ভাব ছি বসি' বসি'।
নিদ্রা নাহি আমার চোখে,—
ধ্বনিয়ে আছে স্তরে স্তরে
পল্লী বনে বনে।
এ জগতে আছি আমি ?

কোথাও নাহি—কোথাও নাহি.
মগ্ন কি স্বপনে !
আজকে আমি কারে চাই ?
কেউ সে নহে কেউ সে নহে।
সত্য বুঝি তাই ?—
বিশ্ব জনের দেবী কোথায় ?
চুপ টি করে ঘুমা যাদু
নাই. সে কেহ নাই !
শ্রীদুর্গা মোহন কুশারী।

ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য

(শেষার্দ্ধ)

ডাক্তার কার্ণ ও ভাউদাজির মতে বিক্রমাদিত্য খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতাবলম্বীগণ সাধারণতঃ যে সমুদয় প্রমাণ উপস্থিত করেন আমরা সংক্ষেপে তাহার সমালোচনা করিতেছি।

(১) প্রচলিত ইতিকথা অনুসারে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহির বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থ হইতে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে. বরাহমিহির খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং বিক্রমাদিত্যের ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

এ সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি এই যে, বরাহমিহির যে বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন, এ বিষয়ে কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ নাই। কেবল মাত্র জ্যোতির্বিদা ভরণ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ মহাকবি কালিদাসের রচনা বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু ডাক্তার ভাউদাজী প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ইহা কদাচ উক্ত মহাকবির লেখনীপ্রসূত নহে। ডাক্তার হলও বলেন যে ইহা অত্যন্ত আধুনিক রচনা। এখন প্রশ্ন এই যে, বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থে এবং প্রস্তর-লিপিতে সংবৎ প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্যের সম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ আছে, একমাত্র ভোজপ্রবন্ধে উল্লিখিত একটি বিরুদ্ধ বর্ণনার নিমিত্ত তাহা অবিশ্বাস করা বিধেয় কি না। আমাদের বিবেচনায় এরূপ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এই বিরোধের মীমাংসার জন্য আমরা দুই প্রকার অনুমান করিতে পারি। (১ম) পরবর্ত্তী কালের কোন অসাবধান লেখক বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের নাম পূরণ করিতে ভ্রমবশতঃ সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ বরাহমিহিরকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। (২য়) অথবা বিক্রমাদিত্য, তাঁহার বংশপরিচয়, ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ও উত্তরাধিকারীগণের নাম, শকদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ও সংবৎ প্রবর্ত্তনার কথা ইত্যাদি সমস্তই কোন পরবর্ত্তী লেখক কল্পনা করিয়াছেন। এই উভয়ের মধ্যে কোনটি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা সহজেই বিচার্য্য।

(২) মেঘদূতের চতুর্দ্দশ শ্লোকে আছে,

"স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্ মুখঃ খং
দিঙ্ নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্।"

মল্লিনাথের মতে এই শ্লোকের একটি প্রচ্ছন্ন ভাব আছে। ইহাতে কালিদাসের প্রতিপক্ষ এবং তাঁহার কাব্যের বিরুদ্ধ সমালোচক দিঙ্ নাগাচার্য্যের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে কালিদাস ও দিঙ্ নাগাচার্য্য সমসাময়িক ব্যক্তি। দিঙনাগ বৌদ্ধাচার্য্য অসঙ্গের শিষ্য। তিব্বতীয় গ্রন্থকার রত্নধর্ম্মরাজের মতে রাজা অশোক ও আচার্য্য অসঙ্গ যথাক্রমে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ১০০ ও ৯০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হন। সুতরাং অসঙ্গের জন্মকাল অশোকের ৮০০ বৎসর পরে। বর্ত্তমান কালে পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে অশোক খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং এই মতে অসঙ্গ, তাঁহার শিষ্য দিঙ্ নাগাচার্য্য ও দিঙ্ নাগা-

চার্য্যের সমসাময়িক কালিদাস ও তাঁহার প্রতিপালক রাজা বিক্রমাদিত্য এ সকলেই ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে, কালিদাস যে মেঘদূতের চতুর্দ্দশ শ্লোকে বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এক মল্লিনাথের টীকা ব্যতীত তাহার অন্য কোনরূপ প্রমাণ নাই। 'দিঙ্‌নাগ' এই শব্দ কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থেও পাওয়া যায়। সকল স্থলেই ইহা দিগ্‌বারণ এই সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। আর কালিদাস যদি দিঙ্‌নাগ নামক কোন ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিয়া থাকেন, তবে এই দিঙ্‌নাগ ও বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগ যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহার প্রমাণ কি? বরং বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ ও কাব্যসমালোচক দিঙ্‌নাগ পৃথক ব্যক্তি হওয়াই সম্ভবপর।

অপিচ, যে প্রণালীতে বৌদ্ধচার্য্য দিঙ্‌নাগের সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। রত্নধর্ম্মরাজের মতে বুদ্ধনির্ব্বাণের ৯০০ বৎসর পরে দিঙ্‌নাগ আবির্ভূত হন। বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণের মতে খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়। সুতরাং দিঙ্‌নাগ খৃঃ ৫ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন ইহাই প্রমাণিত হয়।

অশোকের কালগণনায় রত্নধর্ম্মরাজ একশত বৎসর ভুল করিয়াছেন। দিঙ্‌নাগের কালগণনার সহিত অশোকের কালগণনার কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং অশোক হইতে ৮০০ বৎসর না ধরিয়া নির্ব্বাণকাল হইতে ৯০০ বৎসর গণনা করিয়া দিঙ্‌নাগের কাল নিরূপণ করাই উচিত। ১৯০২ সালে ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার পত্রিকায় (Bombay Br. J. R. A. S.) লিখিয়াছেন যে, ৫ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিঙ্‌নাগাচার্য্যের গ্রন্থ চীনদেশীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সুতরাং দিঙ্‌নাগ যে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন না, তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে।

১৯০৯ সালের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় হর্ণলি সাহেব মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মান্দাসোর প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত যশোধর্ম্মাই প্রকৃত বিক্রমাদিত্য। এ বিষয়ে তিনি নিম্নলিখিত যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন।

মান্দাসোর লিপির লেখক বৎসভট্টি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে স্বাধীন ভাবে কবিতা রচনা বিষয়ে তিনি অতিশয় অপটু, সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের পদানুসরণ করিয়া তিনি এই লিপি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার লিপির তিনটি শ্লোক মেঘদূত ও ঋতুসংহারের শ্লোকের স্পষ্ট অনুকরণ। এতদ্ব্যতীত এই লিপি মধ্যে যশোধর্ম্মার যে রাজ্যসীমা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত কালিদাস বর্ণিত রঘুর রাজ্যসীমার অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা হইতে হর্ণলি অনুমান করেন যে, কালিদাস যশোধর্ম্মার সমসাময়িক লোক এবং অতএব খুব সম্ভবতঃ যশোধর্ম্মাই বিক্রমাদিত্য।

একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, হর্ণলি সাহেব যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাতে কেবল এই প্রমাণিত হয় যে, কালিদাস মান্দাসোর প্রস্তরলিপি খোদিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এতদ্দ্বারা এরূপ বুঝা যায় না যে, বৎসভট্টি ও কালিদাস সমসাময়িক ছিলেন।

বিশেষতঃ ৫ম শতাব্দীর শেষে অথবা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষে শকজাতির কোন প্রভাব বিদ্যমান ছিল না। অথচ বিক্রমাদিত্য শকারি বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। এমত স্থলে হর্ণলির মতানুসারে যশোধর্ম্মা ও বিক্রমাদিত্যের অভিন্নতা কল্পনা, অথবা কার্ণ ও ভাউদাজীর মতানুসারে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের কাল নির্দ্ধারণ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, বিক্রমাদিত্য নাম লাভার্থ প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেরই

মূল বিক্রমাদিত্য বলিয়া গণ্য হইবার অধিকার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

কিন্তু ভিনসেণ্ট স্মিথ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত মালব দেশের কোন বিশেষ সম্বন্ধ দেখাইতে পারেন নাই। বিশেষ গুপ্ত সংবৎ বর্ত্তমান থাকিতে আর একটি অব্দ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নামে প্রচলিত হইল কেন. তাহাও বিচার্য্য বিষয়।

কিন্তু এ বিষয় লইয়া আর বিশেষ বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। কেহই এমন কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই যদ্দ্বারা ৫৮ খৃঃ পূঃ বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব অসম্ভব প্রতিপন্ন হইবে। যাঁহারা ঐতিহাসিক প্রমাণাবলী অগ্রাহ্য করিয়া, চন্দ্রগুপ্ত বা যশোধর্ম্মাকে বিক্রমাদিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তর্কশাস্ত্রের সুপরিচিত নিয়মানুসারে, প্রমাণ করিবার ভার তাঁহাদেরই উপর। অগ্রে তাঁহারা উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা যশোধর্ম্মা বা চন্দ্রগুপ্তকে বিক্রমাদিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করুন—তখনই তাহার প্রতিবাদের সময় হইবে। অতঃপর, এ সমুদয় অনুমানই যে ভ্রান্ত আমরা তৎসম্বন্ধে দুইটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিব।

১। জৈন গ্রন্থ ও বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতির উপখ্যান অনুসারে বিক্রমাদিত্য শক ও অন্ধ্র এ উভয়েরই সমকালবর্ত্তী ছিলেন। দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকায় আছে যে বিক্রমাদিত্য রাজা শালিবাহন কর্ত্তৃক নিহত হন। কালকাচার্য্যকথায় দেখিতে পাই যে বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করার পর, কালকাচার্য্য প্রতিষ্ঠান পুরে শাতবান বা শাতবাহন রাজার সভায় গমন করেন। বলা বাহুল্য, শালিবাহন বা শাতবাহন বংশীয় নৃপতিগণ সুপরিচিত অন্ধ্র বংশীয় ব্যতীত আর কেহই নহেন। অপর দিকে, শকারি এই উপাধিতেই প্রতিপন্ন হয় যে বিক্রমাদিত্য শকগণের সমসাময়িক ছিলেন। বিশেষতঃ কালকাচার্য্যের কথায়ও দেখিতে পাই, বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে শকগণ উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছিলেন। খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে অন্ধ্রগণ ও চতুর্থ শতাব্দীর শেষে শকগণ রাজ্যভ্রষ্ট হন। সুতরাং ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ কর্ত্তৃক ধর্ম্মোপাখ্যানের কাল্পনিক নায়ক রূপে অভিহিত (mythical king) বিক্রমাদিত্য কখনই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা যশোধর্ম্মা হইতে পারেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা আমরা সহজেই প্রতিপন্ন করিতে পারি যে, জৈন গ্রন্থোক্ত বিক্রমাদিত্য অন্ধ্র ও শক এ উভয় সম্প্রদায়েরই সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

চীনের ইতিহাস হইতে আমরা জানি যে খৃঃ পূঃ ১২২ অব্দে ইউ-চি-গণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া শকগণ ভারতবর্ষের অভিমুখে অগ্রসর হয়। সুতরাং প্রায় খৃঃ পূঃ ৭০ বর্ষে যে তাহারা সিন্ধু নদীর পরপারে ছিল এবং তথা হইতে উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছিল ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব হইতে পারে। অন্ধ্রগণের রাজত্বও প্রায় খৃঃ পূঃ ২০০ বর্ষ হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং খৃঃ পূঃ ৫৭ বর্ষ বিক্রমাদিত্য এ উভয়েরই সমসাময়িক ছিলেন। যদি তর্কস্থলে ধরিয়া লই যে যশোধর্ম্মাই প্রকৃত বিক্রমাদিত্য, তাহাহইলে বলিতে হয় যে, বিক্রমাদিত্যের সম্বন্ধে যে সমুদয় আখ্যান প্রচলিত আছে, তাহাদের রচয়িতাগণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া, চারি পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনার সামঞ্জস্য বিধান করতঃ তবে গল্প রচনা করিয়াছেন। এ অনুমান অপেক্ষা আমাদের প্রস্তাবিত নির্দ্দেশ কত স্বাভাবিক সকলেই বিচার করিতে পারেন।

(২) অন্ধ্ররাজ হালের সপ্তশতী নামক গ্রন্থে রাজা বিক্রমাদিত্যের দানশীলতার বিষয় উল্লিখিত আছে। হাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং তদ্বর্ণিত বিক্রমাদিত্য, জৈন গ্রন্থোক্ত খৃঃ পূঃ ৫৭ বর্ষের বিক্রমাদিত্য ব্যতীত আর কেহই নহেন।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন শিলালিপি ও সাহিত্যেও বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ আছে। বুদ্ধগয়াতে প্রাপ্ত ১০০৫ সংবতে লিখিত একখানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, বিক্রমাদিত্য অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন এবং তাঁহার

সভায় নবরত্ন নামে নয়জন বিখ্যাত পণ্ডিত কাজ করিতেন।

বাণ প্রণীত হর্ষচরিত গ্রন্থে বাসবদত্তার উল্লেখ আছে। সুতরাং এ গ্রন্থখানি সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত। এই গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার সুবন্ধু দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, বিক্রমাদিত্য যুগের কবিতা তাহার সময়ে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে—যেন জল পরিপূর্ণ হ্রদ একেবারে জল শূন্য হইয়াছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিলে বলিতে পারা যায় যে জৈন গ্রন্থোক্ত বিক্রমাদিত্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন।

৩। বিক্রম সংবৎ

আমরা প্রথমে প্রমাণ করিয়াছি যে, বিক্রম সংবৎ খৃঃ পূঃ ৫৮ বর্ষ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা আরও দেখাইয়াছি যে জৈন গ্রন্থ ও জৈনদিগের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে ঐ সময়ে বিক্রমাদিত্য শকগণকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন এবং এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই বিক্রম সংবতের প্রতিষ্ঠা হয়। আমরা নানারূপ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, জৈন গ্রন্থোক্ত বিক্রমাদিত্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিবার যথেষ্ট কারণ আছে এবং এই ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু এই সংবৎ রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিনা সে বিষয়ে অনেকে ঘোরতর সন্দেহ করেন।

বর্ত্তমান কালে যাঁহারা ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন অব্দ সমূহের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন, ডাক্তার কীলহর্ণ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ডাক্তার কীলহর্ণ বহু গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "বিক্রম সংবৎ বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজার দ্বারা অথবা তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।" তাঁহার যুক্তি এই যে, যদি প্রকৃতই বিক্রমাদিত্য খৃঃ পূঃ ৫৮ বর্ষে এই অব্দের প্রতিষ্ঠা করিতেন, অথবা এইরূপ কোন কিংবদন্তী প্রচলিত থাকিত, তবে ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, প্রায় সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না? যদি তাঁহার নামে এই অব্দের প্রতিষ্ঠা করা হইত, তবে প্রথম হইতেই এই অব্দের নামের সহিত আমরা বিক্রমাদিত্যের নাম যুক্ত দেখিতাম, এবং এই অব্দটি ৫০০ বৎসর ধরিয়া প্রচলিত থাকিবার পর বিক্রমাদিত্যের নাম তাহাতে প্রথম সংযুক্ত হইত না। কারণ প্রথম পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত এই অব্দ শুধু সংবৎ নামে অভিহিত হইত। পরে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে 'মালবাব্দ' এবং ৮ম শতাব্দীতে মালবেশ্বরাব্দ নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ হয়। নবম শতাব্দীতে "বিক্রমাখ্য কাল" এবং দশম শতাব্দীতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য সম্বৎ এই আখ্যা প্রথম ব্যবহৃত হয়।

এতদ্ব্যতীত ডাক্তার কীলহর্ণ সংবৎ অব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ প্রায় চারি শত অনুশাসনের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রথম পঞ্চাশখানির মধ্যে মাত্র তিনখানিতে অব্দের নামের সহিত বিক্রমের নাম সংযুক্ত হইয়াছে এবং ২য় পঞ্চাশখানির মধ্যে ৭ খানিতে, তৃতীয় পঞ্চাশ খানির মধ্যে ১৪ খানিতে, চতুর্থ পঞ্চাশখানির মধ্যে ১৭ খানিতে এরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে ডাক্তার কীলহর্ণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রথমে সংবৎ অব্দের সহিত বিক্রমাদিত্যের নামের সংযোগ ছিল না, ক্রমে দুই একখানিতে এই অব্দের সহিত বিক্রম নাম ব্যবহৃত হয়, অবশেষে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বসাধারণে ইহার ব্যবহৃত আরম্ভ করিয়াছে।

ডাক্তার কীলহর্ণ যে প্রমাণাবলী উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসাহায্যে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন আমাদের মতে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

প্রথমে আমরা দেখাইব যে সংবৎ অব্দের যে কয়েকটি বিশেষত্ব দেখিয়া ডাক্তার কীলহর্ণ বিক্রমাদিত্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ অস্বীকার করেন, ভারতবর্ষে প্রচলিত অব্দ

কয়েকটি অব্দেও সেই বিশেষত্ব কয়টি সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান। এই বিশেষত্ব তিন প্রকার।

১। সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অব্দ প্রবর্ত্তকের কোন নামোল্লেখ পাওয়া যায় না।

২। রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম প্রথম হইতেই অব্দের নামের সহিত বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয় নাই।

৩। প্রথম উল্লেখের পরও (অব্দপ্রবর্ত্তক) রাজার নাম ক্রমশঃ অতি ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

এখন দেখা যাউক, এ কয়টি বিশেষত্ব ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্য কোন অব্দে পাওয়া যায় কি না। প্রথমে শকাব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করি।

১। এস্থলেও প্রথম পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত ৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত এই অব্দের নামের সহিত শক নাম যুক্ত হইতে দেখা যায় না। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বাদামী নগরের গুহাগাত্রে ৫০০ শকের প্রস্তরলিপিতেই ৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত অব্দের সহিত শকনামের খোদিত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। খোদিত লিপিতে এরূপ উল্লেখ এই প্রথম।

এ বিষয়ে শকাব্দের সহিত বিক্রম সংবতের অদ্ভুত সাদৃশ্য বর্ত্তমান। বিক্রম সংবতের নাম

(১) প্রথম পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত 'সংবৎসর'

(২) তৎপরে মালবাব্দ (৪৯৩, ৫২৯, মান্দাসোর, ৮৩৬ গ্যারিসপুর)

(৩) পরে মালবেশ্বরাব্দ (৭৯০ কানাসুয়া, ১২২৬ মেনালগড়)

(৪) পরে বিক্রমাখ্যকাল (কালপুর ৮৯৮)

(৫) সর্ব্বশেষে রাজাবিক্রমাদিত্য সংবৎ (কাব্য ১০৫০)

শকাব্দের নামও

(১) প্রথম প্রায় পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত 'বর্ষ'

(২) তৎপরে শকাব্দ (গোয়া ৫৩২)

(৩) পরে শকনৃপতি রাজ্যাভিষেকাব্দ।

২। বিক্রম সংবতের দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম প্রথম হইতেই অব্দের নামের সহিত বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু এই বিশেষত্ব শকাব্দেও সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান। কারণ প্রথমে বা শেষে কোন স্থলেই শকাব্দ প্রবর্ত্তক রাজার নাম উল্লিখিত হয় নাই।

৩। বিক্রম সংবতের তৃতীয় বিশেষত্ব এই যে প্রথম উল্লেখের পরও অব্দ প্রবর্ত্তক রাজার নামের উল্লেখ ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

শকাব্দ-যুক্ত প্রস্তরলিপির প্রথম একশতখানি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে মাত্র ২৬ খানিতে শকরাজার উল্লেখ আছে, অবশিষ্টের মধ্যে ১৪ খানিতে অব্দের নাম শালিবাহন শক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বাকী ৬০ খানিতে শক, শকে, শকবর্ষ, শক সংবৎসর, শকাব্দ, শকানাম্ কালে প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিক্রম সংবতে ডাক্তার কীলহর্ণ যে কয়টি বিশেষত্ব পাইয়াছেন তাহার সব কয়টিই শকাব্দে বিদ্যমান। অতঃপর আমরা দেখাইব যে গুপ্ত সংবৎ সম্বন্ধেও একথা সম্পূর্ণভাবে প্রযুজ্য।

যে সকল প্রস্তরলিপিতে গুপ্ত সংবতের ব্যবহার আছে, আমি তৎসমুদয় আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত ফল পাইয়াছি।

গুপ্ত অব্দের ২৬৯ বৎসর পর্য্যন্ত গুপ্ত সংবতের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রথম ১৩৫ বৎসর এই অব্দ কেবল মাত্র সম্বৎসর, সম্বৎ, এবং বর্ষ নামে অভিহিত হইত। তৎপরে 'গুপ্তকাল', এবং সর্ব্বশেষে 'গুপ্ত নৃপতি কাল' এই আখ্যার প্রচলন আরম্ভ হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ২৮ খানি প্রস্তরলিপির মধ্যে মাত্র এক খানিতে 'গুপ্তকাল' ও ৪ খানিতে 'গুপ্তনৃপতি'র উল্লেখ আছে, কিন্তু একখানিতেও অব্দপ্রবর্ত্তক রাজার নামোল্লেখ নাই। বাকী ২৩ খানিতে উক্ত অব্দ সম্বৎসর, সম্বৎ, বর্ষ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে।

ডাক্তার কীলহর্ণ বিক্রম সংবতে যে কয়টি বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অন্য দুইটি অব্দেও বর্ত্তমান।

সুতরাং এই বিশেষত্বের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার কোন মূল্য নাই। এরূপ অবস্থায় যখন সকলেই স্বীকার করেন যে, শকাব্দ ও গুপ্ত সংবৎ কোন রাজার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন বিক্রম সংবৎ রাজা বিক্রমাদিত্য দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, ডাক্তার কীলহর্ণ যাহা বিক্রম-সংবতের বিশেষত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অন্যান্য ভারতবর্ষীয় অব্দেরও সাধারণ লক্ষণ। আমাদের বিবেচনায়, ভারতবর্ষীয় অব্দের উৎপত্তি ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এ লক্ষণগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে।

যে রাজা কোন অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন প্রথমতঃ কেবল তাহার রাজ্যমধ্যেই উহা প্রচলিত হয়। পরে কালক্রমে হয় ইহার প্রচলন অন্য দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, নতুবা রাজবংশের সঙ্গে সঙ্গে ইহা লুপ্ত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহে এইরূপ বহুসংখ্যক অব্দের উদ্ভব হইয়াছিল, কিন্তু বিক্রমসংবৎ ও শকাব্দ ব্যতীত আর সকলগুলিই এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কি কারণে এই দুইটি ভারতবর্ষের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া আজ পর্য্যন্তও টিঁকিয়া আছে, তাহার সন্তোষজনক কারণ নির্ণয় করা যায় না।

ভারতবর্ষীয় অব্দের এই প্রকৃতি মনে রাখিলে এখন আমরা উল্লিখিত স্বাভাবিক লক্ষণগুলির কারণ সহজেই নির্ণয় করিতে পারি। যতদিন পর্য্যন্ত কোন অব্দের প্রচলন অনতিবিস্তৃত প্রদেশবিশেষে আবদ্ধ থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার পূর্ণ নাম ব্যবহারের পূর্ব্বে বিশেষণ রাজি প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। কারণ তত্তৎ প্রদেশের অধিবাসীগণের নিকট ইহাই একমাত্র সুপরিচিত অব্দ বলিয়া, কেবল সংবৎ বা বর্ষ সংখ্যা প্রদান করিলে তাহারা স্বভাবতঃ প্রচলিত এই অব্দ বুঝিয়া থাকে। এই জন্য কোন অব্দ প্রচলিত হওয়ার পর কিছুকাল পর্য্যন্ত ইহা বর্ষ সম্বৎসর বলিয়াই অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে অপর একটি অব্দের ব্যবহার বিদ্যমান এরূপ কোন প্রদেশে যখন ইহার প্রচলন আরম্ভ হয়, অথবা যে প্রদেশে ইহার উৎপত্তি সেখানেই অপর কোন অব্দের ব্যবহারের আরম্ভ হয়, তখন উপযুক্ত বিশেষণ যোগ দ্বারা এক সময়ে বর্ত্তমান দুই অব্দের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন হয়। এরূপ হইতে পারে যে, কেবল নবাগত অব্দটিই বিশিষ্ট নামে ব্যবহৃত হয়। কারণ কোনরূপ বিশেষণ না থাকিলে লোকে স্বভাবতঃই প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত অব্দ বুঝিয়া থাকে।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রখ্যাপিত হইবে। ৭৮ খৃঃ অব্দে শকবংশীয় নরপতি শকাব্দের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত শকরাজ্যান্তর্গত উত্তরপশ্চিম ভারতবর্ষেই ইহার প্রচলন সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে ইহার বিশেষ নির্দ্দেশের প্রয়োজন হয় নাই। কেবল মাত্র বর্ষ বলিলেই লোকে বুঝিতে পারিত যে তাহাদের সুপরিচিত অব্দ অনুসারেই গণনা করা হইতেছে। শকগণ নিজেরা বা তাহাদের অধীনস্থ প্রজাগণ কখনই তাহাদের সুপরিচিত অব্দকে 'শকাব্দ' বা 'শকনৃপকাল' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিবার কোন প্রকার প্রয়োজন বোধ করে নাই।

যখন কোন (অজ্ঞাত) কারণ বশতঃ শকরাজ্যের বহির্ভাগে শকাব্দের প্রচলন আরম্ভ হইল, তখন কাযে কাযেই ইহার বিশেষত্বব্যঞ্জক পূর্ণতর সংজ্ঞার ব্যবহার আবশ্যক হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, দক্ষিণ ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপিতেই প্রথমে 'শক নৃপকাল' এই পূর্ণতর সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিক্রম সংবতের ইতিহাসও এইরূপ। প্রথমে ইহার ব্যবহার মালব দেশে সীমাবদ্ধ ছিল, সুতরাং লোকেরা ইহাকে শুধু সম্বৎসর বলিয়াই অভিহিত করিত। শকাব্দের প্রচলন না হওয়া পর্য্যন্ত এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায়ই লোকে ইহাকে বুঝিতে পারিত। কিন্তু শকাব্দের ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই, উভয়ের প্রভেদ বিজ্ঞাপনের

জন্য পূর্ণতর নাম ব্যবহৃত হইতে লাগিল; এবং প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় যে প্রায় এক সময়েই উভয়ের বিশিষ্টতাব্যঞ্জক নাম ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বিক্রম সংবৎ প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত অব্দ বলিয়া, বিশেষত্ববোধক কোন নাম না থাকিলে, লোকে ইহাকেই বুঝিত। এইজন্য দেখা যায় যে শকরাজ্যের বাহিরে প্রচলিত হওয়ার পর হইতেই শকাব্দ বরাবর তাহার বিশেষত্বসূচক সংজ্ঞা বজায় রাখিয়াছে—যেন কোন সুপরিচিত অব্দ হইতে ইহার বিশেষত্ব রক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, ডাক্তার কীলহর্ণ বিক্রম সংবতের যে কয়টি বিশেষত্বের উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমাদিত্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চান, সেই বিশেষত্বগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়া থাকে।

সর্ব্বশেষে বিক্রমসংবৎ সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্লীট ও কীলহর্ণের মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া আমরা এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মাঙ্গালোর প্রস্তরলিপিতে বৎসরের সংখ্যার পূর্ব্বে "মালবানাম্ গণস্থিত্যা," "মালবগণ স্থিতিবশাৎ" এই দুইটি শব্দের উল্লেখ আছে। ফ্লীট ইহার অর্থ করিয়াছেন, "মালবগণের জাতি সংগঠন হইতে গণনা আরম্ভ করিয়া"। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন "যে মালবগণের এই জাতিসংগঠনদিন চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই খৃঃ পূঃ ৫৮ বর্ষে একটি অব্দ প্রচলিত হয়, পরে ইহা বিক্রম সংবৎ নামে অভিহিত হয়"। যাঁহারা বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চান না, তাঁহারা সাগ্রহে ফ্লীটের এই অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, বিক্রমাদিত্যের সহিত যে সংবৎ অব্দের কোন সম্বন্ধ নাই সে বিষয়ে নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কিন্তু অবশেষে প্রমাণিত হইয়াছে যে, "মালবানাম্ গণস্থিত্যা" এবং "মালবগণ স্থিতিবশাৎ" এ উভয়ের অর্থ "মালবদিগের গণনা অনুসারে"; মালবজাতিসংগঠনের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। স্বয়ং ফ্লীট তাঁহার ভ্রান্তি স্বীকার পূর্ব্বক পূর্ব্বমত পরিহার করিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য। ডাক্তার ফ্লীটের বর্ত্তমান মত এই যে, কুষানরাজ কনিষ্কই সংবৎ অব্দের প্রবর্ত্তক। ১৯০৩ খৃঃ অব্দে তিনি এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, এবং তৎকালে লিখিয়াছিলেন যে, ছয়মাসের মধ্যেই উপযুক্ত প্রমাণাবলীসহ তিনি এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবেন। নয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহার বিস্তৃত আলোচনা এখনও পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। সুতরাং তাঁহার এ মতের সমালোচনা করা বর্ত্তমানে অসম্ভব।

ডাক্তার কীলহর্ণ সংবৎ অব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক কবিত্বময় ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে শরৎকালে এই অব্দের বর্ষারম্ভ হইত। শরৎকাল চিরদিনই ভারতবর্ষীয় নরপতিগণের বিক্রম অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রার প্রকৃষ্ট সময় বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং শরৎকালই প্রকৃত পক্ষে বিক্রমকাল এবং প্রাচীন সাহিত্যে শরৎকালের এই নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে শরৎকালে যে অব্দের বর্ষারম্ভ হইত তাহাকে বিক্রমকাল বলা হইয়াছে।

এইরূপ কবিকল্পনা কাব্যেই শোভা পায়, ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহার প্রতিবাদ করিবারও কোন আবশ্যকতা নাই। মূল বিষয় সম্বন্ধে ডাক্তার কীলহর্ণ কোন কথাই বলেন নাই। খৃঃ পূঃ ৫৮ বর্ষে যে অব্দের আরম্ভ হইয়াছিল তাহার নাম "বিক্রমকাল" হইল কেন, নিরঙ্কুশ কবি কল্পনার সাহায্যে তিনি তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু খৃষ্টের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে এই অব্দ কে প্রচলিত করিল, এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই। ডাক্তার কীলহর্ণের কল্পনা-প্রসূত ব্যাখ্যা কিরূপ অসার হর্ণলি তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হর্ণলি বলেন যে শরৎকাল প্রাচীন ভারতবর্ষের নরপতিগণের বিক্রমপ্রদর্শনের কাল ছিল বটে, কিন্তু 'বিক্রমকাল' এই শব্দ কখনও শরৎকালের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। কেবলমাত্র একস্থলে

বিক্রমকাল এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ শরৎকাল কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

সুতরাং ডাক্তার কীলহর্ণের কল্পনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমরা সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বিশ্বাসযোগ্য কিংবদন্তী অনুসারে খৃষ্ট জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং এ পর্য্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে ইহার অসত্যতা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং আমাদের মত এই, যে পর্য্যন্ত অন্য প্রমাণ পাওয়া না যায় ততদিন, খৃষ্টজন্মের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে রাজা বিক্রমাদিত্য সংবৎ অব্দের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই কিংবদন্তীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুমোদিত।

শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার।

বর্ষা-মঙ্গল

উড়ায়ে পতাকা—ধবল বলাকা, ফুটায়ে কুমুদ-কহ্লারে
বাজায়ে মাদল—বজ্রবাদল, মন্দ্রিলা মেঘ—মল্লারে!
অমিয়া পিয়া উঠিল জীয়া বল্লুর বন-বীথিকা
মুঞ্জি' চাহিলা কুঞ্জ-মহিলা—কুন্দ-কেতকী-যূথিকা!
মণ্ডুক যত সঙ্গীত-রত; ডাহুক-বক-চন্দনা
মিলিত-ললিত-কলিত কণ্ঠে গাহিল বরষা বন্দনা।
কদম্ব-রেণু-রঞ্জিত তনু শ্যামল রুচি শ্রী-অঙ্গে
সরিত অতি ত্বরিত গতি নৃত্যতি বীচি-বিভঙ্গে!
শীতল তব সলিলে নব শুভ্র-সফেন হাস্য,
নীপ-নিকুঞ্জে প্রদীপ-পুঞ্জ, লতায় সলিল লাস্য!
নমঃ মনোরমা! সুন্দরি! শ্যামা! শীতল-সুধা-পরশা!
শস্য শালিনি! বিশ্বপালিনি! বরদায়িনি! বরষা!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

নামিকো

(তৃতীয় খণ্ড)

প্রথম পরিচ্ছেদ

পীড়াবসানে

বাতায়নের তলে পাখীর গানে জাগরিত হইয়া তাকেও তন্দ্রালস নয়ন মেলিল। বিছানার উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া মশারিটি সরাইয়া দিল। পাহাড়ের উপর দিয়া উদীয়মান প্রভাত-সূর্য্যের আলো জানালার মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া প্রবেশ করিতেছিল। পাহাড়গুলি তখনো প্রাতঃকালের কুয়াসায় আচ্ছন্ন, ঊর্দ্ধে শরতের আকাশ স্বচ্ছ নির্ম্মল। তাহার তলে জানালার সম্মুখে চেরিগাছের ডালগুলি রক্তিমাভায় মণ্ডিত হইয়া হইয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ডালের উপর দুই তিনটি ছোট পাখী কিচির মিচির করিতে করিতে লাফালাফি করিতেছিল। অবশেষে তাহারা সকলে ঘরে উঁকি মারিল, অর্দ্ধশায়িত তাকেওর সহিত চোখোচোখি হইতেই যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হঠাৎ উড়িয়া পালাইল। তাহাদের পশ্চাতে বায়ুহীন শূন্যে কেবল একটি শুকনো পাতা ঝরিয়া পড়িল।

প্রভাতের যে দূতগুলি আসিয়া তাহাকে জাগরিত করিয়াছে তাহাদের কথা ভাবিয়া তাকেও ঈষৎ হাস্য করিল। পুনরায় বালিসে মাথা রাখিয়া শুইবার চেষ্টায় যেন বেদনায় সে কপাল কুঞ্চিত করিল, অবশেষে আরাম করিয়া শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিল।

শান্ত প্রভাত, অশান্তির লেশমাত্র নাই। একটা মোরগ ডাকিয়া উঠিল, দূরে জেলেরা গান গাহিতেছিল।

তাকেও চোখ মেলিল, একটু হাসিল, আবার চোখ বুজিল,—যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন!

আজ এক মাসের অধিক হইল যে যুদ্ধে আহত হইয়া সাসেবোর হাসপাতালে আসিয়াছে।

শত্রুপক্ষের গোলার টুকরায় আহত হইয়া ডেকের উপর সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ পায়ের

উপর আঘাত হাড় পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই, অন্যান্য আঘাত-গুলি আঁচড় ছাড়া আর কিছু নয়। তাহার দলের কাপ্তেন গোলার ঘায়ে টুকরা টুকরা হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল. অন্যান্য কর্ম্মচারীরাও সকলে মরিয়াছিল, কেবল কয়েকজন গোলন্দাজ বাঁচিয়াছিল। এমন অবস্থায় তাকেও যে বাঁচিয়া গিয়াছিল ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের কথা। নৌ-হাসপাতালে আসিয়া প্রথমে সে জ্বরবিকারে ভুগিয়াছিল, কিন্তু তাহার তরুণ বয়স বলিয়া শীতাগমের সঙ্গে সঙ্গে তার অবস্থা ভালো হইয়া উঠিল। এক মাসের পর এখনো অল্প অল্প বেদনা অনুভব করিলেও সে কার্বলিকের গন্ধে ভরা ঘর ছাড়িয়া বাহিরের মুক্ত শরতের বাতাসে বাহির হইবার মত সারিয়া উঠিয়াছিল। আবার কবে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইবে সে এখন কেবল সেই দিনের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

যে জীবনকে সে ধূলার ন্যায় অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে তুচ্ছ করিয়াছিল সে জীবন গেল না। জ্বর ও বেদনার উপশমের সঙ্গে বাঁচিবার সাধ ফিরিয়া আসিল, সেই সঙ্গে সেই পুরাণো দুঃখ ও চিন্তাও ফিরিল। সর্প তার চর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু মানুষ তা পারে কৈ? তাই তাকেওর স্মৃতিসূত্র, যাহা কিছুকালের জন্য যুদ্ধ ও যাতনার ভিড়ে চাপা পড়িয়াছিল, তাহা তার স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে মন শান্ত হইয়া আসিলে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু দারুণ পীড়া যেমন আমাদের দেহের পেশীগুলিকে নূতন করিয়া সতেজ করে, তেমনি তাকেও মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি হইয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিল তাহা তার চিন্তাধারাকে নূতন রূপ প্রদান করিল। সেই মহাযুদ্ধ এবং তাহার পূর্ব্বেকার ও পরবর্ত্তী আশ্চর্য্যজনক ঘটনাগুলি ঝড়ের মত তার মনকে তোলাপাড়া করিয়া ফেলিল। ঝড় এখন থামিয়া গেছে কিন্তু তার হৃদয় সমুদ্রে সে ঝড়ের প্রভাব এখনো বর্ত্তমান, এবং যে মনোভাব সে হৃদয় সমুদ্রে ভাসিতেছিল তা ভিন্নমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। মাতার উপর আর তার রাগ নাই। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে সে নামির স্মৃতিটি রক্ষা করিয়াছে সে যেন আর নাই যখনি তার কথা ভাবে, মনে হয় যেন কোন সুদূরের বিষাদমাখা সুমধুর সঙ্গীত শুনিতেছে।

তাজাকি আসিয়াছিল। তাহার নিকটে তাকেও মাতার কথা এবং কিছু কিছু নামির কথাও শুনিয়াছে। তাহাকে মনঃকষ্ট দিবার ভয়ে তাজাকি বলে নাই যে য়্যামাকির কন্যা আসিয়া কিছুদিন তাকেওর বাড়ীতে বসবাস করিয়া গেছে—তাকেওর গৃহিনী হইবার আশায়। নামির বিষয় অল্প যা শুনিল তাহাতেই, তাকেও অশ্রুবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিল না। প্রতি রাত্রে স্বপ্নের মাঝে সেই রুগ্না তরুণীর মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিত,—নির্জ্জন বাড়ীতে একাকিনী সে দিন যাপন করিতেছে, বাতাস সেখানে দেবদারুকুঞ্জের মধ্যে বিষাদের সুর গাহিয়া ফিরিতেছে! কখনো বা এ ছবির স্থানে ইয়ালুর যুদ্ধের রুদ্র ছবি জাগিয়া উঠিত!

সপ্তাহ পূর্ব্বে যা ঘটিয়াছিল তাকেও সেই কথা ভাবিতেছিল; খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া হাই তুলিয়া সেই জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল। পূর্ব্বদিন তাহার ঘরের সঙ্গী চলিয়া গিয়াছে, সে একাকী। দিন শেষ হইয়া আসিতেছিল। ঘর প্রায় অন্ধকার, বাহিরে ঝির্ ঝির্ করিয়া শরতের বৃষ্টি পড়িতেছিল। পাশের ঘরে কোন রোগীর বৈদ্যুতিক চিকিৎসা হইতেছিল, যন্ত্রের গুণ্ গুণ্ শব্দ অবিরাম বারিপতনের শব্দের সহিত মিশিয়া নির্জ্জনতা আরো যেন বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। সেই শব্দ শুনিতে, শাঁশির কাচে বৃষ্টির ঝাপটা ফোয়ারার মত কেমন আসিয়া পড়িতেছিল সে তাহাই দেখিতেছিল। বাহিরের বারিসিক্ত গাছপালা ঝোপঝাড়গুলো এক একবার দেখা দিয়া পরক্ষণই অদৃশ্য হইতেছিল। স্বপ্নাবিষ্টের মত সে কিছুকাল সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর হঠাৎ কম্বল টানিয়া মাথা ঢাকিয়া ফেলিল।

"আপনার জন্য একটি বাক্স আর একটি পার্সেল আছে। ঘুমোলেন না কি?"

তাকেও মুখ বাহির করিয়া দেখিল, বিছানার ধারে

একটি ছোকরা দাঁড়াইয়া—একটা কাগজের পার্সেল ও দড়িবাঁধা একটা বড় বাক্স লইয়া।

"ও আমার জন্য না কি? কোত্থেকে এসেচে?"

ছোকরা প্রেরকের নাম পড়িল। সে তাকেও কখনো শোনে নাই।

"খোল ত ওগুলো।"

তেলা কাগজটি খোলা হইলে একটি বেগুণে রঙের কাপড়ে-মোড়া পুলিন্দা বাহির হইল। সেটি খুলিলে দেখা গেল, একটি হাল্কা পশমী পোষাক, নরম রেশমের একটি ভিতরের পোষাক, সাদা ক্রেপের কোমরবন্ধ, তুষারশুভ্র একজোড়া 'তাবি', চওড়া হাতাওলা একটি জামা। বাক্সে কি ছিল? তাহার প্রিয় বড় বড় নাশপাতি ও টাটকা কলায় সেটি পূর্ণ।

তাকেওর অন্তঃকরণ স্পন্দিত হইতে লাগিল।

"কোনো চিঠি ছিল না এর মধ্যে?"

ছোকরা সর্ব্বত্র খুঁজিল কিন্তু এক টুকরাও লেখা কোথাও মিলিল না।

"দেখি দাও ঐ তেল-কাগজখানা।"

কাগজের উপর তাকেও নিজের নাম দেখিল, হৃদয় তাহার আনন্দে নাচিয়া উঠিল। হস্তাক্ষর সে চিনিয়াছে। সে! সে! সে নয় ত আর কে? পোষাকের প্রত্যেক সেলাইয়ে তার অশ্রুর চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ না কি? দেখিতেছ না, দুর্ব্বল হাতের লেখা কেমন কাঁপিয়া গেছে? দেশ কাল ভুলিয়া গিয়া তাকেও বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

তাকেও এখন বুঝিল, নামি চিরদিনের জন্য তার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সে হৃদয়ে অসীম ভালোবাসার আর সঙ্কুলান হইতেছে না। দিনে সে তার কথা ভাবে, রাত্রে স্বপ্নে তাহাকেই দেখি।

কিন্তু স্বপ্নে যেমন, বাস্তবিক জগৎ তো তেমন স্বাধীন নয়। জগতের তুচ্ছ লোকাচার তো দূরের কথা, তাকেও বিশ্বাস করিত মৃত্যুও পত্নীকে তাহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহার বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া দেখিল যে, সেই তুচ্ছ বিধি আচারগুলো স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃজন করিয়া রাখিয়াছে। জগৎ যাই করুক, সে চিরকাল তার পত্নী। কিন্তু মাতা তাহাকে তার নামে ত্যাগ করিয়াছেন এবং পত্নীর পিতা তাহাতেই সম্মত হইয়াছেন। জগতের চোখে তাহাদের মধ্যে আর কোনো সম্বন্ধ নাই। আরোগ্যলাভ করিয়া আবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা কি সম্ভব হইবে না? মনকে যতই প্রবোধ দিক যে কাজটা একটা তুচ্ছ সামাজিক ব্যাপারমাত্র, তবুও তাকেও কিছুই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, তাহাদের পুনর্মিলন কোনো প্রকারে সম্ভব; বরং বিপরীত। সে জানিত যে এরূপ প্রত্যেক চেষ্টা ব্যর্থ তো হইবেই, অধিকন্তু তাহা মাতা ও নিজের মধ্যেকার ব্যবধান আরো বাড়াইয়া তুলিবে। মাতার ইচ্ছায় বাধা দিবার জ্বালা সে যথেষ্ট ভোগ করিয়াছে!

এই বিশাল পৃথিবীতে বাস করিয়া ভালবাসিবার স্বাধীনতা থাকিবে না ইহা অসহ্য। কিন্তু উপায়ও তো নাই। দিনের পর দিন এই অশান্তি বহন করিয়া কাটিতে লাগিল। মনে মনে শপথ করিল, নামিই তাহার পত্নী—জীবনে মরণে!

সে দিন প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিলে তাকেও সেই কথাই ভাবিতেছিল। ডাক্তার প্রত্যহ যেমন আসেন আজও তেমনি আসিলেন। অবিলম্বে ক্ষত শুকাইয়া যাইবে সে জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তারপর মাতার একখানা পত্র আসিল। তাজাকির নিকট শুনিয়াছেন তাকেও সারিয়া উঠিতেছে, তাই আনন্দ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, চিকিৎসক অনুমতি দিলেই সে যেন শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ফেরে, তাকেওর সহিত প্রয়োজনীয় কথা আছে। কথা আছে! যে কথা সে ভয় করে, যাহাকে সে এড়াইতে চায়, সেই কথা নয় তো? তাকেও ভাবিতে লাগিল।

সে তোকিও ফিরিল না।

নোভেম্বর মাসের প্রারম্ভে, পীতসমুদ্রের যুদ্ধের পর

মাৎসুসিমা যুদ্ধজাহাজ মেরামত হইয়া পুনরায় যুদ্ধে যাইবার অনতিকাল পরেই, হাসপাতাল ছাড়িয়া যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য একখানি যাত্রীজাহাজে তাকেও রওয়ানা হইল।

সাসেবো হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিন তাকেও দুইখানি পত্র ডাকে দিল, তন্মধ্যে একখানি মাতার জন্য।

শ্রীহেমনলিনী রায়।

জগন্নাথপুরের মেলা

শিলং হইতে আমরা এই দিগন্তপ্রসারিত শুষ্ক মরুভূমিতে আসিয়াছি। খাশিয়া পাহাড়ের মধুর স্বপ্নে আত্মহারা মুগ্ধ বাঙ্গালী এখানে কি দেখিলেন? ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার্ এণ্ড্রু ফ্রেজরের প্রিয় আবাসভূমি রাঁচি দেখিয়া নবাগত বাঙ্গালীর হৃদয় কি ভাবে আন্দোলিত হইল? নানাকারণে ব্যক্তিগত ভাবে এ সব বিষয়ের যথাযথ উত্তর দেওয়া সুসঙ্গত নয়। তবে আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকেই বলেন এখানে কেবল মরুপ্রকৃতির শোভা—কেবল চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, মাথার উপর নীলাকাশে চাঁদের বিমল জ্যোৎস্না। আর দূরে অদূরে সৌরকরপ্রদীপ্ত প্রাচীরের মত তরঙ্গায়িত পাদপশূন্য নীল পর্ব্বতশ্রেণী মরু প্রকৃতির একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন শোভা কিয়ৎপরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এখানে না আছে ফুল্ল প্রসূনরাজি, অতুল্য রমণীরূপ, অথবা ফেনিল স্রোতস্বতী। মৃত্তিকায় লুক্কায়িত বালুকাপূর্ণ সুবর্ণ-রেখা ও হনু। গন্ধহীন দুইএকটি বনফুল, পাহাড়ের গায়ে বনতুলসী, অর্দ্ধনগ্ন কোল রমণীর কৃষ্ণকান্তি ও তাণ্ডব নৃত্য কালে তাহাদের মুখে মোদে পিড়ি গেলেম রে গাতিং, কামে লেলো লেলোয়া গাতিং। বারে পিড়ি লেলেম রে গাতিং কামে চিনাও চিনাও। সুন্দি বাইং গুতুলে দা গাতিং কাম লেলো লেলোয়া গাতিং। বাগড়ি বাইং গালাং লেদা সাঙ্গাইং, কাম চিনাও চিনাও। সুন্দি গুতুলেদা গাতিং চারিরেগে গোছা জানা। বাগড়ি বাইং গালাং লেদা সাঙ্গাইং সুতাং রোগে মইলা জানা। * প্রভৃতি সুমধুর গান, অতীত বৃন্দাবনের রাখালবালকের অনুকরণে বেশসজ্জিত কোল বালকের শুভ্রদন্ত-বিকসিত সহাস্যবদন, সাঁঝের বেলা ফুর্‌ফুরে হাওয়া, দুরেণ্ডার শীতল কূপোদক, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দারুণ গ্রীষ্ম এবং প্রান্তরের উপর ঝড়ের আগে বালুকার তাণ্ডব-নৃত্য রাঁচির নৈসর্গিক শোভা-সম্পদ।

রাঁচির সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বিগত রথযাত্রার দিন জগন্নাথপুরের মেলা দেখিয়া আমার হৃদয়-মন আনন্দে প্লাবিত হইয়াছিল। তখন সেই সৌন্দর্য্যের অনুভূতি ভ্রান্তিমূলক মনে করি নাই। সৌন্দর্য্য ভগবানের অবিভাজ্যগুণ। এই মূলসূত্র হইতেই 'The world is a thing of beauty'র উৎপত্তি। জগন্নাথ পুরের রথযাত্রা ও মেলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি অম্লান বদনে বলিব—'জগন্নাথপুরের মেলা ও মন্দিরই রাঁচির কবিতা, এই কাব্য ও কবিতার ভিতর ক্ষুদ্র রাঁচির ও মুণ্ডা জাতির যতকিছু সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত আছে। যে সৌন্দর্য্য পারিজাত কুসুমের ন্যায় নির্ম্মল, যাহার প্রভাবে চিত্ত পরমানন্দ উপভোগ করে, যে সৌন্দর্য্যে চিত্তে হর্ষ ও বিক্ষোভ জন্মে না, তাহাই সেই অনন্ত সুন্দর জগন্নাথের সৌন্দর্য্য। এবং তাহাই ভক্তের নিকট সাধনার বস্তু।

৩২শে আষাঢ়, মঙ্গলবার (১৩১৯ সন)—রথযাত্রার দিন। পুরীতে এই বৎসর প্রায় ছত্রিশ বৎসর পর ঠাকুরের 'অঙ্গরাগ বা নূতন কলেবর হইবে। পুরী ভিন্ন মফঃস্বলে ঠাকুরের দিব্যদেহে

---

* হে সখা, প্রথম মাঠে তোমাকে খুঁজিলাম, সেখানে তোমাকে দেখিতে পাই নাই। দ্বিতীয় মাঠেও তোমাকে খুঁজিয়া পাই নাই। তোমার জন্য হুণ্ডি ফুলের মালা গাঁথিয়াছি, কিন্তু তোমাকে পাই পাই নাই; বাগ্‌ড়ি ফুলের মালা গাঁথিয়াছি, কিন্তু তোমাকে পাই নাই। হে বন্ধু, হুণ্ডি ফুলের মালা কারি উপরে শুকাইয়া যাইতেছে। বাগ্‌ড়ির মালাও সূতার উপরে শুকাইয়া যাইতেছে। সখা তুমি কোথায়!!

রং দেওয়া হয়। এইবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক এই নূতন দৃশ্য দেখিতে 'পুরী যাইতেছিল। এখানেও ভিড় মন্দ হয় নাই।

বেলা চারিটার সময় আমি একাকী জগন্নাথপুরের মেলা দেখিতে রওনা হই। তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাস্তায় অগণিত লোক জগন্নাথ দর্শনে ছুটিয়াছে। ডুরেণ্ডার নিকট হর্ম্ম্য স্রোতস্বতীর উপর পুলে পুলিশ প্রহরীরা 'হট হট্' বলিয়া লোকজন এ দিক ও দিক সরাইয়া দিতেছিল। ভদ্রলোক দেখিলেই গর্ব্বিত প্রহরী সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিতেছিল—'বাবুজি' থোরা বাঁয়ে সরিয়ে।' রাঁচির জঙ্গলেও পুলিশের বিশ্ববিশ্রুত স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য একটুও হ্রাস হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। মুণ্ডাজাতি স্বভাবতঃ ভীরু ও ধীর। এই অঞ্চলে পুলিশের পক্ষে 'গরম' হইবার অবসর কোথায়? তবে আমার মনে হয়, 'সর্প ও সন্ন্যাসীর' দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া পুলিশ মাঝে মাঝে 'ফোঁস্' করিতে বাধ্য হয়। 'হিনুর' নিকট ঘোড়ায় চড়িয়া সার্জ্জেন্ট সাহেব পুলিশের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। চাইবাসার রাস্তা 'বাঁ' দিকে রাখিয়া আমরা (আমি তখন বহু যাত্রীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলাম) মন্দিরের দিকে চলিলাম। যতই আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পথে ততই যাত্রীর ভিড় বাড়িতে লাগিল। সম্বৎসরের পর মেলা দেখিতে পাইবে বলিয়া দলে দলে মাড়োয়ারী ও কোল রমণীগণ বিচিত্র বেশে দিঙমণ্ডল আলোকিত করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। মাড়োয়ারী-বধুর বেশ-বৈচিত্র্য, নবাগত অসংখ্য ইংরেজ কর্ম্মচারীর মটর গাড়ী ও রাঁচির অদ্ভুত যান 'পুস্‌পুস্' বা ঠেলাগাড়ী এই কয়টি অপূর্ব্ব জিনিষ সর্ব্বত্রই মন্দির-যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। পুস্‌পুস্ দেখিতে অনেকটা পাল্কীর ন্যায়। পাল্কীতে দুইখানা চাকা বসান থাকিলেই উহা পুস্‌পুস্। সাধারণতঃ চারিজন কুলিতে উহা টানে, দুইজন সম্মুখে টানে ও দুইজন পশ্চাৎ হইতে ঠেলা মারে। দীর্ঘ রাস্তার অনেক স্থানই ছায়াচ্ছন্ন। পথের দুইধারে শাল ও আম গাছ। এখানে আমগাছের অভাব নাই, কিন্তু ডালে একটিও আম দেখিতে পাওয়া যায় না। হিনুরই অল্প একটু দূরে একটা আম বাগানে প্রায় হাজার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বাগানখানি দেখিলে প্রাণ জুড়ায়। কিন্তু গাছে ফল ধরে না, এই কথাটা মনে আসিতেই হৃদয়ে কেমন একটা নৈরাশ্যের ভাব জাগিয়া উঠে।

আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে 'ক্যাঁ' 'কোঁ' শব্দে অসংখ্য গরুর গাড়ী চারিদিকে চক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি উড়াইয়া অতি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। আমরা পাশ কাটিয়া অতি দ্রুত বেগে চলিতেছিলাম। এক মাইল দূর হইতে এক তুমুল কোলাহল শুনিতে পাইলাম; মন্দিরের সম্মুখ ভাগে বিস্তৃত প্রান্তরে যে মেলা বসিয়াছে সেই মেলায় সহস্র সহস্র লোকসমাগমহেতুই এই কোলাহল। অদূরবর্ত্তী শৈলোপরি জগন্নাথ মন্দির হইতে শঙ্খঘণ্টার রোল ও 'জগন্নাথজীকি জয়' লক্ষকণ্ঠোচ্চারিত এই ধ্বনি উত্থিত হইয়া সেই মরুসম প্রান্তরের মধ্যে আজ একটা সজীবতার ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে।

আমরা বেলা পাঁচটার সময় সেই পুণ্যস্থানে পৌঁছিয়া দেখিলাম, রথযাত্রা উপলক্ষে মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে এক বৃহৎ মেলা বসিয়াছে।

সে মেলায় কোল ও মাড়োয়ারী রমণীর সংখ্যাই অধিক। ক্রয়বিক্রয় জিনিষের প্রায় বার আনা পিত্তল ও কাঁসার জিনিষ। ভেজাল দিতে অনভ্যস্ত বলিয়া আজিও এইসব সভ্যতালোক-বিবর্জ্জিত প্রদেশের নিরক্ষর শিল্পীরা জিনিষের উপাদানগুলি খাঁটি রাখিয়াছে। অপর পক্ষে দেখিতে পাই, জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতাহেতু বিলাস-বিভ্রম-বিমণ্ডিত সভ্য সমাজে খাঁটি জিনিষের পরলে পরলে জাল জুয়াচুরি প্রবেশ করিয়াছে।

এই বৎসর নূতন প্রদেশের সাময়িক রাজধানী বলিয়া রাঁচিতে বহু বাঙ্গালী ও ইংরেজের আগমন হইয়াছে। নূতন দেশের এই অপূর্ব্ব মেলা দেখিবার জন্য বহু বাঙ্গালী

ও ইংরেজ জগন্নাথপুরে গিয়াছিলেন। মাননীয় ছোটলাট স্যার্ চার্লস বেইলী স্বয়ং পারিষদবর্গ সহ মেলায় গমন করিয়াছিলেন।

মেলাতে শিশুদের মনোমোহন বিলাতী খেলনার অভাব ছিল না। মাড়োয়ারী বালক ও কোল যুবকদের প্রায় সকলের হাতেই দুই একটি খেলনা, কিছু মিষ্টান্ন ও একটি ময়না (শালিক পাখী) দেখিতে পাইলাম। এক স্থানে দেখিলাম, কোন সুন্দরী নাকে পিতলের নথ ও হাতে একসের ওজনের কাঁসার বড় বড় বাউটি পরিতেছে। এই গুরুভারে গরবিনীর সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত মুখ শ্রীতে কোন ই-কষ্টের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল না। পিতল কাঁসার দোকানের পার্শ্বেই মিষ্টান্নের দোকান। তৈল ও ঘিতে গরম গরম লুচি কচুরি ভাজা হইতেছে, মূর্খ চাষারা সেইগুলি অতি উপাদেয় বলিয়া পেট পুরিয়া খাইতেছে। সন্দেশ রসগোল্লাও দুই চারিটি ভদ্রলোক খরিদ করিতেছিলেন দেখিলাম। এক স্থানে একখানি টেবিলের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম সেখানে পয়সা সংগ্রহ হইতেছে। ইহা এক রকম জুয়াখেলা; এক পয়সা বাজি রাখিয়া যদি জিত হয়, তাহা হইলে কিছু লাভ; যদি হার হয়, তাহা হইলে গ্রাম্য চাষীরা কষ্ট রক্ষিত সামান্য অর্থ যাহা কিছু মেলায় আনে সবই উড়িয়া যায়।

মেলার এক ধারে একটা বড় গাছের ধারে—নাগর-দোলা, কাঠের ঘোড়া ও বাঘ ভোঁ ভোঁ শব্দে ঘুরিতেছে। দলে দলে চাষীর দল লাল নীল রংএর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ঘোড়া ও বাঘের দোলায় চড়িয়া পাক খাইতেছে।

এক স্থানে একটা তাঁবু; সেই তাঁবুতে সার্কাস আরও কত কি খেলা প্রদর্শিত হইতেছিল। আমরা চারিদিকে ঘুরিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। পাহাড়ের উপর মন্দির।

এই উর্দ্ধ প্রাচীরবেষ্টিত জগন্নাথপুরের মন্দির আজ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইলেও বিগত দুইশত বৎসর ব্যাপিয়া মুণ্ডাদেশে মৃতপ্রায় হিন্দুজাতির অক্ষয় অনন্ত ধর্ম্মের প্রভাব প্রচার করিয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ মুণ্ডাজাতি কোন ধর্ম্মবিশেষের অধীন না হইলেও এই জগন্নাথপুরের দেবতার পদতলে মাথা নোঁয়াইতে দ্বিধা বোধ করে না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করে, জগন্নাথপুরের ঠাকুরই ইহাদিগকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করেন!

এলোমেলো ভাবে সাজান বড় বড় পাথরের সাঁড়ি অতিক্রম করিয়া আমরা উপরে উঠি। তখন শূন্য মন্দিরে লোকের ভিড় ছিল না, তবে বাঙ্গালী বাবুরা অনেকেই পর্ব্বতোপরি হইতে অপূর্ব্ব প্রান্তরদৃশ্য দেখিবার জন্য মন্দিরের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে জগন্নাথ ঠাকুরকে নীচে নামাইয়া রথের উপর স্থাপন করা হইয়াছিল। এই অবসরে আমরা মন্দির ভাল করিয়া দেখিয়া লই।

মন্দির

এখন মন্দির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এই মন্দির পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথমন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত। প্রভেদ এই যে এই মন্দিরের গাত্রে কোন প্রকার লতা, পাতা, ফুল, অথবা মূর্ত্তি কিছুই খোদিত নাই। মন্দিরের চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। দূর হইতে ইহা একটি দুর্গ বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ অসভ্য কোল ভিলেরা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহের কোনরূপ ক্ষতি করিতে না পারে, এ জন্যই মন্দির এই ভাবে সুরক্ষিত। প্রাচীর সংলগ্ন প্রবেশদ্বার খুব উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহা ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু চারিদিকে একখানা অতি উজ্জ্বল ও মসৃণ প্রস্তরের ফ্রেম আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মন্দির চারিটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রত্যেকটীর উপরিভাগ মঠের ন্যায় ক্রমে সরু হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমটী বারান্দা, উচ্চতা পঁচিশ হস্ত; দ্বিতীয়টি গরুড়-মন্দির,এখানে অতি বৃহৎ গরুড়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত আছে, উচ্চতা ত্রিশ হস্ত; তৃতীয়টি ভোগ মন্দির, উচ্চতা প্রায় ৫০ হস্ত; চতুর্থটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; ইহাই জগন্নাথদেবের মন্দির, উচ্চতা ৫০ হস্ত বা ততোঽধিক হইবে।

মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৪০ হস্ত। বারান্দা, গরুড়-মন্দির ও ভোগ মন্দিরের প্রস্থ দ্বাদশ হস্ত ও মূল মন্দিরের প্রস্থ ষোল হস্ত। জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরের প্রস্থ দশ হস্ত; দুই দিকের প্রাচীর তিন হাত করিয়া ছয় হাত।

সম্মুখের দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিলে একটা প্রকাণ্ড বারান্দা ও ভিতরের দিকে অন্ধকারপূর্ণ একটি কুঠরী দৃষ্ট হয়। সেই ঘরের মধ্যে রত্নবেদিকায় জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত।

উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণ আকারে বর্গক্ষেত্র অর্থাৎ চারিদিকেই সমান। প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য ৫০×৫০ হাত।

চারিকোণে চারিটী বিগ্রহের মন্দির। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে নৃসিংহ মন্দির; দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে হনুমানজীর মন্দির। এই উভয় মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে এই দুই বিগ্রহ জগন্নাথদেবের গৃহে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম কোণের মন্দিরে শিবমূর্ত্তি ও দক্ষিণ পশ্চিম কোণের মন্দিরে গণেশ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

জগন্নাথপুরের মন্দির ছোটনাগপুরের মহারাজা রঘুনাথ শাহীর সহোদর ঠাকুর আইনি শাহী অনুমান ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন। জগন্নাথপুর গ্রামখানি বরকাগড় ষ্টেটের অন্তর্গত, ইহা ঠাকুর আইনি শাহী সহোদরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। * ঠাকুর আইনি শাহী মহারাজা রামশাহীর চতুর্থ পুত্র। ইনি পরম ভক্ত সাধু ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইনি নিয়ত দেব-পূজা ও ধ্যানে আত্মসমাহিত থাকিতেন।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। ইনি একবার জগন্নাথ দর্শনে ৺ পুরী গিয়াছিলেন। সেখানে মন্দিরাভ্যন্তরে বহুদিন অনাহারে থাকিয়া দেবতাকে ডাকেন। ভক্তের কঠোর আরাধনায় লক্ষ্মী অত্যন্ত প্রীতি হন, এবং কথিত আছে, স্বপ্নযোগে দেবীর অনুমতিক্রমে ভক্ত আইনি শাহী দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৺ পুরীর মন্দিরের অনুকরণে জগন্নাথপুরের উচ্চ শৈলশিখরে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর শাহীই নাকি এই অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথমে আম্র বৃক্ষ রোপণ করেন এবং উহা জগন্নাথজীর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এই সমগ্র গ্রামখানি একজন কনৌজী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শাসিত হয়। বারকাগড়ের লালবংশ কর্ত্তৃক এই ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত হইতেন। পুরোহিত ঠাকুর প্রত্যহ দেবপূজা ও মন্দির মেরামতের জন্য দায়ী। এই কাজের জন্য ইনি গ্রামের আয় হইতে বার্ষিক ৮৮৲ পাইয়া থাকেন। ঠাকুর আইনি শাহী উপরোক্ত বন্দোবস্ত করিয়া যান। এই সামান্য আয় দেবপূজা ও মন্দির সংরক্ষণে যথেষ্ট নয় বলিয়া ঠাকুর বিশ্বনাথ শাহী ১৮৫৭ খ্রীঃ ব্রাহ্মণকে বার্ষিক ১৯৬৲ আয়ের 'ভুরসোয়ার' গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দান করেন। কিন্তু বিশ্বনাথ শাহীর এই দান স্থায়ী হয় নাই। ১৮৫৭ খ্রীঃ মিউটিনির অগ্নিশিখা রাঁচিতে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ঠাকুর বিশ্বনাথ মদবশে রামগড়ের বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি প্রত্যহ ডুরেণ্ডার ছাউনিতে বসিয়া বিচার করিতেন। জমাদার মাধোসিং সৈন্যদের প্রধান পরিচালক ছিলেন। সময়ে বিদ্রোহানল উপশমিত হইলে জুডিসিয়েল কমিশনারের বিচারে বিশ্বনাথ শাহীকে ১৮৫৮ খ্রীঃ ১৬ই এপ্রিল ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ এর ১০ই ডিসেম্বর ৯৭ নব্বই খানি গ্রাম সহ তাহার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হয়। অধিকন্তু জগন্নাথপুরের মন্দিরের পুরোহিতকে বিশ্বনাথ শাহী যে অতিরিক্ত ব্রহ্মোত্তর

"The picturesque temple of Jagarnathpore, about six miles to the west of Ranchi, was built by Thakur Aini Sahi just six years later in Sambut 1748 or 1691 A. D. This fort-like temple with its solid masonry work, and towering steeple, stands queen-like on the top of a solitary hill, as if presiding over the destinies of the plateau which it over-looks. The animal fair held at the foot of the hill on the occasion of Rath Jatra festival attracts thousands of men and women from all parts of the Chota-Nagpur Division."—S. C. Ray, M, A. B. L.

সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন অদ্যাও গবর্ণমেণ্ট নামঞ্জুর করেন।

মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অন্য জনপ্রবাদ এই যে ঠাকুর শাহীর সাত স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রী ৺ পুরীর রাজার কন্যা ছিলেন। রাজকন্যার জগন্নাথদেবের প্রতি অচলা ভক্তিহেতু ঠাকুরশাহী এই মন্দির নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

পাহাড়ের নীচে সমতল ভূমিতে রথ টানা হয়। রথখানি পতাকা ও সালু কাপড় দিয়া সজ্জিত করা হয়। যাত্রীরা পাহাড়ের পাদদেশ হইতে গুণ্ডিচা বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারি সারি দাঁড়ায়। জনসাধারণের বিশ্বাস, প্রতি বৎসর রথযাত্রার দিন ঠাকুর জগন্নাথ স্বয়ং জগন্নাথপুরে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আগমন করেন। এরূপ ধামরাইর মাধবের রথ সম্বন্ধেও একটা কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। ভক্ত অন্তর্দৃষ্টিতে ধামরাই মাহেশ অথবা জগন্নাথপুরে ঠাকুরের দারু মূর্ত্তিতে প্রাণময়ী প্রতিমা দর্শন করেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অনেক স্থলেই সাধক এইরূপ অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন।

জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখ ভাগে ক্ষুদ্র একটি টিলার উপর "গুণ্ডিচা বাড়ী" দৃষ্ট হয়। রথযাত্রার সময় ঠাকুর মূল মন্দির পরিত্যাগ করিয়া সাতদিন গুণ্ডিচা বাড়ীতে অবস্থান করেন। এখানে সাতদিন ধরিয়া নিয়মিতরূপে ঠাকুরের পূজাদর্শন ভোগ প্রভৃতি হইয়া থাকে। জগন্নাথপুরের মূল মন্দিরের চারিদিকের প্রাচীর ও গুণ্ডিচাবাড়ী সংস্কারাভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নূতন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মন্দিরটী রক্ষার উপায় বিধান করা উচিত। আশা করা যায় বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ মাননীয় মিঃ গেইটের অনুকূল দৃষ্টি এই ভগ্ন মন্দিরের উপর পতিত হইলে হিন্দুজাতির এই প্রাচীন কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা কম।*

শ্রীঅতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

* এই প্রবন্ধ রচনায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় এম এ বি এল ও রাঁচি কমিশনরের রেকর্ড কিপার (মহাপেচ) শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ হাজরা মহাশয়দের নিকট আমি যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। —লেখক

নাচ্‌নী পাখী

নাচ্‌নী পাখীর খাঁটী নাম আমরা পাই নাই। আমাদের পল্লী-নিকুঞ্জে ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প না হইলেও কেহ অনুগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবের জন্য নির্দ্দিষ্ট নামকরণ করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। কেহ বলে "ডালা ঘুরাণী," কেহ বলে "পেকম ঘুরাণী", কেহ বলে "নাচ্‌নী ঘুরণী" কেহ বা কেবল "নাচনী" বলিয়া থাকে।

"নাচ্‌নীর" দেহায়তন টুন্‌টুনির হইতে একটু বড়। টুন্‌টুনির দেহ বেশ গোলগাল আর নাচ্‌নীর দেহ পাত্‌লা, কতকটা চেপ্টা। এই পাখীর রঙ্‌ মেটে কালো —চাকচিক্যহীন। মাথাটী ক্ষুদ্র। চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল কৃষ্ণতার, চক্ষুর চারিদিকের বেষ্টনী রজ্জুর মত পাক দেওয়া সূক্ষ্ম শ্বেতবিন্দুমিশ্রিত কাল বর্ণের। নাচ্‌নীর ঠোঁট সরু, বেঁটে, এবং শক্ত। ইহাদের নাসারন্ধ্রের চতু-র্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম দৃষ্ট হয়। এই লোম পরিণত বয়সে উদ্গত হয়।

নাচ্‌নী পাখীর গলদেশে হাঁসুলীর মত এক সাদা রেখা আছে। যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা তাহার ডানার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া আছে। ডানা দুটী খাট। প্রত্যেক ডানায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালক আছে। পালকগুলি পরস্পর অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট—যেন আঁটা দিয়া জোড়া। কিন্তু নাচ্‌নীর ডানা অন্যান্য পাখীর তুলনায় কম মজবুত। ইহাদের ডানা পালক সমেত চারি ইঞ্চির বেশী লম্বা নহে। পা দুটী সরু, কোমল। নখ তীক্ষ্ণ।

নাচ্‌নী পাখীর লেজের পালকগুলি পক্ষীটীর দেহা-য়তনের অনুপাতে একটু দীর্ঘ। এই পালকগুলির বর্ণ ইহাদের দেহের বর্ণের মত মেটে কালো। লেজের অগ্রভাগ চন্দ্রকলার মত পরিষ্কার সাদা, সপ্তমীর চন্দ্রের মত ঈষদ্‌বক্র। পুচ্ছের নিম্নদিকের গোড়ার অংশ সামান্য সাদা পালকে আবৃত।

ইহারা কখনও লোকালয়ে আগমন করে না। বাঁশ ঝোপের আঁড়ালে বা নিবিড় ঝোপের মধ্যে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী পাট ক্ষেতের ভিতর নাচনী পাখী এ ডাল সে ডাল করিয়া নাচিতে থাকে। অনেক পাখীই এ ডাল সে ডাল নাচে বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে নাচ্‌নীর একটা বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্বই প্রধানতঃ বক্তব্য।

নাচ্‌নী পক্ষী নাচিবার সময় ঠিক ময়ূরের অনুকরণে মাথা হেঁট করিয়া, পুচ্ছ বিস্তার করতঃ পেকম ধরিয়া নৃত্য করে। ইহাদের বিস্তৃত পক্ষপুট ক্রমে বক্র করিয়া উপরের দিকে তুলিয়া ঈষৎ সম্মুখে হেলায়। দুই এক পা নৃত্য করিয়া আবার প্রসারিত পক্ষ পার্শ্বদিকে বিস্তৃত করতঃ পর মুহূর্ত্তেই সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে এবং পুনরায় পেকম ধরিয়া নাচিতে থাকে। মেঘগর্জ্জন শ্রবণে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া ময়ূর নৃত্য করে; নাচ্‌নী পক্ষীর নৃত্যে কাহারও অপেক্ষা নাই। যখনই তাহার মনে হর্ষ উপস্থিত হয়, তখনই সে সুর সংযোগে নাচিতে আরম্ভ করে। একটু দূরে নীরবে বসিয়া ইহাদের মধুর শীস্ শ্রবণ ও মনোহর নৃত্য দর্শন করিয়া যুগপৎ চক্ষুকর্ণের তৃপ্তি সাধন করা যায়।

নাচ্‌নী পক্ষী অনুচ্চ শীষ দিয়া থাকে। সে শীষ বেশী লম্বা নহে, একটু চিতানে টান তুলিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দেয়—এই পর্য্যন্ত। শীষের সঙ্গে নাচের একটু লয় আছে।

ইহাদের পুরুষ পক্ষীরাই নৃত্যগীতে পারদর্শী। মেয়েগুলো অকর্ম্মা। মাদি কোকিলের মত তাহারা দেখিতে বিশ্রী। তদুপরি দুষ্টামিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। গর্ভধারণের সময় উপস্থিত হইলে ইহারা বিকট চীৎকার করিয়া পুংপক্ষীগুলিকে ঠোকরাইয়া অস্থির করিয়া তোলে। আসঙ্গলিপ্সু পুং পক্ষীগুলি বহু অত্যাচার সহ্য করিয়াও দূরে সরিয়া যাইতে চাহে না। এ সময় পুংপক্ষীগুলির দুর্দ্দশার একশেষ হয়। অনেক সময় ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে।

বাঁশঝোপের ভিতরে, বাঁশের গোড়ায় একটী ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করিয়া পক্ষিণী তাহাতে দুইটী ডিম্ব প্রসব করে। ডিমে তা দিবার ভার অনেক সময়ই স্বামীর উপর অর্পণ করিয়া পক্ষিণী ব্রহ্মদেশীয় রমণীগণের মত বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সময় বহু পক্ষী, ডিম্ব বা ছানা সহ সর্প, নকুল প্রভৃতির জঠরজ্বালা নিবারণে আত্মদান করিতে বাধ্য হয়। প্রধানতঃ এই কারণে নাচ্‌নী পক্ষীর বংশলোপ হইতেছে। নাচ্‌নী পক্ষী জ্যৈষ্ঠমাসে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আকাশ

বড় ভালবাসি তোমা দেখিতে সদাই
হে বিরাট অনন্ত আকাশ।
বিশাল বক্ষেতে তব যে দিকে তাকাই
মহত্তত্ব পূর্ণ পরকাশ।

প্রসারি বিপুল হৃদি পরিধি-বিহীন
মহাপ্রেমে ধরিয়াছ কত!—
রবি-শশী-গ্রহ-তারা, কোটী সৌরপুর,
ভীমবাত্যা-বজ্র অগণিত!

জলদের মহাদ্বন্দ্ব,—ভৈরব গর্জ্জন —
তড়িতের তাণ্ডব ভীষণ,
ঝঞ্চার কলহ নিত্য, উল্কার পতন,
পুচ্ছধারি-জ্যোতিষ্কের ঘোর আলোড়ন,
সহিছ রে কত বিড়ম্বন!

অযুত উৎসব নিত্য, অসংখ্য প্রলয়,
তব বুকে কত কিছু হয়!
বিধাতার কর্ম্মভূমি তুই রে নিশ্চয়
ভাঙ্গা-গড়া তো'তে অভিনয়!

অত্যাচারে অবিকারী,—ধন্য মহাপ্রাণ,
ধন্য তব দৃঢ় সহিষ্ণুতা!
হৃদে রাখি কর শান্ত—কিবা প্রতিদান!
ব্রহ্মাণ্ডের ঘোর উন্মত্ততা!

আঘাতে অক্ষত যদি নহ রে কঠিন!
মৌনী, কিন্তু নহ অভিমানী!
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডারে তব, তবু দীনহীন?
'শূন্য' নামে নাহি কিছু গ্লানি!

ক্ষুদ্রতা নীচতা স্বার্থ হ'য়ে যায় লয়
হেরি যবে এ হৃদি তোমার—
কি বিস্তার নিরাকার মহাভাবময়
শুদ্ধ শান্ত চির নির্ব্বিকার!

শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গালা সাহিত্যে দৃশ্য কাব্য

(আদিযুগ)

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে বাঙ্গালা ভাষার সহস্র বৎসরের স্বাধীন অস্তিত্বে সন্দেহ করিবার কোন কারণই দেখা যায় না, তাহাতে প্রকৃত দৃশ্য-কাব্যের জন্ম হইয়াছিল মাত্র গত শতাব্দীর মধ্যভাগে! প্রাচীন কালে যে দৃশ্যকাব্যজাতীয় সাহিত্য একেবারে ছিল না তাহা নহে। বাঙ্গালা দেশে বহুদিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণ যাত্রাগুলিই কতকটা দৃশ্যকাব্যের স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই কৃষ্ণযাত্রার বয়স নির্ণয় করা সহজ নহে। ভারতচন্দ্রের আরব্ধ অসম্পূর্ণ চণ্ডীনাটক হইতে বাঙ্গালী কবিগণের দৃশ্যকাব্য রচনার নিষ্ফল চেষ্টার আভাস পাওয়া যায়। এই সকল কেন যে সফল হইয়া উঠে নাই, তাহা অবগত হইতে হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতির আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রাচীন বাঙ্গালী কবির প্রতিভা প্রধানতঃ দুই রকম রচনায় বিশেষ বিকাশলাভ করিয়াছে,—ধারাবাহিক কাব্যে এবং ছোট ছোট পদ বা গীতিকবিতায়। এক একজন শক্তিশালী কবি উদিত হইয়া প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আর গতানুগতিক বাঙ্গালী কবিগণ যুগ যুগ ধরিয়া সেই প্রদর্শিত পথেই কাব্য রচনা করিয়া আসিয়াছেন। রাজা রাজ্য ওলট পালট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু হিন্দুর রক্ষণশীল স্বভাবের ফলে যুগে যুগে কাব্য-রচনা রীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কাজেই মাত্র দুইশ্রেণীর রচনায় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সম্মুখে শত বৈচিত্র্যময় সংস্কৃত সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য যাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সরল গ্রাম্য কবিগণ প্রায়ই সংস্কৃতের ধার ধারিতেন না। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যে শকুন্তলা উত্তররামচরিতের অসদ্ভাব না থাকিলেও বাঙ্গালা ভাষায় তাহার আমদানী হইয়া উঠে নাই। আমদানী যাঁহারা করিতে পারিতেন, দেশের মস্তিষ্ক-স্বরূপ সেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ মাতৃভাষাকে পৈশাচী আখ্যায় অভিহিত করিয়া তাঁহাদের দীর্ঘ শিখা, হ্রস্ব ধুতি ও নস্যের কৌটা লইয়া অতি সাবধানে সেই পৈশাচী ভাষার সংশ্রব এড়াইয়া পাণিনী-প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ণ পথে সন্তর্পণে পাদক্ষেপণ করিতেন। এ দিকে দৃশ্যকাব্য রচনার জন্য যে মানব-হৃদয়ের অভিজ্ঞতা, চরিত্র-বৈচিত্র্য-জ্ঞান, সুনিপুণ হস্ত এবং ঘটনাতরঙ্গের ঘাত-প্রত্যাঘাত আবশ্যক, তাহা বাঙ্গালী কবিগণের ভাণ্ডারে ছিল না। বাঙ্গালা ধারাবাহিক কাব্যগুলি নেহাৎ ই হেম বাবুর কল্পিত "বাঙ্গালীর মেয়ে" ;—না আছে তাহার সজীব সম্পূর্ণতা, না আছে তাহার নায়িকার উপযুক্ত অন্য কোন গুণ। যে কবিরই গ্রন্থ খোলা যাক না কেন, সেই "পা ছড়ায়ে বসা," "রসনা কলের

গাড়ী” “জলো দুধে পুষ্ট দেহ,” “এলোমেলো গৃহস্থালী,” “হুলুধ্বনি কোলাহলে চতুর্ম্মুখ,” মূর্ত্তিটি চোখে পড়িবে। কিন্তু এদিকে—

মৃদু মৃদু হাসিটুকু অধর রঞ্জন,
সাবাস সাবাস নাকচোখের গড়ন;
কালো চুলে কিবা ঘটা, চোখে কাল তারা!
দেখে নাই যারা কভু দেখে যাক্ তারা।
ভাসা ভাসা খাসা চোক তুলি দিয়ে আঁকা
তা'উপরি কিবা সরু ভুরুযুগ বাঁকা।
থমকে থমকে স্থির গতি কি সুন্দর,
হাসি হাসি মুখখানি কিবা মনোহর!
আহা আহা লজ্জা যেন গায়ে ফুটে আছে
কোথা লজ্জাবতী তুই এ লজ্জার কাছে,—

ইত্যাদি সবই মিলিবে, কিন্তু ইহা হইলেই ত আর নাটক হয় না। ইহাতে নাটকের দেহ স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু নাটকের প্রাণ-মদিরতা নাই।

বাঙ্গালা কাব্যের আর একধারা চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মানস-কন্যা গীতি-কবিতা কিরণশরীরিণী অশ্রুজলগঠিতা দেবকন্যা,—তিনি দৃশ্য-কাব্যের পার্থিব লোকে নামিতেন না। কাজেই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে নাটক জন্মিতে পারে নাই।

আমারা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কৃষ্ণযাত্রাগুলিতেই অশরীরী বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্য অবয়ব ধারণ করিতেছিল। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই কৃষ্ণযাত্রায় দেশ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বিশাল তরঙ্গের শীর্ষে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আমরা মহাত্মা কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে পাই।

প্রধানতঃ ঢাকা নগরী তাঁহার কর্ম্মস্থল ছিল। পূর্ব্ব-বঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইলেও পশ্চিম বঙ্গে তাঁহাকে খুব কম লোকেই চিনে। যদিও ইহা স্বীকার্য্য যে তাঁহার অনুপ্রাস-জর্জ্জরিত রচনারীতি আমাদের বর্ত্তমান রুচি ও শিক্ষার সহিত খাপ খায় না, এবং তাঁহার অসহ্য বাকচাতুরী ভেদ করিয়া কাব্য রসাস্বাদ করিতে অনেক সময়ই উৎসাহ ও ধৈর্য্য বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে,—তবু তাঁহার ভাবুকতায় ও সহৃদয়তায় সন্দেহ করিবার কোনও কারণই নাই।

প্রাচীন কালের কবিরা তাঁহাদের বক্তব্যকে তাঁহাদের রুচি অনুসারে অত্যন্ত সুন্দর করিয়া বলিতে চেষ্টা করিতেন। আমাদের সৌন্দর্য্যের আদর্শ একেবারে বদলিয়া গিয়াছে; ভাবাবেগে একটা অলঙ্কৃত বাক্য আমাদের মুখে আসিলেও আমরা তাহা যথাসম্ভব সরল করিয়া বলি। আমাদের ভয়, পাছে কথাটা স্বাভাবিক না হয়, পাছে লোকে মনে করে কথাটা আমাদের হৃদয়ের কথা নহে! পূর্ব্বে লোকে (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে) বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিত, তথাপি চোখের জল পড়িত; এখন লোকে গুমরিয়া কাঁদে, তথাপি চোখের জল পড়ে। আসল কথা এই যে চোখের জলটাই খাঁটি জিনিস, ক্রন্দনের প্রকারভেদ নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে প্রৌঢ়া গৃহিনীগণও সূক্ষ্ম শাড়ী পরিয়া আপাদমস্তক অলঙ্কারপ্রপীড়িত হইয়া, চারিগাছা মল পায়ে দিয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে হাঁটিয়া যাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং কেহ দেখিয়া তাহা অশোভন বা অস্বাভাবিক বলিয়াও মনে করিতেন না। এখন নব্যাদের অলঙ্কার সূক্ষ্ম এবং পরিধান সেমিজ জ্যাকেট সাহায্যে পুরু হইতেছে, পায়ের মলের পরিবর্ত্তে স্লিপার দেখা দিবার যোগাড় করিয়াছে, কিন্তু নব্যাগণ তাহাতে আগের চেয়ে কম আনন্দিত নহেন। সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তিত আদর্শ লইয়া বিচার করিতে বসিয়া আমরা প্রাচীন সাহিত্যে উপমার ছটা ও অলঙ্কারের ঘটা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাই, এবং তাহাতে কৃত্রিমতার আরোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসি। কিন্তু আমাদের চোখে ফল্গু নদীর উপর বালুকারাশি ধূ ধূ করিলেও, নিম্নে সলিল-প্রবাহের অস্তিত্ব তাহাতে লুপ্ত হইয়া যাইবে না। প্রাচীন কালে লোকে প্রধানতঃ দেখিত, কি বলা হইতেছে, কেমন করিয়া বলা হইতেছে অহা তাহাদের সব সময়ে খেয়াল থাকিত

না। আমরা এখন কি বলা হইতেছে তাহাত দেখিই, কেমন করিয়া বলা হইতেছে, সেই বিষয়েও আমাদের প্রখরদৃষ্টি,—একটু বেশকম হইলেই উকিলের জেরা লইয়া আমরা হাজির! পূর্ব্বে লোকে দেখিত যে, প্রকৃত মহৎ লোক বলিয়া যে পরিচিত হইতে চায়, সে সহৃদয় কি না, মুক্তহস্তে সে দানধ্যান করিতেছে কি না, তাহার পরিধানের ধুতি হাঁটুর উপর উঠিলেও কেহ তাহা লক্ষ্যের মধ্যেই আনিত না। এখন লোকে দান-ধ্যান ত অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে দেখেই, অধিকন্তু তাহার বসনভূষণ একটু বে-মানান হইলে তীব্র সমালোচনার হস্ত হইতে সে অব্যাহতি পায় না। উদ্ভট বসন-ভূষণের অন্তরালে মহৎ স্বভাব এবং কৃত্রিম ভাষার অন্তরালে মধুর কাব্য বাঙ্গালা দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণকমলের প্রথম গ্রন্থ "স্বপ্নবিলাস" প্রচারিত হয় *। রামনারায়ণের "কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব" স্বপ্নবিলাসের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী; কিন্তু কুলীনকুলসর্ব্বস্ব সংস্কৃত নাটকের আদর্শে রচিত। কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব হইতে বাঙ্গালা নাটকের এক নূতন ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। সোনার বাঙ্গালার খাঁটি জল

কৃষ্ণকমল গোস্বামী

বায়ুতে বর্দ্ধিত স্বপ্নবিলাসাদির কাব্য যে স্রোতে বাহিত শেষ পুষ্পোপহার, তাহা কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব দ্বারা প্রারব্ধ স্রোত হইতে একেবারে ভিন্ন;—সে স্রোতের পূর্ব্ব প্রবাহ অতীতের দূর প্রান্তরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কাজেই আমরা রামনারায়ণের আগে কৃষ্ণকমলের গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিব।

কৃষ্ণকমলের গ্রন্থাবলী নামে নাটক, কিন্তু ইহাতে নাটকত্ব নাই বলিলেই হয়। অভিনয়যোগ্য অংশ প্রায় নাই, কেবলি গান। রবি বাবুর "মায়ার খেলা" যেমন আদ্যন্ত গানে গঠিত, এগুলিও প্রায় তেমনি, তবে মধ্যে মধ্যে সামান্য গদ্যাত্মক কথাবার্ত্তা আছে। আমরা ছেলেবেলায় দেখিতাম, কাব্যোক্ত পাত্রপাত্রীগণ সাজিয়া গুজিয়া আসরে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, মধ্যে মধ্যে দুই একটি কথা বলিয়াই গান ধরিত এবং দলস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ সমস্বরে তাহাতে যোগ দিত। মনে আছে, ভাবমগ্ন বৃদ্ধগণ যখন গান শুনিয়া অবিরলধারে অশ্রুপাত করিতেন, তখন তাঁহাদিগকে অত্যন্ত অদ্ভুত জীব মনে হইত। আমরা তখন নাটক দেখিয়াছিলাম, আধুনিক প্রণালীর যাত্রাও শুনিয়াছিলাম, যাত্রা নাটককে অত্যন্ত আমোদের জিনিস বলিয়াই জানিতাম। কাজেই এইরূপ হাস্যজনক অভিনয় দেখিয়া বৃদ্ধগণ কেন যে কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন, তাহার কোন হেতুই খুঁজিয়া পাইতাম না!

স্বপ্নবিলাস একাদশ দৃশ্যে সমাপ্ত গীতিনাট্য। ইহাতে অঙ্কবিভাগ নাই। প্রথমেই গৌরচন্দ্র বা গৌরচন্দ্রিকা *। ইহা কতকটা সংস্কৃত নাটকের নান্দীর মত। তাহার

---

* শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার গোস্বামী মহাশয় সম্পাদিত কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলীর সংস্করণে লিখিত আছে (কৃষ্ণকমলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৬ পৃষ্ঠা) যে ঢাকার আবদুল্লাপুর গ্রামে স্বপ্নবিলাসের প্রথম অভিনয় হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক গ্রন্থে এই কথাই পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ঢাকা নগরের একরামপুর অংশের বৈষ্ণবদিগের অনুরোধে স্বপ্নবিলাস রচিত হয় এবং একরামপুরের ময়দানেই ইহার প্রথম অভিনয় হয়। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ দিব্যোন্মাদেরই প্রথম অভিনয় আবদুল্লাপুর গ্রামে বসাক বাবুদের কাছারী বাড়ীর প্রাঙ্গনে হইয়াছিল। এই দুই কাব্যেরই প্রথম অভিনয় দেখিয়াছেন, এমন অনেক লোক এখনও জীবিত আছেন। আবদুল্লাপুর বিক্রমপুরস্থিত একখানি বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ধনীব্যবসায়ীবহুল গ্রাম।

* কৃষ্ণ যাত্রাগুলির প্রারম্ভে গৌরচন্দ্র বা গৌরচন্দ্রিকা গীত হইত। এই সমস্ত নাট্যকাব্যের উৎপত্তিতে চৈতন্যের অনুবর্ত্তীদের প্রভাব কতখানি কাজ করিয়াছিল, ইহা তাহারই নিদর্শন। গৌরচন্দ্রিকা শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় এত প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে ইহা এখন প্রায় ভূমিকা অর্থবাচক—লেখক

পরে প্রস্তাবনায় পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয় কি এবং তাহা কি অবস্থায় আরম্ভ করা হইবে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। যেমন স্বপ্নবিলাসের প্রস্তাবনা:—

স্বপ্নবিলাস

শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ খেদে যত ব্রজবাসী।
কৃষ্ণ আগমন চিন্তা করে দিবা নিশি॥
সর্ব্বদা করয়ে সবে কৃষ্ণানুশোচন।
আসিবার পূর্ব্বে হৈল মঙ্গল সূচন॥
নিশি যোগে যশোমতী ব্রজনিশাকরে।
স্বপনে দেখিয়ে কেঁদে বলে ব্রজেশ্বরে॥

এই প্রস্তাবনা কতকটা সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার ও নটীর কথোপকথনের মত। সূত্রধার ও নটী যেমন কথায় কথায় বিষয়টি সূচিত করিয়া দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং সেই সূত্র ধরিয়া নাটক আরব্ধ হয়, ইহাও সেই রকম। ইহা ছাড়া গ্রন্থের মধ্যেও চতুর্থ দৃশ্যের শেষে ও পঞ্চম দৃশ্যের প্রারম্ভে একটি প্রস্তাবনা আছে। ইহা সংস্কৃত নাটকের বিষ্কম্ভকের মত। ঘটনার যে স্রোতের বর্ণনা নাটকের মধ্যে হইতেছে, তাহার বাহিরে যে গুরুতর ঘটনা সমকালেই ঘটিতেছে এবং যাহা নাটকের ভবিষ্যৎ স্রোতকে নিয়মিত করিবে, তাহার বর্ণনাই বিষ্কম্ভকের কার্য্য। এই ক্ষেত্রে এই প্রস্তাবনার কার্য্যও ঠিক তাহাই। বৃন্দাবনের ঘটনাবলিরই মধ্যে সমকালেই মথুরায় কি ঘটিতেছে, তাহা জানাইবার জন্যই ইহার অবতারণা। সংস্কৃত নাটকে দৃশ্য-ভাগ নাই, কাজেই নাটককে নেহাৎ জলো না করিয়া আট সাট রাখিতে হইলে বিষ্কম্ভকের অবতারণা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু স্বপ্ন-বিলাসে শুধু কতকগুলি দৃশ্য সমন্বয়ে যখন নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে, তখন আর একটা দৃশ্য বাড়াইয়া দিয়া অনায়াসে এই প্রস্তাবনা ছাড়িয়া দেওয়া যাইত। গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে ব্যাখ্যাসূচক কতকগুলি পদ আছে, তাহা কোন পাত্রপাত্রীর উক্তি নহে, তাহা গ্রন্থকারের উক্তি। প্রধান গায়ক শ্রোতৃ-মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া এগুলি সুরে আবৃত্তি করিয়া যায়।

প্রথম দৃশ্যে মা যশোমতী গোপালকে স্বপ্নে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছেন ও নন্দকে স্বপ্নকাহিনী নিবেদন করিতেছেন। স্বপ্নকাহিনী শুনিয়া নন্দের নিরুদ্ধ দুঃখরাশি উথলিয়া উঠিল, কিন্তু সে অভিমানের ভাবে যশোদাকে জানাইল যে গোপাল আর আসবে না। মার মন কি তাহাতে প্রবোধ মানে? যশোদা পূর্ব্বের মত ক্ষীরননী হস্তে দরজায় যাইয়া "গোপাল" "গোপাল" বলিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন। দূরে শ্রীদাম ও সুবল তাহাদের প্রিয়সখার বিরহে দুঃখ করিতে করিতে যাইতেছিল, এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের মন গলিয়া গেল। তাহারা উচ্ছলিত অশ্রু চাপিয়া গোপাল আসিবে বলিয়া যশোদাকে প্রবোধ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

এই দৃশ্যের প্রথমেই সেই বিখ্যাত গান—

শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকাল—

কতদিন অতীত হইয়া গিয়াছে, ব্রজের গোপাল ব্রজ ছাড়িয়া কর্ম্মের আহ্বানে সংসারে বাহির হইয়া পড়িয়াছে! আজ সহসা স্বপ্ন দেখিয়া যশোমতীর সদাজাগ্রত স্নেহ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। মানবের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির অন্তরালে একটি স্নেহবিহ্বলা কোমলতাময়ী রমণী বাস করে; সে মিলনেও কাঁদে এবং বিচ্ছেদেও অশ্রুজলের বন্যা বহাইয়া দেয়। সে সংসারকে চিনে না, সংসারের নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তনকে সে মানে না, সে কালের অপ্রতিহত গতির বিরুদ্ধে এক অশ্রুকরুণ অসহায় বিদ্রোহ। কাল তাহার অপ্রতিরোধ্য গতিতে তাহাকে অহরহ পদদলিত করিয়া ছুটিতেছে, অহরহ সে পরাজিত, ভূলুণ্ঠিত হইতেছে, তবু সে অনাদি কাল হইতে চির বিদ্রোহ জাগাইয়া রাখিতেছে, কিছুতেই পরাজয় মানিতেছে না। তাহার সম্বল একমাত্র বিগলদ্ অশ্রু, তবু ইহা লইয়াই সে অনাদি কাল হইতে কালের পরিবর্ত্তন অস্বীকার করিয়া আসিতেছে। কর্ম্মের আহ্বানে কর্ম্মযোগী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু স্নেহবিহ্বলা যশোদা কিছুতেই কৃষ্ণের এই অখণ্ডনীয়

প্রস্থানকে মানিয়া নিতে পারিতেছে না। সে এখনও আশা করিয়া আছে, কৃষ্ণ চিরদিনের জন্য যায় নাই, আবার সে আসিবে, আবার সে মা বলিয়া ডাকিবে। তাই সে এখনও স্বপ্ন দেখে যে কৃষ্ণ আসিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া নবনীসরের জন্য পূর্ব্বের মত আবদার করিয়া কাঁদিতেছে, তাই সে এখনও ক্ষীরসরনবনীপাত্রহস্তে বহির্দ্বারে যাইয়া গোপালের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে! এমন একটা অতৃপ্ত চিরজাগরূক আশা ও স্মৃতি মনে রাখিয়া যায় বলিয়াই পৃথিবীর বিচ্ছেদগুলি এত নিষ্ঠুর!

এই দৃশ্যে গোপালবিচ্ছেদবিধুরা যশোমতীর আর্ত্ত মাতৃমূর্ত্তি অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণকমলের প্রধান দোষ ভাষার কৃত্রিমতা ও বাক্ চাতুরী স্বপ্ন-বিলাসের প্রথম হইতেই আধুনিক রুচির পাঠককে পীড়া দিতে থাকে। গৌরচন্দ্রিকার প্রথমেই—

বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্রচরণারবিন্দবন্দ্য
মকরন্দ গন্ধলুব্ধ বৃন্দারক বৃন্দবন্দ্য

দেখিয়া এবং তাহার রাগিণী বেহাগ ও তাল ধ্রুপদের আক্রমণে খুব টে্ঁকসই পাঠকও পলায়নপর হইবেন। তাহার পরে কিছু দূরে যখন সুবল বলে—"মাগো ব্রজেশ্বরী তোমার নীলমণিকে কিছুদিন ভুলে থাক মা", এবং তাহার উত্তরে যশোদা বলে—

"(সুরে) ওরে সুবল রে! ওকি বলিস্ বাছা, সে বাছা কি ভুলবার বাছা, বাছা আমার জগৎ বাছা, তা বিনে যে প্রাণে বাঁচা, সে বাঁচা কি বাঁচার বাঁচা? বলি বলি তবে যে বাঁচা, কেবল মরণ হয় না বলেই বাঁচা। এখন না দেখিলে বাছা আর যে বাঁচা যায় না বাছা, বাছারে দেখায়ে দে বাছা, আমায় বাঁচারে বাঁচারে বাঁচা।"

তখন নিরুপায় পাঠক বোধ হয় হাল ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা বিনাইয়া কান্না, তবু ইহাতে চোখের জলের যে অভাব নাই পাঠক তাহার ক্রমশঃই পরিচয় পাইবেন। প্রাচীন কাব্যে, এমন কি সেক্সপীয়রের কাব্যেও এরূপ অনুপ্রাস-প্রিয়তার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। হর্ষ-চরিত্রের "হারং দেহি মে হারিণী" ও তৃতীয় রিচার্ডের (Richard III) গণ্ট (Gaunt) শব্দটি লইয়া কুস্তী স্মরণীয়।

আমরা স্বপ্ন-বিলাসের প্রথম দৃশ্যের বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। কারণ কৃষ্ণকমলের গুণ ও দোষ উভয়ই প্রথম দৃশ্যেই পূর্ণ প্রকাশিত। যেখানে ভাবাবেগ প্রবল হইয়া ভাষার কৃত্রিমতাকে প্রবল স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে সেখানে কৃষ্ণকমলের কবিত্ব অতুলনীয়, আর যেখানে ভাষার কৃত্রিমতা প্রবল হইয়া ভাবের কণ্ঠ রোধ করিয়াছে সেখানে কৃষ্ণকমলের রচনা অসহ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্যে রাধিকা কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখিয়া আকুল হৃদয়ে নিদ্রা হইতে উঠিতেছেন, অতীত সুখের শতকথা তাঁহার অশান্ত হৃদয়ে উথলিয়া উঠিতেছে। সখিগণ তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল, নিঠুর প্রতারক শ্যামের কথা তাহাকে ভুলিয়া যাইতে উপদেশ দিতে লাগিল। তাহাতে রাধার দুঃখরাশি আরও দ্বিগুণ উথলিয়া উঠিল, এত দুঃখের নিধি শ্যামকে সখিগণ বিস্মৃত হইতে বলিতেছে! তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে শ্যাম যে তাহার কত প্রাণপণ সাধনার ধন তাহাই বর্ণনা করিতে লাগিলেন। দুঃখাবেগে অবশেষে রাধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ভাব ও বর্ণনা গৌরবে সমস্ত স্বপ্ন-বিলাসের মধ্যে এই দ্বিতীয় দৃশ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ বিরহে রাধার দুঃখ অতীতের সুখস্মৃতির করুণ কাহিনী, কৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ এবং সেই অনুরাগ হইতেই উদ্ভূত দারুণ অভিমান এমন নিপুণতা ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সহিত বর্ণিত হইয়াছে যে পাঠমাত্রই সহানুভূতিতে হৃদয় ভরিয়া উঠে, গীত শুনিলে যে অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ললিতা যখন রাধাকে কৃষ্ণ চিন্তা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছে, তখন রাধা কৃষ্ণের প্রতি তাহার প্রবল অনুরাগের বর্ণনা করিয়া ললিতাকে নির্ব্বাক করিয়া দিতেছেন। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রবল আনন্দ রাধার কাহিনীর মধ্য দিয়া উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিতেছে। সে কি কৃষ্ণ চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহার কত আদরের কৃষ্ণ! গহন বিপিনে বংশী পঞ্চমে বাজিয়া উঠিত, আর মুহূর্ত্তে

তাহার সকল পার্থিব বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িত। পাগল হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সে একমাত্র স্বর লক্ষ্য করিয়া ছুটিত। কত বিষধর সর্প কাননপথে তাহার পা জড়াইয়া ধরিত, অপরিমেয় প্রেমাবেগের আত্ম-বিস্মৃতিতে তাহাদিগকে শীতল নূপুর বলিয়া মনে হইত। দুইটি আত্মা যখন মিলনাকাঙ্ক্ষী তখন দেহই তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহার উপর বক্ষবিলম্বী হারের ব্যবধান আরও অসহ্য বোধ হইত। তাই রাধা বলিতেছেন—

একদিন কুঞ্জে মিলনে দোহার
গলে ছিল আমার নীলমণি হার,
বিচ্ছেদের ভয়ে ত্যজিয়ে সে হার
অমনি তুলে নিলেম বক্ষে শ্যামচন্দ্রহার,

এমনি আবেগেই "উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম" চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল যে স্পর্শ পঞ্জরের উপর না হইয়া বক্ষের ভিতরে হয় না কেন? এমনি সময়েই—

"মুগ্ধতনু মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে!

আমাদের আধুনিক কবি গাহিয়াছেন—

এত প্রেম আশা প্রাণের পিপাসা
কেমনে আছে সে পাসরি?
তবে, সেথা কি হাসেনা চাঁদিনী যামিনী
সেথা কি বাজে না বাঁশরী?"

কিন্তু কত প্রেম আর কত আশা তাহা জীবন্ত নাটকীয় চরিত্রে দেখাইতে গিয়া কৃষ্ণকমল বোধ হয় চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির চেয়েও স্থানে স্থানে বেশী দেখাইতে পারিয়াছেন।

পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর বর্ণনা আরও সুন্দর। রাধা তাহার অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার বিলাইয়া দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, কিন্তু সহসা মনে পড়িল, মরিলে ত দেহ দাহন করিয়া ফেলিবে। তাহার দেহও যে তাহার নহে! তাহার নিজের নিকট তাহার দেহের আদর কিছুই নাই, কিন্তু যেই মনে পড়িল যে ইহা কৃষ্ণবিলাসের দেহ, তখন যেন তাহার নিকট তাহার দেহের মূল্য বাড়িয়া গেল। সে সখিগণকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতে লাগিল—আমি মরিয়া গেলে দেহ পোড়াইও না তাহাকে কৃষ্ণবরণ তমালের ডালে বাঁধিয়া রাখিও, যদি কোন দিন কৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসে তবে কৃষ্ণ অঙ্গ সমীর পরশে দেহ জুড়াইয়া যাইবে।* কিন্তু আর এক বিপদ! যদিও নিষ্ঠুর কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছে, তবু সে যে রাধাকে ভোলে নাই, রাধার প্রেমে যে কৃষ্ণের প্রাণ তেমনি ভরপুর সে বিষয়ে প্রেমময়ী রাধার কোন সন্দেহই নাই। কাযেই মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাধার মৃতদেহ দেখিলে কৃষ্ণের কি অবস্থা হইবে তাহা সে সহজেই কল্পনা করিতে পারিতেছে! সে যে রাধাকে মৃত দেখিলে সতীহারা শিবের মত রাধার মৃতদেহ স্কন্ধে উন্মত্ত হইয়া পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইবে! রাধার কত যতনের কৃষ্ণ রাধার অকিঞ্চিৎকর দেহের ভার বহন করিয়া ফিরিবে, সে চিন্তাও রাধা সহিতে পারিতেছেন না। তাই সখিগণকে সে বলিয়া যাইতেছে যে কৃষ্ণ যদি ঐরূপ চেষ্টা করে তবে তাহারা যেন তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া অমন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে। রাধা আরও বলিয়া যাইতেছেন যে সে মরিলে তাহার শোকে ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ আসিলে তাঁহাকে যেন সখিগণ অনাদর না করে—কত আদরের ধন কৃষ্ণ তাঁহার—তাহার অনাদর পরলোকেও রাধার বিষম বাজিবে। সখিগণের অবহেলা পাইবার যোগ্য কোন কায কৃষ্ণ করেন নাই, কারণ রাধাই অযোগ্য হইয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিল, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইয়া কৃষ্ণ ঠিক কাযই করিয়াছেন। এইস্থানে রাধার বিপরীতগামী ভাবপরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাত অতি নিপুণ ভাবে চিত্রিত।

তৃতীয় দৃশ্যে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাধার কুঞ্জের কোলাহল যাইয়া পশিয়াছে, চন্দ্রাবলী তাহা শুনিয়া রাধাকে দেখিতে

* কিন্তু এই সুন্দর অংশটুকু কৃষ্ণকমলের নিজের নহে অন্যের নিকট হইতে ধার করা। লেখক।

আসিতেছিল। রাধার অসীম দুঃখে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দ্রাবলীর মন পর্য্যন্ত নরম হইয়া গিয়াছে, সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেছে—

প্রতিকূল ভাবে যা বলি তা বলি,
কভু তুল্য নহে রাধা চন্দ্রাবলী।

চতুর্থ দৃশ্যে চন্দ্রাবলী যমুনাতীরে যেখানে রাধা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে এবং সখিগণ চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছে, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। রাধার অবস্থা দেখিয়া তাহার অতীতের স্মৃতি, দুঃখের সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তাহারা যে একই দুঃখের দুঃখিনী, একই নিষ্ঠুরের নিষ্ঠুরতায় যে তাহাদের এই দশা! সহানুভূতিতে আজ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে মিলাইয়া দিল, দুঃখাবেগে চন্দ্রাবলীও মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণনাম শ্রবণে চন্দ্রার চৈতন্য হইল, তখন সকলে রাধারও চৈতন্য সম্পাদনের জন্য তাহার কর্ণের নিকট উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল যে কৃষ্ণ আসিয়াছে! তাহা শুনিয়া রাধার অচিরাৎ চৈতন্য হইল, চেতনা পাইয়া রাধা জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিল। সম্মুখে তমাল তরুকে কৃষ্ণ ভাবিয়া যাইয়া আলিঙ্গন করিল, রাধার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। কাছে সমদুঃখিনী চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া সে কতক সান্ত্বনা লাভ করিল। রাধা তাহাকে বলিল, এস বোন, আমরা দুজনে বিরলে বসিয়া নিষ্ঠুর কৃষ্ণের কথা বলি—

আয় গো বল্লি চন্দ্রাবলী,
আয় গো দুজন বিরলে বসিয়ে,
কাঁদি দু'য়ে ধরে দু'য়ের গলে।
ঘরে গুরুজনার গঞ্জনার ভয়ে
ফুকারিয়া নারি বলিতে!

এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুঃখে এক করিয়া দিয়াছে, আজ একে অন্যের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধুর মিলন দৃশ্যে এই দৃশ্য শেষ হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে চতুর্থ দৃশ্য ও পঞ্চম দৃশ্যের মধ্যে একটি প্রস্তাবনা আছে। প্রস্তাবনায় কবি দর্শকদিগকে জানাইয়াছেন যে মথুরা যদিও কৃষ্ণের কর্ম্মভূমি তবু কর্ম্মক্লান্ত কৃষ্ণের হৃদয় বৃন্দাবনের কথা স্মরণ করিয়া মাঝে মাঝে হাহাকার করিয়া উঠিত। তাই তিনি দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পরবর্ত্তী দৃশ্যগুলি মিলনদৃশ্য। কৃষ্ণকমলের কবিত্ব মরুবাহিনী নির্ঝরিণীর মত এখানে ক্রমশঃ শুকাইয়া গিয়াছে। অঙ্কিত কৃষ্ণের চরিত্র কেমন যেন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর ন্যায় শীর্ণ ও দুর্ব্বল, কেবল রাধার চরিত্রের স্থানে স্থানে কবিত্ব-স্ফুলিঙ্গ দেখিয়া বুঝা যায় যে অগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই।

পঞ্চম দৃশ্যে যশোদা তাহার হারানিধিকে ফিরিয়া পাইল। ষষ্ঠ দৃশ্যে যশোদার বাড়ীর আনন্দ-কোলাহল রাধার কুঞ্জে গিয়া পশিয়াছে, বৃন্দা ব্যাপার কি জানিবার জন্য বাহির হইল। সপ্তম দৃশ্যে ব্রজপথে কৃষ্ণের সঙ্গে সুবলের দেখা হইল, সুবল কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধার দুর্দ্দশা বর্ণনা করিতে লাগিল। এই সময় বৃন্দা আসিয়া কৃষ্ণকে দুচারিটি বেশ কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল। কৃষ্ণকে সে চিনিতে পারিল না এবং কৃষ্ণ-বিরহে "তাহারা যে মরিয়া যায় নাই তাহা কৃষ্ণকে ভালমত বুঝাইয়া দিল,

মোরা, হারাইয়া এক কৃষ্ণ ব্রজময় দেখি কৃষ্ণ
কৃষ্ণ সবার অন্তরে বাহিরে,
সবে, প্রাণ সঁপে কৃষ্ণপায় ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণ পায়
কৃষ্ণের কি অভাব ব্রজপুরে!

৮ম দৃশ্যে বৃন্দার বিলম্ব দেখিয়া রাধা অধীর হইয়া উঠিয়াছে, সে ললিতাকে তাহাদের সন্ধানে যাইতে বলিতেছে। এই দৃশ্যে বেশ একটু নাটকীয় ভাবের বিকাশ হইয়াছে। রাধা ললিতাকে পাঠাইবার সময় তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছে, শ্যামকে কিছু ভৎর্সনা করিও না ;—

শোন গো ললিতা, তুমি স্বভাবে প্রখরা
সব সখিগণ হতে চতুরা মুখরা
বহুদিনে বঁধু যদি এল বৃন্দাবনে,
বলো না বলো না কিছু আদরের ধনে।
যখন, বলবে তাকে মনোদুঃখে
তখন, শুনবে বঁধু অধোমুখে
সে মুখ মনে করে ও মা! আমার যেন বাজে বুকে।

কৃষ্ণকে ক্ষুদ্রতম দুঃখের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য রাধার এই আগ্রহ আমরা পূর্ব্বের এক দৃশ্যেও দেখিয়াছি। প্রিয়তমের মঙ্গলের জন্য এই যে আত্ম-বিস্মৃতি ও সদা জাগরূক চিন্তা, ইহা অতি মধুর, অতি রমণীয়। ইহা ভারত-রমণীতেই সম্ভবে! ঐ রকম দুই একটি ছত্রে রাধার যে মূর্ত্তি ফুটিয়াছে, তাহার তুলনা নাই, কিন্তু রাধা কি অভিমান একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছে? তাহা মোটেই নয়! রাধার কথা শুনিয়া ললিতা জিজ্ঞাসা করিল যে, তবে কি কৃষ্ণকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়া আনিতে হইবে? না, না, তাও না। রাধা বলিলেন, ছি ছি, তা কখনও হইবে না, সাধিয়া আনা হইবে না, এ দিকে কড়া কথাও বলা যাইবে না! নারীর ভালবাসা ও অভিমান এইরূপই বটে!

৯ম দৃশ্যে বৃন্দা কৃষ্ণকে ব্রজের পথদিয়া রাধার নিকট লইয়া আসিতেছে। দুজনে নানা সুখদুঃখের কথা হইতেছে। ১০ম দৃশ্যের প্রথম লাইনটি পড়িয়াই ভারী একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দ লাভ হয়। নেপথ্যে সহসা কৃষ্ণের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে রাধার দেহমনপ্রাণের উপর দিয়া যেন একটা তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল। চমকিয়া সে বলিল—

> বাঁশী বাজে গো অনেক দিনে,
> নাম ধরে মনচোরের বাঁশী ঐ বাজে বিপিনে।

এই মধুর বংশীধ্বনি বৃন্দাবনের প্রাণ ছিল। বাঁশী কখনো কুঞ্জবনে, কখনো বিস্তীর্ণ ধেনুচরা মাঠে, কখনো কালিন্দীকূলে থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিত আর বৃন্দাবনের তন্ত্রেতন্ত্রে আনন্দ-শিহরণ জাগিত। সহসা একদিন যখন বাঁশী থামিয়া গেল, তখন গভীর হাহাকারে অবসন্ন বৃন্দাবন ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, আনন্দময় বৃন্দাবনে সহসা যেন শ্মশান-ভীতির আবির্ভাব হইয়াছিল। সে যে কি হৃদয়-বিদারী অসীম পরিবর্ত্তন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জীবনের উত্তেজনা সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন কেবল অতীতের স্মৃতির চর্চ্চা আর অবিরল ধারে আঁখিজল, এমনি সময়ে আবার বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বের মত আনন্দ হইল কি না বলা শক্ত, কারণ এই গমনশীল জগতে যেটি যায় সেটি আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের জীবনের প্রত্যেক আনন্দানুভূতির চারিদিকে ঘটনা, লোক-সমবায়, বয়স, মনের অবস্থা ইত্যাদির বেষ্টনী থাকে, যাহা কেন্দ্রস্থ আনন্দ সঙ্গীতটির সঙ্গে একতালে বাজিয়া আনন্দকে একটি বিশেষত্ব প্রদান করিয়া পূর্ণানন্দে পরিণত করে। যখন তাহা শেষ হইয়া যায়, তখন তাহার অভাব বোধে, তাহার স্মৃতিতে যে একরকম মধুর দুঃখ লাভ হয়, তাহাই পূর্ব্বতন আনন্দের স্থান অধিকার করিয়া হৃদয়কে নূতন উপায়ে এক বিশেষ তৃপ্তি প্রদান করে। ইহারই নাম বিরহ! মিলনানন্দের পরেই বিরহানন্দের আগমন ইহাই স্বাভাবিক। বিরহের আনন্দ মিলনের আনন্দের চেয়ে অনেক গভীর ও পবিত্র; কারণ মিলনের আনন্দে দৈহিক ও মানসিক অনুভূতি সমভাবে মিশিয়া যায়, কিন্তু বিরহে দেহ অনুপস্থিত। বিরহে শুধু মানসানুভূতি ও ধ্যানযোগে মিলনের পূর্ব্বানুভূত আনন্দগুলির পুনরানুভূতি। মিলনে আনন্দের আত্মা ওদেহ দুইই থাকে, বিরহ কেবল আত্মাসার। মিলন যেন খাদযুক্ত সোনা, বিরহ তপ্ত কাঞ্চন। চিনির পরে মধু আনন্দদায়ক, কিন্তু মধুর পরে চিনি পীড়া-জনক।

কৃষ্ণকমলের গ্রন্থে তাই দীর্ঘ বিরহের পরে বৃন্দাবনে, বাঁশী আবার বাজিয়া উঠিয়াছে সত্য, শুনিয়া রাধাও শিহরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বৃন্দাবনের অতীত আনন্দময়তা আর ফিরিয়া আসে নাই, গ্রন্থও এর পরে আর জমে নাই। একটা দীর্ঘ প্রবল বিরহের পরে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটাইয়া দিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এমন কি কবি কালিদাসও এই দুর্ব্বলতার হাত এড়াইতে পারেন নাই, তিনিও দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে আবার মিলাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু—"সখি আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব,"—"পৌরব, দুঃশীলতাচরণ করিও না" যে রাগিণীতে বাজিয়াছিল তাহার নিকট শেষ কথা "বৎস আপনার ভাগ্যকে

জিজ্ঞাসা কর” নেহাৎই ছিন্নতার বীণার আওয়াজের মত ভগ্নকণ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। কালিদাস তবু মিলনটাকে যথাসম্ভব চুপেচাপে সারিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণকমল বিরহে যে আসর জমাইয়া বসিয়াছিলেন, তাহাদেরই সম্মুখে মিলন গাহিয়া এক স্বপ্ন-স্বর্গ হইতে ধাক্কা দিয়া তাহাদিগকে মর্ত্তে পাতিত করিয়াছেন। এই জন্য কৃষ্ণকমলকে শাস্ত্র ভাগবতের নজির পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছে। মথুরা হইতে কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন সম্পূর্ণ কৃষ্ণকমলের কল্পনা, ইহা কোন প্রাচীন গ্রন্থে আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। কিন্তু বিরহের দেবী রাধিকা মিলনে পুতুল হইয়া পড়িয়াছেন।

১১শ দৃশ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলনে গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। কৃষ্ণরাধাকে বলিতেছেন যে রাধার প্রেমের ঋণ কলিতে গৌররূপ ধারণ করিয়া তিনি শোধ দিবেন। রাধা সেইরূপ দেখিতে চাহিলে বক্ষবিলম্বী কৌস্তুভে প্রতিবিম্বিত সেইরূপ কৃষ্ণ রাধাকে দেখাইলেন। গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। এই দৃশ্যে রাধার অভিমান বর্ণনাত্মক গানটি বড়ই সুন্দর,—

তোরা বলিস গো আমায় যেতে শঠের নিকটে।
মন যে আমার পড়েছে সই উভয় সঙ্কটে॥
এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণনাম শুনিব।
আর কর্ণ বলে আমি বধির হয়ে রব॥
(ও নাম শুনব না শুনব না—নিলাজ বঁধুর নাম)
এক নয়ন বলে আমি কৃষ্ণরূপ দেখিব।
আর এক নয়ন বলে আমি মুদিত হয়ে রব॥
(ও রূপ দেখব না দেখব না,—কালীয় কুটীলের রূপ)
এক করে সাধ করে ধরি কৃষ্ণকরে।
আর এক করে, করে করে নিষেধ করে তারে॥
(ও কর ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, কালীয় কুটিলের অঙ্গ)
এক পদে কৃষ্ণপদে যাইবারে চায়।
আর এক পদে পদে পদে বারণ করে তায়॥
(ও পদে যেও না যেও না, নিঠুর বঁধুর কাছে)

স্বপ্ন-বিলাসের পূর্ব্বে রচিত কৃষ্ণকমলের কোন গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য নহে; প্রথম রচনা না হইলেও তাহার প্রকৃত কবি-জীবনের আরম্ভ স্বপ্ন-বিলাস হইতেই, এবং স্বপ্নবিলাসেই তিনি যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহা অসাধারণ।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

ক্ষেত্রপালের ব্রত

পৃথ্বী দেবতাই ক্ষেত্রপাল রূপে আজিও বঙ্গের কৃষি-সম্বল প্রজাবর্গের গৃহে দীনভাবে পূজিত হইয়া থাকে।

বঙ্গে অগ্রহায়ণ মাসেই শস্য-সংগ্রহের প্রধান ঋতু আরব্ধ হয়। এই অগ্রহায়ণই ক্ষেত্রপালের ব্রতের নির্দ্দিষ্ট কাল। অথবা কৃষিদেবতার পূজা করিয়া কৃষকগণ বর্ষ আরম্ভ করিয়া থাকে, এইরূপ বিবেচনা করিলেও অগ্রহায়ণ (বর্ষের প্রথম মাস) মাস এবং ব্রতের বিশিষ্ট কাল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

অগ্রহায়ণ মাসে যে কোন মঙ্গলবারে ক্ষেত্রপালের পূজা হয়। ক্ষেত্রপালের প্রসাদে ক্ষেতে ক্ষেতে প্রচুর ধান হইবে, এই বিশ্বাসেই ব্রতিনীগণ এই ব্রত করে।

ভাজা চাউলের শাতু, খৈ, চিড়া, পূজার উপকরণ। এই সকল উপকরণ দিয়া কলার “ডিগে” ব্রতিনীগণ একটি মাত্র নৈবেদ্য করে, এবং অন্য পাত্রে চাউল কলার একটি সাধারণ নৈবেদ্য দেয়।

আঙ্গিনায় গোময়লিপ্ত একটি স্থানে তুষের ছাই দিয়া একটি চতুর্ভুজ অঙ্কিত হয়,এবং ইহার মধ্যস্থলে দুইটি মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তি দুটির মধ্যে একটি পুরুষ ও অপরটি স্ত্রী। অঙ্কিত চতুর্ভুজটির নাম “খাট”। পুরোহিত এই মূর্ত্তির সম্মুখে বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকে। ব্রতের দিন ব্রতিনী ক্ষেত্রপালের উদ্দেশে নিবেদিত উপকরণ ব্যতীত আর কিছুই খাইতে পায় না।

ব্রতের কথা

এক গ্রামে ছিল এক "রাড়ীর পুত দুইখ্যা" * তার ক্ষেত পাতর † নাই। অগ্রহায়ণ মাস, সকলেই ক্ষেতে যায়, ধান কাটে, বাড়ী আনে, মারা মারে (১) গোলায় তুলে। দুইখ্যা দেখে, মনে বড় কষ্ট পায়।

বড় মর্ম্মাহত হইয়া একদিন দুইখ্যা তার মাকে বলিল, "মা, আমার ক্ষেত কর্ত্তে ইচ্ছা অয় (হয়)।"

"আবাগ্যা,(২) তর এক বেলা খাইলে আর একবেলার উপায় নাই, তুই ক্ষেত পাইবি কৈ!"

যাহা হউক দুইখ্যা গ্রামের জমিদারের নিকট গিয়া তাহার ক্ষেতের আইলটি (আলি) ভিক্ষা চাহিল, এই আইলটিতে সে ধান বাইন (৪) করিবে। জমিদার দয়া করিয়া দুইখ্যার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

সময়ে দুইখ্যার আইলে প্রচুর ধান হইল। অন্যের ক্ষেতের আটটি ছড়ার মত তাহার এক একটি ধানের ছড়া হইল।

দুইখ্যায় কাচি (৫) নাই, ধান দাইবে (৬) কি করিয়া! দুইখ্যা অনেক ভাবিয়া একটা উপায় ঠাওরাইল। যখন অন্যের ক্ষেতের মুনিরা (৭) ধান কাটিতে কাটিতে শ্রান্ত হইয়া তামাক খায় তখন দুইখ্যা তাহাদের কাস্তে চাহিয়া লইয়া ধান কাটে। এইরূপে ধান কাটিয়া দুইখ্যা এই বছরের সমস্ত ধান গোলায় তুলিয়া রাখিল।

বছর ফিরিয়া আসিল। ধান বাইনের সময় হইল। দুইখ্যা জমিদারের নিকট এইবার তিনটি আইল ভিক্ষা করিয়া ধান বুনিল। এবারও তাহার আইলে প্রচুর ধান হইল। প্রকাণ্ড ছড়া! এমন ছড়া আর কেহ কখনও দেখে নাই! এবারও কাস্তে চাহিয়া লইয়া দুইখ্যা ধান কাটিল।

গৃহস্থেরা ভারে ভারে ধান লইয়া যায়। দুইখ্যার অল্প ধান, তার এত ভার হয় না। দেখিয়া দুইখ্যার বড় কষ্ট হইল। দুইখ্যা মনের কষ্টে গামোছা বিছাইয়া আইলে সমস্ত দিন শুইয়া রহিল। শীতের মিষ্ট রৌদ্র ক্রমে তীক্ষ হইয়া আবার মিষ্ট হইল, শেষে একেবারে পৃথিবী হইতে সরিয়া পাড়ল, দুইখ্যা উঠিল না। ক্ষেত্রপালের মনে দয়া হইল; তিনি ব্রাহ্মণের বেশে দুইখ্যার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন,

"আরে দুইখ্যা তুই কা এম্‌নে পইড়া রইছত্?" (৮)

দুইখ্যা তার দুঃখ-কাহিনী সরল ভাবে বলিয়া শেষ করিল। দুইখ্যার চোখে জল আসিল।

ঠাকুর বলিলেন, "ওঠ্! বাড়ী যা; রোজ সকালে আইয়া দেখ্‌বি তোর নারা (৯) ক্ষেতে ছড়া অইয়া রইছে। যত দিন ইচ্ছা তুই তোর ক্ষেত দাইতে পারবি। কিন্তু দেখিছ্, তোর মা যেন কোন দিন ক্ষেত না দেখে। দেখলে কিন্তু নারা ক্ষেতে আর ছড়া মেলবে না।"

দুইখ্যার মা দেখিল দুইখ্যা ধানের পাড়া (স্তূপ) দিয়া বাড়ী ভরিয়া ফেলিল। বুড়ীর মনে ঘোর সন্দেহ হইল। দুইখ্যা এত ধান আনে কোথা হইতে! বুড়ীর সন্দেহ হইল, বুঝি দুইখ্যা অন্যের ক্ষেতের ধান চুরি করিয়া আনে।

বুড়ী দুইখ্যাকে অনেক প্রশ্ন করিল দুইখ্যা কিন্তু কিছুই বলিল না। পরে একদিন বুড়ী খুব সকালে 'নারা' ক্ষেতে গিয়া দেখিল নারার মাথায় ধানের ছড়া বাহির হইয়া রহিয়াছে! বুড়ী সন্তুষ্ট চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

দুইখ্যা ধান কাটিতে আসিল, দেখিল শুধু নারা শুকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আজ আর ছড়া নাই! দুইখ্যা কাঁদিয়া ফেলিল। ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া বুড়ীকে অনেক গালাগালি দিল।

সন্ধ্যাকালে দুইখ্যা আবার ক্ষেতের আইলে পড়িয়া হত্যা (ধন্না) দিল। ক্ষেত্রপাল ঠাকুর আসিয়া দুইখ্যার মনের দুঃখ আবার শুনিল। শুনিয়া বলিল, "তোর নারা ক্ষেতে আর ছড়া মেলবে না; তবে তোর মাকে বল গিয়া সে যেন বছর বছর অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেত্রপালের ব্রত করে। তাহা হইলে তোর আইলে এত ধান হইবে যে, এক বছরে তোর সমস্ত ধান লাগিবে না।"

ক্ষেত্র-পালের আদেশ মত বুড়া তুষের চূর্ণে ক্ষেত্রপাল আঁকিয়া পর বৎসর ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের পূজা করিল। এবার দুইখ্যার আইলের ধান দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল। জমিদার দুইখ্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দুইখ্যা, তোর আইলে এত ধান কি করিয়া?"

"ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের বরে।"

ইহা শুনিয়া সকলেই ক্ষেত্রপালের ব্রত করিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষেত্রপালের ব্রত প্রচারিত হইল। *

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

* বিধবার দুঃখী পুত্র † শস্যক্ষেত্র ১ ধান মারাইয়া লয়। ২ অভাগা।

(৪) বপন; (৫) পূর্ব্ববঙ্গে কাস্তেতে 'কাচি' বলে, (৬) কাটিবে; (৭) মুজুর, 'ম' অক্ষরটির উপর জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

৮। ওরে তুই কেন এরূপ ভাবে পড়িয়া আছিস?

৯। ধান কাটিয়া নিলে ধান গাছের যে অংশ দাঁড়াইয়া থাকে।

* বঙ্গদেশে কৃষক পত্নীগণ শস্য ক্ষেত্রে যাইয়া কৃষিকার্য্যের সাহায্য করে না। আসামে কিন্তু করিয়া থাকে। এই ব্রত কথায় "দুইখ্যার মা'র" শস্যক্ষেত্রে গমনের নিষেধ আজ্ঞা হইতেই ইহার আভাস পাওয়া যায়।—লেখক।

প্রতিভা

৩য় বর্ষ আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২০ ৫ম ও ষষ্ঠ সংখ্যা।

নাটকীয় সাহিত্য—ও বাঙ্গালার নাটক।*

অদ্য সাহিত্য জগতের যে প্রদেশে বিচরণ করিতে আমরা প্রস্তাব করিতেছি তাহা অতি বিপুল। স্বল্প সময়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নহে; ভূতত্ত্ববিদের ন্যায় আমরা ইহার অস্থি-কঙ্কাল বিচার করিতে পারিব না, ভৌগোলিকের মত আমরা ইহার অবস্থান ও স্থানতত্ত্ব বিশদ আলোচনা করিবার অবসর পাইব না এবং ইহার বিস্তৃত জরিপ পূর্ব্বক পরিমাপ করিয়া সদয় শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইব না। কোনও স্বল্পপ্রাণ স্বল্পাবসর পর্য্যটক যেমন কোন প্রদেশের দুটী একটী উন্নত গিরি-সানু, দুই চারিটী স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী, এক আধটী অরণ্যানীর শ্যাম শোভা, ভ্রমর-চুম্বিত দুটী একটী তড়াগের কমল-সম্পদ্, কিম্বা নির্ঝরিণী মুখরিত নিভৃত কুঞ্জ-কাননের অর্দ্ধস্ফুট বিহঙ্গ-কাকলির আভাসমাত্র দিয়া পথিকের চিত্তে ভূয়োদর্শনের কৌতূহল মাত্র জাগরিত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, তেমনই এ ক্ষেত্রে আমরাও যথাসাধ্য একটী সামান্য চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াসী হইব, এবং নাটকীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও বিপুলতার আভাসমাত্র প্রদান করিব।

কল্পনার রথে সৌন্দর্য্য রাজ্যে বিচরণ করাই কবিত্বের কার্য্য। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি কবিতার প্রাণ। মধুকর যেমন স্নিগ্ধ-পরিমল কমল হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য বন-কুসুমের মধু আহরণ পূর্ব্বক তাহার মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, কবি সেইরূপ সংসারের পাপতাপ ও ধূলি-জালের মধ্যে সৌন্দর্য্যকণা বাছিয়া লইয়া জন-সমূহের চক্ষু অথবা কর্ণের সমক্ষে উপস্থিত করেন। তাহাই কাব্য; তাহাই "রসাত্মক বাক্য"। সৌন্দর্য্য-লিপ্সা মানুষের স্বাভাবিক, তাই প্রকৃত কবির নিকট মানুষ ক্রীতদাস। কর্ণাট বর্ণনায় একটী কিম্বদন্তী শ্লোক-নিবদ্ধ হইয়া আছে। কথিত আছে। কালিদাস ছদ্মবেশে কর্ণাট রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কবিত্বের চমৎকারিতায় মহারাজকে মুগ্ধ

* ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ কোনও রাজকীয় খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কালিদাসের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া কবি কহিলেন ঃ—

"পুরো বা পশ্চাদ্ বা কচিদপি বসামঃ ক্ষিতিপতে!
তদা কা নো হানির্ব্বচন-রচনৈঃ ক্রীতজগতাং।" (১)

আবার বলিলেন ঃ—

"মাগাঃ প্রত্যুপকারতয়া বৈকর্ণ্য মাকর্ণয়—
হে কর্ণাট বসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে।
বর্ণ্যন্তে কতিভূধরাম্বুদনদী ভূগোল বৃন্দাটবী—
ঝঞ্ঝা-মারূত চন্দ্রচন্দনগণা স্তেভ্য কিমাপ্তং ময়া॥" (২)

কালিদাস এই কবিতার রচয়িতা কি না জানি না; কিন্তু এটী কবির উচ্চ স্থান প্রচার করিতেছে। বস্তুতঃ কবিদের দিব্য দৃষ্টি in fine frenzy rolling দ্যুলোকে ভূলোকের অপার মহিমাময় সৌন্দর্য্যরাজি লোকচক্ষুর সমক্ষে আনয়ন করে। স্থূল দৃষ্টিতে যাহা ধরা পড়ে না কবিগণ তাহা দেখাইয়া দেন। টেইন্ (Taine) বলিয়াছেন পৃথিবীর সৌন্দর্য্য-রাজির উপর একটী আবরণ পড়িয়া আছে, সেই আবরণ উন্মোচন করিতে কেবল কবিগণই সমর্থ। রবীন্দ্রনাথ সেই জন্যই

"কত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর মধুর মাধবীকাণে
বড় বড় সব পণ্ডিতজনা বুঝিল না তার মানে" ইত্যাদি
কবিতায় পরিস্ফুট করিয়াছেন।

কেনই বা কমল স্মিতমুখে সূর্য্যপানে চাহিয়া চাহিয়া মুদিয়া যায় আর কেনই বা চন্দ্রকে দেখিয়া "পাণ্ডু-কপোলা কুমুদীর চোখে সারারাত নিদ নহি"; ইহা কেহই বুঝিল না; কতযুগ—কতযুগ চলিয়া গেল এ ভালবাসার লুকোচুরি জগতের কপিল, শঙ্কর, নিউটন, ডারুইন, লাপ্লাস্ বুঝিলেন না। একদিন কবি সব ধরিয়া ফেলিল—সে বীণার ঝঙ্কারে 'মধুর প্রেমের মত মধুর গাথার' ভালবাসার লুকোচুরি কহিয়া দিল; আর অমনি—

"শুনিয়া তপন অস্তে নামিল
সরমে গগন ভরি—
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল
বনের আড়াল ধরি।"

পণ্ডিতগণ কবিতাকে বা কাব্যকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন ঃ—মহাকাব্য, গীতিকাব্য, আর দৃশ্যকাব্য। মহাকাব্যের কবি ধীর, স্থির ভাবে তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ের সৃষ্টি করেন। বিশাল-সলিলা ভাগীরথীর মত সুখদুঃখ লইয়া মহাকাব্য ধীর গম্ভীর প্রবাহে গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়। ইলিয়াদ, রামায়ণ, মহাভারতের সঙ্গীত উদাত্ত স্বরে গীত হইয়া গগণ স্পর্শ করে। গীতিকাব্য মনের একটী আবেগের বাহিক অভিব্যক্তিমাত্র। গীতি কবিতা বসন্তবাতান্দোলিতা যুথিকার মত মৃদু-

(১) হে মহীপতে! আপনার সম্মুখেই বসি আর পশ্চাতেই থাকি তাহাতে আমাদের কোন হানি নাই। আমরা কাব্য রচনা দ্বারা জগৎকে ক্রয় করিয়াছি।

(২) হে কর্ণাট-ভূপাল! আমার প্রত্যুপকার করিবার ভয়ে পরাঙ্মুখ হইবেন না। আপনি আমার অমৃতোপম কবিতাগুলি শ্রবণ করুন্। আমি আপনার নিকট কত কত শৈলমালা, মেঘ, নদী, ভূগোল, প্রমোদ-কানন, ঝঞ্ঝাবাতের, চন্দ্র-চন্দনের বর্ণনা করিতেছি এবং ইহাদের নিকট আমি কি লাভ করিয়াছি তাহাই শুনাইতেছি।

স্নিগ্ধ সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া আপনাকে লইয়া আপনি মত্ত। একটীমাত্র ভাবই তাহার সমস্ত জগৎ। মহাকাব্য বাহ্যজগতের বিরাট ঘটনাবলীর বিশাল চিত্র আর গীতিকাব্য অন্তঃকরণের একটী ভাবের আবেগময়ী অভিব্যক্তি। মহাকাব্য মহাসমুদ্র; গীতিকাব্য বনযূথীসমাচ্ছন্ন নগ-নদী। মহাকাব্য নানাফলপ্রসূ উর্ব্বরভূমি; গীতিকাব্য ফলপাকান্তা ওষধি।

মেঘদূত বিরহ-সঙ্গীত; ইন মেমোরিয়াম্ (In Memoriam) শোকগাথা; গীত-গোবিন্দ প্রেমগীতি; ব্রজাঙ্গনা কাব্য মিলনের আবেগময়ী আকুলতা; ল্যা'লেগ্রো (L'Allegro) দেহবদ্ধ প্রফুল্লতা; স্কাই লার্ক (Sky lark) অশরীরী সঙ্গীত-ঝঙ্কার।

দৃশ্যকাব্য কি? দৃশ্যকাব্যও মহাকাব্যের ন্যায় বাহ্য জগতের চিত্র। তবে কবি তাহা স্বয়ং না বলিয়া বর্ত্তমান এবং বাস্তব রূপে চক্ষুর নিকট উপস্থিত করেন। সেই জন্যই তাহার সংস্কৃত নাম "রূপক"। সাহিত্য দর্পণকার বলিয়াছেন—

"দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতম্
দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং তৎরূপারোপাত্তু রূপকম্।"

কাব্য দুইপ্রকার দৃশ্য ও শ্রব্য। যাহা অভিনীত হয় তাহাই দৃশ্য এবং তাহাতে কোনও চরিত্রের স্বরূপ আরোপিত হয় বলিয়া "রূপক" তাহার নামান্তর।

গীতিকাব্যের ন্যায় দৃশ্যকাব্য অথবা তাহার সাধারণ পরিচিত নাম নাটকও আমাদের মনোবৃত্তিগুলি উত্তেজিত করিয়া থাকে। কিন্তু দৃশ্যকাব্যে মনোবৃত্তির আবেগ একটু তীব্র। কারণ চক্ষুর সম্মুখে অত্যাচার সংঘটিত হইতেছে, চক্ষুর সমক্ষে পাপের শাস্তি-বিধান হইতেছে, বাস্তব জীবন্ত ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, এরূপ অবস্থায় মানসিক আবেগ যে অধিকতর উত্তেজিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা মহাকাব্য কিম্বা গীতিকাব্য অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবে পাঠ করিতে পারি, কিন্তু শক্তিশালী নাটক অবিক্ষুব্ধ চিত্তে দর্শন করিতে পারি না। কারণ কল্পনার বলে অতীত যে বর্ত্তমান হইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ আধুনিক রঙ্গমঞ্চে নীলদর্পণ অভিনয়ে সাহেবের আচরণে, কিম্বা "সিরাজদ্দৌলা" নাটকে হোসেনকুলী খাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণা পত্নীর আচরণে, দর্শকবৃন্দের আত্মহারা হওয়ার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নাটকের শ্রেণীবিভাগ করিবার পূর্ব্বে আমরা সভ্যজগতে নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। নাটকের উৎপত্তি কোথা হইতে এবং নাটকের উদ্দেশ্য কি?

একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত বলিয়াছেন:—

"Action is the true enjoyment of life, nay, life itself".—কর্ম্মই জীবনের প্রকৃত সুখাস্বাদ; কর্ম্মই মনুষ্যের জীবন। নাটকাভিনয়ে আমরা এইরূপ কর্ম্ম যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবন সাদামাঠা ভাবে অতিবাহিত হয়। অকিঞ্চিৎকর চিরাভ্যস্ত কার্য্যগণ্ডীর মধ্যে আমরা জীবন যাপন করি। তাই কোনও অদ্ভুত বিস্ময়কর ঘটনা নিজের জীবনে সংঘটিত হইলে আমরা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কবির সহিত চলিতে চাই:—

"One crowded hour of glorious life
Is worth an age without renown".

—অনন্ত মহিমাময়, জীবনের একদিন যশোহীন শতযুগ

...য়। কিন্তু সেরূপ অদ্ভুত বিস্ময়কর ঘটনা লক্ষ জনের মধ্যে ...কজনেরও জীবনে ঘটে কিনা সন্দেহ, বিশেষতঃ আজ-...লকার সভ্য সমাজে। সুতরাং বিরক্তিকরবৈচিত্র্যহীন নিয়মের গণ্ডীবদ্ধ দৈনন্দিন জীবনে মানুষ স্বভাবতঃই নানা-প্রকার আমোদ উপভোগ করিতে প্রয়াসী হয়। তন্মধ্যে কল্পনার রথে চড়িয়া স্বীয় জগৎ হইতে পৃথক অথচ সেইরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট সুন্দরতর, উজ্জ্বলতর জগতে বিচরণ করিতে মানুষ সমধিক ভালবাসে। এই জন্যই নাটক সর্ব্বাপেক্ষা আমোদ-প্রদ জিনিষ। নাটকে আমরা অন্য ব্যক্তির অদ্ভুত বীরত্বপূর্ণ, উদার বা মহৎ কার্য্যাবলি দর্শন করিয়া চিত্তকে উন্নত করি; পাপের বীভৎস চিত্র দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠি, পুণ্যের সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে আত্মাকে পুলকিত করি, প্রেমের জয়ে পুলকিত হই এবং ঐতিহাসিক নাটকে অতীত যুগের কাহিনী লোচন-সমক্ষে অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া আত্মবিস্মৃতির মধ্যে মুগ্ধ হইয়া যাই।

অনুকরণ মনুষ্যমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যাহা হৃদয়ের অভীষ্ট তাহার অনুকরণ করাই আমাদের প্রকৃতি। যখন আমরা অন্যের অবস্থা, মনোভাব, সুখদুঃখ বিরোধ অনুভব করি, তখনই তাহার অনুকরণের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তখনই আত্মবিস্মৃত হইয়া আমরা সেই চরিত্রের অনুকরণ করিয়া আমোদ লাভ করি। শিশুগণ নিরন্তর পিতা, মাতা, শিক্ষক, রাজা, রাখাল সাজিতেছে। ...স্ফুর্ত্তিমান্, প্রফুল্ল হিন্দুস্থানী তাহার কথা বলিবার সময় অঙ্গভঙ্গী করিয়া প্রতিনিয়ত তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছে। আত্ম-সংযত শিক্ষিত ইংরেজ কোন ঘটনা বিবৃত করিবার সময় তাহার মুখের একটী স্নায়ুও বিকৃত হইবে না, কিন্তু ফরাসী কিম্বা ইতালিবাসী সেই কথাগুলিই উচ্চারণ করিতে, সেই মনোভাবই প্রকাশ করিতে অঙ্গ-তঙ্গীর সহায়তায় তাহা কার্য্যতঃ অর্দ্ধেক ব্যক্ত করিবে। একে কল্পনার অভাব;—অপরে তাহার সদ্ভাব। ইহাই কি নাটকের প্রথম সোপান নহে? অনুকরণ প্রবৃত্তি নাটকের জননী। এইজন্য সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন

"ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকারঃ স চতুর্ব্বিধঃ
আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব মাহার্য্যঃ সাত্ত্বিক স্তথা॥"

অবস্থার অনুকরণ অভিনয়। তাহা চারি প্রকার, অঙ্গভঙ্গী দ্বারা, বাক্য দ্বারা, বেশরচনাদি দ্বারা এবং শরীরস্তম্ভ, স্বেদোদ্গম প্রভৃতি দ্বারা। শেষোক্তটীর উদাহরণস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্তে" ছায়ার নৈরাশ্যে তাহার স্থির দৃষ্টি ও নিশ্চল ভাবের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বাভাবিক অনুকরণ প্রবৃত্তি কল্পনার সহায়তা লইয়া মানুষকে নাটক সৃষ্টি করিতে প্রণোদিত করে। সাধারণতঃ যে জাতিতে যত অধিক কল্পনাশক্তি বিদ্যমান, আমাদের বিবেচনায় সেই জাতি নাটকীয় সাহিত্য রচনায় তত অধিক নিপুণ।

গ্রীক ও হিন্দু নাটক

প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দু নাটক ইহার উদাহরণ। এই উভয় জাতির কল্পনার সম্পদ্ পুরাণ-সমূহ জগতে অদ্বিতীয়। উভয় জাতির বুদ্ধি যেমন পরিমার্জ্জিত তেমনই সুরুচিসম্পন্ন। যাহা অসুন্দর, যাহা অশ্লীল তাহা কবিতায় স্থান পায় না। সাহিত্যদর্পণে উত্তম নাটকের যে সকল লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাচীন গ্রীক নাটকে পরিদৃষ্ট হইবে।

ইস্কাইলাসের (Aeschylus) অ্যাগামেম্‌নন্‌ (Agamemnon), ইলেক্‌ট্রা (Electra), ও ইউমেনাইডিস্‌ (Eumenides) নাটকত্রয়ে ভবভূতিরচিত উত্তরচরিত ও মহাবীর চরিতের সহিত অনেক স্থলে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সেই বিরাট গম্ভীর চরিত্র, সেই অপরিসীম শোক-কাহিনী। কিন্তু গ্রীস নাটককার অপেক্ষা হিন্দু ভবভূতি বহুল পরিমাণে স্নিগ্ধ। একে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখরতা, অপরে শরচ্চন্দ্রের শান্তোজ্জ্বল মাধুর্য্য।

কবিত্ব ও নাটকীয় কবিত্ব।

আবার, শুদ্ধ কবিত্ব শক্তি ও নাটকীয় প্রতিভা এক জিনিষ নহে; কোনও জাতিতে সাধারণ কবিত্ব দিব্য পরিস্ফুরিত হইয়াছিল কিন্তু নাটকীয় প্রতিভা নাই। পারস্য ভাষার গীতি কবিতা কাব্যজগতে উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত, কিন্তু আরব্য পারস্যে নাটক নাই। স্পেইন ও পর্তুগাল পরস্পর প্রতিবেশী —সমভাবাপন্ন জাতিত্ব-সম্পর্কিত জাতি, কিন্তু এই উভয় জাতিতে নাটকীয় সাহিত্য বিষয়ে কি পার্থক্য! স্পেনের লোপ ডি ভেগা (Lope de Vega), সারভ্যান্টেস (Cervantes) বা ক্যালডেরণ (Calderon) এর মত নাটককার পর্তুগালে জন্মগ্রহণ করে নাই। স্পেনের উদ্ভাবনী শক্তি অতুল, অভাবনীয় ও বিস্ময়কর। কথিত আছে, একা লোপ ডি ভেগা ১৫০০, শত নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পর্তুগাল অন্যবিধ কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে গৌরবান্বিত, কিন্তু নাটকীয় সাহিত্যে স্পেনের সহিত কিছুতেই তুলনায় হইতে পারে না।

ভারতীয় জাতি-সমূহের মধ্যে আমরা যতদূর জানি নাটকীয় প্রতিভায় বাঙ্গালীই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। সংসারের ঘটনাবলি তীব্রভাবে অনুভব করা এবং তাহা হইতে উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়া একখানি পূর্ণাঙ্গ চিত্র কবিত্বের আবরণে লোকচক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করা, যে শক্তিবলে, যে কল্পনার সাহায্যে সম্পন্ন হইতে পারে, বাঙ্গালীর তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে বলিয়া বাঙ্গালী নাটক-রচনায় এত নিপুণতা লাভ করিয়াছে।

নাটকের উৎপত্তির বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিয়া 'শ্রেষ্ঠ নাটকের উদ্দেশ্য কি ?' আমরা তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি ঃ—

হিন্দু সাহিত্যে নাটকের স্থান অতি উচ্চে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। নাই বা হইবে কেন ? গীতি-কবি যেমন ভাবের বন্যায় ভাসিয়া যাইয়া কেবলই স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেন, মহাকাব্যকার যেমন লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনার একত্র সমাবেশ করিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করেন, নাটককার তাহা করিতে পারেন না। পদে পদে তাঁহার আত্মসংযম চাই। লোকচরিত্রই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। তাহাও আবার আখ্যায়িকা আকারে কথিত হইবে না। চরিত্র-গুলি জীবন্ত আকারে প্রত্যক্ষ প্রদর্শিত হইবে। কেবল তাহাও নহে, মাত্র কথা দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া তাহাদের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। সেইজন্যই নাট্য-কবির কার্য্য সুখসাধ্য নহে। সমবেত জনতার হৃদয়ে একটী পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, এ স্থলে নাট্য-কবিকে বক্তার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ, তাহাদিগের কৌতূহল উদ্দীপন ও সহানুভূতি লাভ

করিতে হইলে বক্তা কি করেন; আবেগময়ী প্রাঞ্জল ভাষায় ক্ষিপ্রগতিতে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করেন। নাট্য-কবিকেও সংক্ষেপে সহজবোধ্য ভাষায় প্রথম হইতেই জনমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে হয়। ঋগ্বেদের পর্জ্জন্যসূক্ত, বা অরণ্যানীসূক্ত পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য অথবা মাধুর্য্যের উদয় হইতে পারে, পরন্তু তাহা মন্দ মলয়-হিল্লোলের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। পক্ষান্তরে লীয়র বা ম্যাক্ বেথ বা জুলিয়স্ সীজার প্রথম হইতেই চিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে। তাই নাট্যকারের কত দুর-দৃষ্টি, কত আত্মসংযম, কত সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। মহাকাব্য সাহিত্যের কাণ্ড হইলে, গীতিকাব্য তাহার সুরভি কুসুম আর নাটক তাহার পরিণত অমৃতরস পূর্ণ ফল।

বিষ্ণু পুরাণে কথিত হইয়াছে ঃ—"ত্রিবর্গসাধনং নাট্যম্"। নাটক স্বত্রে সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন ঃ— নাটক "সুখদুঃখসমুদ্ভূতি নানারসসমন্বিতম্" হইবে। মানবজীবনে নানারূপ সুখদুঃখের বর্ণনায় যে বিভিন্ন রস উপজাত হয় নাটকে তাহাই সন্নিবেশিত হইবে। তাহাই নাটকে দর্পণের মত প্রতিবিম্বিত হইয়া লোকশিক্ষার আদর্শ হইবে। নাটকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলিতেছেন ঃ—

"স্থূলতঃ বলিতে গেলে অধিনায়কের (hero) সংসার তাড়নায় বা পরকীয় আবেগ সমষ্টির উত্তেজনায় যে চরিত্রগত পরিবর্ত্তন ও পরিণাম হইয়া থাকে তাহা প্রদর্শন করাই নাটকের মূল উদ্দেশ্য। যিনি শিখিতে জানেন তিনি নাটক হইতে ইহলোকের চরম শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। বিষভক্ষণে মৃত্যু হয়, বঙ্গদেশে বাস করিলে শরীর দুর্ব্বল হয়, কেবলমাত্র অন্নভোজী হইলে মনুষ্য লম্বোদর সুতরাং অলস-প্রকৃতি হয়, বিলাসপ্রিয় জাতি ক্রমে কঠোর-প্রাণ জাতির করকবলিত হয়, ইতিহাস বা বিজ্ঞানের সমীপে যেমন এইরূপ নানা কথা শিক্ষা করিতে পারা যায়, সেই রূপ কাব্য নাটকের স্থানেও আমরা নানা গভীর নীতি শিক্ষা করিয়া থাকি। যদি ঘুণাক্ষরেও সরলা প্রণয়িনীকে অনর্থক অবিশ্বাস কর, তবে তুমি "ওথেলো" বৃথা পাঠ করিয়াছ; আবার যদি প্রণয়িনীর অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করিতে ঘুণাক্ষরেও সম্মত হও, তবে তুমি "ম্যাকবেথ্" বৃথা পড়িয়াছ। সম্মান-লুব্ধ ব্যক্তিরা চাটুবচনপ্রিয়। তুমি লীয়র পড়িয়াছ এখনও কি চাটু-বচনে নৃত্য করিবে? ......।" [বান্ধব, ১২৮৩ সন শ্রাবণ ভাদ্র সংখ্যা ১০৭ পৃঃ]

চিত্তের-উপর নাটকের এত প্রভাব কেন ?—

নাটকের আধিপত্য। এই প্রভাবের প্রধানতম কারণ প্রত্যক্ষ দর্শন। যাহা কেবল মানসিক কল্পনার বিষয়, তাহার ধারণা তেমন দৃঢ়ভাবে চিত্তে অঙ্কিত হয় না; কিন্তু যাহা চক্ষুর নিকট বাস্তব বলিয়া দেখিতেছি, তাহা যে হৃদয়ের উপর অতুল প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রীন (Green) বলিয়াছেন যে টেনিসন (Tennyson) কৃত হ্যারল্‌ড্ (Harold) নাটক হইতে হ্যারল্ডের চরিত্রে তাঁহার এত অন্তর্দৃষ্টি জন্মিয়াছিল যে তেমন আর কিছুতেই হয় হয় নাই। গিরিশ ঘোষের "বুদ্ধদেব" অভিনয় দর্শনে জানিয়াও স্বর্গীয় নন্দলাল বসু বাহাদুর মহাশয়ের জীবহিংসায় এতদূর বিরাগ জন্মিয়াছিল যে সেই বৎসর

হইতে তাহার বাটীতে দুর্গোৎসব বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। "নিমাই সন্ন্যাস" অভিনীত দেখিয়া মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস গিরিশ বাবুকে উন্মত্তভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন "চৈতন্য-লীলার" অভিনয় দর্শনে উন্মত্তের ন্যায় গ্রন্থকারে পদধূলি লইতে পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হইয়াছিলেন। "নীলদর্পণের" অভিনয়ে দেশে তুমুল আন্দোলন-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে ইতিহাসের বিষয় হইয়াছে। সুতরাং বক্তৃতার ন্যায় নাট্যকারের শক্তিও অসীম। সাধারণতঃ মানুষ মানুষের নিকট স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করে না। পরস্পরে কি এক অবিশ্বাস যে মনের ভাব বিনিময় করিতে সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করে। কিন্তু বার্ক যখন পার্লিমেণ্ট মহাসভায় জ্বলন্ত জীবন্ত বাগ্মিতায় ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত করিতেছিলেন তখন সমগ্র জনতার মধ্যে যে কি ভাবের বন্যা বহিয়াছিল তাহা মেকলের পাঠকমাত্রই জানেন। সেইরূপ রঙ্গমঞ্চেও যখন প্রথম জুলিয়াস সীজার অভিনীত হইয়াছিল কিম্বা ডেস্‌ডিমোনার হত্যাকালে শোকের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তখন দর্শকবৃন্দের হৃদয় একই সহানুভূতি-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের "রাণা প্রতাপ" বা "মেবার-পতন" দর্শক মণ্ডলীকে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় বিক্ষুব্ধ করে বলিয়াই সরকার বাহাদুর তাহার অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং যে নাট্য-কাব্যের এরূপ বিপুল প্রভাব তাহা ব্যক্তিবিশেষের হাতে পড়িয়া সমাজের প্রভূত কল্যাণ বা পক্ষান্তরে অকল্যাণ সাধন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তাই আমরা পরবর্ত্তী আলোচনায় বাঙ্গালা নাটকের দোষগুণ বিচার কালে এই বিষয়ের পুনরপি সংক্ষেপে অবতারণা করিব।

এক্ষণে নাটকের নাটকত্ব কিসে? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নাট্যকবি পাত্রগণের কথোপকথনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার বাক্য রচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল কথাবার্ত্তাই নাটকের জীবন নহে। তাহা হইলে বঙ্কিম বাবুর "প্রচারে" গুরুশিষ্য সংবাদে বা প্লেটোর ডায়েলগ (Dialogue) কিম্বা রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ষড়্ দর্শন সংবাদ' উৎকৃষ্ট নাটক! কিন্তু তাহাতে তো Action বা কর্ম্মজীবন নাই। তাহাতে সংসারের চিত্র নাই। সংসারের তাড়না নাই এবং সেই তাড়নাসম্ভূত আবেগ নাই। কেবল রসপূর্ণ কথোপকথন থাকিলেই নাটক হয় না। মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ, মানবের বৈচিত্র্যময় কর্ম্মজীবনের প্রতিবিম্ব এবং সমুচিত অঙ্গভঙ্গীসহ অভিনয় না থাকিলে নাটক নাট্য-কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

আমরা এতক্ষণ নাটকের প্রকৃতি আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এখন ভারতীয় নাটকের বিশেষত্ব কি? তাহা আলোচনা করিতে করিতে বাঙ্গলার নাট্য ক্ষেত্রে ক্রমশঃ প্রবেশ লাভ করিব। এই প্রবন্ধে নাট্য-কাব্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। সংস্কৃত নাটক হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলা নাটকের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কোনও রাজ্যের ইতিহাস বর্ণনা করিতে হইলে যেমন সেই রাজ্যস্থ প্রধান ব্যক্তিগণের ইতিহাস

বর্ণনাই যথেষ্ট, সেইরূপ সাহিত্য রাজ্যের নাটকীয় প্রদেশের ক্রমোন্নতি বা ক্রম-বিকাশ পরিস্ফুট করিতে এক এক যুগের প্রধান প্রতিনিধি নাট্যকারের বর্ণনা করাই সমীচীন।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে নাটকীয় প্রতিভা সভ্য এবং উন্নত জাতিবর্গের মধ্যেও বিভিন্ন দিশা বিভিন্ন ভাবে বিকাশপ্রাপ্ত। ভারতের নাটক ভারতবাসীর নিজস্ব। ওয়েবার সাহেব (Dr. Weber) তাঁহার "সংস্কৃত সাহিত্য" গ্রন্থে (Sanskrit Literature) কালিদাসের গ্রন্থে যবনী দাসীগণের কথা এবং অশোকের প্রাকৃত ভাষা অপেক্ষা নাতিপ্রাচীন প্রাকৃত ভাষা প্রয়োগ দৃষ্টে খ্রীষ্ট জন্মের বহু শতাব্দীর পরে ঐ সকল নাটক রচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু এ যুক্তি ঠিক্ নহে। আমরা ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে বিশ্বামিত্র এবং বিপাশা ও শতদ্রু নদীদ্বয়ের সহিত মনোহর বাক্যালাপে নাটকের অস্ফুট অঙ্কুর দেখিতে পাই:—বিশ্বামিত্র বলিতেছেন:—

"প্র পর্ব্বতানামুশতীউপস্থা দশ্বে ইব বিষিতে হাসমানে।
গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে বিপাট্ছুতুদ্রী পয়সাজবেতে॥

—পর্ব্বত গৃহ ছাড়িয়া, বন্ধনমুক্ত বিমুক্ত হাস্যপরায়ণ অশ্বযুগলের ন্যায়, মাতৃস্তনলেহি শুভ্র গোবৎসের ন্যায়, হে, বিপাসে ও শতদ্রু নদীদ্বয়। তোমরা বিশাল সলিল রাশি বহিয়া কোথায় খরবেগে চলিয়াছ?

সর্ব্বোপরি, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৫ সূক্তটী নাটকের বীজ স্বরূপ বলা যাইতে পারে। উর্ব্বশী পুরুরবাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন—রাজা উন্মত্তের ন্যায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া একদিন দৈবাৎ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন, উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় বলিয়া উঠিলেন

"হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে
বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু।
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে
ময়স্করন্ পরতরে চ নাহন্॥"

—হে নিষ্ঠুর! পূর্ব্ব স্নেহ মনে করিয়া একটু অপেক্ষা কর। এস, কত কালের রুদ্ধ মনের কথা দুটী বলিয়া দেই। রুদ্ধ মনোবেগ বড় ক্লেশের কারণ।

—আমরা বৈদিক সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। প্রত্যুত্তরে উর্ব্বশী বলিলেন—"আমি উষার মত চলিয়া গিয়াছি। মহারাজ তোমার সহিত কত সুখসম্ভোগ করিয়াছি। কিন্তু যেদিন সুজূর্নি শ্রেণি, প্রভৃতি সখীগণের নিকট প্রণয় সম্ভাষণ লইয়া উপস্থিত হইলে যে দিন তাহারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া উষার অরুণ কিরণের মত আকাশে বিলীন হইয়া গেল সেই দিন আমি তোমাকে ছাড়িয়াছি। নচেৎ হে বীর। তুমিই তো আমার দেহের অধীশ্বর ছিলে ["রাজা মে বীর। তন্ব তদাসীঃ"] পুরোরবা বলিলেন "উর্ব্বশি। তোমার প্রণয়ী আজ তোমাকে না পাইলে এখনেই দেহত্যাগ করিবে, অথবা মৃত্যু-দেবতার অঙ্ক আশ্রয় করিবে তাহার প্রাণহীণ দেহ বন্য বৃকের আহার্য্য হইবে।"

উর্ব্বশী:—"না পুরোরবা। যদিও না-বৃকের আহার্য্য হইও না। স্ত্রীলোকের প্রেমে কি এতই আয়া স্থাপন স্থাপন করিতে হয়? জান না, ইহাদের হৃদয় যে শালি-বৃকীর মত" [শাল্য বৃকানাং হৃদয়ান্যেতা।] কিন্তু রাজন্। যে চারি বৎসর তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া

মর্ত্তালোকে বাস করিয়াছি তাহা ভুলিতে পারি নাই সেই ঘৃতই এখন আমার খাদ্য আমি তাহারই কিঞ্চিৎ আহার করিয়া এখনো জীবন ধারণ করিতেছি—তাহাই আমার পরম তৃপ্তি আমি আর কাহাকেও চাই না। ইহ-কালে আর নয়, এস স্বর্গলোকে আমরা পুনরায় আনন্দে মিলিত হইব"।

ইহাই কালিদাসের প্রসিদ্ধ বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের মূল উপাদান। ইহার উপরই নিপুণ তুলিকায় রং ফলাইয়া কালিদাসের অমর গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে।

গ্রীসে যখন নাটকের নামগন্ধও নাই তাহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতের "নটসূত্র" বা ভরত ঋষি প্রণীত "লক্ষ্মী স্বয়ংবর" নাটকের প্রয়োগ ছিল বলিয়া পুরাণাদিতে দৃষ্ট আছে।

শিলালি ও কৃশাশ্ব নটসূত্র প্রচার করেন বলিয়া পাণিনি "পারাশর্য শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ" এই সূত্রে (৪।৩।১৪০) 'শৈলাল' শব্দ দ্বারা নট বুঝায় বলিয়াছেন। শিলালির নাম শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩।৫। ৩।৩), দৃষ্ট হয়। বাঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত জ্যোতির্গণনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অন্যূন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে শতপথ ব্রাহ্মণ বিরচিত হয়। তখন গ্রীসের নাটক কোথায় ছিল?

বৌদ্ধ গ্রন্থকার অমর সিংহ তাঁহার অভিধানে নটের যে কয়টী প্রতিশব্দ দিয়াছেন তাহা এই:—

"শৈলালিনস্তু শৈলূষা জায়াজীবাঃ কৃশাশ্বিনঃ ভরতা ইত্যাদি নটাঃ।"

এই সম্বন্ধে সমস্ত রামায়ণের আরিতার উল্লিখিত আছে:—

"নৃত্যার সূতং গীতায় শৈলূষং ধর্ম্মায় সভাচরং" (৩০।৬৫)

রামায়ণের আদিকাণ্ডে মহর্ষি বাল্মীকি অযোধ্যার বর্ণনা করিতে লিখিয়াছেন:—

"বধূনাটক সংঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্ব্বতঃ পুরীম্।
উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং শালমেখলাম্॥"

সেইপুরী রমণী অভিনীত নাট্যশালা সমূহে পরিপূর্ণ উদ্যান ও আম্রকানন পরিবেষ্টিত ও তাহার চারিদিকে মেখলার ন্যায় শাল বৃক্ষের সার ছিল।" দেখিতেছি আজিকালি সভ্যতার চরম সীমায় যেমন বিশাল নগ-রীতে বারাঙ্গনা-অভিনীত নাট্যগৃহ আছে, বাল্মীকি-বর্ণিত অযোধ্যায় তাহাই ছিল।

যখন নিশাবসানে মাতুল গৃহে ভরত পিতার মৃত্যু-সূচক অশুভ স্বপ্ন দেখিয়া উন্মনা হইয়া আছেন, তাঁহাকে প্রফুল্ল করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় বয়স্যগণ কেহ মনোহর বাদ্য, কেহ নৃত্য, নাটকাভিনয়, কেহ বা নানারূপ হাস্যজনক কার্য্য করিতেছেন।

"বাদয়ন্তি তথা শান্তিং লাসয়ন্ত্যপিচাপরে।
নাটকান্যপরে স্মাহ হাস্যানি বিবিধানি চ"

৬৯অ—৪শ্লো

মহাভারতের সভাপর্ব্বে ময়নির্ম্মিত সভায় যুধিষ্ঠির যে দিন প্রবেশ করিলেন সে দিনকার আনন্দোৎসবে

"তত্র মল্লা নটা ঝল্লা সূতা বৈতালিকাস্তথা
উপতস্থু মহাত্মানং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্" সভা—চতুর্থ অ—৭

এখানেও নটের উল্লেখ আছে। ওয়েবার সাহেব যাহাই বলুন, পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে যখন ইয়ুরোপ খণ্ডে সভ্যতার উন্মেষ আরম্ভ হয় নাই

তখন হইতেই জ্ঞানের লীলাভূমি ভারতে নাটকাবতার হইয়াছিল। *

এক্ষণে দেখিতে হইবে,এই ভারতীয় নাটকের বিশেষত্ব কি? অথবা জগতের অন্যান্য জাতির দৃশ্যকাব্যের সহিত ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের পার্থক্য কোথায়?

ভারতীয় নাটকের বিশেষত্ব.

সংস্কৃত নাটক পাঠে একটী বিষয় বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। তাহা আত্ম-সংযম। এখানে ম্যাকবেথের মত রাজ্যলিপ্সার পঙ্কিল মলিনতা নাই; এখানে রোমিও বা জুলিয়েটের মত গভীর প্রেম থাকিলেও অসংযমের পরাকাষ্ঠা আত্ম-হত্যা নাই। ভবভূতির মালতীর প্রেম জুলিয়েট অপেক্ষা কম গভীর নহে, কিন্তু হিন্দুপত্নীর সেই মধুর সলজ্জ অথচ গভীর অনুরাগে অনুচিত আত্ম-বিস্মৃতি নাই। ইহাই হিন্দুজাতির নিজস্ব। ইহাই খাঁটি হিন্দু চরিত্রের আদর্শ।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব প্রাচীনে হিন্দু নাটকে ইংরাজীতে যাহাকে wit বলে তাহা নাই। বিদূষক দ্বারা হাস্যরসের অবতারণা করিবার চেষ্টা করা হয় বটে কিন্তু তাহা কি অকিঞ্চিৎকর! এখানে ফলষ্টাফ্ (Falstaff.) নাই, এরিয়েল্ বা পাক্ (Ariel or Puck) নাই, মৃচ্ছকটিতে এক নগর কোতোয়ালের (শকারের) চরিত্র আছে কিন্তু তাহাতে ভদ্রোচিত রসিকতা নাই, ছেলেমানুষের মত মুখ-ভঙ্গী আছে মাত্র। প্রকৃত প্রহসনেরও দুর্দ্দশা তাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রহসন "ধূর্ত্তসমাগমম্", "ধূর্ত্তনর্ত্তকম্", "হাস্যার্ণবম্", "কৌতুক সর্ব্বস্বম্", ইহার উদাহরণ।

তৃতীয় বিশেষত্ব, সংস্কৃত নাটক অধিকাংশই পণ্ডিত মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে লিখিত।

কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি নাটকের পূর্ব্বপীঠিকায় আমরা "গুণগ্রাহিণী পরিষৎ", "বিদ্বৎভূয়িষ্ঠ পরিষৎ" ইত্যাদির উল্লেখ প্রাপ্ত হই। আমাদের মনে হয় গ্রীসে লোকশিক্ষার জন্য পেরিক্লিস (Pericles) যেমন নাটক অভিনয় করাইতেন ভারতে তেমন কিছুই ছিল না।

কিন্তু একটী বিশেষত্ব আছে যাহা পৃথিবীর কোন নাটকে এমন কি গ্রীক বা স্পেনিশ্ বা ইংরেজী নাটকেও আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। তাহা সংস্কৃত নাটকের অনির্ব্বচনীয় মদালস কবিত্ব। এ কবিত্ব, কুসুমের গন্ধের মত, চন্দ্রের কৌমুদীর মত, কুহুকণ্ঠের মাধুর্য্যের মত, কমলের কমনীয় সৌন্দর্য্যের মত সংস্কৃত নাটক হইতে অভিন্ন। শকুন্তলার বনজ্যোৎস্না ও সহকারে বিবাহ; সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা

---

* অধ্যাপক উইলসন (Prof. Wilson) বলেন:—

"The Nations of Europe possessed no dramatic Literature before the 14th or 15th Century, at which period the Hindu Drama had passed into its decline." ("Theatre of the Hindus")

সংস্কৃতজ্ঞ জর্ম্মান পণ্ডিত—শ্লীগাল (Schlegel) বলেন

"Among the Indians whose social institutions and mental cultivation descend unquestionable from a remote antiquity, plays were known long before they could have experienced any foreign influence......... They possers a rich dramatic literature which goes backword through nearly two thousand years"—

A. W. Schlegel's "Dramatic Art & Literature," Black's translation.

মালিনীর চিত্র; ভবভূতির গদগদনন্দিনী গোদাবরীর কলকল; রত্নাবলীর "উদ্দামোৎকলিকা বিপাণ্ডুর-রুচি উদ্যানলতা"র উপমাস্থল রাজবধূ; যেখানে যেদিকে চাই সেখানেই কবিতা যেন সুন্দরীর চরণ ঘাতে অশোকের মত ফুটিয়া রহিয়াছে।

প্রাচীন গ্রীক নাটকের ন্যায় প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেরও কতকগুলি আলংকারিক নিয়মের বিধানে চলিতে হইত। সাহিত্য দর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাহা বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। অনেক সময় আলংকারিকের নিবদ্ধ গণ্ডীতে বাস করিতে যাইয়া কবিত্বের স্বাধীন স্ফুর্ত্তি গ্রীষ্মকালে পল্বল-জলের মত শুষ্ক হইয়া যাইত। আমরা দুটী একটী উদাহরণ দিতেছি:—

সংস্কৃত নাটক বিয়োগান্ত হইতে পারে না; দীর্ঘকাল ব্যাপী ঘটনা নাটকে নিবিষ্ট হইবে না। ফরাসিস্ নাটকে এই শেষোক্ত unity of time অনুসরণ করিতে যাইয়া স্পেন কি ইংলণ্ড দেশীয় নাটকের ন্যায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে নাই। নাটকে তিন চারিটী মাত্র অভিনেতা বা পাত্র থাকিবে। ঈস্কাইলাস্ সফোক্লিস (Sophocles) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক নাটকেও তাহাই আছে। এবং ঐ গ্রীক নাটকের মতই "প্রখ্যাত বংশো রাজা ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্। দিব্যোথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ"—বিখ্যাত ব্যক্তি নাটকের নায়ক হওয়ার রীতি আছে।

সুতরাং আপনারা দেখিবেন সংস্কৃত নাটক সাধারণতঃ রাজরাজরা দেবদেবী নিয়াই ব্যস্ত। চারুদত্ত, নাগানন্দ বা মাধব ইহার ব্যতিক্রম; Exception, rule নহে। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, বাঙ্গালার নাটকের প্রথম অবস্থায় এই প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ হইয়াছিল এবং সংস্কৃতের নিয়মাবলী অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে যাইয়া তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে কেবল আলংকারিকের গণ্ডীনিবদ্ধ নীরসতাই অবতীর্ণ হইয়াছিল।

সংস্কৃত বাঙ্গালা ভাষার মাতামহী হইলেও বাঙ্গালা সংস্কৃতের সম্পদেই পরিপুষ্ট। তাই আমরা এতক্ষণ সংস্কৃত নাটকীয় সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব যে যদিও বাঙ্গালার প্রথম নাটকাবলি সংস্কৃতের ছাঁচে গঠিত হইয়াছিল—যদিও সংস্কৃত পণ্ডিতগণের হাতে পড়িয়া—প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ন্যায়, নাটকীয় সাহিত্য কতকটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু ইদানীংকালে কতকগুলি ইংরেজী শিক্ষিত প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের হাতে পড়িয়া বাঙ্গালার নাটক ক্রমোন্নতির পদবী আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ জগতের সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিবার যোগ্য হইতেছে। আমরা বঙ্গীয় নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, যোগ্যতর ব্যক্তি সে ভার গ্রহণ করিবেন। আমরা বাঙ্গালা নাটকের ক্রম-বিকাশের আভাসমাত্র দিয়া সন্তুষ্ট হইব এবং আমার ক্ষুদ্র প্রণোদনায় যদি কোনও মনস্বীর এই অভিনব পথে বিচরণ করিবার ক্ষণিক ইচ্ছাও জাগরূক হয় তবে এই পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নাই মনে করিব।

আধুনিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত বাঙ্গালার নাটকের আদিপুরুষ কে?

বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে পাঁচালি প্রচলিত ছিল। পাঁচালি শব্দ বোধ হয় যে সকল সঙ্গীত বা কবিতা

আসরের একদিক হইতে অন্যদিকে "পাদ-চালনা" করিয়া গীত বা পঠিত হইত—তাহাদিগকে বুঝাইত। সেইরূপ 'নাচারি' ছন্দ যাহা 'নাচে' গীত হইত তৎপ্রতি প্রযুক্ত হইত। ক্রমে যাত্রাগানের আবির্ভাব হইতে থাকে। 'যাত্রা' শব্দের অর্থ উৎসব এবং এই অর্থেই উত্তরচরিতের প্রস্তাবনায় "ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রায়াং" উক্ত নাটক অভিনীত হইবার কথা আছে। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ৺ সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গ দর্শনে" যাত্রাগানের সমালোচনা করিয়াছিলেন। 'যাত্রাগান' বাঙ্গালীর গীতাভিনয়। উহা একাধারে প্রাচীন পাঁচালির উত্তরাধিকারী সঙ্গীত ও প্রাচীন নাটকের অভিনয়ের সমাবেশ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নদীয়ার রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের অনুরোধে পণ্ডিত বৈদ্যনাথ বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য পুরাণের দক্ষোপাখ্যান লইয়া "চিত্র যজ্ঞ" নামে এক খানি পঞ্চাঙ্ক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। এখানি অভিনয় ও গীতের খিচুড়ী এবং নাটকীয় রীতি, বিরুদ্ধ বস্তু বর্ণনায় (narration) পরিপূর্ণ। আমাদের মনে হয় তখন হইতে বাঙ্গালীজীবনে যাত্রার বাতাস বহিতে ছিল বাঙ্গালীর প্রাণে যাত্রাগণের প্রথম সুর জাগিতে ছিল। "সঞ্জীব বাবুর উল্লিখিত সমালোচনা পাঠে জানা যায়, তাঁহার সময়ে যাত্রাবলিতে সাধারণতঃ বিদ্যা-সুন্দরের পালা বুঝাইত,নচেৎ কালিয়দমন কিম্বা রাম বন-বাস সঞ্জীব বাবুর সমালোচনার পর যাত্রাগণের দুইটী যুগ অতীত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী যুগকে পৌরাণিক যুগ বলা যায়। এই পৌরাণিক যুগেই যাত্রাগানের প্রকৃত উন্নতি হইয়াছিল।" (১) এই সময় একদিকে যেমন যাত্রাগানের গীতাভিনয়ের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িতেছিল, তেমনই খাঁটি অভিনয় ধীরে ধীরে প্রসর লাভ করিতে ছিল। গ্রীক নাটকীয় ইতিহাসে দেখা যায় গ্রীসের রাজধানী এথেন্স্ নগরেই নাটকের প্রথম উৎপত্তি হয় এবং সেখানেই ইহা পরিণতি লাভ করে। দুই একজন ব্যতীত গ্রীসের প্রসিদ্ধ নাট্য কবি এথেন্সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (২) বাঙ্গালার প্রথম নাটক ও তেমনই রাজধানী কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করে।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছিলেন যে রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব" বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নটক। বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুদিত কতক-গুলি নাটক পাইয়াছেন। আমি সে গুলির নাম করিয়া করিয়া পাঠক বর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। কিন্তু অভিনীত না হইয়া (Taylor) প্রণীত Philip van Artevelde এর মত কেবল নাটকাকার কাব্য রূপে পঠিত হইত বলিয়া অনুমান হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছ—"চিত্র-যজ্ঞ" সংস্কৃত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আধুনিক বাঙ্গালীর প্রথম নাটকের ছায়া। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে "কলিরাজার যাত্রানাটক" অভিনীত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে "বিদ্যাসুন্দর নাটক" প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। যাক্, এ সকল নাটকের কথা উল্লেখ করিয়া আমরা বৃথা সময় নষ্ট করিব না। এ সক-লের নিজের কোনও বৈচিত্র্য বা লিপিকুশলতা নাই

(১) ১৩১৯—প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

(২) Schlegel's "Dramatic Literature" Lecture II,

কেবল বাঙ্গালীর নাটকীয় প্রতিভার অঙ্কুরোদ্গমের সাক্ষী বলিয়া ইহাদের প্রতি একটা ঐতিহাসিক কুতূহল মাত্র।

বস্তুতঃ বঙ্গীয় নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ধরিতে গেলে রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক বাঙ্গলার প্রথম নাটক বলিয়া গণ্যহইতে পারে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুরোধে এই নাটক ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী গৃহে প্রথম অভিনীত হয়। নাটকখানি রসিকতায় পরিপূর্ণ। সংস্কৃত নাটকের রীত্যনুসারে নান্দী ও প্রস্তাবনা লিখিত হইয়াছে কিন্তু ইহা কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথার একখানি চিত্র বিনোদক চিত্র। সাহিত্যদর্পণের ধীরোদাত্ত বা দিব্যাদিব্য নায়ক নাই, পুরাণের গন্ধ নাই সুধু এক খানি সামাজিক চিত্র। প্রথম হইতেই বাঙ্গালীর প্রতিভা আলংকারিকের নিবিড় নিগড় ছিন্ন করিতে প্রয়াস হইতেছে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাভারতের প্রসিদ্ধ বঙ্গানুবাদক কলিকাতার জমিদার কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার নিজ বাটীতে সংস্কৃত "বিক্রমোর্ব্বশী" স্বয়ং বঙ্গানুবাদ করিয়া অতিশয় আড়ম্বরের সহিত অভিনীত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপন পূর্ব্বক বাঙ্গলা নাটক অভিনীত করাইতে মনঃস্থ করেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ "রত্নাবলী" অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুবাদ অবিকল নহে। আধুনিক রুচি অনুসারে অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত উহার অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছিল। তবে ভাব সংস্কৃত নাটকের মত সন্দেহ নাই। রত্নাবলী শ্রীহর্ষের রচনা কিন্তু রামনারায়ণ তাহাতে যে বাঙ্গালীর নিবেশিত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক। ঋণগ্রহণে দোষ নাই, কিন্তু জিনিষটাকে নিজের করিয়া লইতে পারিলেই কৃতিত্ব। কেবল অনুকরণ নিতান্তই অসার ও নিষ্ফল। (১) এই সময় বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গলা নাটকীয় সাহিত্যের এক শুভ মুহূর্ত্ত। যখন পাইকপাড়া রাজাদিগের বেলগাছিয়ার উদ্যানে বাটীতে "রত্নাবলী" অভিনীত হইতেছিল, যখন তাহা দর্শন করিতে ছোট লাট, হাইকোর্টের জজ প্রভৃতি মহাগণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আসিতে লাগিলেন, সেই সময় রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদের ভার তরুণবয়স্ক পুলিশ কোর্টের কেরানী মধুসূদন দত্তের প্রতি ন্যস্ত হইল। বলা বাহুল্য অসামান্য প্রতিভাশালী মধুসূদন তাঁহার কার্য্য প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিয়া ছিলেন।

"রত্নাবলীর" সৌভাগ্য দর্শনে মধুসূদনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। তিনি "শর্ম্মিষ্ঠা নাটক" রচনা করেন। ইহার গল্পাংশ যযাতি দেবযানীর উপাখ্যান, শুক্রাচার্য্যের অভিসম্পাতে পিতা যযাতিকে পুরুর যৌবনদান। কথিত আছে মধুসূদন নাটকখানি রচনা করিয়া পণ্ডিত প্রবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকে দেখিতে দিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ এই বলিয়া নাটকখানি ফেরৎ দিলেন যে ইহা সংস্কৃত নাটকের প্রত্যেক বিধানই উল্লংঘন করিয়াছে। কিন্তু মধুসূদন নিজের ব্যক্তিত্ববজায় রাখিয়া নাটকখানি ইয়ুরোপীয় আদর্শে রচিত করেন। এই নাটকে আমরা ইয়ুরোপীয় ও সংস্কৃত রচনা প্রণালীর এক অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাই। ইহাতে সংস্কৃত নাটকের মত সেই ঔদারিক মাধব্য নামধারী বিদূষক আছে। রত্নাবলীর ন্যায় মহিষীদ্বয়েরর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। হাহতোস্মি', কস্তং ভো কপিল। প্রভৃতি সংস্কৃত মিশ্রিত বাঙ্গলা আছে। কিন্তু রচনা প্রণালী ও বিষয় বিন্যাস ইংরেজী রীতি অনুযায়ী। সেই প্রস্তাবনা বা বিষ্কম্ভক জাতীয় কিছুই নাই। স্থূল কথা "শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে" স্বাধীন প্রতিভা কৃত্রিম নিয়মাবলীর শৃংখল ছিঁড়িয়া ও

(১) In fine Arts mere imitation is always fruitless, even what we borrow from others, to assume a true poetical shape, must as it were be born again within us.—Schlegel.

যেন ছিঁড়িতে পারিতেছে না। তার পর "কৃষ্ণকুমারী" নাটক ইহাই বাঙ্গালার প্রথম বিয়োগান্ত নাটক (Tragedy) সংস্কৃত নাটকের বিধান অনুসারে নাটক বিয়োগান্ত হইতে পারে না ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মধুসূদন এবার কৃত্রিম নিয়মাবলীর হাত ছাড়াইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছেন। কৃষ্ণকুমারীতে সংস্কৃত গন্ধি রচনা নাই, কৃত্রিম শব্দ বিন্যাস নাই। ইহাতে এক অভিনব প্রতিভা প্রকাশিত হইতেছে। রঙ্গমঞ্চের উপরি আত্মহত্যা সংসাধিত হইতেছে। উন্মাদের অভিনয় হইতেছে। আত্মসংযম কোথায় উড়িয়া যাইতেছে এবং ঘটনাবলি ঘন ও দ্রুত সন্নিবিষ্ট হইয়া শ্রোতৃবর্গকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে তাহার ক্রমবিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং আমরা এক এক শ্রেণীর নাটকের আদর্শ গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়া সেই শ্রেণীর বিশেষত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "নীলদর্পণ" প্রচারিত করেন। প্রথমতঃ গ্রন্থকারের নাম প্রকাশিত হইয়াছিল না। তাঁহার নিজ বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে নদীয়া জেলায় নীলকরদিগের অমানুষিক অত্যাচার স্বচক্ষে দর্শন করিবার তাঁহার যথেষ্ট সুযোগ ছিল।

ইহাতে নীলকরদিগের অত্যাচারের চিত্রই একমাত্র উৎকৃষ্ট বিষয় নহে। "নীলদর্পণে" গোলক বসু নামক এক সমৃদ্ধ কায়স্থ পরিবারের নীলোপদ্রবে ধনে প্রাণে ধ্বংস হইবার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলপূর্ব্বক প্রজার ভূমিতে নীল বপন, দাদন না লইলে কুঠীতে লইয়া গিয়া জুতা প্রহার, গ্রাম দগ্ধ করা, দাদন গ্রহণে অনিচ্ছু প্রজাকে মিথ্যা মোকদ্দমায় ফেসাইয়া বন্ধু মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক জেলে দেওয়া, নরহত্যা করা প্রভৃতি নীলকর সাহেবদিগের পৈশাচিক অত্যাচার-কাহিনী কৃতিত্বের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। বাঙ্গালার শোকান্ত নাটকের মধ্যে আধুনিক "প্রফুল্ল," "রাণা প্রতাপ" প্রভৃতি দুই চারিখানির ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কিছু নাই। কিন্তু "নীল দর্পণ" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অথচ এই "নীলদর্পণ" একেবারে সংস্কৃত বিধানের বিদ্রোহী—সংস্কৃত নাটকের proprieties বা সুরুচিগুলি ফুৎকারে কোথায় উড়াইয়া দিয়াছে। তাই সংস্কৃত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন দুঃখ করিয়া বলিতেছেন :—

"নীল দর্পণ করুণরসপূর্ণ হইলেও ইহা যে নাটকাংশে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কারণ নাটকের সকল অংশই অভিনেয় হওয়া উচিত; কিন্তু প্রজাদিগের উপর শ্যামচাঁদ ও রামকান্ত প্রহার; গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির উদরে মুষ্ট্যাঘাত; উড়ানি পাকান দড়ীতে গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ দোদুল্যমান রাখা, গলার পা দিয়া (ইন্দু মাধবের স্ত্রী) সরলতাকে হত্যা করা প্রভৃতি কাণ্ড অভিনয়ের যোগ্য হইতে পারে না। ইংরেজী এ সকল সম্পূর্ণ দোষাবহ হয় না বটে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ওরূপ কাণ্ড সকল অভিনয়ের যোগ্য হইতে পারে না।" প্রাচীন সংস্কৃত রীতি লংঘনে প্রাচীন পণ্ডিতের মনে আঘাত লাগিয়াছে। এই "নীলদর্পণ" সম্বন্ধেই কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলিতেছেন :—

"দীনবন্ধু বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট নাটককার। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে নীলদর্পণ রচনার পর হইতেই তাঁহার কাব্যরস তরল হইতে থাকে।" নীলদর্পণ দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারের শোক কাব্য। ইহা অবিনশ্বর—ইহা আঙ্কল্ টমস্ কেবিনের (Uncle Toms Cabin) মত সাহিত্য জগতে চিরসমাদৃত থাকিবে।

"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought". (Shelly)

—সঙ্গীত মধুর তাই বাহে তীব্র শোকতান।

আমরা সংস্কৃত নাটক হইতে উল্লিখিত বাঙ্গালা নাটকগুলির যে সকল পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি তন্মধ্যে বিষাদ-পরিণামই সর্ব্বপ্রধান।

ড্রাইডেন (Drided) একস্থানে কাব্য নাটকের সমালোচনা করিতে বলিয়াছেন যে " Poetical justice " না থাকিলে কাব্য নাটক অঙ্গহীন হয়। কিন্তু বাস্তবজগতে কিম্বা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহে সর্ব্বদা poetical justice—"সুবিচার" অর্থাৎ পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার, প্রেমের প্রতিদান, বিরহে মিলন দেখা যায় না। রামায়ণের সীতাদেবী যদি লবকুশের বধূ বরণ করিয়া পৌত্রমুখ সন্দর্শন পূর্ব্বক রাজমাতার পদবী আরোহণ করিতেন তবে কি আর সীতার জন্মদুঃখের কথা লোকের মনে জাগিত? লিয়ার (Lear) যদি কর্ডেলিয়ার পুত্রকে কাঁধে লইয়া ঠাকুরদাদার গল্প করিতে বসিতেন—তবে কি উহা জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য হইতে পারিত?

সেই রূপ ব্যাসের মহাভারত, হোমরের ইলিয়াদ বিষাদ-পরিণাম না হইয়া মিলনান্ত হইলে জগৎবাসীর হৃদয় কি সেই মহান শোক সঙ্গীতে ডুবিয়া যাইত, না পরস্পরে সহৃদয়তা হইত?

"নীলদর্পণের" পরে বাঙ্গালার এমন আবেগপূর্ণ নাটকের খুব অল্পই সৃষ্টি হইয়াছে। সঞ্জীব বাবু আক্ষেপের সহিত একদিন বলিয়াছিলেন :—

"বাঙ্গালায় আর বড় শোকের সুর নাই। কু-চিহ্ন। শোকে সহৃদয়তা জন্মে! ঐক্য হয়। আন্তরিক শোক সকলের অদৃষ্টে ঘটে না, শোক পবিত্র; শোক স্বর্গীয়; শোক আবশ্যক"। ইহাই এরিষ্টটলের এর ভাষায় বলিতে গেলে, "করুণা ও শোকের উচ্ছ্বাস দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করাই বিষাদ-পরিণাম নাটকের উদ্দেশ্য" (১)

আমরা বলিয়াছি পাইকপাড়া রাজবাটীতে রত্নাবলি প্রভৃতির অভিনয় বাঙ্গালা সাহিত্যের—বিশেষ নাটকীয় সাহিত্যের শুভ দিন। সেই সময় আধুনিক নাট্য কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন। সেই সময় তাঁহার মনে ঐরূপ একটী থিয়েটার করিবার বাসনা জাগরিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতিকে লইয়া তিনি এক দল বাঁধেন এবং দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন "সধবার একাদশী" অভিনয়ে স্বয়ং নিমচাঁদের ভূমিকা (part) গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন।

এই গিরিশ ঘোষ বাঙ্গালা নাটকের আধুনিক যুগের প্রবর্ত্তক ও নেতা। গিরিশচন্দ্র বহু সংখ্যক নাটক রচনা করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সাময়িক কৌতুহল চরিতার্থ করিয়া বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইবে। কিন্তু তাঁহার সামাজিক নাটক "প্রফুল্ল", ঐতিহাসিক নাটক "সিরাজদ্দৌলা" "মীর কাসেম", বঙ্গনাট্য সাহিত্য ভাণ্ডারে অমূল্য অমলিন রত্নরাজি। ইহা অবিকল ইংরেজী শ্রেষ্ঠ নাটকের অনুকরণে গঠিত। এই যুগের প্রধান লক্ষণ একবারে সংস্কৃত পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজী আদর্শে নাটক রচনা করা। অনুবাদ করিতে হইলেও 'রত্নাবলী' 'মালবিকাগ্নিমিত্র' বা 'বিক্রমোর্ব্বশী' আর মনে হয় না। ম্যাক্‌বেথ, হ্যামলেট, প্রভৃতিই হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক শিল্পকলার সাহায্যে অপূর্ব্ব দৃশ্য পট, অপূর্ব্ব সরোবর সৃষ্টি, ষড়্‌ঋতুর আশ্চর্য্য দৃশ্য ("সভ্যতার পাণ্ডায়") প্রভৃতি নাট্য বিষয়ের গৌরব ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে।

ইয়ুরোপে আধুনিক নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিত মরিস্ মেটারলিঙ্ক্ (Maurice Maeterlink) যাহা বলেন ইউরোপের অনুকরণকারী আধুনিক বঙ্গীয় নাটক তাহা অল্লাধিক পরিমাণে প্রয়োগ হইতে পারে। তিনি বলেন :—

"আমরা আধুনিক নাটকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহার প্রধান লক্ষণ ইহাই দেখিতে পাই যে বাহ্যিক আচরণ (action) যেন ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। নাট্যকারেরর দৃষ্টি যেন মনুষ্য-হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া মনোবৃত্তিগুলি বিশ্লেষণ করিতে চাহে; বাহ্যিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আত্মিক সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করাই যেন এখনকার নাট্যকবির উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে আর রক্তপাত

(১) The object of tragedy is to purify the passions by pity and terror.—Aristotle quoted by Schlegel.

নাই; চিত্তের সেই অদম্য আবেগ নাই; বীরত্ব পৃথিবী হইবে অপসৃত হইতেছে। বসন্তের মনোহারিণী রজনীর অবসান হইয়াছে—প্রাচীন নাটকের সেই গভীর শোককাহিনী নাই. ওথেলোর সন্দেহ, ম্যাক্‌বেথের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, হ্যামলেটের অস্থিরচিত্ততা আর তেমন গৌরব ও গাম্ভীর্য্যের সহিত অঙ্কিত হয় না। ....মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করাই বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা ও অবস্থাধীনে কবির একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" (১) সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত শিক্ষার বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চিত্র নাটকেরও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। তাই বঙ্গ-নাটকের আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের "রাজারাণীতে" রাজার চিত্তের আবেগময়ী বৃত্তিগুলিরই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। অন্তঃপুর চারিণী মহিষীর অঞ্চলাশ্রিত নর্ম্মসহচর রাজা অতিস্ত্রৈণ হইতে অতিনিষ্ঠুর হইয়াছেন। শিরীষমৃদুচিত্ত বজ্রাদপি কঠোর হইয়াছে। এবং চিত্তবৃত্তির এই অস্বাভাবিক বিক্ষেপের পরিণাম কবির নিপুণতুলিকায় দিব্য পরিস্ফুট হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান" এক স্নেহময় পিতার পুত্রপ্রেমের পরাকাষ্ঠা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় নাটকীয় সাহিত্যেও দেশীয় প্রভাব বিলুপ্তপ্রায় হইয়া ইংরেজীর আধিপত্য দিন দিন প্রসারলাভ করিতেছে। ইহাতে যেমন এক দিকে প্রাচীন গাম্ভীর্য্য ও সরসতা এবং উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব অন্তর্হিত হইতেছে তেমন অপর দিকে বৈচিত্র্যে, নাটকীয় চরিত্র চরিত্রের বাহুল্যে, রসিকতার অবতারণায়, এক অভিনব অথচ মনোহর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সংস্কৃতে এক "মুদ্রারাক্ষস" ভিন্ন ঐতিহাসিক নাটক নাই, কিন্তু আধুনিক নাট্য সাহিত্যে "চন্দ্রগুপ্ত," "অশোক" "দুর্গাদাস," "রাণা-প্রতাপ," "মেবার-পতন" "শাজাহান" প্রভৃতি কতই না সৃষ্টি হইতেছে। ইহার কোনটী স্থায়ী হইবে বা কোনটী অনন্ত বিস্মৃতি-সমুদ্রের কবল হইতে রক্ষা পাইবে না তাহা নির্ণয় করিবার সময় এখন নহে। কিন্তু ইহা দ্বারা যে জ্ঞানের, ইতিহাস শিক্ষার, প্রকৃত জীবন্ত মহচ্চরিত্রের প্রভাব জন-সমাজে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

অতঃপর আমরা বাঙ্গালার প্রহসনের বিষয় সংক্ষেপে দুইচারিটী কথা বলিব। গুরুগম্ভীর নাটকে বাঙ্গালী তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারিলেও প্রহসনে বাঙ্গালী সিদ্ধহস্ত। মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" "বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁ," দীনবন্ধুর "জামাই বারিক" বা "সধবার একাদশী," আধুনিক রঙ্গমঞ্চের "রাজা বাহাদুর," আবু হোসন" "তাজ্জব ব্যাপার আরো কত নাম করিব? উত্তম প্রহসন। কারণ আমাদের প্রাণে তেমন আবেগ নাই। ইংরাজীতে যাহাকে Energy বা একনিষ্ঠ অধ্যবসায় বলে, তাহা আমাদের জাতীয় অভাব; গভীর ধারণা আমাদের জাতির মধ্যে বিরল। "আমাদের মানসিক হ্রদে সামান্য কুলুকুলি আছে, কিন্তু গভীর প্রপাতের সহিত কল্লোল নাই।" (১)

দীনবন্ধু "নীলদর্পণে" যে গভীর আবেগ অনুভব করিয়াছিলেন তাহার স্বল্পও "নবীন তপস্বিনী" বা "লীলাবতীতে" উপলব্ধি করেন নাই। তাই নাটক লিখিতে প্রহসন লিখিয়াছেন, তাই দ্বিজেন্দ্রলালের "অহল্যায়" অস্থানোচিত হাস্যপরিহাসের অবতারণা হওয়ায় রসভঙ্গ হইয়াছে। গম্ভীর নাটকে প্রহসনের ছায়া পড়িয়াছে।

আমাদের বক্তব্য শেষ করিয়াছি।

বক্তার ন্যায় নাট্যকারের ক্ষমতা অসীম। নাটকীয় কবি যে ইন্দ্রজালে চিত্ত বশীভূত করেন তাহার শক্তি তড়িৎ-শক্তির ন্যায় ক্ষিপ্র অথচ দুর্ব্বার। তাঁহার হাতে ভবিষ্যৎ বংশের শিক্ষার ভার। তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতি মহৎ ও পবিত্র। সুতরাং সংযত হইয়া ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া, যাহাতে তাঁহার অসীম অপরিমেয় শক্তি সৎপথে নিয়োজিত হয় তাহাই তাঁহার পবিত্র ও একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহার অপব্যবহারে পাপ—সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পাপ। আজকালকার রঙ্গমঞ্চে কুৎসিৎ রুচি পরিতৃপ্ত করিতে যাইয়া উজ্জ্বল দৃশ্যে ও মধুর সঙ্গীতে যে বিষ প্রদানের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা যেন না করা হয়. ইহাই বিনীত নিবেদন। কথিত হইয়াছে ঃ—

> ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
> করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিংচ সাধুকাব্য নিষেবনম্‌॥"

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

(১) Maurice Maetalincks' Introduction to Vol. XVI of the "International Library of Famous Literatier

(১) বান্ধব ১২৮৩ সন

আমন্ত্রণ

শারদার স্বর্ণদ্বার
গেল আজি খুলিয়া!
বিহান কে দিল সাড়া
বনে বাজে সানাই-কাড়া
নীলাকাশে লাল পতাকা
কে গো দিল তুলিয়া?

চরে, চকা উঠলো ডাকি
সরে ভাসে সরাল পাখী
নদীর নীরে দিক্-বধূ কি
হিঙ্গুল দিল গুলিয়া!
পূর্ব্বাশার সিংহদ্বার
গেল আজি খুলিয়া!

ভাঙন লাগা গাঙের কূলে
কে তুমি গো আপন ভুলে
পরাণখানি দে'ছ মেলে
ওগো স্বপ্নময়ি!
নিশিশেষে সিক্ত চুলে
মুক্তা কুড়াও শিউলি-মূলে—
পল্লীপথে ছড়ায়ে দিলে
মুঠি মুঠি খই?

উত্তুরে বায় বইছে ধীরে
আবার কি মা এলি ফিরে?
স্নেহশীতল পরশ যে গো
অঙ্গে আমার লাগে,
শ্রীমুখের সে শুভ্র হাসি
কাশের বনে জাগে!

শিশির ধোয়া যূঁথীর বাসে
অঙ্গ-সৌরভ অই গো আসে
শ্যামা মায়ের শাড়ীর প্রান্ত
প্রান্তরে যে লোটে!
নূপুর বাজে বনে বনে—
পুঞ্জ অলির গুঞ্জরণে
চরণতলে আল্‌তা দিতে
পদ্ম-জবা ফোটে!

মা আসে অই পুষ্পরথে
বাষ্পময় ছায়াপথে
স্বচ্ছ-নব-নীহারনীরে
সদ্যঃ অবগাহিয়া
জোনাকীরা পনস ডালে
পান্নাহীরার ফানুস জ্বালে
টিপ্ কপালে দিক্‌বালারা
অনিমেষে চাহিয়া!

পাড়ার যত ঝিল্লীমেয়ে
সাড়া পেয়ে উঠ্‌লো গেয়ে
হুলুধ্বনি—কুলু কুলু
সুরধুনীর তান্
এমন, পারদ পারা শারদ রেতে
কে তুই মা আঁচল পেতে
শুয়ে আছিস্ ধানের ক্ষেতে—
তোর, কিসের অভিমান?

ওগো সখী শিখরিণি!
শশিমুখী নিশীথিনি!
লো সুন্দরী বসুন্ধরা!
তোরা মাকে ডেকে আন্

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

শক-ক্ষত্রপ চষ্টন ও তাঁহার কালনিরূপণ*

জৈন গ্রন্থোক্ত প্রবাদ অনুসারে খৃষ্ট জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে রাজা বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার পিতা গর্দ্দভিল্ল শকগণ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। বিক্রমাদিত্য উক্ত শকগণকে পরাভূত করিয়া পুনরায় পিতৃরাজ্য অধিকার করেন এবং এই সময় হইতে বিক্রম সংবৎ অব্দের আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৩৫ বৎসর পরে শকগণ পুনরায় উজ্জয়িনী অধিকার করেন এবং এই সময় হইতে শকাব্দের আরম্ভ হয়।

সকলেই অবগত আছেন যে ইউরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী এই সমুদয় কাহিনীতে কোন আস্থা স্থাপন করেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকা সাহিত্য পরিষদের কোন অধিবেশনে বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম।

জৈন গ্রন্থোক্ত বিক্রমাদিত্যের বিবরণটি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহাই তাহাতে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম।

অদ্য উক্ত জৈন কাহিনীর অবশিষ্টাংশ. অর্থাৎ বিক্রম সংবৎ প্রতিষ্ঠার ১৩৫ বৎসর পরে, শকগণ কর্ত্তৃক উজ্জয়িনী পুনরধিকৃত হয়, এই উক্তিটির ঐতিহাসিক সত্যতা নির্দ্ধারণে যত্নবান হইব।

ইতিহাসের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ক্ষত্রপ উপাধিধারী এক পরাক্রান্ত রাজবংশ তিনশত বৎসরের অধিক কাল মালব, সৌরাষ্ট্র ও তৎসন্নিহিত জনপদসমূহে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এই রাজগণ ভারত-বাসী নহেন। পণ্ডিতগণ একবাক্যে তাহাদিগকে শকজাতীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মুদ্রা ও লেখমালায় তাঁহারা যে অব্দের ব্যবহার করিয়াছেন তাহা শকাব্দ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ দুইটি বিষয়ে বর্ত্তমানে কোন প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক নাই. কারণ এ বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ নাই। এ বিষয়ে তত্ত্বপিপাসু শ্রোতৃবর্গকে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিত 'বয়ার' লিখিত 'নহপন ও শকাব্দ' (Nahapana et Uero Saka) * নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উক্ত প্রবন্ধোক্ত সকল মতবাদই গ্রহণযোগ্য এমন নহে, কিন্তু ক্ষত্রপগণের মুদ্রা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত অব্দ যে শকাব্দ তাহা নিঃসংশয়রূপে নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কোন কোন অনুশাসনলিপিতে এই ক্ষত্রপগণের বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের প্রায় প্রত্যেক রাজার মুদ্রায় তাঁহার পিতার নাম উল্লিখিত আছে। এই সমুদয় হইতে ক্ষত্রপ রাজগণের নামের ধারাবাহিক তালিকা সঠিকরূপে প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, ভূমক ও তৎপুত্র নহপন ব্যতীত অন্য সমুদয় ক্ষত্রপ রাজগণই চষ্টন নামক ক্ষত্র রাজার বংশধর। ভূমক ও নহপন যে চষ্টনের বংশের অন্তর্গত নহেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নহপন সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা শিলালিপি হইতে অবগত হইতে পারি। তাঁহার জামাতা উষভদাত ও মন্ত্রী অয়মের লেখমালা হইতে জানা যায় যে, তিনি শকাব্দ ৪১ হইতে শকাব্দ ৪৬ বর্ষ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই রাজত্ব করিয়াছিলেন। অন্ধ্র বংশীয়া রাজ্ঞী বালশ্রীর নাসিকস্থ শিলালিপি ও জগল অম্বি নামক স্থানে আবিষ্কৃত বহুসহস্র মুদ্রা হইতে জানিতে পারা যায় যে, অন্ধ্র-রাজ গৌতমিপুত্র শাতকর্ণির হস্তে নহপন পরাজিত, রাজ্যভ্রষ্ট, ও নিহত হন। এই ঘটনা ৪৬ শকাব্দের অনতিকাল পরেই সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

* J. A....R. etc § 83. J. R. A. S. 1899 P. 365

এইরূপে নহপনের সময় মোটামুটি নির্ণীত হইয়াছে। অতঃপর আমরা অপর ক্ষত্রপ রাজবংশের আদিপুরুষ চষ্টনের কালনিরূপণে প্রবৃত্ত হইব। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক লেখক টলেমি তাঁহার ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্তে উজ্জয়িনী নগরী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'ওজিনি বেসিলিয়স টিয়াষ্টস্টানয় ('Ozene Baseleios Tiastanoy')। ইহা হইতে আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারি যে উজ্জয়িনী নগর টিয়াষ্টানীস্ রাজার রাজধানী ছিল। এই টিয়াস্টানিস যে চষ্টনেরই গ্রীক রূপান্তরমাত্র তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইল, শক ক্ষত্রপ রাজগণের একশাখার আদিপুরুষ চষ্টন উজ্জয়িনী নগরে রাজত্ব করিতেন। টলেমির যে গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে উহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শক রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা চষ্টন উজ্জয়িনী নগরে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ও দিকে জৈন গ্রন্থে পাইতেছি যে বিক্রম সংবৎ প্রতিষ্ঠার ১৩৫ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দে শকগণ কর্ত্তৃক উজ্জয়িনী অধিকৃত হয়।

এই দুইটি বিভিন্ন প্রমাণ হইতে এই ধারণায় উপনীত হওয়া স্বাভাবিক যে চষ্টনই এই জৈনগ্রন্থোক্ত শকবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনিই আনুমানিক ৭৮ খৃঃ অব্দে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই সহজ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। ওলডেনবার্গ প্রথমে এই মতবাদ প্রচলিত করেন (I. A. 1881) যে চষ্টন নহপনের পরবর্ত্তী এবং নহপনের পরাজয়কারী অন্ধ্র রাজগণের প্রতিনিধি মাত্র। বার্গেস্ 'পশ্চিম ভারতীয়' পুরাকীর্ত্তি বিবরণীর চতুর্থ ভাগে ও 'ভিনসেন্ট স্মিথ' প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এই মতের পোষকতা করেন। পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজী পূর্ব্বে বিভিন্ন মত পোষণ করিলেও, তাঁহার জীবনের শেষ গ্রন্থ ও তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত বোম্বাই গেজেটিয়ারের (Bombay Gazetteer) অন্তর্গত গুজরাটের ইতিহাসে চষ্টনকে নহপনের পরবর্ত্তী বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। বোম্বাইর সুপ্রখ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস' গ্রন্থেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ র‍্যাপসন (Rapson) তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত "অন্ধ্র, পশ্চিম ক্ষত্রপ, ত্রৈকুটক ও বোধী রাজগণের মুদ্রার তালিকা" নামক গ্রন্থে (Catalogue of the coins of the Andhra Dynasty, the W. Kh., the Traikutaka Dynasty, and the Bodhi Dynasty)' এই মতেরই পোষকতা করিয়াছেন। *

এক্ষণে দেখা যাউক পণ্ডিতমণ্ডলী কি কারণাবলীর উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ টলেমি কর্ত্তৃক চষ্টনের উল্লেখের বিষয় পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, চষ্টন টলেমির সমসাময়িক। টলেমি অনুমানিক ১৫০ খৃঃ অব্দে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং চষ্টন উহার দশ পনের বৎসরের মধ্যেই জীবিত ছিলেন। এই মতের অনুকূলে তাঁহারা আর একটি যুক্তি প্রয়োগ করেন। সুপ্রসিদ্ধ গির্ণার শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদমন ৭২ শকাব্দ অথবা ১৫০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং ইহা হইতেও অনুমান করিতে পারা যায় যে তাঁহার পিতামহ চষ্টন ইহার ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে কোন প্রবন্ধ রচনা উপলক্ষে আমি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইহার কোন যুক্তিই বলবৎ নহে। তৎকালে ইহার বিরুদ্ধে যে

* "All that is known as to the duration of Chashtana's reign is that it must be included together with the reign of his son Jayadaman in the period limited by the years 46 and 72 S = A. D. 124 and 150."

আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিলাম তাহা এই। টলেমি লিখিত বিবরণ হইতে এমন বুঝা যায় না যে চষ্টন তাঁহার সমসাময়িক। উজ্জয়িনীর উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন যে ইহা চষ্টনের রাজধানী। ইহা হইতে এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে, টলেমীর পুস্তক লিখিবার পূর্ব্বে উজ্জয়িনী নগরে চষ্টন নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকাল সম্বন্ধে এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে তিনি টলেমি কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থ লিখিত হওয়ার পূর্ব্বেই রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছেন। কতকাল পূর্ব্বে, ১০বৎসর, ২০ বৎসর, কি ১০০ বৎসর, তাহার কিছুই নিরূপণ করা অসম্ভব। কিন্তু মাত্র এই বিবরণ হইতে উভয়কে সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কোন হেতু নাই।

দ্বিতীয়তঃ গির্ণার শিলালিপি হইতে এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে রুদ্রদমন ১৫০ খৃঃ রাজত্ব করিতেন, কিন্তু তিনি কোন সময়ে রাজত্ব আরম্ভ করেন বলা যায় না। অসম্ভব নহে যে ১৫০ খৃঃ অঃ তাহার রাজ্যকালের শেষাংশ, তিনি ইহার বহু পূর্ব্বেই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পিতামহ যে ১৫০ খৃঃ অব্দের ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন এরূপ বলা যায় না।

সৌভাগ্যের বিষয় আমি এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছি যে আমার এই উভয় অনুমানই সত্য। চষ্টন নহপনের পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। সুতরাং পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমান ভ্রমাত্মক।

ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সুদক্ষ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় ১৯০৬ খৃঃ কচ্ছ প্রদেশের রাজধানী ভোজনগরে কয়েকখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হন। সেই বৎসরের 'পশ্চিম ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব (Arch. Sur. W. I.) বিবরণী পুস্তকে এগুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করেন। ইহার মধ্যে চারিখানি ক্ষত্রপ রুদ্রদমনের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ। এ সকলগুলিরই তারিখ—বর্ষ ২৫ ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া তিথি। এই শিলালিপিগুলির বিবরণ এখন পর্য্যন্ত কোন সুপরিচিত পত্রিকায় আলোচিত বা প্রকাশিত হয় নাই। আমি ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মূল কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "Five of these stone sare, on the whole well preserved and belong to the time of the W. Kshatrapas. Of these four refer to the reign of Rudradamana and all bear the same date viz. the year 52 on the 2nd day of the dark half of Phalguna."

এই লেখমালা হইতে জানা গেল যে, ৫২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৩০ খৃঃ অব্দে রুদ্রদমন রাজত্ব করিতেন।

রুদ্রদমনের মুদ্রায় লিখিত আছে, "রাজ্ঞো ক্ষত্রপস জয়দাম পুত্রস রাজ্ঞো মহাক্ষত্রপস রুদ্রদামস।"

আবার প্রথম রুদ্রসিংহের গণ্ডা ও জুনাগড় শিলালিপি ও রুদ্রসেনের যশধন শিলালিপি প্রভৃতি হইতে ক্ষত্রপ রাজগণের যে বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে আদি পুরুষ রাজা মহাক্ষত্রপ স্বামী চষ্টন, তৎপুত্র রাজা ক্ষত্রপ স্বামী জয়দমন ও তৎপুত্র রাজা মহাক্ষত্রপ স্বামী রুদ্রদমন এই তিনজন পর্য্যায় ক্রমিক রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

মুদ্রা ও শিলালিপির বিবরণের এই ঐক্য হইতে আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারি যে প্রথমে চষ্টন, তৎপরে জয়দমন এবং তৎপরে রুদ্রদমন ক্রমান্বয়ে এই তিনজন রাজা উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাক্ষত্রপ স্বামী নহপনের মন্ত্রী অয়ম কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি জুনারে পাওয়া গিয়াছে, তাহার তারিখ ৪৬ শকাব্দ। নহপনের 'মহাক্ষত্রপ' এই উপাধি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এই সময়ে অর্থাৎ ১২৪ খৃঃ অব্দেও তিনি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইহার কয় বৎসর পরে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন জানা নাই। এই কয় বৎসরকে 'ক' এই অক্ষর দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাউক। রুদ্রদমন ১৩০ খৃঃ

অব্দে রাজা ছিলেন। ইহার কত বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য আরম্ভ করেন তাহাও জানা নাই। এই সংখ্যাকে 'খ' দিয়া নির্দ্দেশ করা যাউক।

এখন পণ্ডিতগণের পূর্ব্বোক্ত মত যদি সত্য হয় অর্থাৎ চষ্টন যদি নহপনের পরবর্ত্তী হন, তবে চষ্টন ও জয়দমনের রাজ্যকাল নহপনের রাজ্যশেষ ও রুদ্রদমনের রাজ্যারম্ভ এ উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ চষ্টনের রাজ্যকাল+জয়দমনের রাজ্যকাল+ক+খ=৬ বৎসর (১৩০—১২৪)

ক ও খ কে যদি দুই দুই বৎসর করিয়াও ধরা যায় তবে চষ্টন ও জয়দমনের রাজ্যকাল মাত্র ২ বৎসর হয়। সাধারণ অবস্থায়ই ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু চষ্টনের রাজ্যকাল যে কিছু সুদীর্ঘ ছিল আমরা তাহার প্রমাণ পাই। প্রথমতঃ চষ্টনের মুদ্রা হইতে আমরা জানিতে পারি যে তাঁহার রাজত্বের মধ্যে এক সময়ে তিনি ক্ষত্রপ মাত্র ছিলেন, অন্য সময়ে মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন। ইহা হইতে সূচিত হয় যে তাহার রাজ্য একেবারে স্বল্পকাল-স্থায়ী ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, টলেমি উজ্জয়িনী নগরীর নাম উল্লেখ করিতে যাইয়া রাজা চষ্টনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে চষ্টন দীর্ঘকাল উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং উজ্জয়িনীর সহিত তাঁহার স্মৃতি এতদূর জড়িত ছিল যে উজ্জয়িনীর উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি তাঁহারও নামোল্লেখ করিয়াছেন।

এ স্থলে তর্ক উঠিতে পারে যে চষ্টন টলেমির সমসাময়িক বলিয়াই তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সিদ্ধান্ত সম্ভবপর নহে। সুতরাং অতঃপর চষ্টন যে টলেমির গ্রন্থ লিখিবার সময় জীবিত ছিলেন না তাহাই প্রমাণিত করিব। টলেমি যে ভাবে উজ্জয়িনী নগরীর বর্ণনা উপলক্ষে চষ্টনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন সেইরূপ প্রতিষ্ঠান নগরীর উল্লেখ কালে তাহার রাজা 'সাইরো পোলেমেইয়সেরও' (Siro Polemaios) উল্লেখ করিয়াছেন। এই পোলেমেইয়স যে অন্ধ্ররাজ গৌতমিপুত্র শাতকর্ণির পুত্র বাশিষ্ঠি পুত্র শ্রীপুলমায়ি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুলমায়ির রাজ্যারম্ভকাল ১৩০ খৃঃ অব্দের পরে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বিস্তৃত প্রমাণ এখানে অনাবশ্যক। 131+X A. D. অর্থাৎ ১৩১ খৃঃ অব্দের অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বৎসর পর, র‍্যাপসন্ প্রদত্ত তাঁহার এই রাজ্যকাল-সংজ্ঞা অবিসংবাদিত বলিয়া বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। টলেমি যখন এই রাজা পুলমায়ির নামোল্লেখ করিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে তাঁহার গ্রন্থ ১৩১ খৃঃ অব্দের পরে লিখিত। সুতরাং চষ্টন এ সময় জীবিত থাকিতে পারেন না, কারণ তাঁহার পৌত্র রুদ্রদমন ১৩০ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত দুইটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া চষ্টনকে নহপনের পরবর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

১। চষ্টন টলেমির সমসাময়িক।

২। তাঁহার পৌত্র রুদ্রদমনের রাজ্যকাল ১৫০ খৃঃ

এই উভয় ধারণাই যে ভ্রমাত্মক তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। সুতরাং চষ্টনকে নহপনের পরবর্ত্তীকালে স্থাপন করিবার কোন কারণ নাই।

আমরা আরও দেখাইয়াছি যে চষ্টনকে নহপনের পরবর্ত্তী বলিয়া ধরিলে, চষ্টন ও জয়দমনের রাজ্যকাল অনধিক ২ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা অসম্ভব।

সুতরাং চষ্টন নহপনের পরবর্ত্তী হইতে পারেন না, নহপনের পরাজয়কারী অন্ধ্ররাজার প্রতিনিধি হওয়া তো দূরের কথা।

এখন চষ্টনের রাজ্যারম্ভ কোন সময়ে হইয়াছিল তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

রুদ্রদমন ৫২ শকাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। সাধারণতঃ পুরুষানুক্রমিক চারিজন রাজার রাজত্বকাল ১০০ বৎসর ধরা হয়। সুতরাং চষ্টন ও জয়দমনের

রাজত্বকাল ৫০ বৎসর ধরিলে, শকাব্দের প্রারম্ভেই চষ্টন উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করেন, এইরূপ অনুমিত হয়। রুদ্রদমনের পুত্র ও চষ্টনের অধস্তন চতুর্থ পর্য্যায়ের রাজা দামজশ্রী ১০০ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহা হইতেও চষ্টনের রাজ্যারম্ভ শকাব্দ প্রারম্ভের নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয়। রুদ্রদমনের পুত্র ও পৌত্র ৭২ শকাব্দ হইতে ১২০ শকাব্দ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন। অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, তাঁহার পিতা ও পিতামহ ঐ পরিমাণ সময় রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাতেও চষ্টনের রাজ্যকাল শকাব্দের প্রথম ৩।৪ বর্ষের মধ্যে পড়ে। আমরা জানি, নহপনের রাজ্যশেষ ও রুদ্রদমনের রাজ্যারম্ভ প্রায় সমকালেই ঘটে। সুতরাং নহপন ও তাহার পিতা ভূমককে জয়দমন ও তাহার পিতা চষ্টনের সমসাময়িক মনে করিতে পারি। নহপন ও ভূমক প্রায় ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং চষ্টন ও জয়দমন এ উভয়ের রাজ্য-কালও আমরা প্রায় ৪৮ বৎসর ধরিতে পারি। সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, চষ্টনের রাজ্যকাল শকাব্দের প্রারম্ভেই পতিত হয়। অপর পক্ষে, চষ্টন যে শক রাজগণের আদিপুরুষ তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। সুতরাং তাঁহার বংশীয় শকরাজগণ যে অব্দ ব্যবহার করিতেন, তিনি যে তাহার প্রারম্ভেই বিদ্যমান ছিলেন তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য। সুতরাং উজ্জয়িনীর প্রথম শকরাজ চষ্টন প্রায় ৭৮ খৃঃ অব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন ধরিয়া লইতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জৈনগ্রন্থোক্ত প্রবাদ অনুসারে বিক্রম সংবতের ১৩৫ বৎসর পরে, অর্থাৎ ৭৮ খৃঃ অব্দে শকগণপুনরায় উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছিল।

সুতরাং জৈন গ্রন্থোক্ত এই প্রবাদটি ঐতিহাসিক সত্যের উপর নিহিত বলিয়াই অনুমিত হয়। "ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য" ["প্রতিভার" এই সংখ্যার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সংখ্যায় প্রকাশিত] প্রবন্ধে অন্যবিধ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, জৈন প্রবাদ ও কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। উক্ত প্রবন্ধের পাঠকগণ বর্ত্তমান প্রবন্ধকে তাহারই অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মতানুযায়ী আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই ধারণা যে ভারতবর্ষীয় পুরাতন গ্রন্থাদিতে যে সমুদয় ঐতিহাসিক তথ্য আছে তাহার কোনই মূল্য নাই। এই দুইটি প্রবন্ধ দ্বারা এইরূপ মতেরই প্রতিবাদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে র‍্যাপসন্ যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন ২ তাহা দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের উল্লিখিত শিলালিপির আবিষ্কারের পরে, অথচ তাঁহার গ্রন্থে ঐগুলির কোন উল্লেখ নাই। ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁহার গ্রন্থ "ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের" (Early History of India) যে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, তাহাতে একস্থলে পাদটীকায় উহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে চষ্টন সম্বন্ধে তাঁহার মত যে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই, চষ্টন সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব ধারণাই অক্ষুণ্ণ আছে সুতরাং কতকটা পূর্ব্বেকার মত এবং কতকটা নবাবিষ্কৃত মত গ্রহণ করায় তাঁহার শক রাজগণের সময় নির্দ্ধারণটা কিছু অদ্ভুত হইয়াছে তিনি লিখিয়াছেন।

১২৬ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্র নৃপতি কর্ত্তৃক নহপনের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন।*

অন্যত্র "নহপনের বিনাশের পর পশ্চিম দিকের স্থানীয় শাসন ভার চষ্টন নামক একজনের প্রতি অর্পিত হয়।" †

---

* "In the year 126 A. D. the Andhra king utterly destroyed the power of Nahapana".

† "After the destruction of Nahapana the local government of the west was entrusted to one Chastana".

অথচ "১৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চষ্টনের পৌত্র, ক্ষত্রপ রুদ্রদমন পশ্চিম প্রদেশগুলির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।" ‡

এতদ্ব্যতীত আর একটু রহস্য আছে। চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদমন ১৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছেন এ কথা ভিনসেণ্ট স্মিথ স্বীকার করিয়াছেন। পুলুমায়ির রাজ্যারম্ভও, তিনি ১৩৮ খৃঃ অব্দে ধরিয়া লইয়াছেন। (In the year 138 A. D. Vilivayakura II was succeeded on the throne by Pulumayi II, the Siro Polemaios of Ptolemy)". অথচ তিনি বলেন, "চষ্টনের 'সমকালবর্ত্তী' টলেমি কর্ত্তৃক চষ্টনের উল্লেখ রহিয়াছে।" ("Chashtana is mentioned by his *contemporary* Ptolemy)."

ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক। নবাবিষ্কৃত সত্যের ফলে পুরাতন মত পরিত্যাগ না করিলে কিরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ মতের সৃষ্টি হয়, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

ভাটিয়াল গান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১৪)

(এটি ভগবানের নামে বিহ্বল ভক্তহৃদয়ের গান।)

মন পাগেলারে, আরে হরদমে গুরুজির নাম লইও।
(ওরে লইও নামটী পরম যতনে)
ওরে দিবা নিশি লইও নাম,
কামাই নাহি দিও।
ওরে ভাই বল, বন্ধু বল, সব সম্পদের সাথী,
ওরে অসময় নিদানকালে গুরুর নাম সারথি।
ওরে টাকা বল, কড়ি রে বল, সব পুরাণ হয়ে যায় ;
আমার গুরুজির নাম সদা নতুন রয়।

হরদমে = প্রতি নিঃশ্বাসে।
কামাই = বাধা।
নিদানকাল = শেষকাল।

(১৫)

আমি দোষী হইয়াছি,—
দোষী হইয়াছি—আমি শ্রীগুরু গৌরাঙ্গপদে
প্রাণ সঁইপাছি গো।
দোষী হইলাম ভাল হইল গো,—
তাতে ক্ষতি নাই ;—
ওগো যার জন্যে হইলাম গো দোষী—
তারে যদি পাই গো।
পরের মন্দ পুষ্প-চন্দন গো,—
ওগো অলঙ্কার গায়,—
নেইচে গেয়ে ব্রজে গো যাব—
নিতাই মাঝির নায় গো।

ভগবানের জন্য উন্মত্ত হইলে সাংসারিক লোকের নিকট অনেক সময় দোষীই হইতে হয় ;—অনেকে পাগল আখ্যাও পাইয়া থাকে! কিন্তু তাহাতে সেই প্রেমপাগলের কি আসিয়া যায়? তাহার উদ্দেশ্য তাহার প্রাণের দেবতাকে লাভ করা,—সে যদি সদ্গুরু সহায়ে সেই আনন্দধামের অভিমুখী হইয়া তার অভীষ্ট দেবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে সে অন্যের গালমন্দকে পুষ্পচন্দন বলিয়াই মনে করে।

(১৬)

ভেবে দেখলাম ভবনদীর নাইরে পারাপার।
আমি যেই দিকে চাই সেই দিকে দেখি অকূল পাথার।
উন্দুধুন্দু নইরাকারে, সে কথা মনে পইলে ফাপর করে,
চিন্তায় জ্বর জ্বরে—না দেখি উপায় (গুরু বিনে)।

---

‡ "Previous to 130 A. D. the Satrap Rudradamana, grandson of Chashtana, had assumed the government of the W. Provinces."

নৈরাকারে=নিরাকারে।
পইলে=পড়িলে।
ফাপর করে=দম বন্ধ হইয়া আসে।

সংসারের অনন্ত রহস্য ভেদ করিতে অক্ষম হইয়া এবং নিজের পরিণাম চিন্তা করিয়া মানব যখন চারিদিকে তমসাচ্ছন্ন দেখে তখন ভগবানকেই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হয়; এই ভাবটিই এখানে প্রকাশ করা হইয়াছে।

(১৭)

দুষ্ খু কইওরে—
নিঠুরের কাছে সই দুষ্ খু কইওরে।
সইগো সই, যেই কালে পীরিতি করলাম
যমুনার ঘাটে,—
ছাড়ুম্ না ছাড়ুম্ না বইলা—
হাত দিল মাথে রে।
সই গো সই, যখন গো পীরিতি করলাম
তুমি আমি জানি।
এখন কেন সে সব কথা—
লোকের মুখে শুনি রে।
সই গো সই, বট বিরিক্ষের তলে গেলাম
ছেওয়া পাইবার আশে,
পাতা ভেইদা রৌদ্ গো লাগে
আপন করম দোষে রে।

ছাড়ুম্ না=ছাড়িব না।
ছেওয়া=ছায়া।
ভেইদা=ভেদ করিয়া।

সরলা বালিকা বড় আশা করিয়া গোপনে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু হায়, যে প্রণয়ী কখনও তাহাকে ছাড়িবে না বলিয়া মাথায় হাত দিয়া শপথ করিয়াছিল, সে এখন ফিরিয়াও চাহিতেছে না! তাই সে গাহিতেছে:—

সই গো সই, বট্ বিরিক্ষের তলে গেলাম
ছেওয়া পাইবার আশে,
পাতা ভেইদা রৌদ্ গো লাগে
আপন করম দোষে রে।

(১৮)

গ্রাম্য-বিরহিণী সাংসারিক কায কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া তাহার স্বামীবিরহের কষ্টটা কোন প্রকারে ভুলিয়া থাকে; কিন্তু দিনান্তে যেই সে পাখীর "বৌ কথা কও" ডাক শুনিতে পায় অমনি তাহার সুপ্ত বিরহ উথলিয়া ওঠে,—তখন তাহার সন্ধ্যাদীপটি জ্বালিতেও ইচ্ছা হয় না,—বুঝি সে গৃহের অন্ধকারের সঙ্গে হৃদয়ের অন্ধকার মিশাইয়া বিষাদে ডুবিয়া রহিতে চাহে। আবার নিষ্ঠুর পাখী যখন নিশীথ সময়ে ডাকিতে থাকে তখন একটি একটী করিয়া কত স্মৃতিই না তার মনে জাগে—আর নলিন নয়ান ছল ছল করিয়া আসে! তখন সে তার চক্ষের জল থামাইয়া রাখিতে পারে না,—তাই পাখীকে করুণ স্বরে বলে:—

পাখী তোমার পায়ে ধরি মিনতি গো করি
আর আমায় জ্বালাইও না—আমার মাথা খাও
জ্বালাইও না—"বউ কথা কও" ব'লে গো ডাইকো না।

পাখী ডাকে সন্ধ্যাকালে,
আমি সন্ধ্যা দিতে যাই গো ভু'লে;
যদি ডাক নিশি কালে
আমি কাইন্দা ভিজাই বিছানা।

(১৯)

দিবা নিশি হরি বলে কে
—বান্ধবীর মায়রা
অহর্নিশি হরি বলে কে।
হরি বলে কে, গৌরাঙ্গ বলে কে
ওরে মনের সাধে হরি বলে কে
—বান্ধবীর মায়রা।

কে শুনাইলা এই হরির নাম,
গুণের বান্ধব বলি তারে,
ওরে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে কইরা
দয়াল নিতাই এইসেছে রে
—বান্ধবীর মায়রা।
হরি হরি হরি রবে মায়া-ঘুমের থনে
উঠ্লাম জেইগে ;—
হরির নামে পাষাণ গলে।
—বান্ধবীর মায়রা।
হরি হরি বইলে আমার নিতাই নাচে
বাহু তুইলে,
হরির নামে মন প্রাণ হরে
—বান্ধবীর মায়রা।

থনে=থেকে।

এ গানটি শুনিলে বুঝিতে পারা যায় কি প্রকারে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ মধুর হরিনাম প্রচার করিতেন, এবং তাহাতে কত মোহাভিভূত মানব মায়ানিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া প্রেমভক্তিলাভে ধন্য হইয়াছে। এখনও গ্রাম্য সাধারণ লোকেরা এই সব গান করিয়া, ক্ষণকালের জন্য সংসার ভুলিয়া, বিমল আনন্দ উপভোগ করে।

(২০)

এই না কালরূপ আমার লাগিল নয়নে গো—
কলঙ্ক রইল্ জলে।
ভরা না দুইফরের কালে জল ভরিবার যাই,
জলের ছায়ায় কৃষ্ণরূপ গো—(যেমুন) দেখিবারে পাই গো,
কলঙ্ক রইল্ জলে।
সব সখী লাল গো, নিল
গউর বরণ্ সাড়ি ;
শ্রীরাধার পৈরণে শোভে গো—
কৃষ্ণ নীলাম্বরী গো—
কলঙ্ক রইল্ জলে।

... ...

রইল্=রহিল। দুইফর=দ্বিপ্রহর।
ভরা না দুইফরের কালে=ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়।
যেমুন=যেমন। পৈরণে=পরিধানে।

সেই অসীমের রূপ কেমন করিয়া কাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে তাহা বুঝা যায় না। দিবা দ্বিপ্রহরে জল ভরিতে যাইয়া শ্রীরাধার জনৈকা সখী নদীসৈকতে প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে সেই অনন্ত শোভার নিদান শ্যামসুন্দরের রূপ দেখিতে পাইল, আর অমনি সেই রূপ তাহার নয়নে লাগিয়া গেল। কলনাদিনী স্রোতস্বতীর জলেও যেন সেই ঢলঢল রূপের ছায়া পড়িল। সে দেখিল, অন্যান্য সখীরা কেহ লাল, কেহ বা "গৌর বরণ" সাড়ি পরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণা রাধিকা তাঁহার হৃদয়দেবতার বর্ণানুকারী "কৃষ্ণ নীলাম্বরী" পরিধান করিয়া আসিয়াছেন। তিনি যে কৃষ্ণভাবেই বিভোরা!

(২১)

হাস্যরসের অদ্বিতীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল "কালো রূপে মজেছে মন" গাইয়া শিক্ষিত সমাজে হাসির তুফান ছুটাইয়াছেন ; কিন্তু আমাদের গ্রাম্য কবি রচিত বক্ষ্যমাণ গানটিতেও পল্লীলক্ষ্মীর কুঞ্জকুটীর কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠে।—

আ-গো মা কাল জামাই ভাল লাগে না —
একে ত চিকন কালা, গলে দোলে বনমালা,
ওগো আমাবশ্যা রাইতে গো মা,
আমি চক্ষে তারে দেখি না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল

(শেষার্দ্ধ)

কোন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন সফলতাই যোগ্যতার পরিমাপক—Success is the only test of merit. কালিদাসও কহিয়াছেন, "আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্"। বলা বাহুল্য, মনোজ্ঞ হইলেও, সূত্রদ্বয়ের কোনটিই প্রকৃত মীমাংসা উপস্থিত করে না। সাফল্য কি, বা বিদ্বান্ কাহাকে বুঝিব? দেশকালের কোন অংশবিশেষকে ধরিয়া সাফল্য, বা পাত্রসমূহকে লইয়া বিদ্বন্মণ্ডলীর ধারণা করিব? পণ্ডিত টলষ্টয় তাহার what is art প্রসঙ্গে এই জাতীয় প্রশ্ন লইয়াই অনেক মাথা ঘামাইয়াছেন, কোন সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহাও নিশ্চিত যে, প্রকৃত মীমাংসাকে দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিতে না পারিলেও, সাহিত্যে এই আদর্শের বিচারই চিরকাল প্রচলিত। প্রত্যেকে আপনা-পন হৃদয়-প্রত্যক্ষের সাহায্যে বিচার করিতে থাকিলেও নিজের বহিঃ-স্থিত মণ্ডলীর উপরেই চরম বিচারটুকু রাখিয়া দেন; 'নিরবধি কাল এবং বিপুল পৃথিবীর" দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই প্রকৃত বিচার অভিমত প্রকাশ করিতে হয়। সাহিত্যে সাফল্য-ধারণার পক্ষে কিছু কাল অতীত হওয়া, এবং বহু বিদ্বানের মনোগত অভিমত স্পষ্টবাক্যে সংগৃহীত হওয়া চাই। মোটের উপর, বহু গুণজ্ঞ সমালোচকের ব্যাখ্যান, আলোচনা, আনুরক্তি এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রশস্তি ব্যতীত কোন কবি কিংবা কাব্যই আত্মপ্রকাশ করিতে বা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। সাহিত্যে গণতন্ত্রই দৃষ্টতঃ প্রবল বলিয়া তাহার বিচারমাত্রই বহুতা-সাপেক্ষ। ব্যক্তিগত ভাবে স্বয়ং নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেও, এই 'ক্ষেত্রে' রায় প্রকাশের সময় দশের মুখা-পেক্ষা করিতে হয়। কারণ, "বলবদপি শিক্ষিতানাং আত্মণ্যপ্রত্যয়ং চেতঃ"। দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলি ভাল লাগে কিনা প্রত্যেক পাঠকেই বলিতে পারিবেন; কিন্তু কি পরিমাণ ভাল লাগে, এবং 'ভাল লাগা উচিত কি না,' উহাই সাহিত্য বিচারের প্রণালী। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই উহাদের রস-নিষ্পত্তিগত দোষগুণ ন্যূনাধিক চিনিয়া লইতে পারিবেন; কিন্তু উহাদের শিল্প প্রতিপত্তি বা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে সহজেই সঙ্কুচিত হইবেন। কারণ শত দোষ সত্ত্বেও, কেবল এক-মাত্র দুর্লভ গুণের দরুণেও অনেক কবি এবং কাব্যকে সাহিত্য ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতেই দেখা গিয়াছে। সাহিত্য প্রতিষ্ঠা নামক ব্যাপারটি অনেক সময়ে দোষের বাহুল্যকে আদবেই গণনা করে না। বহু সহৃদয় ব্যক্তির প্রকাশ্য অভিমত এবং অজুহাত সঞ্চিত হইয়াই দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলির সুলভতা কিংবা দুর্লভতা প্রতিপন্ন করিতে পারিবে; এবং ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর আগ্রহের উপরেই উহাদের জীবন তত্ত্ব এবং প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব নির্ভর করিবে।

কিন্তু বর্তমান কালেও প্রকৃত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, তাঁহার সাহিত্য-জীবন এবং চরিত্রকে ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিতে হইলে, এই সমস্ত নাটকের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই সমস্ত নাটক দ্বিজেন্দ্রের পরিণত বুদ্ধি এবং হৃদয় এবং দীর্ঘকালের জীবন-সাধনার ফল। উহারা সাধারণে বহু পূজিত এবং পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হইতেছে! উহাদের বর্তমান প্রতিষ্ঠা অস্বীকার করা কাহারও সাধ্য নহে।

তবে, সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, সাধারণের দিকে দৃষ্টি রাখার দরুণ, দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলির প্রধান দোষ বা গুণ প্রায় সমস্তই এই সাধারণের গুণ বা দোষ হইতেই সম্ভূত হইয়াছে। এবং উহার গতিকেই তাহা-দের বর্তমান প্রতিষ্ঠা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিবে। কাব্যকলার হিসাবে উহার প্রধান দোষ হয়ত, ঘটনা-দৃশ্যের বাহুল্য, ঘটনাচক্রের মধ্যে এবং তদ্দ্বারা আবর্তিত চরিত্রগুলির মধ্যেও একটা দৃঢ়-সম্বদ্ধ ক্রমিক পরিণতি-

সূত্রের অভাব; চরিত্রের অঙ্কন কিংবা উপস্থাপনের মধ্যেও হয়ত, পরস্পর সহায়তার একটা ঘনীভূত কিংবা চূড়ান্ত ফলের দিকেও লেখকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ নহে। প্রত্যেক দৃশ্যকে কোন না কোন রূপ চিত্তাকর্ষক করিয়া শেষ করিতে পারিলেই হয়ত কবির প্রয়োগবিজ্ঞান চরিতার্থ হইয়াছে। পাঠকের অন্তরের দিকে লক্ষ্য না করিয়া—মর্ম্মপটে উপচীয়মান চিত্রের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কবি হয়ত অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গীয় দৃশ্য-চাকচিক্য-সৃজনের দিকেই অবহিত। কিন্তু এই সমস্ত শিল্প-দোষ সাধারণের প্রীতি কিংবা শিক্ষাসাধক দৃশ্যকাব্য-মাত্রের দোষগুণ বলিয়াই বিবেচিত হইবে; আবার ভাবুক বা সঙ্গীত সাধক কবিমাত্রেরই হয়ত ইহা সাধারণ দোষ; এবং অনেক সময় দোষই প্রগুণতা লাভ করিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা সাধারণ্যে বৰ্দ্ধিত করিয়া থাকে। তাঁহারা মনোমাদী ভাব কিংবা প্রাঞ্জল বাহ্যচিত্র উপস্থাপিত করিয়া, ভাবুকতার উদ্দাম তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় সামাজিকের হৃদয়কে নর্ত্তিত করিয়াই তাহাদিগকে আবিষ্ট করিয়া রাখেন। এই অবস্থায় কাব্যকলার নিখুঁত শিল্প-আদর্শ কিংবা অনবদ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলে পোষায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রধানতঃ সঙ্গীত কবি; এখন বঙ্গসাহিত্য গীতি কবিতার বা সঙ্গতে ভাব-সাধক কবিতারই যুগ। আমাদের নিরেট পদ্য সাহিত্য পর্য্যন্ত, আমাদের জাতীয় হৃদয়ের চিরন্তন লক্ষণ-গত এই ভাবুকতার রং ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র এই সঙ্গীত কবির হৃদয়টুকু লইয়াই স্বদেশী জীবন-সাধনার শক্ত মৃত্তিকার উপরে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক স্থলেই হয়ত জীবনের শক্ত বস্তুটাকে ন্যূনাধিক শক্তভাবে ধরিয়া উহার উপরে ভাবের রং ফলাইয়াছেন; আমাদের নাট্য সাহিত্যে বিশেষতঃ জাতীয় জীবনের বস্তু-সাধনার ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট মন-স্থিতার পরিচয় মুদ্রিত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ভিতরে দৃষ্টি করিলেই বুঝিবেন, সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে সঙ্গীত অধিকারের প্রণালী। অনেক সময় তিনি তাঁহার সঙ্গীত প্রতিভার লীলা সূত্ররূপেই যেন এক একটা দৃশ্য গ্রহণ করিয়াছেন; এবং সঙ্গীতগুলির সার্থকতা-উদ্দেশ্যেই দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে ছুটিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাটকীয় পাত্রগুলির কথাবার্ত্তার মধ্যেও অনেক স্থানে সঙ্গীত-জাতীয় উচ্ছ্বাস এবং রসোদ্গারই লক্ষ্য করিবেন; সময় সময় এক একটা কথা অপরূপ বিদ্যুৎ-বিভাসের ন্যায় সঙ্গীতের আকস্মিক আভোগ-মূর্চ্ছনার ন্যায় উচ্ছ্বাস প্রকট করিয়াই অচিরে বিলীন হইতেছে! বাক্যরীতির মধ্যেও সর্ব্বত্র এমন একটা তীক্ষ্ণ দীপ্তি এবং স্বল্প-নিঃশ্বাসযুক্ত স্ফূর্ত্তি আছে যে, সঙ্গীতের আকস্মিকতা দেখাইয়া মুহূর্ত্ত-মৃত সঙ্কেত বা ক্ষণ-ভঙ্গুর আভাষ মাত্র দিয়াই হয়ত উহা ম্রিয়মাণ হইতে থাকে! কিন্তু এই সমস্ত গুণ বা দোষের দরুণ দ্বিজেন্দ্রলাল অপরিহার্য্যতা লাভ করিয়া বর্ত্তমান হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রতিভা এবং প্রতিষ্ঠার এই লক্ষণ হয়ত এক কালে নিপুণ সাহিত্য-রসিক চক্ষে এই সকল নাটকের শিল্পগৌরব বেশীকম করিতে থাকিবে, এবং যোগ্যতর শিল্পী বা কুশলী কর্ত্তৃক এই ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত হইবার আশঙ্কাও কোন কালে পরিহার করিতে পারিবে না। অনবদ্য শিল্প-ঘটনা পরম সৌভাগ্যের কথা, কে সন্দেহ করিবে? কিন্তু কেবল শক্তিসংস্থান হইতেই এই সৌভাগ্য ঘটে না। জগতের কয়জন কবি এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন? নিজের শিল্প-প্রতিভার যোগ্যতাবশে, অথবা অদৃষ্ট-দেবতার অনুরূপ গতিবশেই হোক, দ্বিজেন্দ্র বঙ্গ-রঙ্গের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী আমরা, আমাদের জাতীয় জীবনের খাতায় ঐ ঘটনা হইতে নিঃসন্দেহে লাভ উদ্বর্ত্ত করিয়াছি। তারাবাই, দুর্গাদাস, প্রতাপরাণা বা মেবার-পতনের মধ্যে হয়ত (এই জাতীয় নাটক-রচনার শীর্ষ স্থানীয়) শিলারের ওয়ালেনষ্টাইন (Wallenstein), উইলিয়াম টেল (Wil-

দয়া-
চছে।
নিজের
তাঁহার
কারে
দর্য্য-

liam Tell) বা জোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc) এর ন্যায় স্থির-সংযত কবিত্ব প্রতিভা বা নিপুণ আদর্শ-সাধনা নাই; কিন্তু তথাপি উহারা নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক। প্রত্যেক পাঠকের হৃদয়ই তাহার সাক্ষ্য দিবে। শিলারের সমসাময়িক জর্ম্মণ জাতি মধ্যে জাতীয়তার জন্য তৃষ্ণা আমাদের ন্যায় এত প্রবল ছিল না; জর্ম্মণীর সামাজিকগণও আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর ছিলেন। শীলার তাঁহার বিষয়গুলির দিকে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য-সাধনার হিসাবে দৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। শীলারের পক্ষে যাহা বেশীকম বুদ্ধি-ব্যবসায়গত সৌন্দর্য্য-সমাধানে পরিণত হইয়াছিল, অবস্থা-গতিকে দ্বিজেন্দ্রের পক্ষে তাহা জাতীয় অভাব-পুরণের দুর্ব্বিষহ ক্ষুধা এবং অবিরাম 'দেহি দেহি' আহ্বানের পরিবেশন কার্য্যেই জাতসমাপ্ত! জর্ম্মণীর পক্ষে যাহা সাহিত্যরসের উপভোগ-সম্ভোগ আমাদের পক্ষে তাহাই অনিবার্য্য তৃষ্ণা! সাহিত্য-হয় না কে গুণীভূত করিয়াও এই তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি সাধনই দৃঢ়ভাবে ছিল। জগতের অন্য কোন সভ্যজাতির অবস্থাই আমাদের সঙ্গে তুলনায় নহে।

পন কিন্তু, স্থায়ী সাহিত্যের রীতি কিংবা আদর্শের ঘনতা সাধনায় দ্বিজেন্দ্র শীলারের সমকক্ষ না হইলেও, পরিব্যাপ্ত মহত্ব এবং পরিপ্লাবী হৃদয়োচ্ছ্বাসের ঘটনায় স্বদেশের জাতীয়তা-সাধনার ক্ষেত্রে তিনি শীলারকেও অতিক্রম করিয়াছেন; এবং এই বিষয়ে তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে 'মেবার-পতন' যে অতুলনীয়তা লাভ করিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ হয় না। এই কাব্যের "মেবার পাহাড়—মেবার পাহাড়" হইতে আরম্ভ করিয়া, "আবার তোরা মানুষ হ" বলিয়া পরিশেষের মধ্যে এমন একটা হৃদয়োচ্ছ্বাস, এবং ঐ উচ্ছ্বাসের পাকে-পাকে এমন অপরূপ আলোক-মধুর তরঙ্গ-ভঙ্গ, এবং সমগ্র শিল্প-সমাধানের মধ্যে এমন একটা সুমার্জ্জিত দীপ্তি আছে, ভারতের জাতীয় ব্যাধি এবং উহার প্রতীকার নিরূপণ আছে যে, সকল দিকে বিবেচনা করিলে উহা তাঁহার এই যুগের সর্ব্ব-গুণ-ঘনীভূত 'শ্রেষ্ঠ' প্রকাশ বলিয়া নিঃসন্দেহে উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমাদের জাতীয় জীবন-সাধনার চিরস্থায়ী সাহিত্য ভাণ্ডারে উহার স্থান নির্দ্দেশ করিতেও ইচ্ছা হয়।

দেশপ্রাণতা এবং জাতীয়তা! নীতিধর্ম্ম এবং সমাজের হিতার্থে আত্মোৎসর্গ! দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলি এই সকল আদর্শের ভাবোজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি উপস্থিত করিয়া বাঙ্গালীকে যেই শিক্ষাদান করিয়াছে, সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া এইরূপে লোকশিক্ষক হওয়াও কম সৌভাগ্যের কথা নহে। এই সকল নাটক চিরকাল বাঙ্গালীর সমুন্নত ভাব-প্রয়াণের গুরু এবং সহযাত্রী হইয়া থাকিবে! কবি এইরূপ পুণ্যব্রত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন যে, উহাদের মধ্যে মনুষ্য-হৃদয়ের কিংবা তাহার মেরুদণ্ডের অবসাদক কোনরূপ পরামর্শ বা ইঙ্গিত ইশারাও মুখ দেখাইতে পারে নাই; নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় He utterred nothing base. দ্বিজেন্দ্র যে সমস্ত দৃশ্যপরিকল্পনার সাহায্যে এই সকল নাটকের ভাব-প্রাণতা সিদ্ধ করিয়াছেন, ইহারা বঙ্গ সাহিত্যে অতুলনীয়! ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বা যোগ্যতর পরবর্ত্তী কর্ত্তৃক কখনো নির্জ্জিত হইবার আশঙ্কা ভবিষ্যতের অন্ধ গহ্বরেই নিহিত থাকুক! বর্ত্তমানের অভিনয়-রঙ্গে এবং জাতীয়তার প্রত্যক্ষ-শিক্ষা-ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

পূর্ব্বোক্ত মতে, দেশধর্ম্ম, দেশপ্রাণতা, সত্যনিষ্ঠা এবং তৎকল্পে আত্মোৎসর্গের আদর্শকে—নীতি-অধিকারের আদর্শকে—উপজীব্য করিয়া দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলি পাত্রগণের সুপরিচ্ছন্ন এবং সুদৃঢ় চরিত্র-রেখা উপস্থাপন পূর্ব্বক হৃদয়ে মুদ্রিত হইতেছে—মনুষ্যমনকে নির্জ্জীবতা এবং জড়িমা হইতে মুক্ত করিয়া দিতেছে! দ্বিজেন্দ্রের বিশিষ্ট চরিত্রগুলির পরিকল্পনাও (study) কি শ্রেষ্ঠ কবির যোগ্য নহে! তাঁহার নুরজাহান, আরংজেব বা চানক্য! উহারা এলিজাবেথ যুগের দুরাত্মা-চরিত্র (fiend) হইতে কতদিকে সমুন্নত, অথচ মনুষ্যত্বের নিগূঢ়

সত্যকে ভিত্তি করিয়াই দাঁড়াইয়াছে। এই study সম্পূর্ণ আধুনিক। উহারা ভারতবর্ষীয়—এবং এই ক্ষেত্রে সাহিত্য জগতে অতুলনীয়! নির্জলা দুরাত্মতা, কোন রূপ পুণ্যসম্পর্কহীন দুর্বৃত্ত চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থে নাই! দ্বিজেন্দ্রলাল কৌতুক-রসিক; কিন্তু এই কৌতুক ততটা বুদ্ধি-অধিকারের নহে; তাঁহার হাস্যোল্লাস সর্ব্বথা হৃদয় হইতে, নিজের সদয় সহৃদয়তা হইতেই উৎসারিত! তিনি বার-বণিতাকে পর্য্যন্ত মহত্ত্বর আলোকে মণ্ডিত করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। এই লক্ষণটুকুর মধ্যে সমস্ত লোকটার অধ্যাত্ম চরিত্রের রহস্যতত্ত্ব নিহিত আছে! তাঁহার নীতি-উপদেশও কুত্রাপি উপদেষ্টার অহংকৃত উচ্চ আসন হইতে, কিংবা ঘৃণা-গম্ভীর মুখ-রন্ধ্র হইতে বহির্গত হয় না! তাঁহার স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যেও নিখুঁত দুরাত্মা বা লেডী ম্যাক্‌বেথ জাতীয় স্ত্রী নাই! রমণীজাতির প্রতি একটা অন্তর্নিহিত সম্মানের ভাব হইতেই তাঁহার স্ত্রী-চরিত্রগুলি অঙ্কিত! কমলমণি, গিরিজায়া কিংবা শান্তি জাতীয় স্ত্রী-লোকই তাঁহার লেখনীমুখে পুনঃ পুনঃ আমাদের দৃষ্টিপথে আসিতেছে! মনুষ্যচরিত্রের অবিমিশ্র দুরাত্ম-ভাব তাঁহার দৃষ্টির অসহ্য!

ইহা ভারতীয় দৃষ্টি—এবং ভারতীয় সমাজের অংকিত ফল! যে দৃষ্টি মনুষ্য-জন্মকে প্রকট পুণ্যফলরূপে—জীবত্বের উদ্গতি সূত্রে সমুন্নত প্রাপ্তি বলিয়া ধারণা করে! যে দৃষ্টি রাবণাদিকে, দুর্গাসুর, মহিষাসুর প্রভৃতি ব্যতিক্রমকেও পুণ্য-অভিব্যক্তি-সূত্রের সহিত জন্মান্ত-বাদ এবং অভিশাপ-পতন প্রভৃতির সাহায্যে বিশ্বনীতির সহিত সম্মত করিয়া বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করে! ভারতবর্ষীয় সমাজে নিরবচ্ছিন্ন দুরাত্মতার সম্ভাবনাও দুর্ঘট! সমাজবন্ধনের বিশেষ আদর্শফলে এই সমাজে মধ্যম-শ্রেণীর ব্যক্তি-সংখ্যাই অধিক; বর্ত্তমান মানব-সভ্যতার সূত্রেই তাই ভারতবর্ষ কেবল মধ্য-পথসেবী এবং স্থিতিশীল! এই অতর্কিত আদর্শ এবং সমাজ-পরিবেশের দরুণেই দ্বিজেন্দ্রের দুরাত্মা-সমূহ তৃতীয় রিচার্ড বা আয়াগো লেডী ম্যাকবেথ, গনিরীল বা রীগাণ হইতে পারে নাই। এই লক্ষণটুকুর মধ্যে সমস্ত লোকটার অধ্যাত্ম চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি আছে! এই রঙ্গ-প্রিয় এবং ভিতর-বাহির-খোলা, এই দোষে-গুণে সরল এবং সহৃদয় ব্যক্তিই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল! প্রথম পরিচয় এবং আলাপের দিনেই লোকটা তাহার সমগ্র চরিত্রটি নিরাবরণ করিয়া আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। মনুষ্যত্বের হিসাবেও ইহা একটা পরম দুর্ল্লভ গুণ বলিয়া মনে করি।

ভিতর চরিত্রের এই ভাবসমুন্নত সরলতা হইতেই দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় সর্ব্বত্র ভাবোন্নত উচ্ছ্বাসের লক্ষণ সংক্রামিত হইয়াছে! উহা সম্পূর্ণ আধুনিকতার সম্পত্তি! উহা বিশ্বসাহিত্যের আধুনিকতা! ইংরাজীর ভিতর দিয়া, বঙ্গীয় পূর্ব্বাপর কবিগণের ভিতর দিয়া ইহা বঙ্গসাহিত্যে ন্যূনাধিক সাধারণ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু, দ্বিজেন্দ্র এই সাধারণতার ক্ষেত্র হইতেই নিজের অনন্য-সামান্য ব্যক্তিত্ব সিদ্ধ করিয়াছিলেন! তাঁহার ব্যক্তিত্বের এই মূল লক্ষণটুকুই সাহিত্যকলার অধিকারে সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা নামে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা নামক কথাটা, সাধারণ কবিতা-লেখকের পক্ষে, অনেক সময় প্রথম যৌবনের শারীরিক উন্মদনা-জনিত 'আনচান' বই নহে—মানসিক বিকার—ইন্দ্রিয়জন্য বিকার বই নহে। এই অবস্থারই প্রাচীন কবির ভাষায় বলা যায়ঃ—

যদাভূৎ অজ্ঞানং স্মরতিমিরমোহান্ধজনিতম্
তদা দৃষ্টং সর্ব্বং নারীময়মশেষং জগাদদম্।

এই যৌন তৃষ্ণাকে স্পষ্ট বর্ণনা কিংবা অস্পষ্ট ইঙ্গিতের সাহায্যে সংকেতিত করিয়া মনুষ্যদেহের স্নায়ুগত উত্তেজনা-সাধারণকেই সাধারণ লোক 'আধ-রস' বলিয়া ভুল করে—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বলিয়া মনে করে। কেবল বেচারা ভারতচন্দ্রের দোষ দিলে চলিবে না, অবস্থা-গতিকে অনেক বড় বড় কবির বেলাতেও এই

ভ্রান্তি ঘটিতে পারে! দ্বিজেন্দ্র মনুষ্য-হৃদয়ের মূল ভাবগুলির উপরে ভিত্তিস্থাপন পূর্ব্বক সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি-মন্দির পরমের দিকে—মহৎ বৃহৎ এবং প্রসারিতের দিকে উত্তোলিত করিয়াছেন। উহা চুড়া-শীর্ষে "কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ" বলিয়া আত্মবিলয় না করিলেও 'জগদ্ধিতায়' বলিয়াই আত্মোৎসর্গ করিতেছে! রসজ্ঞ মাত্রই বুঝিবেন, "জগদ্ধিতায়" এবং "কৃষ্ণায়" কত অভিন্নভাবে এবং অপরিহার্য্য ভাবেই সম্বদ্ধ। সৌন্দর্য্যের সাধক এতদুভয়ের যে কোনটা অবলম্বন করিয়াই পরমার্থে প্রবেশ করিতে পারেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সাধনপ্রণালী কিংবা সমাধান শ্রেষ্ঠ কবি-কৌলিন্যের যোগ্য কি না তদ্বিষয়ে বর্ত্তমানে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিলেও, ইহা নিশ্চিতমতে বলিতে পারি যে, তাহার কবিকৃত্যমধ্যে কোথাও উৎপথ-গামিতার পরিচয় নাই!

ঘননিহিত সৌন্দর্য্যবুদ্ধি, স্থিরসংযত দৃষ্টি, ভাবরসের স্থির প্রবাহিত প্রকাণ্ড কিংবা গভীর উচ্ছ্বাস, বিপুল-গভীর কিংবা পরিণাহী চরিত্রাঙ্কন এবং এই সমস্তের নিয়ামক ও সমস্ত কাব্যের অন্তরঙ্গীয় একটা সত্য-সন্ধ মূললক্ষ্য, এক কথায় অসাধারণ চমৎকার-বিধায়িনী কবিত্ব-প্রতিভাই কবিকে সাহিত্য-জগতের স্রোতোমধ্যে অটল করিয়া কৌলিন্য প্রদান করিতে পারে। বঙ্গ-সাহিত্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত পরিমাণে কিংবা সংখ্যায় স্বল্প সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যে একটি কবি-প্রতিভা অসাধারণ শক্তি-ক্রীড়া দেখাইয়া অকালে অন্তর্হিত হইয়া গেল, বঙ্গসাহিত্যের সাধারণ সমতল নানাদিক উন্নমিত করিয়া গেল, এই সাহিত্যের উপরিস্তরের স্বল্পসংখ্যক মহাজন-নামের তালিকামধ্যে নিজের নাম মুদ্রিত করিয়া গেল, আমাদের ইতিহাস তাহা কোন কালে অস্বীকার করিতে পারিবে না।

দ্বিজেন্দ্রের 'এবারত' বা রীতির মধ্যে যেমন একটা তীক্ষ্ণ দীপ্তি প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাঁহার চরিত্রাঙ্কণ প্রণালীর মধ্যেও তেমনি একটা সুমার্জ্জিত সীমা-পরিচ্ছিন্ন এবং রেখা ব্যবহারের প্রণালীও বোধগম্য; সময় সময় দৃঢ়-চঞ্চল অথচ বৃহৎ তুলিকা সঞ্চালনে বর্ণসৌন্দর্য পরিস্ফুট করার অপরূপ ক্ষমতাও প্রত্যক্ষ হইবে বঙ্গসাহিত্যে এই জাতীয় আর একজন শিল্পী গিয়াছেন—বঙ্কিমচন্দ্র। এই সাহিত্যে বঙ্কিমী গুণের উত্তরাধিকারী কেহ থাকিলে, তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল! এই কারণেই দৃঢ় এবং বৃহৎ তুলি-শিল্পী, স্পষ্টশিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্গ-সাহিত্যের সূক্ষ্মশিল্পী এবং রেখা-আভাস শিল্পীগণের—'অস্পষ্ট' শিল্পীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন; নিজের অধ্যাত্ম প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া, নানাদিকে উহা অপরিহার্য্য ছিল বলিয়াই এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমরা জানি, দ্বিজেন্দ্রের এই কার্য্যকে নানাজনে নানাভাবে গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ উহাকে কেবল দলাদলির ভাব কিংবা আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা বলিয়া কটাক্ষ করিতেও কসুর করে নাই। আমাদের মধ্যে চিরকাল সামাজিক দলাদলির ঝোঁক প্রবল বলিয়া সাহিত্যের spirit বা সাহিত্যসাধনার নিঃস্বার্থ ভাব অধিকাংশ লোকই বুঝে না বলিয়া, অনেকে 'সমালোচনা' জিনিষটাও বুঝে না। সাহিত্য কি পদার্থ, উহার ভালমন্দ বা দোষগুণ সমগ্রজাতির অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে বলিয়া, ঐ ভালমন্দকে কিরূপ নাছোড়-বান্দা ভাবেই সমালোচনা করিতে হয় আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সাহিত্য সমালোচনাকেও ব্যক্তিগত সম্পর্কের আমলে আনিয়াই গ্রহণ করি। এখন দ্বিজেন্দ্রলাল নাই, সুতরাং আলোচনার মধ্যে কোনরূপ ব্যক্তিগত 'ফোঁড়' থাকিলে তাহাও অন্তর্হিত। কিন্তু, আমরা দেখিতেছি, দ্বিজেন্দ্রের স্বকীয় শিল্প-আদর্শের হিসাবে, এই প্রতিষেধ উচ্চারণ না করাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল! নিজের বিপরীত সাহিত্য-আদর্শকে কেবল 'মূকার্পিতাঙ্গুলিসংধৈয়ের' পাশ-কাটিয়া যাওয়া তাঁহার অসাধ্য ছিল। বরং এই কার্য্যে তাঁহার

স্বকীয় বিশ্বাস-অনুগত সাহসের পরিচয়টাই পাইতেছি, এবং উহা হইতে বঙ্গসাহিত্যের লাভ দাঁড়াইয়াছে। আর আত্মপ্রতিষ্ঠা হইলেই বা কি? জগতে বিশেষতঃ সাহিত্য-জগতে এখন স্বার্থপরতা নাই, যদ্দ্বারা পরার্থও বিশেষভাবে লক্ষিত না হইয়া পারে! সাহিত্যজগতে ইহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ইংরাজী নবেলের ইতিহাসে দেখিব, রিচার্ডসন, স্কট, ফীল্ডীং ইহারা কেমন ক্রমান্বয়ে, একে-অন্যের আদর্শকে প্রতিসিদ্ধ করিয়া একে-অন্যের রচনার বিকৃতি বা সং দেখাইয়াও, সমগ্র ইংরাজী সাহিত্যের নবেলের 'আর্ট' কত দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন!

বরঞ্চ, দ্বিজেন্দ্রলালের এই কার্য্যকে আমরা বঙ্গ-সাহিত্যের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া মনে করি। বঙ্গসাহিত্যে দুইটি ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকিবে, যদ্দ্বারা এই সাহিত্যের জীবন বিশেষভাবে অগ্রসর করিয়াছে! অশেষ শুভই সাধিত হইয়াছে! প্রথমটি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দ্বারা হৃদয় খুলিয়া মধুসূদনের সমর্থন; দ্বিতীয়, দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক হৃদয় খুলিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রণালী-বিশেষের প্রতিষেধ। ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, এইরূপ কার্য্যে আসন্ন পক্ষগণের কিছুমাত্র লাভ নাই; বরং ব্যক্তিগত প্রীতি-সম্পর্কের হিসাবে বিশেষ ক্ষতি। প্রকৃত কবিমাত্রই নিজের সজ্ঞান-জাগ্রত এবং অপরিহার্য্য দোষ-গুণেই কবি। বিপক্ষীয় সমালোচনা কিংবা গালাগালির দ্বারাও কোন গঠিত-চরিত্র প্রকৃত কবির বিশেষ কোনরূপ লাভালাভ ঘটে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু সাহিত্যের পাঠক-সংঘ, বিশেষতঃ এই সাহিত্যের সেবকবৃন্দ এই কার্য্য হইতে যথেষ্ট লাভবান্ হইয়াছে। এই লাভের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে—কিন্তু সচেতন সাহিত্যসেবীমাত্রই আমাদের কথায় সায় দিবেন বলিয়াই মনে করি। এই প্রতিষেধ অত্যন্ত সুসময়ে উত্থিত হইয়া নিঃসম্পর্ক পাঠক যাহারা—তটস্থ যাহারা—যাহারা অগঠিত-মতি—যাহারা ভিড়ের মধ্যে সাহিত্যশিল্পের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ বা 'থিওরী' জানে না—চরমপন্থী আদর্শগুলির বিভিন্নতাও বুঝে না—যাহারা অজ্ঞান এবং অসতর্ক,—এক কথায় আমরা সর্ব্বসাধারণের অশেষ উপকার করিয়াছে! যাহারা সতর্ক হইবার, তাহারা সতর্ক হইয়া গিয়াছে!

দ্বিজেন্দ্রলাল সাহস করিয়া বলিয়াছেন, কাব্যে ন্যায়শাস্ত্রটাকে মানিয়া চলা একান্ত আবশ্যক—এবং রবীন্দ্রনাথ সময় সময় ন্যায়শাস্ত্রকে পদদলিত করেন! রবীন্দ্রনাথও ততোহধিক সাহসের সহিত বলিয়াছেন, ন্যায়শাস্ত্রটাকে মানিয়া চলিতে গেলে সকল সময় (?) ভাল কবিতা হয় না! এই উভয় সাহসিকতার মধ্য হইতেই আমরা লাভ উদ্বৃত্ত করিয়াছি।

ব্যারেট ব্রাউনীং ইংরেজী কাব্যের ছন্দঃশাস্ত্রটাকে ফ্লোরেন্সের সাগরজলে ডুবাইয়াছিলেন, তবু তিনি আজ ইংলণ্ডের মহিলা—মহলের শ্রেষ্ঠ কবি—পরম ছন্দঃ-ঐশ্বর্য্যশালিনী খ্রীষ্টিনা রসেটী বা বিপুল শক্তিসামর্থ্যবতী ফেলিসীয়া হীমেন্স এই পদ লাভ করিতে পারেন নাই! কবি কীট্‌স্ ইংরাজী শব্দশাস্ত্রকে "পদ্মবনে মত্তকরী সম" বিদলিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার একান্ত ভক্তগণও স্বীকার করেন! স্বয়ং বায়রণে এইরূপে Queen's Englishটাকে খুন করার দৃষ্টান্ত আছে! তবু ইহাঁরা চিরকালের বরণীয় কবি! পাঠকগণ অম্লানমুখে তাঁহাদের এই সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াই তাঁহাদের, কবিতার বিশিষ্ট রস-ভোগে প্রবৃত্ত হন। ইংরাজী বিদ্যালয়ে কীট্‌স্ ও বায়রণ অধীত হইতেছে—মুখবন্ধে মাথার দিব্য দিয়া বলা হইয়াছে—"সাবধান, ইহাঁরা এইরূপ উন্মত্ত, বাতুল এবং খুনে!" কিন্তু তাঁহাদের মাথায় না তুলিয়া উপায় কি? দ্বিতীয় ব্যারেট দ্বিতীয় কীট্‌স বা দ্বিতীয় বায়রণ জন্মাইলে ত! আমরা টের পাইয়াছি, সহস্র দোষের সন্নিপাতসত্ত্বেও কোন অপরূপ এবং অসাধারণ বিশিষ্টতার উপরেই

কবি-মাহাত্ম্যের প্রতিষ্ঠা! এই বিশিষ্টতা বা দুর্লভতা লাভ না করিয়া, সহস্র দিকে অশেষ-বিশেষ গুণ-গরিমায় একেবারে নৈকষ্য হইলেও কবি-কৌলিন্য লাভে যোগ্যতা জন্মে না! এই দুর্লভতার অভাবে কত কত গুণী-জ্ঞানী, ভাষা ন্যায়শাস্ত্র এবং ছন্দোবন্ধ বিষয়ে পরম বিশুদ্ধ-গন্ধের কবিও বিস্মৃতিনীরে হারাইয়া গিয়াছেন!

আমরা এই প্রসঙ্গের বহুস্থানে দ্বিজেন্দ্রকে একজন সঙ্গীত-কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল একজন জন্মসিদ্ধ গায়ক; এবং এই প্রতিভার বশবর্ত্তী হইয়াই উভয়ে অতুলনীয় সঙ্গীত-সম্ভারে বঙ্গ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করাইয়াছেন। ললিত কলার অধিকারে সঙ্গীতকে কাব্য হইতে একটা সতন্ত্র শিল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ফলে, সঙ্গীত বাক্যকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেও, ন্যায়পদার্থ কিংবা অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মাবলী অতিক্রম করিয়া কোনরূপ সুস্পষ্ট অর্থ-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়াও নিজের একটা মাহাত্ম্য এবং চমৎকারিতা সিদ্ধ করিতে পারে। সঙ্গীত-প্রতিভার কবিগণ সাহিত্যের আসরে আসিয়া গান ধরিলে তাহার নাম হয় গীতি কবিতা! অনেক সময় তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্গীত-কবিতা বই নহে। এই ভেদটুকু এখন আমাদের পক্ষে পদেপদে মনে রাখা আবশ্যক হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি অনুবাদিত হইয়া ইয়োরোপীয় জাতির সমক্ষে বাঙ্গালীর প্রতিভা প্রমাণিত করিতেছে। গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের একটা বিশিষ্টতা-সূচক-ভারতীয় বৈষ্ণব আদর্শের লক্ষণাক্রান্ত অধ্যাত্ম ভাবের নীতি কবিতায় বিশেষতঃ সঙ্গীত কবিতায় পূর্ণ। বিলাতের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ নূতন না ঠেকিয়া পারে না। কাব্য বিভাগের সূক্ষ্ম-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, ইয়োরোপীয় সাহিত্যের আধুনিক মানসিকতা বা বৌদ্ধভাবকে (intellectuality), ইয়োরোপীয় 'সিম্বোলিষ্ট' কবি-সম্প্রদায়ের আদর্শকে অতুলনীয় ভাবে আত্মস্থ করিয়া ভারতের প্রাচীন দ্বৈত আদর্শের আধ্যাত্মিকতার সহিত উহাকে সংমিলিত করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় কবিতার ক্ষেত্রে, এই সিম্বোলিষ্ট আদর্শের নেতা মৈতরলিংক অপরূপ প্রতিভা, অপিচ অপরূপ উদ্দামতা এবং খামখেয়ালীর বশবর্ত্তী হইয়া 'দৃষ্টিহারা' 'পিলিয়াস এবং মেলিসিন্দা' প্রভৃতি তরলার্থক এবং অপরূপ মূর্চ্ছা-পলাতক ইঙ্গিত-আদর্শের যেই সমস্ত গদ্য-কাব্য লিখিয়াছেন সেই সমস্ত যে আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' বা 'ডাকঘর' প্রভৃতি হইতে নিজেদের বিশেষ শিল্প আদর্শের মাহাত্ম্যে কত নিম্নে, ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টশিষ্যগণের, বিশেষতঃ বিলাতের বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে তাহা স্পষ্ট না হইয়া পারে না! ভারতবর্ষ নিজের প্রাচীন অধ্যাত্মিকতাকে ভালরূপে বুঝিয়া আধুনিক সাহিত্যের নামরূপে উহাকে আকারিত করিতে পারিলে এই দিকে তাহার জন্য পরম পূজা-গৌরব লাভের পন্থা রহিয়াছে। ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি। নয় বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য পত্রিকায়, "বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম প্রাচীন বেদ উপনিষদের যে পাবনী ভাব-ধারা এতকাল আর্য্য-রক্তের সঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে. তাহা বাঙ্গালী এখনো জগতের সমক্ষে অনুরূপ সাহিত্যমূর্ত্তি প্রদানে প্রকাশ করিতে পারে নাই। তাহা পারিলে সে সমগ্র জগতের বিস্ময়স্থলী হইবে।" আমাদের রামমোহন, কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ প্রভৃতি এবং পরিশেষে এই রবীন্দ্রনাথ বিলাতী খ্রীষ্টানগণের এবং খ্রীষ্টান সাহিত্য-সেবীগণের উচ্ছ্বাসিত সাধুবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন! * উহার হেতু কি? আমাদের দেশের এই সকল সুপুত্র, উহাদের কোন নাড়ী টিপিয়া, হৃদয়ের কোন রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া, এই সম্মান আয় করিয়াছেন? বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে বাঙ্গলী কোন্

* বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ এই প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হইবার অনেক পরে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রঃ সঃ

একটা বিশেষত্বের নির্ভরে দাঁড়াইতে পারেন? এই ঘটনার ভিতর এই সকল প্রশ্নের একটা মীমাংসা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের আত্মবোধ এখনো এই দিকে উপযুক্ত ভাবে বা ব্যাপক ভাবে জাগ্রত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের এই বিলাতযাত্রা একদিকে সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য সূচনা করিতেছে! ইহার পর হইতে, ইয়োরোপীয়গণ আগ্রহ সহকারে আমাদের সাহিত্যের মতি-রতি এবং গতি পরিদর্শন করিতে থাকিবে! প্রকৃত সহৃদয় থাকিলে, সমজদার থাকিলে তাহা ইয়োরোপে আছে! আমাদের দেশে সমালোচনা বলিয়া পদার্থ এখনো জন্মলাভ করে নাই। ইয়োরোপীয় সমজদারগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে না পারিলে আমাদের আত্ম সম্মান বা প্রকৃত আত্মবোধ জন্মিবারও সম্ভাবনা নাই! আমাদের সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে দর্শনে, সর্ব্বত্র এখন এই অবস্থা! আমরা এই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত প্রতিভা পরম মহার্থ বলিয়াই মনে করি। তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে, সঙ্গীত কবিতাগুলি চয়ন পূর্ব্বক একটা অপরূপ গীতাঞ্জলি রচনা করিতে পারা যায়! বাস্তবিক এইকালে, চয়ন-গ্রন্থ ব্যতীত সাহিত্যিকগণের প্রকৃত মাহাত্ম্য জ্ঞানের অন্য কোন উপায় নাই। মুদ্রাযন্ত্র এবং সাময়িক পত্রিকার অবিশ্রাম দাবী-দাওয়ার মধ্যে পড়িয়া কবিগণ যখন-তখন এবং যাহা-তাহা লিখিতে বাধ্য হইতেছেন। উপযুক্ত পাত্রের দ্বারা, তাঁহাদের বিশিষ্টতা-জ্ঞাপক শিল্পগুলির সংগ্রহ ব্যতীত, সমস্তই এ কালের বিগহন জনতা এবং বেচা-কেনার হলহলার মধ্যে হারাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। দ্বিজেন্দ্র লালের মধ্যে ভারতীয় বিশেষ আদর্শের আধ্যাত্মিক দন্তোদ্গম হইবার সময়-যোগ ঘটে নাই; তাঁহার জীবনে উহা হয় ত আরো কিছুকাল পরে উপস্থিত হইত—তাহার উপক্রমও দেখা দিয়াছিল সুতরাং অকালেই মহাকালের শমন আসিয়া তাঁহাকে আমাদের মধ্য হইতে পরপারে আহ্বান করিয়াছে! তথাপি, তাঁহার সঙ্গীতাত্মক কবিতাগুলি সমূহিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিলে, তাঁহার মধ্যে একটা 'অনির্ব্বচনীয়' এবং চমৎকারী'—(এ গুলি সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের প্রাচীন কথা), 'অস্পষ্ট বলিলে হয়' ত দ্বিজেন্দ্রের পরলোকগত আত্মা রুষ্ট হইবেন—রসের সমাধান আছে এবং বিশেষত্ব আছে, যাহাতে এই কবি সঙ্গীত-কাব্য জগতের গণনীয় কবি-গণের মধ্যে—ভাবুক বা ভাব-সাধক কবিগণের মধ্যে নিজের স্থির-নির্দ্দিষ্ট পদবী লাভ করিতে, পারিবেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী বা সন্নিহিত বন্ধুগণের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি এই কর্ত্তব্য গ্রহণ পুর্ব্বক, এই চয়নিকা রচনা করিলে, ততোহধিক ইংরাজী ভাষার মধ্যে উহার যথার্থ অনুবাদ প্রকাশ করিলে, কবির চিরস্থায়ী স্মৃতি-রক্ষা বিষয়ে বঙ্গদেশবাসীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্যটাই সমাহিত হইবে।

শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন।

আর্য্য ঋষিদিগের প্রথম জন্তুপরিচয়ের বিচিত্রইতিহাস

(উত্তর কুরুবাসের প্রমাণ)

আর্য্যদিগের প্রথম জ্ঞান, প্রথম অভিজ্ঞতা বেদে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে এবিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই। তাঁহাদের প্রথম জন্তুজ্ঞান সম্বন্ধে বেদে যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা তাঁহাদের জাতীয় প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশেই কেবল আলোক বর্ত্তিকার কার্য্য করে তাহা নহে, কিন্তু ভাষার প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশেও আলোক বর্ত্তিকার কার্য্য করে।

বেদে সিংহ, হাতী, মৃগ, গো, অশ্ব, মহিষ, উষ্ট্র, মেষ, প্রভৃতি কয়েকটী জন্তুরই উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং

ইহাদের মধ্যে কোন্ জাতীয় জন্তুর সহিত ঋষিগণ প্রথম পরিচিত হন তৎসম্বন্ধে তথ্য নির্দ্ধারণ একেবারে সহজ সাধ্য নহে। ইহাদের সম্বন্ধে বেদের বর্ণনা নিবিষ্টভাবে আমরা যতদূর বিবেচনা করিতে পারিয়াছি তাহাতে আর্য্য ঋষিগণ যে প্রথমই মৃগজাতীয় জন্তুর সংশ্রবে আসেন তাহাই আমাদের নিকট বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়।

আমরা নিম্নে সিংহ, হাতী, অশ্ব, মৃগ, প্রভৃতি কয়েকটী প্রধান জন্তু সম্বন্ধে ঋষিদের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"মহিষাসো মায়িন শ্চিত্রভানবো গিরয়োন স্বতবসে রঘুষ্যদঃ।
মৃগাইব হস্তিনঃ খাদথা বনা যদারুণীষু তবিষীর্যুগ্ধ্বম্॥ ৭
সিংহাইব নানদতি প্রচেতসঃ পিশাইব সুপিশো বিশ্ববেদসঃ।
ক্ষপো জিন্বন্ত পৃষতিভির্ঋষ্টিভিঃ সমিৎ সবাধঃ সবসাহিমন্যবঃ"॥ ৮

১ম মণ্ডল—৬৪ সক্ত।

'হেমরুৎগণ! তোমরা মহৎ, প্রাজ্ঞ, সুন্দর দীপ্তিমান, পর্ব্বতের ন্যায় বলবান্ এবং শীঘ্রগতি; তোমরা করযুক্ত গজের ন্যায় বন ভক্ষণ কর, যেহেতু তোমরা অরুণ বর্ণ বড়বাকে বল প্রদান করিয়াছ"। ৭

"প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ সিংহের ন্যায় নিনাদ করেন। সর্ব্বজ্ঞ মরুৎগণ হরিণের ন্যায় সুন্দর; তাহারা (শত্রুর) বিনাশকারী, (স্তোতার) প্রীতিকারী, এবং ক্রুদ্ধ হইলে বিনাশক্ষম বলযুক্ত, এতাদৃশ মরুৎগণ তাহাদের বাহন মৃগের সহিত এবং আয়ুধের সহিত শত্রুপীড়িত যজমানদিগকে (রক্ষা করিতে) যুগপৎ আসিতেছেন"॥ ৮ রমেশ বাবুর অনুবাদ।

মরুৎদিগের বাহনরূপে মৃগের কল্পনাতে আমরা যেন আর্য্যদিগের স্মরণাতীত কালের বিলুপ্ত ইতিহাসেরই সন্ধান পাইতেছি। 'মৃগ' আর্য্যদিগের নিজ বাহনরূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই যে ইহা তাঁহাদের উপাস্য দেবতারও, বাহনরূপে কল্পিত হইয়াছিল, তাহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আর্য্যদিগের পরবর্ত্তী ইতিহাসে মৃগকে কোথায়ও বাহনরূপে কল্পিত দেখা যায় না। সুতরাং তাঁহাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রথম যুগেই যে মৃগ বাহনরূপে ব্যবহৃত হইত তাহাই আমাদিগকে অনুমান করিতে হয়। বর্ত্তমানে উত্তর মেরুবাসী ল্যাপল্যাণ্ডার (Lap lander) গণ কর্ত্তৃক যে গাড়ী (sledge) বহন জন্য বল্গাহরিণ (Reindeer) ব্যবহৃত হয় তাহা সকলেরই সুবিদিত। আর্য্যগণেরও উত্তর কুরুবাসকালে পূর্ব্বোক্ত যানেরই ন্যায় যানে মৃগের দ্বারা বাহিত হওয়া অসম্ভাবিত বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে যেমন ইউরোপের অন্যত্র অনুপযোগী বলিয়া ল্যাপ ল্যাণ্ডরেদিগের হরিণ বাহিত যানের প্রচলন হয় নাই তদ্রূপই উত্তর কুরু ভিন্ন অন্যত্র অনুপযোগী বলিয়া আর্য্যগণ তাঁহাদের আদি নিবাস ছাড়িলে পর নূতন দেশে মৃগ বাহন প্রচলিত হয় নাই ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রকারে বেদের প্রাগুক্ত বর্ণনায় আমরা আর্য্যদিগের উত্তর কুরু বাসেরই প্রমাণ আবিষ্কার করিতে পড়িতেছি!

বেদের পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋকে যে হস্তী, মৃগ শব্দের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে তাহাতে মৃগ ও হস্তীর মধ্যে একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রচ্ছন্ন ইতিহাসেরই যেন আভাস পাওয়া যাইতেছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধীৎসু দিগের দ্বারা উত্তর আশিয়া বা সাইবেরিয়াতে যে অতিকায় জন্তুকঙ্কালের বিশালক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই অতিকায় জন্তু প্রাচীন mammoth (ম্যামথ) বা হস্তিজাতীয় জন্তু বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। সাইবেরিয়া উত্তর কুরুরই বর্ত্তমান নাম। সুতরাং মৃগও হস্তীর যোগ যে আর্য্যদিগের উত্তর কুরু বাসেরই পক্ষে প্রমাণ দিয়া থাকে। তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

হস্তী যে বেদে মৃগের নামে পরিচিত হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে মৃগই আর্য্যদিগের প্রথম অভিজ্ঞতার বিষয় হয় এবং তৎপর যখন হস্তীর সহিত প্রথম

পরিচয় হয় তখন মৃগেরই ন্যায় ইহাকে পশুজাতি বলিয়া বুঝিতে পারিয়া ইহাকেও তাঁহারা মৃগ নামই প্রদান করেন কিন্তু হস্তীর শুণ্ডের দ্বারা মৃগহইতে বিশেষত্ব লক্ষিত করতঃ ইহাকে হস্তী বা হস্তযুক্ত এই বিশেষ নামে আখ্যাত করে। এইরূপে ইহার সম্পূর্ণ নাম 'হস্তীমৃগ' অর্থাৎ হস্তযুক্তমৃগ হয়।

"মৃগশব্দ" হস্তীশব্দের সহিত এইরূপে সংযুক্তহইয়া যে সাধারণ সংজ্ঞাশব্দে পরিণত হইতেছে তাহার স্পষ্ট প্রক্রিয়াই বেদে দেখিতে পাওয়াযায়। এখানে আমরা বেদের অন্য দুইটীস্থল উদ্ধৃত করিতেছি তাহা-হইতেই আমাদের উক্তির সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে।

"দনামৃগো নবারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে॥" ৮

ঋগ্বেদ ৮ম মণ্ডল ৮ম সূক্ত।

"(শত্রুগণের) অন্বেষণকারী হস্তী যেরূপ মদজল ধারণ করে, সেইরূপ ইন্দ্র যজ্ঞে মত্ততা ধারণ করে॥ ৮

"যুবাং মৃগেব বারণা মৃগণ্যবো দোষাবস্তোর্হবিষা-নিহ্বয়ামহে॥ ৪

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৪০ সূক্ত।

"যেরূপ ব্যাধেরা বৃহৎ বৃহৎ মৃগকে (হস্তিদিগকে) বাঞ্ছাকরে, তদ্রূপ তোমাদিগকে আমি দিবারাত্রি যজ্ঞের দ্রব্য লইয়া আহ্বান করিতেছি॥ ৪

রমেশ বাবুর অনুবাদ।

শেষোদ্ধৃত ঋকে আমরা হস্তীকে কেবল যে সাধারণ মৃগরূপে সংজ্ঞাদ্বারা উল্লিখিত পাইতেছি তাহা নহে, কিন্তু এক সাধারণ 'মৃগয়া' শব্দেরদ্বারা যে পশুশীকার বুঝায় "মৃগণ্যবঃ" শব্দ যে হস্তিশীকার অর্থে উদ্ধৃত ঋকে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে আমরা তাহার উৎপত্তি ইতিহাসও পাঠকরিতে পারিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত হস্তীর নামরূপে "মৃগ" শব্দের ব্যবহার হইতেই ইহা পশুর সাধারণ নামে পরিণত হইয়াছে আমরা দেখিতে পাই। তাহাতেই "পশবোহপি মৃগঃ" অভিধানে এইরূপ নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়াযায়। সিংহের 'মৃগরাজ' নামও পশুরাজ অর্থেই যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মৃগ যে আর্য্য ঋষিদিগের আদিযুগের পরিচিত জন্তু তাহার আরও বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে আর্য্য ঋষিগণের আশ্রমেও তপোবনে মৃগই আমরা প্রধান পালিত পশু-রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। এই পশু, ঋষিদিগের এইরূপ স্নেহের বিষয় ছিল যে ইহাকে তাঁহাদের পরিবার মধ্যেই পরিগণিত দেখাযায়। সংস্কৃত কাব্যে আমরা মৃগের প্রতি এই বৎসল্যভাবের বিশেষ মাধুর্য্য-পূর্ণ বিবরণ পাঠ করিয়া থাকি। আর্য্যগণের শৈশব কালের স্নেহ-বন্ধন দ্বারাই যেন এই সম্বন্ধটী বিশেষ রূপে মধুময় হইয়া রহিয়াছে। ইহা এরূপই মধুময় যে এরূপ মধুময় সম্বন্ধ আর্য্যদিগের আর কোন পশুর সহিতই দেখিতে পাওয়া যায় না।

মৃগের সহিত আর্য্য ঋষিদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচী-নতম সম্বন্ধের আর একটী প্রমাণ এই যে, মৃগমাংস আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পবিত্রও প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই মাংসদ্বারা যেমন দেবগণের পরিতৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে তেমনই পিতৃগণেরও পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে, যথা—"ঋষ্য খড়্গো রুরুশ্চৈব পৃষিশ্চ মৃগস্তথা। এতে বলিপ্রদানেচ চর্ম্মদানেচ কীর্ত্তিতাঃ।" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কালিকাপুরাণে ৬৭ অধ্যায়।

"ঋষী, খড়্গ, রুরু, ও পৃষি এই সমস্ত মৃগবলিদান-ও চর্ম্মদানে প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।"

যে দশবিধ পশু আমরা বলির জন্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাই তন্মধ্যে মৃগেরই প্রথম উল্লেখ দেখা যায় যথা—"মৃগচ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা। শল্লকী শশকো গোধা কূর্ম্মঃ খড়্গীদশস্মৃতঃ।" ইতি প্রকৃতি বাদে উদ্ধৃত।

"দ্বৌমাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রীণ মাসান্ হরিনেনতু। ঔরভ্রেণাথচতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চবৈ। ২৬৮

যন্ত্রাসান ছাগমাংসেন পার্ষতেনচ সপ্তবৈ। আটাবেনস্ত মাংসেন রৌরবেণ নবৈবতু। ২৬৯

মনুসংহিতা। ৩য় অধ্যায়।

পিতৃগণ মৎস্যদ্বারা দুইমাস, হরিণমাংসদ্বারা তিনমাস মেষমাংসদ্বারা চারিমাস ও পক্ষিমাংস দ্বারা পাঁচমাস তৃপ্তথাকেন।"

"ছাগমাংদ্বারা ছয়মাস, চিত্রিত মৃগমাংসদ্বারা সাতমাস এণমৃগমাংসদ্বারা আটমাস এবং রুরুমৃগ মাংসদ্বারা নয়মাস পরিতৃপ্ত থাকেন।"

মৎস্য হরিণ কৌরভ্র শাকুনিচ্ছাগ পার্ষতৈঃ। ঐণ রৌরব বারাহ শাশৈর্মাংসৈযথাক্রমম্। মাসবৃদ্ধ্যাভিতৃপ্যান্তি দত্তেনেহ পিতামহঃ।" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত শ্রাদ্ধ তত্ত্বম্।

"মৎস্য ও হরিণ, মেষ পাখী। ছাগ, নানাজাতীয় মৃগ, বরাহ, শশা প্রভৃতির মাংস প্রদত্ত হইলে পিতামহগণ যথাক্রমে এক এক মাস অধিক পরিতৃপ্ত থাকেন।

যাহার যেখাদ্য প্রিয় শ্রাদ্ধে তাহাকে সেই খাদ্যের উপহার দেওয়াই নিয়ম। এস্থলে পিতৃগণও পিতামহ গণের উদ্দেশে নানাজাতীয় হরিণ মাংস বলিরূপে প্রদত্ত হওয়ায় বিধান হইতে এই মাংস যে পূর্ব্ব পুরুষদিগের বিশেষ প্রিয় খাদ্য ছিল তাহাই অনুমান হয়। সুতরাং আমাদিগের আর্য্য আদিপুরুষদিগের হরিণমাংস ভক্ষণের প্রথা হইতেই যে শ্রাদ্ধে মৃগমাংস বলিরূপে প্রদত্ত হওয়া শাস্ত্রবিধি আবহমান কালহইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

মৃগের সহিত আর্য্যদিগের প্রথম পরিচয় হইতে তাঁহাদিগের উপর ইহার এরূপই উচ্চপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে মৃগের বিচরণ দেশকেই তাঁহারা পুণ্যদেশ ও আর্য্যবাসের উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই যথা—

"কৃষ্ণসারাস্ত চরতি মৃগোযত্র স্বভাবতঃ।
সজ্ঞেয়াজ্ঞিয়োদেশো ম্লেচ্ছদেশ স্তুতঃ পরঃ॥
এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্ত যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবেসদ্বৃত্তিকর্ষিতঃ॥" ২৪

মনুসংহিতা। ২য় অধ্যায়।

যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বাভাবিক ভাবে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, সেই দেশকে যজ্ঞীয় দেশ বলে, তদ্ভিন্ন স্থানকে ম্লেচ্ছদেশ বলা যায়।

দ্বিজাতিগণ প্রযত্ন সহকারে এই সকল পবিত্রদেশ আশ্রয় করিবেন। কিন্তু শূদ্রের আপন জীবিকার জন্য যে কোন দেশে বসতি করিতে পারে।"

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিশ্বাসী

যে বিশ্বাসে যে নির্ভরে তোমা দেবী, বেসেছিনু ভালো,
আধীর হৃদয়ে মোর চিরদিন জ্বালিবে তা আলো।
বিশ্ব যাক্ ভেঙ্গে চুরে—দ্রোহী হোক্ সকল সংসার—
তবু শুধু তুমি মোর—আমি প্রিয়ে, কেবলি তোমার!
তুমি আজ কত দূরে—কোন্ মহাসাগরের তীরে—
আমি বসে এই পারে, নিরাশা ঘিরিছে ধীরে ধীরে,
ভেঙ্গেগেছে সারা বুক—থেমে গেছে উচ্ছ্বসিত তান—
কিজানি মরণ কোলে কবে হবে নীরবে শয়ান!
সে নহে অসুখী তবু—প্রাণে তার বাজাইছে বাঁশী
তোমারি মধুর স্মৃতি—চির-স্থির সৌদামিনী-হাসি।
"আবার মিলন হবে" বলেছিলে তুমি কতবার,
সেত কভু খেলা নহে—আশ্বাস সে মহাদেবতার।
না জানি আসিবে কবে সে পবিত্র মাহেন্দ্র লগণ,
তাঁরি প্রতীক্ষায় শুধু জন্মে জন্মে বহিবে জীবন।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

নামিকো

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রলোভন

পয়লা সেপ্টেম্বরের পর দুইমাস, জুশির রৌদ্রালোকিত তীরভূমিতে প্রৌঢ়বয়স্কা পরিচারিকার সহিত এক রমণীকে বেড়াইতে দেখা যাইত। গ্রীষ্ম কাল আসিয়াছে, সহরের লোকেরা প্রায় সকলেই তখন বিদায় হইয়াছিল।

জেলেরা ও যে-সব পীড়িতেরা তখনো সেখানে ছিল, সকলেই রমণীর ছায়ার মত মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। যতবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, ততবারই তাহারা তাহাকে অভিবাদন করিত। তাহারা দুঃখের ইতিহাসের কিছু কিছু সকলেই জানিত।

রমণী নামি।

জীবনে কোনো আশা নাই, তবুও সে এখনও বাঁচিয়া আছে। নিরানন্দ শরৎকাল আবার ঘুরিয়া আসিয়াছে।

গত জুনমাসে মাসীমাতার সহিত নামি তোকিও গিয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে সে তার দুর্ভাগ্যের কথা জানিতে পারিল, তখন হইতেই ক্রমশ পীড়া গুরুতর হইতে লাগিল, রক্তবমন বাড়িতে লাগিল। চিকিৎসক কিছুই করিতে পারিলেন না, পরিবারস্থ সকলে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন, এবং সে নিজে সানন্দে মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। জীবন তাহার একটি সূতায় ঝুলিতেছিল। এক আঘাতে সহসা অতল গুহার অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া সে প্রেম বা ঘৃণা বোধ করিবার কোনো অবসর পাইল না। ভীষণ অবস্থার ভারে পীড়িত হইয়া সে কেবল মুক্তি চাহিতেছিল—মৃত্যুই মুক্তির একমাত্র উপায়, তাই সে মৃত্যুকামনা করিতেছিল। দেহ তার যখন পীড়াশয্যায় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, মন তখন পরপারে চলিয়া গিয়াছিল।

আজ বা কাল নশ্বর দেহ খসিয়া পড়িলেই জ্বালাময় জগৎকে পশ্চাতে ফেলিয়া তার আত্মা অসীম শূন্যের মধ্য দিয়া স্বর্গে ধাইয়া চলিবে। সেখানে সে মা'র কোলে শুইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবে। মৃত্যুর দূতকে এখন সে বরণ করিয়া লইবে। কিন্তু মৃত্যুও যে আসে না! প্রতিদিনই সে ভাবে যে সেই দিন তার জীবন প্রদীপ নিবিবে কিন্তু কোথায় অবসান? একমাস পরে, ইচ্ছা না থাকিলেও সে কতকটা সারিল, আর এক মাসে অবস্থা আর একটু ভালো হইল। আবার বাঁচিতে হইবে, অশ্রুসিক্ত দুঃখময় জীবন আবার বহন করিতে হইবে! অদৃষ্টের এ কি পরিহাস! জীবনে তার আনন্দ নাই, মৃত্যুতে ভয় নাই। আর কেন সে চিকিৎসকের অধীন থাকিবে, ঔষধ খাইয়া কেন ব্যর্থ জীবন বাঁচাইতে চেষ্টা করিবে?

কিন্তু আছে, পিতার ভালোবাসা আছে। তিনি মাঝে মঝে দেখিতে আসেন, স্বহস্তে ঔষধ দেন। তাহার স্বাস্থ্যের জন্য ছোট খাট সুন্দর বাড়ী তৈয়ার করাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে সরাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। যখনি সে পিতার পদধ্বনি শোনে, যখনি দেখে তার অবস্থার উন্নতি দেখিয়া পিতার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, অশ্রু তখন আর বাধা মানে না, দুই গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে। মৃত্যুর সাক্ষাৎলাভে অসমর্থ হইয়া পিতার জন্য সে শরীরের যত্ন লইতে লাগিল। আর একটা কারণ ছিল,—স্বামীকে সে সন্দেহ করে না। তাঁহাকে সে ভাল রকমই জানে, স্ত্রী-বর্জ্জনের দোষ তার উপর চাপানো যায় না। রোগশয্যায় যখন সে তার পত্র পাইল তখন স্বামীর উপর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হইল, সে অনেকটা সান্ত্বনা পাইল। অবশ্য ভবিষ্যতের কথা সে কিছুই জানে না। ভালো হইয়া উঠিলেও যে ছিন্ন বিবাহ-বন্ধন পুনরায় জোড়া লাগিতে পারে এ কথা সে মোটেই ভাবে নাই। কিন্তু সে তাহাদের আত্মার যোগে দৃঢ় বিশ্বাস করিত,

আর বিশ্বাস করিত যে, তাহাদের অনন্ত প্রেম কিছুতেই ধ্বংস হইবার নহে।

পিতার ভালোবাসা, স্বামীর প্রেমে স্থির বিশ্বাস ও সুচিকিৎসার গুণে নামির নির্ব্বাপিতপ্রায় জীবন-প্রদীপ আবার জ্বলিয়া উঠিল। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে আবার সে ইকু ও ধাত্রীকে লইয়া জুশির 'ভিলায়' আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে আসিয়া নামি সুস্থ বোধ করিল। স্থানটির নীরবতা তাহার মনে শান্তি আনিয়া দিল। যে দিন বৈকালবেলায় সমুদ্র গড়াইয়া দূরে সরিয়া যাইত ও নামি স্নান সারিয়া আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় পাখীর কলকূজন শুনিত, তখন মনে হইত বিগত বসন্তে কে যেন তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে, হয় তো বা তার স্বামী যে কোনো মুহূর্ত্তে তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইবেন।

এখানকার জীবন ছয় মাস পূর্ব্বে যেমন এখনো প্রায় তেমনিই আছে। ইকু ও ধাত্রীর সাহায্যে প্রত্যহ সে নিজের পরিচর্য্যা করে। চিকিৎসক প্রদর্শিত নিয়ম মানিয়া চলে। মাঝে মাঝে কবিতা রচনা করিয়া বা পুষ্প সাজাইয়া আনন্দ উপভোগ করে। সপ্তাহে তোকিও হইতে একবার বা দুইবার ডাক্তার আসিতেন, মাসী বা মাসতুতো ভগ্নীকে এত ঘনঘন দেখিতে পাইত না, বিমাতার সহিত কচিৎ কখনো দেখা হইত। তাহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া কোনো কোনো পুরাণো ইস্কুলের বন্ধু সহানুভূতি জানাইয়া পত্র পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সে-সব পত্রে আন্তরিকতার বড়ই অভাব। নামি কিন্তু তাহার মাসতুতো ভগ্নী চিজুর আগমনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞাতব্য সবই সে চিজুর নিকট জানিতে পারে।

বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইবার পর কাওয়াশিমা পরিবার তাহার নিকট হইতে দূর হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। সত্য বটে যে শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত প্রিয়ের চিন্তা দিনরাত তাহার মনে আনাগোনা করিত, কিন্তু তাহার শ্বশ্রূর কথা সে কখনো ভাবিত না। চেষ্টা করিয়া সে-চিন্তাকে সে দূরে রাখিত। বৃদ্ধা শাশুড়ির কথা স্মরণে আসিলেই মন তার ঘৃণা ও বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহার ভাবনা টাকেই সে ভয় করিত, সে ভাবনা হইতে দূরে পালাইতে চাহিত। যখন শুনিল য়্যামাকির কন্যা কাওয়াশিমা পরিবারে প্রেরিত হইয়াছে, তখন স্বভাবতঃই সে একটু চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তের জন্য। সে জানিত যে তাহার প্রিয়ের সহিত এ ব্যাপারের কোনো সংস্রব নাই, তাহাকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। সাগামি উপসাগরের বালুকাময় তীরভূমিতে ছোট একখানি 'ভিলায়' বাস করিলেও মন তাহার অহরহ পশ্চিমদিকে ধাবিত হইত।

পৃথিবীতে যে দুটি লোককে সে সর্ব্বাপেক্ষা ভালোবাসে, তাহারা উভয়েই চীনের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত। সে জুশি আসিবার অনতিকাল পরেই পিতা হিরোশিমা যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত বিদায় কালীন সাক্ষাৎ করিবার তাহার খুব ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, শরীরের খুব যত্ন লইয়া ভালো হইয়া উঠিয়া, তিনি জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে সে যেন প্রস্তুত থাকে। সে শুনিল তাকেও সম্মিলিত রণপোত বাহিনীর অধিনায়কের জাহাজে নাই। তাহার ভয় হইল, যদি তাকেও পীড়িত হইয়া পড়ে তো প্রয়োজনের সময় যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিবে না। যদিও সে নিশ্চিত বুঝিয়াছিল যে এ পৃথিবীর সহিত তাহার আর কোনো সংস্রব নাই, তবুও নামি দিনরাত স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধের চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া রহিল, দেশের ও পিতার অক্ষুন্নতা ও তাকেওর সফলতার জন্য চিন্তান্বিত অন্তঃকরণে সে সংবাদপত্র পাঠে মন ডুবাইয়া দিল।

সেপ্টেম্বরের শেষে সে ইয়ালুর যুদ্ধের সংবাদ শুনিল এবং কয়েক্দিন পরে আহতের তালিকার মধ্যে তাকেওর নাম দেখিল। সে রাত্রে নামি ঘুমাইতে পারে নাই।

তোকিওতে তাহার মাসীমাতা তাকেওর অবস্থার কথা জানিয়া তাহাকে জানাইলেন যে তাকেওর আঘাত মারাত্মক নয় এবং সে এখন সাসেবোর হাসপাতালে আছে। সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু পতির রোগশয্যার পাশে তাহার মন ছুটিয়া চলিল, পতির জন্য সে যে কিছুই করিতে পারে না সেই কথাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল হৃদয়ে হৃদয়ে তাহারা অভিন্ন কিন্তু বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হওয়াতে দুঃখজ্ঞাপন করিয়া একখানা কার্ডও সে পাঠাইতে পারে না! এ দুঃখ রাখিবার কি ঠাঁই আছে!

ভাবিয়া ভাবিয়া সে একটা উপায় স্থির করিল। ইকুর সাহায্যে পতির জন্য কতকগুলি পোষাক তৈয়ার করিল। যে-সব ফল তাকেওর খুব প্রিয়, পোষাকের সহিত সেই ফল কতকগুলি ছদ্মনামে সাসেবো পাঠাইল।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল, অবশেষে নোবেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন সাসেবো ডাকঘরের ছাপমারা একখানি পত্র নামির হস্তগত হইল। পত্র পড়িয়া নামি অনেক কাঁদিল।

শনিবার সন্ধ্যা হইতে চিজু ও নামির ভগ্নী কোমা নামির কাছে ছিল। পরদিন প্রাতে তাহারা তোকিও প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহাদের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বাড়ী মুখরিত ছিল, এখন আবার তাহা স্বাভাবিক নিঃশব্দ নির্জ্জন ভাব ধারণ করিল। নামি সেই নিরানন্দ দিনে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া স্বর্গীয়া মাতার চিত্রের সম্মুখে একাকিনী বসিয়া রহিল।

আজ উনিশে নোভেম্বর। পৃথিবীতে মাতার জীবনের শেষ দিন। নামি ছবিখানি বাহির করিয়া ফ্রেমে পুরিয়া দেওয়ালে টাঙাইয়া দিল। চিজু যে ফুল আনিয়াছিল সেই প্রস্ফুটিত চন্দ্রমল্লিকা দিয়া ছবিখানি সাজাইল। কিছুক্ষণ ইকুর নিকট কৌতুকপূর্ণ গল্প শুনিয়া, এখন সে একাকিনী চিত্রের সামনে চিন্তায় নিমগ্ন।

দশ বৎসর পূর্ব্বে সে মাতাকে শেষবার দেখিয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একবারও সে তাঁর কথা ভুলে নাই। কিন্তু পূর্ব্বে কখনো তাঁর জন্য হৃদয় এত উতলা হয় নাই। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে সে তাঁর কাছে তার সব দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়া দুর্ব্বল স্কন্ধ হইতে দুঃখের ভার অনেকটা লাঘব করিতে পারিত। কেন তাঁর অসহায় সন্তানকে পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন? এই চিন্তা চোখে তার সুপ্ত অশ্রু জাগাইয়া দিল।

মাতার মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বেকার একটি সুখের দিন তাহার মনে পড়িল। তার বয়স তখন মাত্র আট বৎসর, তার ভগ্নীর বয়স পাঁচ। দুজনেই ঠিক একই রকম পোষাক পড়িয়াছিল—চেরি ফুল আঁকা গোলাপী রঙের ক্রেপের পোশাক। মাতাকে মধ্যে বসাইয়া গাড়ী চড়িয়া তাহারা কুদানের সুজুকির চিত্রশালায় গিয়াছিল। তাহার সামনের এই ছবিখানি সেই দিন সেখানেই তোলা হয়। দশ বৎসর স্বপ্নের ন্যায় অতীত হইয়া গেছে, ছবিতে যেমন তার মনেও তেমনি তার মাতা বিরাজিত, আর সে—

সে স্থির করিল নিজের কথা আর ভাবিবে না। কিন্তু কি করিবে? তার নিরানন্দ জীবনের কথাই যে ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে জাগিতেছে! তাহার বোধ হইল, তার নিরাশ জীবন যেন গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন, ঘরটা যেন একটা শীতল অন্ধকূপে পরিণত হইয়াছে, সূর্য্যের একটা ক্ষীণ রশ্মিরেখাও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না।

হঠাৎ ঘড়িতে দুইটা বাজিল। ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। দ্রুতপদবিক্ষেপে সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল, যেন পালাইতে চায়। সেখানে কেহ ছিল না। পশ্চাতে ইকু ও ধাত্রী কথা কহিতেছে শুনা গেল। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া সে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানে নামিল ও ফটক পার হইয়া তীরভূমিতে গিয়া পড়িল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শরৎকাল হইলেও গাঢ় পুঞ্জীভূত

মেঘ নামিয়া আসিয়াছিল। সমুদ্রের মূর্ত্তি কালো করাল। প্রকৃতি স্তব্ধ, কণামাত্র বাতাসও জলরাশিকে কম্পিত করিতেছিল না। সাগরের বক্ষে দৃষ্টি যতদুর চলে একখানা পালও কোথাও নাই।

নামি চলিতে লাগিল। আজ সেখানে কোনো ধীবর নাই, তীরভূমির উপর কেহ বেড়াইতেছে না। কেবল একটি ছোট মেয়ে একটি শিশুকে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া গান গাহিতে গাহিতে ঝিনুক কুড়াইতেছিল। নামিকে দেখিয়া সে স্মিতহাস্যে অভিবাদন করিল। নামি মাথা নত করিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল। পরক্ষণেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নত চোখে চলিতে লাগিল।

এইবার সে থামিল। বালুকাময় তীরভূমি যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে দাঁড়াইল। এখন হইতে একটা সরু পথ পাহাড়ের উপর দিয়া জলপাতের ধারে ফুদো মন্দিরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বিগত বসন্তে স্বামীর সহিত সে সেখানে গিয়াছিল।

সেই পথ ধরিয়া সে চলিল।

ফুদো মন্দির অতিক্রম করিয়া গিয়া একটা পাথরের উপর সে বসিল। গত বসন্তে এই পাথরটার উপরই সে পতির সহিত বসিয়াছিল। সে দিন আকাশ ছিল স্বচ্ছ নির্ম্মল, আর সাগর ছিল দর্পণ অপেক্ষাও মসৃণ। আজ কিন্তু আকাশ অদ্ভুত আকারের কালো মেঘে ছাইয়া গেছে, সাগর ফুলিয়া উঠিয়া একেবারে পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, আর তার মসীকৃষ্ণ বুকের উপর সাদা পালের চিহ্নমাত্রও নাই।

নামি পত্রখানি বাহির করিল। দ্রুতলিখিত কয়েক ছত্র মাত্র, কিন্তু নামির নিকট উহা মোলায়েম সুক্ষ্ম ভাষার দীর্ঘ গাঁথুনি অপেক্ষা অনেক অর্থপূর্ণ। "নামি সানের কথা না ভাবিয়া একদিনও কাটে না"—যতবার সে তাকেওর এই সরল উক্তি পড়ে ততবারই হৃদয় স্পন্দিত হইয়া ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয়।

জগৎ কেন তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে? সে তাহাকে এত ভালোবাসে, তবে তাহাদের বন্ধন ছিন্ন হইল কেমন করিয়া? এ পত্র কি তিনি তাঁর হৃদয়ের রক্ত দিয়া লেখেন নাই? এই পাহাড়ের উপরই তো গত বসন্তে তাহারা উভয়ে অঙ্গীকার করিয়াছিল চিরকাল অভিন্ন থাকিবে বলিয়া। সাগর সে কথা শুনিয়াছে, পাহাড় উহা চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। কেন জগৎ এত নিষ্ঠুর হইল, কেন তার লোহার পায়ে তাহাদিগকে পিশিয়া দিল? ওগো প্রিয়! ওগো দয়িত! এই পাহাড়ের উপরই গত বসন্তে—

নামি চোখ মেলিল। পাহাড়ের উপর সে একাকিনী বসিয়া। স্তব্ধ সমুদ্র সম্মুখে বিস্তারিত, পশ্চাতে কেবল প্রস্রবণ-ধারার নিরানন্দ ধ্বনি। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। শীর্ণ অঙ্গুলির মধ্য দিয়া অবারিত ধারায় অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

মনের মাঝ দিয়া চিন্তা-ধারা দ্রুতগতি ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার মাথা দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, বুকের ভিতর শীতল হইয়া গেল। নামি ভাবিতে লাগিল —পতির সহিত এখানে যখন ছিল তখনকার কথা, প্রথম যখন সে পীড়িত হইল, ইকাওতে যে সময় কাটাইয়াছে, যখন সে নববধূ ছিল তখনকার কথা। মাসীমাতার সহিত যে দিন তোকিও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, বৎসর আগে মা'কে যে দিন হারাইয়াছিল; মাতার মুখ, পিতার মুখ, বিমাতা ও ভাই বোনেদের মুখ, আরো কতজনের মুখ তার মনের মাঝ দিয়া ক্ষণপ্রভার মত অবিরত চমকিতে লাগিল। এইবার নামির চিন্তা তাহার এক বন্ধুর উপর গিয়া পড়িল। গতকল্য চিজু তাহার কথা বলিতেছিল। সে নামির চেয়ে দুই বৎসরের বড়। নামির বিবাহের এক বৎসর আগে এক চালাকচতুর নবীন কাউণ্টের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শাশুড়ী তাহাকে খুব পছন্দ করিতেন, কিন্তু তার পতি তাহাকে মোটেই ভালোবাসিত না। তাহার একটি শিশুও ছিল। স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য গত বৎসর

স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে অল্পকাল মধ্যেই মারা যায়। বন্ধু মরিল স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া, আর সে মরিতে বসিয়াছে স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া। বিচিত্র এই মানুষের অদৃষ্ট! কিন্তু সবই দুঃখ আর দুর্দ্দশা। নামি দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়া কালো সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

যতই ভাবে ততই তাহার মনে হয় এ পৃথিবীতে তাহার স্থান আর নাই। সঙ্গতিপন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া আট বৎসর বয়সে মাতৃহারা হইয়াছে. তারপর বিমাতার তত্ত্বাবধানে কত দুঃখকষ্টে দশবৎসর কাটাইয়া যেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখের অধিকারিণী হইল অমনি কাল-ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিল। তারপর যে শাস্তি লাভ করিল তা মরণ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। পতি তাহার প্রতি অনুরক্ত থাকিলেও তাঁহাকে পতি বলিবার বা আপনাকে তাঁহার স্ত্রী বলিবার অধিকার আর তাহার নাই। যদি এমন দুর্ব্বহ জীবন যাপন করিতেই হইবে তবে সে জন্মগ্রহণ করিল কেন? মাতার সহিত তাহার মৃত্যু হইল না কেন? কেন তাকেওর সহিত বিবাহ হইল? যখন প্রথম পীড়া হইল তখন সে পতির বুকে মরে নাই কেন? তাহার দুরদৃষ্টের কথা যখন জানিতে পারিল. তখনই বা সে মরিল না কেন? অসাধ্য রোগে যে ভুগিতেছে, অসম্ভব প্রেমের প্রত্যাশী যে, তার বাঁচিয়া থাকার আর কি প্রয়োজন আছে? আর রোগ যদি সারিয়াই যায় তবুও পতিকে না পাইলে সে তো বাঁচিতে পারিবে না. ভগ্নহৃদয় লইয়া মরিয়া যাইবে। মরণ! মরণ! মরণে ছাড়া আশা নাই!

নামি অশ্রু মুছিবার চেষ্টা করিল না, সমুদ্রের দিকে চাহিল।

ওশিমার দিকে সহসা কালো কালো মেঘের আবির্ভাব হইতেছিল, আকাশের সুদূর প্রান্ত হইতে একটা অবর্ণনীয় কোলাহল জাগিয়া উঠিতেছিল। চকিতের মধ্যে বিপুল সাগরে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। একটা দমকা বাতাস উঠিল। সেটা যেই বহিয়া গেল, অমনি কালো জলের মাঝে সহসা তুষারের মত ফেনপুঞ্জ প্রকাশিত হইল ও পাগলা ঘোড়ার মত বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া, নামি যে পাহাড়ের উপর বসিয়াছিল, তার গায়ে আছড়াইয়া পড়িল। সাগামি সমুদ্রের বারিরাশি ফেনিল হইয়া উঠিল, তরঙ্গের জল উন্মত্ত উল্লাসে ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি মাতামাতি করিতে লাগিল।

জলের ঝাট উপেক্ষা করিয়া নামি তখনো সমুদ্র দেখিতেছিল। সে ভাবিতেছিল—ঐ সমুদ্রের তলে মৃত্যু! জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই হয়তো স্বাধীন! নিরাশা লইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা নিরাকার ছায়ার মত পতির সঙ্গে নিয়ত বাস করা কি বাঞ্ছনীয় নয়? তিনি এখন পীত সমুদ্রে। হউক দূর, এই জলই তো সেখানেও বহিতেছে! সাগরের ফেনার মত আমি মিলাইয়া যাইব, আত্মা আমার তাঁর কাছে ছুটিতে যাইবে!

কোমরবন্ধের ভাঁজে তাকেওর পত্রখানা সযত্নে রাখিয়া নামি দাঁড়াইয়া উঠিল। বাতাসে কেশপাশ খুলিয়া পড়িল।

আকাশের অন্তস্থল হইতে অবিরাম বাতাস বহিতেছিল। কষ্টেসৃষ্টে নামি দাঁড়াইল। উপরে মেঘের দল পরস্পরের পিছু পিছু দ্রুত ছুটিয়া চলিতেছে, সম্মুখে সাগর ক্রোধে তোলাপাড়া করিতেছে। সাকুরা পাহাড়ের উপর বাতাস গর্জ্জিতেছিল. দেবদারু গাছগুলি অশ্বের কেশরের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। ঝড়ের চীৎকার, সাগরের গর্জ্জন, পাহাড়ের বিলাপ মিলিয়া মিশিয়া একটা বজ্রনিনাদে আকাশ ও পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

সময় আসিয়াছে! এই উপযুক্ত সময়! মা আমার হাত ধর! বাবা, তোমার কন্যাকে ক্ষমা কর! আমার অসম্পূর্ণ জীবন স্বপ্নের মত লুপ্ত হয়ে যাক!

কাষ্ঠপাদুকা খুলিয়া ফেলিয়া দুই হাতে পোষাক তুলিয়া ধরিয়া সে ফেনিল সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পশ্চাতে কে চিৎকার করিয়া উঠিল—কে তাহাকে দৃঢ় হস্তে আঁকড়াইয়া ধরিল।

শ্রীহেমনলিনী রায়।

কেশগুচ্ছ।

খোবানী, মনক্কা, আঙুর, সেউ প্রভৃতি মেবা লইয়া উটের পিঠে চড়িয়া বেলুচীস্থানের মরুপ্রান্তর পার হইয়া দুর্গম গিরিগাত্র বহিয়া জালাল রুমা প্রতি বৎসরই ভারতবর্ষে আসে; করাচি ও সিন্ধুনদীর উপকূলস্থান-গুলিতে তাহার বাণিজ্য-প্রসার। এই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া প্রতি বৎসর সে স্বদেশে ফিরিয়া যায়। ভারতের শস্যশ্যামল স্থান অপেক্ষা বেলুচিস্তানের বন্ধুর পর্ব্বতসঙ্কুল বালুকাময় প্রদেশ তাহার সমধিক প্রিয়। পর্ব্বতবুকে মূলা নদীর তীরে ক্ষুদ্র গ্রাম্য নীহারা—তাহার জন্মভূমি, তাহার চক্ষে নন্দন-কানন সদৃশ ছিল।

জালাল রুমা প্রতি বৎসরই করাচিতে আসিয়া খুসনারা নাম্নী এক দরিদ্রা অনাথা স্ত্রীলোকের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিত এবং তৎ বিনিময়ে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় একমুষ্টি অর্থ ঐ ইরাণী মহিলার করে দিয়া আসিত। ইরাণী ইহা পাইয়া যথেষ্ট লাভ মনে করিত, কাজেই তাহার অতিথির প্রতি যত্নস্নেহের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। দরিদ্রা ইরাণী তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল গৃহখানি অতিথির বাসের জন্য প্রদান করিত এবং তাহার অশন ও পরিচর্য্যা সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হইত. বিনিময়ে অর্থমুষ্টিও প্রাপ্ত হইত।

এই যত্ন ও স্নেহ যতই ঘনিষ্ঠতায় পরিপাক হইতে লাগিল, জালাম রুমার গৃহ-প্রত্যাগমনের সময় ইরাণী মহিলা তত বেশী শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল। খুসনারার মনে হইত, এবার জালাল রুমা দেশে না গেলেই ভাল হইত; হা! তাহার তা হ'লে অধিক অর্থপ্রাপ্তি ঘটিত। কিন্তু তাহার মন পূর্ব্বে অর্থের প্রতি যত আকৃষ্ট ছিল, এখন আর তদ্রূপ মনে হইত না। অর্থ অনাবশ্যক সম্পদের মত তাহার গৃহে জমিতে লাগিল।

অপরাহ্ণ রবির আখিজ্যোতিরেখা যখন জানালার ছিদ্রপথে কুঙ্কুমকনককণস্রাবের মত জালাল রুমার মুখে মাখাইয়া দিতেছিল, তখন খুসনারা আহার ও পানীয় লইয়া তাহার সমীপবর্ত্তী হইল। খুসনারা ভুলিয়া গিয়াছিল, কি জন্য সে সেই স্থানে আগমন করিয়াছে। সে মুগ্ধের মত হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে পিয়াসী চকোরের মত কাহার সৌন্দর্য্য পান করিতেছিল। জালাল আহারের প্রতীক্ষায়ই বসিয়াছিল, সে বহুক্ষণ খুসনারাকে নিস্পন্দ অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিল,—খুসন কি দেখিতেছ?

খুসনের স্বপ্ন চকিতে ভাঙ্গিয়া গেল, সে লজ্জাবনতমুখী হইয়া কোন রকমে আহার্য্যের থালখানা জালালের সম্মুখে রাখিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। সে সময় জালাল স্নেহপূর্ণস্বরে বলিল,—খুসন, কালই প্রাতে আমি দেশে ফিরিব, এবার আমি তোমাকে বেশী অর্থ দিয়া যাইব, যেন তোমার বাকী ক'মাস কষ্ট না হয়।

খুসনারা সলজ্জ ভাবে বলিল,—এবার কেন থেকেই যান না, এ দিকে কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখুন।

জালাল মৃদু হাস্যে বলিল,—না, বাড়ীতে সব রয়েছে, তাদের তো দেখ্‌তে হয়। এখানেই তো বছরের বেশী ভাগ থাকি।

খুসনারা বিষণ্ণ ভাবে বলিল,—প্রত্যেক বারই তো দেশে যান, আমার জন্য তো আপনাদের দেশ থেকে কিছুই আনেন না।

জালাল—এবার আনিব; বল, তোমার কি ভাল লাগে।

খুস—আপনার যা ভাল লাগে। আপনার দেশে

কি আছে আমি কি করে জানবো,—আপনার যা সব চেয়ে ভাল লাগে, যা দেখ্‌লে আপনার আপনার সব চেয়ে প্রীতি হয় তাই আনবেন।

"তা' আনবো বলে" পর দিন জালাল রুমা উটের পিঠে চড়িয়া দেশে যাত্রা করিল।

যতক্ষণ না সে চালগুজা ও পেস্তার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পার হইয়া দৃষ্টির বাহিরে গেল, তত ক্ষণ খুসন এক দৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বহুদিন পরে পুত্রকন্যা ও স্ত্রীর মধ্যে আসিয়া জালাল আনন্দে মত্ত হইল। বর্ষের দীর্ঘ আটমাসের স্মৃতি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে উদিত হইল না। এই আট মাস কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছে, তদ্দ্বারা স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া সে সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

জালাল রুমার স্ত্রীর নাম মজিনা খাতুন; জালাল তাহাকে আদর করিয়া কখনো "গুলগুলাব," কখনো "হি আসমান," কখনো "রঙীনা বুল" বলিয়া ডাকিত; বাস্তবিকই তাহার চিত্ত-সৌন্দর্য্য গোলাব ফুলের মত মনোরম, প্রেমিকা বুলবুলের মত সুধাপ্লাবী ও 'হি আসমান' বা যুথিকা ফুলের মত নত নম্র ছিল। তাহার দেহ-সৌন্দর্য্যও চিত্তশ্রীর অনুরূপ মাধুর্য্যে পূর্ণ ছিল। জালাল রুমাও বলিষ্ঠ সৌষ্ঠবপূর্ণ ও সুপুরুষ ছিল। তাহার বলিষ্ঠ দেহ যেমন কোন সময়ই কর্ম্মবিমুখ ছিল না. তাহার চিত্তও তেমনি স্নেহহীন ছিল না, সে সর্ব্বদা পরের উপকার করিয়া কৃতার্থ হইত। তাহার উপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধ কপর্দ্দকও অন্যায় রূপে ব্যয়িত হইত না। এ হেন স্বামী পাইয়া মজিনা বিবি যেমন তৃপ্ত হইয়াছিল, এ হেন স্ত্রী পাইয়া জালাল রুমাও তেমনি কৃতার্থ হইয়াছিল। আবার মেবা লইয়া জালাল রুমার ভারতবর্ষে যাইবার সময় হইল, সে ভারে ভারে মেবা সব বোঝাই করিয়া লইল। কাজেই সে সময় তাহার প্রবাসের আশ্রয় কুটীর-খানির স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইল, এবং তৎসঙ্গে প্রবাসীর সেই আশ্রয়দাত্রী অতিথিবৎসলা ইরাণী মহিলাকেও মনে পড়িল। ইরাণী মহিলার সেই অনুরোধের কথাও জালাল রুমা বিস্মৃত হয় নাই। কাজেই সে ভাবিতে লাগিল,—কি জিনিষ নিলে প্রকৃত পক্ষে ইরাণীর উপযুক্ত হইবে! সে বলিয়াছিল, আমার যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগে তাহাই লইয়া যাইতে—

জালাল স্ত্রীর নিকট যাইয়া বলিল,—আমি তো অনেক দিনের জন্য বিদেশে থাক্‌বো, তোমার একটা প্রিয় দ্রব্য আমাকে দেও।

মজিনা সহাস্য উত্তর করিল,—আমার আবার কি আছে, সকলি তো তোমার পদতলে বিক্রিত। আমার প্রিয় দ্রব্য তুমি ব্যতীত আর কিছুই নাই।

তখন জালাল বলিল,—আচ্ছা, ঐ যে তোমার মাথার সামনে ফণা ধরে এক গুচ্ছ কেশ রয়েছে তাই আমাকে দেও।

মজিনা তৎক্ষণাৎ কাঁচি লইয়া নিজের কুঞ্চিত কেশ-গুচ্ছটী কাটিয়া স্বামীর হস্তে অর্পণ করিল।

জালাল সেটী চুম্বন করিয়া নিজের ইজারের পকেটে রাখিল। তার পর স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে আলিঙ্গন ও ও চুম্বন করিয়া জালাল বিদায় গ্রহণ করিল।

মজিনা বিবি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর গেল। যখন জালালের উট প্রান্তর পার হইয়া একটা পর্ব্বতের প্রত্যন্ত দেশে গিয়া পড়িল তখন আর তাহাকে দেখা গেল না। মজিনা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিল।

মরু পর্ব্বত প্রান্তর দেশ পার হইয়া জালালরুমার উট করাচিতে আসিয়া পৌছিল। খুসনারা সযত্নে তাহার অভ্যর্থনা করিল।

পর দিবস খুসন জালাল রুমাকে বলিল,—দেখি আমার জন্য কি প্রিয় দ্রব্য আনিয়াছেন?

জালাল নিজের ইজারের বক্ষস্থ পকেট হইতে সেই কেশগুচ্ছটি হস্ত মুষ্টির মধ্যে রাখিয়া বলিল,—বল দেখি কি আনিয়াছি।

খুসনারার উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল. সে জালালের হস্ত ধরিয়া বলিল.—দেখি দেখি—কি আনিয়াছেন ?

জালাল সহাস্যে বলিল,—বলিতে পারিলে—

খুসন হাসিয়া বলিল.—আপনার প্রিয় দ্রব্য আমি কি করিয়া বলিব।

"এই নেও" বলিয়া ক্ষুদ্র কেশগুচ্ছটি জালাল খুসনের হাতে দিল।

খুসনারা এই কেশগুচ্ছ দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল, মনে করিল—এ কি !

জালাল খুসনের পূর্ব্ববৎ হর্ষ না দেখিয়া একটু বিমর্ষ হইল। খুসনারা বলিল,—এ কার—কোথা হইতে আনিলেন ?

জালাল রুমা হাস্য সহকারে বলিল.—এ আমার প্রাণ-প্রেয়সীর। তার চক্ষের উপর ফণা ধরে এই কেশগুচ্ছটি দুলতো, কি সুন্দর দেখাতো ! তুমি যদি দেখতে, নিশ্চয় খুসী না হয়ে থাকতে পারতে না।

খুসনারা খুব হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে হাসি তাহার প্রাণের কি না বলিতে পারি না।

খুসনারা সুন্দর কেশগুচ্ছটী লইল। কিন্তু ইহা তাহার শান্তিপূর্ণ জীবনের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিল। খুসনারা বুঝিতে পারিল, জালাল তদীয় স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত। ইহা যেন খুসনারার প্রাণে সহ্য হইল না। কাজেই এই কেশগুচ্ছটি, জালালের পূর্ণ প্রণয়ের প্রেমনিদর্শন-টুকু তাহার জীবনের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি না করিয়া ছাড়িল না। এই কেশগুচ্ছটি যেন মূর্ত্তিমান বিরোধ বাধার মতো তাহার প্রাণের মধ্যে আসন জুড়িয়া বসিল। এতদিন সে যে উচ্ছ্বসিত আনন্দ আবেগে মত্ত থাকিত. আজ যেন তাহাতে কি বাধা পড়িল। এখন তাহার প্রতি কর্ম্মের মধ্যেই যেন কি বাধা কি অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল :— শয়নে স্বপনে ভ্রমণে উপবেশনে সর্ব্বত্র যেন বাধা। এই বিঘ্নের কোন কারণও সে সম্মুখে খুঁজিয়া পাইল না। পূর্ব্বে তো তাহার কার্য্যে এমন বাধা উপস্থিত হয় নাই।

খুসনারা এবার অশেষবিধ যত্ন সহকারে অতিথির পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। খুসনারার আত্মীয়স্বজন কেহ ছিল না। বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যৌবনের সময় তাহার স্বামী লোকান্তরিত হইয়াছিল। অতিথিকে পাইয়া তাহার স্নেহপরিচর্য্যা যেন দিন দিন অধিকতর ভাবে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। অতিথির রোগে তাহার শয্যা-পার্শ্বে কল্যাণীরূপে; সারা দিনমানের পরিশ্রমের পর অতিথির পার্শ্বে বসিয়া আহার প্রদানে, এবং মানব জীবন যাপনের অশেষবিধ প্রয়োজনের একমাত্র পরামর্শদাত্রী-রূপে খুসন অবস্থান করিত।

রোগে কাতর হইয়া একান্ত বিষণ্ণ চিত্তে জালাল যখন একখানি স্নেহ-করুণার মুখ খুঁজিত তখন একমাত্র খুসনকেই দেখিতে পাইত! রোগসন্তাপকণ্টকিত দেহে একটু স্নেহস্পর্শ অনুভব করিতে যখন মন ব্যাকুল হইত, তখন একমাত্র খুসনের কোমল হস্তখানি তাহার দেহে অনুভব করিত। ক্রমে জালাল সে হস্তখানি যেন হৃদয়ের অভ্যন্তরেও খুঁজিয়া পাইল। কাজেই জালাল এবং খুসনের আভ্যন্তরীন দুরত্ব ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল।

এমন সময় আবার জালালের গৃহ প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত হইল। জালাল প্রবাসিনা স্নেহশীলার নিকট বিদায় লইতে গেল।

জালাল বলিল,—স্নেহশীলা, আমি এবার দেশে যাত্রা করি।

নিকটে একটা কপোত-দম্পতি চঞ্চু-চুম্বনে প্রেম জানাইতেছিল, তাহাদিগের দিকে চাহিয়া খুসন বলিল.—আপনি চলে গেলে ত আমার সব শূন্য হয়ে যায়, আমার বড় একেলা মনে হয়।

জালাল—আবার এই কয়েক মাস পরেই তো আসছি।

খুসন অধোমুখে বলিল,—আচ্ছা, এবার আমাকে কেন আপনাদের দেশে লইয়া যান না।

জালালের নিকট এ প্রস্তাব কেমন অসঙ্গত ঠেকিল! —এ ভিন্ন দেশের প্রবাসিনী, সঙ্গে যাইতে চাহিতেছে! তবু এর স্নেহ তো অস্বীকার করা চলে না!

জালাল ভাবিয়া বলিল,—তুমি অতো দূর দেশে কি করে যাবে, কত ভয়ঙ্কর স্থান দিয়া যেতে হয়! তুমি কি যেতে পারবে?

খুসন দৃঢ় ভাবে বলিল,—কেন পারবো না, খুব পারবো। নিয়ে যাবেন কি?

জালাল অগত্যা বলিল,—তবে চল।

কিন্তু সে ভাবিতে লাগিল, ইহাকে দেশে লইয়া গেলে স্ত্রীপুত্র ইহারা কি বলিবে, পাড়া-প্রতিবাসীই বা কি ভাবিবে! কিন্তু কি করিব, যখন বলিয়া ফেলিয়াছি তখন সঙ্গে লইতেই হইবে।

তারপর দিবস এক উটের পিঠে চড়িয়া দুজনে বেলুচীস্থানের দিকে রওনা হইল। গৃহে পৌঁছিয়া জালাল সস্নেহে স্ত্রীপুত্র কন্যাদিগকে চুম্বন ও আলিঙ্গন দিল।

মজিনা জিজ্ঞাসা করিল,—এ স্ত্রীলোকটী কে?

জালাল এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। প্রবাসিনী যে তাহাকে এত স্নেহ যত্ন আদর করিয়াছে, কি বলিয়া পরিচয় দিলে তাহার সমস্ত কথা বিজ্ঞাপিত হয়, জালাল তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না; অবশেষে বলিল,—এ আমার করাচীর সর্ব্বাপেক্ষা হিতৈষী বন্ধু, ইহার কুটীরেই আমি থাকি।

মজিনা বলিল,—দেশ ছেড়ে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ছেড়ে সে এখানে আসিল কি প্রকারে?

জালাল বলিল,—ওর কেহ নাই, আমিই সঙ্গে আনিয়াছি।

মজিনার মনে কেবলি প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, এ প্রবাসিনী এখানে কেন? এখানে তার প্রয়োজন? স্বামী তাহাকে একজন হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটী কি ভ্রষ্টা যে সে অনায়াসে একজন পুরুষের সঙ্গে এত দূর দেশে চলিয়া আসিল? স্বামীর চরিত্রে সে কিছুতেই সন্দেহ করিতে পারিল না, তবু তাহার মন কেমন অভিমান ঈর্ষায় দগ্ধ হইতে লাগিল!

মজিনা চিরকাল স্বামীর অনুগত, কিন্তু এবার সে স্বামীর প্রত্যেক কাজে কেমন বিরোধ উৎপানদ করিতে লাগিল। অন্যান্য বৎসর সে যেরূপ হাসিয়া নাচিয়া প্রাণ খুলিয়া স্বামীর সহিত প্রাণ মিশাইয়া কার্য্য করিত ও তাহার সেবাশুশ্রূষায় তৎপর থাকিত, এবার তাহার কিছুমাত্র পারিল না। কিসে যেন তাহার সমস্ত কার্য্যে বাধা উৎপাদন করিতে লাগিল। মজিনার এই প্রকার ব্যবহারে জালাল প্রাণে প্রাণে নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাহার মনেও অভিমান জন্মিল।

জালাল স্ত্রীর সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিলে সে যেন উপেক্ষার ভাবে সে স্থান পরিত্যাগ করে।

এতদিন মজিনা স্বামী-প্রেমের একনিষ্ঠ সেবিকা ছিল, আজ এ কী হইল!

জালাল ভাবিল, তবে মজিনা কি নিরর্থক আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া পাষণ্ড মনে করিল।

মজিনার এই প্রকার উদাসীন ভাবের জন্য সম্যক রূপে তাহাকে দোষী করা যায় না। সে পূর্ব্বের ন্যায়ই স্বামীর সহিত সোহাগ ভালবাসা দেখাইতে চায়, কিন্তু কি যেন তাহার প্রতি কার্য্যে বাধা উৎপাদন করে: সে শেষে নিজের ব্যবহার উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হয়, কিন্তু সংশোধনের কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পায় না।

এই ভাবে চার মাস কাটিয়া গেল, জালালের করাচিতে ফিরিয়া আসিবার সময় হইল।

খুবানী, আঙ্গুর, পেস্তা বোঝাই করিয়া জালাল ও খুসন এক উটের পিঠে চড়িয়া রওনা হইল। তাহা দেখিয়া মজিনা বলিল,—থামিন! আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

এক উটে এতগুলি লোকের জায়গা হওয়া অসম্ভব, কাজেই স্ত্রীকে রাখিয়াই জালাল হিন্দুস্থান যাত্রা করিল।

মজিনা একদৃষ্টে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল, উটের পিঠে থাকিয়া খুসনের মাথা কেমনে জালালের বুকে হেলিয়া পড়িতেছে, আর জালালের দেহ খুসনের দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছে।

উট যখন আর দেখা গেল না, মজিনার দুই চক্ষু বাহিয়া অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

* * *

জালাল রুমা খুসনকে লইয়া করাচীতে ফিরিয়া আসিল। এবার স্ত্রীর ঔদাসিন্য যেন তাহার স্নেহ-হীনতার পরিচয়পত্রস্বরূপ জালালের মনে হইল এবং এ দিকে সেবারতা প্রবাসিনীর স্নেহটুকু যেন অমল আভায় উজ্জল হইয়া উঠিল। জালাল স্ত্রীর প্রতি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল, এখন খুসনের ব্যবহারের তুলনায় তাহা যেন বিদ্বেষে পরিণত হইল। সে এতদিন মনে করিত, এই প্রবাসিনী অর্থের প্রলোভনে বুঝি তাহাকে এত স্নেহযত্ন করিয়া থাকে। এতদিন পরে সে স্নেহাতুর রমণীর সংগুপ্ত হৃদয়খানি আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তখন লোভাতুর রমণীর হৃদয়খানি বিচার-বিচার্য্য সূত্রে কাছে মোটেই ধরা পড়িল না। জালাল ভাবিল, কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা! কাজেই অতি সহজেই প্রবাসিনী খুসনের প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইল। এবার উভয়ের পরিচয়ের সীমা বন্ধুত্বের সংগোপন অবগুণ্ঠনকে উন্মুক্ত করিল এবং দুইজনে প্রেমালোকে পরস্পরের হৃদয়ের অসীম পরিসীমা দেখিতে পাইল। খুসন বিহনে নিজের হৃদয়ের একদিকটা যেন শূন্য বলিয়া জালালের মনে হইল। কাজেই অতি সহজেই খুসনের সৌভাগ্য উদিত হইল।

জালাল একদিন খুসনকে বলিল,—এ ভাবে আর আমরা পরস্পর পৃথক থাকি কেন?

অতি সহজেই খুসন এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। একদিন জালালের সহিত তাহার শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

সে বৎসর জালাল আর দেশে গেল না, করাচিতেই একখানি ছোট দোকান খুলিল।

দুই বৎসর জালাল স্বীয় গৃহের স্ত্রীপুত্রের কোন সংবাদ লইল না।

দুই বৎসর জালাল ও খুসন দাম্পত্য প্রণয়েই অতিবাহিত করিল। জালাল কিছুদিনের জন্য দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই, খুসন বিমর্ষ হয়, এমন কি দুই একদিন আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, বহু সাধ্যসাধনা ও বিনয়ের পর খুসন শান্ত হয়।

খুসন এখন আর কোন সময়ই জালালকে বেশীক্ষণ বাহিরে থাকিতে দেয় না, অন্তরে সর্ব্বদা শঙ্কিত চিন্তা, কি জানি জালাল দেশের লোকের সহিত কি পরামর্শ করে। খুসন নানাপ্রকারে জালালের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করে। জালাল এ সমস্ত শান্ত ধীর ভাবে সহ্য করিলেও মনে হয়,—এই কি খুসনের ভালবাসা? কই মজিনার ভালবাসায় তো এমন বিষমাখা নিষ্ঠুরতা ছিল না। খুসন নানাপ্রকারে জালালকে ত্যক্ত ও বাক্যবাণে বিদ্ধ করিলেও জালাল নিতান্ত সহজ ভাবে তাহা সহ্য করিত। খুসনের প্ররোচনায়ও অধিক লাভের আশায় জালাল খুসনকে লইয়া বোম্বে যাইয়া দোকান খুলিল।

* * *

দুই বৎসর মজিনা জালালের কোন সংবাদই পাইল না। সে যাহা কল্পনা করিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে মনে করিয়া হৃদয়ে তীব্র নৈরাশ্য ও যাতনা অনুভব করিল। তাহা নানা শোক ও অনুতাপ উপস্থিত হইল—হায়! সে সে বৎসর স্বামীকে ভালরূপ যত্ন করে নাই এবং নানাপ্রকারে ঔদাসীন্য দ্বারা স্বামীর অন্তরে বেদনা দিয়াছে। হয়তো স্বামী সে জন্য বিরক্ত হইয়াই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, অথবা সেই কুলটা তাহার স্বামীকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মজিনা করাচিতে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল, এবং তাহার যাহা কিছু সঙ্গতি ছিল সমস্ত বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা একটী উট ক্রয় করিল, এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া করাচি অভিমুখে যাত্রা করিল।

এক মাস কাল দুর্গম পথ অতিবাহনের পর পুত্রকন্যা লইয়া মজিনা করাচিতে আসিয়া পৌঁছিল। তখন মজিনা একপ্রকার নিঃসম্বল। সঙ্গে দুটী শিশু পুত্রকন্যা, মজিনা বড় ভাবনায় পড়িল। সমস্ত শহর তন্ন তন্ন করিয়াও সে জালালের কোন সন্ধান পাইল না। অবশেষে একজন লোকের কাছ শুনিল, জালাল স্ত্রী হইয়া বোম্বে চলিয়া গিয়াছে। মজিনা অতি কষ্টে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া শিশু পুত্র কন্যা দুটীর কোন প্রকার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগল। সন্তান দুটীকে খাওয়াইয়া মজিনার প্রায়ই আহার জুটিত না। মজিনা মনে করিল, আমি মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এই শিশু পুত্র দুটী কি প্রকারে বাচিবে।

অবশেষে মজিনা বোম্বে যাইয়া জালালের অনুসন্ধান করাই স্থির করিল। স্বীয় পরিধেয় একখানা মাত্র বস্ত্র রাখিয়া গাত্রে যে সামান্য কিছু অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া মজিনা কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইল; তদ্দ্বারা মজিনা শিশু পুত্র কন্যাদুটীকে লইয়া বোম্বে যাত্রা করিল।

বোম্বে অত্যন্ত প্রকাণ্ড সহর। বোম্বে পৌঁছিয়া মজিনা হতাশ হইল, এত বড় সহরে সে কোথায় জালালের সন্ধান পাইবে।

দুইদিন তাহার আহার জোটে নাই, বুভুক্ষিত শিশুদুইটীও তাহার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছিল; বেদনায় মজিনার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল।

সারাদিন বোম্বের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া মজিনা অবসন্ন দেহে সমুদ্রের পারের এক পাশে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল।

কত লোক সেই স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ এই অভাগিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না।

সন্ধ্যার পর একজন দরিদ্র বেশধারী একজন লোক আসিয়া তাহাদের সম্মুখে কিছু খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া গেল।

মজিনা পুত্রকন্যাদিগকে তাহা খাওয়াইতে লাগিল। মাকে খাইতে না দেখিয়া পুত্রকন্যারাও খাইতে অস্বীকৃত হইল, কাজেই দু'এক বার তাহাদের মনরক্ষার্থ নিজের মুখে কিছু দিল।

খাওয়া শেষ হইলে সারাদিনের পরিশ্রান্ত শিশু দুটী সেই অবস্থায়ই মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল।

মজিনা বলিতে লাগিল,—খোদা, আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও, আর এই অনাথ শিশুদুটীকে তুমি রক্ষা করিও।

শোকে দুঃখে ক্লান্ত অবশ হইয়া মজিনা গাইতে লাগিল—

হ্যায় কোই এইসা স্বজন মিলা দে
স্বজনকো মুখবা হমে দেখা দে
নতো খোদায়া হামে উঠা লে—ইত্যাদি।

এ গান শুনিয়া পথপার্শ্বে একজন পথিক যেন থমকিয়া দাঁড়াইল। কান পাতিয়া সে গানের সমস্ত শুনিল। তাহার মনে স্মৃতির আবেগে কোন বিস্ময় যেন জাগিয়া উঠিল।

পথিক অগ্রসর হইয়া গায়িকাকে জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি?

মজিনা বিস্ময়সহকারে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া উত্তর দিল, আমি ভিখারিণী।

পথিক পুনরায় অধিকতর বিস্ময়সহকারে প্রশ্ন করিল,—কোন দেশ— কোন দেশে তোমার বাড়ী।

ভিখারিণী উত্তর করিল,—বেলুচী নিহারা।

আঁ আঁ—তুমি কি মজিনা? পথিক উদ্ভ্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

ভিখারিণী অগ্রসর হইয়া পথিকের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—হাঁ, আমি আপনার চরণাশ্রিতা দাসী মজিনা।

পথিক আর কেহই নহে, স্বয়ং জালাল। জালাল তৎক্ষণাৎ মজিনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল এবং অজস্র চুম্বনে নিদ্রিত পুত্রকন্যার মুখ ভরিয়া দিল।

অনেকক্ষণ অশ্রুবর্ষণের পর জালাল বলিল,—মজিনা, গৃহে চল।

মজিনা সাশ্রু নয়নে বলিল,—স্বামিন এই পুত্রকন্যা দুটীকে লইয়া যাও, তোমার সুখের জীবনে আমি কণ্টক হইব না। তুমি এ দুটীকে প্রতিপালন করিও। এই প্রার্থনা, আর আমার অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা নাই। ক্ষমা করিও—বিদায় দেও।

জালাল মজিনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—মজিনা, মজিনা, তুমি এ কী বলিতেছ! তুমি কি এই অধম স্বামীকে ক্ষমা করিতে পারিতে পারিবে না। আমি তোমাকে যে ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়াছি, তাহা ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া কি আমাকে শাস্তিপ্রদানেও বিরত থাকিবে। কিন্তু তোমার বিরহ-শাস্তি অসহ্য—তুমি যে দেবী, তুমি আমাকে অত গুরুতর শাস্তি দিও না, চল এখন গৃহে।

মজিনা গদগদ্ কণ্ঠে বলিল,—না স্বামীন, আমি গেলে খুসনের কষ্ট হবে। তুমি তাহাকে লইয়া সুখী হও। আমাকে বিদায় দেও, জন্মজন্মান্তরে আবার মিলন হবে।

জালাল অশ্রু-আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে বলিল,—মজিনা, আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই। তুমি পরিত্যাগ করিলে যে আমার জীবন দুর্বহ হবে।

মজিনা বলিল,—আচ্ছা চল এখন, যাহার ধন তাহাকে বুঝাইয়া আমি বিদায় লইব।

জালাল মজিনা ও পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া গৃহে আসিল, ইহাদিগকে দেখিয়াই খুসন অন্য কক্ষে যাইয়া দ্বাররুদ্ধ করিল।

জালালের শত সাধ্যসাধনায়ও আর দ্বার খুলিল না।

পরদিন প্রভাতে মজিনা খুসনের দরজায় গিয়া আঘাত করিল,—বোন, বোন, দরজা খোল, স্বামীর উপর কি এত অভিমান করিতে আছে। তোর স্বামী চিরকাল তোর থাকিবে, মিছা কেন এই অভিমান করিস।

অনেক বেলা হইল তবু খুসন দরজা খুলিল না। অগত্যা জালাল গৃহদ্বার অন্য উপায়ে উন্মোচন করিয়া দেখিল, শাণিত ছুরিকা বুকে বিদ্ধ করিয়া গতজীবন হইয়া মেজের উপর লুটাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—খুসন।

মজিনা খুসনের মাথা বুকে লইয়া অনেক কাঁদিল—হায়, তুই এই পাপ কেন করিলি; আমি কি তোর জীবনসর্ব্বস্ব লইতে আসিয়াছিলাম—সে যে তোরই একমাত্র ছিল আমি তোকেই সব দিতে আসিয়াছি। এত কি তোর অভিমান, দুই দণ্ডের বিচ্ছেদ তোর সহ্য হইল না।

জালাল খুসনের জন্য দুই ফোটা অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিল। তার পর যথাবিধি খুসনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া একটী চমৎকার গোরস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দিল।

খুসনের মৃতদেহের পার্শ্বে একটী কৌটায় একগুচ্ছ কেশ পাওয়া গিয়াছিল।

কেশগুচ্ছটি লইয়া জালাল মজিনা বিবির হাতে দিয়া বলিল,—এই লও তোমার সেই কেশগুচ্ছ, তোমার পবিত্র প্রেমের স্মরণ-চিহ্ন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।





প্রতিভা

৩য় বর্ষ | অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ | ৮ম ও ৯ম সংখ্যা

ধামরাইর পুরাকীর্ত্তি

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতি সুলতান প্রতাপ পরগণাস্থিত ধামরাই গ্রাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। কাঁকলাজানি এবং বংশাই নদীর সঙ্গমস্থলে ধামরাই গ্রাম অবস্থিত। ঢাকার মসলিন যেরূপ পৃথিবী-বিখ্যাত, ধামরাইর বস্ত্রবয়নশিল্পও সেইরূপ বহু প্রাচীন ও উৎকর্ষজ্ঞাপক। কেবল ধামরাই গ্রামেই অদ্যাপিও প্রায় সহস্র ঘর তন্তুবায়ের বাস। ধামরাই-জাত সূক্ষ্মবস্ত্র বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই বয়ন-শিল্পের ইতিহাস সর্ব্বথা আলোচ্য হুইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় উহা হইতে স্বতন্ত্র।

ধামরাই অঞ্চলে অদ্যাপি বহু বৌদ্ধ, পাঠান ও মোগল কীর্ত্তির নিদর্শন বর্ত্তমান আছে শুনিয়া ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, গত আষাঢ় মাসে (১৩২০ সন) আমরা ঐ স্থানসমূহ দর্শন করিতে গমন করি। অনুসন্ধানের ফলে কতিপয় শিলালিপি, এবং ঐতিহাসিক হিসাবে মূল্যবান কয়েকখানা বাদসাহী সনদ, প্রাচীন দলিল প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়। ঐ উপাদান-সমূহের সাহায্যে বহুল পরিমাণে স্থানীয় ইতিহাসের উদ্ধার হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

ধামরাই নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় মৌলিক মহাশয় এবং মিলকিটোলা নিবাসী কাজি বংশজ শ্রীযুক্ত সৈয়দ তুজুম্মল আলি পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ কতিপয় দলিল পত্র স্ব স্ব গৃহে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা লেখককে প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ প্রকাশিত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মৌলিক মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত দলিলসমূহের একখানার [১নং চিত্র দ্রষ্টব্য] অনুলিপি এই :—

প্রথম পৃষ্ঠা।—

* স্বস্তি সমস্ত সুপ্রশস্তলঙ্কৃত সততবিরাজমান মহারাজাধিরাজ বাদসাহক শ্রীযুত অরংজেব পাদান [৩]
যিনি শুভরাজ্যে তন্নিযুক্ত নবাবক শ্রীযুক্ত * *
খাঁনক মহাশয়া নামধিকারে তন্নিযুক্ত জায় [গি]
রিদারক শ্রীযুত ইস্পিন্নিয়ার খাঁনক মহাশয়া নামাধি [কা]
রে তন্নিযুক্ত সিগদারক শ্রীলালবেহারী মহাল *
স্য বিষয়িণি সুলতান প্রতাপান্তর্গত ধর্ম্মরাজী *

শ্রী পাকীয় কায়স্থপল্লীগ্রাম নিবাসিনঃ শ্রীগোপী
নাথ মজুমদারকস্য সভায়ামনেকেষামুপস্থি *
পঞ্চনবত্যধিক পঞ্চদশ শত শকাব্দে সুলতান
প্রতাপান্তর্গত কায়স্থ পল্লীগ্রাম নিবাসি গোপীনা
থ দেবকস্য স্ত্রী শ্রীমতী গঙ্গাদাসী তৎপত্যে [গো]
পীনাথ দেবকস্য স্বর্গকামনয়া তস্য জলভূমি [যু]
ক্ত্য সমেতং নিজাংশ তালুকং তত্র নিবাসিমে শ্রীরা [ম]

শ্রীমতী গঙ্গাদাসী

জীবন মৌলিকায় দত্তবতীতি সন ১০৮২ *
২৩ অগ্রহায়ণস্য (১)
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।—

অত্রার্থে সা
ক্ষি :—
শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মা শ্রীমহেশ শর্ম্মা
শ্রীগোপীনাথ সেবকঃ শ্রীঅভিরাম দাস
শ্রীজগত বল্লভ * * শ্রি
সেবক্স সেবক
শ্রীচৈতন্য সে উত্তমানন্দ্য শ্রীশিবরাম
মর দাস* শর্ম্মা লিখিত মিদমিতি

দলিলখানার উপরিভাগে কোনও রাজকীয় কর্ম্মচারী দলিলের উক্তি সমর্থন করিয়া পারস্য ভাষায় কয়েক পংক্তি লিখিয়া দিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই ;—"পারলৌকিক হিতকামনায়। ধর্ম্মের * * * * সুতরাং এই বাক্যাবলী সনদরূপে প্রদত্ত হইল * * * * ২৪ শে শাবন, ১০৮৪ হিঃ।"

---

(১) এই দলিলে বাদসাহ, নবাব, খাঁন, জায়গিরিদার, সিগদার, মজুমদার, দেব, প্রভৃতি শব্দের পর 'ক' সংযুক্ত রহিয়াছে। ইহা ঐ যুগের বঙ্গভাষার একটী বিশেষত্ব। অদ্যাপি গ্রাম্য ভাষায় ঐরূপ ব্যবহার কোনও কোনও শব্দে দৃষ্ট হয়।

এই দলিলের দানগ্রহীতা রামজীবন মৌলিক ধামরাইর শ্রীশ্রীযশোমাধবের সেবাইত, এবং বর্ত্তমান সেবাইত মৌলিক বংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন।

দলিলের উল্লিখিত "কায়স্থপল্লী" অথবা চলিত ভাষায় কায়েথপাড়া নামক স্থান ধামরাই গ্রামে অদ্যাপি বিদ্যমান। এই স্থানেই যশোমাধবের মন্দির এবং সেবাইত মৌলিক মহাশয়দের বাসগৃহ বর্ত্তমান।

দলিলখানার নকল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত "ঢাকার ইতিহাসে" প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু, তাহাতে কতিপয় ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইল।

দলিল সম্পাদনের তারিখ ১০৮২ বঙ্গাব্দ, ১৫৯৫ শকাব্দ, ১০৮৪ হিঃ, অথবা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন।

"ধর্ম্মরাজী *" শব্দটীর জন্যেই এইস্থানে এই দলিল খানার উল্লেখ করা হইল। বলা বাহুল্য, উহা ধামরাই গ্রামের প্রাচীন নাম! আওরঙ্গজেবের সময়েও ধামরাই "ধর্ম্মরাজী [কা]" নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। পরে, ক্রমে ধর্ম্মরাজি হইতে ধামরাজি, এবং ধামরাজি হইতে ধামরাই নামের উৎপত্তি হইয়াছে; ধামরাই ধর্ম্মরাজী শব্দেরই অপভ্রংশমাত্র। এই ধর্ম্মরাজিকা নামের সহিত বহু প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে। সম্রাট অশোক দেশদেশান্তরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়া তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্যে ৮৪০০০ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজয়-স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ স্তম্ভনিচয় ধর্ম্মরাজিকা নামে খ্যাত ছিল।

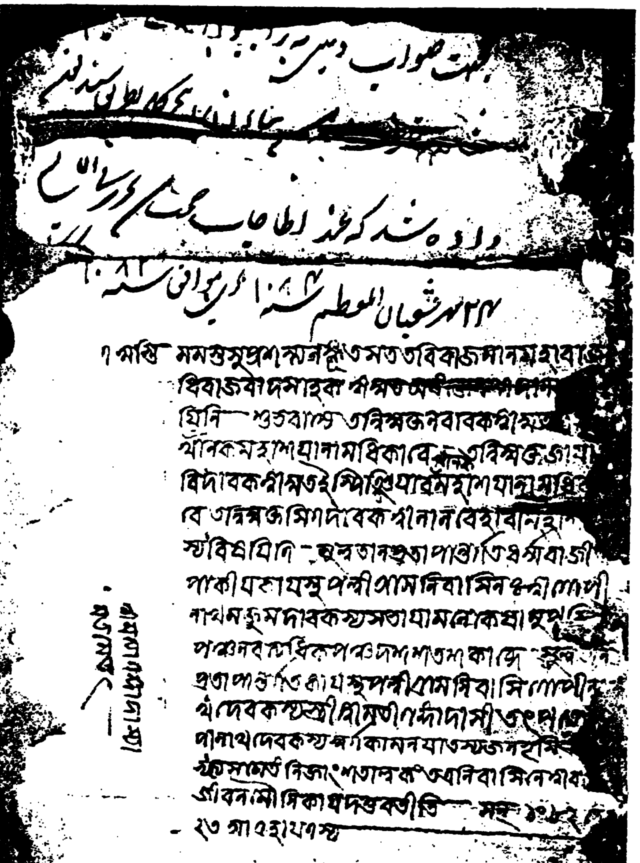
"অশোকো নামা রাজা বভূবেতি। তেন চতুরশীতি ধর্ম্মরাজিকা সহস্রং প্রতিষ্ঠাপিতং। যাবৎ ভগবচ্ছাসনং প্রাপ্যতে তাবৎ তস্য যশঃ স্থাস্যৎ।"—অশোকাবদানম্।

সুঙ্গ বংশীয় পুষ্যমিত্র অথবা পুষ্পমিত্র বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নপর হন। তিনিই এই ধর্ম্মরাজিকাসমূহ ও অন্যান্য বহু বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংস করেন।

ধামরাইর প্রাচীন নাম ধর্ম্মরাজী [কা] র সহিত অশোক-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজিকা স্তম্ভের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। অনেকে আমার এই কথা শুনিয়া উপহাস করিয়াছেন; কেহ কেহ বা বলিয়াছেন, অশোকরাজত্বের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ বনাবৃত ও জলাকীর্ণ, এবং অনার্য্যগণের বাসভূমি ছিল। কিন্তু, নিম্নে আমরা চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন্থ সিয়াঙের বিবরণ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, যে পূর্ব্ববঙ্গে বহুসংখ্যক সঙ্ঘারাম, এবং অশোক প্রতিষ্ঠিত স্তূপ বর্ত্তমান ছিল।



২নং শাকাসর স্তম্ভ।



১নং ধর্ম্মরাজিকা দলিল।

ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউস, ঢাকা।

আমরা আমাদের মাতৃভূমির প্রতি এতই শ্রদ্ধাহীন, যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিলেও কিছুতেই আমরা বিশ্বাস করিতে চাহি না যে, আমাদের দীনা মাতৃভূমিও এক-কালে জ্ঞানগরিমায় পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিল। আমরা এতই দীন হইয়া পড়িয়াছি যে একথা ভাবিতেও আমাদের সাহস হয় না।

সমতট (২) রাজ্যের বর্ণনায় হিউয়েন্থ্‌ সিয়াঙ্‌ বলিয়াছেন,—

"There are thirty or so *Sangharams* with about 2000 priests. They are all of the Sthavira school. * * * * Not far from the city is a *stupa* which was built by Asoka-raja. In this place Tathagata in former days preached the deep and mysterious law for seven days for the good of the Devas. By the side of it are traces where the four Buddhas sat and walked for exercise.

Not far from this, in a *Sangharama*, is a figure of Buddha of green jade. It is eight feet high, with the marks on its person perfectly shown, and with a spiritual power which is exercised from time to time."

——Samuel Beal's "Buddhist Records of the Western World."

"(সমতট রাজ্যে) আনুমানিক ৩০টী সঙ্ঘারাম আছে, এবং তাহাতে ২০০০ পুরোহিত (ভিক্ষু) বাস করেন। তাঁহারা সকলেই স্থবির শ্রেণীভুক্ত। * * * * নগর হইতে অদূরে অশোকরাজ বিনির্ম্মিত একটী স্তূপ বিদ্যমান আছে। পুরাকালে এইস্থানে তথাগত দেবগণের হিতার্থ সাত দিন গভীর এবং অলৌকিক ধর্ম্ম-সূত্রসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। যে স্থানে বুদ্ধ চতুষ্টয় উপবেশন করিতেন এবং ব্যায়ামার্থ ভ্রমণ করিতেন, সেই স্থানসমূহের চিহ্নাদি ঐ স্থানের পার্শ্বেই বর্ত্তমান।

"ইহার অদূরেই, একটী সঙ্ঘারামে শ্যামবর্ণ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা ৮ ফুট উচ্চ, এবং শরীরের স্বাভাবিক চিহ্নাদি উহার গাত্রে অতি পরিস্ফুটরূপে খোদিত আছে, এবং উহার অলৌকিক ক্ষমতা সময়ে সময়ে প্রকটিত হয়।"

সম্রাট অশোক যে পূর্ব্ববঙ্গেও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছিলেন পূর্ব্বোদ্ধৃত বিবরণ হইতেই আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। সুতরাং ধামরাইতে অশোক-কীর্ত্তির নিদর্শন ছিল, এ কথা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

সম্প্রতি ধামরাইর অনতিদূরে শাকাসর নামক গ্রামে একটী প্রস্তর-স্তম্ভের বিবরণ [২নং চিত্র দ্রষ্টব্য] আমি সুধীবর্গের গোচরার্থ মৎপ্রণীত "পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ" নামক গ্রন্থে এবং "প্রতিভা" [অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা, ১৩১৯] ও "ঢাকা রিভিউ" পত্রিকাতে প্রকাশিত করিয়াছি। (৩) ভাওয়াল পরগণার অন্তর্ভুক্ত শাকাসর গ্রামের বহির্দ্দেশে এই স্তম্ভটী পতিত ছিল; এখন গ্রামবাসীগণ তুরাগ নদীর তটদেশে অবস্থিত শাকাসর গ্রামের বাজারে একখানা টীনের ঘর প্রস্তুত

(২) বরাহমিহির আধুনিক পূর্ব্ববঙ্গকে 'সমতট' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (Dr, Kern's "Brihat Samhita" XIV. L. 6. দ্রষ্টব্য)। প্রয়াগস্তম্ভে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের যে প্রস্তরলিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গ 'সমতট' আখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। (J. A. S. B. VI. শিলালিপির ১৬ পংক্তি দ্রষ্টব্য)। Sir Alexander Cunningham নানারূপ প্রমাণ সহ দেখাইয়াছেন যে পূর্ব্ববঙ্গকেই হিউয়েন্থ্‌-সিয়াঙ্‌ 'সমতট' বলিয়াছেন। (Cunningham's "Ancient Geography of India," ৫০২, ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(৩) বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীযুক্ত এচ্‌, ই, ষ্টেপ্‌লটন্‌ মহোদয় এই স্তম্ভটী সম্বন্ধে আমাকে প্রথম সংবাদ প্রদান করেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

করিয়া তন্মধ্যে উহা প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে। বহুকাল যাবৎ গ্রামবাসিগণ মাধব জ্ঞানে স্তম্ভটীকে পার্ব্বণাদিতে তৈল সিন্দুর প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকে, এবং 'শাকাসরের মাধব' আখ্যাতেই এতদঞ্চলে উহা বিখ্যাত। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে কোন হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমান ফকির স্থানীয় মুসলমানগণের সাহায্যে হিন্দু-পূজিত এই প্রস্তরখণ্ডকে নিকটবর্ত্তী তুরাগ নদীতে নিক্ষেপ করে। হিন্দুগণও ইহাতে উত্তেজিত হইয়া ভাওয়ালের স্বর্গীয় কুমার বাহাদুরের সাহায্যে ফকীরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। শুনিয়াছি নাকি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা হয়। কার্য্যটী নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া ঢাকার নবাব বাহাদুর মধ্যবর্ত্তী হইয়া স্বীয় ব্যয়ে হিন্দু দ্বারা স্তম্ভটীকে পুনরায় নদীগর্ভ হইতে উত্তোলিত করাইয়া সংস্কারাদি করাইয়া দেন। তদবধি উহার মহিমা হিন্দুর নিকট আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য মাধব (বিষ্ণু) মূর্ত্তির সহিত স্তম্ভটীর কোনই সম্পর্ক অথবা সাদৃশ্য নাই। স্তম্ভের আবিষ্কৃত অংশ সমগ্র স্তম্ভটীর উপরিভাগ মাত্র। নিম্নভাগ হয় ত কোথাও ভূগর্ভে নিহিত আছে। স্তম্ভ-লিপি সচরাচর ভিত্তিমূলেই খোদিত থাকে; বর্ত্তমান স্তম্ভটীর অনাবিষ্কৃত নিম্নভাগেও হয় ত কোনরূপ খোদিত লিপি থাকিতে পারে। স্তম্ভটী এত ভারী যে উহা দূরদেশ হইতে তথায় আনীত হইয়াছে এরূপ অনুমিত হয় না। কিন্তু, উহা যে স্থানান্তরে ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ দুই তিনবার স্থানান্তরিত হওয়ার সংবাদ আমরা অবগত আছি। স্তম্ভটী স্যাণ্ডষ্টোন (Sandstone) নির্ম্মিত, অষ্টকোণ, এবং আবিষ্কৃত অংশ দৈর্ঘ্যে সাত ফুট। উপরিভাগে আট দিকে আটটী বৌদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে; মূর্ত্তিগুলির কোনটীর ধ্যানাসন, কোনটীর বা ভূমিস্পর্শ মুদ্রা, মস্তকে কিরীট, পাদনিম্নে পদ্ম। মূর্ত্তিগুলির নিম্নে কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপিয়া নানাবিধ কারুকার্য্য খোদিত আছে। স্তম্ভগাত্রে আরও কতিপয় মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল; একখানি এখনও অনেকটা সুস্পষ্ট আছে। অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলি কালের প্রভাবে স্থানে স্থানে অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; বহু প্রাচীন না হইলে উহা এইরূপ ভাবে বিনষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে। স্তম্ভটীর শীর্ষদেশ সুগোল এবং উহা যে কোন প্রাসাদাদির অংশবিশেষ ছিল না, তাহা নিশ্চিত। দর্শনমাত্রই প্রতীয়মান হয় যে উহা পুরাকালে কোনও নৃপতির কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ কোনও স্থানে প্রোথিত ছিল। স্তম্ভটী যে বৌদ্ধযুগের, তাহা গাত্রে অঙ্কিত বৌদ্ধমূর্ত্তি-সমূহ হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। স্তম্ভটী বহু বিশে-ষত্ব পূর্ণ, এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কুত্রাপি এইরূপ কোন স্তম্ভ আছে কি না জানি না।

যদিও বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার সময় নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন, তথাপি ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা উল্লেখযোগ্য। ধামরাই অথবা ধর্ম্মরাজী গ্রামের সহিত অশোক-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজিকার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তাহা বিবেচ্য। শাকাসর ধাম-রাইর অনতিদূরবর্ত্তী তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ধামরাই অঞ্চলে অশোকের ধর্ম্মরাজিকা স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইরূপ অনুমান সুধীসমাজে গ্রাহ্য হইলে, বর্ত্তমান শাকাসর স্তম্ভই উক্ত ধর্ম্মরাজিকাস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ হইতে পারে, এইরূপ অনুমান করিতে আমরা ইচ্ছুক। সম্প্রতি এই অনুমানের কোনরূপ সন্তোষজনক ভিত্তি না থাকিলেও, ভবিষ্যতে উহা প্রমাণিত করিবার উপযোগী উপাদান হয় ত সংগৃহীত হইতে পারে, এই আশায় এই সময় আমাদের অনুমান উপস্থিত করিয়া রাখিলাম। কেহ মনে করিবেন না যে আমরা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি।

ধামরাই এখন শ্রীশ্রীযশোমাধব বিগ্রহের জন্য বিখ্যাত। রথযাত্রার সময়ে ধামরাইতে প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে; রথখানা ত্রিতল অট্টালিকা হইতেও উচ্চ, সুচিত্রিত, এবং বহু

কারুকার্য্য-শোভিত। মাধব সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মূর্ত্তিখানা নিম্বকাষ্ঠ-নির্ম্মিত, এবং যে কাষ্ঠ-দ্বারা শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহারই অবশিষ্টাংশ দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা মাধব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস। এইরূপ সুন্দর মূর্ত্তি এ প্রদেশে অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। নবজলধরশ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, পীতবাস ঐ মোহন মূরতি দর্শন মাত্রই ভক্তহৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস স্বতঃই স্ফুরিত হয়। মাধবমূর্ত্তির পদনিম্নে প্রস্ফুটিত পদ্ম, শীর্ষদেশে দশাবতারের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি, এবং ঠিক মস্তকোপরি বৃষভবাহন মহাদেব মূর্ত্তি অঙ্কিত, উভয় পার্শ্বে কমলোপরি লক্ষ্মীসরস্বতী দণ্ডায়মানা, তৎপার্শ্বে ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ ও প্রহ্লাদ, নিম্নদেশে উভয় পার্শ্বে যশোপাল নৃপতি ও রামজীবন মৌলিকের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত, তৎপার্শ্বে নন্দ, উপানন্দ নামক গোপদ্বয় দধিদুগ্ধ স্কন্ধে দণ্ডায়মান, পদনিম্নে গরুড় গজকচ্ছপের দ্বন্দ্ব মীমাংসা করিতেছে, ইতস্ততঃ কয়েকটী রাজহংস বিচরণ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মূর্ত্তির নিকটে এক একটি কদম্ববৃক্ষ অঙ্কিত আছে। মাধবের পদতল হইতে দুইপার্শ্বে দুইটী সর্প দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কেহ কেহ উহাকে বাসুকি মনে করেন, কিন্তু সহস্রফণ বাসুকির সহিত উহার কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগের অনেক মূর্ত্তিতে এইরূপ সর্প দৃষ্ট হয়। ঐ যুগের নির্ম্মিত মূর্ত্তি বলিয়া শিল্পী কর্ত্তৃক সর্পদ্বয় খোদিত হইয়াছে কিনা, তাহা বিশেষজ্ঞগণের বিচার্য্য।

অতঃপর, মাধব মূর্ত্তির আবিষ্কার হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উহার ইতিহাস অনুসন্ধানে আমরা চেষ্টিত হইতেছি। কাশীমপুর এবং চাঁদপ্রতাপ পরগণার মধ্যবর্ত্তী স্থলে গাজীখালি নদী (মেজর রেণেলের মানচিত্রে ইহা কানাই নদী নামে চিহ্নিত হইয়াছে) অবস্থিত বাইদ্গাঁও গ্রামে মাধবচালা অথবা মাধবট্যাক নামে একটী উচ্চভূমি দৃষ্ট হয়। বাইদ্গাঁও গ্রামে যশোপাল নৃপতির প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও তৎখনিত দীর্ঘিকানিচয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দেশপ্রচলিত প্রবাদ এই, একদা যশোপাল নৃপতি এক শ্বেতহস্তীপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার রাজধানীর অদূরেই একটী স্থানে উপস্থিত হইয়া হস্তী হঠাৎ চকিত ভাবে দণ্ডায়মান হইল, শত অঙ্কুশ প্রহারেও অগ্রসর হইল না, এবং শুণ্ড উত্তোলন করিয়া স্থানটী পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিতে লাগিল। সুশিক্ষিত হস্তীর ঈদৃশ অদ্ভুত ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া রাজা ঐ স্থানে খনন করিতে আদেশ করিলেন। রাজাদেশে বহুদুর খনিত হইলে একটী মন্দির এবং তন্মধ্যস্থ মাধব মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। তখন হঠাৎ দৈববাণী হয় যে, যশোপাল মাধবকে স্থানান্তরিত করিলে তাঁহার রাজ্য এবং বংশ নষ্ট হইবে। ভক্ত নৃপতি ইহাতে বিচলিত হইলেন না। পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা পারলৌকিক কল্যাণকে অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া যশোপাল মাধবকে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উত্তোলিত করিলেন, এবং তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে তথায় স্থাপিত করিলেন। এই মাধব মন্দিরের ভগ্নস্তূপই অধুনা মাধবচালা অথবা মাধবট্যাক নামে খ্যাত। উহা একটী ইষ্টকবহুল মৃৎস্তূপ। যে স্থান হইতে মাধবকে উত্তোলিত করা হয়, সেই গর্ত্তটী এখনও বর্ত্তমান এবং “মাধবের চৌবাচ্চা” নামে খ্যাত; উহা মাধবচালার পার্শ্বেই অবস্থিত। “মাধবের চৌবাচ্চা” একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর ন্যায়, এবং আনুমানিক ২৫ হাত লম্বা ও ২০ হাত প্রশস্ত। কথিত আছে, মাধব প্রতিষ্ঠার পর যশোপালের উপর স্বপ্নাদেশ হয় যে মাধবের স্ত্রী তখনও ঐ গর্ত্তমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। রাজাদেশে পুনরায় সেই গর্ত্ত খননকালে খননকারীদের অনবধানতা বশতঃ খনিত্রের আঘাতে মাধবের স্ত্রীর নাসিকা ভগ্ন হইয়া যায়। ইহাতে তিনি ভূপ্রোথিতা হইলেন, বহু চেষ্টাতেও আর তাঁহাকে পাওয়া গেল না।

দৈববাণী কার্য্যে পরিণত হইলে যশোপালের রাজ্য

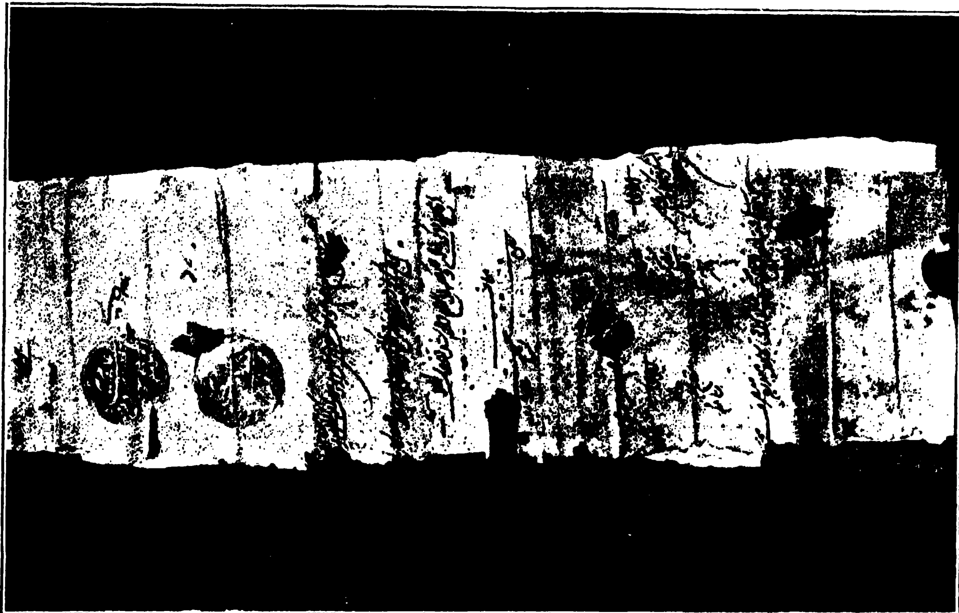
এবং বংশ নষ্ট হইল। রাজ্য এবং বংশ নাশ নিশ্চিত জানিয়াও যিনি অবিচলিত চিত্তে মাধব প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই ভক্তের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মাধব তদবধি নিজ নামের পূর্ব্বে ভক্তের নাম সংযোগ করিয়া যশোমাধব নামে খ্যাত হইলেন। যশোপালের রাজ্যবিনাশের পর তাঁহার রাজধানীও ক্রমে জনশূন্য হইয়া পড়িল। মাধব বোধ হয় অনাদৃত অবস্থাতেই তথায় অনির্দ্দিষ্ট কাল অবস্থান করেন। তথা হইতে মাধব কখন কুমড়াইল গ্রামে স্থানান্তরিত হন তাহার সময় নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। বাইদ্গাঁও গ্রাম কাশীমপুরের জমিদারগণের অধিকারভুক্ত। জনপ্রবাদ এই, কাশীমপুরের জমিদার গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনমধ্যে মাধবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া শিমুলিয়া গ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণকে উহা দান করেন। পরে সেই ব্রাহ্মণ নিজ জামাতা ধামরাইর পার্শ্ববর্ত্তী কুমড়াইল নিবাসী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ রামজীবন রায় মৌলিককে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ উক্ত মূর্ত্তি দান করেন। কিন্তু, নিম্নোদ্ধৃত দলিলখানায় লিখিত আছে যে রামজীবন মৌলিক 'পুরুষানুক্রমে সেবার সরবরাহ' করিতেছেন। সুতরাং তিনি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ মাধবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন নাই, তাহা নিশ্চিত। হয়ত তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষই গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের নিকট হইতে উহা পূজা করিবার জন্য পাইয়াছিলেন, এবং তদবধি মৌলিকগণই মাধবের সেবাইত নিযুক্ত আছেন। কথিত আছে, আধুনিক সেবাইতগণের পূর্ব্বপুরুষ যশোপাল নৃপতির রাজ্য এবং বংশনাশকারী মাধবের সেবার ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু, মাধব যখন তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁহার বংশ নষ্ট হইবে না, বরঞ্চ মাধবের বৃত্তি এবং সেবালব্ধ ধন দ্বারা তাঁহার সন্তানগণ স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, তখন মৌলিক মহাশয় সন্তুষ্টচিত্তে মাধবের সেবার ভার গ্রহণ করিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত দলিলের [৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য] অনুলিপি এই :—

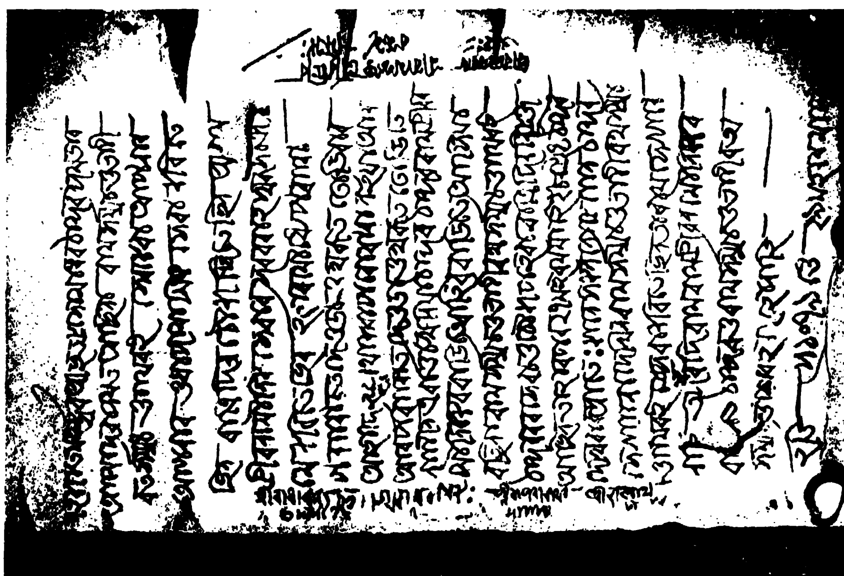
* * * * ও মহ * ব শ্রীযুত জসোমাধব ঠাকুর কুমড়াঙ্গ
গ্রামে দেবালয়ত আছিলা রামসর্ম্মা ও ভগী
রত সর্ম্মা ও গয়রহ সেবকেরা আপনার
আপনার ওয়াদামামির সেবা করিতে
ছিল রাত্রিদিন চৌকী দিতেছিল শ্রীরাম
জীবন মৌলিক সেবার সরবাহ পুরুসা [নু] ক্র
মে করিতেছেন ইহার মৌধ্যে পরগণা
পরগণাতে দেওতা ও মুরুত তোড়িবার
আহাদে হ * * থাকীয়া পরোয়ানা লইয়া আর
আর পরগণাত দেওতা ও মুরুত তোড়িতে
আসীল এ বার্ত্তা শুনিয়া ঠাকুর ঠাকুর রামজীবন
মৌলিকের বাড়িতে বাহির বাড়িতে আসিয়া
রহিলা রামসর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ও গয়রহ
ঠাকুরের সেবা ও চৌকীপহরা রাত্রিদিন নিযুক্ত
আছিল তাহার পর ২৭ মহরম মাহে ২৮ জৈষ্ঠ ঠাকুর
দেখিবার প্রাতেঃকালে সকল লোক গেল ঠাকুর
সেথানে না দেখিল রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা
ও গয়রহ সেবা করিতেছিল তারায় সেথানে
নাহি তদবদি রামজীবন মৌলিকের
বা [ড়ি] তে ঠাকুর ও রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ
সর্ম্মা ও গয়রহ কেহো নাহি
ইতি স ১০৭৯ তেং ২৯ মহরম মাহে ৩০ জ্যৈষ্ঠ (৪)

উল্লিখিত দলিলখানা হইতে ধামরাইর মাধবের পূর্ব্ব ইতিহাসের অনেকটা উদ্ধার হইয়াছে। প্রথমতঃ

(৪) দলিলখানা ধামরাই নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশ বাবুর সম্পত্তি। দলিলখানার উপরিভাগে পারস্য ভাষায় লিখিত দলিলের একজন সাক্ষী সৈয়দ আবদুল আজিজের স্বাক্ষর আছে।



৪নং কারংকর প্রদত্ত নানকার পাট্টা।



৩নং মাধবের স্থানান্তরিত হইবার নিদর্শনের নকল।

দেখা যাইতেছে যে মাধব পূর্ব্বে কুমড়াইল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাইদ্‌গাঁও (মাধবচালা) হইতেই বোধ হয় মাধব কুমড়াইল গ্রামে আনীত হইয়াছিলেন। কোন সময়ে, কাহা দ্বারা, এবং কিরূপে এই স্থানান্তর ঘটে, তাহা জানা যায় না; বাইদ্‌গাঁও হইতে কুমড়াইল আনীত হইবার পূর্ব্বে, এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে মাধব অপর কোন স্থানে ছিলেন কিনা, তাহাও জানিবার উপায় নাই। বৌদ্ধযুগে যশোপাল নৃপতির রাজত্বের অবসান হইতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল মাধব কোথায় এবং কি ভাবে ছিলেন, তাহার ইতিহাস অদ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে। ধামরাইর পার্শ্ববর্ত্তী কুমড়াইল গ্রামে মাধবের পূর্ব্বমন্দিরের নিদর্শনাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান। তথায় পুরাতন ইষ্টকবহুল মৃৎস্তূপ পূর্ণ প্রায় আট কাঠা ভূমি প্রাচীন মাধব মন্দিরের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নবাবী আমলের কাগজপত্রে ঐ ভূমিখণ্ড "পুরাতন মাধববাড়ীর ঘাট" বলিয়া চিহ্নিত আছে। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে বিজয়ী মুসলমানগণ তাঁহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তরস্তম্ভাদি এবং অন্যান্য উপকরণ লইয়া যান। (প্রবন্ধের শেষাংশে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।) আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে যখন হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন করিবার আদেশ প্রচারিত হয়, তখন মাধব কুমড়াইল মন্দির হইতে পার্শ্ববর্ত্তী 'পঞ্চাশ' গ্রামের সেবাইত রামজীবন মৌলিকের বহির্ব্বাটীতে স্থানান্তরিত হন। এই আদেশের ফলই এই স্থানান্তরের মূলকারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিছুকাল পরে রামজীবন পৈতৃক আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া ধামরাই গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করেন, এবং তৎসঙ্গে মাধবকেও স্থানান্তরিত করিয়া ধামরাই গ্রামে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় স্থাপন করেন। ১০৭৯ বঙ্গাব্দের ২৮ শে জ্যৈষ্ঠ মাধব ধামরাই আগমন করেন, এবং তদবধি তথায়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন; রামজীবন মৌলিকের বংশধরগণই অদ্যাপি মাধবের সেবাইতরূপে নিযুক্ত আছেন।

এইস্থানে বলা আবশ্যক যে সেবাইত মৌলিক মহাশয়গণ মাধবের পূজা করেন না, তাঁহারা সেবার তত্ত্বাবধান করেন মাত্র; বৃত্তিভোগী পাণ্ডা অথবা পূজারী ব্রাহ্মণগণ মাধবের পূজা এবং ভোগরাগাদি যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে। এই নিয়ম প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এবং অদ্যাপি এই নিয়মই বলবৎ আছে। পূর্ব্বোক্ত দলিল এবং নিম্নে পাদটীকায় উদ্ধৃত দলিলদ্বয় (৫) হইতে রামজীবন মৌলিকের সমসাময়িক, অর্থাৎ আওরঙ্গজেব বাদসাহের রাজত্বকালে বর্ত্তমান, মাধবের কতিপয় সেবক এবং কর্ম্মচারীর নাম পাওয়া যায়। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের গোচরার্থ নিম্নে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

১। রাম শর্ম্মা
২। ভগীরথ শর্ম্মা } মাধবের পূজারী অথবা পাণ্ডা। রামজীবন মৌলিকের সহকারী।
৩। রাধাবল্লভ শর্ম্মা

(৫) দলিলদ্বয়ের প্রথমখানা পারস্য ভাষায়, এবং দ্বিতীয়খানা বাঙ্গালায় লিখিত। প্রথমখানাতে বিচারালয়ের সিলমোহর আছে এবং উহা বিচারপতির "রায়" (judgment) বলিয়া অনুমিত হয়। দ্বিতীয়খানা রামজীবন মৌলিকের বিরুদ্ধে শ্যাম এবং গোকুল মালির আনীত কোনও মোকদ্দমায় রামজীবনের স্বপক্ষে রাম, ভগীরথ, এবং রাধাবল্লভ শর্ম্মা যে জবানবন্দী দেন, বোধ হয় তাহার নকল।

৪। শ্যাম মালাকর।
৫। গোকুল মালি। } মালাকর, কীর্ত্তনিয়া, এবং মৃদঙ্গবাদক।

গোবিন্দপ্রসাদ রায় শিমুলিয়াবাসী জনৈক ব্রাহ্মণকে মাধবমূর্ত্তি প্রদান করেন, এইরূপ কিংবদন্তীর বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বোধ হয়, রামশর্ম্মা প্রভৃতি পূজারীগণের পূর্ব্বপুরুষ শিমুলিয়াবাসী ছিলেন, এবং

তিনি মাধবের পূজারীরূপে নিযুক্ত থাকায়, পূর্ব্বোক্তরূপ সত্যমিথ্যায় জড়িত এবং অতিরঞ্জিত এক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে।

দলিলে লিখিত আছে, যে আওরঙ্গজেব বাদসাহ পরগণা পরগণাতে হিন্দুর দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। দলিলখানা আওরঙ্গজেব বাদ সাহের রাজত্বকালেই লিখিত ; সুতরাং এই উক্তি বিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয়। "হিজরী ১০৭৯ সালে বাদসাহ যে ভারত ব্যাপিয়াদেবমূর্ত্তি ভাঙ্গার আদেশ দেন,সেই সময়ের সরকারী ফার্সি ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে।" (৬)

পারস্য ভাষায় লিখিত প্রথম দলিলের বঙ্গানুবাদ।—

পিতৃপিতামহের কাল হইতে ঠাকুর যশোমাধবের সেবক ব্রাহ্মণ বংশীয় (উপবীতধারী) রাম, ভগীরথ, এবং রাধাবল্লভ আমার (রাজভৃত্যের) সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বীকার করিতেছে যে শ্যাম, গোকুল মালি, এবং অন্যান্য মালাকার ও মৃদঙ্গবাদক ভৃত্যরূপে নিযুক্ত আছে। রামজীবন মৌলিকের পূর্ব্বপুরুষগণ সেবাইত ছিলেন, এবং তিনিও এখন উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। পূর্ব্বোক্ত গোকুল, শ্যাম, প্রভৃতির মোকদ্দমায় উপরোক্ত সাক্ষিগণ জবানবন্দীতে ইহাও বলিয়াছে যে তোমরা,—শ্যাম প্রভৃতি,—ঢাকা সহর আদালতেও রামজীবন মৌলিকের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলে। আমার (রাজভৃত্যের) সম্মুখে তাহারা এই জবানবন্দী দিয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মণবংশীয় (উপবীতধারী) রাম, ভগীরথ, এবং রাধাবল্লভের স্বীকারোক্তি অনুসারে ইহা সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করা হইল।

(বঙ্গভাষায় লিখিত) দ্বিতীয় দলিলখানার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। দলিলখানার কাগজ এত জীর্ণ, এবং লেখা এত অস্পষ্ট যে, উহার উপরিভাগে ফার্সিতে লিখিত অংশের বহু চেষ্টাতেও ধারাবাহিক পাঠোদ্ধার করা গেল না। সেই জন্য ফার্সি অংশ বাদ দেওয়া হইল।

প্রথম পৃষ্ঠা।—

নিম্নে যে ফার্সিতে লিখিত দলিলদ্বয় উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে আওরঙ্গজেব বাদসাহ সম্ভবতঃ মাধবের সেবার জন্য বহুভূমি রামজীবন মৌলিককে দান করিয়াছিলেন। এই ঘটনাও যদি সত্য হয়, তবে পূর্ব্বের উক্তির সহিত ইহার সামঞ্জস্য সাধন করা সুকঠিন। নিম্নোদ্ধৃত দলিলখানাতে "বাদসাহ আলমগির ১০৯১" অঙ্কিত সিলমোহর দেওয়া আছে, এবং উহার অনুলিপি

শ্রীযুত জসোমাধব
ঠাকুরের

শ্রীশ্যাম মালাকার তথা শ্রীগোকুল মালি ও গ
এরহ মালিবর্গ তথা শ্রীকুলিলত যুচরিতেষু আগে
তোমরা যে কারণ শ্রীরামজীবন মৌলিকে
র নামে ফৈরাদ করহ কারণ কী তোমরাকে তো
মরা মালিনত পঞ্চবির্ত্তি আবদরুন তোমরা
৺দাও আকারণ ও শ্রীরামজীবন মৌলিক
পুরুসানক্রমেই ৺ সেবার অধিকারি মনিব
আমরা পূজাহারি ব্রাহ্মণ ও যুদ্র পরিচারক
তোমরা নহঃক ফৈরাদকরহ শ্যাম মালি তোমা
কে দুই বছর ধরিআ চাকর রাখাইছি কীর্ত্তোন ক
রিতে কারণ তুমি যে ফৈরাদ করহ নাহঃক আ
মরা পুরুসানক্রমেই ৺ সেবা করিতেছি।

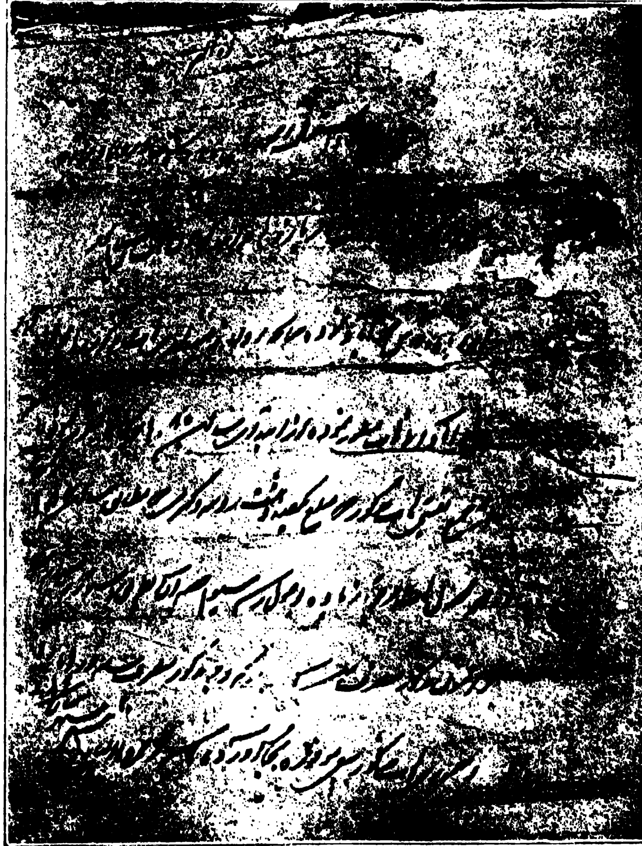
ইতি সন ১০৭৯ তেং ২১ আষাঢ়।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।—

ইসাদি

শ্রীঘনশ্যাম রায়ঃ   নরোত্তম খাঁনস্য   শ্রীনরোত্তম মিত্রঃ   শ্রীরাধাবল্লভ দাস

(৬) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার।—"পূর্ব্ববঙ্গ" —প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২০।



৫নং আরংজেব প্রদত্ত সনদ।

ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউস, ঢাকা।

নিম্নে প্রদত্ত হইল (৭)। দলিলখানা অর্দ্ধ ছিন্ন, সুতরাং, অবশিষ্টাংশের পাঠ অসংলগ্ন। [৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য]।—

বঙ্গানুবাদ।—

বাদসাহ
আলমগির

(শিলমোহর)

*   *   *

১০৯১

বাদসাহ
আলমগির

(শিলমোহর)

*   *   *

১০৯১

পাট্টালাখেরাজ রামজীবন মৌলিক চৌধুরী, মহারাজপুর আমল, পরগণা সুলতান [প্রতাপ] * * * মৌজা গোবিন্দপুর, * * * * পরগণা সুলতান পর [তাপ] * * * উক্ত মৌজাস্থ আবাদি এবং অনাবাদি (বনাকীর্ণ) ভূমি লাখেরাজ প্রদত্ত হইল।

উক্ত দলিল হইতে আমরা জানিতে পারি যে সম্রাট আওরঙ্গজেব রামজীবন মৌলিক চৌধুরীকে সুলতান প্রতাপান্তর্গত গোবিন্দপুর মৌজা নিষ্কর প্রদান করেন। কিন্তু, পাট্টাখানা অর্দ্ধছিন্ন হওয়াতে কি নিমিত্ত তিনি এই ভূমি পান, তাহা জানা যায় না। এ বিষয়ে দলিলখানার মালিক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় মৌলিক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে কোনও মোকদ্দমায় দলিলখানা কাচারীতে দাখিল করা হইয়াছিল, এবং তখন উহা অছিন্ন অবস্থাতেই ছিল। তখন উহার যে বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছিল, তাহা হইতে জানা যায় যে উহা মহম্মদ মজহরের দস্তখতি, এবং ইহা দ্বারা রামজীবন মাধবের সেবার জন্য ৩৭ বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত বঙ্গানুবাদ আমি নিজে দেখি নাই, সুতরাং এই ভূমি মাধবের সেবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল কিনা, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। নিম্নে আমরা সম্রাট আওরঙ্গজেবের সিলমোহর যুক্ত (সিলমোহরের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে) আর একখানা দানপত্র উদ্ধৃত করিতেছি। উহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে ইসলামপুর হাটের প্রভূত আয়বৃদ্ধি করাতে পুরস্কার স্বরূপ রামজীবন মৌলিক উহার আয়ের এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হন। রামজীবন তাঁহার কৃত কর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপই উহা প্রাপ্ত হন, মাধবের সেবার জন্য নহে। তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত পাট্টাখানার প্রদত্ত ভূমিও মাধবের সেবার জন্য কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। ফার্সিতে লিখিত দানপত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল (৮)। [৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য]।—

বঙ্গানুবাদ :——সরকার বাজুহার, অন্তর্গত সুলতানপ্রতাপ পরগণাস্থিত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মচারিগণ, চৌধুরীগণ, কার্য্যনির্ব্বাহকগণ, প্রজাগণ, এবং কৃষকগণ অবগত হও যে, ইসলামপুর হাট সংক্রান্ত জমীদারিপরওয়াণা দৃষ্টে জানা গেল যে রামজীবন মৌলিকের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে উক্ত হাট পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হইয়াছে। * * * * * উক্ত হাটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উন্নতির বিষয় বিবেচনা করিয়া এই আদেশ করা যাইতেছে যে, হিঃ ১০৮৫ সালের প্রারম্ভ হইতে উক্ত হাটকে একটি পরগণাতে পরিণত করা হউক, এবং উহার সমগ্র আয়ের——যাহার পরিমাণ ১০৮৲, এবং তদ্ভিন্ন ফলকর, যাহা হিঃ ১০৮৪ সাল হইতে উপরন্তু আদায় হইতেছে,——একতৃতীয়াংশ জমীদারী রীতি অনুযায়ী * * * * কে প্রদত্ত হউক, এবং * * * * উক্ত হাট নিজের দখলে রাখিয়া উহার উন্নতি সাধনে যত্নবান হউক।

মাধবের সেবার জন্য আওরঙ্গজেব রামজীবন মৌলিককে ৩৭ বিঘা ভূমি দান করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত শ্রীশ বাবুর

(৭) খাঁ বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আওলাদ হোসেন এই দলিলের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। অঙ্ক দ্বারা ভূমির পরিমাণ প্রভৃতি লিখিত আছে, কিন্তু, অপ্রয়োজনীয় বোধে তাহা প্রকাশিত হইল না।

(৮) খাঁ বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আওলাদ হোসেন এই দলিলের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

এই উক্তি সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে এক মহা সমস্যা উপস্থিত হয়। যে আওরঙ্গজেব প্রত্যেক পরগণাতে হিন্দুর দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিবার আদেশ প্রচার করিলেন এবং যে অত্যাচারের ভয়ে রামজীবন মাধবকে স্বীয় গৃহে লুকাইয়া রাখিলেন, সেই আওরঙ্গজেবই যে আবার মাধবের সেবার জন্য ভূমি দান করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? রাজ্যের কোনরূপ কল্যাণজনক কার্য্য করিয়া রামজীবন পুরস্কারস্বরূপ নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হন, এইরূপই অনুমিত হয়। শ্রীশ বাবুর উক্তি যদি সত্য হয়, তবে হয়ত হিন্দুবিদ্বেষহীন তদানীন্তন বঙ্গের কোন সুবাদার অথবা তাঁহার কোন উচ্চ কর্ম্মচারী.——যাঁহারা বাদসাহের নামাঙ্কিত মোহর ব্যবহার করিতে পারিতেন,——ঐ ভূমি মাধবের সেবার জন্য রামজীবন মৌলিককে দান করিয়াছিলেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।

সৌন্দর্য্য *

১

কোমল কমলে কুমুদে,
চন্দ্রমা-কিরণে শরদে,
নিদাঘে তপন-করে বরষার জলধরে
দামিনী দমকে ঝমকে,
শিশির-মুকুতা-ফলে শীতল হেমন্তে,
নবকিশলয়দলে মোহন বসন্তে;

২

ষড়জে, ঋষভে, গান্ধারে
মৃদঙ্গ, মন্দিরা, সেতারে,
রাগরাগিণীর সঙ্গে, কে তুমি মিশিয়া রঙ্গে,
রঙ্গে, ভঙ্গে, রঙ্গমঞ্চে রে,
কমনীয় কামিনীর মধুময় তানে,
তান-লয়-স্বরময় বালকের গানে,

৩

শিশুর হাসিতে তুমি কে?
প্রফুল্ল কুসুমদলে কে?
কি ভাব খেলিছে তায়, কি আভা ভাসিয়া যায়,
ভাষায় পায় না ধরিতে!
অমরের অমর ভাষাটী যদি পাই,
পারি না বলিতে, যাই আপনা হারাই।

৪

কেবা রে বিপিনে ঝঙ্কারে
পাগল করিল আমারে
কেবা রে বাজায় বাঁশী, উদাস করিল আসি
পরাণ লইল কাড়ি' রে:
কে রে ওই স্বরে স্বরে পাতিয়া আসন,
অলক্ষ্যে করিয়া লয় আমারে হরণ।

৫

অচল পর্ব্বতোপরে কে;
ডাকি ডাকি ডাকি নেয় আমাকে!
কেন ওথা বসে থাকি, না জানি কাহারে দেখি,
যতদূর দৃষ্টি চলে রে।
মেঘের মরালে চলে সুদূর আকাশে
কে যায় কে যায় ওই ধীরে ভেসে ভেসে?

৬

নিঝরের ধারে ধারে কে
ডাকিয়া নেয় রে আমাকে
ঝর ঝর ঝরে নীর, ফেনাফুলে ধীর ধীর,
ঝলকে ঝলকে চলকে,
কেন শিলাতলে বসি কি দেখি কি ভাবি,
কেন নিজে হারা হই কার ভাবে ডুবি!

৭

কে রে লয়ে যায় আমারে,
তটিনী পুলিন মাঝারে,
শশীকরে হাসি হাসি, তরঙ্গিণী যায় ভাসি,
আমারে ভাসায়ে নিল রে!

---

* আমার পিতৃদেবের 'পৃথিবী ও সৌররাস' নামক কবিতা ইতিপূর্ব্বে প্রতিভায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই কবিতা-টিও উহার সমসাময়িক কালে বিরচিত—শশাঙ্কমোহন।

হাসে চাঁদ, হাসে তারা সুনীল অম্বরে,
হাসির লহর খেলে আমার ভিতরে।

৮

নিশির নিবিড় আঁধারে,
নিবিড় ঝোপের কিনারে,
দাঁড়ায়ে জোনাকি গায়, কি জ্বলে কি নিবে যায়,
কি দেখি বুঝিতে নারি রে !
নীচের এ রঙ্গ দেখে উপর আকাশে
থেকে থেকে তারাগুলি কেনই বা হাসে !

৯

নিশীথে ঘুমের বিঘোরে,
বসিয়া বিছানা উপরে ;
নিবিড় নিস্তব্ধতায়, কি বা রে ডুবিয়া যায়,
আমারে লইয়া ভিতরে !
শরীর শবের প্রায় বিছানার গায়
পড়ে থাকে নাহি জানি রজনী ফুরায়।

১০

প্রভাতের ধীরে সমীরে,
কি যেন কি যেন মিশি রে,
নবীন জীবন নিয়া, স্তরে স্তরে সঞ্চারিয়া
জাগায় আবার শরীরে ;
ভুবন জাগিয়া উঠে পাখীগণ ডাকে
কলকল কলকণ্ঠে না জানি কাহাকে !

১১

কাহার হাসিটি হাসে রে !
সৌরকররাশি সনে, হাসাইয়া ত্রিভুবনে,
লহরে লহরে লহরে,
হাসিল পরাণ মোর হাসির সাগরে,
ভাসিয়া চলিল কোথা লইয়া আমারে।

১২

পাগল করিল মোরে কে ?
মাতাল করিল কোরে কে ?
কি মদ ঢালিয়া দিল, ধমনীতে প্রবেশিল,
হৃদয় কটকে কটকে !
কি চায় কি চায় মন কাহার পুলকে
মজিয়া ডুবিয়া যায় কাহার কুহকে !

১৩

ধরিয়া রাখিতে মানসে,
পারি না আনিতে স্ববশে।
সুদূরে পাহাড়গুলি থাকে থাকে মাথা তুলি
ডাকে রে আমারে হরষে !
ডাকে মাঠ, ডাকে বাট, ডাকে গাছপালা,
ঝিল বিল সরিৎ তড়াগ বীচিমালা।

১৪

সাগর গরবে হাঁকারে,
যাই বা দেখিতে তাহারে !
উপরে সুনীলাকাশ পরিয়া বিচিত্র বাস
বলিছে যাইতে কোথা রে,
দেশ, মহাদেশ ডাকে, দ্বীপ, মহাদ্বীপ,
উপদ্বীপ, উপকূল ডাকে অন্তরীপ।

১৫

টিপ টিপ নয়নঠারে,
তারাগুলো কেন আমারে,
ডাকে তথা যাইবারে, আকাশের পারাবারে,
সাঁতারে সাঁতারে সাঁতারে !
কি দিবে কি দিবে তারা, কি আছে তাদের
বুঝি না ক আখিঠার, বুঝি না ক ফের।

১৬

ঊষা সন্ধ্যা কেনই বা রে
সাজিয়া এমন বাহারে,
মোর কাছে এসে চায়, না জানি যে কি বা চায়,
দিবার রাতির মাঝারে !
ডাকি ডাকি আসে তারা ডাকি ডাকি যায়,
নিতি নিতি এই রীতি, রীতি না ফুরায়।

১৭

ভূত, ভবিষ্যৎ, হাঁকে রে,
পক্ষ, মাস, ঋতু বছরে,
কেন এত ডাকাডাকি কেন এত তাকাতাকি,
না জানি কিছু না বুঝি রে,
ডাকাডাকি, তাকাতাকি, কিসে হই স্থির
সদাই অস্থির, আত্মা সদাই অস্থির !

১৮

পাগল করিল মোরে কে !
মাতাল করিল মোরে কে !
প্রকৃতির মহাসিন্ধু মথিয়া অমৃতবিন্দু
হৃদয় আমারে এনে দে।
দেবতা অসুর নই বাসুকি মন্দর,
কিরূপে মথিব হায় পাগল অন্তর !

১৯

বছর হাজারে হাজারে
অপার সংসার মাঝারে
ঘুরি ফিরি যদি চাও, কণামাত্র নাহি পাও
সে ঐশ্বর্য্যে সে সৌন্দর্য্যেরে ;
অনন্ত সুন্দর যিনি তাঁহার আভাস
ভাসে প্রকৃতির গায় অনন্ত সে হাস।

২০

ডুব রে, ডুব রে, ডুব রে
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সাগরে,
অনন্ত সুন্দর ইন্দু, পাইলে খুঁজিয়া সিন্ধু
কৃতার্থ জনম হবে রে !
ফিরিয়া আসিতে আর হবে না হবে না
সুন্দরে পাইলে যাবে ভবের বেদনা।

৺ব্রজকুমার সেন।

সমাজ-তত্ত্ব *

সম—অজ+ঘঞ হইতে সমাজ পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার সাধারণ অর্থ দল। বহু লোকের

মানুষ কতদিন

স্বার্থ বা লক্ষ্য একদিকে কেন্দ্রীভূত না হইলে দল সংগঠিত হইতে পারে না! পরস্পর পরস্পরের উপকার করিব, এই বিশ্বাসে যে অতি বিস্তীর্ণ কারবার চলিতে থাকে, তাহার নামই দল বা সমাজ। সমষ্টিগত স্বার্থরক্ষার দিকে সমাজের ন্যায় নিরপেক্ষ ও সুতীক্ষ্ণ দ্রষ্টা আর নাই। সমাজের কথা চিন্তা করিলে মানবের প্রাণ যেন কেন সসীম ভাব হইতে অসীমত্বে ছুটিয়া যায়, ক্ষুদ্রতা বা সঙ্কীর্ণতার কল্পনা মন হইতে অপসারিত হয়, সাগরোদ্দেশে নদী-প্রবাহের ন্যায় মানবের ব্যষ্টিত্ব সমাজরূপ সমষ্টি-জলধিতে ডুবিয়া যায়। তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের রূপান্তর, বাষ্প যেমন জলের ঘনীভূতাবস্থা, ব্যক্তি মাত্রই তেমন সমাজ-শরীরের অঙ্গ-বিশেষ। এ হেন সমাজ বাক্যটি গূঢ়ার্থবোধক। দেখা যাউক, উহার সারতত্ত্ব আমরা বিশ্লেষণ করিতে পারি কি না। পরস্পর পরস্পরের উপকার করিব, এই চুক্তিই যদি সমাজের উদ্দেশ্য হইল, তাহা হইলে এরূপ উদ্দেশ্য সাধনের বাসনা মানবমনে কখন বিকাশ হইয়াছে ?

ইতিহাস মনুষ্য সৃষ্টির বিষয়ে যে সাক্ষ্য দেয় তাহা ভ্রমপূর্ণ বলিয়াই বোধ হয়। ইতিহাস বলে, মনুষ্যের সৃষ্টি তিনি চারি সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে নহে ইতিহাস অপেক্ষা ধর্ম্মগ্রন্থ অনেকটা ভ্রমশূন্য বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যেও বাইবেল ও কোরাণ অপেক্ষা হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র যে অধিকতর প্রাচীন তাহা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু উহা পাঠ করিয়াও আমরা এই জটিল বিষয়ের কোন

* বরিশাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শাখার দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত—সম্পাদক।

মীমাংসা করিতে পারি না। হিন্দুদের ধর্ম্মগ্রন্থও প্রাচীনের গাঢ়তম অন্ধকারে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ঋক্‌বেদ পাঁচ ছয় সহস্র বৎসরের মনুষ্যের পরিচয় দেওয়ার স্পর্দ্ধা করেন। প্রকৃতই কি ইহার পূর্ব্বে মনুষ্য ছিল না? ক্ষীরোদ বাবুর "মানব প্রকৃতিতে" বিবর্ত্তবাদীদের যে মত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে বেশ অনুমিত হয় যে, ইতিহাস ও ঋক্‌বেদ মনুষ্যের আদিম সৃষ্টির যে প্রমাণ দেয় তাহা ভ্রম-শূন্য নহে। উহার পূর্ব্বেও মনুষ্য ছিল, কিন্তু সমাজবদ্ধ ছিল কি না তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। তবে কখন সমাজের সৃষ্টি হইল?

সমাজের প্রথম অবস্থা

আর্য্যগণ যখন উত্তর কুরুবর্ষে বাস করিত, তখন তাহারা জনসংখ্যায় সামান্য না থাকিলেও, তাহাদের আচারব্যবহার নিতান্ত ঘৃণ্য ছিল। উহাদের তখন মৃগয়ামাত্র উপজীবিকা ছিল এবং অরণ্যচর হইয়া উহারা পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে রত থাকিত। ক্রমশঃ বাসস্থানের অভাব হওয়ায় ঐ আর্য্যগণ বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া বাস করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, যে স্কান্দিনেবীয়,টিউটন,রোমক, পারসিক প্রভৃতি অপরাপর বহুতর জাতি এই আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন। উহারা মৃগয়ালব্ধ মাংসে উদরপূর্ত্তি করিত, কাজেই উহা মনুষ্য সমাজের প্রথম অবস্থা। মৃগয়ায় প্রত্যহ সফলকাম হওয়া কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর নহে। উহারা মৃগয়ার অভাবে উপবাস যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য পশুপালন আরম্ভ করিল। জীবিকানির্ব্বাহার্থ মনুষ্যের পশুপালন মনুষ্যসমাজের দ্বিতীয় অবস্থা। পশুপালনের পর উহারা শস্যাদি রোপণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় হইতে উহাদের মনে পরোপকার প্রবৃত্তি প্রবল হইল; কারণ মৃগয়া ও পশুপালন অপেক্ষা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহে পরস্পরের সাহায্য অধিকতর প্রয়োজনীয়। এই কৃষিকার্য্যের সময় ভূমির স্বত্ব ও উহার পরিমাণ সকলের মধ্যে সুস্থির রাখার জন্য কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীর আবশ্যক হইল। স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত সকলেই সেই নিয়মাবলীতে বাধ্য হইল। ত্যাগ ভিন্ন আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি হয় না। সমাজের প্রথম অবস্থায় আর্য্যসন্তানেরা তিতিক্ষার পরিচয় না দিয়া স্বার্থরক্ষার দিকে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। বহিঃ-প্রকৃতির প্রভাব তাহাদের চরিত্রকে অনেক সময় বিপথগামী করিত। এই সময় হইতে আর্য্যসন্তানেরা সমাজের উপকারিতা উপলব্ধি করিতে শিখিলেন।

সমাজের উপকারিতা

আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যজীবনগঠনে সমাজ পরম সহায়। মনুষ্য জন্মধারণ করিয়া মনুষ্যের সাহায্যে উপযুক্ত সময় কথা বলে, মনুষ্যের ন্যায় চিন্তা করে, কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বা অননুষ্ঠেয় তদ্বিষয়ে মনুষ্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হয়। মোটের উপর সে যতকাল অপর লোকের সঙ্গে মিশামিশি করিয়া একযোগে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে না পারে, ততকাল সে সংসার জ্ঞান লাভের নিমিত্ত অপরের ভাব ও অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের ন্যায় শিক্ষিত ও চরিত্রবান হইতে চেষ্টা করে। এক কথায় মনুষ্যে যাহা কিছু মনুষ্যত্ব তাহাই সে মনুষ্যের নিকট শিখিয়া লয়। মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব যদি সাম্প্রদায়িকত্ব হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সে কাহার উৎসাহে উচ্চ বৃত্তিগুলির অনুশীলনে সমুৎসাহিত হইতে পারে? কেই বা তাহার গুণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়? সমাজের নিকট মনুষ্য এত উপকৃত যে, সে যদি সেই উপকার লাভে বঞ্চিত হইত, তাহা হইলে বন্য পশু ও তাহার মধ্যে কিছু মাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইত না। যদি বলা যায় যে মনুষ্যের যাহা কিছু যুক্তি শক্তি ও মানসিক গতিপ্রবণতা দেখা যায়, উহা তাহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত হয়, সেই পূর্ব্বপুরুষগণের শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে ইহাই পাওয়া যায় যে সেই শক্তিবিকাশেও সমাজ তাহার অসা-

ধারণ হিতৈষী ছিল। সুতরাং মনুষ্যের সঙ্গে সমাজের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে।

সমাজ মনুষ্যহৃদয়ের উপর এত আধিপত্য বিস্তার করিলেও সাম্প্রদায়িকতা সমাজ গঠনের ও উন্নতির পরিপন্থী। অনেক সময় সাম্প্রদায়িকতায় যথার্থ মত প্রচারিত বা পরিগৃহীত হয় না। ইহাও দেখা যায় যে, দুর্ব্বল সম্প্রদায় কোন একটি সত্য আবিষ্কার করিয়া তাহা জীবনে বা কার্য্যে প্রায়ই প্রতিফলিত করিতে পারে না। উহা যদি প্রবল সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী হয়, তাহা হইলে উহারা সত্যপ্রিয় নিঃস্ব সম্প্রদায়ের হৃদয় হইতে সত্যের আদর্শ মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন ; যদি প্রত্যেক সম্প্রদায় সত্যরক্ষণে বদ্ধপরিকর না হয়, তাহা হইলে সমাজের ভিত্তি কি সুদৃঢ় হইতে পারে? সত্যই সমাজ দেহের প্রাণ। যদি সমাজকে সংস্কারপ্রভাবে সকলের শ্রদ্ধেয় করার আবশ্যকতা থাকে, তাহা হইলে সত্য নির্ণয়ের জন্য সকল সম্প্রদায়েরই অল্প বিস্তর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সমাজের যাহারা অন্ধ বিশ্বাসী অর্থাৎ ধর্ম্ম, নীতি ও চির প্রচলিত প্রথাগুলির সত্যানুসন্ধানে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল নিয়মানুবর্ত্তনে সকলকে প্রোৎসাহিত করেন, তাহারা কদাচিৎ দেশহিতৈষণার যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। পরন্তু তাহাদের শাসনাধীনে বাস করিয়া লোকে স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ করিতে না পারিয়া মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ে। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, বহু লোক যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করেন, তাহাই চিরন্তন সত্য, তাহাদের মতের বিরুদ্ধে কাহাকেও তর্ক বিতর্ক করিতে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। সমাজের কোন প্রশ্নে সত্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সাম্প্রদায়িক মতের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। অনেক সমাজে এরূপ মনীষী জন্মিয়াছেন, যাঁহার মত প্রথম গৃহীত না হইলেও শেষে সত্য বলিয়া আদৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালের কথা স্মরণ করিলে এ বিষয়ের সমর্থনোপযোগী অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। উদাহরণ-স্থলে ভাস্করাচার্য্য ও গ্যালিলীওর নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদ্বয়ের মত তৎসাময়িক লোক গ্রহণ না করিলেও আমরা কি উহাদের বাক্য অধুনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি না? ব্যাধিগ্রস্ত সমাজে একটা নূতন সত্য পাইয়া অনেক সময় সমাজস্থ লোক সবল হইয়া দাঁড়ায়। তাই বলি কেবল অধিকাংশ সাময়িক মতের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সমাজ যদি সত্যের প্রতি দৃষ্টিশালী হইত, তাহা হইলে অসময়ে ইউরোপ পণ্ডিতাগ্রগণ্য সক্রেটিশকে হারাইত না। ভারত শতাব্দী বসিয়া যে শিক্ষা করিয়াছে, তাহা বোধ হয় ২।১ মাসে শিখিয়া উন্নত হইতে পারিত। বহু লোকের মতের বিরুদ্ধে যখন কোন লোক দাঁড়ায়, তখন তাহাকে উপহাস না করিয়া, পরাধীন করিতে না চাহিয়া তাহার স্বাধীন মত সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচারের সুযোগ দেওয়া উচিত। যদি উহার মত ভ্রমপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সে মত নিয়া অনেক সময় সে আন্দোলন করিতে পারে না। যখন সমাজের একটি লোকের অভ্রান্ত মতের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় জীবনের উদ্ধার হয়, তখন সমাজের ব্যক্তিমাত্রই যে আশাস্বরূপ, হিতসাধনক্ষম, উদ্ধারকারী তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই জন্যই বলিতে হয়, লোকমাত্রই সমাজের অঙ্গ-স্বরূপ, উহার উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে সমাজের বিশেষ সম্পর্ক আছে। সত্যের প্রতি অনাদর বা সত্য আবিষ্কারের দিকে লক্ষ্য না রাখায় অনেক সমাজ উন্নতি-সাধনে বিমুখ হইয়াছে।

লোকের সমাজ-শরীরের অঙ্গ বিশেষ

জগৎ যে ক্রমবিকাশের প্রভাবে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, জাগতিক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই এই সার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। যাহারা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা-পরায়ণ, সত্যানুশীলনে তৎপর, তাহাদের অসাধারণ কার্য্যা-বলীর বিষয় একটু আলোচনা করিলেই বোধ হয় যে, তাঁহারা যেন জগতের গতি পরিণতির দিকে পরিচালিত করার জন্যই ধরাতলে আবির্ভূত হয়েন। যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম

কিরূপে সত্য আবিষ্কৃত হয়

এ দেশের লোকদিগকে সত্য গোপন করিয়া কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আনুষ্ঠানিক ব্রতে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, তখন বোধিদ্রুমের মূলে কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিরত হইয়া যোগিরাজ শাক্যসিংহ জ্ঞানালোকে উদ্বুদ্ধ হইলেন, এবং সাধারণ্যে মহাসত্য প্রচার করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিলেন। যখন রোমের পোপ যিশু প্রচারিত অপূর্ব্ব ধর্ম্মকে ক্রীড়া-কন্দুক মনে করিয়া স্বার্থসিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিতেছিলেন, তখন প্রাণপণে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া নির্ভীক লুথার ইয়োরোপে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম প্রচার করিয়া, শত শত লোককে পাপপথ হইতে পরিত্রাণ করিয়া ধন্য হইলেন। সত্যসাধনে ও সত্যপ্রচারে উক্ত সত্যপ্রাণ মহাপুরুষদ্বয় কি আন্তরিক অনুরক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে শুম্ভিত হইতে হয়। যাহারা সর্ব্বদা সত্যের লঙ্ঘনে তৎপর, তাহাদের আচরণে যে জাগতিক কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হয়,তাহা জ্ঞানাবতার বুদ্ধ ও লুথারের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিলেই বোধগম্য হইবে। যেখানে সাম্য সেই খানেই সত্য বিরাজমান, কিন্তু বৈষম্য সংসারের একটা অপরিহার্য্য নিয়ম। ধনবৈষম্য, শক্তি বৈষম্য, আরও কত বৈষম্য। এই বৈষম্যের ফলে সত্য চাপা পড়িয়া যায়। যেখানে শক্তিমান স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সত্য গোপনে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, সেখানে সমাজ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, সমাজস্থ লোক সৎপথে পরিচালিত হইয়া স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ করিতে পারে না। তাহারা যুক্তি ও তর্ক দ্বারা যাহা চিরন্তন সত্য বলিয়া ঠিক করেন, তাহা সত্য হইলেও কে তাহা সাদরে গ্রহণ করে? সমাজের এক শ্রেণীর লোক যদি অপর শ্রেণীর দ্বারা নিগৃহীত ও উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে সমাজের সজীবতাও কেহ আশা করিতে পারে না। যতকাল শক্তিমান বিষয়-বিশেষে শক্তিহীনেরও সারবত্তা স্বীকার না করিবেন,—সামাজিক ব্যাপারে ব্যক্তিগত মন্তব্য সমাজদেহ পরিপুষ্টির সহায়ক বলিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত না হইবেন, ততকাল সমাজের কোন মতই জনসাধারণের হৃদয়ে স্থায়ী ও নিঃসংশয় ভাবে ক্রিয়া করিবে না। আধ্যাত্মিকতা বাড়িলেই লোকের সত্যের প্রতি আসক্তি জন্মে।

আসুরিক শক্তি সমাজকে উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক

আসুরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সমাজকে উদ্ধার করিয়া থাকে।

শক্তি বিভিন্ন বিভাগ রক্ষার্থ উভয় শক্তি সম্পন্ন লোকই সমাজে প্রয়োজনীয়। কিন্তু আসুরিক শক্তি যদি আত্মরক্ষার হেতু না হইয়া পরের অধিকার ও পরের আধ্যাত্মিক শক্তি খর্ব্ব করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে সেই আসুরিক শক্তিতে সমাজ লয়প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন গ্রীসে বলবীর্য্যশালী স্পার্টাগণ (Sparta) শক্তিমদে প্রমত্ত হইয়া যখন অপরের উপর অবৈধ উৎপীড়ন করিতে লাগিল তখন সমাজের আধ্যাত্মিক শক্তি তাহাদিগকে পরাভূত করিতে না পারাতে অধর্ম্মাচরণের ফলে দুর্দ্ধর্ষ স্পার্টাগণ সমাজকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছিল। স্পার্টাসৈন্য যদি আধ্যাত্মিক শক্তিবলে নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে গ্রীসের মস্তক অসময়ে হেঁট হইত না। কর্ম্মক্ষেত্রে স্পার্টাদের ঐ আসুরিক শক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছিল বলিয়াই স্পার্টাগণ গ্রীসীয় সমাজে নিন্দনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে সমাজে বলবীর্য্যসম্পন্ন লোকের একেবারেই প্রয়োজন নাই, এ কথা বলা চলে না। যে সমাজে ঐ উভয় শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ লোকচরিত্রে পরিস্ফুট হয় না, সে সমাজের দুর্দ্দশা এরূপই হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্র সমরে যোদ্ধদলের ভিতর ঐ উভয় শক্তির যে একত্র সমাবেশ দেখা গিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোথায় সেরূপ দেখা যায় না। সে শক্তি প্রকৃতই বিস্ময়কর ও সকল সমাজস্থ লোকের অনুকরণীয়। মনোবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা সত্য হইতে অধিকতর সত্যে প্রবেশ করা উহাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

মনোবৃত্তির অনুশীলন

সত্যানুসন্ধিৎসায় শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ জন্মায়। সমাজস্থ লোকের চিত্ত কি উপায়ে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। আমাদের মনোবৃত্তির অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যদি শারীরিক বৃত্তিও বৈধভাবে পরিস্ফুট হয়, তাহা হইলে কেবল সত্যের প্রতি আসক্তি কেন, আমরা সত্যরক্ষার্থে সহস্র বিপদকে আলিঙ্গন করিতে পারি। সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণক্ষম হওয়াই কেবল আমাদের জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। সত্যস্বরূপ ভগবানের রাজ্যে যাহাতে সত্যেরই প্রতিষ্ঠা হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ সাধনায় ব্রতী হওয়া সমাজস্থ লোকের প্রধান কর্ত্তব্য। আমরা যখন কোন বস্তুকে সুন্দর বলি, তখন দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে একটি সৌন্দর্য্যের আদর্শ আছে, সেই আদর্শের সঙ্গে প্রাগুক্ত সৌন্দর্য্যের আদর্শ তুলনা করিয়া যদি সেই আদর্শানুরূপ উহা দেখিতে পাই তাহা হইলেই উহাকে সুন্দর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। সেইরূপ সত্যেরও একটা আদর্শ আমাদের মনে বর্ত্তমান থাকে। কোন একটা বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণের সময় সেই বিষয়গুলি ভাগ ভাগ করিয়া যাহা পাই, তাহার সঙ্গে আদর্শের তুলনা করিয়া সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি। উপনিষদ্ বলেন ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। ইহা হইতে এই ঠিক হয়, যে ঈশ্বরে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার পক্ষে সত্য নির্দ্ধারণ তত সহজ ব্যাপার। জাগতিক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেও বোধ হয়, জগৎ ক্রমশঃ ভগবানের অভিপ্রায়-উন্নতির দিকে চলিয়াছে, তাহাকে পরিণতির দিকে পরিচালিত করা জগদীশ্বরের একটা অভিপ্রায়। মিথ্যা দ্বারা যখন যে অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে পারে না, তখন মিথ্যা যে ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধ তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি! যাঁহারা মিথ্যাবর্জ্জন ও সত্যগ্রহণে উৎসাহদাতা, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত হিতৈষী। মন যখন উচ্চ আদর্শের প্রতি সঞ্চালিত হয়, তখনই মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, মিথ্যা বস্তুর তৃষ্ণা অসার বলিয়া বোধ হয়। সমাজের প্রত্যেক লোক উচ্চ আদর্শের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিলেই সমাজস্থ লোকচরিত্রে বলবীর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ দেখা যাইতে পারে। কারণ উভয় দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া উচ্চাদর্শের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নহে।

সত্যানুসন্ধিৎসা

সমাজের অনেকে প্রাচীন আচার ও রীতিগুলির প্রতি এত শ্রদ্ধাপরবশ যে উহার ভিতর কতটুকু সত্য আছে, তাহা বিচার না করিয়া তদনুশীলনে বিশেষ আনুরক্তি প্রদর্শন করেন। ঐগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে যাহারা উহাদের প্রবর্ত্তক তাহারা সাময়িক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কতকগুলি আচার ও রীতি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের কতকগুলি যে পরিবর্ত্তনীয় তাহা রীতিনিষ্ঠ ও আচারপরায়ণগণ স্বীকার না করিলেও সমাজের গতিই উহার সাক্ষ্য দিতেছে। প্রাচীন কালের রীতিনীতির উপর বিশ্বাসস্থাপন প্রশংসার্হ। কিন্তু প্রাচীন রীতিনীতির অনুসরণের মূলে জ্ঞান থাকা চাই। মনুষ্য ভ্রমসঙ্কুল, কিন্তু তাহা হইলেও সকল লোকেরই বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হয়। এই বিচার দ্বারা সম্যক সত্য প্রকটিত না হইলেও, যতটুকু আবিষ্কৃত হয়, তাহা পরবর্ত্তী লোকের পথপ্রদর্শক হইয়া দাঁড়ায়।

কোন কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদের দেশীয় লোক অন্যান্য দেশের ন্যায় তাহাতে যোগদান করেন না। বোধ হয় প্রাচীন কালের ঋষিবাক্যে ইহাদের শ্রদ্ধা বড়ই বলবতী। উহাদের বাক্য তর্কবিতর্ক করিয়া বুঝিয়া লওয়া উহারা পণ্ডশ্রম মনে করেন। অন্তশ্চক্ষুসম্পন্ন ঋষিগণ আজকাল যখন সমাজের নিয়মসংস্থাপক নহেন, অথচ সমাজসংক্রান্ত নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন যখন একান্ত আবশ্যক, তখন উহা সময়োপযোগী করার জন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতের লোকেরও আন্দোলন ও চর্চ্চায় যোগদান করা উচিত।

মৌলিকতা

যে সমাজস্থ লোক অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়, সে সমাজস্থ লোকের ভিতর ঐক্য বন্ধন থাকিলেও তাহারা পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। ভারতের ইতিহাস এমন অনেক কুসংস্কারমূলক ঘটনার সাক্ষ্য দেয় যে উহা যথোপযুক্ত তর্কবিতর্কের অভাবে শ্রেণীবিশেষের হৃদয়ে এত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, উহার বিষময় ফলে অনেক লোকের শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। সকলে একটা নির্দ্দিষ্ট রীতি আশ্রয় করিলে লোকচরিত্র এক ছাঁচে ঢালা যাইতে পারে বটে। কিন্তু সমাজের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য লোকমাত্রকে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্তি প্রদান। এই সত্য নানা কার্য্যে নানারূপ চিন্তায় উদ্ভাবিত হইতে পারে না কি ? সমাজের স্থিতির দিকে দৃষ্ট রাখিলে, বিভিন্ন ব্যবসায়ী লোকের বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন কার্য্যসাধনের অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। এই বিভিন্নতা লোকচরিত্র একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কার কারণ নাই। মৌলিকতা মনুষ্য-চরিত্রের প্রধান ভূষণ। যেখানে একই আচার সকলের অবলম্বন হয় সেখানে মৌলিকতা পরিস্ফুট হইতে পারে না। প্রত্যেক লোকই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য মাত্রকে প্রকৃতির অনুকূল কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া উচিত। উহার ফলে যে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। বিভিন্ন ব্যবসায় জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইলে, এক দিকে যেমন সমাজের আচার লঙ্ঘিত হয়, অপর দিকে তেমনই চরিত্রের মৌলিকতা প্রকাশ পায়। সমাজদেহের পরিপুষ্টি ব্যক্তিগত মৌলিকত্বের উপর যতটা নির্ভর করে, ততটা আচারানুবর্ত্তনের উপর নহে।

বর্ণ বৈষম্য

শুনিতে পাই বেদে বর্ণবৈষম্যের কথা নাই। এই বর্ণবৈষম্যের কথা বেদে না থাকিলেও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। বেদে যাহা নাই তাহাই যে সমাজ শরীরের প্রতিকূলাচরণ এ কথা স্বীকার করা যায় না। যাহারা ঐ বর্ণ-বৈষম্যের প্রবর্ত্তক, তাঁহারা চরিত্রের মৌলিকত্বের উপর বড়ই দৃষ্টিশালী ছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিচতুষ্টয়ের উৎপত্তির কারণ চিন্তা করিলে বোধ হয় যে, যাহারা ঐ সময় বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বিশেষত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহারাই গুণানুসারে এক এক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীভুক্ত হওয়ার সময় নিশ্চয়ই উহাদের চরিত্রগত মৌলিকত্ব নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়া উহাদিগকে যোগ্যতানুসারে স্থানাধিকার করার সাহায্য করিয়াছিল।

জাতিবিভাগ আজকাল একটা মহা অনর্থের মূল বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে উহা গঠিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে আর্য্যবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এক ব্যবসায় অধিকার জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত রাখিয়া দিলে, যাহারা অশক্ত তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান হয় না। পাছে নিতান্ত অকর্ম্মা দুর্ব্বল ব্যক্তিও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া উপায়হীন হইয়া পড়ে, এই জন্য আর্য্যগণ সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। নিয়ম হইল যে, কেহই জাতিগত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিবে না। সমাজের অতি হেয় ব্যক্তির জন্যও এত সতর্কতা শুধু এই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজেরই সম্ভবপর"। বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদ শক্তি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে না। এইজন্য শ্রেণীবিশেষ সমাজকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা যেমন সমাজের প্রতি কতকগুলি লোকের সহানুভূতি হারাইতেছি, তেমনি আমরা উপযুক্ততার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ব্যক্তিবিশেষকে উপযোগী বৃত্তি বা অধিকার দিতে বিরত হইতেছি। এইরূপ নিয়মের সংস্কার না হইলে আর্য্যদিগের সামাজিক জীবন দিনদিনই দুর্ব্বিষহ ক্লেশদা ক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইবে।

আমার এই কথায় কাহারও মনে যেন ধারণা হয় না যে, আমি বর্ণ বৈষম্য উঠাইয়া দিতে বলিতেছি। যোগ্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া স্বভাবের অনুকূলে জীবিকা নির্ব্বাহের বৃত্তি সুস্থির করিয়া দেওয়া যখন বর্ণ-বৈষম্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে চিরকালই লোকের বর্ণবৈষম্য স্থির রাখা কর্ত্তব্য। কারণ একই ব্যবসায়ে যদি সকল লোকই বুদ্ধিবৃত্তি বা শক্তি নিয়োগ করে, তাহা হইলে অন্যান্য বিভাগের কর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে? বিশেষতঃ শক্তি-সম্পন্ন কৃতী পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া শক্তিহীন লোক আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। কর্ম্ম না করিয়া যখন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না, তখন কৃতী ও অকৃতী গুণবান নির্গুণ, পণ্ডিত ও মূর্খের প্রবেশের জন্য কর্ম্মের শ্রেণীবিভাগ উন্মুক্ত না রাখিলে চলিবে কেন? সমাজ যখন বর্ত্তমান সময় গুণানুসারে কর্ম্ম যোগাইতে পারিতেছে না, এবং পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়া অযোগ্যকে যোগ্য স্থান প্রদান করিতেছে, এবং যোগ্যকে অযোগ্য বৃত্তিতে নিয়োগ করিয়া সত্যপথভ্রষ্ট হইতেছে তখন যেরূপ সংস্কার দ্বারা সমাজের এই দোষ সংশোধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য! বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান সময়ের বর্ণ বৈষম্য দ্বারা লোকচরিত্রের মৌলিকতা নষ্ট হইতেছে।

স্বাধীন মত

মানবচরিত্রের মৌলিকতা বৃদ্ধির নিমিত্ত স্বাধীন মত ও স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেকে মনে করেন যে শাখাপল্লব ছাঁটিয়া দিলে যেরূপ বৃক্ষের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ মনুষ্যমাত্রকে কঠোর শাসনের মধ্যে রাখিয়া পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মানুসরণ করিতে বাধ্য করিলে মনুষ্যচরিত্র সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়। আদর্শকে ধরিবার জন্য কতকগুলি নিয়মের বাঁধাবাধি কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যে সব মত পোষণ করিলে বা যে সব বৃত্তির অনুশীলন করিলে আদর্শ হইতে পিছাইয়া পড়িতে হয় না, সে সব মত পোষণ করিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। ভগবানের সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিলে বোধ হয় যে, কোন প্রবৃত্তি বা বৃত্তির চরিতার্থতায় যদি ভগবৎ-সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাহা হইলে উহা আচার বা নিয়ম বহির্ভূত হইলেও চরিতার্থ করিতে দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু এই কার্য্যে এইটুকুমাত্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উহা পূর্ণ বা চরিতার্থ করিতে দিলে ব্যক্তিগত ন্যায্যস্বার্থ সংরক্ষিত হয় কি না? কোন ব্যক্তির সুখ বা মঙ্গলের পথে ঐরূপ কোন বৃত্তির অনুশীলন যদি কণ্টকবৎ পরিগণিত হয়, তাহা তাহা হইলে সেই বৃত্তির অনুশীলনে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে অনেক স্থলে অনেকে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ হয়েন। তাঁহারা বলেন যে, তাহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়াতে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয় না। সমাজে স্বাধীন মত প্রকাশ করা ও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করার গুরুত্ব তুল্য নহে। কোন একটি মত প্রকাশিত করার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, যাহাদের মধ্যে উহা প্রকাশিত হইল, তাহারা সেই মতটি কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ ভাবে ব্যবহার করে। এইজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাধীন মতও সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। মনুষ্য যখন নির্ভুল বা পূর্ণতাপন্ন নহে, তখন তাহাকে স্থানবিশেষে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দিলেও অপরের সঙ্গে তাহার মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। কতকগুলি সামবায়িক মত সংগ্রহ করিয়াই কোন বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত নহে; লোকমাত্রই যাহাতে উহার প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তদ্দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রতিবাদহীন মত সমাজে প্রবর্ত্তন করিলে অনেক সময় সমাজ অনেক কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হয়।

প্রকৃতির আধিপত্য প্রত্যেক সমাজের উপরই পরিদৃষ্ট হয়। অনেকে উহা না বুঝিয়া প্রকৃতিবিরোধীয়

ভাব অপর সমাজ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ সমাজে প্রবর্ত্তন করেন। এরূপ অনুকরণ পরিত্যজ্য।

অনুকরণ

প্রত্যেক সমাজই কিছু না কিছু অনুকরণপ্রিয়। গুণের অনুকরণ অনেক সময় প্রশংসনীয়, কিন্তু যাহার হৃদয়ে পরিণতির একটা আদর্শ আছে, তাহারা সর্ব্বথা কখনও অনুকরণ করিবার পক্ষপাতী হন না। সংসর্গফলে যে উদার ভাব ও নীতি শিক্ষা করা যায়, উহা চরিত্রে প্রতিফলিত করাকে অনুকরণ বলে না। পৃথিবীর নিকট বা লোক-বিশেষের নিকট যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, উহা চরিত্রে ফলাইলেই যদি অনুকরণ করা হইত, তাহা হইলে অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধদের নিকট আমাদের কি শিখিবার কিছুই নাই? স্বাধীন ভাবে কার্য্য করার অধিকার দেওয়ারও একটা নির্দ্ধারিত সময় থাকা উচিত। প্রত্যেক সমাজস্থ লোকের অন্ততঃ যৌবনকালটা অভিজ্ঞ লোকের শিক্ষার অধীনে ব্যয় হওয়া কর্ত্তব্য। লোকের যখন মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত হয়, নৈতিক বলে চরিত্র উন্নত ও নির্দ্দোষ হয়, মুখখানিতে সংযমের কঠোরতা সূচিত হয়, তখন তাহাকে কার্য্য-বিশেষে যদৃচ্ছাক্রমে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। অনুপযুক্ত সময়ে স্বাধীন ভাবে চলিতে দিলে লোকের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। স্থূল কথা, জীবনের কতকাংশ বিচার উপলব্ধি এবং প্রভেদাত্মক জ্ঞানার্জ্জনে ব্যয় করিয়া প্রত্যেক লোকের স্বেচ্ছানুরূপ পন্থাবলম্বনের যোগ্য হওয়া উচিত। যাহাদের জীবন কেবল প্রচলিত রীতি ও পুরাতন প্রথার অধীনে ব্যয় হয়, তাহারা যেমন বুদ্ধি দ্বারা ভালমন্দ প্রভেদ করিতে পারে না, তেমন উৎকৃষ্ট পথে অগ্রসর হইবার জন্য অভিলাষও করে না। ব্যায়ামের ফলে যেমন মাংসপেশী সুদৃঢ় হয়, তেমন মানসিক শক্তিও উপযুক্ত ব্যবহারে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মানসিক বৃত্তির যত স্ফুরণ হইবে, তত সত্যের ভিতর হইতে অধিকতর সত্য বাছিয়া বাহির করা যাইবে। কিরূপে মানসিক শক্তির পরিচালন করা যায়, তাহা জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যখন সমাজে একটী সত্য প্রচারিত হয়, তখন উহা নিজের যুক্তিতর্কের সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া উচিত। যুক্তি তর্ক না খাটাইয়া অপরের প্রচারিত সত্য বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিলে অনেক সময় যুক্তিশক্তি নষ্ট হয়। যে কোন জটিল বিষয়ই হউক না কেন, যুক্তিতর্ক বলে একবার বুঝিয়া লইতে পারিলে, তৎপ্রতি লোকের একটা আসক্তি জন্মে। যে কার্য্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ থাকে না, সে কার্য্য মহৎ হইলেও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। বিষয়বিশেষে যুক্তিতর্কের প্রয়োজন এই জন্যই কতটা বাঞ্ছনীয়। সমাজের যাঁহারা প্রধান লোক, সময়ের গতির দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। আমরা সাধারণতঃ দুই প্রকার সমাজ দেখিতে পাই। এক প্রকার হ্রাসবৃদ্ধিরহিত বদ্ধ সমাজ, অপর প্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ উদ্যমশীল লোকের উন্নতিশীল সমাজ।

বদ্ধ ও উন্নতিশীল সমাজ

যে সমাজ পুরাতন প্রথার একটুও পরিবর্ত্তন করিতে চাহে না, যে সময়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবল শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানিয়া চলে, সময় তাহার প্রতিকূল হওয়াতে, উহা উন্নতির পথে বাধা প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ যে সমাজস্থ লোক কোন এক সময় স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের জীবনধারণের উপায় যদি পরহস্তগত হয়, তাহা হইলে সময়ানুসারে পূর্ব্বতন বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়া উহারা যদি প্রাচীন প্রথা ও রীতিই সমাজরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করেন, তাহা হইলে তাহাদের সমাজ যে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ভাগ্যক্রমে যদি ঐ শ্রেণীর লোকের সমাজ টিঁকিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই যথেষ্ট। বিজয়ীর সংস্রবে বিজি-তের কেবল ব্যবসায় বাণিজ্য এবং প্রাচীন রীতি-নীতিরই পরিবর্ত্তন ঘটে না, আদর্শেরও পরিবর্ত্তন

ঘটিয়া থাকে। যে সময় কোন জাতির আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটে, সে সময় সে জাতি মৃতাবস্থায় গিয়া দাঁড়ায়। আর্য্যসন্তানেরা যখন মধ্য এশিয়া পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ পথ ধরিয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন প্রকৃতি সুন্দরী তাহাদের উপাস্য হইয়াছিলেন। কেনই বা না হইবেন! সেই শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা, অভ্রভেদী শৈলমালা, অনায়াসলভ্য ফলমূল শোভী অরণ্যাণী, যাহার কথাই বল, সকলগুলিই তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের হেতু হইল। প্রকৃতিপ্রদত্ত ঐ সব আশ্চর্য্যজনক জিনিষ অবলোকন করিয়া আর্য্য সন্তানেরা প্রকৃতিকে উপাসনা করিতে শিখিল। আজও প্রকৃতির বিচিত্র হস্তনির্ম্মিত সেই সব শোভমান দৃশ্য বর্ত্তমান, কিন্তু বিজয়ীর সংশ্রবে বিজিতের আদর্শেরও এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, উহারা আর শিক্ষিত লোকের নিকট পূজার্হ নহে! হিন্দুরা প্রকৃতির প্রসাদে যে রমণীয় স্থানে বাস করিতেছে, তাহাতে মনকে মহানের দিকে প্রসারিত করার পক্ষে ঐ নয়নাভিরাম দৃশ্যগুলি কি অমূল্য সম্পদ নহে? বিজয়ীর গুণগ্রহণ করা পরাধীন জাতিরই মঙ্গলজনক, কিন্তু পরাধীন জাতির যাহা স্বাভাবিক আদর্শ, তাহা পরিত্যাগ করার কল্পনা কি পরিতাপের বিষয় নহে! যে সমাজ সময় ও প্রকৃতির অনুকূলে চলে, সেই সমাজই উন্নত হয়। হিন্দুসমাজ বর্ত্তমান সময় প্রকৃতির ও সময়ের প্রতিকূলেই চলিতেছে। এইজন্য বলিতে হয় যে তাহা ধ্বংসোন্মুখ নতুবা স্থিরভাবাপন্ন বা Stationary.

পাশ্চাত্য সমাজ দোষবর্জ্জিত না হইলেও যে অনেক বিষয়ে উন্নত, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দেখা উচিত কোন গুণে উহা এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজের অধিকাংশ লোকই যে আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, এমন কথা বলা যায় না। তাহাদের উন্নতির মূল অনুশীলন ও চরিত্রের নানাত্ব (Diversity of character)। ইউরোপীয় লোকের প্রধান গুণ এই যে, উহারা স্থিরলক্ষ্য, এবং উহা উহাদের স্বভাবানুযায়ী করা চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। বোধ হয় এই জন্যই অল্পায়াসে প্রায় কার্য্যে অপ্রত্যাশিত ফল লাভ করিয়া উহারা সমাজ ও দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়া থাকেন। এ দেশের লোকের যেরূপ অবস্থা ও সামাজিক রীতিনীতি, তাহাতে কয়জন প্রকৃতির অনুকূলে কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হয়েন? সমাজ সুসংস্কৃত নহে বলিয়াই যিনি যে বিভাগে নিযুক্ত হইয়া স্বাভাবিক শক্তিবলে বিশেষত্ব দেখাইতে পারিতেন, সে বিভাগ তাহার জন্য উন্মুক্ত নহে! সমাজের এই দোষ অমার্জ্জনীয়। ইহার ফলে সমাজ অনেক প্রতিভাবান যোগ্য পুরুষের উপযুক্ত সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইতেছে। প্রতিভা ও শক্তির অনুকূলে কর্ম্ম যোগাইয়া হিন্দু সমাজ যদি হিন্দুদের কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে সমাজ অনেক উন্নতাবস্থায় আরোহণ করিয়া বিদেশীয় লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিত। পাশ্চাত্য সমাজের এই গুণ যে, তাহারা সমাজস্থ লোকের প্রতিভা পরিস্ফুট করার জন্য কর্ম্মের নানারূপ বিভাগ খুলিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বিরাট হিন্দু সমাজ তদ্দিকে দৃক্‌পাতশূন্য। একটি বর্দ্ধমান বৃক্ষের মূল দেশে সার দেওয়ার পরিবর্ত্তে যদি ধ্বংসকারী ঔষধ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বৃক্ষটি স্বভাবের নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত না হইয়া যেমন দিন দিন অন্তঃসারশূন্য হয়, আমাদের সমাজস্থ লোকও প্রকৃতির অনুকূলে কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত না দেখিয়া শুষ্কতরুর ন্যায় অন্তঃসারশূন্য হইতেছে। ক্রমাগতই যদি হিন্দু সমাজের লোক এইরূপ প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া প্রতিভা ও শক্তি জলাঞ্জলি দিতে বসে, তাহা হইলে সমাজ কতজন উপযুক্ত লোক শিক্ষা দেওয়ার স্পর্দ্ধা করিতে পারিবেন? বহু অত্যাচার হিন্দু সমাজ অতিক্লেশে সহ্য করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহার শরণাগত লোকের প্রকৃতির অনুকূল কর্ম্মদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সমাজ বুঝি মরমে মরিয়া যাইতেছে। যে সমাজের

অধীনে থাকিয়া মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করার উপাদান পায় না, সে সমাজের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। চারিদিকে ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা শুনিয়া আশান্বিত হইতেছি যে, বিধাতা বুঝি এখন একবার অভাগা ভারত-সন্তানের প্রতি প্রসন্নমুখে চাহিবেন। ধনী সম্প্রদায়ের নিকট আমাদের এই বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা যেন ধনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় একবার এই অবসরে চিন্তা করিয়া দেখেন।

সমাজের প্রভুত্ব

সমাজ যখন মনুষ্যের অসাধারণ হিতৈষী তখন মনুষ্যের উপর কি তাহার কোন প্রভুত্ব নাই? মনুষ্যমাত্র সমাজের অধীন হইলেও, সমাজ তাহার কতকটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে। এই উপকারের জন্য ব্যক্তি মাত্রেরই তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যেখানে ব্যক্তি বা জনসাধারণের কোন ন্যায্য স্বার্থ বা অধিকার কাহারও কর্তৃক বিলুপ্ত হয়, সেই খানেই সমাজ শান্তিহারকের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের অধিকারী। এই অধিকারের সীমা দুই প্রকার নির্দিষ্ট আছে, একপ্রকার আইনসঙ্গত অধিকার, অপর প্রকার সমাজনির্দ্ধারিত অধিকার। ব্যক্তিবর্গকে এই দুই অধিকার প্রদানের জন্য সমাজ যখন কাতর তখনই বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, এবং সমাজের শক্তিহীনতা প্রকাশ পায়। ব্যক্তিবর্গকে এই দ্বিবিধ অধিকার প্রদানের জন্য সমাজ কেবল দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন করিয়াই কি নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? তৎ সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের উচ্চশিক্ষা প্রদানের বন্দোবস্ত দরকার। আমার মনে হয় প্রকৃত শিক্ষা পাইলে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শিক্ষায় অগ্রসর হইলে মনুষ্য-মাত্রই শান্তভাবাপন্ন হইবে এবং বিভিন্ন সমাজস্থ লোক একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সর্ব্বদাই পরস্পরের উপকার-চেষ্টায় রত থাকিবে। তখন হয় ত সমাজে আসুরিক শক্তি সম্পন্ন লোকের মোটেই দরকার হইবে না। কিন্তু সেরূপ সময় উপস্থিত হইবার বিশেষ বিলম্ব আছে বলিয়া বোধ হয়। যতকাল পর্য্যন্ত আমরা না বুঝিব যে পরের উপর কর্ত্তব্য পালন করিয়াই আমরা সমাজকে সবল রাখিতে পারি না, নিজেরাও যদি কর্ত্তব্যের রেখা বিন্দুমাত্র উল্লঙ্ঘন করি, তাহা হইলেও সমাজ-দেহ রুগ্ন হইয়া পড়ে, ততকাল পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ, আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, আমরা আত্মদ্রোহী। সমাজতত্ত্ববিদ মনস্বী জেমস ষ্টুয়ার্ট (?) মিল (James Stuart Mill) তাহার একখানি গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন তাহা শুনিলেই ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"No person is an entirely isolated being. It is impossible for a person to do anything seriously or permanently hurtful to himself without mischief reaching at least to his near connexions, and often far beyond them. If he injures his property, he does harm to those who directly or indirectly derived support from it, and usually diminishes by a greater or less amount, the general resources of the community. If he deteriorates his bodily or mental faculties he not only brings evil upou all who depend on him for any portion of their happiness, but disqualifies himself from rendering the services, which he owes to his fellow-creatures generally."

সমাজ-তত্ত্বের এরূপ সার আলোচনা অল্প গ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হয়। ইহার তৎপর্য্য চিন্তা করিতে গিয়া লেখকের উপর আমার বিশেষ ভক্তির সঞ্চার হইল। মনে হয় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই চূড়ান্ত কথা, ইহার উপর আমার কোন বক্তব্য নাই।

৺ সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

———

স্মৃতির মন্দির

আজি মোর সব গেছে ! শুধু স্মৃতি তব
এখনো রয়েছে বুকে করিতে গৌরব
তোমারে আমারে বলি' ! অস্ত মধু-রাতি
শুধু রেখে একখানি ফুল্ল মালা গাঁথি'
অমলিন সুধা মাখা ! নিত্য যথা প্রিয়ে,
তোমারি চরণ-রেণু বিশ্বে পবিত্রিয়ে
অলক্ষ্যে পড়িত ঝরি' গভীর মিলনে
তুষিতে অধম দাসে, সপ্রেম সান্ত্বনে
জুড়াতে সকল ব্যথা, আজিকে সেথায়
প্রতি বিন্দু হৃদি-রক্ত বিনিময়ে হায়,
উদার অম্বর-চুম্বী মহাকালজয়ী
স্মৃতির মন্দির এক অয়ি প্রাণময়ী,
অজ্ঞাতে উঠেছে গড়ি' ! এ তো নহে "তাজ"—
তোমারি ভিখারী কবি ধন্য তবু আজ !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মাণিক দত্তের "মঙ্গল চণ্ডী"*

মালদহের অধীন শিরশী নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া দিবস চতুষ্টয় পূজার আসরে মঙ্গল চণ্ডীর গান গীত হইয়া থাকে। ষষ্ঠীর দিন যে কিছু না হয় তা নয়; সে দিনও গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর এবং গুরু প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তির বন্দনাদির পর মঙ্গল-চণ্ডী গানের পূর্ব্বাভাস দেওয়া হয়। তাহাতে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা অর্থাৎ প্রথমে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিরূপ ছিল, ক্রমে কিরূপে তাহাতে স্থলের সৃষ্টি হইল, পরে কি প্রকারে দেবমানবের সৃষ্টি ও বসবাস হইল, ইত্যাদি পৌরাণিক বিষয়ের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হয়। সপ্তমী হইতে মূল পালা আরম্ভ করিয়া দশমীর সন্ধ্যায় "বহিত" তুলিয়া তাহা শেষ করা হয়। "বহিত" তোলা ব্যাপারটা বড় কৌতুকপ্রদ। আসরের একপার্শ্বে একটী ছোট পুষ্করিণী কাটিয়া তাহার চারিটী ঘাট করা হয়; পুষ্করিণীর চারি কোণে চারিটী কদলীশাখা প্রোথিত করিয়া আলিপনাদির দ্বারা উহার চতুর্দ্দিক চিত্রিত করা হয়। পরে পুষ্করিণীটী জলপূর্ণ করিয়া ও চারি ঘাটে চারিটী গোটা পান ও সুপারি স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি সহযোগে তথায় গঙ্গা পূজা করান হয়। এ দিকে কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র নৌকা একখানি আলিপনাদির দ্বারা বিচিত্র করিয়া তদুপরি স্বর্ণ, রৌপ্য, কড়ি ও চামর রক্ষা করা হয়; একখানি কুলায় পাঁচসের ধান্য ঢালিয়া হরিদ্রা রঙ্গের বস্ত্রখণ্ড দিয়া আবৃত রাখা হয়। বৃন্ত সহিত একটী কুষ্মাণ্ড ও এক গাড়ু জলও প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। গঙ্গা পূজা শেষ হইলে নায়কদের মধ্য হইতে অর্থাৎ যাঁহাদের অর্থসাহায্যে ও উদ্যোগে পূজা হইতেছে—দুইজন বালক বা অবিবাহিত যুবককে ডাকিয়া সজ্জিত নৌকাখানি পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া এ ঘাট ও ঘাট করিয়া চারিঘাটে চারি বার লাগানর পর হুলুধ্বনি সহকারে একজনের মাথায় তুলিয়া দেওয়া হয়। ধান্যপূর্ণ কুলাখানি অপরের মাথায় দেওয়া হয়। পুষ্করিণী হইতে পূজার ঘর পর্য্যন্ত এক খণ্ড নূতন বস্ত্র পাতিত করিয়া তাহার উপর দিয়া সর্ব্বাগ্রে একজন জলের গাড়ু লইয়া ধীরে ধীরে জল ঢালিয়া চলিবেন, তৎপশ্চাতে একজন বৃন্তসাহায্যে কুষ্মাণ্ডটী গড়াইয়া লইয়া যাইবেন, তৎপশ্চাতে ধান্যপূর্ণ কুলা, ও সর্ব্বশেষে নৌকা যাইবে। বোধ হয় ইহার তাৎপর্য্য এই:—অগ্রে জলের ঝারা দিয়া মঙ্গলাচরণও হয় এবং বাণিজ্যশেষে গৃহে প্রত্যাগত সাধুর বহুতর বাণিজ্য-সম্ভার তুলিবার অগ্রে জল দ্বারা পথের ধুলি

* মালদহ-সাহিত্য সম্মিলনের কালিগ্রাম অধিবেশনে পঠিত, কার্ত্তিক, ১৩২০।

নিবারণ করাও হয়। তৎপরে "ধন", অর্থাৎ তাল তাল বা কুষ্মাণ্ডাকার সুবর্ণ, তৎপরে "ধান্য", সর্ব্বশেষে "বাহিত্র" অর্থাৎ নৌকা, যাহাতে বোঝাই দিয়া স্বর্ণ ও ধান্যের ন্যায় মূল্যবান দ্রব্যজাত আনা হইয়াছে তাহাই, গৃহে উঠিবে। বহিত্র গৃহে উঠানর অর্থ, বোধ হয়, বন্দরে আনিয়া নিরাপদ স্থানে রাখা। এই "বাহিত্র" কথার অপভ্রংশেই "বহিত" কথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে যখন দেশের সওদাগরেরা বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন তখন বাস্তবিকই তাঁহারা নানাদেশ হইতে ঐরূপ কুষ্মাণ্ডাকার অর্থাৎ ভূরিপ্রমাণ সুবর্ণ আনয়ন করিতেন। এক্ষণে বাণিজ্যহীন দেশে তরকারির কুষ্মাণ্ড তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে. ইহাপেক্ষা অধিকতর অবনতি আর কি হইতে পারে। পূর্ব্বেকার এমন জলন্ত দৃষ্টান্ত চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এবং হাতে কলমে প্রতি বৎসর তাহার একটা বীভৎস অভিনয় করা সত্ত্বেও আমাদের জড়তা ভাঙ্গে না. ইহা আরও পরিতাপের বিষয়! বাণিজ্যলব্ধ দ্রব্যজাত গৃহে তুলিবার সেকেলে ব্যবস্থাও কেমন সুন্দর! অগ্রে ধন, তৎপরে "বহিত্র"।

নবমীর রাত্রিশেষে আর একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ পাটনের মশানে উপস্থিত করিয়া শ্রীমন্তের প্রাণদণ্ডের জন্য যখন কোটাল শাণিত খড়্গ উত্তোলন করে, তখন তাঁহার উদ্ধারার্থ চণ্ডী দেবী পক্ককেশা বৃদ্ধা রূপে মশানে অবতীর্ণা হন; আসরে গায়কদের একজন বুড়ীর মুখোষ মুখে দিয়া ঐ অংশ অভিনয় করে। তৎপরে ভৈরবী বেশে দুর্গার আগমন, সর্ব্বশেষে চামুণ্ডা রূপে দেবী মশানে অবতীর্ণা হইয়া রাজার সৈন্যসামন্ত সংহার করিতে লাগিলে শ্রীমন্তের মুক্তি হয়।

এই চামুণ্ডা নামা অংশটী নিম্ব কাষ্ঠে নির্ম্মিত চামুণ্ডার মুখোষ মুখে দিয়া গায়েনেদের একজন অভিনয় করিয়া থাকে। এই অভিনয় ও ঐ মুখোষখানি তাহারই চিরন্তন সম্পত্তি। তাহার পিতৃপিতামহও ঐ চামুণ্ডা নাচিত, সেও নাচে, তাহার পুত্রপৌত্রও নাচিবে, এইরূপই প্রথা। অবশ্য ইহাতে কিছু প্রাপ্যও আছে; পূর্ব্বে বিলক্ষণই ছিল, এক্ষণে বিস্তর কমিয়াছে। মুখোষ মুখে দিয়া আসরে নামিলে সেই ব্যক্তির উপর না কি দেবী আবিষ্টা হন; সেই সময়ে দর্শক মণ্ডলীর কেহ কোন কামনা করিলে তাহা পূর্ণ হইবে কি না মুখোষ পরা ব্যক্তিটা ঘাড় নাড়িয়া তাহার উত্তর প্রত্যুত্তর করে। যাহার কামনা পূর্ণ হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ দেওয়া হয়, তাহাকে হয় পূজা, নয় গান, না হয় চামর, কিম্বা শাড়ী বা নূপুর ইত্যাদি দিতে প্রতিশ্রুত হইতে হয়।

কোটালের মুখোষ আছে. ভৈরবীর কেবল "কপালী" অর্থাৎ শোলার মুকুট, মুখোষ নাই। ইহা ব্যতীত গানের মধ্যে মধ্যে হাস্যোদ্দীপক সংও অনেক দেওয়া হয়। দশমীর প্রত্যূষে চামুণ্ডা নাচার পরই গান সাঙ্গ করিয়া, আবার বৈকালে আরম্ভ হয় ও সন্ধ্যায় "বহিত" তুলিয়া একবারে পালা শেষ করা হয়।

দক্ষিণ পাটনের মশানে প্রাণদণ্ড হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীমন্ত তথাকার রাজকন্যা, অন্যান্য উপঢৌকন ও বাণিজ্য সম্ভার গৃহে আনয়ন করিলে পালা শেষ করা ও দেবীর প্রতিমা বিসর্জন করা প্রথা; কিন্তু মূল পালার আরও অবশিষ্ট থাকে। এই পালা আট দিনে গীত হইলে তবে সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু পূজার স্থায়িত্ব মাত্র চারি দিন, সুতরাং চারিদিনে শেষ করিবার জন্য উহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করা হইয়াছে। যে সমস্ত গীতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয় তাহাকে প্রায়ই মঙ্গল গীত বলে; যথা, অন্নদামঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি। এগুলি সচরাচর অষ্ট রাত্রি ও সপ্ত দিবস ব্যাপিয়া গীত হইত, সেই জন্য "অষ্টমঙ্গলা" নামেও এগুলি আখ্যাত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি শুভকার্য্যে এই অষ্টমঙ্গল গীত না হইলেই চলিত না, কিন্তু লোকের রুচি পরিবর্ত্তিত হওয়াতে এক্ষণে উহার আদর গিয়াছে; যদিও ভ্রমক্রমে কেহ করায় তবে চারি দিনের বেশী নয়;

সুতরাং সম্পূর্ণ গ্রন্থভাগ এখন পাওয়া সুকঠিন। আবার এই গানের গায়কেরা প্রধানতঃ কোচ, পোলি ও রাজবংশী জাতীয়; ইহারা এমন কুসংস্কারাপন্ন যে গ্রন্থভাগ কাহাকেও দিলে বা দেখাইলে ইহাদের বংশদেবীর অকৃপা হইবে, ইহাই তাহাদের ধারণা। অনেক স্থলে গায়েনেরা তাহাদের নিজ নিজ গুরু বা ওস্তাদের নিকট মুখে মুখে গান শিখিয়া থাকে, কেহ কেহ বা স্বপ্নেও শিখিয়াছে, এরূপ প্রবাদ প্রচলিত। এই কারণে বিশেষ অনুসন্ধানেও হস্তলিখিত মূল গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। বহুকালব্যাপী চেষ্টায় আধুনিক লোকের লিখিত নকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু বর্ণাশুদ্ধি ও লিখনভঙ্গীর দোষে এবং মাঝে মাঝে কতক শব্দ পড়িয়া যাওয়ায় তাহারও সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই। কোন কোন স্থানে কতকাংশ একেবারে পরিত্যক্ত হওয়ার গ্রন্থভাগ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাইয়াছি। যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশ যে খাতায় লেখা ছিল, তাহা আজ ৬।৭ বৎসর হইল মালদহ জেলাস্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক পরমপূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেখিতে লইয়াছেন, এ যাবৎ ফেরৎ পাই নাই। যৎকিঞ্চিৎ যাহা নিকটে আছে তাহা হইতে মূলগ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাষ দিবার চেষ্টা করিব। আবশ্যক হইলে গ্রন্থভাগ পরে পাঠাইতেও পারি। সাহিত্য সম্মিলনীর অনুগ্রহ-আহবানে ও সম্পাদক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়ে আপনাকে পরম সম্মানিত জ্ঞান করিয়া শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও লেখনী ধারণ করিয়াছি; নগণ্যব্যক্তির লেখায় পদে পদে ত্রুটী ও ভ্রমপ্রমাদ অনিবার্য্য; সুধী সভ্যবৃন্দ ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ কৃপাপূর্ব্বক ত্রুটী মার্জ্জনা ও ভ্রম সংশোধন করিয়া লইলে পরম কৃতার্থ ও বাধিত হইব।

এক্ষণে আখ্যানভাগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। মঙ্গলচণ্ডী গ্রন্থের প্রথমেই মঙ্গলাচরণের স্থানে লিখিত আছে—

"ওঁ মঙ্গলে মঙ্গলাদেবী সর্ব্বমঙ্গলকারিণী। প্রসীদ মম কল্যাণি শুভামঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥"

পরে বন্দনার স্থানে মঙ্গলচণ্ডীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এইরূপ ঃ—

বন্দিব ভবানী, জগতজননী, গিরিবর নন্দিনী মাতা।
স্বামী ত্রিলোচন পুত্র গজানন, সুখমোক্ষ বরদাতা॥

অথচ এ হেন জগতজননী ভবানীদেবীকে মঙ্গলচণ্ডী রূপে মর্ত্ত্যে পূজা পাইবার জন্য নানা কলকৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যখন ধনপতি সদাগর ভেট-দ্রব্য সহিত গৌড়রাজের দরবারে উপস্থিত হইয়া সুবর্ণ পিঞ্জর প্রস্তুতের প্রার্থনা জানান, তখন গৌড়রাজ পিঞ্জর প্রস্তুত করাইয়া দিতে সম্মত হইলেন।

... ...।
স্বর্গে চিন্তিত হইল দেবী ভগবতী॥
দুর্গা বলে পদ্মা ঝি শুনহ বচন।
রাজা কালি গঠিয়া দিবে সুবর্ণ পিঞ্জর॥
মর্ত্ত্যে খণ্ডব্রত বাছা না হৈল আমারে।
সুযুক্তি দেহ বাছা যে আইসে বিচারে॥
পদ্মা বলে কারিকরেক দেখাহ স্বপন।
রাজ্য ছাড়ি পলাক যত কারিকর॥
বিশাইর মূর্ত্তি দুর্গা ধরণ ধরিয়া।
কারিকরে স্বপন দেখায় ঘোরমূর্ত্তি হৈয়া॥
কারিকরের গালে মারে চড়।
চৈতন্য পাইল যত কারিকর॥
আকাশবাসী কথা কহে সর্ব্বত্র মঙ্গল।
গৌড় ছাড়ি পলাও যত কারিকর॥
গৌড়েতে আসিয়াছে এক সদাগর।
তোমাকে বান্ধিয়া লবে উজানি নগর॥
এ কথা শুনিয়া তারা হৈল ভাবিত।
গৌড় ছাড়িয়া পলাইল কারিকর যত॥

(গ্রন্থের অন্যত্র লিখিত আছে, এই কারিকরেরা ঢাকা জেলার সুবর্ণগ্রামে আশ্রয় পাইয়াছিল। আজকাল

ঢাকার কারিকরেরা স্বর্ণ-শিল্পে বিখ্যাত। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ যে গৌড়ের অধিবাসী, তাহার আভাষ এই খানেই পাওয়া যায়।

আবার যখন দুবুলা দাসীর কুযুক্তিতে লহনা ঔষধ খাওয়াইয়া খুলনার যৌবন ও প্রকারান্তরে প্রাণ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই সময়ে—

দুর্গাবলে খুলনা যদি ঔষধ খাইয়া মরে।
ব্রত নষ্ট হবে মোর অবনিমাঝারে॥
সেই ক্ষণে ভবাণী খুলনাকে দিল বর।
ঔষধ খাইয়া রূপ হৈল সূর্য্য কলেবর॥

মর্ত্ত্যে ব্রত প্রচারের জন্য এইরূপ আরও বহুস্থানে দেবীর আকুল প্রয়াস দেখা যায়। বিষহরি দেবীও তাঁহার পূজার জন্য বিনা দোষে বেহুলা লখিন্দরের প্রতি কত অত্যাচারই না করিয়াছেন! তিনি প্রায়ই বলিয়াছেন।

"বুদ্ধি দেহ নেতাই দিদি কি করি উপায়।
কেমনে বানিয়ার হাতে ফুল জল পাই॥"

তাৎকালিক বণিকগণের বিশেষ মান্য ছিল। তাঁহারা রাজসভায় একাসনে বসিয়া রাজার হাতে পান পাইতেন; রাজাদের সহিত পাশা খেলা ও হাস্যপরিহাসাদিও চলিত। রাজার হাতে পান খাওয়াটা বিশেষ সম্মানসূচক ছিল। যখন অগুরু চন্দন আনিবার জন্য ধনপতিকে দক্ষিণ পাটনে পাঠান হইতেছে তখন,

হস্তে পান লইয়া রাজা ধর ধর বলে।
কুলিন বাণিয়ার পুত্র লজ্জার লাইগা (লাগিয়া) মরে॥
সভার মধ্যে ধনপতি রাজপ্রসাদ পাইল।
গৃহের মধ্যে কিছু হউক মাথা নোয়াইল॥

উক্ত বণিক সম্প্রদায় শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ধনপতির যাত্রা কালে তাঁহার মঙ্গলার্থে খুলনা যখন "ঘট বারি" দ্বারা দুর্গার পূজা করিতেছিলেন সেই সময়ে দুষ্টবুদ্ধি লহনা ধনপতিকে ডাকিয়া খুলনার বিরুদ্ধে মিথ্যাপবাদ দিলে ধনপতি ক্রোধে ঘটে লাথি মারেন ও

মন্দবাক্য খুলনাকে কহিল বিস্তর।
মায়া দুর্গার সেবা কর ঘরের ভিতর॥
পূজা কর মহামায়া জগতের দাতা।
শিবের কৃপায় মোর দুর্গার নাহি চিন্তা॥

এমন অর্থসামর্থ্যশালী ও রাজসম্মান প্রাপ্ত এবং শৈব ধর্ম্মাবলম্বী বাণিয়া বংশের নিকট পূজা আদায় করিতে পারিলে মর্ত্ত্যে তাহাদের ব্রতপ্রচার হওয়া সহজসাধ্য হইবে, ইহা মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরী দেবী বেশ বুঝিয়া ছিলেন; সেই জন্যই তাঁহারা উজানী নগরে ধনপতি সদাগর ও চম্পকনগরে চাঁদ সদাগরকে উপযুক্ত পাত্র বোধে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই দেবীদ্বয়ের পূজায় অসম্মত হওয়ায় অশেষ কষ্টভোগও করেন; কিন্তু তাঁহাদের অন্তঃপুরে দেবীদ্বয় পূজা পাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইলে ক্রমে পুরুষ মহলেও তাঁহাদের প্রাধান্য বিস্তারিত হয়। এইরূপে চণ্ডীদেবীর নিজমাহাত্ম্য ও ব্রত প্রচারই যেন মঙ্গলচণ্ডী উপাখ্যানের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। উপাখ্যানভাগে দেখা যায় প্রথমে কলিঙ্গে সুরথ রাজা, পরে কালকেতু নামক ব্যাধ মঙ্গল চণ্ডীর পূজা করেন। সর্ব্বশেষে উজানিনগরে তাঁহার পূজার প্রচার হয়।

মঙ্গলচণ্ডী গীতের আদি রচয়িতা কে, তাহা সঠিক নির্ণয় করা সুকঠিন; কিন্তু মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী যে অতি প্রাচীন্ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থকার কোন্ সময়ের ও কোন্ দেশের লোক তাহা ঠিক জানা যায় না; তবে গ্রন্থে বর্ণিত আচারব্যবহারগুলির বিশেষ অনুসন্ধান লইলে তাঁহার সময় নির্ণয় করা কতকটা সহজ হইতে পারে। সম্পূর্ণ গ্রন্থভাগ উপস্থিত না থাকায় এ বিষয়ে আপাততঃ নীরব থাকাই সুযুক্তি। তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে গ্রন্থান্তরে কতক আভাষ পাওয়া যায়। মগরার জলে সাধুর বহর ডুবাইবার সময় চণ্ডীর আদেশে তথায় বহু নদনদীর আবির্ভাব হইয়াছ, তন্মধ্যে মালদহের মহানন্দা, কালিন্দী, পুনর্ভবা

রাও ছিলেন। ইহা হইতে গ্রন্থকারকে মালদহ বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী বলিয়া অনুমান করা দোষাবহ নয়। দ্বিতীয়তঃ গৌড়ে আসিবার সময় ধনপতি ছেতেভেতের বিল পার হইয়াছিলেন। যথাঃ—

যোড়গ্রামে করি স্নান, রন্ধন ভোজন পান, ছাত্যা ভাত্যা এড়াইল তথি।

তেমনি বিদায়ের সময় তিনি "গৌড়েশ্বরীকে" প্রণাম করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকার মালদহবাসী না হইলে মোড়গ্রাম, ছেতেভেতের বিল, গৌড়েশ্বরী প্রভৃতি মালদহের অন্তর্নিহিত স্থানসকল ও দেবদেবীর উল্লেখ অন্যের দ্বারা সম্ভবে না। গ্রন্থের ভাষাও অনেকটা মালদহের ছাঁচে ঢালা।

আবার চৌত্রিশ অক্ষরে দেবীর স্তবের সময় তাঁহাকে "দ্বারবাসিনী" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এই দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দির গৌড়ের উপকণ্ঠে স্তূপাকারে এখনও বর্ত্তমান। এই সমস্ত প্রমাণবলে গ্রন্থকার মাণিক দত্তকে মালদহ বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী বলিয়াই অনুমিত হয়।

আবার বর্ত্তমান গ্রন্থে গৌড়যাত্রাকালে ধনপতি যে পথে গিয়াছিলেন তাহার এইরূপ বর্ণনা আছেঃ—

উজানি লইল সাধু পাছু করিয়া।
ইছানি নগরে সাধু উত্তরিল গিয়া॥
মঙ্গল কোট লইল সাধু পাছু করিয়া।
সতীর জাঙ্গাল সাধু উত্তরিল গিয়া॥
সতীর জাঙ্গাল লইল পাছু করিয়া।
হুসনাপুর দৌলতপুর উত্তরিল গিয়া।
আর কত ঠিকানা সাধু পাছু করিয়া।
থানাঘাটী সদাগর উত্তরিল গিয়া॥
দুইদিনে থানাঘাটী দিল দরশন।
সেখানে করিল সাধু রন্ধন ভোজন॥
থানাঘাটী ছাড়িয়া সাধু চলিল সত্বরে।
তৃতীয় দিবসে আইল মজিনি সহরে॥
বালিঘাটী ডুবিল দিনমণি।
রন্ধন ভোজন করি পোহাই রজনী॥
রাত্রিকালে চলি যায় সাধুর নন্দন।
খিরখণ্ড চলি দধি করিল ভোজন॥
রর্দ্ধ (?) পুরেতে আইল চতুর্থ দিবসে।
বিশ্রাম করিয়া চলে নিশি অবশেষে॥
শীতলপুরেতে আইল পঞ্চম দিবসে।
বড়গঙ্গা পার হৈয়া গৌড়ে প্রবেশে॥

ইহা পাঠে গ্রন্থকারের বাসস্থান সম্বন্ধে পূর্ব্বধারণায় সন্দেহ জন্মে। কিন্তু এই বর্ণনাটী যেন বেশী-স্বাভাবিক; কেন না, বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত মঙ্গলকোট হইতে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ অতিক্রম করিয়া মালদহে আসিতে হইলে অনেক নগর উপনগর অতিক্রম করা আবশ্যক। মঙ্গলকোটের ৭।৮ মাইল উত্তর পূর্ব্বে, "শ্রীখণ্ড" আছে কিন্তু "খিরখণ্ড" কোথায় জানিনা। আবার "কান্দির" ১৪।১৫ মাইল উত্তরে এক "মরগ্রাম" আছে। ধনপতি দক্ষিণ হইতে আসিয়াছিলেন, সুতরাং উপরোক্ত জনপদগুলি অতিক্রম করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

মাণিক দত্তের রচনায় দেখা যায় সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। যখন লহনা ঔষধপ্রয়োগে খুলনার যৌবন নষ্ট করিতে পারিলেন না তখন তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণী সই-এর যুক্তি মত ধনপতির হস্তাক্ষরে ছেলি (ছাগল) চরাইবার আদেশ যুক্ত একখানা জাল চিঠি লেখাইয়া খুলনাকে দেন। তখন খুলনা হস্তাক্ষরে সন্দেহ করিয়া হাসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী-সই বলিতেছেন—

মিথ্যাকরি মায়াপত্র করহ লিখন।
পত্র পাঠাঞা দেহ খুলনার সদন॥
আপন হস্তে পত্র রামা করিল লিখন।
পত্র পাঠাঞা দিল খুলনার বিদ্যমান॥
দ্বারে রহিয়া চোর (দুত?) ডাকে মায়া করি।
ধনপতির পত্র পড় খুলনা সুন্দরী॥
... ...।
... ...॥

পত্র পড়ে লহনা হইয়া জর্জ্জর।
মিথ্যা পত্র নহে প্রভুর হস্তের অক্ষর॥
... ...।
... ...॥
লহনার বচনে খুলনা পড়ে পাঁতি।
হাসেন খুলনা অক্ষর অন্য ভাতি॥
প্রভুর অক্ষর তবে দেখিতে সুন্দর।
কে বা আনিয়াছে পত্র করিয়া প্রবন্ধ॥
... ...।
... ...॥
খুলনা বলেন দিদি না কর তরাস।
পত্র লিখিয়াছে কেবা করে উপহাস॥

ইহা ব্যতীত গ্রন্থকারের সমসাময়িক আরও নানা বিষয়ক আচারব্যবহার, রীতিনীতির বিশদ পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু সময়াভাবে ও বাহুল্য-ভয়ে তৎসমস্তের উল্লেখে বিরত থাকা গেল।

খুলনাকে খাওয়াইবার জন্য যে ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার উপকরণগুলি ম্যাক্‌বেথের ডাইনীদের জ্বলন্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত উপকরণগুলির অপেক্ষা বরং অধিক অধিক কার্য্যকারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েক বচন উদ্ধৃত হইল—

সতীর চুলির আঙ্গার বড় যত্নে পাই।
বানিয়ার দোকানের আন হাই হামলাই॥
চিলের বাসার কুটা আর পোড়া হাঁড়ি।
দাইয়ের ঠাঁই কিনিয়া আন ছাওয়ালের নাড়ী॥
তেপথার ধুলা রাহু চণ্ডালের নাড়ি।
বিপাকে সঞ্চাকে পাই নাথাড়ের দড়ি॥
ঔষধ আনিতে সই না হবে কাতর।
রজস্বলা স্ত্রীলোকের লাগিবে কাপড়॥
মঙ্গলবারের কেঁন্নাই বিস্তর যার পাও।
সত্বরে আনিলে চাহ চিনা জোঁকের ছাও॥ ইত্যাদি

মাণিক দত্তের রচনাপ্রণালী মুকুন্দরামের অপেক্ষা নিম্ন দরের; মাণিক দত্তের রচনা অনেকটা পদ্যের আকারে গদ্য মাত্র। পৌরাণিক এবং চরিত্র বর্ণনাতেও মুকুন্দ-রামের কৃতিত্ব আছে; তাঁহার বর্ণনা হিন্দু পুরাণানুযায়ী, কিন্তু মাণিকদত্তের বর্ণনা বৌদ্ধশাস্ত্রানুযায়ী বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মতে

অনাদ্যের উৎপত্তি জগৎ সংসারে।
হস্তপদ নাহি ধর্ম্মের ভ্রমে নৈরাকারে॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞি গোলক ধেয়াইল।
গোলক ধিয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড সৃজিল॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞি শূন্য ধেয়াইল।
শূন্য ধিয়াইতে ধর্ম্মের শরীর হইল॥
জন্ম হৈল ধর্ম্ম গোসাঞি গুণে অনুপামা।
পৃথিবী সৃজিয়া তেঁহো রাখিবে মহিমা॥
—জিনিয়া তবে সিন্ধু উথলিল।
মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিয়া পড়িল॥

তাহাই জলরূপে পরিণত হইল; সুতরাং জলেই ধর্ম্মের আসন বৈসন ইত্যাদি হইতে লাগিল। ক্রমে পাতাল ভুবনে গিয়া "দ্বাদশ বৎসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল।" তাহারই বাটুল প্রমাণ লইয়া ভাসিয়া উঠিল ও তদ্দ্বারা পৃথিবী সৃজিত হইল; গজ ও কূর্ম্ম পৃথিবীর ভারধারণে অসমর্থ হইলে ধর্ম্ম নিজ পৈতা ছিঁড়িয়া বাসুকীর সৃষ্টি করিলেন ও তাহার মাথায় পৃথিবী স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, ইত্যাদি। অর্থাৎ ধর্ম্মই সব, তাহা হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির উদ্ভব হয়। ইহাতে শূন্যবাদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া বোধ হয় দেশে বৌদ্ধপ্রভাব বিদ্যমান থাকা কালেই মাণিক দত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। তবে গ্রন্থকলেবরে স্থানে স্থানে তাঁহার আধুনিকত্বেরও আভাষ পাওয়া গিয়াছে। হইতে পারে, আধুনিক কোন

কবি নিজ মস্তিষ্কপ্রসূত কোন রচনা উহার সহিত জুড়িয়া দিয়া "সাত নকলে আসল নষ্ট" প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা করিয়াছেন।

শ্রীভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি এ

নামি কো

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পোর্ট্ আর্থার্

বাইশে নভেম্বর জাপানী সেনা পোর্ট্ আর্থার্ দখল করিয়াছিল।

"মা! মা! ও মা!"

সংবাদপত্র হস্তে লইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে চিজু চীৎকার করিয়া উঠিল।

"হয়েছে কি? অমনি করে চেঁচাতে হয়, ছি!"

মাতার ভর্ৎসনার লজ্জায় চিজুর মুখে ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল। ঈষৎ হাসিয়া আবার গম্ভীর হইয়া সে কহিল—"মা চিজিওয়া মারা গেছে।"

"চিজিওয়া! চিজিওয়া মরেচে? কেমন করে? যুদ্ধে?"

"হাঁ। খবরের কাগজে তার নাম রয়েচে। ঠিক হয়েছে!"

"ছি! ও কথা বলতে নেই—যুদ্ধে মরেচে সে! কিন্তু এত সাহস হ'ল কি করে তার?"

চিজু কহিল—"তার পক্ষে মরাই ভালো হয়েছে।" কাতো গৃহিণী নীরব রহিলেন।

"মরার পর কাঁদবার কেউ থাকবে না, এটা কি কম কষ্টের কথা চিজুসান?"

চিজু বিদ্রূপের স্বরে কহিল—"কাঁদবার লোকের ভাবনা কি? কাওয়াশিমা বুড়ী রয়েচে তো! হাঁ, কাওয়াশিমা বলতে মনে পড়ল—ওতোয়োসান ও বাড়ী থেকে বিদায় হয়েচেন।"

"ঠিক জানিস্?"—কথাটা শুনিয়া মাতা বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন।

"হাঁ। কাল আরো কি গোলমাল হয়েছিল বুড়ীর সঙ্গে, সহ্য করতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গেছে শুনলুম। ও বাড়ী ছেড়েচে বেশ করেচে।"

"ওখানে বেশী দিন কেউ টিকতে পারে বলে' তো বোধ হয় না।"

কাতোগৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, চিজু নীরব রহিল।

চিজিওয়া মরিয়াছিল। উপরোক্ত কথোপকথনের তিন সপ্তাহ পরে কাওয়াশিমার নিরানন্দ বাড়ীতে একখানা পত্র ও একখণ্ড মনুষ্য-অস্থি আসিয়া পৌঁছিল। অস্থিখণ্ড চিজিওয়ার; পত্র তাকেওর নিকট হইতে আসিয়াছিল।

সে লিখিয়াছিল—"পোর্ট্ আর্থার্ দখলের দুইদিন পরে সকল পোত ও পোতাশ্রয়গুলি নৌবিভাগের হস্তে অর্পিত হইবে স্থির ছিল—সেই উপলক্ষ্যে আমার জাহাজের অন্য কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত তীরে নামিয়াছিলাম। ভীষণ যুদ্ধের পরবর্ত্তী সে ভয়ানক দৃশ্য বর্ণনার অতীত! আমি একটা অস্থায়ী যুদ্ধ হাসপাতালের সামনে দিয়া চলিয়াছিলাম। দেখিলাম কয়েকজন লোক ডুলিতে একটা মড়া বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। মড়ার গা' একখানা নীল কম্বলে এবং মুখ সাদা কাপড়ে ঢাকা। আচ্ছাদনের মধ্য দিয়া যেটুকু মুখ ও থুঁতনি দেখা যাইতেছিল তাহা দেখিয়া আমার পরিচিত একজনের কথা মনে পড়িতেছিল—তাই নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। যখন শুনিলাম মৃতদেহ লেফটেন্যাণ্ট্ চিজিওয়ার, তখন আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

"তাহার মুখের আবরণ খুলিয়া দিলাম। দেখিলাম মুখ তার বিবর্ণ, পাংশুল, দাঁতে দাঁতে লাগিয়া গেছে। ইদুশান

কেল্লা দখল করিতে গিয়া সে গুলির ঘায়ে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। সকাল অবধি জ্ঞান ছিল, তার পর মরিয়াছে। শুনিলাম তার দলের লোক তাকে একেবারেই পছন্দ করিত না; কিন্তু সে যুদ্ধ লড়িয়াছে ভালো—চিন্‌চৌ আক্রমণের সময় সেই লোকজন লইয়া উত্তর দ্বার ভাঙ্গিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু অনেক সময়ই সে সৈনিকের অযোগ্য ব্যবহার করিত। সঙ্গে তার বিস্তর অর্থ ছিল। একবার পিৎজুওতে সে নাকি কয়েকজন চীনার প্রতি ভারি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, কড়া হুকুম অমান্য করিয়া তাহাদিগের অর্থ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে। সে জন্য তার শাস্তি হইবারও কথা ছিল। সে যাই হোক, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হওয়াতে তার সে কলঙ্কের মোচন হইয়াছে।

"তুমি ত জানই সে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে—সে জন্য তার সকল সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলাম; কিন্তু তার স্মৃতির বিরুদ্ধে আমার বলিবার কিছু নাই। আর যখন ভাবি কতদিন আমরা একত্র সহোদরের মত কাটাইয়াছি, তখন বাস্তবিকই বেচারার জন্য কষ্ট হয়। তার দেহ ভস্মীভূত করিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম—তাই একখণ্ড অস্থি পাঠাইতেছি। যথাবিধি সমাহিত করিও।"

পোর্ট্ আর্থারে তাকেও যে কেবল ইহাই দেখিয়াছিল তা নয়। আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইচ্ছা করিয়া সে পত্রে সে বিষয়ের উল্লেখ করে নাই।

চিজিওয়ার মৃতদেহ যে দিন মিলিয়াছিল সে দিন জেটিতে ফিরিতে তাকেওর বিলম্ব হইয়া গেল। সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল।

সঙীন উঠাইয়া শান্ত্রী দাঁড়াইয়া আছে, অশ্বারোহী সেনাপতি ঘুরিয়া ফিরিতেছে, নিম্ন কর্ম্মচারিবৃন্দ উপর-ওয়ালার নিকট হুকুম গ্রহণ করিতেছে, চীনারা বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাঁবেদারেরা হুকুম তামিল করিবার জন্য ঘোরাঘুরি করিতেছে। এক স্থানে কয়েকজন কুলি একটা প্রকাণ্ড আগুন তৈয়ার করিতেছিল, তাকেও অবশেষে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল।

তাহাদের মধ্যে একজন কহিল—বেজায় শীত! বাড়ী থাকলে মাছপোড়ার সঙ্গে দিব্যি এক পাত্তর খাওয়া যেত। কিচি, তোর গায়ে তো বেড়ে জিনিস দেখছি!

কিচি একটি চমৎকার বেগুনে রঙ্গের সাটিনের তুলা ভরা কোর্ত্তা পরিয়াছিল। সম্ভবতঃ সেটি সে কাহারো নিকট হইতে হাতড়াইয়াছে।

কিচি উত্তর করিল—আমার ত কি। একবার গেনের দিকে দেখ! একটা লোমের কোর্ত্তা গায়ে দিয়েচে, ওর দাম চারশো টাকার কম নয়।

প্রথম কুলি কহিল,—অমন বরাত! না হ'লে ওর হাত থেকে শীকার কখনো ফস্‌কায় না, ওর গায়ে বন্দুকের গুলি কখনো লাগে না, কিছু না করেই ও বকসিস পায়! আমার দিকে দেখ, এই পাতলা ধুরধুড়ে জামা। পোড়া অদৃষ্ট আমার! তাইলিয়েনওয়ানে সব খোয়া গেল। শীগগিরই একটা কিছু জোগাড় করতে হবে।

অপর একজন কহিল—সাবধান ভাই। আজ বিকালে একটা বাড়ীতে ঢুকেছিলাম—হঠাৎ একটা বাক্সর পিছন থেকে এক টিকিধারী খোলা তলোয়ার হাতে লাফিয়ে বেরুল। সে ভেবেছিল আমি তাকে খুন করতে যাচ্ছিলুম, সত্য কথা বলতে কি আমি তার ভয়ে প্রায় মরবার দাখিল হয়েছিলুম। ভাগ্যে আমাদের সৈন্য এসে পড়ে' বেটাকে সাবার করে দিলে। নইলে যমের বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিল আর কি!

পোর্ট আর্থার দখলের পর দু এক দিন মাত্র হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাড়ীর মধ্যে লুক্কায়িত বহু পলাতক চীনা সৈনিক জাপানীদিগকে বাধা দেওয়ার অপরাধে নিহত হইয়াছে।

সাধারণ সৈনিকদের কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে তাকেও জেটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে আলোকের সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে, লোকচলাচলও

বিরল হইয়াছে। একধারে শেলাখানার দীর্ঘ দেওয়াল ভূমির উপর কৃষ্ণ ছায়া বিস্তার করিয়াছে ও অন্য দিকে ভূমি ঘ্রাণ করিতে করিতে ধাবমান শীর্ণদেহ কুকুরের উপর রাস্তার ম্লান অস্পষ্ট আলো আসিয়া পরিয়াছে।

অন্ধকারে চলিতে চলিতে প্রায় পঞ্চাশ গজ সম্মুখে তাকেও দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। সে বেশ বুঝিল, তাহারা কর্ম্মচারী। একজন বলিষ্ঠ স্থূলস্কন্ধ, অপরটি পাতলা ছিপছিপে। তাহারা যথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ তাকেও লক্ষ্য করিল, কে একজন চুপে চুপে তাহাদের অনুগমন করিতেছে। দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা অস্বাভাবিকভাবে দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল না। হঠাৎ সেই লোকটা এক পদ অগ্রসর হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া আর এক পদ অগ্রসর হইল, বোধ হইল সে যেন সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। এই বার মূর্ত্তিটা দুইটা বাড়ীর মাঝামাঝি একটা আলোকিত স্থানে আসিয়া দাড়াইল—লোকটা চীনা। ঠিক সেই সময়ে তাহার হাতে একটা কি ঝকমক করিয়া উঠিল। তাকেও উত্তেজিত হইয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে তাহার অনুগমন করিতে লাগিল।

সম্মুখের লোক দুইজন এইবার পথের শেষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; কালো মূর্ত্তিটা অন্ধকার হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল ও তাহাদের দিকে ছুটিয়া গেল। ভীত হইয়া তাকেও সম্মুখে ছুটিল। চীনাটা তাহাদের প্রায় দশ গজ তফাতে গিয়া উপস্থিত হইল, ও নিমেষ মধ্যে হাত তুলিয়া এক গুলিতে পাতলা কর্ম্মচারীটিকে ভূপাতিত করিল। অপর কর্ম্মচারীকেও সে গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় তিনি হঠাৎ ফিরিলেন, এবং ঠিক সেই সময়ে তাহাকেও উপস্থিত হইয়া খুনেটার ডান বাহুতে কঠিন আঘাত করিল। পিস্তলটা ভূমিতে পড়িয়া গেল। ব্যর্থকাম ক্রুদ্ধ খুনেটা ফিরিয়া তাওকে আক্রমণ করিল। দুজনে তখন হাতাহাতি বাধিয়া গেল। বলিষ্ঠ কর্ম্মচারিটি তাকেওকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। একদল জাপানী সেনা শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহারা খুনেটাকে বাঁধিয়া ফেলিল। তাকেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে স্থূলস্কন্ধ কর্ম্মচারীর দিকে চাহিল, তিনিও তাহার দিকে ফিরিলেন।

রাস্তার আলো কর্ম্মচারীর মুখের উপর পড়িল, তিনি আর কেহ নন—লেফটেন্যাণ্ট জেনার‍্ল কাতাও কা। তাকেও কহিল—আপনি!

সেনাপতিও বিস্মিত হইয়া কহিলেন—তুমি! তাকেও নামির পিতার প্রাণরক্ষা করিয়াছে!

নামির নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছিল, তখন ইকুর আনন্দ আর ধরে না। সে কহিল—"আহা তাঁরই উপযুক্ত কাজ হয়েচে! শীগ্‌গির করে সেরে ওঠ দিদিমণি।"

নামি একটু বিষাদের হাসি হাসিল।

শ্রীহেমনলিনী রায়

বেদনা।

স্মৃতির দর্পণখানা ধূলিতে মলিন
যতদূর হ'তে হয় হ'য়ে গেছে বুঝি!
সারাটি হৃদয়ে আজ দীর্ঘ নিশিদিন
কোথাও সন্ধান তার পাই না তো খুঁজি!
শুধু যেন একি ভার পাষাণের মত
রহিয়াছে আজি মোর বক্ষটী জুড়িয়া;
কি যেন অনল-উৎস চলিছে নিয়ত
মর্ম্মের নিভৃত পথে নীরবে বহিয়া!
সেকি রে বক্ষের কোন আঁধার গুহায়—
সংসারের হাসি-কান্না যেথা নাহি পশে,

নীরবে বসিয়া সেথা, অজস্র ধারায়
অম্লানো অশ্রুর জল আজিকে বরষে !
কিন্তু আমি আঁখি মুদি দেখি যতবার
মলিন সে মুখখানা কোথাও না পাই ;
মর্ম্মের সারাটী কোষ—শূন্য চারিধার,—
সকলি রে বলে যেন নাই নাই নাই !
সে কি রে আসিবে বলে গিয়াছে প্রবাসে,
হৃদিখানা তার বুঝি কুলিশ কঠিন !
স্তব্ধ মৌন হিয়া মোর এ জীর্ণ আবাসে
চেয়ে আছে শূন্য পানে দৃষ্টি উদাসীন !
পত্রের মর্ম্মরধ্বনি নদী কলকলে
কি যেন অব্যক্ত-বার্ত্তা শুনায় আমায়,—
সুদূর ধরার প্রান্তে অনন্তের কূলে
সে বুঝি বসিয়া আছে মোর অপেক্ষায় !

শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গাংচিল

গাঙ্গচিল দেখিতে অতি মনোহর পাখী। বড় বড় নদী, হাওর প্রভৃতির উপর আকাশের কোলে এই সুদৃশ্য বিহঙ্গম আনন্দে উড়িয়া বেড়ায় এবং ছোঁ মারিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছ ধরিয়া ভক্ষণ করে। ইহারা নদীর ধারে ছন ক্ষেতে, বিন্না ঝোপে বা কাশ বনের মধ্যে বাসা নির্ম্মাণ করে। খড় কুটা প্রভৃতি দিয়া মাটী হইতে অতি অল্প উচ্চে বাসা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দুই বা তিনটী ডিম্ব প্রসব করে। ডিমগুলি দেশী কুল অপেক্ষা বড় নহে। পক্ষিনী মাঘ মাসে গর্ভ ধারণ করিয়া চৈত্র মাসে ডিম্ব প্রসব করে। যৌন সম্মিলনের সময় সমাগত হইলে আসঙ্গলিপ্সু বিহঙ্গমিথুন উষার রক্তরাগরঞ্জিত নদী জলের উপরে পরস্পরের বড়ই সন্নিধানে উড়িয়া বেড়ায় এবং পুংপক্ষী সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষায় স্ত্রী-পক্ষীর গায়ে ঝাপ্টা মারিতে থাকে। স্ত্রী-পক্ষী তখন ছোঁ মারিয়া পুং পক্ষীকে বিব্রত করিতে ক্রটী করে না।

গাংচিলের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় অতি অল্প। স্বেচ্ছা বিহার ইহাদের মধ্যে একটু বেশী। বিহঙ্গিনী ডিম্ব প্রসব করিবার পর যখন সূতিকাগৃহে ডিমে তা দিতে আবদ্ধ থাকে, তখন তাহার দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। স্বামী সেই প্রাতঃকালে আহারান্বেষণে গমন করার পর দীর্ঘ সময় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। হয়ত মাছ ধরিবার আশায় তাহাকে দুই চারি মাইল দূরে যাইতে হইয়াছে, হয়ত আজ মাছ সহজে মিলিতেছে না, পক্ষি-মাতা ক্ষুধার তাড়না সহিতে সহিতে ক্রমে কঙ্কালসার হইয়া পড়ে। সূতিকাগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াও বেচারীর কষ্ট দূর হয় না ; তখন নিজের আহারের চিন্তা অপেক্ষা সদ্যোজাত ছেলেমেয়েদের চিন্তায় সে বড়ই ব্যতিব্যস্ত থাকে। জলের মাছ ইচ্ছা করিলেই ত আর সর্ব্বদা পাওয়া যায় না ; বেচারী তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেক্ বা কীট ধরিয়া বাসায় যায়। স্বামী কতক সাহায্য করে বটে, তবে তাহাতে মায়ের মত "অবশ্য কর্ত্তব্য" টুকুর অভাব।

গাঙ্ চিলের মাথার উপরিভাগ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এবং অত্যন্ত চক্চকে। ঠোঁট হল্‌দে এবং গোড়ার দিকে ঈষৎ লালের আভাযুক্ত। ঠোটের অগ্রভাগ অতিসামান্য বক্র কিন্তু তীক্ষ্ণাগ্র। ঠোঁটের উভয় পার্শ্ব ধারাল। ইহাদের শরীরের সমুদয় অংশ সাদা। ডানার উপরের পালক ঈষৎ ধূম্র। এই পালকগুলির উপরদিক একটু গাঢ় ধূম্র, ক্রমে ক্রমে সাদার ছায়া যুক্ত হইয়া শেষ ভাগে প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছে। শরীরের তুলনায় ডানা লম্বা। ইহাদের ডানা খুব হাল্‌কা কিন্তু অত্যন্ত মজবুত। এত মজবুত যে গাঙ্গচিল বিশ্রাম না করিয়া ও

তিন চারি মাইল উড়িয়া আবার নিজবাসায় ফিরিয়া আসিতে পারে। ইহাতে বিশেষ ক্লান্ত হয়, এমত বোধ হয় না। অকূল মেঘনা বা গঙ্গার বক্ষে গাঙ্গচিল তিন চারি মাইল উড়িয়া আবার অশ্রান্ত দেহে নিজালয়ে আসিতে পারে। ডানা অপেক্ষাকৃত বড় হওয়া সত্বেও দৃঢ়তা নিবন্ধন প্রতিকূল বায়ুতেও ইহারা উড়িয়া যাইতে অসমর্থ নহে। ইহারা দ্রুতগামী ষ্টীমারের অনুগমন করিতে পারে। *

গাঙ্‌চিলের পায়ের রঙ্‌ হল্‌দে। পা দুটীকে বুকের নীচে ঠিক করিয়া রাখিয়া গাঙ্‌চিল মাছ সন্ধান করে। ইহাদের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে দ্রুত উড়িবার সময়ও চঞ্চল লহরীমালার মধ্য হইতে ছোঁ মারিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছ ধরিয়া ফেলে। পা দুখানি এমন ভাবে রাখে যে শিকার ধরিবার সময় তাহার পা আর ঘুরাইতে ফিরাইতে হয় না। ইহাদের নখ তীক্ষ্ণ এবং বক্র, পুচ্ছাগ্র প্রসারিত। দ্রুতগতি পরিবর্ত্তনে এবং লুফিয়া শিকার ধরিবার পক্ষে ইহাদের পুচ্ছই প্রধান সহায়।

গাঙ্‌চিল খুব উচ্চ আকাশে উড়িতে যায় না—প্রয়োজনও নাই। জলে মাছ ধরাই ইহাদের ব্যবসায়। জলে মাছ ধরিয়া উড়িতে উড়িতে তাহা ভক্ষণ করে।

ইহারা উড়িবার সময় একরূপ সাঙ্কেতিক শব্দ করে এই শব্দ মধুর। এই শব্দ শুনিয়া আবার সঙ্গের অন্যান্য গাঙ্গচিলও তদনুরূপ শব্দ করিয়া থাকে। কখন কখন ইহারা দুই চারিটী বা দশটী সম্মিলিত হইয়া উড়িতে উড়িতে বেশ একটু গান করিয়া লয়।

গাঙ্গচিল কাহাকেও পুষিতে দেখি নাই।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

* একবার ষ্টীমারে গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ আসিতে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। রাজাবাড়ীর নিকট যখন ষ্টীমার আসিয়াছে তখন এক দল গাঙ্গচিল কোথা হইতে আসিয়া মহা আনন্দে প্রায় ১০০ শত গজ দূরে থাকিয়া ষ্টীমারের অনুসরণ করিতে লাগিল। দলে ত্রিশটি গাঙ্গচিল ছিল, জল হইতে বার চৌদ্দ হাত উচুতে থাকিয়া তাহারা ষ্টীমারের সমান গতিতে উড়িতেছিল। ষ্টীমারের সঙ্গে পাল্লা ধরিয়া তাহারা যেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। নাগরদোলার দোলাগুলি যেমন একবার ভূমিতে নামে একবার আকাশে উঠে প্রত্যেকটি গাঙ্গচিল ও তেমনি ছোঁ মারিয়া পদ্মা তরঙ্গে পড়িতেছিল, পরক্ষণেই দ্রুতগতিতে উপরে উঠিয়া ষ্টীমারের সঙ্গে উড়িতেছিল। মধ্যে মধ্যে আকাশে একে অন্যের গায়ে পাখার ঝাপ্‌টাও মারিতেছিল পর মুহূর্ত্তেই আবার পদ্মাতরঙ্গে ঝাপাইয়া পড়িয়া স্নান করিয়া উঠিতেছিল। এই বিচিত্র স্নানলীলায় তাহাদের যে কি আশ্চর্য্য লঘু আহ্লাদ উচ্ছ্বলিত হইতেছিল, তাহা না দেখিলে ঠিক ধারণা করা যায় না, পদ্মা মেঘনা সঙ্গম পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে ষ্টীমারের অনুসরণ করিয়া পাখীর দল এক দিকে উড়িয়া চলিয়া গেল।—প্রঃ সঃ

সন্তানের মানসিক শিক্ষা

মানসিক শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যদিচ দুই মত নাই তথাপি এবিষয়ে আমাদের কতটা চিন্তা করা উচিত, যতট মাথা খাটান উচিত তাহা কদাপি করিয়া থাকি। আমরা ছেলেকে স্কুলে দিলেই খালাস। ছেলে যদি স্কুলে ভাল পড়া দেয় তা হলে তো সব দিকেই মঙ্গল। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাহা না হয় তাহা হইলে, শিক্ষক মহাশয় বেত্র সাহায্যে তাহার নিকট পড়া আদায় করিবার চেষ্টায় থাকেন। হতভাগ্য শিশুটি পড়াকে এবং শিক্ষক মহাশয়কে বাঘ ভালুকের মত ভয় করিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় ফল যে খুব সন্তোষজনক হইবে এমন আসা কেহই করিতে পারেন না। ছাত্রকে তাড়না করিবার সময় বিশেষে একুট আধটু প্রহার করিবার যে আবশ্যক হয় না তাহা নহে। আমি এই বলিতে চাহি অধিক তাড়না এবং নির্দ্দয় প্রহারের ফল কদাপি ভাল হইতে দেখা যায়। আজকাল প্রহার ও তাড়না না করিয়া, বিবিধ কৌশলে, শিশুর চিত্ত বিনোদন করিয়া, শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে প্রায় স্থানেই উত্তম ফল হইতে দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশে নামতঃ এই পদ্ধতির অনুসরণ হইতেছে বটে, কিন্তু অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগের হস্তে শিশুদিগের ভার ন্যস্ত থাকাতে কাজে কিছুই হইতেছে না। এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়াকে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া বলে।

যাঁহাদের শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সামান্য মাত্র জানা আছে, তাঁহারা অবশ্য জানেন—শিশুদের ভালবাসিয়া, তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যত সহজে এবং সন্তোষকর ভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এমন মারিলে, ধরিলে, এবং কঠোর শাসন অনুশাসনে হয় না। শিশুর মন যাহাতে শিক্ষকের প্রতি অনুরক্ত হয়—সে যাহাতে তাঁহার উপর সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনির্ভর করিতে পারে, শিক্ষক মহাশয়, কথায় কাজে অহোরহ সেইরূপ আচার অনুষ্ঠান করিবেন। যেখানে তিরস্কারের আবশ্যক কঠোর বাক্যে তাহা না করিয়া মিষ্ট বাক্যে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিলে, শিশু তাহা যত সহজে ও শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারে এমন অন্য উপায়ে হয় না। শিশুর মনে এই বিশ্বাসটি বদ্ধমূল হওয়া উচিত যে. শিক্ষক মহাশয় তাহার একান্ত বন্ধু, তিনি যাহা করেন তাহা ছাত্রের মঙ্গলের জন্যই করেন, ছাত্রকে কষ্ট দেওয়া শিক্ষক মহাশয়ের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এইরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারিলে, শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গ শিশুর নিকট কোন কালেই অপ্রীতিকর হয় না। গুরুশিষ্যের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ভাবটি জন্মাইলে, সাধারণতঃ তাহাকে প্রহারের আবশ্যক করে না। তথাপি সময় বিশেষে সকল শিশুকেই এক আধ ঘা যে না দিতে হয় এমন নহে। সে স্থলে তাহাকে নির্দ্দয় ভাবে বেত্রাঘাত না করিয়া. তাহার পাছায় আস্তে আস্তে ২।১টা চাপড় বসাইয়া দিবে যেন—সে বুঝিতে পারে, অধিক প্রহারে বা বেত মারিলে তাহার কষ্ট হইবে বলিয়াই, তুমি তাহা হইতে বিরত হইয়াছ। শিশুর মাথায়, কখনও প্রহার করিতে নাই। শিশুকে নির্ম্মম নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিবার কাহারও অধিকার নাই। এরূপ ভাবে প্রহার করিলে শিশুটির ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। যিনি এরূপ ভাবে প্রহার করেন, তাঁহার প্রতি শিশুর যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ছিল তাহা অবিলম্বে দূরীভূত হইয়া, তাহার স্থলে অশ্রদ্ধা, ভীতি প্রভৃতি ভাবের উদয় হয়। যিনি কথায় কথায় অধৈর্য্য ও আত্মবিস্মৃত হন, শিশুদের শিক্ষার ভার তাঁহার হস্তে কখনও দেওয়া উচিত নহে। যিনি অল্পেতে বিচলিত হ'ন না, শিশুর সহিত অবাধে ও সহজে মিলিতে মিশিতে পারেন—যিনি কথায় কাজে সত্য ভিন্ন কদাপি মিথ্যার অনুসরণ করেন না—শিশুর মনে কি করিয়া উৎসাহ সঞ্চার করিতে

হয়, ইহা যাঁহার জানা আছে, কঠোরতার অবলম্বন না করিয়াও যিনি শিশুদের নিকট হইতে সম্মান ও শ্রদ্ধা আদায় করিতে পারেন—এইরূপ ব্যক্তিই শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষক। এমন অনেক শিক্ষক আছেন, উঁহাদের গুণের সীমা নাই,কিন্তু শিশুদিগের সহিত ব্যবহার করিতে হইলে, তাঁহার পক্ষে কতটা দৃঢ়তা অবলম্বন করা উচিত তাহার ওজনজ্ঞান না থাকাতে শিক্ষকতা কার্য্যে যশস্বী হইতে পারেন না। হয়তো তাঁহারা অকারণ অধিক শক্ত হন, তাহাতে শিশুর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারাইয়া বসেন ; হয়তো এত আলগা ও ঢিলা হন যে শিশুরা তাঁহাদিগকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতে চাহে না।

ভূমিষ্ঠ হইবার কালে, শিশুর মন বলিয়া বড় একটা কিছু থাকে না। এ কথা অবশ্য সত্য যে নবজাত শিশুর মুখে স্তন দিলে, সে তাহা লইয়া কি করিতে হইবে তাহা বেশ বুঝে বটে, এবং ভিজে বিছানায় শোয়াইয়া দিলে, কিম্বা কোন কষ্ট বা অসুবিধা ঘটিলে তাহা যে অনুভব না করিতে পারে এমন নয়। তথাপি শিশু যে নিতান্ত অজ্ঞানাবস্থা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে,এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে জন্মের পর কয়েক দিবস মধ্যেই তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির শক্তি ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতে থাকে। সে অনতিকাল বিলম্বে চোক্ দিয়া দেখিতে শিখে, কান দিয়া ধ্বনি শুনিতে শিখে, জিহ্বা দিয়া আস্বাদানুভব করিতে শিখে, ত্বক দিয়া বিবিধ প্রকার স্পর্শানুভব করিতে পারে। ইহার পর সর্ব্বশেষে নাক দিয়া আঘ্রাণ লইতে শিখে।

শিশু তাহার বাহ্যেন্দ্রিয় কয়টির দ্বারা যাহা যাহা উপলব্ধি করে, দীর্ঘকাল সময়ের জন্যই হোক আর স্বল্পকালের জন্যই হোক, সে সকলকে আপনার স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিতে থাকে। এই স্মৃতির সাহায্যেই তাহার মনে জ্ঞান ও বুদ্ধির উদয় হইতে থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্টতর হইতে পারে। মা শিশুকে তুলিয়া কোলে করিয়া স্তন দেন। মা যেই শিশুকে বিছানা হইতে তুলিয়া কোলে করেন অমনি সে বুঝিতে পারে আমাকে কি করিতে হইবে। ঠিক নিয়মিত সময়ে যদি শিশুকে স্তনপানাভ্যাস করান হয়, তাহা হইলে এমন দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে ঠিক স্তন দেওয়ার সময়টি হওয়ামাত্র শিশুর মুখ ভাঙিয়া যাইবে। শিশুর অনুভব ও বোধ শক্তি এত শীঘ্র প্রকাশ পাইবে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যজ্ঞান করিতে হয়। কয়েক দিনের শিশুটিও তাহার মাতার ক্রোড় বা অপর একজনের ক্রোড় বুঝিতে সক্ষম হয়। ২১ দিনের শিশুর কানের গোঁড়ায় একটা ঘড়ি ধরিলে সে মনোযোগ সহকারে ঘড়িটার টীক্‌টিক্ শব্দ শুনিতেছে এইরূপ মনে হয়। দুধ আর ভেরাণ্ডার তেল যে এক পদার্থ নয় তাহা দিব্য বুঝিতে পারে। মাতা যদি একটু ত্যাগস্বীকার করেন, তাহা হইলে ২।৪ মাসের শিশুকে যথাসময়ে নিয়মিত ভাবে মলমূত্রত্যাগ অভ্যাস করাইতে পারেন।

এইরূপে শিশুর মস্তিষ্ক বাহ্যেন্দ্রিয় সাহায্যে পদার্থ ও ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। সুধু গ্রাহ্য করা নয় এগুলি তাহার মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া যায়। এবং ইহাদেরই স্মৃতি-সাহায্যে তাহার বুদ্ধি ও জ্ঞান ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে। সে যতই বড় হইতে থাকে, তাহার কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের সংখ্যাও ততই বাড়িতে থাকে—তাহার সঙ্গে তাহার জ্ঞানের সীমানা ততই বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করে। সে দেখিল ছুঁচ হাতে বিধেঁ,অতএব সে আর ছুঁচ হাতে দেয় না ; কেন না হাতে বিঁধার কথা সে তখনও ভুলিতে পারে নাই। আগুণে হাত দিয়া দেখিল যে হাত পুড়ে, আর সে আগুণ দেখিলে হাত বাড়ায় না। এই রূপে অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধির বৃদ্ধি হয়। শিশু যেই একটু বড় হয়, কে যে তাহার মা তাহা বেশ বুঝিতে পারে। তাঁহাকে "মা, মা" বলিয়া ডাকিতেও শিখে। বাবাকে বাবা বলে। ঘোড়া "চিঁহিঁ" করিয়া ডাকে, তাই

তাই শিশু ঘোড়া দেখিলে তাহাকে "চিঁহিঁ" বলে। গাড়ী গড়্ গড়্ করিয়া যায়—এই কারণে গাড়ীর নাম শিশুর নিকট "গড়্গড়্"। এই প্রকারে বাহেন্দ্রিয় সাহায্যে ক্রমশঃই তাহার পদার্থ জ্ঞান ও বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়।

শিশু যত অনুকরণ করিতে ভাল বাসে এমন আর কেহ নহে। অনুকরণ দ্বারা সে অনেক বিষয়ই শিখে। এই জন্য তাহার চারি পার্শ্বের অবস্থাসমূহ এমন হওয়া উচিত যাহাতে অনুকরণ দ্বারা ভাল ভিন্ন মন্দ কিছু শিখিতে সমর্থ না হয়। শিশুর সম্মুখে কোনরূপ কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে নাই। মাতালের ছেলে যে বড় হইয়া মাতাল হয়—অসচ্চরিত্র ব্যক্তির ছেলে যে মন্দস্বভাব হয়, তাহার কারণ সে জন্মাইয়া অবধি ঐ সব কদনুষ্ঠান দেখিতে পায়, এবং তাহা অনুকরণ করিতে থাকে। শিশু যত বড় হয় নূতন নূতন কথা শিখিতে থাকে। অনেকের কেমন দোষ, শিশুর বয়স বিচার না করিয়া, তাহাকে অকারণ কতকগুলা বেশি শব্দ শিখাইতে থাকেন। ইহা ভারি অন্যায়। ইহাতে শিশুর মস্তিষ্ক অন্যায়ভারাক্রান্ত হয়। শব্দ শিখাইবার জন্য কিছুমাত্র বেগ পাইবার বা ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই—সে আপনা হইতেই যাহা শিখিবার শিখিয়া লইবে।

শিশু আমাদের মত হাস্য দ্বারা চিত্তের আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার মনে আনন্দ বা কষ্ট হইলে, সে মৃদু হাস্য দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিয়া থাকে। একটু বড় হইলে তবে উচ্চ হাস্য করিতে সমর্থ হয়। কোন বিষয় যদি তাহার মনের মতন না হয়, তাহা হইলে ভ্রূ কুঁচকাইয়া অথবা ঠোঁট ফুলাইয়া, নয়তো কাঁদিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যেই তাহার মুখে ২।১টি কথা ফুটে কোন বিষয়ে সম্মতি অসম্মতি প্রকাশ করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

চরিত্রের দোষগুণ খুব শৈশবেই প্রকাশ পাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই মানুষের মধ্যে কেহ হয়তো ভারি একগুঁয়ে, কেহ বা অতিশয় স্বার্থপর, কেহ বা ভারি পরশ্রীকাতর, কেহ বা অত্যন্ত লোভাতুর। চরিত্রের এই সব দুর্ব্বলতার চিহ্ন ছেলেবেলাকার বিবিধ ছোটখাট কাজের মধ্যে প্রকাশ পাইতে পারে। বাবা মা যদি চেষ্টা যত্ন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানের এই সব ত্রুটি শৈশবেই ধরিতে পারেন, এবং বিশেষ যত্ন ও কৌশল দ্বারা শৈশবে ইহাদের মূলোচ্ছেদ করিতে পারেন। এ বিষয়ে উদাসীন হইলে, বড় হইলে তাঁহাদের সন্তানের ব্যবহার তাঁহাদের নিকট এবং তাহার নিজের নিকটও বিশেষ পীড়াকর হইয়া দাঁড়ায়। অতএব শৈশব হইতেই সন্তানের ব্যবহারাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার আবশ্যক। তাহার মনের গতি বুঝিয়া তাহার অনুসারে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। চরিত্রের বিশেষ কোন দোষের সম্ভাবনা যেমন শৈশবকাল হইতেই টের পাওয়া যায়, সেইরূপ কোন গুণের সম্ভাবনা থাকিলে তাহাও যে জানিতে না পারা যায় তাহা নহে। এই সময় হইতেই শিশুর চরিত্রে স্নেহ মায়া মমতা, উদারতা, সত্যপ্রিয়তা, পরদুঃখকাতরতা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনেচ্ছা, দৃঢ়চিত্ততা ও কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতি সদ্গুণরাজির চিহ্ন প্রকাশ পায় এবং যথোচিত ভাবে অনুশীলন করিলে বিশেষ ভাবে পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হয়। এ স্থলে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কার্য্যতৎপর না হইলে সংসারের কেহই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু খুব শৈশবে এই দুটি বৃত্তির যদি অস্বাভাবিক পুষ্টি ঘটে, তাহা হইলে তাহা শিশুর ভবিষ্যৎ পক্ষে উপকারের না হইয়া বরঞ্চ অপকারেরই হইতে দেখা যায়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সে স্থলে শেষে একগুঁয়েমিতে পরিণত হয়, আর কার্য্যতৎপরতা অস্থিরতা ও চঞ্চলতায় পর্য্যবসিত হয়। এই কারণে কাহারও পক্ষে ঐ দুটি গুণের উৎসাহ দেবার আবশ্যক, কোথা ও বা বিশেষ কৌশল অবলম্বন

করিয়া উহাদের কমাইতে চেষ্টা করিতে হয়। সন্তান বড় হইয়া জীবন সংগ্রামে যাহাতে জয়লাভ করিতে পারে এমন ইচ্ছা সকলেরই হয়। কিন্তু ইচ্ছাটাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে নিজেদের অন্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না।

শৈশবের ক্রীড়াকৌতুকগুলিতে ও খেলেনা লইয়া খেলাতে শিশুর মানসিক শক্তি দিব্য পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। এই কারণে এ সকল হইতে শিশুকে নিবৃত্ত করিতে নাই, বরঞ্চ উৎসাহ দিতে হয়। খেলেনা সম্বন্ধে ধনীর ঘরে প্রায়ই অন্যায় ঘটিতে দেখা যায়। সকলেই এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক একদিনে শিশুকে একটি, খুব জোর দুইটির বেশী খেলেনা দিতে নাই। অধিক খেলেনা দিলে, শিশু কোনটিরই মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না, কাযেই খেলেনার যাহা উদ্দেশ্য সেটি সম্পূর্ণ বিফল হয়। কোন বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে শিশুর পুরাণ খেলেনাগুলি তাহার দ্বারা দরিদ্র শিশুদের মধ্যে বিলাইয়া দিতে হয়। শিশুর এই দানে দরিদ্র শিশুদের মনে আনন্দ হয়। ইহাতে দাতার হৃদয়ে দয়াবৃত্তির ও উদারতার বৃদ্ধি হয়, সুতরাং পরের আনন্দ বর্দ্ধন করা এবং ভাল কাজ করার প্রবৃত্তিটি যেন স্বভাবজাত হইয়া দাঁড়ায়।

শিশুদের কেমন স্বভাব যাহা দেখে কি শুনে, তাহার বিষয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে ভাল বাসে। সৃষ্টির সকল বিষয় জানিবার জন্য তাহাদের মনে কেমন একটা কৌতুহল জন্মায়। শিশুর প্রশ্নে তাহার পিতামাতা তাহার উপর বিরক্ত হন এবং সময়বিশেষে হয়তো তিরস্কারও করিয়া থাকেন। ইহা ঠিক নাই। শিশুর প্রশ্নে বিরক্ত হইলে চলিবে না। শিশুর সহিত ব্যবহার কালে অতিশয় ধীরতা অবলম্বন করা উচিত। শিশুর হৃদয় অভিমানে পরিপূর্ণ—তাহাকে "মুখনাড়া" দিলে সে হৃদয় মধ্যে অতিশয় বেদনা পায়। তাহার ফলে তাহার মনের স্বাভাবিক স্ফুর্ত্তির বিলোপ ঘটিতে পারে। শিশু যদি সত্যই এমন প্রশ্ন করে যাহার উত্তর ঠিক তাহার বুদ্ধির উপযোগী নহে, তাহা হইলে মিষ্ট কথায় তাহাকে সেটা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, এবং বড় হইলে তাহাকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে এরূপ আশা দেওয়া কর্ত্তব্য। কতকগুলি শিশু এমন থাকে তাহারা অকালেই পক্কতা লাভ করিয়া থাকে। ইহাদের ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা বাস্তবিকই বড়ই বিরক্তি-কর বোধ হয়। ইহারা এমন সব কথা কহে এবং কাজ করে, যাহা কিছুতেই ইহাদের বয়সোচিত বলা যায় না। চলিত ভাষায় ইহাদের "জেঠা" ছেলে বলে। অনেকে ইহাদের খুব চতুর ও বুদ্ধিমান বলিয়া ভুল করিয়া বসেন। "জেঠামি" আর চতুরতা ঠিক এক জিনিস নহে। পিতামাতা যদি শিশুর অকালপক্কতায় উৎসাহ দেন, তাহা হইলে শিশুটির ভবিষ্যৎ একবারে নষ্ট হইয়া যায়। উৎসাহ ত দূরের কথা বাপমার কার্য্য, দৃঢ়ভাবে অথচ রাগ প্রকাশ না করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যে, তাহাদের এই ব্যবহার বা কথা ঠিক নহে, ইহাতে নিন্দার পাত্র হইতে হয়, ইহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর।

শিশুদের কোন বিষয়ে কথা দিলে তাহা পরিপূরণ করা কর্ত্তব্য। শিশু কাহারও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথাটা কিছুতেই ভুলিতে ও মার্জ্জনা করিতে পারে না। ইহাতে সত্যের প্রতি তাহার শ্রদ্ধালোপ হয়। বাস্তবিকই যদি এমন ঘটে, পূর্ব্বে শিশুকে যে কথাটা দেওয়া হইয়াছিল, অনিবার্য্য কারণ বশতঃ তাহা ভঙ্গ করিতে হইতেছে, তাহা হইলে শিশুকে কথাটা বেশ করিয়া বুঝা-ইতে চেষ্টা করিতে হয়। তাহা না করিলে, শিশুর মনে তোমার প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে। শিশুর কথায় ও ব্যবহারে যাহাতে সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রকাশ না পায় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার আবশ্যক। যাহার তাহার সম্মুখে শিশুকে তাড়না করিতে নাই। যে সব বাপমা এ নিয়মটি রক্ষা না করেন তাঁহারা সন্তানের মিত্র নহেন, ঘোরতর শত্রু। শিশুর চরিত্রের কোন দোষ

সংশোধন করিতে হইলে, তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া উপদেশ দিতে হয়। ইহাতে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। দশ জনের সম্মুখে তাহার লাঞ্ছনা করিলে সে একেবারে বিগড়াইয়া যায়।

মনে করা যাক শিশুটি চারি বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়াছে। এখন হইতে তাহার শিক্ষা বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক? এখন তাকে কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ৪ হইতে ৭ বৎসরের বয়স পর্য্যন্ত শিশুর শিক্ষার পক্ষে কিণ্ডার গার্টেনের পদ্ধতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। কেবল মুখস্থ করাইয়া পাঠাভ্যাস করাইলে শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষতি ভিন্ন উন্নতি হয় না। যে স্থলে কিণ্ডার-গার্টেনের কোন সুবিধা নাই, সে খানে ৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে প্রকৃতির শিক্ষারই অধীন রাখিতে হয়। বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোনরূপই আয়োজন করিবার আবশ্যক নাই। এমন কি এই সময় তাহাকে বর্ণপরিচয় পর্য্যন্তও শিখাইতে নাই।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীতে যে সকল অনুষ্ঠান করা হয়, নিম্নে সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইতেছে। শিশুকে একলা আপনমনে খেলিতে দেওয়া, তাহার সমবয়স্ক দশজনের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া স্বাধীন ভাবে খেলিতে দেওয়া, বিবিধ ব্যায়াম; তাহার দ্বারা যাহা সম্ভব এই রকম কারুকার্য্য করিতে দেওয়া; বেড়াইতে দেওয়া; গান বাজনা শিক্ষা; কবিতা আবৃত্তি; গল্প বলা; ভাল ভাল ছবি দেখা; ঘরের কাজে যোগ দেওয়া; এবং বাগানে গাছ লাগান ও গাছে জল প্রভৃতি দেওয়া; বলা বাহুল্য আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত এ পদ্ধতির তেমন আদর হয় নাই। কিন্তু ইহার উপকারিতা ও আবশ্যকতা বিষয়ে যখন আর কোন সন্দেহই নাই, তখন কাল বিলম্ব না করিয়া ইহার অনুষ্ঠান করা উচিত। এই প্রথার বিশেষত্ব এই যে, খেলা করিতে করিতে শিশুর বর্ণ পরিচয় হয় এবং সে এক দুই গণিতে শিখে। নানা প্রকার ঝুড়ি বুনিতে শিখে; দক্ষতানুসারে ছবি আঁকিতে চেষ্টা করে। অক্ষর দেখিয়া, কাষ্ঠখণ্ড সমূহ দ্বারা সেইরূপ অক্ষর প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করে। এ সব ছাড়া তাহাকে বিবিধ ফলপুষ্প পশুপক্ষী প্রভৃতি দেখান হয়। প্রথমতঃ শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ সকল পদার্থের পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহার পর উহাদের সম্বন্ধে যতটা জানার আবশ্যক শিক্ষক মহাশয় তাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। এক দিন শিশুকে একটীর অধিক বিষয়ে শিক্ষা দিতে নাই। ইহার পর শিশুরা ব্যায়াম করে, মার্চ্ করে, আর গান গাহে। ইহারা যাহা করে, তাহারই সহিত খেলা মিশ্রিত থাকে। মোটের উপর বলিতে গেলে, কিণ্ডার গার্টেন্ পদ্ধতিতে শিশুর মনে আনন্দ ও সন্তোষের সঞ্চার হয়। ইহাতে তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব ফুটাইয়া তুলে। তাহার স্বভাবের ছোট ছোট দোষগুলি সংশোধিত হইয়া যায়। ইহাতে তাহার নীতিবৃত্তি সমূহ ও পরোপকার বৃত্তি প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়, পরস্পর ভালবাসা জন্মায়, জীবের প্রতি দয়া হয়, স্বাধীন চিন্তার অভ্যাস জন্মায়। গান গাওয়া, গল্প বলা ও কবিতা আবৃত্তির জন্য উচ্চারণ-দোষ সংশোধিত হয়। শব্দের তালিকা পুষ্ট হইতে থাকে। ড্রয়িঙ্ ও ছবি আঁকার চেষ্টা করায়, সৌন্দর্য্যবোধশক্তিটির অনুশীলন হইতে থাকে।

শিশু ৭ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৮ বৎসরে পড়িলে আর তাহাকে কিণ্ডার গার্টেন্ মতে শিক্ষা দেওয়ায় কোন আবশ্যক নাই। এখন তাহাকে সাধারণ স্কুলে দিতে দিতে পারা যায়। ইচ্ছা করিলে স্কুলে না দিয়া উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারা গৃহেতেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এ সময় সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় এইটি যে, শিশুর স্কন্ধে যেন এক রাশি পুস্তক না চাপান হয়। আর তাহার মুখস্থ করিবার বৃত্তিটির প্রশ্রয় না দেওয়া যায়। মনে কর শিশুটির স্বাস্থ্য ভাল, তাহার শরীরের উন্নতি দিন দিন বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাহার মনের উন্নতি হইতেছে, বটে কিন্তু তাহা অতি ধীরে। এ স্থলে শিশুর

পিতামাতাকে উহাতেই তৃপ্ত থাকিতে হইবে। ছেলে যদি আপনার ক্লাশে উচ্চ স্থান অধিকার না করিতে পারে তাহার জন্য তাহাকে তিরস্কার করা উচিত না। অবশ্য যদি এমন বুঝা যায় যে পড়াশুনায় একবারে ঔদাস্য বশতঃই এমন ঘটিতেছে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। যদি এমন বুঝা যায় যে ছেলেটি চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না, তাহা হইলে তাহাকে ভর্ৎসনা করা মিথ্যা। যে সকল ব্যক্তি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান পাইয়াছেন, তাঁহাদের কেহই ১২ বৎসরের পূর্ব্বে আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রতিভার কোনই নিদর্শন দেখাইতে পারেন নাই। যে সকল ছেলেদের স্বভাবতঃই বুদ্ধি বেশী, তাহারা বুদ্ধির কাজ লইয়াই থাকিতে ভাল বাসে, খেলা ধূলা ব্যায়াম প্রভৃতিতে তাহাদের তেমন আসক্তি থাকিতে দেখা যায় না। এরূপ স্থলে তাহাদের বুদ্ধির চালনা হ্রাস করিয়া শরীরের চালনা যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ছেলে বেলায় সকলকে এমন একটা কাজ শিখান ভাল, যাহা ভবিষ্যতে তাহার কাজে লাগিতে পারে। গাছপালা, চাষ আবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে সকলকেই একটু আধটু শিক্ষা দেওয়া মন্দ নহে।

পিতামাতা যেন সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের সন্তানেরা যেন কোন কালেই বাঁকা হইয়া না বসে। এক একটি ছেলের কেমন অভ্যাস বাঁকা না হইয়া লিখিতেই পারে না। এইরূপ অভ্যাস কিছুতেই হইতে দিতে নাই। পড়িবার বা লিখিবার কালে এমন ভাবে বসা উচিৎ যাহাতে আলোকরশ্মি তাহার বামস্কন্ধের উপর দিয়া আসিয়া কাগজ বা পুস্তকের উপর পড়িতে পারে। পড়িতে পড়িতে বা লিখিতে লিখিতে যদি চোক দিয়া জল পড়ে, কিম্বা চোখের মধ্যে বেদনা হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে চক্ষু-চিকিৎসকের দ্বারা চক্ষুর পরীক্ষা করা উচিত। সহর অপেক্ষা পাড়াগাঁয়ের বাতাস বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। এই কারণে ছেলেদের পাড়াগাঁয়ে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে পাপের প্রলোভন অনেক বেশী। এই কারণে সহরে ছেলেদের নৈতিক অবনতির অধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে। পুরুষ প্রকৃতি ও স্ত্রী প্রকৃতি ঠিক একরূপ নহে, এই কারণে শিক্ষা কালে যাহাতে স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতির বিশেষত্ব রক্ষিত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্ত্রী পুরুষস্বভাবাপন্ন আর পুরুষ স্ত্রীসভাবাপন্ন হউক, ইহা কেহই ইচ্ছা করে না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচি।

রেডিয়াম

আবিষ্কারের ইতিহাস।

পিচব্লেণ্ড (pitch blend) নামক এক প্রকার পাথর হইতে মাদাম কিউরি (Madame Curie) রেডিয়াম নামক নূতন ধাতুর আবিষ্কার করিয়াছেন। যখন এই নবাবিষ্কৃত ধাতুর অদ্ভুত গুণসমূহ পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইল, তখন সকলেই সবিস্ময়ে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে কি উপায়ে মাদাম কিউরি এই আশ্চর্য্য ধাতু আবিষ্কার করিলেন? অনেক সময়ে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ঘটনাবশাৎ আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু রেডিয়াম সেরূপ দৈবাধীনে আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে যে আবিষ্কারপরম্পরার ফলে মাদাম কিউরি রেডিয়ামের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার প্রথমটীর মূলে একটা আকস্মিক ঘটনা বই আর কিছুই ছিল না।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রণ্ট্গেন (Rontgen , নামক অষ্ট্রিয়া দেশের এক অধ্যাপক এক দিন একটী কাচের নলের

বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া তাড়িত স্রোত প্রবাহিত করতঃ নানারূপ পরীক্ষা করিতেছিলেন। নিকটে একটী বাক্সের মধ্যে কয়েকখানা ফটোগ্রাফের প্লেট ছিল। ফটোগ্রাফের প্লেটে আলোক লাগিলে তাহা বিকৃত হইয়া যায়; তদ্দ্বারা আর ফটোগ্রাফ তোলা যায় না। এই জন্য সেগুলি এরূপ বাক্সে রাখা হয় যাহাতে কোন মতেই আলোক প্রবিষ্ট হইতে পারে না। পূর্ব্বকথিত কাচের নল লইয়া পরীক্ষা করার সময়ে এরূপ একটী বাক্স ঘটনাবশাৎ তাহার সম্মুখে ছিল। তিনি বাক্স খুলিয়া দেখেন যে উপরি উক্ত প্লেটগুলি বিকৃত হইয়াছে,—যেন তাহাদের উপর আলোকের ক্রিয়া হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া রঞ্জেন সিদ্ধান্ত করিলেন যে ঐ তাড়িতাবিষ্ট কাচের নল হইতে নিশ্চয়ই এরূপ কোন আলোক নির্গত হইয়াছিল, যাহা কাঠের মধ্য দিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে; এবং তাহা অদৃশ্য হইলেও দৃশ্য আলোকের ন্যায় ফটোগ্রাফের প্লেট বিকৃত করিয়া ফেলিতে পারে। তিনি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখিলেন যে উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত অমূলক নয়। অজ্ঞাত রাশিকে বুঝাইবার জন্য অঙ্কশাস্ত্রে এক্স্ (x) অক্ষর ব্যবহৃত হয়, বলিয়া তিনি এই অজ্ঞাত পূর্ব্ব আলোকের নাম রাখিলেন এক্স্ আলোক। আবিষ্কারকের নামানুসারে ইহাকে রঞ্জেন আলোকও বলা হইয়া থাকে।

রঞ্জেনের এই আবিষ্কারের পর অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরাও এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। রঞ্জেন আলোকের নলগুলি অন্ধকারে উজ্জ্বল দেখায়। এই জন্য, যে সমস্ত পদার্থ অন্ধকারে উজ্জ্বল দেখায় অনেকে তাহা লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিলেন যে সাধারণ জোনাকি পোকা হইতে দৃশ্য আলোক ছাড়াও এক প্রকার অদৃশ্য আলোক নির্গত হয়; এবং সেই অদৃশ্য আলোক কালো কাগজের মধ্য দিয়া অনায়াসে চলিয়া গিয়া ফটোগ্রাফের প্লেট বিকৃত করিয়া ফেলিতে পারে।

রঞ্জনের আবিষ্কারেরও পূর্ব্বে লেনার্ড (Lenard) নামক অষ্ট্রিয়া দেশের আর এক জন অধ্যাপক আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে বায়ুশূন্য কাচের নল তাড়িতাবিষ্ট হইলে তাহা হইতে অন্য এক প্রকার অদৃশ্য আলোক নির্গত হয়; সেই আলোক যদি কোন কাচপাত্রের উপর পতিত হয় তবে ঐ কাচপাত্রকে আলোকিত করে; এবং তাহা পাতলা ধাতুর পাতও ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে।

রঞ্জেন আলোকের আবিষ্কারের পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকারেল (Becquerel) আবিষ্কার করিলেন যে সুপরিচিত ইউরেণিয়াম (Uranium) ধাতু হইতেও এরূপ আলোক নির্গত হয়, যাহা রঞ্জেন আলোকের ন্যায় কাঠ ভেদ করিয়া ফটোগ্রাফের প্লেট বিকৃত করিতে পারে এবং লেনার্ড আলোকের ন্যায় কোন কোন পদার্থকে আলোকিত করিতে পারে। পিচব্লেণ্ড হইতেই ইউরেণিয়াম পাওয়া যায় পিচব্লেণ্ডেও অল্পাধিক পরিমাণে এই সমস্ত গুণ আছে।

বেকারেলের এই আবিষ্কার রেডিয়াম আবিষ্কারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। মাদাম কিউরি পিচব্লেণ্ড নানা রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং যে সমস্ত পদার্থে ইউরেণিয়ামের গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি প্রথমতঃ সেগুলি নিষ্কাশিত করিলেন। পরে আবার সেইগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর ইউরেণিয়াম ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ নিষ্কাশিত করিলেন। এইরূপ বিশ্লেষণ করিতে করিতে তিনি অবশেষে এরূপ এক পদার্থ প্রাপ্ত হইলেন যাহাতে ইউরেণিয়ামের পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণসমূহ ইউরেণিয়াম অপেক্ষা ১৮,০০,০০০ গুণ অধিক বর্ত্তমান আছে। এই অদ্ভুত পদার্থের নাম রেডিয়াম।

তিন প্রকার আলোক

মাদাম কিউরি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে রেডিয়াম হইতে তিন প্রকার আলোক নির্গত হয়। কিন্তু সাধারণ আলোক হইকে রেডিয়ামের আলোকের,—অন্ততঃ রেডিয়ামের দুই প্রকারের আলোকের, বিশেষ পার্থক্য আছে। সাধারণ আলোক ঈথরের তরঙ্গ বই আর কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে ঈথার নামক এক সূক্ষ্ম পদার্থ আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাহা বায়ু হইতেও সূক্ষ্ম এবং বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য। পৃথিবী হইতে কতক দূর পর্য্যন্ত বায়ু পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, কিন্তু ঈথর অনন্ত আকাশব্যাপী। পুষ্করিণীর জলে যদি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা যায়, তবে তাহাতে যেরূপ চক্রাকার তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হয় একটী পদার্থের দ্বারা অন্য কোন পদার্থকে আঘাত করিলেও বায়ুতে ঠিক সেইরূপ তরঙ্গ উপস্থিত হয়। এই তরঙ্গ যখন আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করে তখন আমরা শব্দ শুনিতে পাই। ঠিক সেইরূপ, কোন আলো জ্বলিলে ঈথার সমুদ্রেও এক প্রকার তরঙ্গ উত্থিত হয়। সেই ঈথার তরঙ্গ যখন আমাদের চক্ষুর মধ্যস্থিত রেটিনা (retina) নামক পরদায় আঘাত করে; তখন সেই আলো আমরা দেখিতে পাই। নিউটন বিশ্বাস করিতেন যে উজ্জ্বল পদার্থ হইতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আলোককণা সমস্ত ছুটিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষুর উপর পতিত হয়; তাহাতেই আমাদের সেই পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা আর তাহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন যে সাধারণ আলোক ঈথরের তরঙ্গ বই আর কিছুই নহে।

কিন্তু রেডিয়াম পরীক্ষা করিয়া গিয়াছে যে তাহা হইতে অনবরত অতি সূক্ষ্ম আলোক-কণা সমূহ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। এই সমস্ত আলোককণা এত সূক্ষ্ম যে যদিও সেগুলি অনবরত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তথাপি তাহাতে বহুবৎসর পরেও এক খণ্ড রেডিয়ামের পরিমাণ কি ওজনের হ্রাস হইতে দেখা যায় না। অবশ্য রেডিয়ামের এই আলোক-কণা বিক্ষেপের ক্ষমতা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কিন্তু কত হাজার হাজার বৎসর পরে এক খণ্ড রেডিয়ামের ক্ষমতা হ্রাস হইবে তাহা বলা কঠিন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রেডিয়াম হইতে তিন প্রকার আলোক নির্গত হয়। গ্রীক বর্ণমালায় প্রথম তিন অক্ষরের নামানুসারে এই তিন প্রকারের রেডিয়াম আলোকের নাম যথাক্রমে আল্‌ফা, বিটা, এবং গামা রাখা হইয়াছে। 'আলফা' আলোক অন্য দুই প্রকার আলোক অপেক্ষা মন্দগতি। অভ্রের একখানা পাতলা পাত ধরিলে আলফা আলোক তাহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। 'বিটা' আলোকের গতি অত্যন্ত দ্রুত। সাধারণ আলোক এক সেকেণ্ডে ১,৮০,০০০ মাইল চলিয়া যায়। 'বিটা' আলোকের গতিও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু 'আলফা' আলোকের গতি তদপেক্ষা অনেক কম। 'আলফা' আলোক এক সেকেণ্ডে ১৫,০০০ মাইলের অধিক যাইতে পারে না। 'বিটা' আলোক এইরূপ দ্রুতগামী বলিয়া অভ্রের পাত সহজেই ভেদ করিতে পারে; এমন কি, সিকি ইঞ্চি পুরু সীসার পাতও ভেদ করিয়া যাইতে ইহার কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু 'গামা' আলোকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী। ইহা প্রকাণ্ড লৌহপিণ্ড অনায়াসে ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে।

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আলফা ও বিটা আলোক রেডিয়ামের অতি সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম কণা মাত্র। কিন্তু গামা আলোকও এইরূপ রশ্মিকণা কি না তদ্বিষয়ে এখনও বৈজ্ঞানিকদিগের সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ গামা আলোক, সাধারণ আলোকের মত, ঈথরের তরঙ্গ বই আর কিছুই নহে।

আগামী বারে আমরা এই তিন প্রকার আলোকের বিশেষ লক্ষণ ও রেডিয়াম সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য বিবৃত করিব।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ

দ্বিতীয় সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী

(সন ১৩১৯)

ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। প্রার্থনা করি যে ভগবানের অনুগ্রহে পরিষদের ক্ষুদ্র চেষ্টা বিগত বৎসর যেরূপ সফলতালাভ করিয়াছে বর্ত্তমান বৎসরেও তাঁহারই অনুগ্রহে উহা যেন তদ্রূপ বা তদধিক সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সভার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন

নানা উপায়ে বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতিকল্পে কতিপয় মাতৃভাষার সেবক কর্ত্তৃক এই পরিষৎ ১৩১৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশের দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকা নগরীতে এরূপ একটী সভার যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কলিকাতা মহানগরীতে এমন কি বঙ্গদেশের অনেক নগরে এই জাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক সভা সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্য, ও প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা, অনুশীলন, ও উদ্ধার কল্পে দেশব্যাপী যে চেষ্টা চলিতেছে একমাত্র ঢাকা নগরীই কি সে চেষ্টায় যোগদান করিতে বিরত থাকিবে? এতদিন পর্য্যন্ত আমরা এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম, ইহা কি আমাদের কলঙ্কের কথা নহে? ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ তাহার ক্ষুদ্র চেষ্টা দ্বারা সে কলঙ্ক মোচনের প্রয়াসী হইয়াছে। সে প্রয়াস বিফল হইবে আমাদের এরূপ বিশ্বাস নহে। ঢাকা জিলায় শিক্ষিত লোকের অভাব নাই। অথচ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখুন, ঢাকা জিলার, তথা পূর্ব্ববঙ্গের, সাহিত্যিকদিগের সংখ্যা কত। বোধ হয় তাঁহাদিগকে করাগ্রভাগে গণনা করা যাইতে পারে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আলস্যপরায়ণ, মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন; এবং যাঁহাদের এ বিষয়ে চেষ্টা আছে, আগ্রহ আছে, তাঁহারাও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে চেষ্টা ও চিন্তা করিয়া আশানুরূপ সফলতা দেখাইতে পারিতেছেন না। এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিয়া, আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সুপ্তশক্তি জাগরিত করিয়া, তাহা মাতৃভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনকার্য্যে নিয়োজিত করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যদি দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন,—যাঁহাদের অর্থ আছে তাঁহারা যদি অর্থ সাহায্য করেন, যাঁহাদের প্রতিভা আছে তাঁহারা যদি আলস্যশয়নে দিন কর্ত্তন না করেন,—তবেই পরিষদের উদ্দেশ্য সম্যক্ রূপে সাধিত হইবে।

সভ্য-সংখ্যা

দুই বৎসর হয় এই পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহা যে কাজ করিয়াছে তাহা নিতান্ত নৈরাশ্যসূচক বলিয়া মনে হয় না। ১৩১৮ সনে এই সভা যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহার সভ্য-সংখ্যা ৩১জন ছিল। ১৩১৮ সনের শেষভাগে সভ্য-সংখ্যা ১৪৯ জন দাঁড়াইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে ঐ সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইয়া ৩৬০ জনে পরিণত হইয়াছে যথা,—

আজীবন সভ্য—	৪
সাধারণ সভ্য—	২৮৬
ছাত্র সভ্য—	৬৭
পরিপোষক—	৩
	৩৬০

সাধারণ সভ্য মধ্যে—

সহরে—	১৫৪
মফঃস্বলে—	১৩২
	২৮৬

মোট সভ্য-সংখ্যার মধ্যে আলোচ্য বর্ষে ১০ জন ছাত্র সভ্য ও ৫০ জন সাধারণ সভ্যের নাম সভ্য-তালিকা হইতে অপসৃত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে মফঃস্বলস্থ ৪৯ সভ্য সারা বৎসর আমাদের পত্রিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বর্ষশেষে তাঁহাদিগের দেয় চাঁদা আদায়ের জন্য পত্রিকা ভি পি ডাকে প্রেরিত হইলে তাঁহারা ভি পি গ্রহণ না করিয়া আমাদিগকে অন্যায়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাহাতে পরিষৎকে এইরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে না হয় তজ্জন্য বর্ত্তমান বৎসরে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি এরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে প্রত্যেক তিনমাস অন্তর পত্রিকা ভি পি ডাকে পাঠাইয়া মফঃস্বলস্থ সভ্যগণের চাঁদা অগ্রিম আদায় করা হইবে।

চাঁদা আদায়

সহরস্থ সভ্যগণের চাঁদাও অনেক বাকী পড়িয়াছে। রীতিমত চাঁদা আদায় না হওয়াতে আমাদিগকে যে কি রূপ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যাহাতে সভ্যগণ স্ব স্ব দেয় চাঁদা নিয়মিতরূপে আদায় করেন এবং পূর্ব্ব বাকী শীঘ্র শীঘ্র পরিশোধ করেন তজ্জন্য সভ্যমহোদয়গণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি।

আজীবন সভ্য

যাঁহারা পরিষৎ ভাণ্ডারে এককালীন ১০০৲ টাকা দান করেন তাঁহারা পরিষদের আজীবন সভ্যরূপে পরিগণিত হন। বড়ই সুখের বিষয় আলোচ্য বৎসরে চারিজন মহোদয় পরিষদের আজীবন সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন; যথা,

(১) কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

(২) ভাওয়ালের পরলোকগত ৺ কুমার রবীন্দ্র-নারায়ণ রায়।

(৩) মালদহের উকিল শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষ

(৪) ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল রায়।

উক্ত মহোদয়গণ পরিষৎকে এই রূপে উৎসাহ প্রদান করিয়া পরিষদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ভরসা করি, অন্যান্য মহোদয়গণও তাঁহাদের মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ঢাকা সাহিত্য পরিষৎকে অনুগৃহীত ও উৎসাহিত করিবেন। *

মৃত সভ্যগণ

(১) পরিষদের অন্যতম আজীবন সভ্য ভাওয়ালের কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। যদিচ এই শোচনীয় ঘটনা বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্যবিবরণীরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, তথাপি আমি ইহার উল্লেখ না করিয়া বিষয়ান্তরের আলোচনা করিতে পারিতেছি না। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে পরিষদের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। ভাওয়ালের রাজবংশ চিরকালই বিদ্যোৎসাহী। তাঁহার পিতা রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরও সাহিত্যসেবীদিগকে উৎসাহ-প্রদানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। পরলোকগত কুমার বাহাদুর যে পিতার এই গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঢাকা সাহিত্য পরিষদের আজীবন সভ্যপদ গ্রহণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্যোৎসাহী লোকের প্রাচুর্য্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ অবস্থায় কুমার বাহাদুরের অকালে পরলোক গমন সাহিত্য পরিষদের গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

(২) ৺বিজয় কুমার রায়। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সাধারণ সভ্য ৺বিজয় কুমার রায়ও

---

* এই কার্য্যবিবরণী প্রস্তুত হইবার পরে ইতিমধ্যেই ঢাকার নবাব খাজে সলিমুল্লা বাহাদুর পরিষদের পরি-পোষক ও ধানকোরার জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় মহাশয় ও মুরাপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় পরিষদের আজীবন সভ্যপদ স্বীকার করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

আমাদিগকে অকালে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঢাকা কলেজ হইতে বি, এ উপাধি গ্রহণ করিয়া এম, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি পুরাতত্ত্ব আলোচনা ও প্রাচীন তথ্য সংগ্রহে এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন যে তাহা বিশেষ প্রশংসা যোগ্য। তিনি সাভার অঞ্চল স্বয়ং পরিদর্শন ও অনুসন্ধান করিয়া তথাকার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পাঠ করিয়াছিলেন। ("সাভারে প্রাচীন কীর্ত্তি"—প্রতিভা, ১৩১৯, কার্ত্তিক) যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ শুনিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার নিকট অনেক আশা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুশাসন কালের ইতিহাস আজিও লিখিত হয় নাই। সেই ইতিহাস সঙ্কলনে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিতেন তাহা বলাই বাহুল্য। নাম কিনিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মোটেই ছিল না। তাঁহার মত যশঃস্পৃহাশূন্য, অক্লিষ্টকর্ম্মা যুবকের অভাব পরিষদের গুরুতর শোকের কারণ হইয়াছে। তাঁহার অভাবে পরিষৎ এক জন প্রকৃত কর্ম্মী হারাইয়াছে।

পত্রিকা

এই পরিষৎ 'প্রতিভা' পত্রিকা পরিচালন করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রের নিতান্ত অভাব। দেশের লোকের সাহিত্য চর্চ্চায় অনুরাগ জন্মাইতে হইলে প্রতিভার ন্যায় একখানা প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা পরিচালন করা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই জাতীয় অন্যান্য সমিতির পত্রিকাগুলি ত্রৈমাসিক। অসীম সাহস সহকারে ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রকে মাসিক করা হইয়াছিল। বৎসর তিন টাকার মধ্যে প্রতিভার আয়তনের মাসিক পত্রিকা প্রতি সভ্যকে প্রদান কতদূর কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আলোচ্য বৎসরে (১৩১৯) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় এরূপ বন্দোবস্তে প্রতিভা প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে তিনি পরিষদের প্রত্যেক সভ্যকে ✓০ আনা মূল্যে পত্রিকার প্রতি সংখ্যা দিবেন এবং তদতিরিক্ত প্রতি সংখ্যার ২৫ খানা বিনামূল্যে পরিষদে অর্পণ করিবেন; পত্রিকা প্রকাশের লাভ লোকসানের জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন, উহার সহিত পরিষদের কোন সংস্রব থাকিবে না; কেবল, প্রতিভা পরিচালনে লাভ দাঁড়াইলে সেই লাভের শতকরা ১০৲ টাকা মাত্র তিনি পরিষৎকে প্রদান করিবেন। আলোচ্য বর্ষে এই নিয়মে প্রতিভা পরিচালন করিয়া সত্যেন্দ্র বাবু পরিষদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তবে নানা কারণে তিনি বিগত (১৩১৯) বর্ষের শেষ ভাগে পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান বৎসরে (১৩২০) সত্যেন্দ্রবাবু কেবলমাত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত করেন। তাহাও অসময়ে প্রকাশিত হয়। পরে এই সনের ভাদ্র মাসে তিনি পত্র দ্বারা সম্পাদকের নিকট প্রস্তাব করেন যে বর্ত্তমান বৎসরে যে পর্য্যন্ত পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পর হইতে প্রতিভা প্রকাশের কার্য্য হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হউক। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি সত্যেন্দ্র বাবুকে ঐ কার্য্য হইতে অব্যাহতি দেওয়াই সঙ্গত মনে করেন। তখন আষাঢ়ের সংখ্যা যন্ত্রস্থ। কাজেই ঐ আষাঢ়ের সংখ্যা পরিষৎ কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হইলেও শ্রাবণ ভাদ্রের সংখ্যা এখনও প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রতিভা প্রকাশের ভার পরিষদের উপর অর্পিত হওয়াতে পরিষৎ যে কিছু বিব্রত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। অতি শীঘ্র পত্রিকা পরিচালনের জন্য অর্থ-সংগ্রহ না করিতে পারিলে প্রতিভা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে পারিবে না। তাহাতেও, প্রতি দুই মাসের জন্য এক এক সংখ্যা প্রকাশিত করিতে হইবে। পত্রিকা পরিচালনের জন্য ইতিমধ্যেই কয়েকজন সভ্য অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন। শীঘ্রই এ বিষয়ে আমরা অন্যান্যের নিকটও উপস্থিত হইব।

মাসিক অধিবেশন

গত বর্ষে পরিষদের ১২ টী অধিবেশন হইয়াছিল, যথা—

১৫ই বৈশাখ রবিবার — এই সভায় ১৩১৮ সনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ, নিয়মাবলী সংশোধন, কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি আবশ্যক কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ইহাই পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন। এই সভায় কোন প্রবন্ধ-পাঠ হয় না।

		প্রবন্ধ	লেখক
১৩ই জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	ভাটিয়াল গান	শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।
৯ই আষাঢ়	,,	মেঘদূত	পণ্ডিত শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
৫ই শ্রাবণ	,,	(১) ধামরাইর যশোমাধব	শ্রীমেঘনাদ সাহা।
		(২) সাভারে প্রাচীন কীর্ত্তি	৺বিজয়কুমার রায় বি এ।
৯ই ভাদ্র	,,	(১) মেঘদূত (দ্বিতীয়াংশ)	পণ্ডিত শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
		(২) কাছারী গান	শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি এ।
৭ই আশ্বিন	,,	দ্বিজ রামপ্রসাদ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
২০শে আশ্বিন	,,	পূর্ব্ববঙ্গের পালরাজগণ	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।
১৭ই অগ্রহায়ণ	,,	পণ্ডিত ভবানীনাথ কৃত রামাভিষেক কাব্য	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
২০শে অগ্রহায়ণ	,,	পূর্ব্ববঙ্গের একটী বিস্তৃত জনপদ	শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্, এ।
৬ই মাঘ	,,	চন্দ্রসিংহ বা চন্দ্রসেন	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি এ, বি টি।
৭ই মাঘ	,,	ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ,পি আর এস্।
৩১শে চৈত্র	,,	বার্গসোঁ ও তদীয় দার্শনিক মত	শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ।

মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ব্যতীত বিবিধ পুরাতত্ত্ব বিষয়ক দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রস্তর মূর্ত্তি ও তাহার আলোক-চিত্র, প্রাচীন মুদ্রা, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের মানচিত্র, কারুকার্য্যখচিত প্রাচীন ইষ্টক, প্রাচীন কামানের প্রস্তরময় গোলা, তাম্র-শাসন ও প্রস্তর-লিপির ছাপ ও আলোক-চিত্র, পুরাতন দলিল, তালপত্রে লিখিত প্রাচীনপুথি ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার অধিকাংশই পরিষৎ কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে।

আয়ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে সর্ব্ব প্রকারে ৬৬৩৶৫ আনা পরিষদের আয় হইয়াছে এবং ৬৫৮।৶১০ আনা ব্যয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় আয়ব্যয়ের হিসাব যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

পরিষৎ কার্য্যালয়

পরিষৎকার্য্যালয় পূর্ব্ববৎ ৪৩নং আশক লেনে স্থাপিত আছে। তথায় প্রতিভা পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত হিন্দি,

মারাঠী ও ইংরেজী পত্রিকাদি টেবিলের উপর রক্ষিত হয়। পাঠগৃহে সাধারণের প্রবেশাধিকার আছে। ঐ পাঠ-গৃহ ক্রমশঃ সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের সাহিত্য চর্চ্চা ও ভাব বিনিময়ের কেন্দ্রস্বরূপে পরিণত হইয়া উঠিতেছে। যদি অধিকতর প্রকাশ্য স্থানে ঐ পাঠগৃহ সংস্থাপিত হইতে পারিত, তবে ইহার আরও সদ্ব্যবহার হইত সন্দেহ নাই। জানি না, কবে অমাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে!

পুরাতত্ত্ব সমিতি

প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ, স্থানীয় ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা ও উদ্ধারের জন্য আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য পরিষদের এক পুরাতত্ত্ব সমিতি গঠিত হইয়াছে। অল্প কালের মধ্যেই এই সমিতি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

স্থানীয় ইতিহাস

স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা, পরলোকগত বিজয় কুমার রায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বসু ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, মহাশয়ের অনুসন্ধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অনুসন্ধান ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া শ্রীযুত মেঘনাদ সাহা ধামরাই, ও ৺বিজয় কুমার রায় সাভার, ও বীরেন্দ্র নাথ বসু ঠাকুর সাভার ও ভাওয়াল অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। বীরেন্দ্র বাবু সাভার ও ভাওয়াল ভ্রমণ কালে কয়েকখানা ইষ্টক ও কতকগুলি মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইষ্টকের মধ্যে একটীতে বৌদ্ধ মূর্ত্তি অঙ্কিত, অপরটীতে একজন পাল রাজার নাম লিখিত রহিয়াছে। এই দুইটী যে পূর্ব্ববঙ্গের পালরাজগণের অস্তিত্বের অতি প্রামাণিক নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন বীরেন্দ্র বাবু ঐ অঞ্চলে একটী শিলা-স্তম্ভও আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা অশোকের সময়ের নিদর্শন বলিয়া তিনি অনুমান করেন। উল্লিখিত মহোদয়গণ এই সমস্ত বিষয়ে মৌলিক গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি আলোচ্য বর্ষের প্রতিভায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন পুরাতত্ত্ব সমিতির অনুরোধে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ মহাশয় ত্রিপুরা হইতে শিব নর্ত্তেশ্বরের একটি প্রস্তর মূর্ত্তি আনয়ন করিয়াছেন। উহার পাদ-পীঠে উৎকীর্ণ শিলা-লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে ত্রিপুরার বরকামতা নগরে প্রাচীন কালে এক হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত ছিল। এই সম্বন্ধে তিনি যে মৌলিক গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা শীঘ্রই প্রতিভা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

তাঁহার এতৎ-সম্পর্কিত প্রবন্ধ কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনেও পঠিত হইয়াছিল এবং সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রিপুরা শ্রীহট্ট ও বিক্রমপুর অঞ্চলে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ বি এ, বি টি মহাশয়ও অনুসন্ধান কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ময়মনসিংহের চারিপাড়ার রাজা নবরঙ্গ রায়ের ইতিহাস উদ্ধারে নিযুক্ত আছেন।

প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাদেশিক ভাষা

এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ মহাশয় ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের ব্রতকথা ছড়া পাঁচালী ও কাহিনী সংগৃহীত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত মহাশয় ঢাকা জিলার মেয়েলী ছড়া ও ভাটিয়াল গান সংগ্রহ করিয়াছেন। কয়েকটি ভাটীয়াল সঙ্গীত হারমোনিয়াম সংযোগে পরিষদের মাসিক অধিবেশনে গান করিয়া তিনি সভ্যদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল মহোদয়গণ পরিষৎ কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

জীবজগতের বৃত্তান্ত

এই বিভাগে একমাত্র পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাজ করিতেছেন। তিনি গায়ক পাখীর আকৃতি প্রকৃতি পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার ফল প্রতিভা পত্রিকায় প্রকাশিত করিতেছেন। এই প্রবন্ধগুলি কোন প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ক ইংরেজী পুস্তকের সার সঙ্কলন নহে। আধুনিক বঙ্গে যে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয় এইগুলিতে সেই পর্য্যবেক্ষণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে পূর্ণ বাবুর প্রবন্ধগুলি মূল্যবান।

সংগ্রহ

আলোচ্য বর্ষে প্রাচীন পুথি অধিক সংগৃহীত হয় নাই। পূর্ব্ব বৎসরে প্রায় ১৫০ খণ্ড পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে যেগুলি অতিশয় মূল্যবান ও প্রকাশযোগ্য সেগুলিও অর্থাভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। প্রাচীন পুথি প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র অর্থভাণ্ডার সংস্থাপিত না হইলে পরিষদের সভ্যগণের পুথি সংগ্রহে উৎসাহ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আলোচ্য বর্ষে বিষ্ণুমূর্ত্তি, সূর্য্যমূর্ত্তি, ত্রৈলোক্য বিজয়িনী মূর্ত্তি, লিপি সংযুক্ত শিব নর্ত্তেশ্বর মূর্ত্তি, সাভারের কারুকার্য্য খচিত ও বুদ্ধ মূর্ত্তিযুক্ত ইষ্টক প্রভৃতিও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলির বিশেষ বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মূর্ত্তি ও পুথি প্রভৃতি সমস্তই পরিষৎ কার্য্যালয়ে রক্ষিত হইয়াছে।

অন্যান্য কার্য্য

(ক) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি ও শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা পূর্ব্ববঙ্গের প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির চিত্র-সম্বলিত তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। এই কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য এক স্বতন্ত্র সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি, আর, এস্, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি উক্ত সমিতির সভ্য।

(খ) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি এল, মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবসায়ী ও শিল্পীগণের ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দজাতের তালিকা করিতেছেন।

(গ) তিনি এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন পুথিগুলির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত এম, এ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের ক্রমোন্নতি ও তৎসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ধর্ম্ম ও সমাজের তুলনা মূলক বিবরণ প্রকাশিত করিবার জন্য তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ দুইটী স্বর্ণপদক প্রদান করিবার সঙ্কল্প বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী বিজ্ঞান ও একটী সাহিত্য বিষয়ক উৎকৃষ্ট রচনার লেখককে প্রদত্ত হইবে।

গ্রন্থ প্রকাশ

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলী ভুক্ত গ্রন্থ মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়ের 'ঢাকার ইতিহাস' ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুর পূর্ব্ববঙ্গের 'পালরাজগণ' প্রকাশিত হইয়াছে।

'ঢাকার ইতিহাস' বিষয়ে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। এই গ্রন্থের প্রশংসা সমস্ত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাতীয় যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই গ্রন্থই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ঢাকা জিলায় এরূপ প্রাচীন কীর্ত্তি নাই, এরূপ ধ্বংসাবশেষ নাই যাহার বিবরণ এই গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই। কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে গ্রন্থকার এই কার্য্য সম্পন্ন

করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুখের বিষয় যে পরিষদের পুরাতত্ত্ব সমিতির সভ্যগণের অনুসন্ধান ফল ঢাকার ইতিহাস প্রণয়নে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছে। অপর পক্ষে এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাও কেহ অস্বীকার করিত পারিবেন না। ঢাকা জিলার গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে যে সমস্ত পুরাকীর্ত্তির চিহ্ন বিদ্যমান আছে তাহার বিবরণ ও ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া কি আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে? যাঁহারা তাহা অবগত হইবার বাসনা রাখেন তাঁহাদিগকে যতীন্দ্রবাবুর ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পুস্তকের মুল্য ৩।০ টাকা, ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে ৩৲ টাকা মাত্র।

"পূর্ব্ববঙ্গের পালরাজগণ" নামক গ্রন্থেও অনেক অজ্ঞাত পূর্ব্ব ঐতিহাসিক তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুশাসন কালের ইতিহাস রচনা সম্পর্কে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। বহু মূল্যবান কীর্ত্তিনিদর্শনাদির আবিষ্কার ও উহাদের চিত্রাদি সংগ্রহে বীরেন্দ্র বাবু যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

পুস্তকালয়

আলোচ্যবর্ষে কতিপয় মহোদয় গ্রন্থোপহার প্রদান করিয়া ঢাকা সাহিত্য পরিষদকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আমরা অনুরোধ করি যে, প্রত্যেক গ্রন্থকার যেন স্ব স্ব গ্রন্থের এক এক খণ্ড পরিষদকে উপহার প্রদান করিতে বিস্মৃত না হন। উপযুক্ত পুস্তকালয়ের অভাবে আমাদের সাহিত্য-চর্চ্চা অঙ্গহীন হইবে। অথচ আমাদের এরূপ অর্থবল নাই যে অন্যের সাহায্য ব্যতীত আমরা একটী উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে পারি। যে সমস্ত বিদ্যোৎসাহী মহাত্মা গ্রন্থোপহার প্রদান অথবা অর্থ সাহায্য দ্বারা একটী উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপনের সহায়তা করিবেন, তাঁহারা এদেশে মৌলিক গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই।

উপসংহার

উপসংহারে বক্তব্য এই যে যে সমস্ত মহোদয়গণ পরিষদের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং যাঁহারা আজীবন সভ্য কি পরিপোষক হইয়া কি অন্যরূপ অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আলোচ্য বর্ষের যে কার্য্যবিবরণী পঠিত হইল তাহা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে পরিষৎ যে সমস্ত আবশ্যক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা ব্যয়সাধ্য। সকলের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন আমাদের কার্য্যের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে সহানুভূতি প্রদর্শন ও সাধ্যানুরূপ আনুকূল্য প্রদানে পশ্চাৎপদ না হন। অন্যথা পরিষৎ মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও ইতিহাসাদির উদ্ধার করা রূপ যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইবেন না। ভগবান আমাদিগের এই শুভ অনুষ্ঠানের সহায় হউন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ
সম্পাদক।

প্রতিভা

৩য় বর্ষ	মাঘ ১৩২০	১০ম সংখ্যা।

বার্গসোঁ দর্শন

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।)

আজ আমি আপনাদের নিকট একটু নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। ঢাকা সাহিত্য পরিষদে এতদিন পর্য্যন্ত আপনারা ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বেশি শুনিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা অন্যায় হয় নাই। সকল সময়েই যুগধর্ম্মকে (Time-Spirit) মানিয়া চলিতে হয়—ইহার ব্যতিক্রম করিলে শেষ ফল কোন কালেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম মানুষকে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের আলোচনার দিকে লইয়া যাইতেছে, সুতরাং ঐগুলিই এ কালের বিশেষ আলোচ্য ও চিন্তনীয় বিষয়। জনৈক জর্ম্মণ মনীষী সত্যই বলিয়াছেন : "পণ্ডিত তাঁহার আলোচনার বিষয় কেবল নিজে পছন্দ করিয়া লন না, পরন্তু কালবশে বিষয়বিশেষ তাহার আলোচনার জন্য স্থিরীকৃত হয়। ১৪শ শতাব্দীতে বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে ন্যায়ের বিচার ; ১৬শ শতাব্দীতে ভার্জ্জিলের অনুযায়ী লাটিন কবিতা ; ১৮শ শতাব্দীতে গণিত ও পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান, অথবা কুসংস্কারের অপকারিতা সম্বন্ধে সন্দর্ভ রচনা, ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা কালের রুচি অনুসারে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে পণ্ডিতেরা হয় কোন অধুনা-বিস্মৃত গ্রীক গ্রন্থকার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পরীক্ষায় নিযুক্ত হন, বা মাটী খুঁড়িয়া প্রাগৈতিহাসিক কালের কতকগুলি নিদর্শন বাহির করিতে ব্যাপৃত থাকেন।"* এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বর্ত্তমান যুগে পণ্ডিতগণের আলোচ্য বিষয়—ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব।

তাহা হইলে, এই ক্ষুদ্র দার্শনিক প্রবন্ধের স্থান কোথায়! জর্ম্মণ পণ্ডিতের উক্তি অনুসারে আমাদের স্থান চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে—এ যুগে আমরা পুরাতন ও অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটী বিষয় আপনাদের নিকট নিবেদন করি। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন—আমাদের ভারতবর্ষ

* Nor does the Scholar choose his scientific task, his age selects it for him : in the 14th century, a logical disquisition on Substance and Accident ; in the 16th Latin Verses modelled after Virgil ; in the 18th a Mathematical-Physical investigation or a treatise on the harmfulness of Superstition. In our days he makes an historical examination of a lost Greek writer or digs up pre-historic ruins. Paulsen,—Ethics P. 458.—

সম্বন্ধে এ কথা সম্যক্ খাটে না। প্রত্যেক জাতিরই এক একটী বিশেষত্ব আছে। দর্শন ও দার্শনিক গবেষণা ভারতের চিরন্তন সামগ্রী। সুতরাং এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন হইলে আমরা আমাদের আজন্মের অধিকার (birth right) হারাইব বলিয়া আমার মনে হয়। আরও, দর্শনের কাজ আজকাল একটু অন্যরূপ হইয়াছে। এখন যদি দর্শন জগৎকে বাদ দিয়া সুধু অতীন্দ্রিয় তত্বে নিবিষ্ট থাকে তাহা হইলে তাহার কাজ সম্পূর্ণ হয় না। এখন দর্শনের কাজ জগতের সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা—দেখাইয়া দেওয়া, কেমন করিয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গবেষণার ফল এক করা যাইতে পারে—কেমন করিয়া আমরা সমস্ত জগৎ সম্বন্ধে একটা সত্য ও সুশৃঙ্খল মত প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। পরলোকগত অধ্যাপক জেম্‌স্ বলিয়াছেন যে আমেরিকাতে 'কলেজ' বলিলে আমরা যাহা বুঝি, দর্শন সম্বন্ধে তাহাই বুঝা উচিত ; অর্থাৎ যথার্থ কলেজে লোকে সকল বিষয়ের জ্ঞান পাইয়া পরে তাহা হইতে সত্য ও জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা (Conception) স্থির করিয়া থাকে। সুতরাং দর্শন দ্বারা আমরা আমাদের খণ্ড জ্ঞানসকল শৃঙ্খলাবদ্ধ ও 'এক' করিতে সক্ষম হই।

এই জন্যই আমি দার্শনিক প্রবন্ধ আপনাদের নিকটে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। আরও একটু বিশেষ কারণ আছে। ভারতীয় দর্শন শুধু কথার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে ইহার উদ্দেশ্য দর্শন করা বা 'দেখা'। আজ যাঁহার কথা আপনারা শুনিবেন, তিনি দর্শনকে এই চক্ষেই দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দর্শনের উদ্দেশ্য কেবল কথার জড়াজড়ি করা নহে, ইহার উদ্দেশ্য যথার্থ ভাবে দেখা—To see. পাশ্চাত্য দর্শনে এ ভাব বড় বেশী দেখা যায় না—অন্ততঃ সকলের কাছ হইতে এই ভাবটী পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যায় না। বার্গসেঁা ইহা প্রচার করিয়া ইউরোপীয় দর্শন অন্য দিকে চালাইতেছেন। ইহাই তাঁহার নূতনত্ব, ইহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব।

বার্গসেঁার নাম ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশে সকলে ইঁহার কথা অবগত হইয়াছেন কিনা, জানি না। বার্গসেঁা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্যারে নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ সালে তিনি কলেজ ডি ফ্রান্সে (College De France) অধ্যাপক হন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য লেখাগুলি ইহার পর হইতে প্রকাশিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বার্গসেঁার নূতনত্ব তাহার দার্শনিক গবেষণার প্রণালীতে (method)। এই প্রণালী সম্পূর্ণ অভিনব। ইহা বাক্যে নহে—অনুভবে। যুক্তিমূলক ধারণা (concept) দ্বারা নহে, কিন্তু অনুভূতি (Intuition) দ্বারা। আর এক বিশেষত্ব, তাহার বলিবার ভঙ্গী (style)। জেম্‌সের মতে "বার্গসেঁার প্রতি পৃষ্ঠায়ই যেন এক একটা নূতন দিক আমাদের চোখের সামনে খুলিয়া যায়। তাঁহার রচনায় যেন প্রভাতের নিঃশ্বাস আর পাখীর গান অনুভব করিতে থাকি। ইহাতে যাহা আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তাহা যেন সত্যের স্বরূপ—পুরাতনের ধূলিতে পূর্ণ কোন আধুনিক অধ্যাপকের মন-উদ্গারিত পূর্ব্বপণ্ডিতগণের চিন্তার উদ্গার মাত্র নহে। বার্গসেঁার রচনার কিছুই দোকানে আসিয়া লাট হইয়া যায় নাই, বা পাইকারের নিকট হইতে লওয়া নহে।" আর "বার্গসেঁার ভাববিন্যাস-প্রণালীর প্রাঞ্জলতার প্রতিই প্রথমতঃ সকলের দৃষ্টি পড়ে। ইহাতে আগে হইতেই এক রকম ভুলাইয়া ও ঘুষ দিয়া পাঠককে তাহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া ফেলে। বোধ হয়, এ যেন একটা অত্যাশ্চর্য্য দৈব আবির্ভাব, আর বার্গসেঁা যেন এই আশ্চর্য্যের বিঘটক একজন যাদুকর।" †

---

† Open Bergson and new horizons loom on every page you read. It is like the breath of the morning and the song of birds. It tells of reality itself, instead of merely re-iterating what dusty-minded professors have written about what other previous professors have thought. Nothing

ইংরাজী বাক্য উদ্ধৃত করিলে সাহিত্য পরিষৎ হয়ত আমার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। কিন্তু কথাগুলি এত সুন্দর ও যথার্থ, যে অনুবাদে উহার মাধুর্য্য একেবারে গিয়াছে।

এখন তাঁহার প্রণালী বা 'method' কি দেখা যাউক। ইহা বুঝিতে হইলে পাশ্চাত্য দর্শন একটু পূর্ব্ব হইতে বিচার করিতে হইবে। প্লেটোর সময় হইতে দর্শনে যুক্তিরই প্রাধান্য চলিয়া আসিয়াছে। যাহা যুক্তিযুক্ত তাহাই দর্শনে স্থান পাইবে, অন্য কিছু দর্শন হইতে বহির্ভূত করিতে হইবে। এই প্রণালীই বহু পূর্ব্বকাল হইতে দর্শনে অবলম্বিত হইয়াছে; অবশ্য প্লেটো, আরিষ্টটল প্রভৃতি মনীষীগণ এই 'যুক্তির' সদ্ব্যবহারই করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। অর্থাৎ এই 'যুক্তিকে' (Reason) সত্য ও সত্তার সহিত একেবারে এক করিয়া ফেলা হইয়াছে। 'যুক্তিই সত্য,যুক্তি ও সত্তা একই কথা—Idea ও Reality একই পদার্থ। এই ভাব আমরা দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ হেগেলে সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাই। হেগেল 'ন্যায়' কে (Logic) সত্য ও তত্ত্ব নির্দ্ধারণের একমাত্র দ্বার স্বরূপ করিয়াছেন। তাঁহার 'পদার্থ' বা category মনের জিনিষ নহে—তাহা বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়কেই নিয়মিত করে। তাঁহার 'ডায়েলেকটিক্' নামে পরিচিত যুক্তিপ্রণালী (Dialectic) কেবল মনোরাজ্য চালনা করে এমন নহে—বহির্জ্জগতেও তাহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান।

এ স্থলে হেগেলের সম্বন্ধে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিব না। তবে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে হেগেলের এই মত কিছুকাল পরে জর্ম্মণীতে আদরণীয় হয় নাই। অনেক মনীষী 'speculative philosophy' বলিয়া ইহাকে গালি দিয়াছেন। আমার মনে হয় লট্জাই (Lotze) প্রথমে হেগেল-মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তাঁহার "মাইক্র-কস্‌মাস্" ("Microcosmus") নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ও পরবর্ত্তী গ্রন্থে হেগেলের মতের দোষ দিয়া তিনি যুক্তি ও সত্তা (Reality) এই উভয়েরই সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ তাঁহার নূতন যুক্তিবাদ (Idealism) মত স্থাপন করিয়াছেন। লটজা বলিয়াছেন যে, 'যুক্তি' কি বুঝিতে হইলে 'যুক্তির' উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা প্রণিধান করিতে হইবে; 'যুক্তি' কি জন্য জগতে আসিল, ইহা কি কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহা বুঝিতে হইবে। 'লটজা' বলেন যে, আমরা সকল কর্ম্মই কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করিয়া থাকি। যুক্তিও এ নিয়মের বহির্ভূত নহে। সত্য কি, যথার্থ সত্তা কি, ইহাই অবধারণের জন্য 'যুক্তি' নামক পদার্থ জগতে আসিয়াছে। সুতরাং 'যুক্তি' যুক্তিরই জন্য, ইহা বিবেচনা করার কোন কারণ নাই। হেগেল প্রমুখ দার্শনিকেরা 'যুক্তি' যুক্তিতেই পর্য্যবসিত হয় ইহা বলিয়াছেন। ইহাতে সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে। জগতের সকল বিষয়ই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও 'যুক্তি' তাহার অন্তর্ভূত, এই তথ্য 'লটজা' তৎকালীন জর্ম্মণ সমাজে প্রচার করেন।

তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, আধুনিক প্র্যাগ্‌মেটিষ্টগণ (Pragmatist) তাহাই আরও বিশদরূপে বলিয়াছেন। জেমস্ (James), শিলার (Schiller) ডিউই (Dewey) প্রমুখ প্র্যাগ্‌মেটিষ্টগণের মত আলোচনা করিলে আমরা ইহাই বুঝিতে পারিব। সকল জিনিসই কোন না কোন উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত;—'যুক্তি' সত্য (Truth) সকলই আমাদের ঐ উদ্দেশ্যের সহায়তা করে। 'যুক্তি' সত্য কি তাহা

---

in Bergson is shop-worn or at second hand." "The lucidity of Bergson's way of putting things is what all readers are first struck by. It seduces you and bribes you in advance to become his disciple. It is a miracle, and he a real magician."—Pluralistic Universe.

জানিবার নিমিত্ত; 'সত্য' তাহাই, যাহা মানবকে তাহার মঙ্গলের দিকে লইয়া যায়। প্র্যাগ্‌মেটিষ্টগণের 'সত্য' সম্বন্ধে মত প্রণিধানের বিষয়। মানুষ সত্যের জন্য নহে, সত্য হইয়াছে মানুষের মঙ্গলের জন্য। যাহা মানুষের অত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করে, তাহাই সত্য। ইহাই প্র্যাগ্‌মেটিষ্টগণের মত। এখন আপনারা বিচার করুন. এই তত্ত্বের সহিত আমাদের মহাভারতোক্ত "যদ্ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা" (বনপর্ব্ব, ২০৮ অধ্যায়) এই বাক্যের কোন সম্বন্ধ আছে কি না।

বলা বাহুল্য, এই মত আজ কাল ইউরোপীয় দর্শনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এমন কি নব্যতন্ত্রের হেগেল শিষ্যগণও ইহার পোষকতা করিতেছেন। ব্র্যাডলী (Bradley), জোসিয়া রইস্ (Josiah Royce), ও হালডেনে (Haldane) এই প্রভাব কিছু কিছু উপলব্ধি করা যায়।

এখন বার্গসোঁ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রত্যাবৃত্ত হওয়া যাউক। বার্গসোঁও সম্পূর্ণ ভাবে এই মতের পোষকতা করেন। প্রথম হইতেই তিনি বলেন যে, দর্শন কোন পণ্ডিত বা সম্প্রদায় বিশেষের জিনিস নহে, দর্শন সকলেরই সামগ্রী। 'যুক্তি' দর্শনের গোড়ায় নহে, সাধারণ জ্ঞান (Common sense) দর্শনের মূলে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। এই সাধারণ জ্ঞান হইতে দর্শন কিরূপ ভাবে উদ্ভূত, তাহা বার্গসোঁ দেখাইয়াছেন।

বার্গসোঁ বলেন যে, এই প্রণালী বুঝিতে হইলে আমাদিগকে বর্ত্তমান জাগতিক জ্ঞানের পূর্ব্ব অবস্থায় যাইতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান কয়েকটী বিষয় লইয়া; যথা, কতকগুলি ধারণাসমষ্টি ও তাহাদের পরস্পরের সমন্বয়। এই ভাব উৎপত্তি হওয়ার পূর্ব্বে কি ছিল! সে এক অবস্থা, যখন সত্য সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ ভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত হইত—যখন ধারণার (Ideas) কোনরূপ বাঁধাবাঁধি হয় নাই, এবং জগতের সকল বস্তু একে একে আমাদের সমক্ষে নৃত্য করিত—প্রতি দ্রব্য প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব মূর্ত্তিতে সাজিয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিত। তখন আমরা কতকগুলি ধারণাসমষ্টির গণ্ডীর ভিতর দিয়া সত্তাকে দেখিতাম না—তখন সত্তা আপনাকে নিজ মূর্ত্তিতে ধরা দিত এবং প্রতি মুহূর্ত্তে নিজরূপ বদলাইয়া নূতন হইতে নূতনতর মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখীন হইত। তখন প্রকৃতিতে আমরা কতকগুলি বাঁধাবাঁধি. আঁটাসাঁটা বস্তু দেখিতাম না—তখন দেখিতাম, প্রকৃতি প্রতি মুহূর্ত্তেই বদলাইতেছে.—এই এক মুহূর্ত্তে এক বস্তু দেখিতেছি, পরক্ষণেই সেই বস্তু সরিয়া গিয়া আর একটী নূতন বস্তুকে আনিতেছে. সেটিও আবার অপসারিত হইয়া আবার একটী নূতন জিনিসের জনক হইতেছে। বার্গসোঁর ভাষায় ইহা এক অন্তহীন ভাবস্রোতঃ, "Endless Stream of Becoming", এবং ইহাই যথার্থ সত্তার অবস্থা।

কিন্তু এই অবস্থা আমরা বেশি ক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। এই অনন্ত পরিবর্ত্তন, Endless flux, কেবল অনুভব করিতে পারি মাত্র। তাহার দ্বারা জাগতিক বিষয়ে আমরা কিছু করিতে পারি না। এই জন্য এই সত্তা-স্রোতের মধ্য হইতে আমাদের আবশ্যক কতকগুলি বিষয় আমরা বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিয়াছি, সেগুলিকে আটকাইয়া আমরা নিজের মত করিয়া লইয়াছি। আমার ধারণা অপরের ধারণার সঙ্গে মিলাইয়াছি, এবং এইরূপে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পরস্পরের সহিত আলাপ ও ব্যবহারের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছি। ওয়ার্ড (Ward) সাহেব যাহাকে "সামাজিক ব্যক্তিগণের পরস্পর ভাববিনিময়" ("Trans-subjective Intercourse") বলিয়াছেন, সেই প্রক্রিয়ার সাহায্য আমরা এই ধারণাগুলিকে বাঁধাবাঁধি করিয়াছি ও তদ্দ্বারা কতকগুলি ধারণা ('Concept') পাইয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান এই ধারণার (Concept) উপর দাঁড়াইয়াছে।

এই প্রক্রিয়াতে অবশ্য আমাদের লাভ হইয়াছে—ইহা দ্বারা আমরা সকলের সহিত মিলাইয়া এক ধারণা-

মূলক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে আমরা কি হারাইয়াছি? আমরা হারাইয়াছি বিশ্বসত্তার সেই স্বাভাবিক নৃত্য, যদ্দ্বারা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন হইতে নূতনতর বিষয় উপলব্ধি করিতাম। তাহার স্থানে পাইয়াছি কতকগুলি কৃত্রিম ও মৃত ধারণা—যেগুলিকে বলপূর্ব্বক পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া আমরা মারিয়া ফেলিয়াছি ও যাহার মূলে আমরা যুক্তিধৃত ধারণা (Logical Concept) মূলক এই বর্ত্তমান জাগতিক জ্ঞান লাভ করিয়াছি। ইহার ফলে আমরা যথার্থ সত্তা হইতে দূরে পড়িয়া গিয়াছি, এখন সত্তাকে আমরা অপরোক্ষ ভাবে দেখি না, দেখি কতকগুলি কৃত্রিম ও মৃত ধারণা-সমষ্টির ভিতর দিয়া।

এ কথাগুলি আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলাম কি না জানি না। তবে ইহার ফল এই যে বার্গসোঁর মতে 'Permanence' বা 'স্থায়িত্ব' সত্তার পরিচায়ক নহে, সত্তার প্রকৃত পরিচায়ক Change বা পরিবর্ত্তন। বলা বাহুল্য, দার্শনিক জগতে এতকাল পর্য্যন্ত 'স্থায়িত্ব'ই সত্তার প্রকৃত গুণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; বার্গসোঁর মতে ইহা যথার্থ নহে। কারণ 'স্থায়িত্ব' বা 'পরিবর্ত্তনশূন্যত্ব' সত্তার স্বাভাবিক অবস্থা নহে: সত্তার যথার্থ অবস্থা পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তন-স্রোতের মধ্যে কতকগুলি ভাব আমরা বলপূর্ব্বক আটকাইয়াছি ও এই 'আটকান' বা 'ধরিয়া রাখার' অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে 'পরিবর্ত্তনশূন্যত্ব', Changelessness, এই ভাবে উপনীত হইয়াছি। ফলতঃ যথার্থ ভাবে 'পরিবর্ত্তনশূন্যত্ব' বলিয়া কোন বিষয়ই নাই—ইহা আমাদের মনগড়া ও কৃত্রিম। পরিবর্ত্তনের ভাবই যথার্থ ভাব ও ইহাই সত্তার প্রকৃত অবস্থা।

এই কথাটী আমাদের দার্শনিক নানা ভাবে তাঁহার নানা গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। এখন আমরা ক্রমে ক্রমে ঐ গ্রন্থগুলির অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

প্রথম আলোচ্য গ্রন্থ "টাইম্ এণ্ড ফ্রি উইল" ("Time and Free Will")—"কাল ও মুক্ত ইচ্ছা"। এই গ্রন্থে বার্গসোঁ যথার্থ 'স্থায়িত্ব' বা Duration কি তাহা আলোচনা করিয়াছেন। যথার্থ 'স্থায়িত্ব' কোন পরিবর্ত্তনশূন্য অবস্থা নহে, কারণ ঐ অবস্থা কৃত্রিম। যথার্থ 'স্থায়িত্ব' ভাব আমরা অন্য ভাবে প্রাপ্ত হই। যখন আমাদের অন্তঃকরণ 'যুক্তিমূলক ধারণার' বা Logical Concept এর গণ্ডী হইতে অপসারিত করি, তখন সত্তা আমাদের নিকট যথার্থ ভাবে আবির্ভূত হয়। তখন আমরা প্রতি সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে পরিবর্ত্তন অনুভব করি, এবং এই পরিবর্ত্তন প্রতি ক্ষণেই নব নব অবস্থার বিকাশ করে। প্রথম অবস্থা হইতে দ্বিতীয় অবস্থা তৎ পরে এই দুইটী ও তাহার আনুষঙ্গিক মিলিয়া তৃতীয়, তাহার পর পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে পর পর অবস্থাগুলি আবির্ভূত হয়। আর এই অবস্থাগুলি প্রতি ক্ষণে নব নব সম্পদ প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাতে আমরা বুঝিতে পারি যে 'কাল' অর্থাৎ Time আপনার মধ্যে এই সকল অবস্থাগুলিই ধরিয়া রাখিতেছে ও নিজমধ্যে সামঞ্জস্য করিতেছে। এই স্রোতের মধ্যে কোন স্থানে 'শূন্য' বা Gap নাই: এই অখণ্ড রাগিণীর মধ্যে কোন তালই ভঙ্গ হয় না। সকলগুলিই এক সূত্রে গ্রথিত, পরন্তু সকলগুলিই প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব ভাবের 'সৃষ্টি' করিতেছে। ইহাই যথার্থ Duration বা 'স্থায়িত্ব', ইহাই যথার্থভাবে 'Time', আর এই 'Time' সত্তার আর এক নাম।

সুতরাং আমরা পাইলাম, 'Time'ই যথার্থ 'Reality.' কালই প্রকৃত সত্তা। আর একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিব যে এই অবস্থাটী 'মুক্ত' অবস্থা। এই অবস্থাতেই আমরা মুক্তি বা 'Freedom' কি, তাহা যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই।

সাধারণতঃ আমরা বিষয়গুলি যুক্তিধৃত ধারণার (Logical Concept) গণ্ডীর দিয়া ভিতর অনুভব করি; এই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া তাহার বাহিরে যাইতে

পারি না, ও উহার বাহিরের বস্তুগুলিকে অযথার্থ বলিয়া জ্ঞান করি। সুতরাং এই 'আবদ্ধ ভাব' ধারণার (Logical Concept) মধ্যেই হইয়াছে। এ বিষয়টি আমরা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিব। আমরা অলৌকিক ব্যাপার (miracle) অবিশ্বাস করি কেন? কারণ আমরা যুক্তিধৃত ধারণা (Logical Concept) দ্বারা জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে এক ধারণা বা Idea করিয়া রাখিয়াছি; অলৌকিক ব্যাপার এই ধারণা-সমষ্টির সঙ্গে খাপ খায় না, কাজেই এ স্থলে এই অসামঞ্জস্য হৃদয়ঙ্গম করি। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও আমরা দেখিব যে যতক্ষণ আমরা ধারণার (Concept) গণ্ডীর ভিতর দিয়া জগৎ দেখি, ততক্ষণ 'মুক্ত' অবস্থা কি, তাহা জানিতে পারি না। কিন্তু যে ক্ষণেই আমরা ইহার বাহিরে যাই, অর্থাৎ Duration বা সত্তা-স্রোতের মধ্যে আপনাকে ভাসাইয়া দিই, তখনই 'মুক্ত' অবস্থা কি, তাহা জানিতে পারি। বার্গসেঁা এক স্থানে মানব-মনকে কূপের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই কূপটী জলে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহার উপরিভাগ গলিত লতাপত্রে আচ্ছাদিত। সচরাচর কূপের জল না দেখিয়া আমরা এই লতা-পত্রের আবরণমাত্র দেখি, এবং তদ্দ্বারা কূপ সম্বন্ধে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হই। কিন্তু যদি কোন প্রকারে এই পত্রের আবরণ ঠেলিয়া অবগাহন করি, তাহা হইলেই কূপের জলস্রোতে, শীতলতা, জলের স্বাদ অনুভব করিতে সক্ষম হই। এইরূপ 'সত্তা' ও যুক্তিধৃত ধারণা '(Concept)' ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে আমাদের বোধের বিষয় হইয়া থাকে।

"টাইম এণ্ড্ ফ্রি উইল" গ্রন্থে এ ইহাই প্রধানতঃ বিবেচ্য বিষয়। এটী প্রমাণ করিবার জন্য বার্গসেঁা মনোবিজ্ঞানের (Psychology) অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। সেগুলি এ স্থলে আলোচনা হয়ত সাধারণের প্রীতিকর হইবে না। যাহা এই গ্রন্থের মূল তত্ত্ব তাহাই আপনাদের নিকট বলিয়া রাখিলাম। তবে এ সম্বন্ধে উদাহরণ সম্পর্কে বার্গসেঁা দেখাইয়াছেন যে, যুক্তিমূলক ধারণা (Logical Concept) অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা আমরা বলিতে পারি না। এরূপ ধারণা কেবল গণ্ডিবদ্ধ বিষয় লইয়াই থাকে, সুতরাং সুদূর ভবিষ্যতে যাহা হইবে তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা তাহার অধিকার বহির্ভূত। কিন্তু কাল (Duration) প্রভাবে আমরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতেও সক্ষম হই। এইরূপে 'কারণ' ('Causality') যথার্থ কালের (duration) কাছে টিকে না। এইরূপে একটী একটী করিয়া বার্গসেঁা বদ্ধভাব (Determinism) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, ও দেখাইয়াছেন যে কালস্রোতই (Duration) যথার্থ সত্তার অবস্থা। এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের অবস্থা (dynamic) এবং ইহার দ্বারা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে নবনব ভাবের উপলব্ধি করিতে পারি—এই জন্যই এ অবস্থাতেই আমরা যথার্থ 'মুক্তি' (freedom) কি, তাহা বুঝিতে পারি। অন্য দিকে Determinism বা বদ্ধভাব যুক্তিমূলক ধারণা (Logical concept) দ্বারা অনুভূত হয়। যতক্ষণ আমরা এই ধারণার (concept) এর গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্তি বা freedom কি বুঝিব না—ততক্ষণ ভাবগুলি অপরিবর্ত্তনীয় আঁটাসাঁটা বলিয়াই আমাদের মনে হইবে।

প্রধানতঃ ইহাই "টাইম এণ্ড ফ্রি উইল" (Time and Free-will) গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। যদি ইহা শুনিয়া আপনাদের কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষা অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে ভবিষ্যতে বার্গসেঁার অন্যান্য গ্রন্থগুলি ক্রমে আপনাদের সম্মুখীন করিব।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

শেষ যাত্রী

সাঙ্গ কোরে শীতের খেয়া
পশ্চিমের ঘাটে,
ভাঙ্গা পাড়ির আড়াল ধোরে
সূর্য্য গেল পাটে ।
এমন সময় গ্রামের শেষে
শ্রান্তদেহে উর্দ্ধশ্বাসে
ছুটোছুটি ঐ কে আসে
সন্ধ্যাধূসর মাঠে ।
শীতের খেয়া বন্ধ হ'ল
পশ্চিমেরি মাঠে ।

ভরা সাঁজে রশি খুলে
একলা উঠে নায়ে ।
শুধাও দেখি, এত ত্বরা,
যাবে ও কোন্ গাঁয়ে ?
জীর্ণ তরী নেইকো মাঝি,
পার হ'তে কি হ'বে আজই !
আঁধার রাতে কেমন কোরে
বাইবে ডা'নে বাঁয়ে !
নিষেধ করো, ও যেন আজ
ওঠে না কো নায়ে ।

কাল প্রভাতে ফাগুন হাওয়ায়
জমবে প্রথম পাড়ি ;
শ্রান্ত পথিক তখন এসো,
কিসের তাড়াতাড়ি !
এখনো বয় শীতের বাতাস,
কুজ্ঝটিতে ঝাপসা আকাশ,
এখন কি কেউ নৌকা খুলে ?
কালকে যখন ফাগুন হাওয়ায়
জমবে নূতন পাড়ি ।

উত্তর বায় লাগে যদি
পালের 'পরে সোজা,
কঠিন হ'বে এই আঁধারে
বাঁধাঘাটটি খোঁজা ।
যে আঘাটে শীতের খেয়া
কর্‌তেছিল দেওয়া নেওয়া,
ক'মাস কেবল পার করেছে
শুক্‌নো পাতার বোঝা,
সেই শ্মশানে লাগ্‌বে তরী
শীতের বায়ে সোজা ।

কাল্‌কে যখন ফাগুন দিনে
দখিন হাওয়ার ভরে,
ভিড়্‌বে তরী বকুল তলে
বাঁধাঘাটের পরে,
ফুটবে ফুল, ডাকবে পাখী,
সখার তরে আসবে সখী,
যার কাছেতে যাচ্ছ, সে কি
রৈতে পার্‌বে ঘরে !
কাল ফাগুনে তোমায় চেয়ে
আস্‌বে ঘাটের ধারে ।

থেকে থেকে যাচ্ছে ডেকে
উত্তরে বাতাস,
হিমাঙ্গ মুমূর্ষু শীত
টান্‌ছে নাভিশ্বাস ।
হায় অভাগা এই অকালে
যেও না কো বাঁধন খুলে ;
সাধ কোরে কি পর্‌বে গলে,
ঘূর্ণাজলের ফাঁস !
এক রাত্রি দেরী করো
আস্‌ছে মধুমাস ।

"ক্ষমা করো, বন্ধু আমার!
দিলাম খুলে রশি।
ফাগুন দিনে আমায় চেয়ে
থাক্‌বে না কেউ বসি।
কন্‌কোনে এ শীতের হাওয়া
অনেকটা মোর আছে সওয়া,
সকল চেয়ে দখিন বায়ে
ভয় করি যে বেশী।
যাই, বন্ধু! গেছে যেথায়
শুক্‌নো পাতার রাশি।"

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

ভারতে রেশমশিল্পের অবনতি*

অতি প্রাচীন কাল হইতে রেশম ভারতবর্ষের একটী প্রধান পণ্যদ্রব্য। বাঙ্গলা দেশেই অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে আবার আমাদের মালদহ জেলাই রেশমের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। পৌরাণিক যুগের অনেক পূর্ব্ব হইতে মালদহে রেশম শিল্প প্রচলিত আছে, তাহারও প্রমাণ আমরা রামায়ণ মহাভারতাদি মহাগ্রন্থ পাঠে কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারি। পাঠান ও মোগল শাসন সময়ে মালদহে রেশম ও রেশম বস্ত্র যে একটী প্রধান শিল্প ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রবন্ধে বর্ত্তমান রেশম শিল্পের সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। এইজন্য অতীত সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইতে বিরত হইলাম; আর সে সম্বন্ধে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির জ্ঞানও খুব অল্প।

খৃঃ ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে আরবদিগের হাত দিয়া ইউরোপে যে কল বহুমূল্য দ্রব্য রপ্তানি হইত, তন্মধ্যে রেশম একটী প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য ছিল। তারপর পোর্টুগীজ নাবিক ভাস্কো ডি গামা কর্ত্তৃক সমুদ্র-পথে ভারতে আসিবার পথ পরিজ্ঞাত হইলে অবধি বাণিজ্যদ্বার সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয় এবং তখন হইতে এতদ্দেশীয় প্রচুর রেশম ও রেশম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। রেশম বাণিজ্যের অবস্থা এত দিন পর্য্যন্ত খুব উন্নতই ছিল, কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন হইতে অকস্মাৎ এরূপ অবনতির পথে দাড়াইয়াছে যে, যদি ইহার প্রতিকারের পন্থা সত্বর আবিষ্কৃত না হয়, তাহা হইলে সমূলে উৎপাটিত বিচিত্র হওয়া নহে। মালদহের রেশম বস্ত্র কিছুকাল পূর্ব্বেই অর্থাৎ অনুমানিক ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে একরূপ লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে পুরাতন মালদহ হইতে ভিখু শেখ যে জাহাজ বোঝাই করিয়া এক জাহাজ রেশম ও রেশম বস্ত্র ইংরোপে রপ্তানী করিয়াছিলেন তাহা আমরা লোকপরম্পরায় শুনিতে পাই। পুরাতন মালদহে রেশম ও কার্পাস সূত্র মিশ্রিত করিয়া একরূপ থান প্রস্তুত হইত; তাহাও এখন প্রায় দেখা যায় না। পুরাতন মালদহ ও সাহাপুর অঞ্চলে কেবল রেশম বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্যই বিস্তর তাঁত ও চরকা চলিত, এ কথা অতি প্রাচীন নহে; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত স্থানসমূহ হইতে ঐ ব্যবসা প্রায় একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন মালদহের মধ্যে কেবল শিবগঞ্জ ও কানসাট অঞ্চলে অল্পাধিক পরিমাণ রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যাহা হউক মালদহে রেশম বস্ত্র বয়ন কম হইয়া গেলেও প্রচুর পরিমাণে রেশম সূত্র ও রেশম কোষ (কোয়া) (Raw materials) উৎপন্ন হইতেছিল। ইউরোপীয় রেশম ব্যবসায়িগণ বাঙ্গলা দেশে স্থানে স্থানে কুঠী সংস্থাপনের পর হইতে রেশম সূত্র অপেক্ষা রেশম ব্যবসায়ী অর্থাৎ পোলুপোষা বসনিগণ অধিক পরিমাণে রেশম কোষই

---

* মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনের কলিগ্রাম অধিবেশনে পঠিত—কার্ত্তিক, ১৩২০।

উৎপন্ন করিতেছিল। ইউরোপীয় বনিকগণ যদিও বিদেশী, তথাপি তাঁহাদের দ্বারা এ দেশের অনেক লোক প্রতিপালিত হইতেছিল। তাঁহাদের দ্বারা পলুব্যবসায়ীগণ অপ্রত্যক্ষ ভাবে উপকার পাইত। এতদ্ভিন্ন আমলা কেরাণী হইতে কুলী মজুর পর্য্যন্ত এদেশের কত শত লোক তাহাদের নিয়োজিত মূলধনের উপর নির্ভর করিয়া নিজেদের এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিত। প্রত্যেক কুঠীতে একজন সাহেব ম্যানেজার ব্যতীত আর সমস্ত কার্য্যই বাঙ্গালী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু অধুনা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিবিধ রকমের

রেশম প্রচলিত হওয়াতে ভারতবর্ষ হইতে রেশমের ব্যবসা একরূপ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। কোম্পানীর রাজত্বকালে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় সমস্ত রেশম বিলাতে রপ্তানী হইত। ক্রমশঃ চীন ও জাপান রাজ্যের দ্বারও ইউরোপীয় বণিকদিগের জন্য উদ্‌ঘাটিত হইল। ভারতবর্ষের সহিত চীন ও জাপানের প্রতিযোগীতা এবং ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্স ও ইউরোপের প্রতিযোগীতা বৃদ্ধি হওয়াতে আরও সুবিধা হইয়াছে। এই প্রতিযোগীতা দ্বারা ফ্রান্স ও ইটালীর সাহায্যে চীন ও জাপান ভারতবর্ষকে পরাস্ত করিয়াছে। ইংরাজ রাজত্বে ব্যবসায়ের উপর গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার নিয়ম এখন উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু ফ্রান্স ও ইটালী স্বাধীন বাণিজ্যের মন্ত্র গ্রাহ্য করেন না; আবশ্যক হইলে ঐ দুই দেশের গভর্ণমেণ্ট রাজভাণ্ডার হইতে অর্থব্যয় করিয়া স্বদেশীয় বণিকদিগকে উৎসাহ-দান ও শুল্ক বসাইয়া বিদেশীয় বণিকদিগকে নিরুৎসাহ করিয়া থাকেন। ইহার উপর আবার সম্প্রতি কৃত্রিম রেশমের আবিষ্কার হওয়াতে ভারতের রেশমের আরও শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

নূতন আবিষ্ক্রিয়ার ফলে যে ভারত হইতে নীলের ন্যায় একটী প্রধান লাভজনক ব্যবসা এককালীন লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, বৈদেশিক্ বাণিজ্যের প্রভাবে সেই ভারত হইতে রেশম ব্যবসাও ধ্বংস হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপীয় বণিকদিগের এ দেশে যে সকল রেশম কুঠী ছিল তাহা হইতে উৎপন্ন রেশম তাঁহারা নিজেদের দেশে রপ্তানী করিয়া বিস্তর লাভ করিতেন। অধুনা তাঁহাদের দেশে এবং চীনও জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে বিবিধ রকম রেশম ও কৃত্রিম রেশম আমদানী হইতেছে বলিয়া ভারতবর্ষের রেশম প্রতিযোগীতায় আর কম দরে বিক্রীত হইতে পারিতেছে না। কাজেই বাঙ্গলা দেশের মধ্যে তাহাদের যে সমস্ত রেশম কুঠী ছিল, তাহা উঠিয়া যাওয়াতে রেশম ব্যবসাও এদেশ হইতে ক্রমশঃ কম হইয়া যাইতেছে। যখন তাঁহাদের ব্যবসা খুব উন্নত ছিল, তখন তাঁহারা এদেশে রেশম অধিক পরিমাণে জন্মাইবার জন্য কত রকমই না চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা তিনটি কোম্পানী অর্থাৎ লুইপেন, বেঙ্গল সিল্ক, ও ফারগুসান কোম্পানী মিলিয়া একটী কমিটি গঠন করিয়াছিলেন।

সেই কমিটীর উদ্দেশ্য ছিল, বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপাদন করা ও ইউরোপ প্রভৃতি দেশের ন্যায় রেশম কীটকে নানাবিধ ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা করা। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা কমিটী হইতে একজন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট এবং তাহার অধীনে বহুতর ওভারসিয়ার ও সব্‌ওভারসিয়ার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা পোলু পোষা বসনীদিগের বাটী বাটী ঘুরিয়া তাহাদিগকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা বীজনির্ব্বাচন প্রণালী ও পোলুপোষা ঘর বিশোধিত রাখিবার জন্য নানাবিধ দ্রব্যের ব্যবহার বিষয়ে উপদেশাদি প্রদান করিতেন।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এই কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন; অধিকন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর অর্থব্যয় করিয়া বিশুদ্ধ বীজ সরবরাহ করিবার জন্য বাঙ্গলা দেশের মুর্শীদাবাদ্ রাজসাহী বগুড়া মালদহ বীরভূম জেলার স্থানে স্থানে বীজাগার প্রস্তুত করিয়াছেন; এবং আদর্শ ভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়মে রেশমকীট পালনের জন্য রাজসাহী বহরম-

পুর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সকল বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে এবং যাঁহারা বৈজ্ঞানিক নিয়মে রেশম কীট পালনে অভিজ্ঞ তাহাদিগকে ওভারসিয়ার ও সব্ ওভারসিয়ার নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব্বেও অবশ্য এ কার্য্য গভর্ণমেন্টের হাতে ছিল; কিন্তু তাহাও বৈদেশিক রেশম ব্যবসায়িগণের উত্তেজনায়, আর তখন ইহা তাদৃশ প্রসার লাভ করে নাই। এখন অবশ্য গভর্ণমেণ্ট স্বতঃ প্রণোদিত হইয়াই এদেশের রেশম ব্যবসায়ী পোলুপোষাবসনীদিগের উপকারার্থেই এই অর্থব্যয় করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে যে অন্তরায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা গভর্ণমেণ্টের গোচর হওয়া উচিত।

অধুনা বহির্বাণিজ্য ক্রমশঃ অবনতির পথে দাঁড়াইয়াছে। রেশম উৎপাদন করা অপেক্ষা রেশম কাট্‌তি করাই অধিকতর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পোলুপোষা বসনিগণ বংশানুক্রমে পোলুপোষা ব্যবসাতে অভ্যস্ত থাকায় এবং বেঙ্গল সিল্ক কমিটী ও গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে বৈজ্ঞানিক নিয়মও কিছু কিছু পরিমাণে আয়ত্ত করিতে শিক্ষা করায়, এখন রেশমকীট প্রতিপালনের জন্য তাহাদিগকে ততদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। রেশম ব্যবসায়ীগণ হইতে রেশমসূত্র প্রস্তুতকারী এবং রেশম বস্ত্র বয়নকারী তন্তুবায়গণ পর্য্যন্ত সকলেই অশিক্ষিত ও দরিদ্র। পৃথিবীর কোথায় কি পরিমাণ রেশম উৎপন্ন হয়, ও কোন দেশ হইতে কত রেশম আমদানী ও রপ্তানী হয়, এবং কোন দেশে কত কত রেশমের ব্যবহার হয়, এই সকল বিষয়ে তাহারা একেবারে অনভিজ্ঞ। অন্য দেশের কথা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষেরই কোন্ কোন্ স্থানে কত রেশমের দরকার এ জ্ঞান তাহাদের নাই। প্রধানতঃ মারয়ারী ও বেনারস্ প্রভৃতি স্থানের রেশম ব্যবসায়িগণের নিকট এ দেশের রেশম ব্যবসায়িগণ তাহাদিগের দ্বারা উৎপন্ন রেশম সূত্র বিক্রয় করিয়া থাকে, এবং তাহারাই এদেশের উৎপন্ন রেশম ভারতের বিভিন্ন অংশে ও বিদেশে চালান দিয়া অধিকতর লাভবান হইয়া থাকে। তাহারা রেশমীদিগের নিকট হইতে রেশম সূত্র পাইবার জন্য বহুতর দাদন দিয়া থাকে; কাযেই কোথায় রেশমের কি পরিমাণ কাট্‌তি হয়, এবং সেই সকল স্থানে তাহার দরই বা কি, এ সকল কথা চিন্তা করিবার অবসরও এ দেশের রেশম ব্যবসায়িগণ পায় না। কারণ ভিন্ন স্থানে পাঠাইবার ইচ্ছা থাকিলেও দাদনের জন্য বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে তাহাদের উৎপন্ন রেশম-সূত্র দাদন-দাতাগণের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। এইরূপ ভাবে রেশম ব্যবসা অবলম্বন করিয়াও রেশম সূত্র প্রস্তুতকারী ব্যবসায়িগণ একরূপ নিজেদের জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিতে-ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে বৈদেশিক রেশম ব্যবসায়িগণের কুঠি উঠিয়া যাওয়াতে প্রায় সমস্ত রেশমই ঘুংরু অর্থাৎ বাঙ্গলা ঘায়ে প্রস্তুত হইয়া মারয়ারিগণের দ্বারা বিদেশে বা ভারতের বিভিন্ন অংশে চালান হইতেছে; অর্থাৎ অল্পদিন পূর্ব্বে এ দেশের উৎপন্ন অধিকাংশ রেশম কোষ হইতেই ইয়ুরোপীয় বণিকগণের সাহায্যে রেশম প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর সুদূর প্রদেশে রপ্তানী হইত; বাঙ্গলা ঘায়ের অল্প রেশমই চালান দিবার জন্য মারয়ারিগণের হাতে আসিয়া পড়িত। সেইজন্য পক্ষান্তরে বৈদেশিক বণিক-গণের সহিত মারয়ারিগণের একরূপ প্রতিযোগীতা ছিল, এবং সেই প্রতিযোগীতার ফলে এ দেশের পোলুপোষা ব্যবসায়িগণ ও সূত্রপ্রস্তুতকারী ব্যবসায়িগণ সচ্ছন্দে আপনাদের জীবিকানির্ব্বাহ করিত, কিন্তু এখন আর সে প্রতিযোগীতা নাই; কাযেই প্রায় সমস্ত রেশম সূত্রই মারয়ারীদিগের হাত দিয়া চালান হইতেছে। তাহারা সময় সময় এক যোগে কায করিয়া রেশম ব্যবসায়িগণের একেবারে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। অধিকন্তু পূর্ব্বে এক মণ রেশম প্রস্তুত করিতে যাহা ব্যয় হইত, বর্ত্তমানে দেশের কলকারখানার প্রভাবে কুলীমজুরের বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে প্রায় তাহার দ্বিগুণ খরচ পড়িতেছে, অথচ রেশমের দর বরং পূর্ব্বাপেক্ষাও কম হইয়াছে।

দেশের এ অবস্থায় যদি ধনশালী ব্যক্তিগণ এবং এদেশীয় রাজা ও জমিদারবর্গ আপনাদের অর্থকোষ উন্মুক্ত না করেন, তবে বহুকালের প্রাচীন আর একটি শিল্প প্রদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে রেশম ব্যবসায়ীগণের মধ্যে অনেকেই অন্নাভাবে জর্জ্জরিত হইবে। কারণ তাহারা প্রায় অনেকেই অশিক্ষিত ও দরিদ্র, বিশেষতঃ মালদহের রেশম-ব্যবসায়ী গণের অন্ন-সংস্থানের আর কোনই উপায় নাই। তুঁত জমি ৪।৫ বিঘা হইলেই রেশমকীট প্রতিপালন দ্বারা একটি ছোট পরিবারের অনায়াসেই জীবিকানির্ব্বাহ হইত। ৪।৫ বিঘা ধানের জমি বা অন্য কোন ফসলী জমি হইতে সে প্রকার আয়ের সম্ভাবনা নাই। কাজেই তাহাদের ধ্বংস এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী। আর সদাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে গবর্ণমেণ্ট রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য যে অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহা যেন এ দেশের রেশম ব্যবসায়িগণের উপকারার্থ ব্যয় করা হয়। নচেৎ তাহাতে এ দেশের লোকের তাদৃশ উপকার দর্শিবে না। গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ বিশুদ্ধ বীজ সরবরাহ করিবার জন্য, কারখানা স্থাপন ও বসনীদিগকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে রেশম কীটপালনের জন্য খরচ করিতেছেন, তাহা না করিয়া যদি কেবলমাত্র অল্প সুদে পোলুপোষা বসনীগণকে কিছু কিছু ধার দেন, ও কোথায় কি পরিমাণ রেশমের কাটতি হয় কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে তাহার সন্ধান দিয়া, এবং কি উপায় অবলম্বন করিয়া তাহারা মারয়ারিগণের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া নিজেরা সেই সব স্থানে রেশম চালানের বন্দোবস্ত করিতে পারেন, ঐ সকল বিষয়ে পরামর্শ, সাহায্য, ও সুবিধা প্রদান করেন, তবে এখনও বাঙ্গলার রেশম শিল্প অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে। কারণ পোলুপোষা বসনিগণ এতদ্দেশীয় মহাজনদিগের নিকট হইতে যে টাকা ঋণ করেন তাহার সুদ অত্যন্ত বেশী; বসনীদিগের অধিকাংশই সেই সুদের দায়ে একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই নিয়মে অর্থব্যয় করিলে বোধ হয় তাহা অধিকতর কার্য্যকারী হইতে পারে, এবং গবর্ণমেণ্টের প্রদর্শিত পথে এ দেশের অনেক ধনশালী ব্যক্তিও আপনাদের অর্থ নিয়োজিত করিতে পারিবেন।

কেবল গবর্ণমেণ্ট ও ধনশালী ব্যক্তিদিগের অর্থসাহায্য দ্বারাই রেশম শিল্পের সম্যক্ উন্নতির আশা করা যায় না। কারণ উদার-চরিত্র খুব অল্প লোকই সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। যে সকল উপায় অবলম্বন দ্বারা রেশম ব্যবসায়ের উন্নতি হওয়া সম্ভব, সেই সকল যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য প্রধান রেশম ব্যবসায়ীগণের একটি সমিতি থাকা কর্ত্তব্য। এই সমিতির সদস্যগণ কেবল বাঙ্গালী, অথবা কেবল ইংরেজ হইলে চলিবে না। এই সমিতি কেবল রেশম সূত্র রপ্তানীর স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত থাকিলেও বিশেষ উন্নতি হইবে না। কি তন্তুবায়, কি সূত্রপ্রস্তুতকারী, কি পলুব্যবসায়ী, সকলেই একমত এবং বদ্ধপরিকর হইয়া ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হইলে উন্নতি নিশ্চয় হইবে। সমিতির সদস্যগণ যাহাতে রেশম ব্যবসায়ের সকল শাখা সম্বন্ধে নিয়মিত সংবাদ পাইয়া নিজ নিজ কার্য্যে উন্নতিসাধনে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন, তজ্জন্য বাঙ্গলা ভাষায় একখানি পত্রিকা হইলে আরও ভাল হয়। রেশম ব্যবসায় সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা বিশেষ উন্নতি হওয়া সম্ভব। জ্ঞানাভাবই অবনতির সমস্ত কারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রেশম ব্যবসায় সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের স্বার্থ যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাহাতে বোধ হয় যে ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের সাহায্যেই এ দেশের রেশম শিল্পের ও রেশম বাণিজ্যের সম্যক্ উন্নতি হইবে। বহির্বাণিজ্য ভারত হইতে এককালীন লুপ্ত হইয়া গেলেও যে এ দেশে রেশমের কাটতি নিতান্ত কম নহে, তাহা পরলোকগত রেশম-তত্ত্ববিদ,

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর, মিষ্টার এন্ জি্ মুখার্জীর রেশম বিজ্ঞান নামক পুস্তকের সাহায্যে প্রতীয়মান হয়। তবে উপরোক্ত নিয়মে মারয়ারিগণের দ্বারা বরাবরই এই ব্যবসা চলিতে থাকিলে সমূহ রেশম ব্যবসায়ীগণের সম্পূর্ণ ক্ষতি, এমন কি সমূলে বিনাশ হওয়ারও সম্ভাবনা।

মিষ্টার মুখার্জী তাহার পুস্তকে কোন দেশে কি পরিমাণ রেশম উৎপন্ন ও আমদানী রপ্তানী হয়, কোন দেশে কি পরিমাণ তাহা ব্যবহৃত হয় তাহার যে তালিকা দিয়াছেন সাধারণের অবগতির জন্য সেই তালিকা এবং তাঁহার নিজ মত এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল।

উৎপন্ন

(ওজন সের)

দেশ	রেশম	চশম	মোট উৎপন্ন
চীন	১০৫০০০০০	৮৫০০০০০	১৯০০০০০০
জাপান	৩৯০০০০০	৩২০০০০০	৭১০০০০০
মালয় উপদ্বীপ	৯৫০০০০	৭৫০০০০	১৭০০০০০
ভারতবর্ষ	৬২৫০০০	৫৫০০০০	১১৭৫০০০
মধ্যএসিয়া	১০৪০০০০	৮৬৫০০০	১৯০৫০০০
ইউরোপীয় রুশিয়া	——	——	——
এশিয়াটিক তুরস্ক	৭০০০০০	৬৫০০০০	১৩৫০০০০
ইউরোপীয় তুরস্ক	১৬০০০০	৫০০০০	২১০০০০
বল্কান রাজ্য	৩০০০০	১৫০০০	৪৫০০০
গ্রীস	৩৫০০০	২০০০০	৫৫০০০
অষ্ট্রিয়া হঙ্গেরী	২৬৫০০০	২২০০০০	৪৮৫০০০
ইটালী	৪২০০০০০	৩৬০০০০০	৭৮০০০০০
ফ্রান্স	৭২০০০০	৬০০০০০	১৩২০০০০
স্পেন ও পর্টুগাল	৮০০০০	৫০০০০	১৩০০০০
সুইজারলণ্ড	৩০০০০	৫০০০০	৮০০০০
জর্ম্মণী	——	৫০০০	৫০০০
ব্রিটেন	——	৩০০০০	৩০০০০

মোরোক্কো	৫০০০	৫০০০	১০০০০
ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ও কেনেডা	৫০০০	৫০০০০	৫৫০০০
মেক্সিকো	১০০০	—	১০০০
মোট	২৩২৪৬০০০	১৯২১০০০০	৪২৪৫৬০০০

আমদানী—ওজন সের

দেশ	রেশম	চশম	মোট আমদানী
চীন	——	——	——
জাপান	১০০০	২০০০	৩০০০
মলয় উপদ্বীপ	১৭৫০০০	——	১৭৫০০০
ভারতবর্ষ	৬০০০০০	৬০০০০০	১২০০০০০
মধ্য এশিয়া	৪০০০০	——	৪০০০০
ইউরোপীয় রুশিয়া	৪৫০০০০	২০০০০০	৬৫০০০০
আরব	১২০০০	——	১২০০০
এসিয়াটিক তুরস্ক	২০০০০০	——	২০০০০০
ইউরোপীয় তুরস্ক	২০০০	——	২০০০
বল্কান রাজ্য	৬০০০	——	৬০০০
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	৫০০০০০	৫৪০০০০	১০৪০০০০
ইটালী	১৪০০০০০	৭৬৫০০০	২১৬৫০০০
ফ্রান্স	৫৩১০০০০	৬৫৯০০০০	১১৯০০০০০
স্পেন ও পর্টুগাল	১২৫০০০	——	১২৫০০০
সুইজারলণ্ড	২১৭৫০০০	১৩০০০০০	৩৪৭৫০০০
জর্ম্মণী	২৩৯০০০০	৯০০০০০	৩২৯০০০০
বেলজিয়ম	৭৫০০০	——	৭৫০০০
ব্রিটেন	১১৪০০০০	৩২৯০০০০	৪৪৩০০০০
মিসর	১৭০০০০	——	১৭০০০০
টিউনিস ও ট্রিপোলি	৭৫০০০	——	৭৫০০০
আলজিরিয়া	৩০০০০	——	৩০০০০
মোরোক্কো	৬৫০০০	——	৬৫০০০

ইউনাইটেড্ ও কেনেডা	২৬৫০০০	৬৩০০০০	৩২৮০০০০
মেক্সিকো	১০০০০	——	১০০০০
অষ্ট্রেলিয়া	——	১৪০০০০	১৪০০০০
মোট	১৭৬১০০০০	১৪৯৫৭০০০	৩২৫৬৭০০০

রপ্তানী

(ওজন—সের)

দেশ	রেশম	চশম	মোট রপ্তানী
চীন	৪৭৫০০০০	৩৭৮০০০০	৮৫৩০০০০
জাপান	২৮৪০০০০	১৭০০০০০	৪৬৪০০০০
মলয় উপদ্বীপ	৭৫০০০	১২০০০০	১৯৫০০০
ভারতবর্ষ	১৬০০০০	৬০০০০০	৭৬০০০০
মধ্য এসিয়া	১২৫০০০	৬৩০০০০	৭৫৫০০০
এসিয়াটিক তুরস্ক	৬২০০০০	৫৫০০০০	১১৭০০০০
ইউরোপীয় তুরস্ক	১৩৫০০০	২০০০০	১৫৫০০০
বল্ক'ন রাজ্য	১০০০০	———	১০০০০
গ্রীস	২২০০০	— —	২২০০০
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	৪১৫০০০	৩৮৫০০০	৮০০০০০
ইটালী	৫২০০০০০	১৬৭০০০০	১৮৭০০০০
ফ্রান্স	২৪৩০০০০	১৯০০০০০	৪৩৩০০০০
স্পেন ও পর্টুগাল	৫০০০০	৪০০০০	৯০০০০
সুইজারলণ্ড	৭৪০০০০	৭০০০০০	১৪৪০০০০
জর্ম্মণী	৪ ০০০০	৫৫০০০	১০৪০০০০
বেলজিয়ম	২০০০	——...	২০০০
ব্রিটেন	১৫০০০	৪৩৫০০০	৫৪০০০০
মিসর	৪০০০	———	৪০০০
মোট	১৮১৯১০০০	১৩১৮০০০০	৩১৩৭১০০০

রেশমের ব্যবহার

দেশ	দেশীয়	বিদেশীয়	মোট
চীন	৫৭৫০০০	———	৫৭৫০০০০
জাপান	১১৫০০০০	১০০০০	১১৬০০০০
মলয় উপদ্বীপ	১০০০০০০	১৭৫০০০	১১৭৫০০০
ভারতবর্ষ	১৭৫০০০	৬২৫০০০	১১০০০০০
মধ্য এশিয়া	৮৫০০০০	———	৮৫০০০
ইউরোপীয় রুশিয়া	———	৪৫০০০০	৪৫০০০০
লেভাণ্ট	১১৫০০০	৪০০০০০	৫১৫০০০
অস্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	১০০৯০০	৩৬০০০০	৪৬০০০০
ইটালী	১৫০০০০	২৫০০০০	৪০০০০০
ফ্রান্স	৬৯০০০০	২৯১০০০০	৩৬০০০০০
স্পেন ও পোর্ত্তুগাল	৪০০০০	১২০০০০	১৬০০০০
সুইজারলণ্ড	———	১৪০০০০০	১৪০০০০০
ব্রিটেন	———	৯০০০০০	৯০০০০০
ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ ও কেনেডা	———	২৬৫৯০০০	২৬৫৯০০০
মেক্সিকো	———	১০০০০	১০০০০
মিসর ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ	———	২৫০০০০	২৫০০০৯
মোট	১০২৮০০০০	১২৪৫০০০০	২২৭৩০০০০

চশম সূত্রের ব্যবহার

(Rough Silk)

সেরের হিসাব

দেশ	দেশীয়	বিদেশীয়	মোট
চীন	১৫০০০০০	———	১৫০০০০০
জাপান	৪০০০০০০	———	৪০০০০০
মলয় উপদ্বীপ	২০০০০০	———	২০০০০০
ভারতবর্ষ	২০০০	২০০০০০০	২২০০০০
মধ্য এশিয়া	২১৫০০০	———	২১৫০০০
	২০৩৫০০০	২০০০০০	২৫৩৫০০০

	২৩৩৫০০০	৩০০০০০	২৬৩৫০০০
ইউরোপীয় রুশিয়া	——	১০০০০০	১০০০০০
লেভাণ্ট	২০০০০	——	২০০০০০
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	১০০০০০	১৩০০০০	২৩০০০০
ইটালী	২০০০০০	৩০০০০	২৩০০০০
ফ্রান্স	১১০০০০০	৫০০০০০	১৬০০০০০
স্পেন ও পর্টুগাল	——	৪০০০০	৪০০০০
সুইজার লণ্ড	১২৫০০০	——	১২৫০০০
জর্ম্মণী	১৫০০০০	৯৫০০০০	১২১০০০০
ব্রিটেন	৫৫০০০০	——	৫৫০০০০
ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ ও কেনেডা	১৯০০০০	১০০০০	২০০০০০
মেক্সিকো	——	৫০০০	৫০০০
মিসর ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ	——	৯০০০০	৯০০০০
অষ্ট্রেলিয়া	——	৫০০০০	৫০০০
মোট	৪৮৭০০০০	২১০৫০০০	৬৯৭৫০০০

মোট রেশমসূত্রের ব্যবহার—

দেশ	মোট রেশমসূত্রের ব্যবহার
চীন	৭২৫০০০০
জাপান	১৫৬০০০০
মলয় উপদ্বীপ	১৩৭০০০০
ভারতবর্ষ	১৩২০০০০
মধ্য এসিয়া	১০৬৫০০০
ইউরোপীয় রুশিয়া	৫৫০০০০
লেভাণ্ট	৫৩৫০০০
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	৬৯০০০০
ইটালী	৬৩০০০০
ফ্রান্স	৫২০০০০
স্পেন ও পোর্টুগাল	২০০০০০
সুইজারলণ্ড	১৫২৫০০
জর্ম্মণী	৩১০০০০০
ব্রিটেন	১৪৫০০০০
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ও কেনেডা	২৮৪০০০০
মেক্সিকো	১৫০০০
মিসর ও আফ্রিকার অনান্য দেশ	৩৪০০০০
অষ্ট্রেলিয়া	৫০০০০
মোট	২৯৭০৫০০০

রেশম শিল্প কতিপয় কারণবশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ভারতবর্ষে এই শিল্পটীর গৌরব তিরোহিত হয় নাই। যে দেশে কেবল রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু মূল উপাদান (অর্থাৎ রেশম কোষ) উৎপন্ন হয় না, সে দেশের বাণিজ্যের অবস্থা স্থির ও দৃঢ়বদ্ধ হইতে পারে না। জর্ম্মণী, ইংলণ্ড, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্, কেনেডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বহুপরিমাণে রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল দেশে রেশম কোয একেবারে উৎপন্ন হয় না, অথবা অতি সামান্যরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ সকল দেশের রেশম বাণিজ্যের অবস্থা নিতান্ত চঞ্চল।

(১) উপাদান উৎপাদন (২) উপাদান শিল্প নৈপুণ্য (৩) শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহার, এই তিনটী অবস্থাই দেশে বর্ত্তমান না থাকিলে বাণিজ্যটী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে না। সুখের বিষয় ভারতবর্ষে উক্ত তিনটী অবস্থাই বর্ত্তমান আছে; (১) যথা, রেশম কোষ প্রধানতঃ জাতিবিশেষ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। (২) এ দেশের রেশম বস্ত্রের শিল্পনৈপুণ্যও কোনও দেশের রেশমী কাপড় অপেক্ষা হীন নহে। (৩) পট্টবস্ত্রের ব্যবহারও এ দেশে বড় কম নয়। কি অন্নপ্রাশনে, কি কর্ণবেধে, কি উপনয়নে, কি বিবাহে, কি নিত্য উপাসনার সময়

দেশীয় পট্টবস্ত্র ভিন্ন বিদেশীয় পট্টবস্ত্রের ব্যবহার আজিও হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। হিন্দুর অনুকরণে ভারতবর্ষের মুসলমান এবং পার্শিরাও সংস্কার-বিশেষে চেলী প্রভৃতি রেশম কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে যে ৬২৫০০০ সের অর্থাৎ ১৫৬২৫ মণ রেশম সূত্র প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে কেবল ১৬০০০ সের, অর্থাৎ ৪৫০০ মণ, রেশম অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইয়া যায়। অবশিষ্ট ৪৫৬০০০ সের অর্থাৎ ১১৬২৫ মণ মাত্র যে ভারতবর্ষে শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয় তাহাও নহে। অন্য দেশ হইতে যে ৬২৫০০০ সের অর্থাৎ ১৫৬২৫ মন রেশম সূত্র ভারতবর্ষে আমদানি হয়, তাহাও সমস্ত এ দেশের শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের রেশম শিল্পের ব্যবসা, রেশমের বহির্বাণিজ্য হইতে অনেক প্রকাণ্ড।

৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ রেশম রপ্তানী হইত, এখন তাহা অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। ১৮৬৭—৬৮ খৃষ্টাব্দে যে রেশম বিদেশে চালান যায়, তাহার মূল্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। ১৮৮৭—৮৮ খৃষ্টাব্দে যে রেশম চালান যায়, তাহার মূল্য ৪৮ লক্ষ টাকা এবং ১৮৯২—৯৩ খৃষ্টাব্দে যে রেশম এদেশ হইতে রপ্তানী হয়, তাহার মূল্য ৬৭১৫০০০ টাকা। যদি পূর্ব্বের ন্যায় টাকার দাম এখন দুই শিলিং থাকিত, তাহা হইলে রেশমের রপ্তানী আরও কমিয়া যাইত। এক্ষণে রেশম অপেক্ষা পাট, চা, চাউল ও তৈলপ্রদ বীজ সমস্তের রপ্তানির দ্বারা ভারতবর্ষে অনেক অর্থ আসিয়া থাকে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চশমের অর্থাৎ Rough silk এর রপ্তানী একেবারে ছিল না। ঐ সময় হইতেই চশমের রপ্তানি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। চশম রপ্তানী আরম্ভ হইবার পরে, তসর, মুগা ও এণ্ডির রেশম কোয়াও এদেশ হইতে রপ্তানী আরম্ভ হইয়াছে। লাট বা মটকার সূতা অধিকাংশ বঙ্গদেশে কাপড় প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ১৬৬৪৫১৪ টাকার রেশমী বস্ত্র অন্য দেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইংলণ্ডে ১০১০৯০২ এবং ফ্রান্সে ২৮৭৮১৪ টাকার কাপড় বিক্রীত হইয়াছে।

পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অন্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে অনেক অল্প পরিমাণ রেশম সূত্র আমদানী হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশ হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে কয়েক বৎসর ধরিয়া অধিক রেশম সূত্র চালান যাইতেছে।

অন্যান্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে রেশম সূত্র অপেক্ষা রেশম বস্ত্রের আমদানী অধিক হইয়া থাকে। ১৮৮৯ খ্রীঃ হইতে ৪ বৎসর ধরিয়া মোট কত টাকার রেশম বস্ত্র ও রেশম সূত্র আমদানী হইয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকা দ্বারা বুঝা যাইবে।

সাল	টাকা
১৮৮৯—৯০	২৮৪৫১৫৯০
১৮৯০—৯১	২৫০১৪৩০০০
১৮৯১—৯২	৩০১৪৬৯০০
১৮৯২—৯৩	২৮১°৬৫১০

এই তালিকাটি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে বৎসরে ২।৩ কোটি টাকার রেশম বস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় রেশম ব্যবসায়ের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় লক্ষণ।

এই ২।৩ কোটি টাকা যদি ইংলণ্ডীয় রেশমবস্ত্র ক্রয় করিতে ব্যয় হইত, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের মনে শান্তি থাকিত; কিন্তু ভারতবর্ষে যে সকল রেশম বস্ত্র অথবা রেশম সূত্র আসিয়া থাকে, তাহার প্রায় সমস্তই ইংলণ্ড হইতে না আসিয়া অন্যান্য দেশ হইতে আসিয়া থাকে।

শ্রীভগবচ্চরণ দাস।

———

রেডিয়াম

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আলফা আলোক

সাধারণ আলোকের ন্যায় আলফা আলোকও ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে বিটা আলোক অপেক্ষা আলফা আলোকের শক্তি অনেক কম। বিটা আলোক একখানা কাঠের বা ধাতুর পাত ভেদ করিয়াও ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর ক্রিয়া করে, কিন্তু আলফা আলোক সেরূপ পারে না। আলফা আলোকের আর এক গুণ আছে। উহা যদি কান কোন ধাতুর পদার্থের উপর পতিত হয় তবে ঐ সমস্ত পদার্থ অন্ধকারে উজ্জ্বল দেখায়। আলফা আলোক দ্বারা আলোকিত কোন পদার্থকে কাচের পরকলা দ্বারা নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় যে ঐ পদার্থ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকশিখায় আবৃত হইয়াছে, এবং তজ্জন্যই উহাকে উজ্জ্বল দেখাইতেছে। আলফা আলোকের অতি সূক্ষ্ম কণা উপরি উক্ত ধাতুর পদার্থ-গুলির যে স্থানে সবেগে আঘাত করে সেই স্থানে ক্ষুদ্র আলোক-শিখা দেখা যায়। আলফা আলোকের কণা খুব উৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও দেখা যায় না। কিন্তু উহা যে স্থানে আঘাত করে সেই স্থানে যে আলোক শিখার সৃষ্টি হয় তাহা, ঔজ্জ্বল্যের গতিকে, আমাদের নয়ন গোচর হয়। যেমন পিস্তল ছুড়িলে তাহার গুলি আমাদের নয়নগোচর হয় না, কিন্তু অন্ধকার ঘরে দেওয়াল লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলে তাহার গুলি আমাদের নয়ন গোচর না হইলেও, ঐ গুলি দেওয়ালের যে স্থানে আঘাত করে সেই স্থানে ক্ষুদ্র একটী অগ্নিশিখা দেখা যায়, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। অতএব আলফা আলোক রেডিয়ামের এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম রশ্মিকণা; তাহা অবিরত রেডিয়ামের উপরিভাগ হইতে চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হাজার হাজার বৎসর পরেও এই বিক্ষেপের কোন হ্রাস দেখা যায় না।

আলফা আলোক সম্পর্কে আরও আশ্চর্য্যজনক কথা আছে। আলফা আলোক যে কেবল রেডিয়ামের উপরিভাগ হইতেই বিক্ষিপ্ত হয় তাহা নহে; এই রশ্মিকণা রেডিয়ামের ভিতরেও অবিরত ছুটাছুটি করিতেছে। রেডিয়াম নিতান্ত ঘন শক্ত পদার্থ হইলেও তাহার অভ্যন্তর প্রদেশে আলোক-কণার যথাসম্ভব দ্রুত গমনাগমনের কোন বাধা হয় না। ঘন পদার্থেরও অণুগুলির মধ্যে সামান্য একটু ফাঁক আছে। তাহা অনাবৃত চক্ষে এমন কি অনুবীক্ষণের সাহায্যেও দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লৌহের অণুতেও এই সমস্ত ফাঁক আছে, রেডিয়ামেরও আছে। এই কারণেই রেডিয়ামের ভিতরে আলোক-কণার গমনাগমনের সুবিধা হয়। গমনাগমনের আর একটী ফল হয়, তাহারও উল্লেখ আবশ্যক। আলোক-কণার গমনাগমনের সময়ে একটীর সহিত অপরটীর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে সামান্য তাপের উৎপত্তি হয়। যেমন কোন লৌহদণ্ডকে হাতুড়ী দ্বার আঘাত করিতে থাকিলে তাহা ক্রমে গরম হয়, সেইরূপ একটি রশ্মিকণার সহিত অপরটীর সংঘর্ষ হইলেই তাহাতে তাপ উৎপন্ন হয়। এই কারণেই রেডিয়াম যেখানে থাকে তাহার নিকটস্থ অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা উহা তিন ডিগ্রি অধিক উত্তপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। রেডিয়ামের এই সঞ্চিত উত্তাপ সামান্য হইলেও তাহা হাজার হাজার বৎসর স্থায়ী হয়। অন্ততঃ ২০ হাজার বৎসর ব্যাপিয়া অর্দ্ধসের রেডিয়ামের দ্বারা শীতপ্রধান দেশে প্রতি ঘণ্টায় অর্দ্ধসের বরফ গলাইতে পারা যায়।

এই স্থানেই অপর একটি কৌতুহলপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমস্যার কথা উত্থাপন করিতে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে আমাদের এই পৃথিবী পূর্ব্বে তরল উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল, কালক্রমে তাহা শীতল ও কঠিন হইয়া মনুষ্যের

বাসোপযোগী হইয়াছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান তাপের দ্বারা পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করিতে পারা যায়। ভূস্তর পরীক্ষা করিয়াও পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এই দুই ভিন্ন প্রণালীতে বয়স নির্ণয় করিলে ফল দুই প্রকার হয়। পৃথিবীর তাপের দ্বারা পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করিলে উহার বয়স কম হয়। কিন্তু ভূস্তর পরীক্ষা করিয়া পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করিলে উহার বয়স অনেক বেশী হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কারণ কি? বৈজ্ঞানিকেরা এই সমস্যার পূরণ করিতে এতদিন অসমর্থ ছিলেন। রেডিয়মের আবিষ্কার সেই সমস্যা পূরণ করিয়া দিয়াছে।

পূর্ব্বে কহিয়াছি যে রেডিয়ামে তাপ সঞ্চিত আছে। পৃথিবীতে ইতস্ততঃ অনেক রেডিয়াম বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পৃথিবীস্থ এই রেডিয়ামই পৃথিবীকে দ্রুতগতিতে শীতল হইতে দেয় নাই। যদি পৃথিবীতে রেডিয়াম না থাকিত তবে পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায় যেরূপ শীতল তদপেক্ষা অনেকগুণ অধিক শীতল হইয়া যাইত। রেডিয়াম আবিষ্কারের পূর্ব্বে এই জন্য এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেন যে ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর যে বয়স নির্দ্দেশ করেন তাহা ঠিক নহে; কেন না, পৃথিবীর বয়স এত অধিক হইলে পৃথিবী এতদিনে অনেক বেশী শীতল হইয়া পড়িত। কিন্তু রেডিয়াম আবিষ্কারের পরে দেখা যাইতেছে যে ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের কথাই ঠিক। পৃথিবীতে রেডিয়াম বর্ত্তমান থাকাতেই পৃথিবীর উত্তাপ রক্ষিত হইয়াছে।

আলফা আলোক বায়ুর মধ্য দিয়া প্রবল বেগে গমনের সময়ে বায়ুর পরমাণুগুলিকে চূর্ণ করিয়া চলিয়া যায়। বায়ুর এই চূর্ণিত পরমাণুগুলিকে আইয়ন (ion) বলে। সাধারণতঃ বায়ু তাড়িত-পরিচালক পদার্থ নহে; কিন্তু, আলফা আলোক দ্বারা উহার পরমাণুগুলি চূর্ণিত হইলে উহা তাড়িত-পরিচালক পদার্থে পরিণত হয়। বায়ুতে জলকণা বর্ত্তমান থাকিলেও উহা তাড়িত-পরিচালক হয়। কারণ, জল কতক পরিমাণে তাড়িত-পরিচালক। এই জন্যই বর্ষাকাল তাড়িত-ঘটিত পরীক্ষায় উপযুক্ত সময় নহে। কোন পদার্থকে তাড়িতাবিষ্ট করিলে বায়ু অপরিচালক বলিয়া তাহা হইতে তাড়িত চলিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু রেডিয়াম কোন তাড়িতাবিষ্ট পদার্থের নিকট আনীত হইলে ঐ তাড়িতাবিষ্ট পদার্থের তাড়িত উহা হইতে অতি শীঘ্র নিঃসৃত হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে আলফা আলোককণা রেডিয়াম হইতে সবেগে নিঃসৃত হইয়া নিকটস্থ বায়ুর পরমাণুগুলিকে চূর্ণিত করতঃ বায়ুকে পরিচালক পদার্থে পরিণত করে, কাজেই তাড়িতাবিষ্ট পদার্থের তাড়িত সহজেই তাহা হইতে বহির্গত হইয়া যায়।

কিন্তু আলফা আলোককণা নিজেই তাড়িতাবিষ্ট। তাড়িত দুই প্রকার,—ধন তাড়িত ও ঋণ তাড়িত। এক খণ্ড কাচের দণ্ডকে একখানা শুষ্ক রেশমের বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, কাচের দণ্ড ও রেশমের বস্ত্র, উভয়েই তাড়িত উৎপন্ন হয়। কাচের দণ্ডে যে তাড়িত উৎপন্ন হয় তাহার নাম ধন তাড়িত, এবং রেশম বস্ত্রে যে তাড়িত উৎপন্ন হয় তাহার নাম ঋণ তাড়িত। আলফা আলোক কণায় যে তাড়িত বর্ত্তমান থাকে তাহার নাম ধন তাড়িত।

বিটা আলোক

বিটা আলোকের গতি আলফা আলোকের গতি হইতে অনেক দ্রুত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিটা আলোকের কণা পরমাণু হইতেও অনেক ক্ষুদ্র। এইজন্য ইহাদের এক নূতন নাম সৃষ্টি করা হইয়াছে—ইলেকট্রণ বা তাড়িতাণু। বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বাস যে বিটা আলোক তাড়িতেরই ক্ষুদ্রতম অংশ বা পরমাণু। কিন্তু এখানে একটুকু গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ পর্য্যন্ত ধন তাড়িতের কোন পরমাণু দেখা যায় নাই। ঋণ তাড়িতের পরমাণু আছে। বিটা আলোকের কণা এই ঋণ তাড়িতের পরমাণু। ইহাদিগকে এখানে পরমাণু বলিয়া

উল্লেখ করা গেল বটে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ইহাদের আকার পরমাণু হইতে অনেক ক্ষুদ্র; ইহা পরমাণুর এক হাজার ভাগের এক ভাগের সমান। এইজন্যই ইহাদের নূতন নাম তাড়িতাণু।

ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর আলফা আলোক অপেক্ষা বিটা আলোকের ক্রিয়া বেশী হয়। কাঠের পরদা বা ধাতুর পাত ভেদ করিয়াও এই আলোক ফটো গ্রাফের প্লেট বিকৃত করিতে পারে।

এই আলোকের আর এক লক্ষণ এই যে ভাল চুম্বক লৌহ ইহার নিকট আনয়ন করিলে ইহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বিটা আলোকেও কোন কোন পদার্থ উজ্জ্বল দেখায়। কাগজ, রবার বা মনুষ্যগাত্রে এই আলোক পতিত হইলে অনিষ্ট উৎপাদন করে। এইজন্য রেডিয়ম পকেটে লইয়া চলিতে হইলে উহা পুরু সিশের বাক্সে আবদ্ধ করিয়া লইতে হয়; কারণ অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরু সীসের পাত বিটা আলোক ভেদ করিতে পারে না। আলফা আলোকের ন্যায় বিটা আলোকও বায়ুর পরমাণু চুর্ণ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু আলফা আলোক অপেক্ষা এ বিষয়ে বিটা আলোকের ক্ষমতা কম; যে হেতু বিটা আলোক-কণা আকারে অনেক ক্ষুদ্র।

গামা আলোক

গামা আলোক রেডিয়াম হইতে বিক্ষিপ্ত রেডিয়ামের কণা নহে, ঈথারের তরঙ্গ,—অনেক বৈজ্ঞানিক এইরূপ মনে করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে এখনও কোন রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এই আলোক রঞ্জেন আলোকের অনুরূপ। কিন্তু রঞ্জেন আলোকযে পদার্থ ভেদ করিতে পারে না ইহা তাহা হইতে অনেক স্থুল পদার্থ ই ভেদ করিয়া যাইতে পারে। রঞ্জেন আলোকের দ্বারা মনুষ্যের হাতের ফটোগ্রাফ তুলিলে অভ্যন্তরস্থ হাড়ের ছবি উঠে। কারণ রঞ্জেন আলোক মাংসভেদ করিতে পারিলেও হাড় ভেদ করিতে পারে না। কিন্তু গামা আলোকের দ্বারা ঐরূপ হাড়ের ফটো তোলা যায় না, কারণ মাংস, হাড়, উভয়ই গামা আলোকের নিকট স্বচ্ছ। গামা আলোক ১২ ইঞ্চি দুরে লৌহখণ্ড ভেদ করিয়াও ফটোগ্রাফের প্লেট বিকৃত করিতে পারে।

গামা আলোকের সহিত যেমন রঞ্জেন আলোকের, আলফা আলোকের সহিত তেমনি লেনার্ড আলোকের সাদৃশ্য আছে। এবং কোন বায়ুশূন্য কাচের নলের মধ্যে তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত করিলে যে তাড়িতাণুর প্রবাহ ধাতব পদার্থে আপতিত হইয়া রঞ্জেন আলোক উৎপাদন করে, বিটা আলোক সেই তাড়িতাণুর প্রবাহ (Cathode rays) হইতে অভিন্ন। এই তিন আলোকই পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল; কিন্তু রেডিয়ামেই এই তিনের একত্র সমাবেশ দেখা যায়॥ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রেডিয়ামের এই তিন প্রকারের আলোকের উৎপাদন করিবার জন্য কোন তাড়িত-স্রোতের আবশ্যক হয় না, স্বভাবতঃই উহা রেডিয়াম হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

রেডিয়াম হইতে উৎপন্ন পদার্থ

রেডিয়ামের পূর্ব্ববর্ণিত গুণ অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্যজনক আর এক প্রকার গুণ আছে। রেডিয়াম হইতে সর্ব্বদাই গ্যাসের ন্যায় এক পদার্থ নির্গত হয়। ইহা নিকটস্থ বস্তুর উপর পতিত হইয়া তাহাকেও রেডি-য়াম ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া তোলে। কিন্তু তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। সার্দ্ধ তিন দিবসের মধ্যে উহার ক্ষমতা অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। রেডিয়াম হইতে নিঃসৃত এই গ্যাসবৎ পদার্থ ধ্বংস হইয়া পুনরায় বিভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়। এবং এই সমস্ত পরিবর্ত্তিত পদার্থও অল্পাধিক রেডিয়ামের ন্যায় গুণবিশিষ্ট হয়। কোনটা বা কয়েক সপ্তাহে কোনটা বা কয়েক দিনে কোনটা বা কয়েক

* There is yet no general consensus of opinion as to the true nature of the gamma rays—Enclyclopaedia Britannica.

ঘণ্টায় ধ্বংসমুখে পতিত হয়। কিন্তু প্রত্যেকটীই এক একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন। যেটী এক সপ্তাহে ধ্বংস হয় সেটী সর্ব্বদাই এক সপ্তাহে ধ্বংস হইবে; যেটী একদিনে ধ্বংস হয় সেটী সর্ব্বদাই একদিনে ধ্বংস হইবে, এইরূপ।

পলোনিয়াম

মাদাম কিউরি রেডিয়াম ধর্ম্মাক্রান্ত আর একটী ধাতুর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার নাম পলোনিয়াম। অনেকের বিশ্বাস যে তিনি রেডিয়াম আবিষ্কারের পর উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। রেডিয়ামের পূর্ব্বেই তিনি পলোনিয়াম আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে তিনি ইহাকে অমিশ্রিত অবস্থায় প্রাপ্ত হন নাই। ইহাকে সর্ব্বদাই বিসমাথের (Bismuth) সহিত মিশ্রিত অবস্থায় দেখা যাইত। কিন্তু রেডিয়াম আবিষ্কারের পরে তিনি ইহাকে বিসমাথ হইতে পৃথক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই পলোনিয়াম হইতে কেবল মাত্র আলফা আলোক নির্গত হয়। কিন্তু ইহার শক্তি বেশী দিন স্থায়ী হয় না। ১৪০ দিবসের মধ্যেই ইহার শক্তি অর্দ্ধেক হ্রাস হইয়া যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রেডিয়াম হইতে যে একটি গ্যাস বৎ পদার্থ নির্গত হয় তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় রেডিয়ামের লক্ষণাক্রান্ত বিভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়। রেডিয়াম হইতে উৎপন্ন এই পদার্থশ্রেণীর সপ্তমটীর নাম দেওয়া হইয়াছে রেডিয়াম জি (Radium G) পলোনিয়ামের যে লক্ষণ, এই রেডিয়াম জিরও ঠিক সেই লক্ষণ। রেডিয়াম জি হইতেও কেবলমাত্র আলফা আলোক নির্গত হয় এবং ১৪০ দিবসে উহার শক্তি অর্দ্ধেক হ্রাস হইয়া যায়। এই জন্য অনুমান হয় যে পলোনিয়াম ও রেডিয়াম জি একই পদার্থ।

এই পলোনিয়াম জীব-শরীর অতি শীঘ্র নষ্ট করিয়া ফেলে এবং ইহা হইতে আলফা আলোক এত সবেগে নির্গত হয় যে ইহা কোন স্ফটিক পাত্রে রাখিলে এই আলোককণার ঘাতে স্ফটিকপাত্র ফাটিয়া যায়।

পরশ পাথর

পলোনিয়ামের শক্তি যখন নষ্ট হইয়া যায় তখন ইহা অন্য দুই পদার্থে পরিণত হয়; ইহার একটী হিলিয়াম নামক সুপরিচিত মৌলিক পদার্থ, এবং অপরটী বোধ হয় সীস। এক ধাতু যে অন্য ধাতুতে পরিণত হইতে পারে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা এই সর্ব্ব প্রথম তাহা প্রমাণিত হইল।

রেডিয়াম হইতে নির্গত গ্যাসবৎ পদার্থের পরিবর্ত্তনের ফলেই বৈজ্ঞানিকগণের এখন বিশ্বাস হইতেছে যে, রেডিয়ামও বোধ হয় অন্য এক উৎপন্ন পদার্থের পরিবর্ত্তনের ফল। সেই উৎপন্ন পদার্থের ধ্বংস এক দিন দুই দিন নয় সহস্র সহস্র বৎসরে সংঘটিত হইয়াছে। যদি তাহাই ঠিক হয়, তবে বোধ হয় রেডিয়ামও অন্য কোন মৌলিক পদার্থ হইতে নির্গত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে স্বয়ংও অপর এক আকারে উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে পরশ-পাথরের গল্প আর দিদিমার গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না; তবে দিদিমার গল্পে যে মানুষের কর্ত্তৃত্ব কল্পিত হয় তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না।

এক ধাতু আর এক ধাতুতে পরিবর্ত্তিত হয় বটে কিন্তু তাহাতে মানুষের কর্ত্তৃত্ব নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের বশে এক ধাতু অপর ধাতুতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মনুষ্য তাহার সহায়তাও করিতে পারে না কি বাধাও দিতে পারে না। লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পূর্ব্বেও পারিত না এখনও পারে না। কিন্তু এখন আমরা এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে এক ধাতু আর এক ধাতুতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এবং সত্য সত্যই আমাদিগের চারিদিকে এই পরিবর্ত্তন ধীরে, অতি ধীরে, সংঘটিত হইতেছে।

স্বাভাবিক নিয়মে সীস যে স্বর্ণে পরিণত হইতেছে তাহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, রেডিয়ামের প্রত্যেক পরমাণু সীসে পরিণত হইতেছে। ইহার প্রধান প্রমাণ এই যে যে সমস্ত খনিজ পদার্থে রেডিয়াম পাওয়া যায় তাহাতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সীসও পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য কোন বস্তু যদি রেডিয়ামে পরিণত না হইত তবে সমস্ত রেডিয়ামই সীসে পরিণত হইয়া যাইত। ইউরেণিয়াম হইতেই রেডিয়াম উৎপন্ন হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস; কারণ উভয়ই এক স্থানেই,—পিচব্লেণ্ডেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উপসংহার

অতএব রেডিয়াম আলোচনায় আমাদের এই প্রধান শিক্ষা হইল যে আমরা পূর্ব্বে যে মনে করিতাম যে এই বিশ্বের পদার্থ-নিচয় স্থির, অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা ঠিক নহে। আমরা বুঝিলাম যে, উহারা পরিবর্ত্তন-শীল; এবং সেই পরিবর্ত্তন এমন ধীর গতিতে সম্পন্ন হইতেছে যে তাহা কেবল তিনিই উপলব্ধি করিতে পারেন, যাঁহার নিকট কোটি কোটী বৎসর একটী দিনের অনুরূপ। আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল রেডিয়াম এবং তল্লক্ষণ-বিশিষ্ট কয়েকটী পদার্থেরই আণবিক পরিবর্ত্তনের বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছি। কারণ তাহাদের পরমাণু এত দ্রুত গতিতে বিক্ষিপ্ত হয় যে তাহার ফল মানব নয়নের গোচরীভূত হয়। হইতে পারে যে অন্যান্য পদার্থ হইতেও এরূপ পরমাণু বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে কিন্তু তাহাদের গতি নিতান্ত মন্থর বলিয়া বোধ হয়। অন্য ধাতব পদার্থে পড়িয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিতে, কি ফটোগ্রাফের প্লেট বিকৃত করিতে, কি বায়ুর পরমাণু চূর্ণ করিতে পারে না, এবং তজ্জন্য সেই পরমাণু বিক্ষেপের বিষয় আমরা অবগত হইতে পারি না। কিন্তু তাহাদের পরমাণু বিক্ষেপ যতই মন্থর গতিতে সম্পন্ন হউক না কেন, পরমাণু বিক্ষেপ হইলেই তাহাদের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। অতএব দেখা গেল যে পরিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ যে কেবল প্রাণী-জগতেই নিবদ্ধ তাহা নহে। বিশ্বের তাবৎ সজীব ও নির্জীব পদার্থেই ক্রম-বিকাশের ক্রিয়া চলিতেছে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গুহ।

নামিকো

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাকেওর প্রত্যাবর্ত্তন

যুদ্ধে বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল, যুদ্ধেই বৎসরের অবসান হইল।

প্রথম দুই মাসের মধ্যে উই-হাই-উই দখল ও চীনা রণপোতবাহিনীর ধ্বংস হইয়া গেল। মার্চ মাসে জাপানী সেনা বন্যার মত শত্রুকে সম্মুখ হইতে ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহাদের চিহ্নমাত্র রাখিল না। পর মাসে সন্ধিদূত জাপানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মে মাসের শেষে জাপান সম্রাট মহাসমারোহে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

পোর্ট আর্থারে চিজিওয়ার দেহভস্ম সমাহিত করিয়া এবং জেনারেল কাতাওয়াকার জীবন রক্ষা করিয়া তাকেও উই-হাই-উই দখলে যোগদান করিয়াছিল। জুনের প্রারম্ভে তাহার জাহাজ য়োকোসুকা বন্দরে ফিরিয়া আসিল। তাকেও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এক বৎসরের অধিক হইল সে ক্রোধবশে মাতার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল। সেই সময়ের মধ্যে এত সব আশ্চার্য্য ব্যাপার ঘটিয়া গেছে যে তাকেওর মন কতকটা কোমল হইয়া আসিয়াছে। সাসেবো হাঁসপাতালে বর্ষার দিনে, উই-হাই-উই বন্দরে দারুণ শীতের রাত্রে, তাহার গৃহহারা অন্তঃকরণ তোকিওর পুরাতন বাড়ীতে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

বাড়ী আসিয়া তাকেও কোনো পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল না, কেবল দেখিল, যে পরিচারিকাটি সদর দরজার কাছে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল সে নূতন লোক। মাতার শরীরের আয়তন কিছুমাত্র কমে নাই, বাতে তিনি শয্যাশায়িনী। তাজাকি প্রত্যহ আসিয়া পূর্ব্বেকার মতই তাহার ছোট কামরায় বসিয়া সাংসারিক হিসাব পত্র লেখে। সবই ঠিক আছে, কোনো পরিবর্ত্তন নাই। অথচ এমন কিছুই তাকেও খুঁজিয়া পাইল না, যাহা দেখিয়া বা শুনিয়া মনে আনন্দ পাওয়া যায়। বহুদিনের পর মাতার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। নিজের বাড়ীতে বেশ আরাম করিয়া স্নান করিয়া পুরু কোমল আসনে বসিয়া সে তাহার বিশেষ প্রিয় ব্যঞ্জন খাইয়াছে,

ও এক্ষণে নরম বালিস মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়াছে তবুও তাহার ঘুম আসিতেছিল না। ঘড়িতে একটা বাজিল, দুইটা বাজিল, তবু তাহার চোখে ঘুম নাই, হৃদয়ের ভারেরও কোনো লাঘব হইতেছিল না।

এক বৎসরে মাতাপুত্রের মনোমালিন্য কাটিয়া গিয়াছে ; অন্তত দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছিল। মাতা অবশ্য পুত্রকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করিলেন, পুত্রও তাঁহাকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু উভয়েই প্রথম সাক্ষাতেই লক্ষ্য করিল যে তাহাদের মধ্যে হৃদয়ের যোগ কোথাও নাই। পুত্র মাতাকে নামি সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না, মাতা তাহার বিষয়ে কিছু বলিলেন না—পুত্রের জানিবার ইচ্ছা ছিল না বা মাতা যে জানিতেন না এমন নয় ; কিন্তু তাহারা উভয়েই জানিত যে, সে আলোচনায় বিপদের সম্ভাবনা; তাই এমন হইল। তাহারা উভয়েই লক্ষ্য করিতেছিল যে প্রত্যেকেই ঐ আলেচনাটি এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে ; তাই কথাবার্ত্তা থামিয়া গেলেই পাছে অপ্রীতিকর আলোচনাটা জাগিয়া উঠে, তাই ভাবিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

নামিকে স্মরণ করিবার জন্য বিশেষ কোনো আলোচনার অপেক্ষা ছিল না। পুরাতন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তাকেও দেখিল, সকল জিনিসই তাহাকে সেই এক নামির কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তাহার অন্তর তার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে এখন কোথায় ? সে কি তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের কথা শুনিয়াছে ? প্রেম দূরত্বের ব্যবধান জানে না। কিন্তু এখন নামির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে, তাই শ্বশুরালয় এক ক্রোশের পথ মাত্র হইলেও, তাহাই তাকেওর নিকট গ্রহতারকার মত সুদূর বলিয়া বোধ হইতেছিল। নামির মাসী-মাতার নিকট গিয়াও নামির কথা জিজ্ঞাসা করিবার জো নাই। গত বৎসর মে মাসে জুশি গিয়া সে যখন তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, তখন সে তো স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সেই বিচ্ছেদ তাহাদের চিরবিচ্ছেদ হইবে। বাড়ীর ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া নামি বলিয়াছিল, শীগগির ফিরে এস। সে ধ্বনি এখনো তাহার কানে বাজিতেছে, কিন্তু এখন সে কাহার নিকট গিয়া বলিবে—আমি ফিরে এসেছি ?

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে য়োকোসুকার পথে জুশিতে অবতরণ করিয়া তাকেও উদ্যানবাটিকা অভিমুখে অগ্রসর হইল, দেখিল সম্মুখে ফটকটি বন্ধ রহিয়াছে। বাড়ীর মালিক তোকিও গিয়াছে ভাবিয়া সে ঘুরিয়া বাড়ীর পশ্চাতে গেল। উদ্যানে বৃদ্ধ ভৃত্য একাকী আগাছা তুলিতেছিল।

পদশব্দ শুনিয়া বৃদ্ধ মুখ ফিরাইল। আগন্তুককে চিনিতে পারিয়া সবিস্ময় সম্ভ্রমের সহিত তাহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল—"নমস্কার হই, কবে ফিরলেন আপনি ?"

তাকেও কহিল—"এই দিন কতক হোল। ভালো আছ, মোহেই ?"

বৃদ্ধ কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ। ভালোই আছি আপনাদের আশীর্ব্বাদে।"

তাকেও জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি এখানে একলা রয়েচ ?"

"ব্যারণেস—না দিদিমণি—এই যাঁর অসুখ হয়েছিল, তিনি ইকুর সঙ্গে গত মাসের শেষ পর্য্যন্ত এখানেই ছিলেন। তখন থেকে আমি একলাই রয়েচি।"

তাকেও নিজের মনে বলিল—"গত মাসে ফিরেচে ? তা হোলে এখন সে তোকিওতেই আছে।"

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"কর্ত্তাবাবু চীন থেকে ফেরবার আগেই তিনি তোকিও গিয়েছিলেন। তার পর তিনি কর্ত্তার সঙ্গে কিওতো গিয়ে ছিলেন, এখনো ফেরেন নি বোধ হয়।"

তাকেও নিজের মনে বলিল—"কিওতো ? তা হোলে সে ভালো আছে নিশ্চয়।" তারপর জিজ্ঞাসা করিল—"কবে কিওতো গেলেন ?"

"এই হপ্তাখানেক—।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ সহসা থামিয়া গেল। ভাবিল এতটা বলা ঠিক নয়। তাকেও বুঝিতে পারিল, বৃদ্ধ ভৃত্যের মনের মাঝে কোন্ চিন্তা উদিত হইতেছে, তাই তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ তাহারা নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাকেওর অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধের মনে দুঃখ হইল, সে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"দোর খুলে দি। ভেতরে বসুন, একটু চা খান।"

তাকেও কহিল,—"না না ব্যস্ত হোয়ো না। য়োকোসুকায় ফিরছিলুম, তাই একবার দেখে গেলাম।"

পরিচিত উদ্যানটি দেখিবার জন্য তাকেও মুখ ফিরাইল। উদ্যানরক্ষক ছিল বলিয়া বনজঙ্গল হয় নাই। বাড়ীর সমস্ত দ্বার বন্ধ, চৌবাচ্চা জলশূন্য। বৃক্ষগুলি পত্রবহুল হইয়া উঠিয়াছে। ভূমির উপর প্লাম-ফল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। শষ্পাচ্ছাদিত ভূমির উপর বৎসরের শেষ গোলাপ তার অন্তিম নিঃশ্বাসের মৃদু সুরভিতে উদ্যান পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই। কেবল দেবদারুগাছ হইতে পতঙ্গের কর্কশ চীৎকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

তাকেও বৃদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চিন্তাভারাক্রান্ত মনে চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে আবার দক্ষিণে যাইবার হুকুম আসিল।

দুই সপ্তাহ সে বাড়ীতে ছিল; কিন্তু সে সময় যুদ্ধ জয়ের আনন্দ উৎসবে অতিবাহিত হয় নাই। দূরে থাকিয়া সে মনে করিত বাড়ীর মত স্থান পৃথিবীতে কোথাও নাই, কিন্তু এখন শত চেষ্টা করিয়াও অন্তরের শূন্যতা কিছুতেই পূর্ণ করিতে পারিল না।

মাতা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যখনি তাহারা কথা কহে, তাকেওর মনে হয়, তাহাদের মধ্যে যেন একটা দেওয়ালের ব্যবধান রহিয়াছে। সে ব্যবধান কিছুতেই ঘুচিতছে না।

য়োকোসুকা হইতে যাহাজে যাত্রা করিবার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে যাইবার গাড়া ধরিতে না পারিয়া তাকেও কুরে হইতে জাহাজে উঠিতে স্থির করিল। দশই জুন তারিখে সে একাকী তোকাই-দো রেলপথে যাত্রা করিল। .

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চকিতের দেখা

উজির মন্দির হইতে তিন জন লোক বাহির হইয়া আসিল। পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়স্ক একজন স্থূলাকার ভদ্রলোক য়ুরোপীয় পোশাকে সজ্জিত; তাঁহার হাতে এক গাছা সোনা,বাধানো বেতের লাঠি। প্রায় বিংশবর্ষীয়া একটি রমণী, হাতে তাঁহার একটি কালো ছাতা। একটি বর্ষীয়সী পরিচারিকা, হাতে তার একটি ছোট থলি।

তাঁহাদিগকে বাহির হইতে দেখিয়া তিন জন লোক তিন খানি রিক্‌স টানিয়া আনিয়া ফটকের নিকট হাজির হইল। তাহারা তাঁহাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। রমণীর দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কহিলেন," চমৎকার দিনটি দেখা যাচ্ছে। একটু হাঁটবে কি মা?"

"বেশ তো।"

পরিচারিকা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁপিয়ে যাবে না দিদিমণি?"

রমণী কহিল—"না না হাঁপাবো কেন? একটুখানি হাঁটি।"

"তাহলে চল আস্তে আস্তে যাই, দরকার হ'লেই রিক্‌স চড়া যাবে।"

তিন জনে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, রিক্‌স তিন খানা তাহাদের পশ্চাতে চলিল। এ তিন ব্যক্তি আর কেহ নয়, জেনারল্ কাতাওকা, নামি, ও ইকু। গতকল্য নারা হইতে এখানে আসিয়াছিলেন, এখন ওৎসু যাইবার জন্য য়্যামাশিনা ষ্টেসনের দিকে চলিয়াছেন।

জেনারল গত মে মাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এক দিন গোপনে তিনি নামির চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার দুই দিন পরেই কন্যা নামি ও ইকুকে লইয়া কিওতো যাত্রা করিলেন। নদীর ধারে একটি কোলাহলবর্জ্জিত নিস্তব্ধ হোটেলে আড্ডা গাড়িয়া সৈনিকের পোষাক ছাড়িয়া ফেলিয়া, কয়েকদিন ধরিয়া নামিকে লইয়া তিনি বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন। সভাসমিতির সমস্ত নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া, জগতের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া, এ কয় দিন তিনি একান্ত নামির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

চা তুলিবার শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাতাসে মাঝে মাঝে শুষ্ক চা এর গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। চাএর ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে গোধূমের ক্ষেত্রগুলি হরিদ্রাবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে কাস্তের খস্ খস্ শব্দ শুনা যাইতেছিল। দূরে খ্যামাতোর পাহাড়গুলি গ্রীষ্মের তরল কুহেলিসমাচ্ছন্ন। বহুদূরে নৌকায় শুভ্র পাল গোধূমের ক্ষেত্র ছাড়াইয়া উঠিয়া উজি নদীর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল। নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কাকের আলস্যবিজড়িত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল। মাথার উপর আকাশে একখানা পাণ্ডুরবর্ণ মেঘ স্থির হইয়া ভাসিতেছিল। নামি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সেই সময় বাম দিকের একটা পথ হইতে এক কৃষক ও তাহার পত্নী কথোপকথন করিতে করিতে বাহির হইল। দ্বিপ্রহরের আহারের পর তাহারা কাজে চলিয়াছে। পুরুষটির কোমরবন্ধে একখানি কাস্তে গোঁজা, স্ত্রীলোকটির দাঁত কৃষ্ণবর্ণ ও মাথায় একখণ্ড সাদা কাপড় জড়ানো। তাহার হাতে একটি প্রকাণ্ড চাএর কেট্‌লি। নামিদের দল দেখিবামাত্র সে চমকিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর দ্রুতপদবিক্ষেপে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া ফিশ ফিশ কি বলিল। উভয়েই ফিরিয়া চাহিল। স্ত্রীলোকটি মৃদু হাস্য করিতেছিল, তাহার রঞ্জিত দাঁতগুলি দেখা যাইতেছিল। কথা কহিতে কহিতে তাহারা একটা মেঠো রাস্তায় গিয়া পড়িল। সেখানে বন্য কাঁটাগাছ ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

নামির দৃষ্টি তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। কৃষকের থালার ন্যায় প্রকাণ্ড গোল খড়ের টুপি ও কৃষক-পত্নীর শ্বেত মস্তকাবরণ ক্রমশঃ গোধূম ক্ষেত্রের হরিদ্রাবর্ণের মধ্যে ডুবিতে ডুবিতে অবশেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। তারপর শুনা গেল মনের আনন্দে কৃষক গান ধরিয়াছে।

নামি তাহার বিষাদমাখা চোখ দুটি ভূমির উপর স্থাপিত করিল।

জেনারল তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"তুমি কি হাঁপিয়ে উঠেছ মা?" কন্যার হাত তিনি নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিলেন।

চলিতে চলিতে জেনারল নামির সহিত কথা কহিতেছিলেন।

"সময় যেন উড়ে চলেচে। তোমার কি মনে পড়ে মা যখন তুমি ছোট ছিলে, তোমাকে আমি পিঠে করে নিয়ে বেড়াতুম, আর তুমি পা ছুড়তে। তোমার বয়স তখন নিশ্চয়ই পাঁচ ছ' বছর ছিল।"

ইকু বলিয়া উঠিল—"আমার মনে পড়ে, কর্ত্তাবাবু তোমায় যখন পিঠে নিতেন, তখন ছোট দিদিও ওঁর পিঠে চড়বার জন্যে কি রকম কান্নাকাটি আরম্ভ করতেন। এখনো তিনি নিশ্চয়ই ভাবচেন আমাদের সঙ্গে থাকলে কি মজাটাই হোত।"

নামি একটু বিষাদের হাসি হাসিল।

জেনারল কহিলেন—"কে? কোমা? তার জন্যে আমরা অনেক ভালো ভালো জিনিষ নিয়ে যাব'খন। কিন্তু কোমার চেয়ে চিজুসানই আসতে চেয়েছিল বেশি, না মা?"

ইকু পুনরায় বলিতে লাগিল—"আমারো তাই মনে হয়। তিনি আমাদের সঙ্গে থাকলে খুব আমোদ হোত। কর্ত্তাবাবু, আপনাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। যে নদীটা আমরা এই মাত্তর পেরুলুম ওটা কি উজি নদী? ঐ নদীটাই তো জোনাকী পোকার জন্য বিখ্যাত? আর এখানেই তো কোমাজাওয়া তার প্রেয়সী মিয়ুকির দেখা পেয়েছিল?"

জেনারল সহাস্যে কহিলেন—"আমাদের ইকু ত কম নয়, সে তো সব জানে দেখচি!

কালে কালে কত জিনিষই বদলাচ্চে। আমি যখন ছোট ছিলুম তখন ওসাকা থেকে কিওতো যেতে হ'লে নৌকোয় গাদাগাদি করে যেতে হোত। প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত হয়ে যেত। আমার যখন কুড়ি বছর বয়স তখন এর চেয়েও মজার ব্যাপার হয়েছিল। একবার একটা জরুরি কাজে ওসাকা যেতে হয়েছিল, পথে এসে দেখি ট্যাঁকে একটিও টাকা নাই। কি আর করি, খালি পায়ে রাত্তির বেলায় নদীর ধারে দিয়ে ওসাকা পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা ছুটতে ছুটতে গেলুম। হা, হাঃ, হাঃ!

গরম বোধ হচ্ছে। নামি, মা! তোমার আর চলে' কাজ নেই। গাড়ীতে ওঠো।"

ইকু রিকস্‌ওয়ালাদের ডাক দিল। তিনজনে রিকস্ চড়িয়া ধীরে ধীরে চা ও গোধূম-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া য়্যামাশিনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পিতার মস্তকের শুভ্রকেশ দেখিয়া নামির মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল যে, জগতের সমস্ত আশা ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া অদূরবর্ত্তী মৃত্যুর অপেক্ষায় সে বসিয়া আছে—তাহার ভাগ্য কত মন্দ! কিন্তু এরূপ মন্দভাগ্য কন্যার যিনি পিতা তাঁহার অবস্থা কী শোচনীয়! তাহার প্রতি পিতার অসীম স্নেহ ভালোবাসার সে কী প্রতিদান দিবে? মনে মনে তাহার বিগত বাল্যজীবনে ফিরিয়া গিয়া, জগতের কথা ভুলিয়া, পিতার বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত আর কিছুই সে করিতে পারে না! সেই

জন্য সে শিশুর মত আগ্রহে নূতন নূতন দৃশ্য দেখিতেছিল। কিওতোয় যখন সে রেশমের কাপড় খরিদ করিতেছিল, তখন সে জানিত, উহা তাহার কোনো কাজেই লাগিবে না; তবুও সে খুব রং চংএ কাপড়ই বাছিয়া কিনিল. তাহার ভগ্নি সেগুলি পাইলে তাহাকে মনে রাখিবে বলিয়া।

পিতার দুঃখ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেও নামি তাকেওর কথা একমুহূর্তও বিস্মৃত হয় নাই। তাহার কোনো সংবাদই সে পায় নাই। পোর্ট আর্থারে সে পিতার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল কেবল এই সংবাদ পাইয়াছিল। তাহার কত ভাবনা হইত। স্বপ্নে সে তাহার দেখা পাইত, কিন্তু সে যে কোথায় তাহার কিছুই সে জানিত না। তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইত,—জীবনে কেবল আর একবার দেখিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু হায়! সে সাধ তাহার অপূর্ণই রহিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার সেই কৃষক-দম্পতীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহারা কী নিবিড় সুখে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছিল! জীর্ণ চির পরিয়া তাহারা কত সুখী, তাহাদের কি সৌভাগ্য! আর বহুমূল্য রেশমের পোশাক পরিয়া সে——!

চক্ষু তাহার জলে ভাসিয়া উঠিল। অশ্রুরোধ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে ভয়ানক কাশিতে লাগিল।

কাশির শব্দে চিন্তিত হইয়া জেনারল ফিরিয়া চাহিলেন।

অমনি অশ্রুর মধ্যে হাসি ফুটাইয়া নামি কহিল "কিছু নয়, সেরে গেছে।"

য়্যামাশিনায় তাহারা একখানা পূর্ব্বদিক্‌গামী টেণে চাপিল। প্রথম শ্রেণীর কামরায় কেবল তাহারা তিন জন। নামী খোলা জানালার ধারে বসিল, তাহার পিতা তাহার সম্মুখে বসিয়া কাগজ পড়িতে লাগিলেন।

অনতিকাল পরেই একখানা কোবের গাড়ী পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া তাহাদের গাড়ীর পাসে থামিল। অন্য দিকে ট্রেনের দরজা খুলিবার শব্দ ও কুলিদের 'য়্যামাশিনা' 'য়্যামাশিনা' বলিয়া চীৎকার হইতেছে, এমন সময় নামিদের ট্রেণের ইঞ্জিন বাঁশি বাজাইয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। জানালা হইতে নামি পাশের ট্রেণখানার দিকে চাহিয়াছিল। যেই একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার সামনে আসিয়াছে অমনি দেখিল, একটি যুবক হস্তে কপোল রাখিয়া বসিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের চোখে চোখে সাক্ষাৎ হইল। নামি একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল। তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না।

যুবক 'নামি সান্।' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।—সে তাকেও।

ট্রেণ চলিয়া যাইতেছে। নামি উন্মাদিনীর মত লাফাইয়া উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া যুবকের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার বেগুনে রঙ্গের রুমালখানি নাড়িতে লাগিল।

'পড়ে যাবেন যে, দিদিমণি!' বলিয়া ব্যস্ত চকিত হইয়া ইকু তাহার আস্তীন চাপিয়া ধরিল।

জেনারেল তাহা দেখিয়া কাগজ হাতে লইয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইলেন।

ট্রেণ দুইখানার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। নামি জানালা দিয়া আরও ঝুকিয়া উঠিয়া দেখিল, তাকেও অধীরভাবে রুমাল নাড়িতেছে, ও কি বলিতেছে। তাহার কথা নামির কানে পৌঁছিল না। সহসা ট্রেণখানা একটি পাহাড়ের পাশ দিয়া বাঁকিয়া গেল। এখন উভয় দিকে কেবল তৃণাচ্ছাদিত ঢালু জমি। পশ্চাতে কাপড় ছেঁড়ার মত একটা ফ্যাশ্ শব্দ হইল। তাকেওর ট্রেণ পশ্চিমে যাত্রা করিল।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নামি পিতার জানুর উপর মাথা নত করিল।

শ্রীহেমনলিনী রায়।

ধামরাইর পুরাকীর্ত্তি*

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

(দ্বিতীয়ার্দ্ধ)

এ পর্য্যন্ত বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মাধবের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করিতে আমরা চেষ্টিত হইয়াছি। অতঃপর আমর ধামরাইর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে, বিশেষতঃ কুমড়াইল এবং ধামরাইর মধ্যবর্ত্তী পাঠানটোলা নামক গ্রামে, অদ্যাপি যে সমস্ত পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইব। পাঠানটোলাতে এবং তৎসান্নিধ্যে পাঠান রাজত্বকালের প্রাসাদ এবং বহু মস্‌জিদাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববঙ্গে পাঠান জাতীয় লোক কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। কিন্তু, এই গ্রামে কতিপয় পাঠান পরিবার অদ্যাপি বাস করিতেছেন। দুর্দ্ধর্ষ পাঠান দলপতি ওস্‌মান্ খাঁ সদলে মোগল কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া এই জলবেষ্টিত পূর্ব্বাঞ্চলে আবাস স্থাপন করিয়া মোগল সৈন্যের সহিত বহু খণ্ডযুদ্ধ করেন। পাঠানটোলার অদূরে "রণস্থল" নামক গ্রামে মোগল পাঠানে এইরূপ কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এইরূপ প্রবাদ। পুরাকালের সেই রণাভিনয়ের স্মৃতি বহন করিয়া অদ্যাপি ঐ স্থান "রণস্থল" নামে খ্যাত।

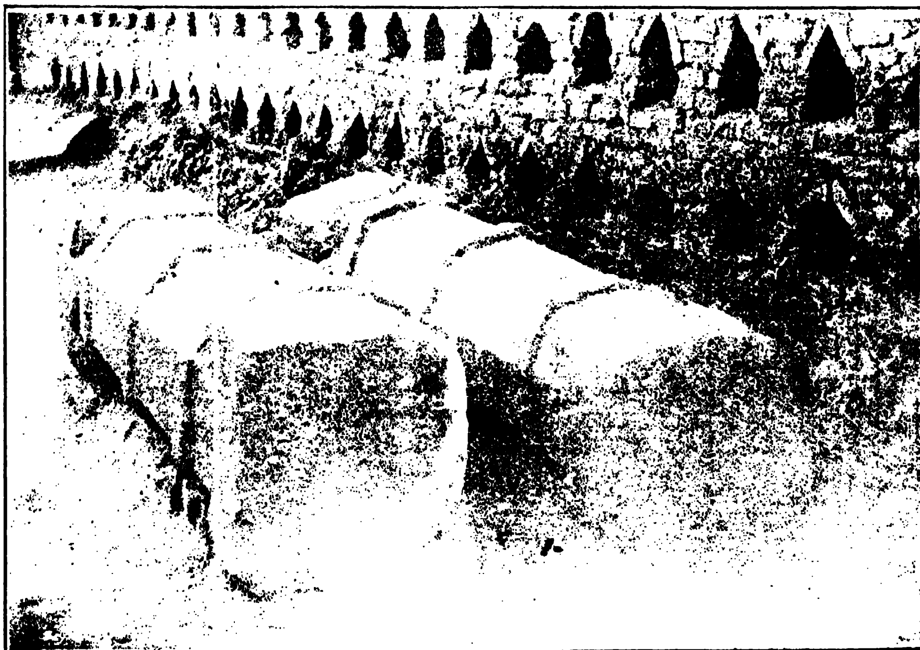
ধামরাইর মৌলবী সামসুদ্দিন আহাম্মদের বাটিতে (সাহ সাহেবের দরগাতে) দুইটী প্রস্তর-স্তম্ভ পতিত আছে। [৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। স্তম্ভদ্বয় সাত ফুটের কিঞ্চিদধিক লম্বা, অষ্টকোণ, এবং লোহিতাভ গ্রেনাইট (granite) প্রস্তর নির্ম্মিত; উহাতে কোনরূপ মূর্ত্তি অথবা লিপি খোদিত নাই; দেখিলেই বোধ হয় কোনও অট্টালিকা হইতে উহা স্থানান্তরিত হইয়াছে। ধামরাই গ্রামের প্রান্তভাগে আরমান বিবির বাড়ীর যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও উহার দ্বারদেশে এই স্তম্ভদ্বয় প্রোথিত ছিল; পূর্ব্বোক্ত মৌলবী সাহেব কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে আরমান বিবির কোন দরিদ্র বংশধর হইতে স্তম্ভদ্বয় ক্রয় করিয়া নিজবাটীতে রক্ষা করিয়াছেন। স্তম্ভদ্বয়ের গঠন-প্রণালী দেখিলেই প্রতীতি জন্মে যে মুসলমান রাজত্বের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত। সম্ভবতঃ মুসলমান বিজেতৃগণ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু অথবা বৌদ্ধ যুগের কোনও অট্টালিকা হইতে ঐ সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ভবনাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এতদঞ্চলে যে বহু বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিয়াছি। ধামরাইর যশোমাধবও যে বৌদ্ধযুগের নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি পূর্ব্বে তাহারও আলোচনা করিয়াছি। সম্ভবতঃ বৌদ্ধযুগের কোনও অট্টালিকা হইতেই ঐ স্তম্ভদ্বয় আরমান বিবির প্রাসাদের শোভাবর্দ্ধনার্থ আনীত হইয়াছিল।

এতদঞ্চলের অন্যান্য বৌদ্ধ নিদর্শনের চিহ্ন স্বরূপ ধামরাইর অনতিদূরস্থ নান্নার গ্রামের "বাজাসনের ভিটার" উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের ধারণা যে সুপ্রসিদ্ধ বজ্রাসন বিহার এই স্থানেই অবস্থিত ছিল, এবং তিব্বতে বুদ্ধের অবতাররূপে পূজিত বৌদ্ধ

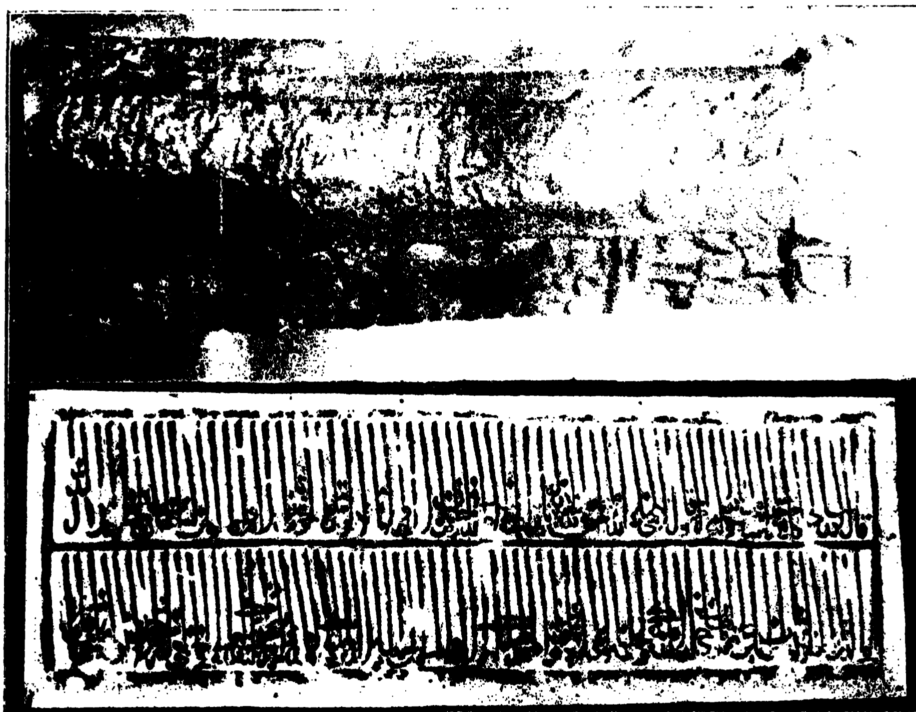
ধর্ম প্রচারক দীপঙ্কর এই বিহারেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। [প্রবন্ধান্তরে এই বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।]

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ধামরাইর প্রান্তভাগে আরমান বিবির বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। এই আরমান বিবি সুপ্রসিদ্ধ গাজি বংশজ আলওয়ার অথবা দেলওয়ার গাজীর পুত্র। গাজীবংশ পলওয়ান অথবা পহ্লুন সাহের প্রতিষ্ঠিত। আলওয়ার অথবা দেলওয়ার গাজী প্রথমে এতদঞ্চলে আসিয়া মেঘসিমুলিয়ার নিকটবর্ত্তী রাজবাড়ী নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ রাজধানী আধুনিক মানিকগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত জায়গীর বন্দরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল; এখন তাহা ধলেশ্বরীর নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে। আলওয়ার অথবা দেলওয়ার গাজীর চাঁদ গাজী, সেলিম গাজী, এবং সুলতান গাজী নামক তিন পুত্র ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ তিন পুত্রের মধ্যে তাঁহার রাজ্য বিভক্ত হয়, এবং তাঁহাদের নামানুসারে তাঁহাদের পৃথক্‌কৃত রাজ্য চাঁদপ্রতাপ সেলিমপ্রতাপ ও সুলতানপ্রতাপ নামে খ্যাত হয়। আইন্-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, উক্ত পরগণাত্রয় সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল, এবং উহার রাজস্ব ৪৬২৫৪৭৫ দাম একত্র প্রদত্ত হইত। এই তিন পরগণার রাজস্ব একত্র গৃহীত হওয়ার বিবরণ হইতেই প্রমাণিত হইতেছে, যে পরগণাত্রয় এক ভূম্যধিকারীরই সম্পত্তি ছিল। সুলতান প্রতাপ পরগণার স্থাপয়িতা সুলতান গাজী ধামরাইতেই বাস করিতেন এবং ধামরাইতেই তাঁহার রাজধানী ছিল; ধামরাই গ্রামের প্রান্তভাগে অবস্থিত আরমান বিবির বাড়ী তাঁহারই প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। উহা সুলতান গাজীর মাতা আরমান বিবির নামানুসারে খ্যাত ছিল, এবং অদ্যাপিও আছে। বোধ হয় এই আরমান বিবি অত্যন্ত ভাগ্যবতী রমণী ছিলেন, তাই অদ্যাপি তাঁহার নাম বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়া যায় নাই। আরমান বিবির বাড়ীর বনাকীর্ণ ভগ্নাবশেষ বহুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছে; কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও তথায় প্রাচীর প্রভৃতির চিহ্নাদি সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইত, এখন শুধু ইষ্টক ও মৃৎস্তূপসমূহ প্রাসাদের অতীত গৌরবের সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান। গ্রামবাসিগণ স্ব স্ব গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার জন্য ইষ্টকগুলিও প্রায় নিঃশেষে স্থানান্তরিত করিয়াছে। আরমান বিবির বাড়ীর পূর্ব্বদিকে মস্‌জিদ পুষ্করিণী এবং দক্ষিণ দিকে জীয়স পুষ্করিণী নামক দীর্ঘিকাদ্বয় অদ্যাপি বর্ত্তমান। পূর্ব্বোল্লিখিত স্তম্ভদ্বয় আরমান বিবির বাড়ীর দ্বারদেশে প্রোথিত ছিল, কিন্তু উহা যে মুসলমান যুগের পূর্ব্বের নির্ম্মিত, আমাদের এইরূপ অনুমানের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হয়ত বৌদ্ধযুগের কোনও অট্টালিকা হইতে বিজেতা মুসলমানগণ অন্যান্য দ্রব্যাদির সহিত ঐ স্তম্ভদ্বয়ও স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

এইরূপ ঘটনা যে পূর্ব্বে সংঘটিত হইত, আমাদের অনুমান যে সম্পূর্ণ অমূলক নহে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য নিম্নে আমরা একখানা প্রস্তর খণ্ডের বিবরণ প্রদান করিতেছি। উহার এক পৃষ্ঠে ফার্সিতে কয়েক পংক্তি লিপি খোদিত আছে। পাঠান টোলার একটী বহু প্রাচীন মস্‌জিদ্ গাত্রে উহা সংলগ্ন ছিল। মস্‌জিদটী ধ্বংসমুখে পতিত হইবার পর বাগনগর ঘাটের অদূরস্থিত একটী কবরে উহা সংলগ্ন করা হইয়াছিল। পরে উহাও বিলুপ্তপ্রায় হওয়াতে কতিপয় বর্ষ যাবৎ শিলালিপি খানা পাঠানটোলা নিবাসী মৃত মুন্সী হাফেজ রহমানের গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। [৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। পরীক্ষায় দৃষ্ট হইল যে, প্রস্তরফলকখানার অপর পৃষ্ঠে কয়েকটী মূর্ত্তি খোদিত আছে। নিম্নভাগে একটী উপবিষ্ট বৌদ্ধ মূর্ত্তি, তদুপরি গজারূঢ় সিংহমূর্ত্তি, এবং তদুপরি আর একটী দণ্ডায়মান মনুষ্য মূর্ত্তি। প্রস্তরখণ্ড কিঞ্চিদধিক তিন ফুট লম্বা, এবং উহা নিশ্চয়ই কোন বৌদ্ধ মূর্ত্তির



(৬নং) আরমান বিবির বাড়ীর দ্বারদেশে প্রাপ্ত স্তম্ভদ্বয়।



(৭নং) ফতে শাহের প্রস্তরলিপি—অপর পৃষ্ঠে (বৌদ্ধ) মূর্ত্তিযুক্ত।

ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউস, ঢাকা।

অথবা বৌদ্ধযুগের কোনও অট্টালিকার অংশবিশেষের ভগ্নাবশেষ। গজারূঢ় সিংহ মূর্ত্তি পালরাজগণের রাজ-চিহ্ন ছিল। (৯) সুতরাং প্রস্তরখণ্ডের অপর দিকস্থ মূর্ত্তিগুলি যে বৌদ্ধযুগে পালরাজগণের রাজত্বকালে খোদিত গজসিংহমূর্ত্তি এবং উপবিষ্ট বৌদ্ধমূর্ত্তি হইতেই তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্তর দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে মুসলমান বিজয়ের পর হয় ত ঐ প্রস্তর খণ্ড স্থানান্তরিত করা হয় এবং বিজেতৃগণ উহা নিজেদের আবশ্যকমত আকারে কাটিয়া লইয়া উহার অপর পৃষ্ঠে ফার্সি লিপি খোদিত করিয়া মস্‌জিদ্ গাত্রে সংলগ্ন করিয়া রাখে। ইষ্টকের গাঁথনির অন্তরালে লুক্কায়িত থাকায় এতদিন উহা প্রচ্ছন্ন ভাবেই রহিয়া গিয়াছিল। এতদঞ্চলের বৌদ্ধ কীর্ত্তির এই নিদর্শনটী বহুশতাব্দীর অজ্ঞাতবাসের পর অধুনা অনুসন্ধিৎসুর কৌতুহল চরিতার্থ করিতেছে। ফার্সিতে লিখিত প্রস্তরলিপিখানার অনু-লিপি প্রদত্ত হইল (১০) [৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। বঙ্গানুবাদ।—

সর্ব্বশক্তিমান ভগবান বলিয়াছেন,—"ভগবৎবিশ্বাসী ব্যক্তি অন্তিমকালে ভগবানের জন্যে মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন।" আচার্য্য (মহম্মদ)—ঈশ্বরের করুণা তাঁহার উপর বর্ষিত হউক,—বলিয়াছেন, "যিনি ভগবানের জন্য মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিবেন, স্বর্গে তাঁহার জন্য তদ্রূপ আবাস প্রস্তুত হইবে।" বর্ত্তমান কালের নৃপতি, করুণাময়ের অনুগৃহীত, ইসলামধর্ম্ম এবং মুসলমানগণের সহায়ক, নৃপতি মাহ্‌মুদ্ শাহের পুত্র, নৃপতি জালালুদ্দ্‌নিয়া-ওয়াদ্দিন আবুল মুজাফফ্‌র ফতে শাহের রাজত্বকালে এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হয়; ভগবান তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন, এবং তাঁহার ক্ষমতা ও মর্য্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি করুন। মুসলমানগণ এবং ইসলাম ধর্ম্ম দ্বারা পূত এই মস্‌জিদ্ নৌসেনাপতি জাহির উল্ উলিয়াৎ ওয়াদ্দিন মালিকউল্ মুলুক্ আখোন্দ্ শের কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইল। ভগবান স্বর্গে তাঁহাকে আবাস প্রদান করুন। তারিখ ১০ই জামাদি, ৮৮৭।

উদ্ধৃত শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যে মস্‌জিদে উহা সংলগ্ন ছিল, তাহা হিঃ ৮৮৭ অব্দে, অর্থাৎ ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে, ফতে শাহের রাজত্বকালে তাঁহার নৌসেনানায়ক আখোন্দ শের কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, আখোন্দ্ শের সম্ভবতঃ ধামরাইর অধিবাসী অথবা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অথবা হয়ত ধামরাই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হওয়াতে দৈনন্দিন নেমাজ করিবার জন্য ঐ মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন।

ফতে শাহ্ বঙ্গের একজন স্বাধীন নৃপতি ছিলেন, এবং হিঃ ৮৮৭ হইতে ৮৯৬ অব্দ, অর্থাৎ ১৪৮২ হইতে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত রাজ্যশাসন করেন। এই সময়ে লোদি বংশীয় সম্রাট বেলোল্লি লোদি দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। উদ্ধৃত শিলালিপিই এতদঞ্চলে মুসলমান কীর্ত্তির প্রাচীনতম নিদর্শন।

পাঠানটোলাতে প্রায় এই সময়েরই আর একখানা শিলালিপি আছে। ফার্সিতে লিখিত লিপি খোদিত একখানা সুবৃহৎ প্রস্তরফলক পাঠানটোলাস্থ বড় পীড়ের কবরে সংলগ্ন আছে। এই বড় পীড়ের সম্পূর্ণ নাম "সুলতান উল্ আউলিয়া জনাব হজরৎ সৈয়দ সাহ্ মীর সৈয়দ আলি তেরমিজি হোসেন উল্ হোসেনি কুদ্দিসল্ লাহু সিরুরাহু।" বড় পীড়ের মস্‌জিদ্ পাঠানটোলাতে কাজির গাঙ্গের তটদেশে অদ্যাপি অভগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। শিলালিপিখানা পূর্ব্বে সন্নিকটস্থ অন্য একটী মস্‌জিদ্‌গাত্রে সংলগ্ন ছিল; তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। বোধ হয় উহাই বড় পীড়ের মস্‌জিদ্ ছিল। উক্ত মস্‌জিদ্

(৯) J. A. Vas's "District Gazetteer of Rangpur."

(১০) খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে পরবর্ত্তীকালে এই শিলালিপি তথা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া বর্ণিত কবরে সংলগ্ন করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা বড়পীড়ের সমাধি ;—অন্ততঃ এই নামেই অধুনা ইহা খ্যাত। বড়পীড়ের মস্‌জিদের দ্বারদেশে তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ও পরিচয় পরবর্ত্তীকালে লিখিত হইয়াছে। উহা অধিক বিশ্বাস্য নহে। কবর সংলগ্ন শিলালিপির অনুলিপি প্রদত্ত হইল (১১)। [৮নং চিত্র দ্রষ্টব্য]।

বঙ্গানুবাদ।—

আচার্য্য (মহম্মদ)—তাঁহার উপর ভগবানের করুণা বর্ষিত হউক,—বলিয়াছেন, "যে ঈশ্বরের জন্য মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিবে, ভগবান স্বর্গে তাঁহার জন্য তদ্রূপ আবাস প্রস্তুত করিবেন।" এই সুবৃহৎ মস্‌জিদ্ সৈয়দ আস্‌রফ্-উল হোসেনির পুত্র পরম সম্মানিত আলাউদ্দুনিয়া ওয়াদ্দিন আবুল মুজাফ্‌র শাহ্ সুলতান হোসেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ভগবান তাঁহার রাজত্ব ও রাজ্য চিরস্থায়ী করুন। দ্বাবিংশত্যধিক নবশত অব্দে (নির্ম্মিত), ৯২২ হিঃ।

শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে বঙ্গের জনৈক স্বাধীন নৃপতি হোসেন শাহ্ এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল হিঃ ৯০৫ হইতে ৯২৭ অব্দ, অর্থাৎ ১৪৯৯ হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ। এই সুলতান মক্কা অথবা তেরমিজের অধিবাসী, এবং মহম্মদের বংশ জাত ছিলেন। অবস্থার আনুকূল্য সাধনার্থ তিনি আরবের মরু-প্রদেশ ত্যাগ করিয়া উর্ব্বর বঙ্গদেশে আগমন করেন। বংশমর্য্যাদায় অত্যুন্নত হওয়াতে তিনি শীঘ্রই গৌড়ের রাজসভায় সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার প্রতিভাবলে রাজ্যমধ্যে তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি মুজাফ্‌রের অত্যাচারে অনতিবিলম্বে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ভাগ্য-বিবর্ত্তনে নিজেই সিংহাসন লাভ করিলেন।

পাঠানটোলার বড় পীড় তেরমিজি অর্থাৎ তেরমিজ অথবা মক্কার অধিবাসী ছিলেন, এবং তিনি ও অন্য চারিজন পীড় হোসেন শাহের সহিত মক্কা হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। সিংহাসন লাভের পর, সৈয়দ হোসেন (হোসেন শাহ্) আলাউদ্দিন সেরিফ মেক্কি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন কোন ঐতি-হাসিকের এইরূপ মত। কিন্তু, রিয়াজ-উস্-সালাতিন্ কার বলেন যে গৌড় অঞ্চলের অট্টালিকা সমূহে তাঁহার সময়ে যে সমস্ত শিলালিপি বর্ত্তমান ছিল, তাহার সকলগুলিতেই তিনি হোসেন শাহ্ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা আস্‌রফ্ উল্-হোসেনি বোধ হয় মক্কার সেরিফ ছিলেন, সেই জন্য বোধহয় তিনিও উক্ত বংশগৌরবের দাবী করিতেন। আলোচ্য শিলা-লিপিতে আমরা হোসেন শাহের সেরিফ্ মেক্কি উপাধি পাইতেছি না ; সুতরাং রিয়াজের উক্তি সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।

হোসেন শাহ্ পাইকগণের সংখ্যা হ্রাস এবং বিশ্বাস ঘাতক কাফ্রি সৈন্যদিগকে কার্য্যচ্যুত করাতে তাহা-দিগের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই জন্য নিজকে নিরাপদ করিবার জন্য তিনি একডালা দুর্গে বাস করিতে আরম্ভ করেন। হোসেন শাহ্ই গৌড় অথবা পাণ্ডুয়া হইতে বঙ্গের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। একডালার স্থান নির্দ্দেশ লইয়া নানারূপ মতভেদ আছে, কিন্তু, আমরা সম্প্রতি এরূপ প্রমাণ পাইয়াছি যাহাতে নিঃসন্দেহরূপে উহার স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। শীঘ্রই প্রবন্ধান্তরে আমরা তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব, সুতরাং এ স্থানে উহা হইতে বিরত হইলাম। এ স্থানে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, লক্ষ্যা ও বানার নদীর সঙ্গমস্থলে যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, যাহা অদ্যাপি একডালার দুর্গ বলিয়া খ্যাত, ঐ স্থানেই প্রকৃত পক্ষে হোসেন শাহের একডালা দুর্গ অবস্থিত ছিল।

(১১) ধামরাই নিবাসী মৌলবী আবদুল রহমান এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

ধামরাইর পাঁচ পীড়—অন্ততঃ বড় পীড়—মক্কা হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত হোসেন শাহের সহিত আগমন করিয়া, তাঁহার রাজ্যলাভের পর,তদীয় রাজধানী একডালা হইতে অনতিদূরস্থ ধামরাই অঞ্চলে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে হোসেন শাহ্ প্রত্যেক জেলায় জেলায় মস্‌জিদ্ এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে বৃত্তি প্রদানের বন্দোবস্ত করেন। এস্থানে বলা আবশ্যক যে হোসেন শাহ্ শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক ছিলেন, তাঁহার প্রিয়শিষ্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী হোসেন শাহের অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। হোসেন শাহ অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, এবং প্রতিবৎসর পদব্রজে পাণ্ডুয়াতে নুর কুত্‌ব্ উল্-আলমের সমাধি দর্শনে গমন করিতেন। তাঁহার রাজত্ব কালে সেকন্দর লোদি ও ইব্রাহিম লোদি দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

ধামরাই অদ্যাপি 'পাঁচ পীড়ের দরগা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিদেশাগত পাঁচ জন দরবেশ ধামরাইতে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, এবং তাহা হইতেই এই নামের উৎপত্তি। প্রথমাগমনকালে ক্ষুধার্ত্ত দরবেশগণ মাঠে একটী হৃষ্টপুষ্ট বৃষকে চরিতে দেখেন; অন্য কোন খাদ্যের অভাবে অগত্যা তাঁহারা উহাকে বধ করিয়া উহার মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। ধামরাইতে 'বৈলতলা' নামক একটী স্থান অদ্যাপি প্রদর্শিত হয়; কিংবদন্তী এই, ঐস্থানেই বৃষটীকে হত্যা করা হইয়াছিল। বৃষটী ধামু নামক জনেক গোপের পালিত ছিল; সে উহার হত্যায় রুষ্ট হইয়া প্রতিবিধানার্থ দরবেশগণের নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু তাঁহাদের নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করে। পীড়গণও তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া ধামু ও তাহার স্ত্রী রাইর নামানুসারে উক্ত স্থানের নামকরণ করেন। তদবধি ঐ স্থান ধামরাই নামে খ্যাত।

বলা বাহুল্য গল্পটী গ্রাম্য ব্যক্তিগণের কল্পনাপ্রসূত। ধামরাই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। পাঁচ পীড়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহারা এই কৌতুকজনক গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু, পূর্ব্বে যে পাঁচ পীড়ের উল্লেখ করা হইল তাঁহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহাদের সকলের সমাধিই অদ্যাপি ধামরাই গ্রামে বর্ত্তমান। তাঁহারা যে বিশেষ রাজানুগৃহীত ছিলেন, বাদসাহ হোসেন শাহ কর্ত্তৃক বড় পীড়ের মসজিদ্ নির্ম্মাণ হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। নিম্নে পাঁচ পীড়ের নাম ও তাঁহাদের সমাধিস্থানের বর্ণনা প্রদত্ত হইল।—

(১) সুলতান-উলা-উলিয়া জনাব হজরৎ সৈয়দ শাহ্ মীর সৈয়দ আলি তেরমিজি হোসেনি-উল-হোসেনি কুদ্দিসল্-লাহ সির্‌রাহু। ইনি সাধারণতঃ বড় পীড় বলিয়া এতদঞ্চলে খ্যাত। [ইঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।]

(২) হজরৎ সৈয়দ শাহ্ মিব্‌তাহুদ্দিন তায়েফি; সাধারণতঃ হাজিসাহেব নামে খ্যাত।

(৩) হজরৎ সায়েফ মীর মহম্মদ মেসরি; সাধারণতঃ গাজি সাহেব নামে খ্যাত।

হাজি ও গাজি সাহেবের সমাধি ধামরাই বড়বাজারে অবস্থিত, এবং সমাধিদ্বয়ের উপরে একটী মসজিদ অদ্যাপি বর্ত্তমান। তদুপরি একখানি প্রস্তর লিপিতে লিখিত ছিল,—

"আলমারু হজরৎ শাহ্ হাজি গাজিসাহেব কুদ্দিসল্-লাহ এস্‌বাবুহমা ৯০০" (১২)

(৪) মীর মকদম।

(৫) জজি পীড়।

(১২) শিলালিপিখানা এখন স্বস্থানচ্যুত হইয়াছে। ধামরাইর মৌলবী আবদুল রহমান লেখককে অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহার নকল প্রদান করিয়াছেন।

এই দুই পীড়ের সমাধি ধামরাই মেছুয়াপাড়াতে অবস্থিত, কিন্তু, তাহাদের উপর কোন মস্‌জিদ্ নাই।

ধামরাইতে আমরা আরও দুইখানি শিলালিপি পরীক্ষা করিয়াছি। কিন্তু, পরবর্ত্তী কালের হওয়াতে তদ্বিষয়ে অতি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখমাত্র করা হইল। প্রথমখানা বড়পীড়ের মস্‌জিদের পার্শ্ববর্ত্তী একটী কবরে সংলগ্ন। উহার মর্ম্মার্থ এই যে, উক্ত কবর সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (যখন আলীবর্দ্দী খাঁ বঙ্গের সুবাদার ছিলেন) ১১৫৩ হিঃ অব্দে (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে) আবদুল রসুল নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। দ্বিতীয় শিলালিপিখানা পাঠানটোলার মুচি মিঞার বাটীস্থ একটী মস্‌জিদে সংলগ্ন; এবং উহার মর্ম্মার্থ এই যে, উক্ত মস্‌জিদ্ (দ্বিতীয়) আকবরের রাজত্বকালে ১২২৮ হিজরী অব্দে আজমের পুত্র খাজে মহম্মদ এনায়েৎ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

ধামরাইতে অর্দ্ধভগ্ন একটী অট্টালিকা দেখিলাম। অনুসন্ধানে জানা গেল যে উহা ফরাসীদিগের কুঠি ছিল। ফরাসীগণ ঐ স্থানে সূতার কারবার করিতেন এবং ধামরাইবাসী তন্তুবায়দিগকে সূতার দাদন দিতেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের লিখিত একখানি প্রাচীন দলিলেও ঐ অট্টালিকা ফরাসীদিগের সূতার কুঠি বলিয়া বর্ণিত আছে। বোধ হয় উহার অনতিকাল পরেই ফরাসীদের রাজ্যলোপের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কুঠি উঠিয়া যায়। ঐ কুঠি কোন সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই, তবে উহা দ্বিশতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়।

মোগল বাদ্‌সাহদিগের, বিশেষতঃ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ধামরাই একটী উল্লেখযোগ্য স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। যশোমাধবের খ্যাতি সেই সময় হইতেই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং বহুসংখ্যক যাত্রী সর্ব্বদা মাধব দর্শনে গমন করিত। সুদক্ষ সেবাইত রামজীবন মৌলিকের তত্ত্বাবধানে আওরঙ্গজেবের সময়ে মাধবের সেবাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত, এবং তাঁহার উদ্যোগেই স্থানীয় বহু ভূম্যধিকারী মাধবের সেবার জন্য বহু সম্পত্তি দান করেন। এমন কি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সরকার হইতেও এই সময়ে মাধবের সেবার জন্য বহু সম্পত্তি লাখেরাজ দেওয়া হয়; আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

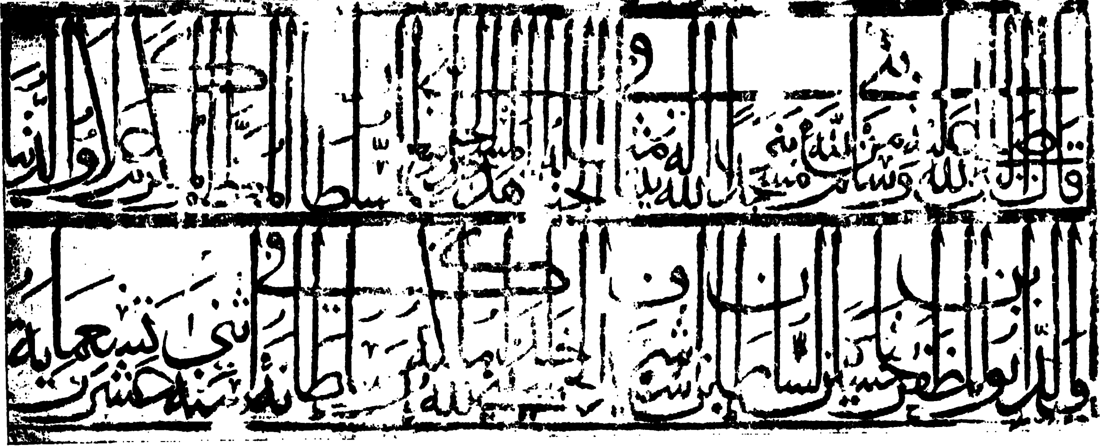
মোগল রাজত্বকালে ধামরাইতে খাদেম-এ সরা অথবা কাজিগণের কাচারী ছিল; তৎকালে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রায় আধুনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের তুল্য ছিল। তুজুম্মল আলি নামক ধামরাইর কাজিগণের জনৈক দরিদ্র বংশধর পাঠানটোলার সংলগ্ন মিল্‌কিটোলা পল্লীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার নিকট পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি-চিহ্নস্বরূপ পূর্ব্বতন কাজিগণের পাঁচখানা নিয়োগ-জ্ঞাপক সনদ ও নয়টী সিলমোহর অদ্যাপি রক্ষিত আছে। নিম্নে তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

নয়টীর মধ্যে একটী সিলমোহর ডিম্বাকার, এবং বাকী আটটী গোল। সমস্তগুলিই পূর্ব্বতন কাজিগণের এবং তাঁহাদের সহকারিগণের নাম সংযুক্ত। উহাদের লিপির পাঠ প্রদত্ত হইল (১৩)। [৯নং চিত্র দ্রষ্টব্য]।

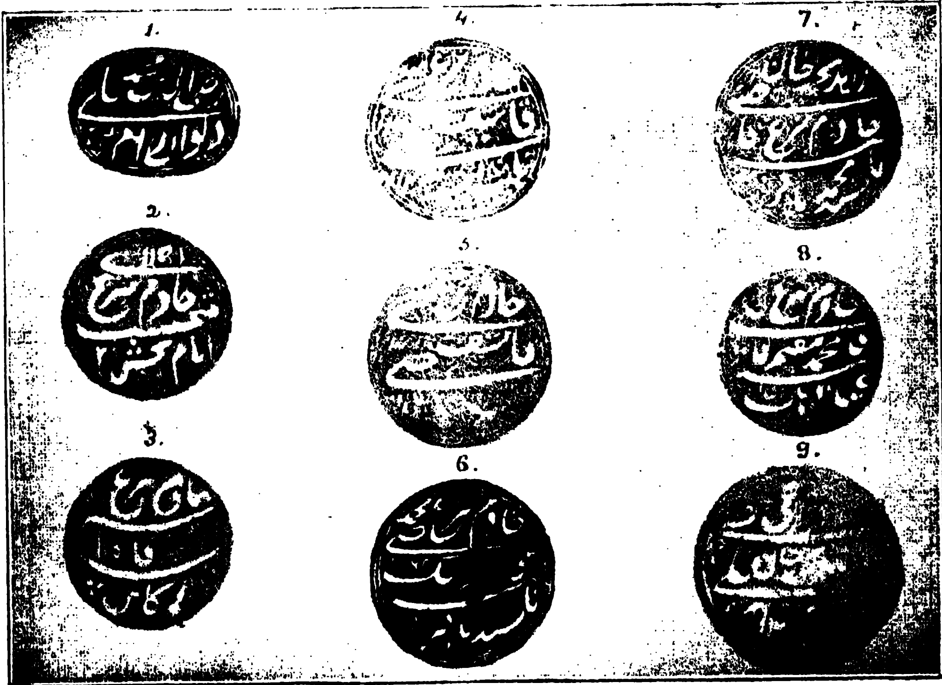
(১) রাজিউদ্দিন মহম্মদ দেওয়ান রাম খানে ২৪ [সম্ভবতঃ রাম নামক জনৈক হিন্দু এই কাজির দেওয়ান ছিলেন। 'খানে' শব্দের অর্থ 'ঠিকানা'।]

(২) ১১৫১ খাদেম-এ-সরা-নবি মোহতাসিব্ ইমাম বক্স্ ২১ ["খাদেম-এ-সরা-নবি" শব্দের অর্থ আচার্য্য (মহম্মদ) প্রবর্ত্তিত আইনের ভৃত্য। "মোহ্‌তাসিব" উচ্চ রাজকীয় কর্ম্মচারী। বাজারে যাহাতে উচিত মূল্যে এবং ঠিক ওজনে পণ্য দ্রব্যাদি

(১৩) খাঁ বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আওলাদ হোসেন সিলমোহর সমূহের লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।



(৮ নং) হোসেন শাহের প্রস্তর লিপি ।



(৯নং) ধামরাইর পুরাতন কাজীগণের সিল-মোহর ।

ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউস, ঢাকা ।

বিক্রয় হয়, তিনি তাহা পরিদর্শন করিতেন। তাঁহার ক্ষমতা আধুনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ছিল।]

৩। খাদেম-এ-সরা ৪৮ মহম্মদ কাসেম নায়েব মহম্মদ কামেল ১১১৫।

৪। খাদেম-এ-সরা নবি কাজি সায়েফউল্লা ১১৪৩ নায়েব-অ-হু মহম্মদ মতিন ১৩।

["নায়েব-অ-হু" শব্দের অর্থ 'এবং তাঁহার সহকারী'।]

৫। খাদেম-এ-সরা নবি কাজি সায়েফ উল্লা ১১৪৩ নায়েব-অ-হু আহাম্মদ ১৩।

৬। খাদেম-এ-সরা কাজি মহাম্মদ নজর বেগ ১১৬৫ নায়েব-অ-হু সৈয়দ বাকর ৫।

৭। খাদেম-এ-সরা কাজি জাহেদ মহম্মদ খাঁ নায়েব -অ-হু সৈয়দ মহম্মদ বাকর।

৮। খাদেম-এ-সরা কাজি মহম্মদ মোকিম নায়েব অ-হু আবদুল ওয়াহাব।

৯। খাদেম-এ-সরা কাজি জাহেদ মহম্মদ খাঁ নায়েব -অ-হু সেখ গোলাম আলি ৫।

[পূর্ব্বোক্ত লিপিসমূহে একক এবং দশম সংখ্যক সংখ্যাগুলি রাজত্বজ্ঞাপক বৎসর, এবং সহস্র সংখ্যক সংখ্যা গুলি হিজরী অব্দ।]

শ্রীযুক্ত সৈয়দ তুজুম্মল আলির নিকট পূর্ব্বতন কাজিগণের নিয়োগজ্ঞাপক ৫ খানা সনদ রক্ষিত আছে। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত উহার একখানার প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল, বাকী ৪ খানার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইল। (১৪) সমস্তগুলির মর্ম্মই প্রায় এক প্রকার, সুতরাং, প্রকাশিত দলিলখানা হইতেই সমস্তগুলির মর্ম্মার্থ পাঠকবর্গের বোধগম্য হইবে।

১। প্রথম সনদের ফার্সি পাঠের অনুলিপি [১০ নং চিত্র দ্রষ্টব্য।]

উদ্ধৃত সনদখানা ধামরাইর নায়েব কাজি সৈয়দ মহম্মদ বাকরের নিয়োগপত্র। ইহাতে কাজি জাহেদ মহম্মদ খাঁর সিলমোহর অঙ্কিত আছে। তারিখ ২রা রজব, রাজকীয় ৩ সন। উপরে প্রকাশিত ৭নং সিলমোহরে কাজি জাহেদ মহম্মদ খাঁ এবং তাঁহার নায়েব সৈয়দ মহম্মদ বাকরের নাম অঙ্কিত আছে।

(২) দ্বিতীয় সনদ দ্বারা সৈয়দ মহম্মদ বাকরকে ধামরাইর এবং খুর্দ্ ধামরাইর নায়েব কাজি নিযুক্ত করা হইয়াছে। সনদে কাজি জাহেদ মহম্মদ খাঁর সিল মোহর অঙ্কিত আছে, এবং উহার তারিখ ২রা রজব, রাজকীয় ৩ সন।

(৩) তৃতীয়খানা জাহাঙ্গিরনগর চাকলাতে যে কোন নায়েব মোহ্তাসিব নিযুক্ত হইবেন, তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ধামরাইর নায়েব কাজি সৈয়দ মহম্মদ বাকরের একরার পত্র।

(৪) চতুর্থ সনদ মহম্মদ হামিদের পুত্র মহম্মদ মামুদের ধামরাইর এবং খুর্দ্ ধামরাইর নায়েব কাজি রূপে নিয়োগপত্র। সনদে কাজি ওয়াজিহুদ্দিন আহ্-ম্মদের সিলমোহর অঙ্কিত আছে। তারিখ ২রা সফর রাজকীয় ১৩ বৎসর।

(৫) পঞ্চম সনদ সৈয়দ মহম্মদ ফকরের কাশীমপুরের নায়েব কাজি রূপে নিয়োগপত্র। সনদে কাজি মহম্মদ হামেদের সিলমোহর অঙ্কিত আছে। তারিখ রজব মাসের প্রথম ভাগ।

এই সমস্ত নিয়োগপত্র এবং সিলমোহর হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মোগল সম্রাটগণের সময়ে ধামরাই এবং কাশীমপুরে নায়েবকাজিগণের কাচারী ছিল। কাজিগণের ক্ষমতা প্রভৃতির একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রধান কাজিকে "সদরস্ সদুর" বলা হইত, এবং তাঁহার আদালত "মহকুমে কাজা" রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত

(১৪) ঢাকার মৌলবী এলাহ্ নেওয়াজ খাঁ সনদগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

থাকিত। এই আদালতে মুসলমান ধর্ম্ম ও মুসলমানী বিষয়াধিকার সম্বন্ধে চূরান্ত নিষ্পত্তি হইত। পূর্ব্বে এই কাজির আদালতে হিন্দুর ফৌজদারী বিচারও নিষ্পত্তি হইত, কিন্তু, অনেক সময়ে কাজিগণের ধর্ম্মান্ধতায় হিন্দুগণের উপর অন্যায় উৎপীড়ন হয় দেখিয়া নবাব মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ ঐ ক্ষমতা নিজামৎ আদালত এবং আদালৎ ফৌজদারীর উপর ন্যস্ত করেন।

"সদরস্ সদুরের" অধীনে একজন কাজির উপর পূর্ব্ববঙ্গের ভার ন্যস্ত ছিল, এবং "দার-উল্-কাজা" নামক তাঁহার আদালত ঢাকাতে স্থাপিত ছিল। তাঁহার অধীনস্থ নায়েবকাজিগণের উপর বিভিন্ন জেলার ভার ন্যস্ত ছিল। ধামরাই এইরূপ একজন নায়েবকাজির অধীনস্থ জেলা ছিল।

"মুসলমানগণের বিবাহ সম্বন্ধীয় মোকর্দ্দমা, নিরুদ্দেশ লোকের বিষয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা, অসিয়ৎ (উইল), উত্তরাধিকার, তৌলিয়ৎ (trustee—ন্যাসরক্ষী) প্রভৃতি ও সর্ব্বপ্রকার লোকের বিষয় ক্রয়বিক্রয়, স্থিতাবন্ধ, কট্‌কোবালা (বয়বিল্ ওফা), মুসালেহা (মীমাংসা নিষ্পত্তি), এব্‌রা (নাদাবিনামা), ইজারা, হেবা (দান), ইত্যাদি বিষয়ের বিচার ভার কাজির হস্তে ন্যস্ত ছিল। কাজির কার্য্যপ্রণালী নিজামৎ আদালতেরই মত; পার্থক্যের মধ্যে এই, এখানে জমিদারের বা অন্য কাহারও উকীল উপস্থিত থাকিতেন না। কাজি স্বাধীনভাবে বিচার করিতেন; কচিৎ নাজিমের নিকট আদেশ জন্য প্রেরিত হইত। দস্তকগুলিতে কাজির মোহর থাকিত। মফঃস্বলের কোন মোকর্দ্দমা সহরের কাজির আদালতে, উপস্থিত হইলে তাহার সুবিচারের জন্য তত্তৎ স্থানের ফৌজদার বা কাজির মতামত অবগত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল।" (১৫)

বৌদ্ধ এবং মুসলমান যুগে ধামরাই একটী বিখ্যাত স্থান ছিল বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা প্রমাণিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। অধুনা শ্রীশ্রীযশোমাধব ও প্রসিদ্ধ বয়নশিল্প ব্যতীত ধামরাইর গৌরবের কিছুই নাই। অদ্যাপি ইহা একটী সমৃদ্ধ জনপদ, এবং এখানে বহুলোকের বাস। ধামরাই এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে এখনও অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্নাদি লুপ্তপ্রায় অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে আরও অনেক মূল্যবান সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।

(১৫) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল।" ৪৭৭, ৭৮ পৃষ্ঠা।

বিদায়কালে

(Rossetti)

১

আমার যখন মৃত্যু হবে, ও গো আমার প্রিয়তম !
করুণ সুরে বিষাদ-গাথা গেয়ো না ;
আমার সুপ্ত শিয়র দেশে জন্মায়ো না গোলাপবন,
ছায়ানিবিড় কুঞ্জবনে ঢেকো না ;
থাক্‌বে আমার বক্ষপরে শ্যামল কোমল শষ্পাসন,
বৃষ্টিধারে শিশিরপাতে ভিজিয়া,
যদি আমায় মর্ম্মে জাগে—রেখো আমায় মর্ম্মে গো,
নয় তো ধীরে যেয়ো মোরে ভুলিয়া।

২

আমার দেহে ঝরবে না কো ঝর্ঝরিয়া বর্ষাজল,
দেখ্‌ব নাকো কুঞ্জশোভা চাহিয়া,
আমি কভু শুন্‌ব নাগো উচ্ছ্বসিত বেদনায়
পাপিয়া সে উঠ্‌বে যবে গাহিয়া ;—
আমায় ঘিরে থাক্‌বে শুধু অন্তহারা অন্ধকার—
স্বপ্নঘোরে রাখ্‌বে মোরে ঘিরিয়া,
হয়ত তোমায় জাগ্‌বে মনে—রাখ্‌ব তোমায় মর্ম্মে গো
হয়ে তো আমি যাব তোমায় ভুলিয়া।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

চিল

বঙ্গদেশীয় শিকারী পক্ষিকুলের মধ্যে চিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহারা হিংস্র প্রাণী। বলিতে গেলে চিল শার্দ্দুল জাতীয় বিহঙ্গম।

আমরা সচরাচর চারি জাতীয় চিল দেখিতে পাই। চিল নামীয় হইলেও দুই জাতীয় চিল দৈহিক গঠন এবং প্রকৃতিতে অনেকটা পৃথক। মোটের উপর আমরা দুই শ্রেণীর চিলই আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইব। ইহাদের একটীর নাম "গোদাচিল", "ডোমচিল", বা "চাঁড়ালে চিল", আর দ্বিতীয় প্রকারের চিল "শঙ্কর চিল", বা "বামুন চিল"।

(১) গোদা চিল

ইহাদের চক্ষু ও ঠোঁট বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঠোঁট বক্র এবং অগ্রভাগও বড়শীর মত বাঁকানো। ঠোঁটের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, দৃঢ়, এবং পার্শ্বও ধারাল। ঠোঁটের মূল হইতে কপালটী ক্রমে একটু বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু চক্ষুর নিম্নভাগ ঈষদুন্নত বিধায় উভয় চক্ষুর দৃষ্টি ঠিক সম্মুখে একত্র হইতে পারে। ইহার ফলে চিল অব্যর্থ সন্ধানে শিকারের উপর পতিত হয়। চক্ষুর্দ্বয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন এবং বেশ বড়। অতিশয় দ্রুত গতিতে মস্তকসঞ্চালন করিয়া ইহারা লক্ষ্যান্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকে।

গোদা চিলের গায়ের পালকের বর্ণ পাতলা কালো রঙ্গের সহিত গাঢ় পিঙ্গলের মিশ্রণে উৎপন্ন এক প্রকার মিশ্র রং। ডানার রঙ্গ অপেক্ষাকৃত গাঢ়। পেটের বর্ণ ঈষৎ পাতলা। গোদা চিল ২২—২৫ ইঞ্চি লম্বা দেখা দেখা গিয়াছে। ইহাদের ডানাও প্রায় ১৬—১৮ ইঞ্চি। গোদা চিলের ডানা খুব শক্ত এবং কষ্টসহিষ্ণু। আমাদের দেশে প্রায় কোনও পাখীই ইহাদের মত অধিক সময় আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না। শকুন, কোড়াল ও চিলই বোধ হয় ঊর্দ্ধগগণবিহারী বিহঙ্গম। এক মাইলেরও বেশী দূর হইতে ইহারা খাদ্য সামগ্রীর সন্ধান পায়।

গোদা চিলের পা দুটী খুব মজবুত। নখগুলি তীক্ষ্ণধার, শক্ত এবং বাঘের নখের অনুকরণে গঠিত। আঙ্গুলের পর্ব্ব সাধারণতঃ তিনটী, কিন্তু প্রত্যেকটি আঙ্গুলই অনায়াসে বাঁকিয়া থাকিতে পারে। এই জন্যই

ইহারা সহজে সরু শাখায় বসিবার এবং শিকার ধরিবার পক্ষে সুবিধা প্রাপ্ত হয়। ইহাদের হাঁটু পর্য্যন্ত লোমে আবৃত। জানুতে প্রচুর শক্তি আছে। শিকার ধরিতে চিল প্রথমে ঠোঁট অপেক্ষা নখের সাহায্যই অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়।

ইহারা উড়িবার সময় কিম্বা বসিয়া শিকারের দিকে লক্ষ্য করে এবং তীরের মত তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া যায়। নখ তীক্ষ্ণধার এবং বক্র হওয়াতে অতি সহজেই শিকারের দেহে বিদ্ধ হয় এবং শিকার আটক পড়ে। একবার নখ বিদ্ধ হইলে বাহির করা একটু কষ্টসাধ্যই বটে।

গোদাচিল খুব সাহসী। মানুষকেও বড় বেশী ভয় করিতে ইচ্ছা নাই। অনেক সময়ই মানুষের হাত হইতে মাছ বা অন্য ভক্ষ্য দ্রব্য কাড়িয়া লইয়া যায়। সময় সময় তাহার ফলে মানুষের গায়ে আঁচড় লাগিয়া গভীর ক্ষত হয়। পুকুরের ছোট ছোট মাছ, বেঙ, গৃহস্থের হাঁস, কপোত বা মুরগীর ছানা গোদা চিলের বিশেষ প্রিয় খাদ্য। গোদাচিলের উপদ্রবে গৃহস্থ সর্ব্বদাই গৃহপালিত নিরীহ পক্ষীগুলিকে লইয়া বিব্রত হয়। ইঁদুর বা ছোট সাপও ইহারা ভক্ষণ করে।

ইহারা উচ্চ কাঁঠাল, আম, নারিকেল তাল প্রভৃতি বৃক্ষে বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহাদের বাসার অন্ততঃ ১৫।২০ হাতের মধ্যেও অপর বৃক্ষে আরোহণ করা নিরাপদ নয়। অনেক সময় তাহাতে বিপন্নই হইতে হয়। আজ কয়েক বৎসর আমাদের বাড়ীতে এক জোড়া গোদা চিল, এক জোড়া শঙ্খ চিল এবং দুই জোড়া কাক বাসা লইয়াছে। সখের খাতিরে বাসা ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু ইহাদের ব্যবহার এমনই উৎকট যে, শুনিলে অনেক পাঠকের মনে করুণ রসের সঞ্চার হইবে।

খড় কুটা ছোট ডাল প্রভৃতি দিয়া চিল বাসা নির্ম্মাণ করে। মধ্যস্থলে গাছের পাতা, ধানের খড় ইত্যাদি বিছাইয়া লয়, এবং তদুপরি একজোড়া ডিম পাড়ে। কখন কখন তিনটী ডিম পাড়িতেও দেখা যায়। ডিম গুলি প্রায় মুরগীর ডিমের মত বড়, রং ঈষৎ নীলাভ সাদা।

চিল দম্পতী ৺শারদীয় পূজার ছুটিতেই আপনাদের গৃহস্থালী সাজাইবার যোগাড়ে লাগিয়া যায়। পূর্ব্ব-বৎসরের জায়গাটা পছন্দ হইলে সেখানেই স্বত্ব সাব্যস্ত করে। কার্ত্তিক মাসের শেষভাগেই খড়কুটা সংগ্রহ করিতে থাকে এবং অগ্রহায়ণ মাসে বাসা নির্ম্মাণ শেষ হয়। পৌষ মাসে ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। স্ত্রী-চিল তিন মাসাধিক কাল গর্ভধারণ করে। ডিম্ব প্রসবের পরে প্রায় পনর দিন ডিমে তা দিতে হয়। অতঃপর এক উদর, চক্ষু, চঞ্চু সর্ব্বস্ব জীবের আবির্ভাব হয়। ইহার সর্ব্বাঙ্গ কোমল পালকে ঢাকা। ক্ষুদ্র দুইটী ডানার চিহ্ন থাকে, চরণের অবস্থাও তদ্রূপ। ফাল্গুনের শেষ বা চৈত্রের মাঝামাঝি চিলশাবক উড়িতে শিখে এবং বৈশাখ মাসে স্বাধীন ভাবে শিকার করিতে যায়। এই সময় হইতেই মাতাপিতার সংস্রব পরিত্যাগ করে।

যদি কখন রাজার পুণ্যে মাঘের শেষে বর্ষণ হয়, তবে চিল পাখা বিস্তার করিয়া শাবককে ঢাকিয়া রাখে। শীতাতপ হইতে চিলের সন্তানপালন বড়ই শিক্ষাপ্রদ।

জঠরজ্বালায় বা অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইলে কখন কখন পুরুষ-চিল আপন ছানার মাংসে উদর পরিতোষ করে। এইজন্যই দেখা যায় ডিম ফুটিলে স্ত্রী-চিল বাসা ছাড়িয়া কদাচিৎ বাহির হয়। পুরুষগুলি সর্ব্বদা আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়।

চিলের পুচ্ছ তাহার শিকার-সন্ধান, দ্রুত গতিপরি-পরিবর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্যের প্রধান সহায়। নৌকার হাল আর পাখীর পুচ্ছ একই কার্য্য নির্ব্বাহ করে। চিলের পুচ্ছ বিস্তৃত বা সংকুচিত করা তাহাদের অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। চিলের ডানা সোজা নহে,

ঈষৎ বক্র। ইহাতে শিকারের উপর পড়িবার সাহায্য হয়।

চিল কত দিন বাঁচে নির্ণয় করিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ ইহারা ৫০ বৎসরের বেশী বাঁচে। নৈসর্গিক কারণ ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত চিলদেহ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। জনৈক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি, তাহাদের তাল গাছে একজোড়া চিল অনেক দিন ধরিয়া (৩০বৎসরেরও বেশী সময়) বাস করিতেছে।

এ দেশে চিলের অভাব নাই, সর্ব্বত্রই ইহার প্রাচুর্য্য। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে বা মাছের আড্ডায় চিলের খুব আমদানী। ঝাঁকায় করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছ লইয়া গেলে চিলের দুষ্টামি দেখা যায়। উপরে হয় ত একখানা লাঠি ঘুরান হইতেছে, কতিপয় চিলও উপরে ঘুরিতেছে। একটা হঠাৎ ছোঁ মারিয়া অনেকগুলি মাছ মাটিতে ছিটাইয়া ফেলিল, আর পলকের ভিতর অন্যান্য চিলগুলি সেই মাছ ছোঁ মারিয়া উঠাইয়া লইয়া গেল।

চিলের মায়াকান্না ধরণের রাগিণী সকলেরই পরিচিত। এই অবস্থার ডাকে চিল যদি "গায়ক পাখীর" শ্রেণীতে স্থান পায়, আমার আপত্তি নাই।

(২)শঙ্কর চিল বা বামুন চিল

শঙ্কর বা বামুনের সম্পর্ক থাকার দরুণ, অথবা শরীরে অপেক্ষাকৃত কম শক্তি থাকার দরুণই হউক, এই জাতীয় চিল একটু ভদ্র ; অর্থাৎ গোদা চিল অপেক্ষা ইহারা অনেক কম অত্যাচার করিয়া থাকে।

শঙ্কর চিলের মাথা, গলা, বুক ও পেটের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সাদা, অবশিষ্টাংশ পাটকিলে লাল। গলার লোম একটু লম্বা এবং দূর হইতে কেশরের মত দেখায়। (দুই বর্ণের বলিয়া কি ইহদিগকে শঙ্কর চিল বলা হয় ?)

শিকার ধরিতে শঙ্কর চিল গোদা চিল অপেক্ষা কম ক্ষিপ্রকারিতায় পরিচয় দেয় না। তবে ইহারা মানুষকে ভয় পায়। কিন্তু সুবিধা বুঝিলে মানুষের হাত হইতেও মাছ বা খাবারের ঠোঙ্গা লইয়া যাইতে কসুর করে না।

এই জাতীয় চিল গোদা চিল অপেক্ষা ২।৩ ইঞ্চি ছোট, ইহাদের দৈহিক গঠনও তেমন বলিষ্ঠ নহে। ইহারাও হাঁসের ছানা, মুরগির ছানা, কিম্বা পারাবতের ছানা প্রভৃতির যম। ইহারাও ফাল্গুন মাসে একজোড়া ডিম পাড়ে। ডিম গোদাচিলের ডিম অপেক্ষা ছোট; রং প্রায় একই রকম।

অন্যান্য বিষয়ে উভয় চিলের প্রায় সৌসাদৃশ্য আছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বসন্ত-ব্যথা

বসন্ত এসেছে ফিরে আসেনি হৃদয়-রাণী,
সাজে নি মধুর সাজে আমার ধরণীখানি!
আমার দুয়ারে আজ কোকিল কাঁদিয়া মরে,
মাতে না পরাণ আর আকুল আবেগ-ভরে!
বৃথায় বাগান মোর ছেয়ে গেছে ফুলে ফুলে,
মধুময় ফুল-মালা কেহ ত গাঁথে না ভুলে!
বৃথায় মলয় আজি মৃদু মৃদু বয়ে যায়,
কাঁপে না আঁচল কারো, নাচে না চিকুর হায়!
কেবলি বিফলে আসে এমন জ্যোছনা-রাতি,
আঁধার ঘরের কোণে বারেক জ্বলে না বাতি!
থেমে গেছে হাসি-গান, ভুলে গেছি সাধ-আসা,
হাহাকার করে শুধু বুক ভরা ভালবাসা!
সকল সুষমা মাঝে যে দিবে চেতনা দান,
তাহারি অভাবে আজি সব-কিছু পরিম্লান!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

শ্রীহট্টের রঘুনাথ ও বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি

প্রথম প্রস্তাব

আজ চারিশত বৎসরের অধিক হইল, একটি পিতৃহীন দরিদ্র বালক সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া নিজ প্রতিভার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই মহাত্মা ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক নবদ্বীপ নিবাসী রঘুনাথ শিরোমণি। প্রতিকূল সাংসারিক অবস্থায় প্রতিভার আত্মপ্রতিষ্ঠা বড়ই দুরূহ ব্যাপার; সুতরাং উক্ত মহাপুরুষের জীবনের আলোচনা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহাতে বহু নৈরাশ্যপূর্ণ নবীন হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতে পারে।

রঘুনাথ শ্রীশ্রীচৈতন্য ও বঙ্গাধিপ হুসেন শাহের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন।

রঘুনাথের সমসাময়িকগণ। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। আর হুসেন শাহ ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। রঘুনাথ সম্বন্ধে অপর একটি কথা এই যে তিনি নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট এবং মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সমুদায় হইতে নিঃসন্দেহে জানিতে পারা যায় যে, রঘুনাথ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

রঘুনাথ নিজজীবনী সম্বন্ধে কোনও বিবরণী রাখিয়া যান নাই। তিনি নিজ প্রতিভার

রঘুনাথ জীবনীর উপাদান। নিদর্শনস্বরূপ "দীধিতি" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থমাত্র দেশবাসীকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এবং বঙ্গের চতুষ্পাঠি-সমূহে রঘুনাথ-সংশ্লিষ্ট অনেক ইতিকথা প্রচারিত আছে। এতদ্ব্যতীত বিগত দশ বৎসর মধ্যে রঘুনাথের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা শ্রীহট্ট হইতে প্রচারিত হইয়াছে। "রঘুনাথ জীবনী" প্রসঙ্গে আমরা এই সমুদয় আলোচনা করিব।

আধুনিক মত আলোচনা—শ্রীহট্টের রঘুনাথ

আমরা প্রথমেই শ্রীহট্ট হইতে উত্থাপিত ও আধুনিক মত-সমূহের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপবাসী বলিয়াই সাধারণ্যে পরিচিত। কিন্তু আজ দশ বার বৎসর যাবৎ শ্রীহট্টবাসী কতিপয় ব্যক্তি সংবাদপত্রে প্রচার করিতেছেন যে রঘুনাথের জন্মভূমি শ্রীহট্ট। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া শ্রীহট্টই যে রঘুনাথের প্রকৃত জন্মভূমি বঙ্গবাসীকে ইহা ভুলিবার অবসর দিতেছেন না। তাঁহাদের আলোচনার ভাবে মনে হয় যে শ্রীহট্ট যে রঘুনাথের জন্মভূমি তাহা এক প্রকার নির্দ্ধারিত সত্য। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পক্ষে প্রমাণাবলী এখনও পাওয়া যায় নাই। বরং ইহার বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। আমরা এই আপত্তিগুলির আলোচনা করিব।

প্রথমে দেখা যাউক, শ্রীহট্ট হইতে যে ব্যক্তিকে নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণির সহিত একীকরণের চেষ্টা হইতেছে, তিনি কোন্ বংশ সম্ভূত, শ্রীহট্টের কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, এবং কি উপায়ে তাঁহার সময় নির্দ্ধারিত হইতে পারে। ‡ বাস্তবিকই শ্রীহট্টের রঘুনাথ কালক্রমে বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, অথবা তিনি বঙ্গীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, রঘুনাথ নামধেয় অপর ব্যক্তি, এই আলোচনায় তাহাও স্থির হইবে। শ্রীহট্টে রঘুনাথের জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে যে মত

প্রচারিত হইয়াছে আলোচনার সৌকর্য্যার্থ আমরা প্রথমে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত লিখিত সুবিদ নারায়ণ ও তৎকুটুম্ব রঘুনাথ বিবরণ।

রঘুনাথ সম্বন্ধে আলোচনায় 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়, ১৩১১ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসোক্ত বিবরণের (১৮৭-১৯০ পৃঃ) অনুকরণ করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধটী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের স্বরচিত, এবং জাতীয় ইতিহাসের মত * লেখকের নিজ মতের পরিপোষক। নিম্নে জাতীয় ইতিহাস প্রদত্ত বিবরণ উদ্ধৃত হইল——"যখন দিল্লীর সিংহাসন লইয়া হুমায়ুন ও শেরসাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, তখন শ্রীহট্টে ইটার সুবিদনারায়ণ স্বাধীন ভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। রাজা সুবিদ নারায়ণের চারিটি পুত্র ও তিনটি কন্যা ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যা খঞ্জ ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল রত্নাবতী। রাজা কাত্যায়ন গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রঘুপতিকে কৌশলে বশীভূত করিয়া তাঁহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। উক্ত বিবাহে 'কৌশলে বশীভূত করিয়া" লেখার তাৎপর্য্য এই যে (৬৪১ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরা রাজার নিকট দানগ্রহণের পর হইতে কাত্যায়নাদি পঞ্চগোত্রীয়গণ বৎস প্রভৃতি পঞ্চগোত্রীয়দিগকে প্রতিগ্রাহী বলিয়া ঘৃণিত মনে করিয়া তাঁহাদের সহিত আদানপ্রদান রহিত করেন। পরন্তু সাধারণের নিকট ও সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে শেষোক্ত পঞ্চগোত্রীয়গণই অপেক্ষাকৃত সম্মানিত। এই কারণেই সুবিদ নৃপতির কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তিনি যে বিশেষ কোনও ফল পাইয়াছিলেন মনে হয় না। কেন না এই বিবাহের পর তাঁহার জামাতা রঘুপতির আত্মীয় কুটুম্ব এমন কি তাঁহার ১১শ বর্ষীয় ভ্রাতা পর্য্যন্ত তাঁহাকে (কুলগৌরবধ্বংসকারী বলিয়া) ত্যাগ করেন। রঘুপতির সেই ভ্রাতাই ভারতবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি।

এই বিবাহে রঘুনাথের মনে আত্মগ্লানি হওয়ায় এবং সমাজে অহরহঃ ভ্রাতার নিন্দাবাদ শ্রবণে তিনি ও তাঁহার মাতা রঘুপতির সংস্রব এমন কি স্বীয় জন্মভূমি পর্য্যন্ত ত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া নবদ্বীপাভিমুখে গমন করেন।" (১৮৬-৭ পৃঃ—জাতীয় ইতিহাস) ১৮৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা † হইতে দৃষ্ট হইবে যে নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পুর্ব্বে তিনি পঞ্চখণ্ডে বিদ্যাভ্যাস করেন।

জাতীয় ইতিহাস ২২১ পৃষ্ঠায়, আধুনিক কুলগ্রন্থ বৈদিক সংবাদিনী হইতেও যৎকিঞ্চিৎ স্থান পাইয়াছে। রঘুনাথের প্রাদুর্ভাব-কাল আলোচনায় সাহায্য হইবে বলিয়া নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল——"ততো নিধিপতির্ণাম বিপ্রবরস্য বংশাবতার সুবিদ্যনারায়ণ নামা কশ্চিদ্বিপ্রবরঃ পৈতৃকগৃহীত ভুমিমুর্ব্বরাং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ। প্রাগুক্ত ধর্ম্মপাল মহারাজবংশীয়তঃ কস্মাদতিমহীপালতঃ সচ্ছন্দতঃ স্বাধিকারার্থং স্বকীয়াশেষসদ্‌গুণাদিবলেন মহারাজেত্যুপাধিং লব্ধঃ। সুবিদ্যনারায়ণ নৃপতে-

* এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে রঘুপতি বংশীয় শ্রীযুক্ত রামকমল শাস্ত্রী মহাশয় এবং উক্ত বংশের শিষ্য শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর দাস উকিল মহাশয় জাতীয় ইতিহাস প্রদত্ত বিবরণ শ্রীহট্ট হইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।—লেখক।

† জাতীয় ইতিহাস ১৮৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা——

"প্রসিদ্ধি আছে, পঞ্চখণ্ডে অবস্থানকালে পঞ্চম বর্ষ বয়সে নিজগ্রামস্থ শিবরাম তর্ক সিদ্ধান্তের টোলে অধ্যায়নার্থ প্রেরিত হইয়া দুই দিবসে স্বরবর্ণের পরিচয় ও অভ্যাস হওয়ার ও ব্যঞ্জন বর্ণ পরিচয়কালে, রঘুনাথ অধ্যাপককে প্রশ্ন করেন যে, 'ক' 'খ' ইত্যাদি ক্রমে না পড়িয়া 'খ' 'ক' 'জ' 'ট' ইত্যাদি ক্রমে পড়িলে কি দোষ হয়; আর দুইটী 'ন' তিনটী 'শ' ও দুইটী 'ব' কেন?"।

দ্বিতীয়া ভানুমতি নাম্নী পদ্মিনী কন্যাতিসুন্দরী বয়োগুণসম্পন্না চাসীৎ। অথৈকদা মুরসিদাবাদ নগরীয় নবাব কস্য রাজ্যপরিদর্শকঃ মৌলবী ওস্‌মান খাঁ নামকঃ কশ্চিৎ সেনাপতিরাগত্যাত্র দেশে তামুত্তমাং কন্যাং দৃষ্ট্বা তস্মৈ নবাবকপুত্রায় যুবরাজায়োক্তবান্ ।...তদা নিরুপায়মালোক্য স রাজা তস্য কন্যাপি ধর্ম্মনাশভয়াৎ স্বেচ্ছাতঃ কেনচিদুপায়েন প্রাণান্ তত্যাজ।"

এতদ্‌ব্যতীত, নূতন কথার মধ্যে 'ইতিবৃত্ত' লেখক বলেন—

১। "যখন দিল্লী সিংহাসনে বেহলুল লোদী অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ পরাক্রমে দিল্লীর প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিয়াছিলেন, সুবিদ নারায়ণ সেই সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন।"—শ্রীঃ ইঃ, ২ভাঃ ২য় খণ্ড

২। তৎকালে রাজা ও রাজকল্প ব্যক্তিগণের ভ্রমণকালেও তাম্বুল (১৩৪ পৃঃ) ও তাম্রকুট সেবন করিবার রীতি দেখা যাইত।" (১৩৭ পৃঃ)—ঐ

"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" ও "জাতীয় ইতিহাস" প্রভৃতিতে বর্ণিত উল্লিখিত বৃত্তান্তের আলোচনা দ্বারা আমরা প্রমাণ করিব যে,

(১) রঘুনাথের শ্রীহট্ট ত্যাগের কারণরূপে কল্পিত সুবিদ নারায়ণের সম্পর্কহেতু প্রতিগ্রাহিত্ব অপবাদ যথার্থ নহে।

(২) সুবিদনারায়ণের কাল বিচার করিয়া দেখিলে, শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক সমাজের বাৎস্য বা কৃষ্ণাত্রেয় রঘুনাথ ও বঙ্গের নৈয়ায়িক রঘুনাথ এক ব্যক্তি হইতে পারেন না।

(১) জাতীয় ইতিহাস বর্ণিত প্রতিগ্রাহী অপবাদ—

কাত্যায়ন রঘুপতি বাৎস্য রাজকন্যা রত্নাবতীকে বিবাহ করাতে তাঁহার জননী ও শিশুভ্রাতা রঘুনাথ তাঁহাকে কুল গৌরবধ্বংসকারী জানে তাহার সংস্রব এমন কি দেশ ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ গমন করেন, এইরূপ জাতীয় ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে, অধিকন্তু 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সমর্থিত হইয়াছে। এইরূপ কাহিনী অপ্রকৃত কি না আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব।

এই আখ্যানের বিরুদ্ধে আমরা নিম্নে কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি।

১। উক্ত আখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে যে ৬৪১ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা-রাজ পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণকে শ্রীহট্টের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু পঞ্চখণ্ডে প্রাপ্ত নবাবিষ্কৃত ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, উক্ত সময়ে পঞ্চখণ্ড প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভাস্করবর্ম্মার অধীনে ছিল। *

২। উপরোক্ত আখ্যানে দেখিতে পাই যে কাত্যায়নাদি পঞ্চগোত্রীয় অর্থাৎ কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগল্য, স্বর্ণ কৌশিক, ও গৌতম, এবং বৎসাদি পঞ্চ গোত্রীয় অর্থাৎ বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় এবং পরাশর, ব্রাহ্মণগণ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে একত্র আসিবার এক বৎসর অতিবাহিত না হইতেই শ্রীহট্টে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু এই দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কয়েক শাখা যে অত্যন্ত আধুনিক, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।—

(ক) প্রথমতঃ আমরা জানি এবং উপরোক্ত এই মতের প্রস্তাবকগণও স্বীকার করেন যে, এই দশ গোত্রের অন্তর্গত বাৎস্য গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা নিধিপতি, রাজা সুবিদ নারায়ণের উর্দ্ধতন দশম পুরুষের ব্যক্তি। এই আখ্যানকারীগণের মতানুসারে সুবিদনারায়ণকে যদি পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াও ধরা যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে

---

* প্রদত্ত ভূমির এক সীমা, ব্যবহারী "খাসোকের পুষ্করিণী',। "গঙ্গিনিকা" উক্ত ভূমির অপর এক সীমা। খাসা গ্রামের অতি প্রাচীন দীঘীর তীরে দীঘীর পাড় অবস্থিত। খাসা গ্রাম পঞ্চখণ্ড টীলা ভূমির প্রান্তে অবস্থিত। "মরা গাঙ্গ" এইস্থান হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। এই সমস্ত নিকটবর্ত্তী আধুনিক স্থানের উল্লেখ হইতে বুঝা যাইবে যে তাম্রশাসনখানি পঞ্চখণ্ড সংশ্লিষ্ট। ভিন্ন দেশ হইতে তথায় আনীত, এরূপ মত ঠিক নহে।

হইবে যে ৬৪১ খৃষ্টাব্দের বহুশত বৎসর পরে নিধিপতি বাৎস্য শ্রীহট্টে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

(খ) দ্বিতীয়তঃ শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সমাজে সকলেই অবগত আছেন যে, এই দশ গোত্রের মধ্যে একাধিক গোত্রের খ্যাতি নিতান্ত আধুনিকতা জ্ঞাপক। এস্থলে ইহাদের উল্লেখ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বোধে পরিত্যক্ত হইল। এই দশ গোত্রের অন্যতম ঢাকা দক্ষিণ দত্তরালীর বৎস্য গোত্রে * শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া শ্রীহট্টে প্রসিদ্ধি †। ঐতিহাসিকগণের মতে শ্রীচৈতন্যের প্রপিতামহ মধুকর মিশ্র ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা হইতে শ্রীহট্টে আসিয়া বসবাস করেন। ইহা যদি সত্য হয়, তবে ঢাকা দক্ষিণ দত্তরালীর বৎস্যগোত্র এবং তাঁহাদের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচিত, বুড়ঙ্গার বৎস্যগণ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা যজ্ঞোপলক্ষে শ্রীহট্টে আগমন করেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আখ্যানোক্ত দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের একযোগে ত্রিপুরা হইতে শ্রীহট্টে আগমন সম্পূর্ণ আধুনিক কল্পনা। যদি তাহাই হয়, তবে ইহার মধ্যে বৎসাদি পঞ্চগোত্রের, ত্রিপুরাতে রাজার দান প্রতিগ্রহ স্বীকার করাতে, কাত্যায়নাদি পঞ্চগোত্র কর্ত্তৃক পতিত রূপে গণনা, এবং যজন যাজনে বঞ্চিত না হইলেও,আদান-প্রদানরাহিত্য ইত্যাদি কথা কল্পনার বিকাশ মাত্র। অতএব দশগোত্রীয়গণের শ্রীহট্টে উপনিবেশের পর রঘুপতিকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম বাৎস্য সুবিদনারায়ণের কন্যা বিবাহ হেতু সমাজচ্যুতির আশঙ্কা, এবং তজ্জন্য শিবরাম তর্কসিদ্ধান্ত-শিষ্য একাদশ বর্ষীয় রঘুনাথের জননীসহ শ্রীহট্ট পরিত্যাগ প্রভৃতি অর্থহীন ও অসঙ্গত কল্পনামাত্র।

এইরূপ দেখা যাইবে যে পতিত প্রভৃতি অপবাদ প্রকৃত নহে।

ইহার অন্যবিধ প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১) আখ্যানকারীগণের মতে রাজা সুবিদনারায়ণ চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। কিন্তু তাঁহারা যে কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছেন সেই বৈদিক-সংবাদিনী মতে "মুরসিদাবাদ নগরীয় নবাবস্য রাজ্যপরিদর্শকঃ মৌলবী ওসমান খাঁ" সুবিদনারায়ণের সমসাময়িক ব্যক্তি।

চৈতন্যের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে 'মুর্শিদাবাদের' অস্তিত্বই ছিল না। সকলে জানেন, উহা আরংজেবের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) কাত্যায়নাদি পঞ্চ গোত্রীয় বিপ্রগণ বর্ত্তমানে দশগোত্রীয় সাম্প্রদায়িক সমাজের বাহিরে আদানপ্রদান করেন না। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে সামাজিক নিয়ম আরও কঠোর ভাবে প্রতিপালিত হইত।

কাত্যায়নাদি মধ্যে আবার সামাজিক মর্য্যাদায় বিষম পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইহাদের শ্রেষ্ঠ গোত্রগুলি স্বীয় শাখার অন্তর্গত অপর গোত্রের কন্যা গ্রহণে এখনও সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু "প্রতিগ্রাহী" বৎসাদি পঞ্চগোত্রীয়গণের সহিত স্বচ্ছন্দে আদানপ্রদান করিয়া

* শ্রীহট্টে সামবেদী বৎস গোত্রীয় তিনটী পৃথক বংশ আছেন। সাধারণতঃ আলোচনা স্থলে ইহাদের পরস্পর পার্থক্য জ্ঞান দেখা যায় না বলিয়া ইহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইল।—

(১) বুড়ুঙ্গার সামবেদী বৎসগোত্রীয় বিপ্রগণ, চৌধুরী, ভট্টাচার্য্য, পুরকায়স্থ, চক্রবর্ত্তী এবং গোস্বামী এই সকল শ্রেণীতে বিভক্ত এবং ইঁহাদের শাখা রেঙ্গা ও ইন্দেশ্বর বিদ্যমান। ইহাদের পরস্পর স্নানাশৌচ আছে এবং ইহারা সকলেই সাম্প্রদায়িক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত।

(২) ঢাকাদক্ষিণ রায়গড়ের সামবেদী বৎসগোত্রীয় বিপ্রগণ সাম্প্রদায়িক শ্রেণীভুক্ত হইলেও তাঁহারা পৃথক বংশীয়রূপে শ্রীহট্টে স্বীকৃত। তাহাদের উপাধি ভট্টাচার্য্য।

(৩) ঢাকা দক্ষিণ দত্তরালীর সামবেদী বৎস বিপ্রগণের উপাধি মিশ্র। ইহাদের সহিত উপরোক্ত দুই বংশের স্নানাশৌচ নাই।

† শ্রীচৈতন্যের বংশ সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় রূপে বঙ্গে সুপরিচিত।

থাকেন। কেহই স্বগোত্রে ও মাতৃগোত্রে জ্ঞাতসারে আদানপ্রদান করেন না; সুতরাং পূর্ব্বে বৎসাদির সহিত আদান-প্রদানের রীতি না থাকিলে কাহার সহিত আদান প্রদান হইত তাহা বিবেচ্য।

(৩) সাম্প্রদায়িক শ্রেণীভুক্ত রাজা সুবিদনারায়ণের বংশ-পত্রিকা ও কুলগ্রন্থ হইতে নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায়, যে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নিধিপতি নামক কনোজবাসী জনৈক তেজস্বী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রথম শ্রীহট্টে উপনিবিষ্ট হন, এবং উক্ত নিধিপতির বংশে রাজা সুবিদনারায়ণ দশম পুরুষের ব্যক্তি। অতএব বাৎস্য নিধিপতি ৬৪১ খৃঃ অব্দের বহু শত বৎসর পরে শ্রীহট্টে প্রতিষ্ঠিত হন *। সুতরাং উক্ত সময়ে শ্রীহট্টে আগত দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রতিগ্রাহী অপবাদ তাঁহার স্কন্ধে কিরূপে আরোপিত হইতে পারে?

(২) রাজা সুবিদনারায়ণের সময় নিরূপণ—

সুবিদনারায়ণের কাল নিরূপণের সহায় হইতে পারে এরূপ দুইটি তথ্য 'জাতীয় ইতিহাস' ও 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে'ই প্রদত্ত হইয়াছে।

(১) সুবিদনারায়ণ ও ওসমান নামধেয় এক জন সেনাপতি সমসাময়িক।

(২) সুবিদনারায়ণের সময় তাম্রকুটের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

আমরা এই দুই তথ্যের আলোচনা দ্বারা সুবিদনারায়ণের কালনিরূপণের চেষ্টা করিব।

আমরা ওসমানের কাল অন্যত্র ["প্রতিভা, ১৩২০, জ্যৈষ্ঠ—"বঙ্গের ওসমান খাঁ ১। ওসমান ও সুবিদনারায়ণ। ও শ্রীহট্টের খাজে ওসমান"] নির্দ্ধারণ করিয়াছি। জাতীয় ইতিহাস বর্ণিত সময়ে, অর্থাৎ হুমায়ুন এবং শের শাহের বিরোধকালে, এবং 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে' বর্ণিত বেহলুল লোদীর সময়ে বহু অন্বেষণ করিয়াও আমরা ওসমানের কোনও সন্ধান পাই নাই। মুসলমান ঐতিহাসিক ইনায়েৎ উল্লার, "তক্‌মিল আকবরনামা" গ্রন্থে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের সপ্তচত্বারিংশৎ (৪৭) বর্ষের ঘটনা সমূহের বর্ণনায় সর্ব্বপ্রথম বঙ্গে পাঠান দলপতি ওসমানের সাক্ষাৎ পাই। এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদের নবাবের রাজ্যপরিদর্শক ও সেনাপতি ওস্‌মান নামধেয়, আকবরের পূর্ব্ববর্ত্তী, কোনও ওসমানের অস্তিত্ব পাইতেছি না। পাদটীকায় ইনায়েৎ উল্লা প্রদত্ত বিবরণ উদ্ধৃত হইল *।

১। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' লেখকের মতে রঘুনাথ রাজা সুবিদনারায়ণ সমসাময়িক অথবা একপুরুষ ব্যবধানবর্ত্তী, এবং সুবিদনারায়ণ ও ওসমান বেহলুল লোদীর সমসাময়িক। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গের ওসমান খাঁ ও শ্রীহট্টের খাজে ওসমান" শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রতিভা—জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) বিভিন্ন মুসলমান ঐতিহাসিক প্রদত্ত বিবরণ, নসিরুদ্দিনের সনন্দ, বংশ-পত্রিকা ও অন্যান্য বিশিষ্ট প্রমাণ হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রাজা সুবিদনারায়ণ, নসিরুদ্দিন খাঁ, এবং খাজে ওসমান ইহারা সমসাময়িক ব্যক্তি। ইহারা সকলেই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন—বেহলুল লোদীর সময়ের হইতে পারেন না।

---

* সুবিদনারায়ণের জন্মকাল খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে ইহা অতঃপর প্রদর্শিত হইবে।

* "Usman the Afghan trod in the path of rebellion, and crossing the Brahmaputra river, was in vain opposed by Baz Bahadur, the Imperial thanadar, who retired to Bhowal."—Illiot, P. 106, vol. vi.

২। সুবিদনারায়ণের সময়ে তাম্রকুটের ব্যবহার।

রাজা সুবিদ নারায়ণের সময় নির্দ্দেশ কল্পে আমরা এক্ষণে একটি কৌতূহলজনক প্রমাণ উপস্থিত করিব। শ্রীহট্টের ইতিহাসে বর্ণিত আছে, এবং স্থানীয় অনুসন্ধানেও এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, রাজা সুবিদনারায়ণের সময়ে তাম্রকুটের ব্যবহার রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, এবং রাজা স্বয়ং তাম্রকুট সেবনে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। দোলা আরোহণ পূর্ব্বক রাজ্যমধ্যে পরিভ্রমণ কালে জলপূর্ণ হুকায় ধূমপানের নিমিত্ত এই আচারনিষ্ঠ নৃপতি বর্ত্তমান কালে বাহাড়ু বা মালা নামে পরিচিত জল আচরণীয় সম্প্রদায়বিশেষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এই সূত্রে আমরা রাজা সুবিদনারায়ণের সময় নির্দ্দেশ করিবার সুযোগ পাইতেছি। নিম্নোদ্ধৃত মুসলমান ঐতিহাসিকের বর্ণনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে রাজার পক্ষে সম্রাট আকবরের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া অসম্ভব—কারণ তখনও ভারতে তামাকের প্রচলন হয় নাই।

Introduction of Tobacco—"In Bijapur I had found some tobacco. Never having seen the like in India, I brought some with me, and prepared a handsome pipe of jewel work, with purple velvet.

His Majesty (The Emperor Akbar) was enjoying himself after receiving my presents, ... when his eye feel upon the tray with the pipe and its appurtenances; he expressed great surprise and examined the tobacco, which was made up in pipefuls; he inquired what it was and where I had got it. The Nawab Khan-i 'Azam repplied: "This is tobacco, which is well known in Macca and Medina, and this doctor has brought it as a medicine for your Majesty." His Majesty looked at it, and ordered me to prepare and take him a pipeful. He began to smoke it, when his physician approached and forbade his doing so. But His Majesty was graciously pleased to say he must smoke a little to gratify me, and taking the mouthpeice into his sacred mouth, drew two or three breaths. The physician was in great trouble, and would not let him do more. He took the pipe from his mouth, and bid the Khan-i 'Azam try it, who took two or three puffs. He then sent for his druggist and asked what were its peculiar qualities. He replied that there was no mention of it in his books; but that it was *a new invention*, and the stems were imported from China and European doctors had written much in its praise. The first physician said, "In fact, this is an untried medicine, about which the doctors have written nothing. How can we describe to your Majesty the qualities of unknown things? It is not fitting that your Majesty should try it." * * * *

The physician was going to say more, when His Majesty stopped him and called for the priest. * * *

As I had brought a large supply of tobacco and pipes, I sent some to several of the nobles, while others sent to ask for some; indeed, all, without exception, wanted some and *the practice was introduced.* After that the merchants began to sell it, so the custom of smoking spread rapidly. His Majesty, however, did not adopt it.—Historian—Asad Beg.—Book—'Wikaya' Vol VI, Page 165.

৩। বংশ-পত্রিকার হিসাবে সুবিদনারায়ণের কালনিরূপণ।

আমরা এক্ষণে রাজা সুবিদনারায়ণের সময় নির্দ্ধারণের জন্য নূতন করে আরও কিছু প্রমাণ উপস্থিত করিব।

এই জন্য আমরা শ্রীহট্টের বিভিন্ন স্থান ও পরিবার হইতে সংগৃহীত রাজা সুবিদনারায়ণ সম্পর্কিত কয়েকটী বংশ-পত্রিকা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিব।

১। সুবিদনারায়ণের বংশপত্রিকা (পরিশিষ্ট 'ক')—

সুবিদনারায়ণ-বংশীয় শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম চৌধুরী প্রণীত বংশলতা প্রবন্ধের শেষভাগে প্রদত্ত হইবে। এই বংশ-পত্রিকার সহিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে' উদ্ধৃত বংশ-পত্রিকার তুলনা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা উল্লেখযোগ্য।

রাজবংশীয়গণ নিজ বংশবিবরণ সম্বন্ধে যতদূর জানিবার সুযোগপ্রাপ্ত হইবেন অপরের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। অতএব যদি অপর কেহ প্রকাশ করেন যে, রাজা সুবিদনারায়ণের পুত্রগণের পর তিন পুরুষ ছিল, কিন্তু উহাদের নাম তদ্বংশীয়গণের নিকট অজ্ঞাত, তাহা হইলে এইরূপ উক্তির প্রতি মনে স্বতঃই অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিবে। 'ইতিবৃত্ত' লেখক সুবিদনারায়ণের পর তদ্বংশে অজ্ঞাত তিন পুরুষ আবিষ্কার করিয়াছেন।

২। রাজ জামাতা কাত্যায়ন রঘুপতির বংশপত্রিকা (পরিশিষ্ট 'খ')—

রাজজামাতা রঘুপতি বংশীয় স্বর্গীয় রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রণীত বংশ বিবরণীও প্রবন্ধের শেষভাগে প্রদত্ত হইবে। এই বিবরণী প্রণয়ণের পর বহু শাখায়ই আর এক পুরুষ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। যে বংশ-বিবরণী হইতে নিম্নোদ্ধৃত বংশ-পত্রিকা প্রণীত হইয়াছে তাহা নানা কারণে অত্যন্ত মূল্যবান। সার্ব্বভৌম মহাশয় রাজ-জামাতা রঘুপতির বংশধর, এবং শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সমাজে সুপরিচিত এবং বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। এই বংশ-পত্রিকার সহিত তুলনায় আলোচনার নিমিত্ত আধুনিক কালে প্রচারিত দুইটী কাত্যায়ন বংশ-পত্রিকাও প্রবন্ধের শেষভাগে প্রদত্ত হইবে। ইহার একটি (পরিশিষ্ট 'গ') 'জাতীয় ইতিহাস' ধৃত কাত্যায়ন বংশাবলী, অপরটি (পরিশিষ্ট 'ঘ') পঞ্চ খণ্ডের কাত্যায়ন মূল শাখার বংশাবলী।

রঘুনাথ আবিষ্কারের পর রঘুপতি বংশীয়গণের যে সকল বংশাবলী প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের সহিত সার্ব্বভৌম-প্রণীত বংশাবলীর তুলনা করিলে কয়েকটি বিষম পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। তন্মধ্যে রঘুনাথের নাম নাই। তিনি রঘুনাথ শিরোমণিকে নিজ বংশীয় বলিয়া জানিতেন না, ইহাই এস্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩। পঞ্চখণ্ডে অবস্থিত রাজ-জামাতা রঘুপতির জ্ঞাতিগণের বংশ-পত্রিকা—

পঞ্চখণ্ড দাস গ্রামের কাত্যায়ন মূল শাখার বংশ-পত্রিকাও প্রবন্ধের শেষভাগে প্রদত্ত হইবে। এস্থলে সংক্ষেপে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি—

লক্ষ্মীকান্ত
|
রুদ্রপতি (১) (পঞ্চখণ্ড ঘুঙ্গাদিয়া নিবাসী)
|
├── রঘুপতি (২)
│ (ইনি ইটায় বাস স্থাপন করেন।)
└── রমাপতি (২
  (ইনি পঞ্চখণ্ড ঘুঙ্গাদিয়া গ্রাম হইতে আসিয়া কিছুকাল পঞ্চখণ্ড দীঘিরপার গ্রামে ও পরে নিকটবর্ত্তী দাস গ্রামে বাস স্থাপন করেন।)

(বংশাবলী প্রণেতা) তারক চন্দ্র (১০)
নিশিকান্ত (১০)
কালীকৃষ্ণ (৮০)
প্রসন্নকুমার (১০)
} ইহারা বর্ত্তমান পুরুষের ব্যক্তি। সম্প্রতি প্রতি পরিবারেই এক পুরুষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই বংশাবলীতে রঘুপতির পিতার নাম গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নহে এবং তাহার ভ্রাতার নামও রঘুনাথ নহে। আর রঘুপতির ভ্রাতার পিতার পূর্ব্বনির্ব্বাস দীঘির পাঁর নহে। এইবংশ-পত্রিকা হইতেও রঘুপতির ভ্রাতা ও তদ্‌বংশীয়গণের মধ্যে ৯ পুরুষের অধিক ব্যবধান দৃষ্ট হইবে না।

মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী রাজপুত্রগণের বংশ-পত্রিকা নানা কারণে অতীব মূল্যবান। এই বংশ-পত্রিকা অনুসারে সুবিদ-নারায়ণ ও তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরগণ মধ্যে নয় পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান হইতে ১১ পুরুষ পূর্ব্বে রাজা সুবিদনারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। আর সার্ব্বভৌম বিরচিত কাত্যায়ন বংশ-বিবরণী হইতেও দৃষ্ট হয় যে, রাজজামাতা রঘুপতি ও তাহার বর্ত্তমান বংশধর সার্ব্বভৌম-পুত্র তারাকিশোর স্মৃতিরত্ন মধ্যে ছয় পুরুষ মাত্র ব্যবধান। কিন্তু ইহার পরে কিঞ্চিদধিক এক পুরুষ চলিতেছে। 'জাতীয় ইতিহাস' উদ্ধৃত কাত্যায়ন বংশ-পত্রিকায়ও এতদুভয়ের মধ্যে ছয় পুরুষ ব্যবধান দেখান হইতেছে।

রাজ কুটুম্ব রঘুনাথ ও নৈয়ায়িক রঘুনাথে শত বর্ষাধিক সময়ের বৈষম্য

এমতাবস্থায় কোন বংশাবলী অনুসারেই রাজা সুবিদ নারায়ণ বর্ত্তমান হইতে ১১ পুরুষের অধিক পূর্ব্বের এবং তথাকথিত রঘুনাথ দশ পুরুষের অধিক পূর্ব্বের লোক বলিয়া প্রমাণিত হন না।

এক্ষণে রাজা সুবিদনারায়ণ ১১ পুরুষ পূর্ব্বের লোক ধার্য্য হইলে কিরূপে তাহার সময় নির্দ্দেশ করিতে হইবে? উহা কোন সময়ের কথা?

সমাজে তৎকালীন প্রচলিত বিবাহের বয়স দ্বারা একপুরুষ কাল নির্ণীত হইতে পারে।

উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে, বিশেষতঃ শ্রীহট্টের অধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ বংশে, পুরাকালে সচরাচর সমাবর্ত্তন অর্থাৎ অধ্যয়ন সমাপনান্তে দারপরিগ্রহ ঘটিত। সে অধ্যয়ন দীর্ঘকালব্যাপক ছিল বলিয়া চব্বিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সচরাচর দারপরিগ্রহ ঘটিত না। কন্যার বিবাহ অষ্টম বর্ষেই সম্পাদিত হইত। দশম বর্ষ মধ্যে কন্যা বিবাহিতা না হইলে সমাজে অপদস্থ হইতে হইত। উপরোক্ত কারণে তিন পুরুষে শত বর্ষ ধরিলে সম্ভবতঃ কাহারও আপত্তি থাকিবে না। তিন পুরুষে শত বর্ষ হিসাবে সুবিদনারায়ণের আনুমানিক জন্মকাল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে।

রাজার সময় নির্দ্দেশ করিবার এইরূপ উৎকৃষ্ট সুযোগ থাকিতেও কেন যে রাজা ও তৎসহ ওসমানকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বেহ্‌লুল লোদির সমসাময়িক রূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা হইতেছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে রাজা সুবিদ-নারায়ণকে তাঁহার প্রকৃত সময় হইতে শতবর্ষাধিক পূর্ব্বের লোকরূপে প্রতিপন্ন করিবার মূলে, কোনও পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বা স্বার্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কি না।

শ্রীহট্টের বহু বিশিষ্টব্যক্তি প্রকাশ্য সংবাদপত্রে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে রাজাকে বেহ্‌লুল লোদির সমসাময়িক রূপে প্রতিপন্ন করিবার মূলে গোবিন্দাত্মজ কাত্যায়ন রঘুনাথের শ্রীহট্টে জন্মস্থান বলিয়া এই দাবী। এই নিমিত্ত পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধের উপসংহার-ভাগে রঘুনাথকে লইয়া শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ-সমাজে এক বিষম মনোমালিন্যের আভাষ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথকে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সমাজ ভুক্ত আদি বাসিন্দারূপে প্রমাণিত করিতে পারিলে, শ্রীহট্টের পক্ষে,এবং পরিবারবিশেষের পক্ষে শ্লাঘার কারণ ঘটিবে, ইহা বলাই বাহুল্য। এক্ষণে রাজকুটুম্ব কাত্যায়ন রঘুনাথকে চৈতন্যের সমসাময়িক না দেখাইতে পারিলে তাঁহাকে নৈয়ায়িক-শিরোমণি রঘুনাথরূপে প্রমাণ করা যায় না এবং কাত্যায়ন রঘুনাথ চৈতন্যের সমসাময়িকরূপে প্রমাণিত হইলে, রাজা সুবিদনারায়ণ ও

ওসমানকে নিশ্চয়ই চৈতন্যের পরবর্ত্তীরূপে কীর্ত্তিত করিতে হয়।

কিন্তু আমরা বিভিন্ন প্রণালী দ্বার বিচার পূর্ব্বক দেখাইয়াছি। যে সুবিদনারায়ণের জন্মকাল আনুমানিক ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ এবং তথাকথিত কাত্যায়ন রঘুনাথের জন্মকাল অনুমানিক ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে।

পক্ষান্তরে নৈয়ায়িক রঘুনাথ চৈতন্যের সমসাময়িক। চৈতন্যের জন্মকাল হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ৪২৮ বৎসর এবং আনুমানিক ১৫ পুরুষ চলিতেছে।

ইহা হইতে নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে বর্ণিত রাজকুটুম্ব রঘুনাথ চৈতন্যের সমসাময়িক রঘুনাথ নহেন। সুতরাং রাজ-জামাতার ভ্রাতা রঘুনাথের অস্তিত্ব তর্কস্থলে স্বীকৃত হইলেও তিনি বঙ্গের নৈয়ায়িক রঘুনাথ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি, কারণ উভয়ের মধ্যে শত বর্ষাধিক কালের ব্যবধান।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে সময় নির্দ্ধারণের এতটা সুযোগসত্ত্বেও কেহ কেহ প্রকাশ করিতেছেন যে রঘুনাথ শিরোমণি সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত এবং ব্যক্তিবিশেষের কুটুম্ব এবং রঘুনাথের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দশ পুরুষ চলিতেছে। কিন্তু আশা করি যে উপরোক্ত সুদীর্ঘ বিচার ফলে দেখা যাইবে যে রাজকুটুম্ব রঘুনাথ ও বাসুদেবশিষ্য রঘুনাথ মধ্যে শতাধিক বর্ষ ব্যবধান, এবং উহারা এক ব্যক্তি হইতে পারেন না।

শ্রীহট্টে রঘুনাথ আবিষ্কার চেষ্টার বিভিন্ন অধ্যায়

আমরা বিস্তারিত আলোচনার ফলে দেখিলাম যে 'জাতীয় ইতিহাস' ও 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে' প্রস্তাবিত মতে শ্রীহট্টের রঘুনাথ ও বঙ্গের নৈয়ায়িক রঘুনাথের অভিন্নত্ব স্থাপন অসম্ভব রহে।

একণে দেখা যাউক, কি প্রণালীর উপর নির্ভর করিয়া উভয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস হইয়াছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই নূতন ঐক্য আবিষ্কার সম্বন্ধে কয়েকটী রহস্য আপনা দের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আমরা এই উপলক্ষে দেখিব যে এই জাল রঘুনাথ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, এবং সংকীর্ণ দেশগৌরব বর্দ্ধন প্রয়াসে অল্পদিন হইল শ্রীহট্টে ইহার আবিষ্কার হইয়াছে, এবং এই প্রস্তাবিত রঘুনাথের (অতএব রাজা সুবিদনারায়ণের) সময়ের ও বঙ্গের রঘুনাথের (অতএব চৈতন্যের) সময়ের দেশের অবস্থা এক নহে।

দশ বার বৎসর পূর্ব্বে রঘুনাথকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়া শ্রীহট্টের কেহ জানিত না। কিন্তু ৪১৯ গৌরাব্দে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া এবং ১৩১০ বঙ্গাব্দে "নব প্রতিভা" নামক মাসিক পত্রিকার স্তম্ভে শ্রীহট্টের কাত্যায়নগোত্রে রঘুনাথ আবিষ্কার কাহিনী বিঘোষিত হইলে পর রঘুনাথকে লইয়া শ্রীহট্টে পক্ষাপক্ষ গঠিত হইল।

এক দল বলিয়া উঠিলেন, 'রঘুনাথ নিশ্চয়ই কাত্যায়ন গোত্রীয়। তাঁহারা বলিলেন, নৈয়ায়িক গদাধর মিশ্র টীকার প্রারম্ভে রঘুনাথকে "ক্যাত্যায়ন খনিজমণি" বলিয়াছেন। শ্রীহট্ট ও মিথিলা ভিন্ন বঙ্গে কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নাই। (পূর্ব্বে ছিল কিনা বলা হইল না।) রঘুনাথ মিথিলাবাসী ছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং, 'ইতিবৃত্ত' লেখকের কথায় (১৭৯ পৃঃ), "কাত্যায়ন খনিজমণি" রঘুনাথকে শ্রীহট্টবাসী বলিতে আপত্তির পথ কোথায়? (প্রমাণ কোথায় বলা হইল না।) শ্রীহট্টের অন্যতম কাত্যায়ন বংশ—বানিয়াচুঙ্গের কাত্যায়ন আঙ্গিরস বার্হস্পত্য—রঘুনাথকে আপনাদের বলিয়া দাবী করেন না। সুতরাং, পঞ্চখণ্ড কাত্যায়ন বিশ্বামিত্র কাম্পিল্যগণের ইটা শাখার দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য।'

এইরূপে প্রচারিত হইল, রাজজামাতা উপরোক্ত কাত্যায়ন রঘুপতির রঘুনাথ নামক এক ভ্রাতা নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক কালক্রমে রঘুনাথ শিরোমণি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু ইহা প্রমাণ করিতে যাইয়া যখন রাজবংশীয়গণের প্রতি আক্রমণ করা হইল—যখন প্রচার করা হইল যে নিজভ্রাতা রঘুপতির বিবাহে সামাজিক

বংশমর্য্যাদার লাঘব হওয়াতে, বালক রঘুনাথ দেশত্যাগী হইয়া নবদ্বীপ গমন করেন, অমনি মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল।

এদিকে পঞ্চখণ্ড হইতে আগত দক্ষিণ শ্রীহট্টের কৃষ্ণাত্রেয়গণও নিজ বংশাবলী মধ্যে রঘুনাথের নাম দেখিয়া নাম-সাদৃশ্যে নিজ দাবী লইয়া উপস্থিত হইলেন। এই উভয় পক্ষ নিজদাবী প্রমাণে সচেষ্ট হইলেন। বাক্‌যুদ্ধ ও মসিযুদ্ধে সমাজে এক অভিনব বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। জীর্ণ বংশ-পত্রিকার অনুসন্ধান ও আলোচনা আরম্ভ হইল।

রহস্যের বিষয় এই যে, কাত্যায়ন ও কৃষ্ণাত্রেয় এই দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের (কাত্যায়ন) বংশধরগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক শ্রেণী বলেন, রঘুনাথ আমাদের লোক; আর এক শ্রেণী (রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম প্রভৃতি) বলেন, আমাদের কি না জানি না। তাঁহার বংশপত্রিকায় রঘুনাথের নাম নাই।

স্বনামধন্য সার্ব্বভৌম রচিত এই বংশবিবরণী বিরোধের বহু পূর্ব্বে রচিত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহাতে রঘুনাথের নামোল্লেখ নাই। তিনি রঘুনাথকে নিজ বংশীয় রূপে জানিতেন না। এই বিবরণী দৈবচক্রে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পুত্র মৌলবীবাজার মুন্সেফী আদালতে সাক্ষ্যদান কালে দাখিল করেন। উক্ত দলীলের সহীমোহর যুক্ত নকল হইতে নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

"কাত্যায়নীং মহেশানীং সর্ব্বেশানীং সনাতনীং।
তপোধনতমং বন্দে মুনিং কাত্যায়নঞ্চ তৎ। ১।
গোত্রেষ্টিকারিণা তেন সুতান্ মুনিবরান্ ততান্।
কাত্যায়ন বিশ্বামিত্র কাম্পিল্য প্রভবাভিধান্। ২।
*(বং)শে কাত্যায়নীয়েঽস্মিন্ বঙ্গে রঘুপতির্ম্মহান্।
নানা শাস্ত্রে প্রবীণস্তাভট্টাচার্য্যস্ব ?) আগতঃ। ৩।
বৈধক্রিয়া সুনিপুণঃ সদা নির্ম্মল মানসঃ।
শান্তো দান্তস্তপঃসারঃ পারদর্শী সদাশয়ঃ। ৪।
স্থিরকীর্ত্তিঃ শুভাকারঃ সাদরঃ করুণাকরঃ।
সর্ব্বকল্যাণনিলয়ঃসত্যব্রতপরায়ণঃ। ৫।
সুবুদ্ধি নারায়ণ ভূমিপালঃ সব্রাহ্মণ সাধুমতির্ম্মহাত্মা।
রত্নাবতীং সর্ব্ব গুণৈরুপেতাং সুতাং দদৌ দিব্য বরায় তস্মৈ। ৬।
ভূমিঞ্চ বৃত্তেরুপযোগিনীং সুধীর্ব্বিত্তঞ্চ দিব্যং পরমার্থ-সবিকং।
রূপান্ সুবিজ্ঞান্ সকলেষ্টকারকান্ দদৌ স রাজা সদয়ঃ সদাশয়ঃ। ৭।
তস্যাং তেন সুতৌ জাতৌ রমাপতি রকরুষঃ।
রুদ্রপতিশ্চ সারজ্ঞৌ শুভ ব্রতপরায়ণৌ। ৮।
রমাপতেঃ সুতো বঙ্গে রঘুদেবঃ প্রসন্নধীঃ।" ইত্যাদি।

শ্রীহট্টের রঘুনাথ আবিষ্কারের পরক্ষণেই শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ভদ্রলোক "শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকার ৩য় বর্ষ দশম সংখ্যায়" (৪২০ গৌরাব্দ) "শ্রীশ্রীরঘুনাথ শিরোমণি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা" নামক প্রবন্ধে ব্যক্তিগত প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। এই প্রতিবাদপত্র বড়ই মূল্যবান্, কারণ ইহা হইতে শ্রীহট্টে কাত্যায়ন রঘুনাথের আবিষ্কারক ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের নাম এবং এই আবিষ্কারের সময়, ৪১৯ গৌরাব্দের, সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

নিম্নে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"তৃতীয় বর্ষের (৪১৯ গৌরাব্দের) শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার পত্রিকার ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ ভক্ত

---

* পুরাতন জীর্ণ কাগজ হইতে অক্ষরটী উঠিয়া গিয়াছে।

লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি শ্রীহট্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বনামধন্য নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির* (ফুটনোটে আছে, "রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টবাসী কিনা এ সম্বন্ধে এখনও সুপ্রমাণাভাব। —সম্পাদক।") পুণ্যময় জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়া আমাদের এ পতিত ও হতভাগ্য দেশের যে কি মহদুপকার সাধিত করিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য।"

অতঃপর লেখক অচ্যুত বাবুর প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিতেছেন.........."নব প্রতিভা নামক একখানি অজ্ঞাতপূর্ব্ব মাসিক পত্রিকার ২য় বর্ষের (১৩১০) একত্র প্রকাশিত অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।" ......"সম্প্রতি ভক্তপ্রবর অচ্যুত বাবুর নামে উক্ত প্রবন্ধটী "শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়াতে আমরা আর উহাকে পূর্ব্ববৎ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। উভয় প্রবন্ধের ভাষা পারিপাট্যে ও রচনাকৌশলে এরূপ সুসাদৃশ্য রহিয়াছে যে 'নব প্রতিভায়' প্রকাশিত প্রবন্ধটিও অচ্যুত বাবুর লেখনী-নিঃসৃত বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইতেছে।" ইত্যাদি।

এক্ষণে আমরা দুই পক্ষের দুই রঘুনাথের কথা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

প্রথম পক্ষের কৃষ্ণাত্রেয় রঘুনাথের কথা— ইহারা বলেন যে, বঙ্গের রঘুনাথ করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পঞ্চখণ্ড কানায় সুপাতলা গ্রামে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

বৈদিক পুরাবৃত্ত নামক কুলগ্রন্থে এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বর্ণনা স্থান পাইয়াছে :—

"আসংস্তস্য ত্রয়ঃ পুত্রা রঘুনাথ মহেশ্বরঃ।
উমাকান্তশ্চ তে সর্ব্বে বিদ্যাজ্ঞানবিশারদাঃ॥
বিদ্যয়া বুদ্ধিতীয়ঃ স বসহতি রিবা গুরু।
লব্ধা শিরোমণি নাম সভায়াং বিদুষাম্পতেঃ॥
পাণ্ডিত্য পদবীং লেভে কানস্তার্কিক কেশরী।
ভয়াৎ প্রকম্পিতা স্তস্য যে যে তার্কিক দিগ্‌গজাঃ॥
পুনরেত্য নবদ্বীপে রঘুনাথ শিরোমণিঃ।
বিজিত্য বিদুষঃ সর্ব্বান্‌ রাজসম্মানভূষিতঃ॥
অধ্যাপনার্থং তত্রৈব তস্থৌ জহ্নুসুতাতটে।
ন্যায়স্য বিবিধান্‌ গ্রন্থান্‌ দীধিত্যাদীন্‌ চকার হ॥"
—তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই কুলগ্রন্থোক্ত বিবরণের বিরুদ্ধে আমাদের যুক্তি এই, প্রথমতঃ,উক্ত কুল-গ্রন্থ হইতে এরূপও অবগত হওয়া যায় যে, মহেশ্বর ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে শাহ জালাল * কর্তৃক পরাজিত রাজা গৌরগোবিন্দের সভাপণ্ডিত ছিলেন ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দেই যাহার সময় কাল তাঁহার ভ্রাতা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কিরূপে হইতে পারেন?

দ্বিতীয়তঃ, কয়েকটী প্রচলিত কৃষ্ণাত্রেয় বংশাবলী হইতে দৃষ্ট হয়, যে তিনি ও তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরগণ মধ্যে ৬। ৭ পুরুষ ব্যবধান। সুতরাং কৃষ্ণাত্রেয় রঘুনাথের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও তিনি অনধিক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, ইহাই প্রমাণিত হয়। তাঁহাকে কোন মতেই শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বলিয়া কল্পনা করিতে পারা যায় না।

বর্ত্তমানে কৃষ্ণাত্রেয় রঘুনাথের পৃষ্ঠপোষকগণ নিজ দাবী পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ় ভাবে প্রচার করিতে বিরত আছেন। অতএব এই পক্ষ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

* P. 24. Dt. Gazetteer Sylhet.—
"Dr. Bloch is of opinion that the narration of Shah Jalal's life is so thickly overgrown with fiction that it remains a matter of doubt whether he is an historical person at all."

The generally accepted date of Shah Jalal is 1384. A D.

* (A short Note or Panchakhanda.)

দ্বিতীয় (কাত্যায়ন রঘুনাথের) পক্ষের কথা—আজ ১০ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি সর্ব্বপ্রথম এই মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে বঙ্গীয় রঘুনাথ পঞ্চখণ্ড দীঘীরপার নিবাসী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ পুত্র এবং বেহলুল লোদীর সমসাময়িক ব্যক্তি। কিন্তু পঞ্চখণ্ডে তৎকালে রঘুনাথের জন্ম অসম্ভব। বেহলুল লোদীর সময়ে পঞ্চখণ্ড টীলাভূমিতে অবস্থিত গ্রামগুলি ঘোর অরণ্যময় ছিল, এবং এক জাতীয় কুকী তৎকালে তথায় বাস করিত। দ্বিতীয়তঃ, তর্কসিদ্ধান্ত ইত্যাদি উপাধি-বিশিষ্ট অধ্যাপকগণের তৎকালে পঞ্চখণ্ডে বসবাস করিবার কাহিনীও অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে। বর্ত্তমান পঞ্চখণ্ডের স্থাপয়িতা পাল ও দত্ত বংশীয়গণের বংশপত্রিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে ১২ পুরুষের অনধিককাল পূর্ব্বে, তাহারা বর্ত্তমান পঞ্চখণ্ডে উপনিবিষ্ট হন। তাহাদের আগমনের পর হইতেই অরণ্য পরিষ্কৃত হইয়া বিভিন্নপল্লী স্থাপিত হইতে থাকে। দত্তগণের স্থাপিত সুপতলা গ্রামের লোক বসবাসের যেরূপ শৃঙ্খলা তাহা অতি প্রাচীন গ্রামে রক্ষিত হইতে পারে কি না বিবেচ্য।

দ্বিতীয় মতের ক্রমবিকাশ

নৈয়ায়িক রঘুনাথের শ্রীহট্টে জন্মস্থান কল্পনা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইলেও কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার অবতারণায় অক্লান্তভাবে দীর্ঘকাল যাবৎ লেখনী পরিচালনা করিতেছেন। তাহাদের এই চেষ্টা ও অধ্যবসায় তিন অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়। এখনও ইহার বিরাম নাই।

নবপ্রতিভা, শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, আনন্দবাজার, পরিদর্শক, শিলচর প্রভৃতি সাময়িক পত্রে রঘুনাথ সাহিত্যের প্রথম অধ্যায় সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল প্রবন্ধের বিশেষত্ব এই যে সর্ব্বত্রই এক প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা হইয়াছে, যেন ইহারা সকলেই যৌথিক এবং অপূর্ব্ব সম্বন্ধে অনুপ্রাণিত। পরবর্ত্তী দুইটি অধ্যায়ে কিরূপে ধীরে ধীরে দুর্ব্বল প্রমাণগুলির পরিবর্ত্তন অথবা পরিমার্জ্জন করিতে হইয়াছে, এই সমুদয় প্রবন্ধ হইতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিচয় পাইতে হইলে, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড, বিশ্বকোষ, নবপ্রতিভার প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে রঘুনাথ সাহিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় মন্থন করিয়া যাহা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা ইতিপূর্ব্বে ইহাদের প্রচারিত মতের বিস্তারিত বিচার করিয়াছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে সাহিত্য-সংবাদ, বিজয়া, সুরমা প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত রঘুনাথ সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধগুলি উল্লেখ যোগ্য। তন্মধ্যে বিজয়া পত্রিকায় "শ্রীহট্টের কানা ছেলে", "শ্রীহট্টের পাগ্‌লা ছেলে" প্রভৃতি উপাদেয় প্রবন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দেবশর্ম্মা, এবং সাহিত্য সংবাদ নামক পত্রিকায় মৌলবীবাজারের গৃহীতাবসর প্রবীন উকিল এবং ইটা রাজনগরের নবগঠিত "শিরোমণি চতুষ্পাঠীর" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর দাস মহাশয় রঘুনাথ সাহিত্যের বর্ত্তমান অধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন।

রঘুনাথ সাহিত্য-বর্ত্তমান যুগ.

মাঘ ১৩১৯ সনের সাহিত্য সংবাদ পত্রিকায় এবং বিগত ১২,১৯, এবং ২৬শে আগষ্ট তারিখের সুরমা পত্রিকায় প্রকাশিত "ন্যায় দর্শনে শ্রীহট্ট" নামক একই প্রবন্ধে হরকিঙ্কর দাস মহাশয় লিখিতেছেন,—"মিথিলায় শ্রীধর আচার্য্যের আদি নিবাস ছিল। পুরুষ গণনায় শ্রীধর আচার্য্য হইতে ঈশান পর্য্যন্ত ২৩ পুরুষ পাওয়া যায়। ঈশানের পুত্র বিদ্যাবাগীশ, তাহার পুত্র হরিহর আচার্য্য, হরিহরের পুত্র রমাকান্ত, তাহার পুত্র রামচন্দ্র, রামচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ

চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র রঘুপতি ও রঘুনাথ। এই হিসাবে রঘুনাথ ৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন।” ইত্যাদি। কিন্তু এ স্থলে বক্তব্য এই যে, দাস মহাশয়ের প্রদত্ত হিসাব সাধারণের বোধগম্য হওয়া দুষ্কর। ১০।১২ পুরুষ পূর্ব্বের কোনও ব্যক্তির সময় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, আধুনিক কাল হইতে কতপুরুষ পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন তাহার নিরূপণ আবশ্যক। কুলগ্রন্থ হইতে বংশ প্রতিষ্ঠাতার পৌরাণিক নাম হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত ব্যক্তির নামের সংখ্যা পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া তদ্দ্বারা তাহার সময় নিরূপণ কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। কাত্যায়ন বংশ-পত্রিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে রঘুপতি বর্ত্তমান কাল হইতে ৯ পুরুষ পূর্ব্বের, অথবা ৩০০ বৎসর পূর্ব্বের ব্যক্তি। দাস মহাশয় এই হিসাব দেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি ৪২৫ বৎসরের অনুসন্ধানে ছিলেন।

উক্ত প্রবন্ধে দাস মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে শকাব্দা ১৩৩৪ (?) সনে তাহার হাতে খড়ি দেওয়া হয়। তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়দর্শন পড়িয়া গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক ১৪২১ শকাব্দায় ন্যায়দর্শন শিক্ষার জন্য মিথিলায় গমন করেন। গৃহে থাকার কালেই তিনি ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ শেষ করিয়াছিলেন। বিশেষ কোনও কারণে মাতার সহিত নবদ্বীপ চলিয়া যান।

কিন্তু তিনি সন তারিখগুলি কোথায় পাইলেন, শিবরামের নিকট কত বৎসর পর্য্যন্ত রঘুনাথ বিদ্যা শিক্ষা করেন, কেন তিনি দেশত্যাগী হন, রঘুনাথ-কুটুম্ব রাজা সুবিদনারায়ণ কোন সময়ের লোক, গোবিন্দ ও রঘুনাথ নাম বিভিন্ন বংশাবলীতে কেন নাই, এই সকল বিষয়ের সম্বন্ধে বিচার করেন নাই।

সুরমা পত্রে “বঙ্গ রাজ্যে শ্রীহট্টের মন্ত্রী” শীর্ষক প্রবন্ধে দাস মহাশয় সম্প্রতিও লিখিয়াছেন—মিথিলার সেই প্রাচীন রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠন পূর্ব্বক নবদ্বীপে ফিরিয়া যিনি নব্য ন্যায়ে বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া ছিলেন, সেই পণ্ডিতকুল-শিরোমণি একচক্ষুঃ রঘুনাথের জন্মভূমি এই শ্রীহট্ট। *

১৩১৯, চৈত্র মাসের বিজয়া পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দেবশর্ম্মা লিখিত “শ্রীহট্টের কানা ছেলে” প্রবন্ধ হইতে যৎসামান্য আপনাদের নিকট উপস্থিত করিয়া আধুনিক রঘুনাথ সাহিত্য আলোচনা পরিসমাপ্ত করিব।

“পঞ্চখণ্ড ত্রৈপুর মহারাজ সমানীত সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের আদি নিবাস ভূমি। এই স্থানে কাত্যায়ন গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাসভূমি ছিল। মৃত্যুকালে গোবিন্দ স্ত্রীকে বলিয়া যান—‘রঘুপতি বংশবর্দ্ধন ছেলে, একদিন রাজৈশ্বর্য্য পাইবে। কোলের ছেলেটীকেও যত্নে পড়াইও; এটি বংশের মুখ, দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। রঘুপতি পিতা কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হন। পিতার মৃত্যুকালে তিনি যুবক আর রঘুনাথ কোলের ছেলে। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদ। অধ্যাপক রঘুনাথের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন——কানা গরুর ভিন্ন পথ, তুমি তোমার পথ দেখ’। তদবধি বাড়ীতেই রঘুপতির নিকট মায়ের তত্ত্বাবধানে রঘুনাথ বিদ্যাশিক্ষা করিতে থাকেন। ঘটক রঘুপতিকে রাজার গৃহজামাতা করিবার প্রস্তাব লইয়া আসিল। রঘুপতির মা এদিকে স্থির করিলেন—‘কাণা খোঁড়ায় একত্র বাস করাইব না।

তিনি রঘুপতিকে বলিলেন—“নবদ্বীপে আমাদের দেশের অনেকেই আছেন। ঠাকুরের আদেশ আছে রঘুনাথকে যত্নে পড়াইতে হইবে। বাবা রঘুপতি ঠাকুরের বাক্যে সফল কর—রাজৈশ্বর্য্য বর্দ্ধন কর। রাজার মন ক্ষুণ্ণ করিও না। রাজার রাজসম্পদ চিরদিন

সংপ্রতি শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব মহাশয়ও ঠিক এই কথাগুলিই প্রয়োগ করিয়াছেন “মিথিলার সেই..................এই শ্রীহট্ট—গৃহস্থ, পৌষ ১৩২০—আলোচনা (৫৮) শ্রীহট্টের প্রতিভা [illegible]।

থাকিবে না—কিন্তু তোমার বংশ ধনে মানে পাণ্ডিত্যে দেশে প্রধান হইবে।" ইত্যাদি। (নিম্নরেখাগুলি আমাদের প্রদত্ত)।

আলোচ্য প্রবন্ধে কতিপয় মৌলিক গবেষণা আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছে। আজ বহুকাল পরে শ্রীহট্টের রঘুনাথ কানা বলিয়া স্থির হইলেন। শিখিরাম তর্কসিদ্ধান্ত শ্রীহট্টের কানা রঘুনাথের শিক্ষাগুরু নহেন,—এবং রঘুনাথের জননী ভূতভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছেন!

কাত্যায়ন রঘুনাথের সমসাময়িক শ্রীহট্ট-
(ক) ঐতিহাসিক অবস্থা।

১৫৭৫ হইতে ১৬১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৭ বৎসর কাল শ্রীহট্টের বড়ই দুর্দ্দিনের সময়। এই সময়ে পাঠান রাজশক্তি ক্রমেই শক্তিহীন হইতে থাকে এবং মোগল রাজশক্তিও বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হয় নাই। ১৬১২ খৃঃ অব্দে ওসমানের পরাভব হইতেই প্রকৃত পক্ষে দক্ষিণ শ্রীহট্টে মোগলশাসন সংস্থাপিত হয়। এই অরাজকতার নিমিত্তই শিলা রায় এবং অমর মাণিক্যের শ্রীহট্ট বিজয় সম্ভবপর হইয়াছিল। এই অরাজকতার মধ্যেই ত্রিপুরা সীমান্তবর্ত্তী ইটা রাজ্যে সুবিদনারায়ণ রাজত্ব করেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ওসমানের পরাজয় ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই ক্ষুদ্র রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হওয়াতে দেশে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রদত্ত রাজকুটুম্ব রঘুনাথের সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণ শ্রীহট্ট ঐতিহাসিকগণ প্রদত্ত বিবরণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

(খ) সমাজের অবস্থা।

প্রায় বাইশ পুরুষ পূর্ব্বে ইটা অঞ্চলে ভদ্র বসতি ছিল না। এস্থলে অনার্য্য ও পার্ব্বত্য জাতির বসবাস ছিল। পরে বিশিষ্ট কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ পরিবার একে একে ইটার বাসস্থাপন করিতে থাকেন এবং রাজার সময়েই ইটা একটী ভদ্রপরিশোভিত জনপদরূপে পরিণত দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা সুবিদনারায়ণ সমাজপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। ভিন্ন স্থান হইতে আগত ব্রাহ্মণ ও অপর জাতীয় ভদ্রলোকদিগকে নিজ রাজ্যে স্থাপন করতঃ সমাজের বন্ধন দৃঢ় করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

আট মৌজা ও চোদ্দ মৌজা নামে ব্রাহ্মণ সমাজের যে দুইটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও রাজা সুবিদনারায়ণের সময়ে সৃষ্ট হইয়াছিল এরূপ অবগত হওয়া যায়। ইহারা যথাক্রমে গুরুতা ও যাজনিক কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। রাজার সময়ে তান্ত্রিক মতের যথেষ্ট প্রসার ছিল। রাজা সুবিদনারায়ণের আত্মীয় তান্ত্রিক সাধক রঘুদেবের সম্বন্ধে মত্ত দুগ্ধে পরিবর্ত্তিত করিবার কাহিনী সুপরিচিত।

উপসংহার।

রঘুনাথ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দৃষ্টে বোধ হয় যে, কোন পূর্ব্ব কল্পিত সিদ্ধান্তের সমর্থনের চেষ্টা হইয়াছে। আমরা প্রমাণবিচারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, সপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় এমন কি বিশ্বকোষ প্রভৃতি মহাগ্রন্থেও ইদানীং স্থান পাইয়াছে। জিলার ইতিহাস প্রদত্ত বিবরণ জাতীয় ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। ঐ বিবরণগুলি অলীক ও ভিত্তিশূন্য হইলে জাতীয় ইতিহাসের অঙ্গহানি ঘটে। সুতরাং স্থানীয় বিবরণগুলি যাহাতে সত্য ও অবিকৃত হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বিচারে যাহা সমীচীন তাহা গৃহীত ও যাহা ভিত্তিহীন তাহা বর্জ্জিত হইয়া এক অবিসংবাদিত সত্য বিবরণ বর্ত্তমান থাকুক, এই আমাদের বাসনা।

রঘুনাথ আলোচনায় জাতীয় ইতিহাসের শোচনীয় ভবিষ্যৎ আশঙ্কা করিয়া আমি যথাশক্তি তারস্বরে বিপদের আগমন ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র গুহ।

পরিশিষ্ট। (ক)

রাজা সুবিদনারায়ণের (মুসলমান) পুত্রগণের বংশাবলী।

১ রাজা সুবিদনারায়ণ

২ ইছাখাঁ চৌধুরী (ক) হাজি খাঁ চৌঃ (ক) জামাল খাঁ চৌঃ কামাল খাঁ চৌঃ

৩ ইলিয়াছ খাং ইস্রাইল খাঁ। ইচমাইল খাঁ। সা খাং হাজি দেওয়ান আবদুল মজিদ

৪ খাং মকি খাং চনি খাং জাকর খাং গোছ গোলাম মইনদ্দিন আবদুল মনসুর (১) আবুল মজফর (২ খ) আবু নছর (৩) আবুল কাছিম (৪) গোলাম হসন (৫)

৫ খাং তকি খাং নকি খাং আফতাব খাং বাখাব খাং এতিম গোলাম জিলানী খাং মুলু আবুল কজল (গ) আবুল জফর আবুল হেকিম (গ) আহম উল্লা খাং হবসম খাং মজক গোলাম নবি গোলাম নবি

৬ খাং ছকি আলি খাং খাং আমিন খাং নওয়াজ (গ) খাং নইব খাং মৌক আবুল খয়র আঃ মুহন খাং হাপির খাং আসরফ খাং ইছুব আমিন উদ্দিন খাং মজা

৭ খাং মনসুর [কটুবিঞা] (ক খাং আলী খাং আলম খাং জমির খাং নাজির খাং হাজির গোলাম রসুল খাং আনিছ কন্যা কন্যা মাঃ বাছির খাং আমিন আকা আবদুলবাকী

৮ আবদুল আহছান আবদুল ইব্রাহিম চৌধুরী (নিরুদ্দেশ) গোলাম ইমাম খাং আকমল খাং আফজল খাং ওয়াজিদ চৌঃ (আবলবিঞা) খাং মখদুক খাং মজফর বাজিদীঘীর পার

৯ দেওয়ান আবদুল খালেক চৌঃ (সিকন্দর মিঞা) আবদুল করিম চৌধুরী (বংশাবলী প্রণেতা) খাং ইয়াকুব চৌধুরী

১০ দেওয়ান আবদুল হাদির আবদুল হেলিম চৌধুরী কন্যা আমীরউন্নেছা খাতুন

১১ চৌধুরী (বালী দীঘীর পার) (মনসুর নগর)

মন্তব্য (ক) শ্রীহট্ট ইতিবৃত্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত বংশাবলী মধ্যে ইছাখাঁর পর তিন পুরুষ 'অজ্ঞাত' দেখান হইয়াছে। হাজিখাঁর পরও তদ্রূপ তিন পুরুষ 'অজ্ঞাত' দেখান হইয়াছে।

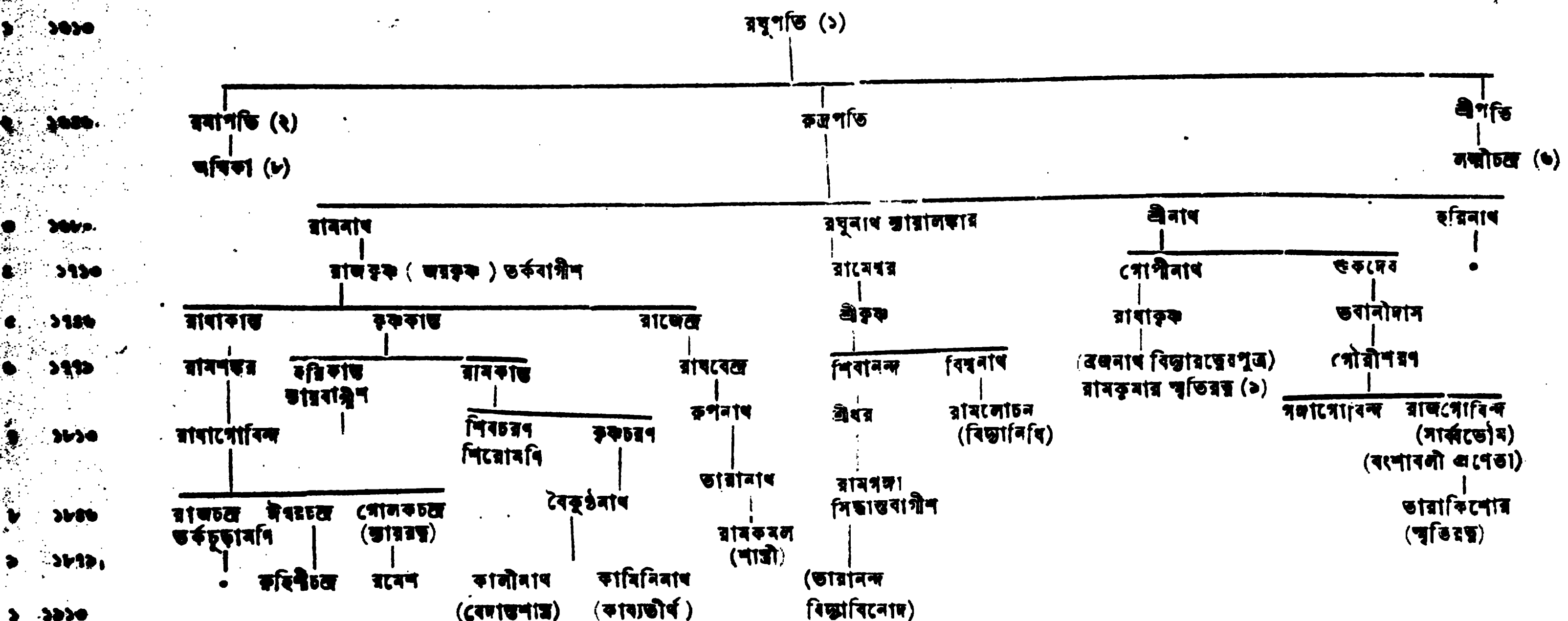
(খ) আবুল মুজফর চৌধুরীর অধীন রাজারাম দাস নামক জনৈক ব্যক্তি রঘুপতি বংশীয় জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ হইতে শক্তি মন্ত্র গ্রহণ করেন (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১৬৫ পৃঃ)। উপরোক্ত বিবরণ প্রকৃত হইলে ইহারা সকলেই পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন।

(গ) সুবিদনারায়ণ বংশীয় আবুল ফজল চৌধুরী, খাং নাওয়াজ চৌধুরী এবং আবুল হেকিম চৌধুরী ১৭০১ খৃঃ অব্দে নবগঠিত সমসেরনগর পরগণার চৌধুরী পদ লাভ করেন। ...ই মর্মে শ্রীহট্ট ইতিবৃত্ত গ্রন্থের ১৮৬ পৃষ্ঠায় একটি সনদের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট (খ)।

ইটা কাত্যায়ন বংশ পত্রিকা—

(সার্ব্বভৌমকৃত বিবরণী হইতে। *



Summarised from—

* Exhibit No. 3 in suit No. 1301 of 1901, Maulavibazar second Munsiff's court. Filed by witness Tarakishor Smritiratna.

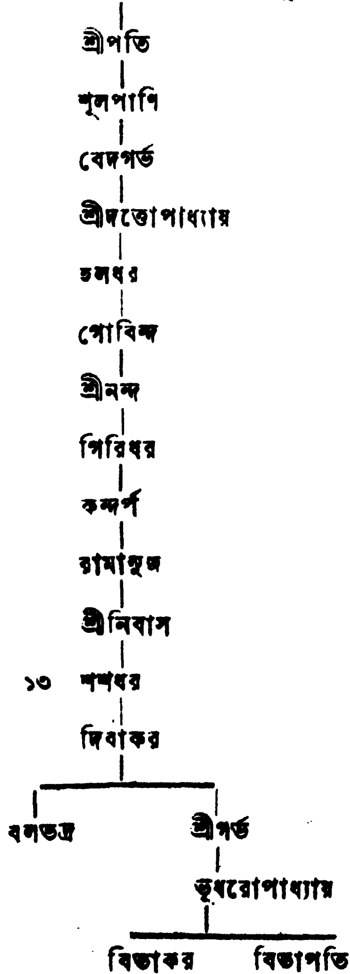
পরিশিষ্ট। (গ)

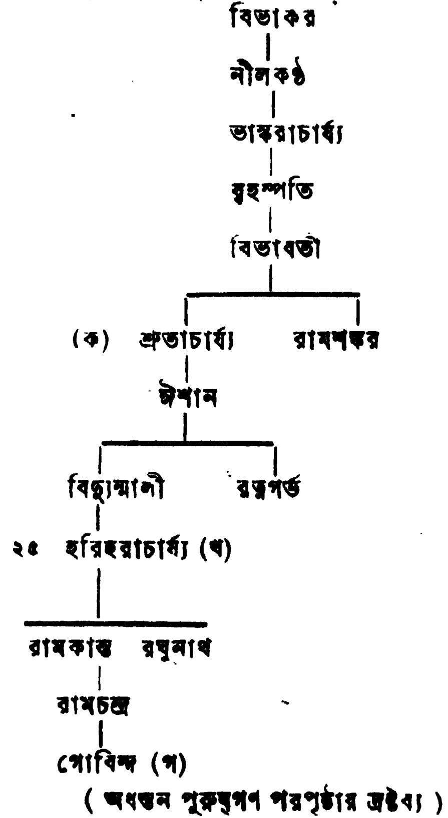
শ্রীহট্টে বৈদিক সমাজ।

কাত্যায়ন গোত্র।

(জাতীয় ইতিহাস, ৩য় অংশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা হইতে।)

১ শ্রীধরাচার্য্য (৫৩ ত্রিপুরাব্দে মিথিলা হইতে শ্রীহট্টে আগত।)





(গ)

পুরুষ			
১১	গোবিন্দ		
১০	রঘুপতি	২৯ রঘুনাথশিরোমণি (ঘ)	
৯	রুদ্রপতি (চ)		
৮	৩১ শ্রীরাম (১ম পুত্র)	রঘুনাথ (ঙ) (২য় পুত্র)	শ্রীনাথ (৪র্থ পুত্র)
৭	জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ	রামেশ্বর	শুকদেব চক্রবর্ত্তী
৬	রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার	শ্রীকৃষ্ণ	ভবানীপ্রসাদ
৫	রামশরণ	শিবানন্দ	গৌরীশঙ্কর
৪	রাধাগোবিন্দ	শ্রীধর	রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম
৩	গোলকচন্দ্র ন্যায়রত্ন	রামগঙ্গা সিদ্ধান্তবাগীশ	তারাকিশোর স্মৃতিরত্ন
২	রমেশচন্দ্র	তারানন্দ বিদ্যাবিনোদ	তারেশচন্দ্র
১	৩৮ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র	গদাধর	

কাত্যায়ন বংশাবলী সম্বন্ধে মন্তব্য।

(ক) শ্রুতাচার্য্য ও রামশঙ্কর পর্য্যন্ত পুরুষগণনা পূর্ব্বে ছিল না। তখন ঈশান হইতে বংশগণনা হইত। বংশের প্রাচীনত্ব দেখাইবার জন্য পরে সংযুক্ত হয়।—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দ বাজার। (২৫ অক্টোবর ১৯০৬) দ্রষ্টব্য।

(খ) গণক বংশীয় হরগোবিন্দ আচার্য্য প্রভৃতি ইহার বংশধর এইরূপ ও অবগতি হওয়া যায়। আনন্দ বাজার (২৫ অক্টোবর ১৯০৬)।

(গ) পঞ্চখণ্ড বংশপত্রিকায় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এই নামের পরিবর্ত্তে রুদ্রপতি নাম দৃষ্ট হয়।

(ঘ) পঞ্চখণ্ড বংশ পত্রিকায় রঘুনাথ শিরোমণির নাম নাই। উক্ত বংশপত্রিকায় রমাপতির নাম রহিয়াছে।

(ঙ) হিন্দু পরিবারে খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রের একই নাম—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

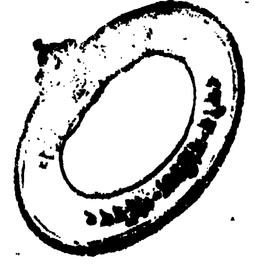
(চ) ইহার কোনও কোনও কাত্যায়ন বংশপত্রিকা মধ্যে এই নাম দৃষ্ট হয় না।

পরিশিষ্ট (ঘ)

("রঘুপতি রাজা সুবিদনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ পূর্ব্বক ইটায় বাস করেন। প্রসিদ্ধ কনক সিংহের বাড়ীই রঘুপতির বাড়ী ছিল। ইহা রঘুপতি ভট ছেগার ভূমি।")

পঞ্চখণ্ড মৌং দাসগ্রাম—
কাত্যায়ন গোত্র সারণী—

- লক্ষ্মীকান্ত
  - রুদ্রপতি (১)
    - রঘুপতি (২)
    - রমাপতি (২) (ঘুঙ্গাদিয়া হইতে আসিয়া দীঘীরপার বাসকরেন, পরে দাসগ্রামে বাস করেন)।
      - জয়কৃষ্ণ (৩)
        - হরকৃষ্ণ (৪)
          - রমাকৃষ্ণ (৫)
            - (৬) রামকৃষ্ণ
              - যদুনাথ (৭)
                - গঙ্গাচরণ
                  - গৌরীনাথ
              - রঘুনাথ (৭)
                - নীলকণ্ঠ (৮)
                  - অভয়াচরণ (৯)
                    - (১০) প্রসন্নকুমার
                      - উপেন্দ্রকুমার
                    - তারকচন্দ্র (১০) (বংশাবলী প্রণেতা)
            - ভবানীচরণ
            - জয়কৃষ্ণ
              - গণেশ্বর
          - গঙ্গাধর
            - উমাকান্ত
              - শ্রীকান্ত
              - চন্দ্রকান্ত
        - বলরাম (৪)
          - রামায়ণ (৫) (রমাকান্ত)
            - রাধাকান্ত (৬)
              - রতিকান্ত (৭)
                - কৃষ্ণকান্ত (৮)
                  - হরকান্ত
                  - তারাকান্ত (৯)
                    - নিশিকান্ত (১০)
                  - অম্বিকাকান্ত
                - গৌরীকান্ত
                  - রুদ্রকান্ত
                    - রমণীকান্ত
              - গোবিন্দরাম (৭)
          - রূপেশ্বর (৫)
          - রামজীবন (৫)
            - কামদেব (৬)
              - রামগোপাল (৭)
                - হরেকৃষ্ণ (৮)
                  - রাধাকৃষ্ণ (৯)
                    - কালীকৃষ্ণ (১০)



প্রতিভা

৩য় বর্ষ চৈত্র ১৩২০ ১২শ সংখ্যা

আনন্দী কবি

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

মনসা পুরাণের বহু কবির নাম শুনিয়াছি। দুই চারিজনের গ্রন্থ পড়িয়াছিও। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় যে তালিকা বাহির করিয়াছেন, তাও চক্ষু গোচর করিয়াছি। কিন্তু মনসা পুরাণ উপলক্ষে আনন্দী কবির কোন উল্লেখ এ যাবৎ পাই নাই। আনন্দী কবির একখানা মনসা পুরাণ বহুপূর্ব্বে আমার হস্তগত হইয়াছিল কিন্তু মনসার ভাসান চিত্রে এত কবির সমাবেশ হইয়াছে যে, তাতে আবার এক আনন্দী কবির আবির্ভাব কেবল একটা হট্টগোল আনয়ন করিবে ভাবিয়া এতদিন সে বিষয়ে কোন প্রয়াস পাই নাই।

কিছুদিন হইল গরমের ছুটিতে বাড়ী গিয়া গৃহ-সংস্কারের বড় সাধ হইল। রান্না ঘরে উননের কাছে তাকারির উপর গোটা ত্রিশেক পুস্তকের বস্তানি ছিল। দীর্ঘকাল ধূম্রসেবনে তাদের বর্ণ বৈশাখীয় নবজলধর-পুঞ্জের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। সরস্বতীর এই অক্ষয় প্রসাদগুলি বোধ হয় দুই পুরুষ যাবৎ উপযুক্ত ভক্ত খাদকের অভাবে কীটাদিরই উদর পূর্ত্তি করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতেছিল।

যথাসম্ভব অগ্নিদেবের তৃপ্তি সাধনের জন্য তাহাদিগকে মৃত্তিকাধামে অবতীর্ণ করাইলাম। দেখিলাম তাতে বহু পদার্থই আছে। বালি কাগজে মক্স হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন পর্য্যন্ত ত আছেই; আরও আছে দৈনিক জমাখরচের হিসাব, যাতে মাসবরাদ্দ জিনিস পত্রের মধ্যে পাঁচ পয়সার তেলের কথাও আছে; মাটি খরিদের হিসাব,যাতে ৮০৲ টাকায় আড়াই শত বিঘা ভূমি কিনিবার কথা আছে; আর সুখদুঃখের হিসাব—লেখক যাতে চাউলের মণ ১৷০তে চড়িয়া গিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত খেদ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং লিখিতের সর্ব্ব-বিষয়ক মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া পত্রে "ইতি দিয়াছেন।"

এর পর খানকতক খাতাপত্র উল্টাইয়া একখানা হাতের লেখা পুঁথি চোখে পড়িল। রামপালের প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিয়া মাথাটা ইদানীং একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; এবং ছেড়া পুরাণো কাগজের টুকরাটি দেখিলেও চোখ দুটি শকুনির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া তার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িত। সুতরাং পুঁথিখানা দেখিবা মাত্রই ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইলাম এবং যেন কোন রাজ্যের রাজত্বই বা ততোঽধিক মন্ত্রিত্বই পাইয়া বসিয়াছি, এমনি গম্ভীর ভাবে চশমাটি নাকের আগায় স্থাপন করিয়া পাঠোদ্ধারে লাগিয়া গেলাম।

পুঁথিখানির জীর্ণতার পরিমাণ দেখিয়া প্রথমে মনে

হইয়াছিল, হয় ত বা দুই কি আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন সম্পত্তি হইবে এবং হয় ত বা ইহার পাঠোদ্ধারের জন্য কোন বৈদিক ঋষিকে চিত্রগুপ্তের খাতা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, কিন্তু যখন পড়িতে গেলাম, তখন দেখি এ নিতান্তই পরিচিত হস্তলিপি, এবং ইহার পাঠোদ্ধারের জন্য কোন আধুনিক বিদ্যাবিনোদেরও প্রয়োজন হয় না।

পুঁথিখানার নাম জয়দেবচরিত। ইহাতে গীত গোবিন্দ প্রণেতা জয়দেবের চরিত্র পদ্যে লিখিত হইয়াছে। ভাষা অর্দ্ধ ব্রজবুলি, অর্দ্ধ বাংলা। প্রথমার্দ্ধে ভনতা

"তেঁহ ঠাকুরের চরিত্র মধুময়
বর্ণাইতে আনন্দীর আনন্দ বাড়য়।"

"দীন গৌর কিশোরের" নামে পরবর্ত্তী অধ্যায় গুলির ভনতা। সিদ্ধান্ত করিলাম, আনন্দী কবি পুস্তকখানা আরম্ভ করেন গৌর কিশোর শেষ করেন। হয় ত মৃত্যু কি অপর কোন দুর্ঘটনা প্রথম কবির চিত্র-লেখাটি পূর্ণ হইতে দেয় নাই।

জয়দেব চরিতের পর একখানা গানের খাতা হস্তগত হইল তাতে কতগুলি বৈষ্ণব কবিতা, অধিকাংশই কীটদষ্ট।

এই জয়দেবচরিত ও বৈষ্ণব কবিতা পড়িয়া কবির জীবনাখ্যায়িকাটি জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা হইল। বৃদ্ধদের গল্প ও পুস্তকের ভূমিকা ভনতা ইত্যাদি হইতে কিছু যে তথ্যোদ্ধার না হইল, তাও নয়। নিম্নে তার একটা হিসাব দিতেছি।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিলেট জিলার অন্তঃপাতী ছাতকে আনন্দী কবির আবির্ভাব হয়। এই বংশের উপর বা সরস্বতীর কিঞ্চিৎ কৃপাবৃষ্টি ছিল বলিয়া অনুমান করি। আনন্দী কবির পর তৃতীয় পুরুষে যুগল কিশোর শর্ম্মা, ভৈরব চন্দ্র শর্ম্মা ও গৌরকিশোর শর্ম্মা। ইহাদের প্রথমোক্ত ব্যক্তি সিলেট জিলার প্রথম ইংরাজী-ওয়ালাদের একজন। দ্বিতীয় বহু বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা। জয়দেব প্রসঙ্গে তৃতীয়ের নামোল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের পরবর্ত্তী পুরুষে ঈশান চন্দ্র শর্ম্মা † একজন সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্যরথী দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তাঁর যে পত্রবিনিময় হইত, তার দুই একখানা আমাদের জীর্ণ বস্তানিগুলির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। পত্রগুলির অধিকাংশই সাহিত্য লইয়া আলোচনা।

আরো দুই একজন কবি এ বংশে ছিলেন, কিন্তু তাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য নহে। তাঁদের কারো কারো কাব্যরস হয়ত বিন্দাদূতীর এক দৌত্যেই নিঃশেষ হইয়া গেছে; কারো কারো বা ভাবাবেশ রাক্ষসপুরীর রাজকুমারীর অনুসন্ধানে পাতাল পর্য্যন্তই নামিয়া পড়িয়াছে। তবু তাদের অনেকেই অল্পবিস্তর কবি।

উল্লিখিত কবিদের খাতাগুলি বিশ্বহিতরত হইয়া উইজাতির ক্ষুধানির্ব্বাণের জন্য এম্‌নি ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল যে, দুই একটী সঙ্গীত ছাড়া তাদের পাঠোদ্ধারের আর কোনই আশা নাই। আনন্দী কবির বৈষ্ণব সঙ্গীতগুলিরও প্রায় তদ্দশা। তবে তার এক-খানি পুস্তক একটী মূলমাথাকাটা গাছের মত পাওয়া গিয়াছে; এ প্রবন্ধে তারই আলোচনা করিব কিন্তু তার আগে কবির জীবনী সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক; কারণ তাও একটা ছোটখাটো কাব্য বিশেষ।

কবির পিতার নাম খোদাবক্স ই ছিল, কি ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ছিল, বলিতে পারি না, তবে লোকে তাকে

---

† গণিত শাস্ত্রে ও ইহার বিশেষ অধিকার ছিল। তৎপ্রণীত গণিত ভূগোলের একখানা হস্তলিপি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জানকী নাথ দাস মহাশয়ের কাছে আছে। আজকাল যে প্রণালীতে ভূগোল শিক্ষা চলিতেছে, ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এঁরা তারই আলোচনা করিয়াছেন।

খড়ুঠাকুর বলিয়া ডাকিত। খড়ুঠাকুর তিনটি শিশুকে খাতায় জমা দিয়া সংসারের কাজে ইস্তাফা দেন। আনন্দী কবি ইহাদের জ্যেষ্ঠ। বংশ হিসাবে সে আজ প্রায় ১৫০ বছরের কথা। ইংরাজ রাজত্ব তখন বদ্ধমূল না হইলেও মুসলমানের প্রভাব একবারেই খর্ব্ব হইয়া হইয়া পড়িয়াছে এবং মারহাট্টা ও ইংরাজে রাজ্য লইয়া একটা বোঝাপড়া চলিতেছে। দেশব্যাপী রক্তারক্তির মধ্যে মানুষ তখন আদর্শ হারাইয়া সুতাকাটা ঘুড়ির মত বাতাসে বাতাসে ছুটিতেছে এবং যথেচ্ছাচারকে বিচার ও লাম্পট্যকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহজীবনের মধ্যেই নরকের পথে কার্পেট বিছাইতেছে। তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিকারগ্রস্ত হইয়া বুজরুকি ও মদ্যমাংসসেবায় পরিণত হইয়াছে আর চৈতন্যের হরিপ্রেম বিকৃত আচারের আশ্রয় নিয়াছে। বাদসাহী-বিলাসে জর্জ্জরীভূত এদেশের নৈতিক মজ্জার উপর বাণিজ্যের স্বার্থের নিদারুণ কশাঘাত পড়িয়াছে এবং কাব্যও তার তাড়নায় মানুষের বিকৃত রুচির হেয় তোষামোদে আত্মসমর্পণ করিয়াছে—অলঙ্কার, শব্দবিন্যাস আর অশ্লীলতাকেই বরণ করিয়া ভাবকে তেপান্তরপারে নির্ব্বাসন দিয়াছে। এক কথায় ভারতবর্ষের একপ্রান্তে তখন রক্ততৃষ্ণা, অপর প্রান্তে অনাচার; একপ্রান্তে যুদ্ধ অপর প্রান্তে ডাকাতি; একপ্রান্তে অশান্তি, অপর প্রান্তে ভ্রান্তি। কাব্য এর মধ্যে একটা আষাঢ়ী ঝঞ্ঝার মত অসংযত অথবা ক্রীতদাসের মুক্ত সত্তাহীন না হইয়া পারে না।

এই নিয়মবন্ধনহীন কালে কবি রামানন্দ (আনন্দী) জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্পবয়সে পিতামাতাকে হারাইয়া কাণ্ডারী হারা তরীর মত সংসারসাগরে ঘুরিতে থাকেন। বাহিরে যেমন সমাজের বন্ধন তেমন শক্ত ছিল না ঘরেও তেমনি স্নেহের বন্ধন বড় কিছু বর্ত্তমান ছিল না। মানুষ এমন অবস্থায় স্বভাবতঃ মূর্খই হইয়া থাকে। কিন্তু আনন্দীকবি তা হইলেন না। বৈষ্ণব গ্রন্থ ও সংস্কৃত কাব্য লইয়া তিনি যে মাতিয়া পড়িয়াছিলেন তাঁর প্রণীত গ্রন্থসমূহেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাল্যকাল হইতে রামানন্দের হৃদয় ভাবপ্রবণ ছিল। তিনি রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন এবং নির্ঝর চিত্রিত শেলা শৈলমালার নীলায়ত দেহে সেই পরমপুরুষের দেহকান্তি দেখিয়া দেখিয়া বনকুন্তলা সুরমার তীরে এক একদিন আত্মহারা হইয়া বসিয়া থাকিতেন।

নিশান্তের ঊষাপ্রতিভা পূর্ণ মহিমায় জাগিয়া উঠিয়া তাঁর অসংযত কেশদামের উপর শিশিরবারি সিঁচিয়া যাইত, সন্ধ্যার বর্ণবৈচিত্র্য ভরানদীর উচ্ছ্বসিত জলবক্ষে প্রতিহত হইয়া তাঁর ভাবালস অক্ষিপুটে চুম্বন করিত। শুনা যায় একদিন বালক রামানন্দ কি করিয়া হারাইয়া গেলেন। পথে হাটে ঘাটে মানুষ খুঁজিতে লাগিল; খুঁজিতে খুঁজিতে পাওয়া গেল, তিনি চিকুর জঙ্গলে* একটা সুন্দর ছোট গাছের গলায় ফুলের মালা পরাইতেছেন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কবির ভাবসাগরে লহরীনৃত্য প্রারম্ভ হইল। পরে যখন নবযৌবনের প্রথম অরুণ-রশ্মি সেই তরল সুনীল ফেনিল জলরাশিতে প্রতিবিম্বিত হইল, যখন শীত-সূর্য্যের মত অস্ফুট, বানের মত উদ্দাম, মহাকালের মত বুভুক্ষু এক বাসনালীলা হৃদয়ের মধ্যে জলকম্পের মত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তখন সুক্ষণে হউক, কুক্ষণে হইক, পূর্ব্বজন্মের পুণ্যের ফলেই হউক, পাপের ফলেই হউক, সেই উদ্বেল ভাবসাগরের দূর জলান্তে একদিন চাঁদের উদয় হইল—সাগরের বুক ফুলিয়া উঠিল—জোয়ার ছুটিল।

---

* ছাতক বাজারের দক্ষিণে এক গভীর জঙ্গলে চিকু নামক ডাকাত থাকিত। তার নামানুসারে জঙ্গলের নাম চিকুর জঙ্গল হয়। সে জঙ্গল এখন আবাদ হইয়া অল্প মাত্রই অবশিষ্ট আছে। পুকুরের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। বর্ষা কালে ছেলেবেলায় এ পুকুরে মাছ ধরিতে যাইতাম।

সে চাঁদ এক ভিক্ষুণী। ভিক্ষুণী রূপবতী ছিল, কি কুরূপ ছিল; বৈশাখী মেঘের মত তাঁর কেশের রাশি ছিল, না চাঁছাছোলা নারিকেলটির মত তার মাথার খুলি ছিল; ঠোঁট দুখানি বাঁধুলির মত রাঙ্গা ছিল, না শীতের গোলফুলের মত পাংশু ছিল; জানিবার আমাদের উপায় নাই। তবে এটুকু বলিতে পারি যে তার বয়স ছিল। পরিশ্রমে দেহ সবল ছিল; কপোলে স্বাস্থ্যের লালিমা ছিল, চক্ষে নবযৌবনের ছায়াময়ী উন্মাদনা ছিল। সেই আনন্দময় রূপ লইয়া, হাতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষুণী ঠাকুরবাড়ীর দ্বারে হরেকৃষ্ণ বলিয়া দাঁড়াইল। ভাগ্যেরও উপহাস, সেই সময়ে আর কেহ বাড়ী ছিলেন না; তাই কবিকেই ভিক্ষা দিতে হইল।

কবি রামানন্দ ভিক্ষা দিলেন, ভিক্ষুণী জোড়হাতে পাত্র ধরিয়া ভিক্ষা লইল। দিবার নিবার সন্ধিকালে চারিচক্ষুর সন্ধি হইল। কবির হাত কাঁপিল, নারীর হাত থামিল, কবির মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, নারীর চোখ নত হইয়া পড়িল; তারপর? তারপর প্রকৃতি যা চায় তাই করিল, বিশ্বপরিণয়ের অদৃশ্যসূত্র প্রণয়ী-প্রণয়িণীর হাতে হাতে বাঁধিয়া দিল।

যারা প্রেমে মজিয়াছে, প্রেমের শক্তি তারাই জানে। অনন্ত নীল আকাশ যেমন জ্যোতিষ্কমালাকে ধরিয়া আছে, প্রেম তেমনি সৃষ্টির নানান্ বৈচিত্র্যকে এক গ্রন্থিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ইহা স্বর্ণতন্ত্রীর মত উজ্জল, বায়ুতন্তুর মত সূক্ষ্ম, সিংহস্নায়ুর মত সুদৃঢ়। ইহার প্রবল আকর্ষণে কত রাধিকা কুল ত্যাগ করিয়াছেন, কত চণ্ডীদাস জাতি ত্যাগ করিয়াছেন, কত ভ্রমর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আনন্দী কবি সে আকর্ষণে পড়িলেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইলেন। যার প্রেমে বৈরাগী হইলেন, আমরা তার নাম পাই নাই; কি করিয়া উভয়ের পূর্ব্বরাগ মিলনে পরিণত হইয়াছিল, তারও কোন সংবাদ জানি নাই। হয় ত কোন দুখের রোগশয্যায় একে অন্যের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, হয় ত কোন জলোদ্বেল বর্ষার নৌকা ডুবি হইতে একে অন্যেকে বাঁচাইয়াছিলেন, হয় ত কোন নির্ম্মল শরৎজ্যোস্নার গন্ধবিধুর বকুলতলায় উভয়ে পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিলেন—জানি না কি হইয়াছিল। শুধু এইমাত্র জানি যে রামানন্দ বৈষ্ণবীকে হইয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। আর একটু জানি যে সর্পাঘাতে সে প্রেমিকা বৈষ্ণবীর ইহজীবনের প্রেমলীলা সাঙ্গ হইয়াছিল। এই গেল কবির জীবনেতিহাস। এর পর তাঁর কাব্যের কথা তোলা যাইতে পারে। তাঁর কাব্যের মধ্যে প্রধান পদ্মাপুরাণ। আজিকার আলোচনা আমি উহারই মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাই।

এই বিরাট গ্রন্থখানি তিনখণ্ডে বিভক্ত। স্বর্গ খণ্ড, মর্ত্ত্যখণ্ড ও পাতালখণ্ড। তুলসীলীলা লইয়া স্বর্গখণ্ড আরম্ভ। তারপর সমুদ্র মন্থন, গরুড়ের জন্মকাহিনী ও গজকচ্ছপের যুদ্ধ; তারপর দক্ষযজ্ঞ, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, ও তারকসংহার এবং মনসার বাল্যলীলা। এর একটি অধ্যায় এক একটি কাব্য বিশেষ।

তুলসীলীলায় কবি একটি অতিবড় দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। সে অজ্ঞানকৃত ও জ্ঞানকৃত পাপের তুলনা। পাপ—পাপ, সে অজ্ঞানেই কর, আর জ্ঞানেই কর। কর্ম্মের যদি একটা ফল থাকে, তবে অজ্ঞানকৃত পাপেরও ফল একটা ফলিবেই ফলিবে। না জানিয়া বিষ খাইলে মানুষ মৃত্যু হইতে রক্ষা পায় না, না জানিয়া পাপ করিলেও পাপের শক্তি স্তব্ধ হইয়া থাকে না। মানুষের কাছে তুমি নিন্দা কম বেশী পাইতে পার, সমাজের বিচারে তুমি নিষ্কৃতি পাইতে পার, কিন্তু তুমি যে না জানিয়া করিয়াছ, সেই জন্য প্রকৃতি তোমাকে ক্ষমা করিবে না—অটল নিরপেক্ষ নিয়তি তোমাকে ক্ষমা করিবে না। অজ্ঞান যে নিজেই একটা পাপ। সুতরাং তোমার অজ্ঞানকৃত পাপেরও ফল ফলিবে—সে ফল তুমি নিজেই ভোগ কর, তোমার পুত্রপৌত্রই ভোগ করুক, আর তোমার সমাজই ভোগ

করুক। তুলসী অজ্ঞানে পাপ করিয়াছিলেন, সে পাপের ফলে শঙ্খচূড় প্রাণ হারাইল। ইহা প্রকৃতির প্রতিশোধ।

শঙ্খচূড়ের চরিত্র আদর্শ। সে কালের সময় ও অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে এই চরিত্র আরও ফুটিয়া উঠে। পূর্ব্বে প্রেম হইয়া পরে বিবাহ বিদ্যাসুন্দরেরও হইয়াছিল, তুলসী শঙ্খচূড়েরও হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যা-সুন্দরে সে প্রেমের কি বিকট অসংযম, তুলসীলীলায় তার কি পুণ্যপরিণতি! শঙ্খচূড়তুলসীর প্রেম বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনের মধ্যেই চাপা ছিল—সংযমের আগুণে নিকষিত হইয়া উঠিয়াছিল—বিদ্যাসুন্দরী তুবড়ির মত উচ্ছসিত হইয়া পড়ে নাই। একদিন মাত্র শঙ্খচূড় একটু চঞ্চল হইয়াছিলেন। তুলসী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "মার্জ্জনা কর; আমি কুমারী। তোমার সঙ্গে প্রেমালাপে আমার সত্য নষ্ট হইবে, তোমারও হইবে। আমি যা ধর্ম্মসঙ্গত তাই বলিতেছি, তুমি আমার অপরাধ নিও না, আমার প্রতি মনক্ষুণ্ণ হইও না।" গুরুগৃহে শাস্ত্রালাপমধ্যে এই প্রণয়ী-প্রণয়িনীর পূর্ব্বরাগ সঞ্জাত হয়। শঙ্খচূড় তখন ব্রাহ্মণ-পুত্রের ছদ্মবেশে ছিলেন। বিবাহের পর একদিন সেই ছদ্মবেশ পরিয়া প্রথম যৌবনের সেই উন্মাদক স্মৃতি লইয়া রসিক প্রেমিক তুলসীর সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন এবং প্রেম ভিক্ষা করিলেন। সতী উত্তর করিলেন

অকারণে আমারে না দিও ব্রহ্মশাপ,
শঙ্খপরে যতেক পুরুষ মোর বাপ।

এই তুলসী বিবাহিত জীবনে পতিব্রতার আদর্শ। তাঁর কাছে শিবও নাই, বিষ্ণুও নাই, ব্রাহ্মাও নাই ইন্দ্রও নাই; এক পতিই তাঁর সর্ব্বস্ব। কিন্তু একদিন-কার এক ভ্রম তাঁর সমস্ত নষ্ট করিয়া দিল। ভ্রমের অপরাধ, অজ্ঞানের অপরাধ মহাদেব ক্ষমা করিলেন না। তার ফলে বিষ্ণুর হাতে শঙ্খচূড়ের নিধন।

শঙ্খচূড়ের নিধনে তুলসীর বিলাপ ও আত্মধিকার কি মর্ম্মস্পর্শী! ইহাতে অজবিলাপের উন্মাদনা নাই, রতিবিলাপের রচনা-চাতুর্য্য নাই; কিন্তু যাহা আছে, তা খাটি; তা বাস্তব—তা আর কিছুতে নাই।

শঙ্খচূড়ের মৃত দেহকে বেষ্টন করিয়া তুলসী কাঁদিতেছেন—

"উঠ উঠ আরে প্রভুরে, শঙ্খনরপতি
আমি যে অভাগী নারী—কি হইবে গতি?
দেবতা অসুর নাগ নরপশু যত
আপনার ভুজবলে করিলায় হত!
হৈলায় অযোনিজন্ম হরের কৃপায়
জিনিলায় ত্রিভুবন ইঙ্গিত লীলায়।
শিবের আজ্ঞায় পাইলা পতিব্রতা নারী
কোন দেবে মায়া করি আইল মোর পুরী?
ধরিল তোমার রূপ সত্য কৈল নাশ,
তেকারণে হৈলে প্রভু অকালে বিনাশ!"

এই শেষ কথাটুকু বলিবার সময় তুলসীর হৃদয় যেন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে চক্ষু ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে; তাই দুই হাতে জোরে চুল ছিঁড়িতেছেন—কপালে কাঁকন দিয়া আঘাত করিতেছেন। আবার কখন রুষ্ট হইয়া বলিতেছেন—

"বিনা অপরাধে মোরে যে কৈল নৈরাশী
শাপ দিয়া তাহাকে করিব ভস্মরাশি
কিবা ব্রহ্মা কিবা বিষ্ণু কিবা সুরপতি,
বৃন্দার শাপেত কারো নাহি অব্যাহতি।"

তার পর আবার আক্ষেপ করিতেছেন—

"নব যুবাকাল প্রভু তোমার বনিতা
হেন নারী শূন্য ঘরে প্রভু গেলা কোথা?
কোথা ছাড়ি গেলা প্রভু রত্নসিংহাসন,
কোথা ছাড়ি গেলা প্রভু গজবাজিধন
কোথা ছাড়ি গেলা প্রভু কাঞ্চন নগরী
শূন্য ঘরে কান্দে তোমার বৃন্দা পাটেশ্বরী।"

কাঁদিতে কাঁদিতে অনাথিনী পাগলের মত হইয়া উঠিল, কপালের সিন্দুর মুছিয়া ফেলিল, আর

"ছিঁড়িলা মুক্তার হার ভাঙ্গিল কঙ্কণ।"

এই পতিব্রতা নারীর উপযুক্ত স্বামীই ছিলেন শঙ্খচূড়। তিনি অনার্য্য রাজা কিন্তু শিবভক্ত, বিদ্বান এবং বীর। তুলসীও বিদুষী ছিলেন। ইহা দেখিয়া পুরাতত্ত্ববিদ সে কালে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিলই ধরুন আর নাই ছিল ধরুন, এটা কিন্তু বেশ বুঝা যায় যে অনার্য্যের বেদপাঠে আর্য্যব্রাহ্মণের বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না। শঙ্খ অনার্য্য হইয়াও বেদজ্ঞ ছিলেন এবং এমনি বীর ছিলেন যে বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধকালে

বাধিলেক মল্লযুদ্ধ দুই বলবান
দুজনার পদাঘাতে মহী কম্পমান।"

আবার

"কেহ কারে নাহি জিনে সম দুই জন।"

এই বীরের প্রাণ লইবার জন্য বিষ্ণুকে বিশম্ভর রূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল।

তুলসীলীলার পর দক্ষযজ্ঞ ও উমাপরিণয় উল্লেখ যোগ্য। এ অধ্যায়ের রচনা বড় চমৎকার। কবি এখানে হাসিয়াছেন ‡ কাঁদিয়াছেন, বকিয়াছেন ‡ আবার শান্তির কথাও কহিয়াছেন। কখনো হাসির পর অশ্রু উথলিয়া উঠিয়াছে, কখনো অশ্রুবিন্দুর ভিতর দিয়া হাসির ছায়া-পাত হইয়াছে। আরম্ভটা ধরা যাক্। তুষারশুভ্র কৈলাসের লোকাতীত সিংহাসনে শিবসতী বসিয়া আছেন। দক্ষ-যজ্ঞের কথা উঠিয়াছে। সতী বলিলেন

"আসিয়াছে যত দেবগণ
তোমা কেন পিতায় না করিলা বার্ত্তন ?"

শিব রহস্য করিয়া উত্তর দিলেন

"মোর সঙ্গে তোমার না হইল নিমন্ত্রণ
আমারে বরিয়া প্রিয়া হইলা অভাজন"

সতী জোরের সহিত সে কথা অস্বীকার করিলেন। বলিলেন,

"শিবব্রহ্মা অনাদি নিধন
তুমি পরে পতি যোগ্য হয় কোন জন ?
জগতে পুরুষ নাই একমাত্র শিব।"

সুতরাং "হেন শিব ছাড়ি যজ্ঞ কে করিতে পারে ?" সতী দাবি করিলেন। রসিক শিব সতীকে ক্ষেপাইয়া মজা দেখিবেন; তাই হাসিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন

"আমি বৃদ্ধ আর অনাচারী
পরিধান পশুচর্ম্ম, জনম ভিকারী।
ভূষণ বাহন মোর দেখিতে কুৎসিত
ভূত বেতাল সঙ্গে করি নৃত্যগীত ॥
আমি গেলে হরিষেতে হইবে বিষাদ
তে কারণে দক্ষ মোরে না দিল সংবাদ ॥"

এখানে শিবের হাসির ভিতরে অবজ্ঞাত জামাতার অভিমানের ছায়া স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু আর একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই সতীদেখান অভিমানের অভ্যন্তরে একটা অটল সংযম আছে, একটা অনাবিল বৈরাগ্য আছে যা ঝড়ের মত প্রবল, জড়ের মত নিষ্কাম, অথচ বিশ্বপ্রেমের মত অকঠোর, যার বলে মহাদেবের কাছে সকল বিলাসবিভব, সকল ধনমান সকল সাংসারিক ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতি তুচ্ছাদপিতুচ্ছ।

যাই হউক, শিব সতীকে উত্তেজিত করিতে চাহিয়াছিলেন—সতী উত্তেজিত হইলেন—বলিলেন, "ছার যজ্ঞ করে মূর্খ পিতা।"—শিবের তামাসা দেখিবার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। কিন্তু হায়, কে জানিত, এই তামাসার ভিতর দিয়া নিষ্ঠুর নিয়তি তার ধ্বংসলীলার কোন চাল চালাইবে? কে জানিত, এই প্রেমিক দম্পতির রহস্যের হাসি মৃত্যুর দূতকে ঘরে ডাকিয়া আনিবে—চক্ষুর জলে অবসান পাইবে? তাই স্বয়ং সংযমের অবতার মহাদেবকে কাঁদিয়া বলিতে হইল

"উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়া প্রাণেশ্বরী সতী
তোমার অভাবে মোর কি হইবে গতি ?
... ..."

কুক্ষণে কহিনু কথা আমি অভাজন
কুক্ষণে কহিনু হায় রহস্য বচন।
কুক্ষণে করিল যজ্ঞ দক্ষ মতিনাশ
তার পাপে আমার হইল সর্ব্বনাশ !
... ...
সহিতে না পারি সতী তোমার সন্তাপ
অনলেতে পুড়ি কিম্বা জলে দেই ঝাঁপ।
... ...
কর্ম্মদোষে কুবচন কৈল পাপমতি
আপনার দোষে তার হইল অধোগতি।
কোপ পরিহর প্রিয়া চল যাই ঘরে
আনন্দে বসতি করি কৈলাস শিখরে।"

কিন্তু সতী উঠিলেন না, ঘরে গেলেন না! সুতরাং শিব আর কি করিবেন? প্রাণপ্রিয়ার মৃতদেহ কাঁধে লইয়া দেশে দেশে ঘুরিতে থাকিবেন।

সতীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াই শিবের যে অবস্থা হইল, তার কথা বৈজ্ঞানিকের নিপুণ হাতে লেখা হইয়াছে।

"কি বোল নারদ?" বলি কহিলেক বাণী
এক দৃষ্টে রহিলেক দেব শূলপাণি!
এক বাক্য পরে মুখে না আসে দোসর"

সত্য কথা, এমনি হয় বটে। তার পর যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, কথার অর্থ বোধ হইল, তখন

"কাল রুদ্র অবতার হৈলা শূলপাণি
কাঁপে স্বর্গ রসাতল কাঁপয়ে মেদিনি॥
শিব অঙ্গ কাঁপিতে কাঁপয়ে ত্রিভুবন
প্রমাণ (?) গণিতে লাগে দেব ঋষিগণ।"

কিন্তু তিনি কাঁদিয়া অধীর হইলেন না। আগে দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংস হউক, পাপের ফল ফলুক, তবে ত কাঁদিবার সময়!

এই শিবচরিত্রের সঙ্গে কবির সমসাময়িক ভারত চন্দ্রের শিবের তুলনা করিলে মন্দ হয় না। প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বলেন,"অপরাপর কাব্যেও কবি জীবনের কোন গূঢ় সমস্যা কি কঠোর পরীক্ষা উদ্‌ঘাটন করিয়া উন্নত চরিত্রবল দেখান নাই। নির্ব্বাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় মহাযোগী মহাদেবকে ভারতচন্দ্র একটা বেদিয়ার মত চিত্রিত করিয়াছেন। শিশুগুলি তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। "কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল। কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥ কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া। ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া।" সমালোচ্য কাব্যের শিব চরিত্রে কবির এবম্বিধ প্রকারের রহস্যপ্রিয়তা বড় দেখা যায় না। ভারতচন্দ্রের ভাষার উপর প্রবল অধিকার ছিল, ইহাকে লইয়া তিনি আতসবাজিওয়ালার মত ইচ্ছাখুসি খেলাইতে পরিতেন। ভাষা সম্বন্ধে এ যুগে রবীন্দ্রনাথের যে স্থান সে যুগে ভারতচন্দ্রের স্থান বোধ হয় তারো উচ্চে ছিল। কিন্তু ভাব ও ভক্তির হিসাবে আনন্দীকবিকে পাছে স্থান দেওয়া হয় ত অন্যায় হইবে। হৃদয়ে ভক্তি থাকিলে লেখায় তার আনন্দ কি ভাবে ফুটিয়া উঠে, কবির উমাজন্ম পড়িয়া তার আভাষ পাওয়া যায় —

"জন্মিলেক মহামায়া ধরি তামসিক কায়া আনন্দে নাচয়ে দেবগণ।
প্রসন্ন হইলা বিধি সিদ্ধি হইল মহানিধি রক্ষা হইল এ তিন ভুবন॥
চন্দ্রসূর্য্য হরষিত নদনদী প্রনর্ত্তিত দশদিক হইল উজ্জ্বল,
পুষ্পবন প্রকাশিত খঞ্জনে করয়ে নৃত্য কোকিলায় গায়ন্তি মঙ্গল॥
ময়ূরে পেখম ধরে ভ্রমরে গুঞ্জন করে কপোতকপোতী ছাড়ে বোল।
হরষিত তরুলতা ফলপুষ্প সনে পাতা মৃগপক্ষী আনন্দ সকল;
পাতাল পৃথিবী স্বর্গ হরষিত উপবর্গ হরষিত সপ্ত সাগর।
পক্ষীগণ বৃক্ষডালে রব করে কুতূহলে আনন্দিত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।"

তার পর উমার রূপ বর্ণনা। এই রূপবর্ণনা করিতে গিয়া ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন

"কথায় পঞ্চমস্বর শিখিবার আশে।
দলে দলে কোকিলকোকিলা চারিপাশে॥
কঙ্কন ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জনখঞ্জনী॥"

কবি ঝাঁকে ঝাঁকে "অতিশয়োক্তি" বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু রূপ প্রকাশের স্বাভাবিক চেষ্টা এতে কিছুমাত্রই নাই। এর পাশে আনন্দী কবির স্বল্পালঙ্কারা উমাকে দাঁড় করাইয়া দেখুনঃ—

"কিবা দীপ্তি করে আহা নধর অধর।
পদ্মমুখে শোভে যেন চন্দ্র শশধর॥
দন্তের অঙ্কুর মুখে নাহিক তুলনা।
ক্ষুদ্র কেশ অন্তে শোভা করে ঘর্ম্মকণা॥"

এই শেষ চরণটির ভিতর কবিহৃদয়ের কতটুকু কোমলতা, কতটুকু স্নেহ লুকাইয়া আছে তা তিনি বুঝিবেন না, যিনি কোনদিন কেলিশ্রান্তা বালিকার চাঁদমুখের ঘামের কণা হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে মুছাইয়া না দিয়াছেন।

তারপর—"যবে হাসে মহামায়া দেখাইয়া দন্ত।
সেই যে লাবণ্য সুখ নাহি তার অন্ত।"

অন্ত নাইই বটে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকার হাসিভরা মুখের ছোটছোট দাঁতগুলি দেখিয়া সংসারের সকল পাপ, সকল কুটিলতা সকল দুঃখ যে মরিয়া যায়! আবার "মা বাপের প্রাণ তুল্য লাবণ্য চলন।
মহাধীর ক্ষমাশীল ধরণী সমান।"

এ মা হইলে বালিকার দেবত্ব ফুটিবে কেন? কবির অগাধ ভক্তি বুকভরা স্নেহ ফুটিবে কেন? কিন্তু রামানন্দের কল্পনা যে কেবল বাস্তবেই রহিয়াছে, আদর্শের দিকে ছুটে নাই, তা নয়। কবিরচিত "স্বর্ণ ভগবতীর" রূপ দেখিয়া জড় ও প্রাণ পায়, জড়ও আত্মহারা হইয়া পড়ে তাই

"লাবণ্য কমল তনু চরণ চঞ্চল
তাহে রঙ্গ অলঙ্কার খেলায় বিহ্বল।"

আনন্দী কবির নায়িকারা সকলেই বিদুষী! তাই উমা

"পড়িল বিংশতি দিন বৃহস্পতি স্থানে
সরস্বতী রহিতে না পারে বিদ্যমানে॥
পঠিলেক বেদ গীতা শাস্ত্র ও পুরাণ।"

কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে এই আখ্যায়িকা গৃহীত, ঘটনা-সমাবেশ হইতে ইহা বেশ অনুমান করা যায়। দুই একস্থলে কৃতজ্ঞতার কথাও আছে

যথা,—"কবিমুখে শুনি দ্বিজ রামানন্দে গায়।"

কিন্তু অন্যান্য কবির মত ইনি কালিদাসের প্রায়ানুবাদ করেন নাই। কবি জয়নারায়ণ চণ্ডীকাব্যের মধ্যে ছন্দে ভারতচন্দ্রের ও বস্তুতে কালিদাসের অনুকরণ করিয়া লিখিতেছেন—

"মহেশে করিতে জয় রতিপতি সাজিল।
দামামাভ্রমররঙ্ক সঘনে বাজিল॥
নবকিশলয়েতে পতাকা দশদিশেতে।
উড়িল কোকিলসেনা সব চারিপাশেতে॥
ত্রিগুণ পবন হয় যোগ গতি বেগেতে।
ফুলধনু পিঠে, ফুলশর কর পরেতে॥

ভ্রমাইয়া ভাঙ্গে আড় হেরি আঁখিকোণেতে।
কুসুমের কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে।
বামবাহু রতিগলে রতিবাহু গলেতে।
ভুবনমোহন কর হরমন মোহিতে॥
বায়ুবেগে সকলে উত্তরে হিমগিরিতে।
আগমন মদন সকল ঋতু সহিতে॥
কুসুমে প্রকাশ গিরি বন উপবনেতে।
নানাফুল ফুটিল ছুটিল রব পিকেতে॥
ছুটিল মানিনীমান লাগিল ধ্বনি কানেতে।
মৃততরু জীবিল নবীন ফুলপাতেতে॥



থরথর কেতকী কাঁপিছে মৃদু বাতেতে।
অকালে অশোক ফোটে শেফালিকা দিনেতে॥
ললিত মালতী ফোটে যুথিকার ডালেতে।
বকুল কদম্ব নাগকেশরের পরেতে ইত্যাদি।”

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত)

এই স্থলে কাব্য হিসাবে রামানন্দের বর্ণনা জয়নারায়ণের বর্ণনার অনেক নীচে। কিন্তু তিনি ছন্দেও কারো অনুকরণ করেন নাই, ভাবেও কারো অনুকরণ করেন নাই। তিনি সরল সহজ নিজস্ব কথায় লিখিয়া গেছেন,

“চলিলা অনঙ্গরাজ নানা পুষ্পে করি সাজ পুষ্পের বিমানে করি ভর।
পুষ্পধনুক হাতে পঞ্চ বিশিখ তাতে, যথা আছে ত্রিলোচন হর॥
নানা পুষ্পের রেণুবিভূষিত সর্ব্বতনু কুসুম-মুকুট শোভে শিরে।
কুসুমে নির্ম্মিত হার কুসুমে বলয়া তার পদে সাজ কুসুমী নুপুরে॥

... ...

পুষ্পের ধনুক হাতে কুসুমিত গুণ তাতে তাহাতে সন্ধিয়া পঞ্চবাণ।
বিদ্যুতের যেন গতি তেন চলে রতিপতি কর্ণসম পুরিয়া সন্ধান॥

... ...

সকল কুসুমী সাজ অভিনব যুবরাজ কামদেব নাহিক তুলনা।
দেখিয়া কামের সাজ অকালেত ঋতুরাজ ‘বরিষয় নব বারিকণা॥’*
অকালে বসন্ত হয়ে অধীর সমীর বহে পুষ্পময় সকল কানন।
হরিণ হরিণী চরে ময়ূর পেখম ধরে কোকিলায় পঞ্চম গায়ন॥
মধুলোভে ভ্রমরায় কপোতে মঙ্গল গায় পুষ্পের সৌরভে নাহি অন্ত।
এই সব দলেবলে হরের নিকটে চলে অকালেতে করিয়া বসন্ত।”

জয়নারায়ণের রতিবিলাপ কালিদাসের অনুবাদ বলিলেও চলে।

“অন্য নায়িকার ঘরে নিশিথে বঞ্চিয়া ভোরে মোর কাছে এয়েছিলা তুমি।
খণ্ডিতা অধীরা হৈয়া মনরাগ না সহিয়া মন্দকাজ করিছিনু আমি।”

আনন্দী কবির রতি বিলাপ করিতেছেন,

“পতিয়ে পত্নীয়ে আর নাহিক সম্বন্ধ।
সৌরভবিহীন পদ্মরে নাহি মকরন্দ॥
মন্দ মলয়া বাত্যা কোকিল দুরন্ত।
মোর প্রাণনাথ বিনা অসার বসন্ত॥
কুসুম সৌরভ আজি রে ব্যথা হেন গণি।
বৃথা মধুকরধ্বনি বিষ হেন শুনি॥
মোর পতি বিনা বৃথা রে, কোকিলের নাদ।
আর মোর মলয়াবসন্তে নাই সাধ॥”

হর যেখানে ছদ্মবেশে পার্ব্বতীকে ছলনা করিতেছেন, সেখানে কবি একটু বিশেষ ভাবে কালিদাসের অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু সে অনুকরণ অনুবাদ নয়—বদহজমের ফল নয়। কালিদাসের সরস রসিকতা কবির রক্তমাংসের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া স্বাভাবিক চেষ্টারূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

অন্নদামঙ্গলের পর মনসা মঙ্গল। মনসা মঙ্গলে কবি বংশীবর ও নারাইণ কবির পদানুবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু স্থলে স্থলে এমন সরস হাতে তুলিকা ধরিয়াছেন, এমন নিপুণ ভাবে চরিত্রাঙ্কন করিয়াছেন এমন বাতাসের মত সহজ, কিরণ-লেখার মত সরল, বীণাতন্ত্রীর মত গানে ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন যে অবাক হইয়া তাঁর কাব্যলীলায় ডুবিয়া থাকিতে হয়। এই

*এই চিহ্নিত স্থলটি অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হইয়াছে, কারণ মূল পুঁথিতে এই লেখাটুকু অনেকটা মুছিয়া গিয়াছে।

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। আমি মাত্র দুই একটি স্থলের উল্লেখ করিয়া দেখাইব। চন্দ্রধর শ্বশুরবাড়ী গিয়াছেন। শালীরা তাঁকে লইয়া আমোদ করিতেছে। কবি সেই হাস্যপরিহাসের একটি মনোরম চিত্র দিয়াছেন। কিন্তু নিজের বর্ণনা পূর্ণ হইল না মনে করিয়া শেষকালে বলিতেছেন

"যত পরিহাস্য কৈল বলিতে তা না পারি
যে জানে সে জানে—যেই গেছে শ্বশুর বাড়ী।"

আর এক স্থলে—

"দুই বেহাই গলাগলি করিলা বিস্তর।
দুই পেটে লাগালাগি পাঁচ হাত অন্তর॥

আমার একান্ত অনুরোধ, কেহ যেন সেকেলে রসিকতার পরিমাণ করিতে গিয়া, এই দেড় শ বছর পরের মাপকাঠি না লাগান।

একটু বিরহের কথা তুলি—দেখিবেন কবির চিত্রটি কি স্বাভাবিক! কেমন সহজ! অথচ কেমন উজ্জ্বল! কবির দৃষ্টি কি অন্তর্দর্শী।

"সম্বৎসর করে রাজা তীর্থ পর্য্যটন।
এথায় শুমুকা রাণী বিষাদিত মন॥
নবীন যৌবন ধনি উন্মাদিত চিত।
স্বামীর বিরহে রামা হইল মূর্চ্ছিত॥
তাহাতে বসন্তকাল হৈল আগমন।
নানাপুষ্পে বিকসিত কুসুম কানন॥
গন্ধ লইয়া মন্দ বহে মলয় পবন।
কুহু কুহু স্বরে ডাকে যত পিকগণ॥
যুবকযুবতী যত সদা আমোদিত।
মদন অনলে জলে বিরহিণীচিত॥
বৎসরেক হৈল চান্দ ঘরে না আইল।
পন্থ নিরখিয়া সুনাই আকুল হইল॥
আহার নিদ্রা ত্যজি বামা সদায় বেভুল।
জিজ্ঞাসিলে কেহ কিছু নাহি বোলে বুল॥"

এই অবস্থায় সুমুকা চাঁদকে স্বপ্নে দেখিল। দেখিয়া যে আগুন এতদিন চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, পলে পলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে আগুনে শমীলতার বুকের মত জলিতেছিল—আর তা সাম্লাইতে পারিল না। তাই—

"কান্দে সুনাই হইয়া আকুল—
হাহা রে পরাণনাথ কি করিলে বজ্রাঘাত কোথা রইলে হইয়া বেভুল॥
প্রভু রইল দেশান্তরে, কি মোর পরাণে করে, উপসর্গ এই ঋতু কাল।
কারে কি কহিতে হয়, কহিবার কথা নয়, কাল হৈল যৌবন জঞ্জাল॥
তাহে কাল ঋতুরাজ সদায় হৃদয় মাঝ জলি উঠে অনঙ্গ আগুন।
যৌবন উদ্বেগ কাল, অন্তরে দারুণ শাল, বিচ্ছেদেতে দহিলু দ্বিগুণ
কোকিল ভৃঙ্গের রাও, শুনিয়া চমকে গাও, অঙ্গ দহে মলয় পবনে।
রজনী হইল কাল, শয্যা লাগে যেন শাল বিরহিণী বাঁচিবে কেমনে॥
যত অলঙ্কার গায়, জলন্ত অনল প্রায়, পরিধানে না রহে কাপড়।
শীতল চন্দন বারি অঙ্গে দিল বহু করি তবু না জুড়ায় কলেবর॥

চাঁদ বাণিজ্য হইতে ফিরিতেছিলেন। বিষহরির কোপে সাগরে তুফান উঠিয়াছে। বিপন্ন চন্দ্রধর বলিতেছেন।

"শুন ভাই কাঁড়ারী দুলাই!
কি হইল অকস্মাৎ, শিলাবৃষ্টি বজ্রপাত, মনে আমি স্বস্তি নাহি পাই।
বিষম তুফানী বাও, কেমনে রাখিবা নাও, দৃঢ় মুষ্টে ধরিবা কাঁড়ায়
মুষলপ্রমাণ ফোটা, ঘন ঘন বজ্রঠাটা, আজি আমার না দেখি নিস্তার।
বিদ্যুতের চমৎকার, ঘন ঘোর অন্ধকার, পথের নাহিক দেখি দিশা

অর্দ্ধাঅর্দ্ধি সাগরে, বিধাতা ডুবাইল মোরে, আজি হৈল
জীবনে নৈরাশা।
বিষম মেঘের ডাক, চৌদ্দডিঙ্গায় লইল পাক, পাইক
সবে না পারে রাখিতে
ঘন ঘন বজ্র পড়ে, হস্তী ঘোড়া পাইক মরে, না পারিমু
সাগর তরিতে।
ঢেউয়েতে পর্ব্বত লড়ে, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, আজি মোর
ভোগ হইল শেষ
ধনে প্রাণে একেবারে, বিধাতা ডুবাইল মোরে, আর না
যাইমু জন্মদেশ॥

চাঁদ বিপদে পড়িয়া ভবাণীকে ডাকিল। ভবাণী ভক্তের নৌকার কাণ্ডারী হইলেন। এই চিত্রটি কি সুন্দর—কি কবিত্বপূর্ণ! বজ্রবৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে, ফেনিল উদ্বেল উন্মাদ তরঙ্গতাণ্ডবের মধ্যে, মহাকালের রুদ্র নৃত্যের মত সেই দিগন্তব্যাপী প্রলয়োচ্ছ্বাসের মধ্যে কাঠের ডিঙ্গায় ভবাণী কাণ্ডারী—সে খোলের ডিঙ্গাই টলায় কার সাধ্য? বাতাসে তাঁর এলোকেশরাশি উড়িতেছে! সমুদ্রবারি তাঁর চরণ চুম্বন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে! তাঁর রুষ্টনয়নের বিদ্যুৎ দৃষ্টিতে তড়িৎ লেখা ম্লান হইয়া যাইতেছে! ধ্বংসে আর রক্ষায়—মৃত্যুতে আর জীবনে, সুন্দরে আর ভৈরবে কি অপূর্ব্ব মিলন! রবীন্দ্রনাথের গানটি মনে পড়িতেছে—

"হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু তালে তালে!"

লয়পালনের এমন অপূর্ব্ব খেলা, রুদ্রকরুণের এমন অপূর্ব্ব মিশামিশি, বোবার ইঙ্গিতের মত অর্থপূর্ণ, রঙ্গিন চিত্রের মত সুস্পষ্ট, বিশ্বপ্রকৃতির মত জীবন্ত এমন কাব্যলীলা মনসাপুরাণের আর কোন কবিতে দেখি নাই।

এর পর আমার প্রবন্ধ শেষ করাই উচিত ছিল। কিন্তু আর একটি কথা না কহিয়া পারিতেছি না,সে চরিত্রাঙ্কন। তার মধ্যে বেহুলা ও পদ্মার চরিত্রে এ কবির বিশেষত্ব। বেহুলা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ক্ষেমানন্দের যে সমালোচনা করিয়াছেন, আনন্দী কবির সমালোচনার্থ আমি তাই উদ্ধৃত করিব।

"আমরা যখন এই পুথি পড়িয়াছিলাম, তখন মানবী বেহুলাকে দেবী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, বেহুলার পাতিব্রত্যের কথা পড়িতে পড়িতে ভাবিয়াছিলাম—বাঁধুলী, তিলফুল ও চতুর্দ্দশীর চাঁদ দিয়া কবিগণ সচরাচর যে সব সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহাদের অনেকে বেহুলার বাঁদী হইবার যোগ্য নহে।" এক কথায় আনন্দীকবির বেহুলা অন্ততঃ ষষ্ঠীবর ও নারাইণ কবির বেহুলার অনেক উপরে। কিন্তু তা প্রমাণ করিবার মত অবসর এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমার নাই।

তারপর মনসা চরিত্র। মনসার বহু কার্য্যকলাপ আমাদের কাছে নিতান্ত কঠোর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁর বাল্যলীলা আলোচনা করিলে এ রূঢ়তার জন্য আমরা তাঁকে ক্ষমা না করিয়া পারি না। কি কঠোর জীবন সে! এই মাতৃহীনা বালিকার উপর বিমাতার অত্যাচার—প্রাণপণ সেবার পরও স্বামীর বিরাগ—ক্ষুদ্র অপরাধে জরৎকারুর অমানুষ ব্যবহার—এই সমস্তই মনসার চরিত্রগঠন করিয়াছে। সুতরাং মনসার চরিত্র রূঢ় বলিলেও অস্বাভাবিক বলিতে পারি না। তার পর, তাঁর সেই রূঢ়তা ও পূজাপ্রিয়তার ভিতরে যে করুণার মন্দাকিনীও বহিয়া যায়, সে কথা কে অস্বীকার করিবে?

শিবচরিত্র সম্বন্ধে আর একটি কথা। অন্নদামঙ্গলে যে শিব দেবতা, মনসামঙ্গলে সেই শিব একটি অসংযত চরিত্র "ধাঙড়"। এর কারণ, অন্নদামঙ্গল আনন্দী কবির নিজস্ব; মনসামঙ্গল অনুকরণ। বেহুলার রূপ দেখিয়া শিব ভুলিয়াছিলেন, এ কথা মনসামঙ্গলের সকল কবিই লিখিয়াছিলেন, আনন্দীকবিও লিখিয়াছেন। কিন্তু আনন্দী কবির বিশেষত্ব এই যে শিবের এই ধৈর্য্যচ্যুতিটা বাহিক। অন্তর তাঁর "নির্ব্বাত নিষ্কম্পইবপ্রদীপম্"। মনসা তাঁর অত্যন্ত আদরের কন্যা—কিন্তু ন্যায় বিচারের সময় শিবের কাছে

স্নেহ নাই, মমতা নাই কন্যা নাই, পুত্র নাই,। এখানে তিনি বিচারক, এখানে তিনি দেবতা—এখানে তিনি বিধাতা। অনুকরণদুষ্ট কবিলেখনী এখানে এই দেব-চরিত্র অঙ্কন করিয়া পুণ্য হইয়াছে, সার্থক হইয়াছে।

এই অজ্ঞাত কবিটির পূর্ণ আলোচনা এখানে অসম্ভব। আমি বহু কথা ছাড়িয়া আসিয়াছি, বহু স্থল উদ্ধৃত করিবার লোভ অতি কষ্টে দমাইয়া আসিয়াছি। লখিন্দরের বিবাহে, মনসা নারদ সংবাদে, চন্দ্রধরের বাণিজ্যে বহু রসিকতা আছে; সুনুকার পুত্রমিত্রবিয়োগে বহু অশ্রুধারা আছে; চন্দ্রধরের অদ্ভুত চরিত্রে ভীষ্মের অটলতা আছে। আজ তার বিস্তৃত সমালোচনা অসম্ভব। আমার এই রচনা যদি এই বনলতাটির দিকে কোন উদ্যানবিহারী রাজনায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, তবে ইচ্ছা করি আবার আপনাদের সমক্ষে আমার এই বারো আনা দামের ম্যাজিক লাণ্টার্নটি লইয়া হাজির হইব।

শ্রীঅশ্বিনী কুমার শর্ম্মা

কপিলাবতার ও তত্ত্ব সংহিতা*

অতুলকীর্ত্তিশালিনী, পুণ্যময়ী, ভারত-ভূমির তপোময় তেজোদীপ্ত শান্তআশ্রমবাসী ধ্যানপরায়ণ আর্য্যঋষিগণের মনীষা-গোমুখী হইতে যে চিন্তার অমলা-ধবলা-নির্ম্মলা মন্দাকিনীধারা বিনিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা কত দেশ, কত নগর, ও কত গ্রামের তত্ত্ব-বিষয়িণী হইয়া পিপাসা নিবারণপূর্ব্বক, শতমুখী হইয়া অবশেষে অনন্তজ্ঞানরত্নাকর পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল; আবার, সেই রত্নাকর কতবার যে কালাগস্ত্য কর্তৃক পীত ও উদ্‌গীর্ণ হইয়াছে, আর কতবারই যে উহা বিদ্যুৎসুধাকরের গবেষণা-চন্দ্রিকা-সম্পাতে উদ্বেল হইয়া, জোয়ার ছুটাইয়াছে এবং কালবশে তাহাতে ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছে, তাহা আমরা বিনষ্ট-পুনরুদ্ভূত ও লুপ্তাবশিষ্ট রত্নরাজি পরীক্ষা করিলেই বুদ্ধিতে কতকটা ধারণা করিতে পারি। আমরা সৌভাগ্য ও পূর্ব্ব-পিতৃগণের তপস্যার বলে যে সমস্ত চিরভাস্বর ও অনর্ঘ রত্ন লাভ করিয়াছি, দর্শন ও তত্ত্বশাস্ত্র তাহার অন্যতম। তদন্যতম সাংখ্য ও কপিলদেব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অদ্য প্রবৃত্ত হইয়াছি। জানি না উহা সমীচীন কিনা। তবে পরমভক্ত ধ্রুবের কথায় এইমাত্র বলিতেছি,—

"যোহন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণ ত্বগাদীন্—
প্রাণান্, নমো ভগবতে পুরুষায় তস্মৈ॥"

যে অখিল শক্তিধর, আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় চিৎশক্তি দ্বারা আমার এই প্রসুপ্তা বাণী এবং অন্য অন্য—হস্ত, চরণ, শ্রবণ, ত্বক্ ও প্রাণকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, সেই অন্তর্যামী ভগবান্‌কে প্রণাম করি।

সাংখ্যতত্ত্ব বা সাংখ্যজ্ঞান অতি প্রাচীন। কপিলদেবকে সাংখ্যকর্ত্তা বলা হইলেও তৎপূর্ব্বেও যে সাংখ্য বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।—

"পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতং।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ং॥ ৯

ভা, ১।৩।১০

পঞ্চমাবতার সিদ্ধেশ কপিল, যাহাতে তত্ত্বসমূহ বিনির্ণীত হইয়াছে, এতাদৃশ, কালক্রমে বিনষ্ট সাংখ্য আসুরিকে বলিয়াছিলেন।

ইহাতে জানা গেল, কপিলদেব, পূর্ব্বেই উদ্ভূত অথচ কালক্রমে বিনষ্ট সাংখ্য আসুরিকে বলিয়াছিলেন। তিনি সাংখ্য-জ্ঞানের প্রথম উদ্ভাবয়িতা না হইলেও তিনি যে উহার প্রণেতা তাহারও প্রমাণ আছে।

পুরাণ মতে কপিলদেব—যিনি কার্দমি বা দেবহূতি-তনয় তিনি ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত

* মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের কলিগ্রাম অধিবেশনে পঠিত, কার্ত্তিক, ১৩২০।

হইয়াছেন। তিনি কর্দমের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কি করিবেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিতেছেন :—

"সহাহং স্বাংশকলয়া ত্বদ্বীর্য্যেণ মহামুনে।
তব ক্ষেত্রে দেবহূত্যাং প্রণেষ্যে তত্ত্ব-সংহিতাং॥"

(ভা ৩।২১।৩০)

আমি স্বীয় অংশ-কলার সহিত তোমার প্রভাব যুক্ত হইয়া তোমার ভার্য্যা দেবহূতিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক তত্ত্ব-সংহিতা প্রণয়ন করিব।

মূলে "প্রণেষ্যে" এই ক্রিয়ার প্রণয়ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং দেবহূতি তনয় কপিলদেব যে একখানি সাংখ্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহের কারণ নাই।

আমরা পুরাণশাস্ত্রে দুইজন কপিলকে দেখিতে পাই :—ব্রহ্মা, কর্দম ও দেবহূতিকে বলিতেছেন :—(ভা ৩।২৪।১৯)

"অয়ং সিদ্ধ গণাধীশঃ সাংখ্যাচার্য্যৈঃ সুসম্মতঃ।
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ॥"

এই যে তোমাদের পুত্র—ইনি সিদ্ধগণের অধীশ, সাংখ্যাচার্য্যগণের সুসম্মত,—ইনি "কপিল" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন।

এখানে বলা হইয়াছে, "ইনি সাংখ্যাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সুসম্মত," ইহাতেই ব্যঞ্জনা হইতেছে যে, আর একজন কপিল ছিলেন, বা আছেন, তিনি "সাংখ্যাচার্য্য-সুসম্মত নহেন"।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বাদরায়ণসূত্রের ভাষ্যে সাংখ্য-মত-খণ্ডন প্রসঙ্গে এ কথা বলিয়াছেন।

এ স্থলে (ক্রম সন্দর্ভে) পরম-দার্শনিক জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন, "অন্যস্তু বিশেষঃ কাপিলঃ দর্শনকর্ত্তা ন সুসম্মতঃ। বেদ বিরুদ্ধানীশ্বর বাদাৎ।"

অন্য একজন কপিল—দর্শনকর্ত্তা, তিনি সুসম্মত নহেন, কেন না, তিনি বেদ-বিরুদ্ধ অনীশ্বরবাদ প্রচারক।

পরমপণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও সারার্থদর্শিনীতে এই কথাই বলিয়াছেন। বৃন্দাবনের রাধামোহন গোস্বামীরও ইহাই অভিপ্রায়। অধিকন্তু, তিনি বলিয়াছেন, "সেই অন্য কপিল অগ্নিবংশজ"। প্রাচীন বিজয়-ধ্বজ পণ্ডিতও বলিয়াছেন, (সাংখ্যাচার্য্যৈঃ সুসম্মতঃ অবিপ্রতিপন্নঃ নায়ং কুতর্ক বৃংহিত, সাংখ্য কর্ত্তা" অর্থাৎ ইনি বিরুদ্ধবাদী ও কুতর্ক বর্দ্ধিত সাংখ্যের কর্ত্তা নহেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই ব্যঞ্জিতার্থই স্পষ্ট করিয়া, পদ্ম-পুরাণে লিখিত হইয়াছে :—

"কপিলো বাসুদেবাখ্যস্তত্ত্বং সাংখ্যং জগাদহ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্য স্তথৈবচ।
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্ব বেদার্থৈরুপবৃংহিতং॥"
"সর্ব্ব-বেদ-বিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদহ।
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্ক-পরিবৃংহিতঃ॥"

বাসুদেবের অবতার কপিল, সকল প্রকার বেদার্থ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত সাংখ্যতত্ত্ব ব্রহ্মাদি দেবগণকে, ভৃগু প্রভৃতি (মুনিগণ) কে ও আসুরিকে বলিয়াছিলেন; আর একজন কপিল, সর্ব্ববেদ-বিরুদ্ধ ও কুতর্ক-পরি-বর্দ্ধিত-সাংখ্য অন্য একজন আসুরিকে বলিয়াছিলেন।

সেই অন্য কপিল কে, এই জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার জন্য বেদান্তদর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্য কর্ত্তা বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছে,—"নমু শ্রীভাগবতোক্তঃ কাপিলঃ সেশ্বরঃ, স কথং নিরীশ্বরং সাংখ্যমকরোৎ? ইতি সন্দেহং ছেত্তুমাহ কপিল ইতি। বাসুদেবঃ কার্দ্দমিঃ॥ কপিলঃ অন্যস্তু জীবোঽগ্নিবংশজঃ, যদুক্তং বনপর্ব্বনি অগ্নিবংশবর্ণনে মার্কণ্ডেয়েন,—

"কপিলং পরর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা।
অগ্নিঃ স কপিলোনাম সাংখ্যযোগ প্রবর্ত্তকঃ॥

(২১০।২২)

ইতি। তথাচ নামমাত্রেণ ন ভ্রমিতব্য মিতি।"

অর্থাৎ শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত কপিল ঈশ্বরবাদী, তিনি কেন নিরীশ্বর সাংখ্য প্রণয়ন করিলেন? এই সন্দেহ-

ছেদনের জন্য (উল্লিখিত) "কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ" ইত্যাদি শ্লোক বলা হইয়াছে। এখানে বাসুদেব শব্দে কার্দ্দমি কি না কর্দমতনয়কেই বুঝিতে হইবে। আর এক জন অন্য কপিলের কথা বলা হইয়াছে, তিনি জীব—বাসুদেবের অবতার নহেন; তিনি অগ্নিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অগ্নিবংশ বর্ণন প্রসঙ্গে মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয় মুনি বলিয়াছেন, "যতিগণ যাঁহাকে সর্ব্বদা কপিল ও পরমর্ষি বলেন, তাঁহার নাম অগ্নিকপিল, তিনি সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তক।" তথাপি যেন কেহ নাম মাত্রে ভ্রমে পতিত না হন।

এই যে দুই জন কপিলের কথা প্রমাণিত হইল, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া সাংখ্যকারিকার টীকাকর্ত্তা গৌড়পাদ স্বামী আর একজন কপিলের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি "কপিলায় নমস্তস্মৈ" ইত্যাদি শ্লোকে নমস্ক্রিয়া করিয়া বলিয়াছেন, "ইহ ভগবান্ ব্রহ্মাসুতঃ কপিলোনাম তদ্ যথা—

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ু পঞ্চশিখস্তথা।"
"ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ।"

"এখানে কপিল ব্রহ্মার পুত্র। কপিল যে ব্রহ্মার পুত্র তাহার প্রমাণ—"সনকাদি (শ্লোকোল্লিখিত) সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার পুত্র।" উদ্ধৃত বচন দ্বারা সনকাদি ও কপিল যে ব্রহ্মার পুত্র, এই মাত্র প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু উক্ত সপ্তের অন্যতম কপিল যে সাংখ্যের কর্ত্তা বা বক্তা তাহা কিছুতেই সিদ্ধ হইতেছে না। আমরা এ যাবৎ অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই যে ব্রহ্মপুত্র কপিল সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যেরও গুরু, আচার্য্য গৌড়পাদ স্বামী কেন যে ব্রহ্মাপুত্র কপিলকে "সাংখ্যময়ী নৌকার" কর্ত্তা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে আলোচ্য ও চিন্তনীয় বিষয় বটে।

আমরা শ্রুতিতে কপিলের নাম দেখিতে পাই :—
"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।"

এখানে তাঁহার আদিজ্ঞানিত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, দেবহূতি তনয়ের পূর্ব্বেও একজন জ্ঞানী কপিল ছিলেন। ইনিই কপিলের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও যে সাংখ্য-জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এ কথা প্রথমোক্ত ভাগবতীয় পদ্যদ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত যে চারিজন তত্ত্বজ্ঞানীর উল্লেখ হইল, তাঁহারা সকলেই কপিলনামে অভিহিত হইয়াছেন, ইহার কারণ কি?

পূজ্যপাদ রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন—
"প্রোক্তঃ কপিলবর্ণত্বাৎ কপিলাখ্যো বিরিঞ্চিনা।"
(লঘুভাগবতামৃত ১।৪২)

কপিলবর্ণ বলিয়া, ব্রহ্মা তাঁহার নাম কপিল রাখিয়াছিলেন।"

একথা তিনি দেবহূতির পুত্র কপিল সম্বন্ধেই বলিয়াছেন; নচেৎ প্রত্যেক তত্ত্বজ্ঞানীই যে কপিলবর্ণ হইবেন এবং সেই জন্যই তাঁহাদের নাম কপিল হইবে পুরাণে বা অন্য শাস্ত্রে তাহার কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। কথাটা যুক্তিসহ বলিয়াও বিবেচিত হয় না। সম্ভবতঃ সেই জন্যই বিজয়ধ্বজতীর্থ বলিয়াছেন,—
"সংসার-কম্প-লয়হেতুত্বাৎ কপিলঃ ইত্যস্মিন্নর্থে বিপ্রতিপত্তির্নাস্তি।"

তিনি সংসারের কম্পের কি না ভীতিজনক বেপনের লয় অর্থাৎ বিনাশের হেতু, এ জন্য তাঁহার নাম কপিল। এই অর্থে আর কোনই দোষ হয় না।

ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, তৎকালে কপিল শব্দ বিক্রমাদিত্য ও বেদব্যাস শব্দবৎ উপাধিরূপে—তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক এই অর্থে ব্যবহৃত হইত।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, কপিলদেব—যিনি কার্দ্দমি—বেদার্থোপবৃংহিত সাংখ্যের উপদেষ্টা, এবং অগ্নিকপিল সর্ব্ববেদ-বিরুদ্ধ, কুতর্ক-পরিবৃংহিত সাংখ্যের প্রবর্ত্তক। স্থূল কথায়, একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদী। অপর জন ঈশ্বরের নাস্তিত্ববাদী।

বর্ত্তমান কালে একখানিমাত্র দর্শন—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র—কপিল প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহাতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহার যে প্রকার সমাধান করা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যাইবে, এ দর্শনখানি সেশ্বর কি নিরীশ্বর।

সাংখ্য দর্শনে ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে।—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষের লক্ষণ এইরূপ করা হইয়াছে :—

"যৎ সম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎপ্রত্যক্ষং।"

কোন বস্তুর সহিত বুদ্ধি সম্বন্ধ-যুক্তা হইয়া সেই বস্তুর আকার ধারণ করিলে, যে বিজ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। ইহাতে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ আবশ্যক। কিন্তু ঈশ্বর শাস্ত্রানুসারে অতীন্দ্রিয়, তাঁহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় না; তিনি অপরিচ্ছিন্ন, এ জন্য বুদ্ধিতে তাঁহার ধারণা হইতে পারে না; সুতরাং ঈশ্বর-প্রত্যক্ষে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইয়াছে। এই বিপ্রতিপত্তির সমাধান জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—

১। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (১।৬১)

ঈশ্বরে কোন প্রমাণ না থাকায় তাঁহার সিদ্ধি নাই।

যদি ঈশ্বর নাই থাকেন, তবে "একোঽহং বহুঃ স্যাং" "স ইমান্ লোকান সৃজত"—এক আমি বহু হইব, তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, ইত্যাদি শাস্ত্র কেন রহিয়াছে? ইত্যাদি আশঙ্কা করিয়া বলা হইয়াছে—

২। "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা, উপাসা সিদ্ধস্য বা" (১।৯৫)

ঐ সমস্ত শাস্ত্র মুক্তাত্মাদিগের প্রশংসাপর, অথবা সিদ্ধগণের উপাসনাপর। ইহাতেও ঈশ্বর-সিদ্ধি হইতে পারে না।

এ জগতে মুক্ত বা বদ্ধ পুরুষ ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ নাই। যদি বা ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা ধরিয়া লওয়া যায়, তবে তিনি উক্ত দ্বয়ের মধ্যে কি? যদি বল, তিনি মুক্ত, তবে তাঁহার কোনই বাসনা নাই, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর যদি তিনি বদ্ধ হন, তবে ত তিনি আমাদের মতই, তাঁহার সৃষ্টি-সামর্থ্য থাকিতে পারে না। এ জন্য বলিতেছেন—

৩। "মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ"।

(১।৯৩)

তিনি যখন মুক্তও নন, বদ্ধও নন, তখন আর তাঁহার সিদ্ধি হইতে পারে না।

যদি বল, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের ফলদাতা ঈশ্বর, তবে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি ইচ্ছাপূর্ব্বক শুভাশুভ বিধান করেন, কি জীবের কর্ম্মানুসারে তাহা সম্পাদন করেন? যদি ইচ্ছানুসারে হয়, তবে তিনি পক্ষপাতী, লৌকিক বিচারকের ন্যায় দ্বেষাদির অধীন; আর যদি বল, কর্ম্মানুসারে ফলদান করেন তবে বলি,—

৪। "নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফল নিষ্পত্তিঃ,
কর্ম্মণা তৎ সিদ্ধেঃ।" (৫।২)

অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বারা ফল নিষ্পত্তি হয় না, কর্ম্ম দ্বারাই ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। অনর্থক ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন কি?

অনুমান দ্বারাও যে ঈশ্বর সিদ্ধি হয় না তাহাই দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন :—

৫। "সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং"। (৫।১১)

জগৎ প্রকৃতির কার্য্য, তাহার ঈশ্বরের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই, এ জন্য অনুমানও ঈশ্বর-সিদ্ধি করিতে পারে না।

শব্দপ্রমাণও ঈশ্বর স্থাপন করিতে পারে না এতদর্থে বলিতেছেন—

৬। শ্রুতিরপি প্রধান-কার্য্যত্বস্য

শ্রুতি জগৎকে প্রধান কি না প্রকৃতিরই কার্য্য বলিয়াছেন, (ঈশ্বর-সৃষ্টি বলেন নাই, অতএব ঈশ্বরসিদ্ধি তাহাতেও হইতেছে না) সেই শ্রুতি

"অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণরূপাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানং স্বরূপাঃ"

একা লোহিতকৃষ্ণরূপা অজা, নিজরূপিণী বহু-প্রজার সৃষ্টির কারিণী। এখানে অজা অর্থে জড়ময়ী প্রকৃতি।

প্রথমোক্ত বিষয় দৃঢ়ীকরণার্থ পুনর্ব্বার বলিতেছেন,

৭। "প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ" (৫।১০)

যখন কোনই প্রমাণ নাই, তখন (তর্কের প্রয়োজন কি?) ঈশ্বরসিদ্ধি হইতেই পারে না।

সাংখ্যপ্রবচনের ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত সূত্র উল্লিখিত হইল, তাহাতে উক্ত দর্শনে যে নিরীশ্বরত্ব, বেদবিরুদ্ধত্ব ও কুতর্কপরিবৃংহিতত্ব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে অসম্মতি দিবার সবিশেষ কারণ দেখা যাইতেছে না।

"সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" (৩।৫৬)
"ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধা" (৩।৫৭)

এই দুইটী সূত্র দ্বারা কেহ কেহ ঈশ্বরাস্তিত্বের আংশিক প্রমাণ করিয়াছেন; কিন্তু, যদি ঐ সূত্রদ্বয় দ্বারা বাস্তবিকই ঈশ্বর প্রমাণ করিতে পারা যাইত, তবে ভাষ্য-কার বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলিতেন না যে "অস্মিন্ শাস্ত্রে ব্যবহারিকস্যৈব ঈশ্বরপ্রতিষেধস্য ঐশ্বর্য্যবৈরাগ্যার্থং অনুবাদৌচিত্যম্।" অর্থাৎ বৈরাগ্য উৎপাদনার্থেই এই শাস্ত্রে যে ব্যবহারিক ঈশ্বর-প্রতিষেধ করা হইয়াছে তাহা অনুচিত নহে।" ইহা দ্বারা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাতে ঈশ্বর প্রতিষেধ করাই হইয়াছে। তবে তাহা বিবেকোৎপাদনের জন্য বলা হইয়াছে, এই মাত্র তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানভিক্ষু নিজে ঈশ্বরবাদী ছিলেন, তাহা তাঁহার সাংখ্য-ভাষ্য পাঠে অবগত হওয়া যায়। যদি উক্ত সূত্র-দ্বয়ীতে ঈশ্বর সিদ্ধি হইত বা উহা তদ্বিষয়ক হইত, তবে তিনি তৎসমাধানে সবিশেষ চেষ্টা করিতেন, তাঁহার শক্তি নিশ্চয়ই তদুপযোগিনী ছিল।

দার্শনিকচূড়ামণি মাধবাচার্য্যও নিজকৃত সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে বহুকথার আলোচনা করিয়া "নিরীশ্বর-সাংখ্য-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক কপিলানুসারিণাং মত মুপন্যস্তং।"—নিরীশ্বর-সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক কপিলের অনুগামিগণের মত উপন্যস্ত হইল—বলিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত এখানে আলোচিত হইল না।

পূর্ব্বেই পাদ্মবচন ও অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা প্রতি-পাদিত হইয়াছে যে, বেদ-বিরুদ্ধ, কুতর্ক-পরিবৃংহিত, নিরীশ্বর-সাংখ্যের প্রবর্ত্তক দেবহুতি-তনয় কপিল নহেন। সাংখ্যপ্রবচন সম্বন্ধে যে সকল কথা আলোচিত হইল, তদবলম্বনে জানিতে পারা গেল যে, দেবহুতি-নন্দন কপিল-দেব সাংখ্যপ্রবচনসূত্র বা তন্মতানুকূল কোন তত্ত্ব প্রণয়ন করেন নাই বা বলেন নাই।

কেহ কেহ অনুমান করেন, তত্ত্বসমাসই কার্দমি কপিল কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা এতই সংক্ষিপ্ত যে উহাকে "বেদার্থৈরুপবৃংহিতঃ" বলিতে পারা যায় না।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোক্ত ব্রহ্মবিদ্যাংশ যে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন, তাহা মহাভারত কর্ত্তা ঋষির বাক্যেই জানিতে পারি; ঠিক সেই রূপেই আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সাংখ্য-তত্ত্বই কার্দ্দমি কপিল-দেব কর্ত্তৃক উক্ত ও প্রণীত "তত্ত্ব-সংহিতা"। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, গীতোক্ত ভগবদ্‌বাক্যের যদি কিছু পরিবর্ত্তন বা সংস্করণ করিয়া থাকেন, তবে ইহাতেও করিয়া থাকিবেন। ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধীয় একবিংশতিতম অধ্যায় হইতে কপিল দেবের উপাখ্যান আরম্ভ হইয়া স্কন্ধশেষে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। ইহার মধ্যে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে কপিলদেবের উপদেশ বা তত্ত্বসংহিতা আরব্ধ হইয়া দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে উহা

শেষ হইয়াছে। এই অষ্টাধ্যায়ী যে কপিল-প্রণীত, তাহাই প্রখ্যাপনের নিমিত্ত, স্বয়ং ব্যাস, বা শুকদেব কিংবা সৌতি প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে—অন্য অন্য অধ্যায়ের শেষ যেরূপ আছে বলিয়া, "কাপিলেয়ে ভক্তিযোগো নাম" "কাপিলেয়ে তত্ত্বসমাম্নায়ো নাম" ইত্যাদি লিখিয়াছেন। যদি কপিলোপাখ্যান আছে বলিয়া অথবা কপিলের তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে বলিয়া, "কাপিলেয়ে" এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে অন্য পাঁচটী অধ্যায়ের শেষেও উহা লিখিত থাকিত; ঐ পাঁচটী অধ্যায়েও কপিলোখ্যান ও কপিলের তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। অতএব কপিলদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বা প্রণীত বলিয়াই যে অষ্টাধ্যায়ীতে কপিলের বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

আরও এক কথা এই যে, এই অষ্টাধ্যায়ী ও সাংখ্য-প্রবচন, এই দুই গ্রন্থ মাত্রই কপিল-প্রণীত বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে। সাংখ্য-প্রবচনখানি যে কার্দ্দমি কপিল প্রণীত নহে তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সুতরাং অপরখানি, অর্থাৎ অষ্টাধ্যায়ীই তৎপ্রণীত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এতদুক্ত সাংখ্য যে, "বেদার্থৈরুপবৃংহিতঃ"—সেশ্বর—বিস্তৃত, এ কথাও আমাদিগের স্বীকার করিতে বাধা দেখিতেছি না।

পঞ্চবিংশ হইতে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত কপিলোক্ত সাংখ্যতত্ত্বে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা শ্রীধর স্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কারিকা আলোচনা করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

পঞ্চবিংশাধ্যায়ে ভক্তি ও তাহার লক্ষণ, এবং প্রভাব, ও উৎকর্ষ, এবং গুরুভাবে যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। ষড়্বিংশাধ্যায়ে—মহদাদির উৎপত্তি, বিড়াড়াবির্ভাব, আত্ম-প্রবেশে তাঁহার চৈতন্য প্রাপ্তি (উত্থান) এবং প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তবিংশাধ্যায়ে—বহুপ্রকার সাধন যোগ হইতে—ভক্তি-মিশ্র জ্ঞান সাধন হইতে এবং পুরুষ ও প্রকৃতির জ্ঞান হইতে কি প্রকারে মোক্ষ হয়,তাহা বিবৃত হইয়াছে। অষ্টাবিংশাধ্যায়ে ধ্যানযুক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্তি (মুক্তি); সংক্ষিপ্ত-স্বভক্তি-মিশ্রিত, বিবৃত সাংখ্য-তত্ত্ব ও অষ্টাঙ্গযোগ উপনিবদ্ধ হইয়াছে। একোনত্রিংশাধ্যায়ে—সগুণ ও নির্গুণ ভক্তিযোগ সংসারের ঘোরত্ব, কালের বল—বিরক্তির উৎপাদনার্থ—কথিত হইয়াছে। ত্রিংশাধ্যায়ে—শরীর ও ভার্য্যাদির লালনাদিতেই সংযুক্ত জীবের তামসী অধোগতি প্রকটীকৃত হইয়াছে। একত্রিংশাধ্যায়ে—বিমিশ্র পুণ্যে পাপান্তরিত মনুষ্যযোনি প্রাপ্তি রাজসী গতি—গর্ভ, জন্ম ও বাল্যাদির দুঃখ এবং গর্ভেও ভক্তি হইতে পারে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে—ধর্ম্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা সাত্ত্বিকী ঊর্দ্ধ্ব গতি, অবিবেক ও সকাম কর্ম্ম দ্বারা পুনরাবৃত্তি, ও ভক্তাভক্তে সাংখ্যযোগের কথনাকথন উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

এই বিষয়-সূচীতেই বুঝিতে পারা যায়, ইহা কিরূপ পূর্ণাঙ্গ সাংখ্যতত্ত্ব। সাংখ্য-দর্শন-প্রবচন-সূত্রের সংযোজিত পরমত খণ্ডনাদি মাত্র ইহাতে নাই।

পূজ্যপাদ জীবগোস্বামীর বাক্য ও উল্লিখিত বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে, সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র নামধেয় সাংখ্যদর্শনই অগ্নিবংশজ পরমর্ষি কপিল প্রণীত। কিন্তু, বিজ্ঞানভিক্ষুর লিখিত——

"কালার্কভক্ষিতং সাখ্যং শাস্ত্রং জ্ঞান সুধাকরং
কলাবশিষ্টংভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥"

জ্ঞান-সুধাকর সাংখ্য-শাস্ত্র কাল-রূপ সূর্য্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে, (সংপ্রতি তাহার) কলামাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। (তাহাই) আমি বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা পরিপূর্ণ করিতেছি।

এই শ্লোকে এবং ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকার

"এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপিপঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রং॥"
শিষ্যপরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেণ চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগ্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তং॥

(এই পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ সাংখ্যশাস্ত্র কপিল মুনি আসুরিকে আসুরি পঞ্চশিখকে প্রদান করেন। পঞ্চশিখ আবার তাহা বহুধা বিস্তার করেন।

শিষ্যপরম্পরাগত ইহা আর্য্য-মতি ঈশ্বরকৃষ্ণ কর্তৃক সম্যক অবগত হইয়া আর্য্যাছন্দে সংক্ষিপ্ত হইল।)

এই আর্য্যাদ্বয়ের অভিপ্রায় পর্য্যালোচনা করিলে,—সংপ্রতি আমরা যে আকারে সাংখ্যদর্শন দেখিতে পাইতেছি, বিজ্ঞানভিক্ষু ও ঈশ্বর কৃষ্ণের সময়ে যে ঠিক সেইরূপই ছিল, বিশেষতঃ ঈশ্বরকৃষ্ণের সময়ে উহা কপিল প্রণীত রূপে আদৃত হইয়াছিল কি না, এ সমস্ত বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন এইজন্য এবং এই প্রবন্ধে উহার আলোচনা তাদৃশ আবশ্যক নহে বলিয়া তদ্বিবরণ প্রদর্শনে বিরত হইলাম।

আরও এক কথা এই যে, আরও রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত করিয়া, সম্মিলনে উপস্থিত সদঃসদ্‌গণের সাহিত্যরসে সরসমুখ শুষ্ক করিয়া, তাঁহাদের মন্যুভাজন হইতে আমি সাহসী হইতে পারিতেছি না।

শ্রীকৃষ্ণকেশব শাস্ত্ররত্ন গোস্বামী।

রাগিণী।*

১

আমরা কেবলি ধ্বনি!
শূন্যের বুকে ঘুরিয়া ফিরিয়া
সৃষ্টির জাল বুনি!
কে জানে কখন হ'ল হুঙ্কার -
'আকাশ—আকাশ হোক
আজো কবে সে উঠিল ডাকিয়া
আলোক—আলোক হোক!
দেখিলাম মোরা উঠেছি জাগিয়া
আপনাতে ভর করি,'
দেখিনু আমরা উঠেছি জ্বলিয়া
শূন্যেরে পরিপূরি!
কালের দেশের সূত্রে বিনায়ে
ছায়া-মুক্তার হার,
জমিয়াছি মোরা গগনে ভরিয়া
ভুবনে চমৎকার!
ক্ষীতি জলবায়ু আগুনে জন্মেছি,
—অদ্ভুত সে কাহিনী
আমরা কেবলি ধ্বনি!

২

কে শুনিতে চাও মোদের কাহিনী
—অবোধা' মোদেরি যাহা?
রচেছি অয়ন ঋতু দিবা পল
গড়েছি বর্ষমাহা!
ধ্বনি মোরা শুধু জমিয়া হয়েছি
সূর্য্য চন্দ্র তারা;
রচিয়াছি ধরা জীবন ধাত্রী
—সাকারে এ' নিরাকারা!

* এই কবিতা লেখকের প্রকাশমান কাব্য 'বিকাশিকা' বা 'ব্যোমসঙ্গীতের' অন্তর্ভুক্ত।

কোটি কোটি হেন শূন্য ভরিয়া
জন্মিয়া গিয়েছি মোরা
বিনা সূতে বাঁধি' ভুবনে ভুবনে
অলক্ষ্য রাখি-ডোরা!
বিনা সূতে বাঁধি প্রত্যেক অণু
ভুবনে ভুবনে গণি—
আমরা কেবলি ধ্বনি!

৩

বুঝিয়াছি যেন, নাহি বুঝি পুনঃ
আমাদের সে কাহিনী
—আমরা কেবলি ধ্বনি!
সেই হতে, সেই আদিনির্দ্দেশে
স্বর্গ ও ধরাতল,
রচি চরাচর রচি মরামর,
গড়েছি জলস্থল!
সাগর ভূধর নদীনদ বন
সূর্য্য কি খদ্যোৎ,
যত বিশেষ্যে, আর বিশেষণে
আমরা ওতঃপ্রোত!
ভাবেতে ক্রিয়ায় শব্দে আমরা
রচি নিখিলের সত্তা,
অনাদি কালের অনন্ত যাত্রা
সদসৎ—পুন নিত্য!
অব্যয় মোরা প্রকৃতি নিত্যা
মোরা পুন গুণগুণী
—আমরা কেবলি ধ্বনি!

৪

আছে-নাই হেন ছায়া-অণু লয়ে
সত্তা ফেলেছি বুনি'
ভাব-অভাবের অবয় বিন্যাসে
—আমরা কেবলি ধ্বনি!
ভাব হয়ে মোরা ভাবনা ফলাই,
বিষয় হইয়া ভাস,
রূপে রসে জমি, মৌচাক সম
ইন্দ্রিয়ে পরকাশি!
অণু হয়ে মোরা বিশ্বমনেরে
সৃষ্টি-বেপারে চালি
বিজলী-আভাসে করি তার কাছে
অসীমের ঘটকালী!
বিদ্যা হইয়া লই মানবেরে
সভ্যতা-গতিরথে;
গোপনে গোপনে লই কোলে করি'
অনন্ত নীতি পথে!
নয়নে-নয়নে বাঁধি বিনা সূতে
রচি পরাণের মালা
নিত্য-নিয়ত তাজা ফুল দলে
ভরি সংসার ডালা!
জগতের আদি শেষের বিদ্যা
শক্তি সে সনাতনী—
আমরা কেবলি ধ্বনি!

৫

কত ভাবে কত ভঙ্গী-আবেশে
ছায়ার তন্তু বুনি
নরের নয়নে শ্রবণে পরশে
—আমরা কেবলি ধ্বনি!
পর্ব্বত শিরে ঘুমাই আমরা
সিন্ধুর বুকে ভাসি;
গরজি ঊর্ম্মি লোদিত কুহরে,
হু হু করে ছুটে আসি
দূর নীলিমার মেঘ রেখা দিলে!
বিজলী-বিলাসে ভরা
আকাশে পাতালে উঁকি মেরেছে
ভিগবাজী খেলি মোরা!

বনে-অরণ্যে বসিয়া সে মোরা
রিম-ঝিম সুরে কাঁদি,
বিশ্ব ভুবনে এইরূপে সব
সুরের সূত্রে বাঁধি।
তামসী নাগিনী ফণা'পরে মোরা
বসাই তারকা-মণি।
—আমরা কেবলি ধ্বনি।

৬

সিন্ধু সাগর আকাশের বাণী
সঙ্গতি যেথা আসি'
সেই পদে নিতি জন্ম মোদের
মোরা উভলোক-বাসী!
জগতের আদি অন্ত ভাবের
নিদান গোমুখী ধারা
সঙ্গীত বাণী কাব্য জননী
—বিশ্বের কবি মোরা!
হৃদয়ের কথা সূক্ষ্ম সূত্রে
লই পদে দেবতার
দেবতার কথা মর্ম্মের পথে
আনি অন্তরে তার!
নিসর্গ মুখে আকাশমুখিনী
ভাষা যেই নীরবতা
স্তব্ধতা হতে নর-বুকে আনি
অন্তরে তার ব্যথা,
সূর্য্য-জীবন হৃদয়ে বহিয়া
আনে যথা নিশামণি—
আমরা কেবলি ধ্বনি।

৭

বুঝিবে কি নর, কে আমরা তুমি,
কে তোমরা মোরা পুনঃ?
এখনো বাজিছে, নিত্য সে বাণী
ওই শোন—ওই শোন!

হয়েছে হইবে বিশ্বআকারে,
যাহা আছে যাহা নাই,
আগু-পাছু যাহা অন্তর-বহিঃ
সর্ব্ব সে আমরা ই।
জানা-অজানায় বিনাইয়া মোরা
বিশ্বভুবন গড়ি—
চলিয়াছি মোরা অনাদি কালের
অনন্ত বাঁশি ধরি'।
বাজিছে আসিয়া বিশ্বের বুকে
ধার-ধরা' সে রাগিণী।
ডাকিছে কোথায়—টানিছে নিত্য!
আমরা কেবলি ধ্বনি!

৮

কোথা এর শেষ, কোথা উদ্দেশ,
সীমা কোথা, কি বা জানি।
—আমরা কেবলি ধ্বনি!
জানি না কবে সে শেষের বিষাণ
কোথায় উঠিবে বেজে,
ধ্বনির সিন্ধু ফিরাইয়া পুনঃ
অনাদি বিন্দু মাঝে।
ভাব অভাবের ভিতর বাহির
হয়ে যাবে যাহে এক
একের সঙ্গে দু'য়ের বিভেদ
নহে যেথা পরত্তেক!
আছে-নাই যেথা এক হয়ে যাবে
নিরাস্ত নিরাধার,
দেশে কালে যবে গরাসি বাজিবে
প্রণবের ওঙ্কার।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

নামিকো

ষষ্ঠপরিচ্ছেদ

চিরবিদায়।

সাতই জুলাই সন্ধ্যাকালে জেনারল কাতাওকার গৃহে অনেক লোক সমবেত হইয়াছেন। সকলেই চাপা গলায় কথা কহিতেছিলেন, কারণ তাঁহার কন্যা নামির মৃত্যুকাল উপস্থিত।

গতমাসের শেষে যখন নামি ও তাহার পিতা হঠাৎ কিওতো হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন সকলেই দেখিল নামির অবস্থা অনেক খারাপ হইয়াছে। চিকিৎসক বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে কেবল যে তাহার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে তাহা নয়, তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। সেই সময় হইতে কাতাওকার গৃহে গভীর রাত্রিতেও বাতি জ্বলিত, চিকিৎসকেরা অহরহ আনাগোনা করিতেন। কাতাওকা গৃহিণী গ্রীষ্মাবাসে যাইবার জন্য মনস্থ করিয়াছিলেন, আপাতত সে সংকল্প তাঁহাকে স্থগিত রাখিতে হইল।

সুচিকিৎসা, দিবারাত্র ইকুর অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা, কিছুতেই কিছু হইল না—নামির অবস্থা ক্রমশ মন্দ হইতে লাগিল। উপরি উপরি কয়েকবার রক্তবমন হইল। যে দিন রক্তবমন হয় সে দিন সে আধঘুমন্ত অবস্থায় আপনার মনে কত কি বকে। দিন দিন সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। তাহাকে কাশিতে শুনিয়া যখন তাহার পিতার ঘুম ভাঙিয়া যাইত, তিনি উঠিয়া কন্যাকে দেখিতে আসিতেন, নামি অমনি মুখে ম্লান হাসি ফুটাইয়া পরিষ্কার গলায় কথা বলিত—তাহার যে নিশ্বাস ফেলিতে কত কষ্ট হইতেছে সে কথা গোপন করিতে চেষ্টা করিত। আধঘুমন্ত অবস্থায় সে গুণ গুণ করিয়া কেবলই তাকেওর নাম উচ্চারণ করিত।

চিকিৎসক যে দিনটিকে ভয় করিতেছিলেন সে দিন শেষ হইয়া আসিতেছিল। ঘরে ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে। কেহই উচ্চ কণ্ঠে কথা কহিতেছে না, সমস্ত বাড়ী সমাধিভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ। পীড়িতার ঘর হইতে দুইটি মহিলা বাহির হইয়া আসিলেন—একজন কাতোগৃহিণী ও অপরটী একটি বৃদ্ধা। এই বৃদ্ধাই জুশিতে সমুদ্রে লম্ফপ্রদানে উদ্যতা নামিকে বাধা দিয়াছিলেন। গত বৎসরের শরৎকালের পর আর তিনি নামিকে দেখেন নাই। নামির বিশেষ অনুরোধে আজ তাহাকে আহ্বান করিয়া আনা হইয়াছে।

"আপনার দয়ায় একবার তার প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। আপনার কাছে আমরা যে কত কৃতজ্ঞ তা আর কি বলব! নামি আর একবার আপনাকে দেখতে চেয়েছিল। আপনি এসেচেন দেখে নিশ্চয়ই সে খুব সুখী হয়েচে।" কাতো-গৃহিণী আর কথা কহিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, কি যে বলিবেন কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তিনি কোথায়? ওঁর স্বামী?"

"শুনচি তিনি ফর্ম্মোসায়।"

"ফর্ম্মোসা!"

বৃদ্ধা আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

কাতো-গৃহিণী অনেক কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া কহিলেন—"নামি সদাই তাঁর কথা ভাবচে. কাছাকাছি হোলে তাঁকে আমরা ডাকিয়ে পাঠাতুম, একবার ওদের শেষ দেখাটা হয়ে যেত। কিন্তু সে এখন ফর্ম্মোসায়; শুধু তাই নয়, যুদ্ধজাহাজে রয়েচে—"

এমন সময় কাতাওকা গৃহিণী প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে চিজু আসিয়া ব্যস্তভাবে মাতাকে কি বলিল।

প্রশস্ত ঘরটি বাতির ম্লান আলোতে আলোকিত। তুষার-শুভ্র শয্যার উপর নামি চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিয়াছিল, সে দুই বৎসর ধরিয়া ভুগিতেছে। এখন তাহাকে

দেখিতে ছায়া বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার পাণ্ডুর মুখ প্রায় স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কেশ পূর্ব্বেরই মত মসৃণ রহিয়াছে। শয্যার পার্শ্বে ধাত্রী বসিয়া সুশীতল মদ্যে তাহার ওষ্ঠ ভিজাইয়া দিতেছিল। ইকুর চক্ষু কোটরগত, মুখ রক্তহীন পাণ্ডুর। সে অন্য একজন ধাত্রীর সাহায্যে নামির বক্ষদেশ মালিস করিতেছিল। ঘর নিস্তব্ধ, কেবল নামির নিশ্বাস ফেলিবার শব্দ শুনা যাইতেছিল।

সহসা সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, চোখ খুলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"মাসী কোথায়?"

"এই যে মা," বলিয়া কাতোগৃহিণী চেয়ারখানা শয্যার নিকট টানিয়া লইয়া নামিকে কহিলেন—"একটু ঘুম হোল কি? কি বলচ? আচ্ছা।" ধাত্রী ও ইকুর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তোমরা একবার বাইরে যাও তো বাছা।" তাহারা চলিয়া গেলে তিনি শয্যার আরো নিকটে চেয়ার টানিয়া লইলেন। নামির কপালের উপর হইতে ধীরে ধীরে চুলগুলি সরাইয়া দিয়া তাঁহার ম্লান বিষণ্ণ দৃষ্টি বোনঝির উপর স্থাপিত করিলেন। নামিও মাসিমাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বালিসের তল হইতে কম্পিত হস্তে নামি একখানি খামে মোড়া চিঠি বাহির করিল। ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল—"এখানা—আমি—মরে'গেলে—তাঁকে—দিও।" কাতোগৃহিণী চক্ষু মুছিতে পত্রখানা বক্ষের কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া কহিলেন—"কিছু ভেবো না মা। আমি নিজের হাতে তাকেওকে দেবো।"

"কিন্তু এই—এই আংটি—"

নামি তাহার বাম হাতখানি মাসীমাতার জানুর উপর রাখিল। সেই হাতের একটি অঙ্গুলিতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় দীপ্তি পাইতেছিল। সেটি তাকেও বিবাহের সময় নামিকে দিয়াছিল। স্বামীগৃহ হইতে যখন সে বিতাড়িত হইয়াছিল তখন সকল জিনিসই সে শ্বশুরালয়ে ফিরাইয়া দিয়াছিল, ফিরাইয়া দিতে পারে নাই কেবল এই অঙ্গুরীয়টি। নামি কহিল—"এটি—আমি সঙ্গে—নিয়ে-যাবো।"

মাসীমাতা চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঘাড় নাড়িলেন। নামি চক্ষু মুদিল। কিছুক্ষণ পরে আবার চক্ষু মেলিয়া নামি কহিল—"তিনি—কি—করচেন—তাই—ভাবচি।"

"তাকেওসান ফর্ম্মোসায় পৌঁছে কাজ করচেন। নিশ্চয়ই সদাই আমাদের কথা ভাবচেন। তোমার বাবা বলচেন, সম্ভব হয়ত তাঁকে ডাকিয়ে পাঠানো হবে। নিশ্চয় বলচি নামি মা। আমি তাঁকে তোমার কথা বলব, এই চিঠিখানাও দেবো তাঁর হাতে।"

নামির অধরে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। পরক্ষণেই তাহার রক্তহীন কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল, চক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল, চক্ষু দিয়া উষ্ণ অশ্রু গড়াইতে লাগিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে বলিয়া উঠিল—"উঃ, বুক গেল! বড় ব্যথা!"

কপাল কুঞ্চিত করিয়া বক্ষদেশ হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া বেদনায় সে ছটফট করিতে লাগিল। কাতো-গৃহিণী ডাক্তার ডাকিবার জন্য উঠিতেছিলেন, এমন সময় সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল, তারপর কাশিতে কাশিতে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

চিকিৎসক ও অন্যান্য সকলে ঘরের মধ্যে আসিলেন। ধাত্রীর সাহায্যে চিকিৎসক নামিকে কতকটা সুস্থ করিলেন। শয্যার নিকটের একটা জানালা খুলিয়া দেওয়া হইল।

স্নিগ্ধ নিশীথ-সমীরণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে সেইমাত্র চাঁদ উঠিয়াছিল। চাঁদের আলো বৃক্ষ শাখার ফাঁকে ফাঁকে রূপার মায়া ছড়াইতেছিল।

জেনারেল, তাঁহার পত্নী, কাতোগৃহিণী, চিজু, কোমা ও ইকু—সকলেই শয্যার পার্শ্বে বসিয়া। ধীর সমীরণ নামির কেশগুচ্ছ কম্পিত করিতেছিল, সে মৃতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া শুইয়াছিল। চিকিৎসক তাহার নাড়ী টিপিয়া ধরিয়া এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। ধাত্রী একজন তাঁহার নিকটে বাতি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাতির আলো মিট্‌মিট্ করিতেছিল।

এইরূপে দশ মিনিট—পনর মিনিট অতিবাহিত হইল। ঘরের মধ্যে ঈষৎ একটু নিশ্বাসের শব্দ শুনা গেল, তারপর নামির অধর কম্পিত হইল। চিকিৎসক তাঁহার মুখে এক চামচ মদ ঢালিয়া দিলেন। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনা গেল, নামি বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল—"চল চল। ফিরে চল। এই যে মা আমরা আসচি। ও এখনো এখানে?" নামি চক্ষু মেলিল।

উদ্যানের উপরে চাঁদ উঠিয়া মায়াময় আলোকে নামির মুখ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। চিকিৎসক নামির পিতার দিকে চাহিয়া শয্যাপার্শ্ব পরিত্যাগ করিলেন। জেনারেল নামির হাত দুখানি তুলিয়া লইলেন। "নামি, মা! শুনচ। আমি তোমার বাবা। আমরা সবাই এখানে রয়েচি।"

নামি উদাসনেত্রে চাহিল, একটু নড়িল, তারপর পিতার অশ্রুভরা চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিল। "বাবা, ও বাবা! কেঁদে না বাবা!"

নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে নামি ডান হাতখানি ধীরে ধীরে উঠাইয়া পিতার হাত চাপিয়া ধরিল। নামি জিজ্ঞাসা করিল—"মা?"

ভায়কাউন্টেস নিকটে আসিয়া নামির অশ্রু মুছাইতে লাগিলেন। নামি তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল—"তবে চলুন মা!"

ভায়কাউন্টেসের অধর কম্পিত হইল, তিনি একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ক্রোন্দ্যমানা কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া কাতোগৃহিণী নিকটে আসিয়া নামির হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। কোমা আসিয়া দিদির শয্যার পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। শীর্ণ কম্পিত হাতখানি তুলিয়া নামি কোমার মাথার উপর স্থাপন করিয়া কহিল—

"কোমা-চান, বিদায় ভাই"—

নামির নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছিল। কোমা তাহাকে এক চামচ মদ দিল। চোখ মেলিয়া নামি চারিদিক দেখিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিল—"কি-চান্—মি-চান্?"

শিশু দুটিকে গ্রীষ্মাবাসে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। নামি মাথা নাড়িল। তাহার চারিদিকে কি যে হইতেছে সে যেন তাহা কিছুই বুঝিতেছিল না। এমন সময় ইকু আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নামির শিথিল হাত চাপিয়া ধরিল।

নামি কহিল—"ইকু"—

"দিদিমণি আমায় একলা ফেলে কোথায় যাও—" বলিয়া ইকু কাঁদিতে লাগিল।

বহু কষ্টে ইকুকে পার্শ্বের ঘরে পাঠানো হইল। আবার সব নিস্তব্ধ। নামি মুখ ও চোখ বন্ধ করিল। তাহার মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া নামিবার আর বিলম্ব নাই।

জেনারেল দ্বিতীয় বার নিকটে আসিয়া বলিলেন, —"নামি আর কিছু কি তুমি বলতে চাও। বল, মা, বল।"

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া নামি চক্ষু মেলিয়া মাসী-মাতাকে দেখিতে পাইল। তিনি কহিলেন—"আমি তোমার জন্যে সব করব মা। কিছু ভেবো না। যাও মা! তোমার মার কাছে যাও!"

নামির অধরে একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল। তারপর তাহার চক্ষু মুদিয়া গেল, তাহার সকল জ্বালার অবসান হইল।

স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক তাহার মৃত্যুপাণ্ডুর মুখ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। হাসিটি তখনো অধরে লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে ঘুম আর ভাঙিবে না!

* * * * *

চারিমাসের অধিক উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শরতের আকাশে মেঘের লেশমাত্র নাই। অপরাহ্ন সূর্য্যের আলোতে সমাধিভূমি প্লাবিত। চেরি গাছ হইতে একটি নীহারক্লিষ্ট পাতা নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল। বেড়ার গায়ে প্রস্ফুটিত পুষ্প বাতাস সুরভিত করিয়া তুলিতেছিল। ঝোপের মধ্যে কোথায় একটা পাখী ভয়ে ভয়ে চিরিক্ চিরিক্ করিয়া ডাকিতেছিল। কোডাইচো অভিমুখে একখানা রিক্স ছুটিয়া গেল, তাহার শব্দ যখন আর শুনা গেল না তখন স্থানটিতে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে কেবল সুদূর হইতে নগরের জীবন-কল্লোলের ক্ষীণ আভাস বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

একজন নৌকর্ম্মচারী হস্তে কতকগুলি শ্বেত চন্দ্রমল্লিকা লইয়া আওয়ামার সমাধিভূমিতে প্রবেশ করিল। সে থামিয়া থামিয়া নূতন সমাধিস্তম্ভগুলির লেখা পড়িতে পড়িতে অগ্রসর হইতেছিল। এক স্থানে কতগুলি সমাধি, তাহাদের চারিদিকে নীচু ঝোপ। কয়েকটি চেরী ও দেবদারু বৃক্ষ স্থানটিতে ছায়াবিস্তার করিতেছিল। সম্মুখে একটি পুরাতন সমাধি প্রস্তর। তাহার পার্শ্বেই একটি নূতন সমাধি। একটি সুদর্শন দেবদারু উহার উপর চিরহরিৎ আচ্ছাদন রচনা করিয়াছে। রক্ত ও হরিদ্রা বর্ণ চেরিপাতা উহার চতুর্দ্দিকে ঝড়িয়া পড়িতেছিল। সমাধির উপর গাঢ়কৃষ্ণ কালিতে লেখা রহিয়াছে, "নামি কাতাওকার সমাধি।" কর্ম্মচারীটি লেখা পড়িয়া প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সেখানে দাঁড়াইয়া সে বালকের ন্যায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

গতকল্য তাকেও ফর্ম্মোসা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

পাঁচ মাস পূর্ব্বে ফর্ম্মোসা যাইবার পথে ক্ষণেকের জন্য সে নামিকে দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার পর কতোগৃহিণীর পত্রে শুনিল—নামি আর ইহজগতে নাই।

সমাধির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাকেওর জলভরা চোখের সামনে গত তিন বৎসরের স্মৃতিগুলি ভাসিয়া উঠিতেছিল। বিবাহের দিন, ইকাওএর সূর্য্যালোক, ফুদোমন্দিরের অঙ্গীকার, জুশির শেষ সন্ধ্যা এবং অবশেষে য়্যামাশিনায় ট্রেনে বসিয়া সেই চকিতের দেখা, একে একে সকল কথাই মনে পড়িতেছিল। একদিন সে বলিয়াছিল—"শিগগির ফিরে এস," সে কণ্ঠস্বর এখনো সেদিনকার মতই কানে বাজিতেছে, কিন্তু কোথায় সে!

তাকেও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল—"নামি আমার! কোথায় তুমি? এমনি করে কি চলে' যেতে হয়!

মাথার উপর দিয়া বাতাস বহিয়া গেল। সির সির করিয়া কতগুলি চেরি পাতা সমাধির উপর ঝড়িয়া পড়িল। তাকেওর চমক ভাঙ্গিল। চক্ষু মুছিয়া সে সমাধির নিকট অগ্রসর হইল। ঝরা পাতা ও শুষ্ক ফুল-গুলি পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া সে হস্তস্থিত চন্দ্রমল্লিকাগুলি সেই খানে সাজাইয়া দিল। তারপর পকেট হইতে কি একটা বাহির করিল।

নামির শেষ পত্র। তাকেও পত্রখানি খুলিল। নামির সে সুন্দর হস্তাক্ষরের চিহ্নমাত্রও নাই। অক্ষরগুলা আঁকা বাঁকা, স্থানে স্থানে কালি লেপিয়া গিয়াছে, কাগজে অশ্রুচিহ্ন এখনো সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

সে লিখিয়াছিল—"আমার দিন শেষ হয়ে এসেচে তাই তোমায় কিছু বলে' যাচ্চি। এ জগতে তোমার দেখা পাবার আশা আমার মোটেই ছিল না, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তোমার সঙ্গে সে দিন দেখা হয়ে আমি যে কত সুখী হয়েছিলুম তা আর কি বলব। সেই এক মুহূর্ত্ত যে কেমন করে কি করে, কাটাব তা ভেবেই পাই নি।"

তাকেও যেন পরিষ্কার দেখিতে পাইল নামি ট্রেণের জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া অধীর আগ্রহে তাহার রুমাল নাড়িতেছে! তাকেও মুখ তুলিয়া চাহিল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই, কেবল সম্মুখে সমাধিস্তম্ভটি নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে।

"আমাদের সকল কল্পনা ব্যর্থ হয়েচে। তা হোক,তার জন্যে আমি কা'কেও দোষ দিই না। আমার ধূলার শরীর ধূলায় মিশলেও আত্মা আমার চিরদিন তোমার পাশে থাকবে—"

একটি বালক চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা, বাবা, কে রয়েচে দেখ।" সেই কণ্ঠে আবার বলিয়া উঠিল, "বাবা, তাকেও সান—",কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই ফুল হাতে লইয়া বালক দৌড়াইয়া তাকেওর নিটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিস্মিত তাকেও নামির পত্র হস্তে লইয়া পিছনে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল নামির পিতা দাঁড়াইয়া।

তাকেও সে দিকে আর চাহিতে পারিল না। মাথা নত করিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা কে আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে তাকেও মুখ তুলিল।

দুজনে চোখো চোখি হইল। বৃদ্ধ জেনারল বলিলেন—"তাকেও আমারও বুক ভেঙে গেছে!"

জগতে যে দুই জনকে নামি প্রাণ ভরিয়া ভালো বাসিয়াছিল, তাহারা দিনান্তের অস্পষ্ট আলোকে দাঁড়াইয়া নামির সমাধি অশ্রুসিক্ত করিয়া দিল।

সমাপ্ত

শ্রীহেমনলিনী রায়

যুবার কথায়

শেষ বয়সের শোকে তাপে
দুঃখের একটা বিশিষ্টতা কিবা?
অবাক্ হয়ে যুবার কথায়
জবাব খুঁজি হুঁইয়ে পৃষ্ঠ, গ্রীবা।
সত্য, ছেলেবেলা থেকে
জন্ম-মৃত্যুর উদয়াস্ত রবির—
একই রকম আস্‌ছি দেখে
দৃশ্যপটে একই চিত্র ছবির।
কিন্তু পূর্ব্বে কেহ সরে'
গেলে পরেও থাকত পড়ে হাসি;
যেথায় যেতাম, ঘরে ঘরে
বল্‌ত লোকে তোমায় ভালবাসি।
পর পারে এখন যে যায়
সে যে দেখায় বেজায় কঠিন সাজা,
হাড় ভেঙ্গে সে মজ্জা নে যায়;
এ হার জুড়ে হবে না আর তাজা।
জরায় শুষ্ক দেহে শোকের
অনুভূতি কেন থাকে বজায়?
কেন পোড়া হাড়ে লোকের
ছুঁচের-খোঁচা-তোলা দূর্ব্বা গজায়?
মরুর মাঝে মনসা কাঁটা!
বক্ষ ভাঙ্গা, শুষ্ক দেহের মাটি;
বাদুড়-চোষা শেয়াল-কাটা
ফলের খানি শক্ত দুঃখের আটি।
বাড়্‌ছে ছায়া পূর্ব্ব দিকে
আঁধার চেপে রাখ্‌ব তবু, যুবা?
—ভালবাস বুড়াটিকে?
আয় রে তবে স্নেহের মাঝে ডুবা।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার

পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ

(ঢাকা সাহিত্যপরিষদে পঠিত)

প্রায় পচিশ বৎসর অতীত হইল, নারায়ণগঞ্জের অদূরে স্থিত আশরফপুর গ্রামে দেবখড়্গ নামক এক বৌদ্ধ রাজার দুইখানা তাম্রশাসন ও একটি মিশ্রধাতুর

চৈত্য পাওয়া গিয়াছিল। একখানি শাসনের প্রান্তভাগ অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অপর শাসনখানা অবিকৃত এবং সম্পূর্ণাঙ্গ ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্য-বিবরণীর ৪৯—৫২ পৃষ্ঠায় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রথমোক্ত শাসনখানার পাঠ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণীর ২৪২ পৃষ্ঠায় এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণীর ১১৯ পৃষ্ঠায়ও এই শাসন দুইখানির কিছু কিছু বিবরণ বাহির হইয়াছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের বিবরণীতে চৈতের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব পরলোকগত ৺ গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় এই শাসন দুইখানি অবলম্বন করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি তাম্রশাসন দুইখানি লইয়া অনেক আলোচনা করেন, এবং যথাসাধ্য তাহাদের শুদ্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত করেন। পূর্ব্ববঙ্গের এই আদি প্রত্নোপাসকের এই প্রথম চেষ্টা তাহার আজীবন প্রত্নতত্বচর্চ্চার একমাত্র স্মৃতিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে গঙ্গামোহন বাবুর পাঠই এই পর্য্যন্ত আদর্শ পাঠ বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

গঙ্গামোহন বাবুর পরে এই তাম্রশাসন দুইখানা লইয়া উল্লেখযোগ্য আর কোন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উভয় তাম্রশাসনেই উল্লিখিত আছে যে উহারা "জয়কর্ম্মান্তবাসকাৎ" প্রদত্ত। এই কর্ম্মান্ত নগর কোথায় এবং খড়্গবংশ বঙ্গদেশের কোন প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, গঙ্গামোহন বাবু অথবা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধলেখকগণ তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই। এই পর্য্যন্ত তাহা নির্দ্দেশ করিতে কেন যে কেহ অগ্রসর হন নাই তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। খড়্গবংশ যে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন এমন মনে হয় না, কিন্তু তবু সেন এবং পাল রাজগণের শাসনাবলীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী এই শাসনদ্বয় ঐতিহাসিকগণ অন্যায় রূপে অবহেলা করিয়াছেন।

গত বৎসর কুমিল্লায় অবস্থান কালে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় আমাকে একখানি খোদিত লিপির প্রতিলিপি আনিয়া প্রদর্শন করেন। সেই লিপির মধ্যেও কর্ম্মান্ত নামক নগরের উল্লেখ পাইয়া ইহার বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। বৈকুণ্ঠ বাবু একখানা নটেশ শিবমূর্ত্তির পাদপীঠ হইতে উক্ত লিপিখানা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে অবগত হই যে, যেখানে এই মূর্ত্তিখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহার নিকটেই বড়কামতা নামক এক স্থান আছে। এই বড়কামতা কুমিল্লা নগরী হইতে প্রায় বার মাইল পশ্চিমে। স্থানটি অসংখ্য প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ-সমাকীর্ণ। বড়কামতায় এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসকলে প্রাপ্ত অসংখ্য শৈব ও বৌদ্ধ প্রস্তরমূর্ত্তি, বহু প্রাচীন দুর্গ ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন পুষ্করিণী ইত্যাদি, দেখিবামাত্র মনে হয় যে প্রাচীন কালে বড়কামতা মহা ঐশ্বর্য্যশালিনী নগরী ছিল। এই বড়কামতাই যে খড়্গবংশের রাজধানী এবং অধুনা-প্রাপ্ত লিপিতে উল্লিখিত কর্ম্মান্তনগরী সেই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

কর্ম্মান্তের খড়্গবংশ কোন সময়ে অভ্যুদিত হইয়াছিল? কতদূর পর্য্যন্ত তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল? কিরূপে খড়্গবংশের পতন হয়? নবাবিষ্কৃত শিলালিপির সাহায্যে আমরা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

গঙ্গামোহন বাবুর প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"(অনুবাদ)—অক্ষর-তত্বের বিচারে আশরফপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলি অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া বোধ হয়।" ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও এই মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ইহারা কেহই এই বিষয় লইয়া বেশী বিচার করেন নাই, এবং প্রধানতঃ অনুমানের আশ্রয় লইয়াই ঐরূপ

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অনুশাসনদ্বয় যে অত পর-বর্ত্তী নহে, তাহার অকাট্য প্রমাণ পরে প্রদত্ত হইবে; কিন্তু অক্ষর-তত্ত্বের বিচারেও তাম্রশাসনদ্বয় অত পরবর্ত্তী হইতে পারে না। অষ্টমশতাব্দীর শাসনাবলী এবং লেখ-মালার সহিত তুলনা করিলে নিমেষে প্রতীয়মান হইবে যে এই তাম্রশাসনদ্বয় উহাদের চেয়ে অনেক প্রাচীন। এমন কি ৭ম শতাব্দীর শেষভাগের লিপিমালার সহিত তুলনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাম্রশাসন-দ্বয় তাহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। হর্ষ সম্বতের ৬৬ বৎসর (৬৭২ খৃষ্টাব্দ) মানাঙ্ক যুক্ত মহারাজ আদিত্যসেনের সাহাপুরের মূর্ত্তিলিপি (১) এবং মহারাজ আদিত্যসেনেরই আপসড় শিলালিপির (২) সহিত আশরফপুর তাম্রশাসনের অক্ষরের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে আশরফপুর তাম্রশাসনের অক্ষরগুলি উক্ত লিপিদ্বয় হইতে প্রাচীন-তর। মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন (৩) এবং বাঁশখারায় (৪) প্রাপ্ত তাম্রশাসনদ্বয়ের অক্ষরের সহিত আশরফপুরের তাম্রশাসনদ্বয়ের অক্ষরের এত সাদৃশ্য আছে যে দেখিয়াই মনে হয়, এই চারিখানি তাম্র-শাসন একই সময়ের।

সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি হইতে প্রথম আমরা সমতট রাজ্যের নাম অবগত হই। "সমতট ডবাককামরূপনেপালকর্ত্তপুরাদি" রাজ্য তাঁহার রাজ্যের প্রান্তভাগে অবস্থিত ছিল। কাজেই আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই সমতটাদি রাজ্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং মহা-রাজাধিরাজ সমুদ্র গুপ্তের সময় সমতটাদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ প্রকাণ্ড ভারত সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব দ্বার রক্ষা করিয়া অবস্থিত ছিল। স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত কামরূপ ও নেপাল রাজ্যের বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, তাহারা আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ডবাক ও সমতট রাজ্যের অবস্থান আজও নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয় নাই। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি ভিন্ন আর দেখাও ডবাক রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অনে-কের মত, ডবাক নাম ঢাকাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া এখনও আত্মরক্ষা করিতেছে, এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমতট এবং হিমালয়প্রান্তবর্ত্তী কামরূপের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান ঢাকা জেলাই প্রাচীন ডবাক রাজ্য। সে যাহা হউক, ডবাক রাজ্যের কি হইল কিছুই জানা যায় না; কিন্তু সমতট রাজ্য যে বহুদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল, হিউএন্‌সঙ্গ এবং ইৎচিঙ্গের বিবরণ হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, হিউএন্‌সঙ্গ সমতটের বর্ণনা প্রসঙ্গে সমতটের রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাহার বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে সমতটে ৩০টি সঙ্ঘারাম এবং দুই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু-ছিলেন। ইহাদের পোষণ এবং প্রতিপালনের ব্যয় রাজাই সমস্ত বহন করিতেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে রাজা নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। হিউএন্‌সাঙ্গের শিক্ষক নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ শীলভদ্র সমতট রাজপরিবার হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। এবং ইৎচিঙ্গ পরিষ্কারই বলিয়া গিয়াছেন যে সমতটরাজ গোড়া বৌদ্ধ ছিলেন। এখন আমাদের অনুসন্ধের বিষয় এই যে; সমতট রাজ্য ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল, হিউএন্‌সাঙ্গ এবং ইৎচিঙ্গ কর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং বর্ণিত দেব-মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ কোথায় থাকা সম্ভব, এবং সম-তটের যে রাজবংশ হইতে প্রসিদ্ধ শীলভদ্র অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন তাহা কোন রাজবংশ।

আমাদের বিশ্বাস এই বৌদ্ধ রাজবংশ কর্ম্মান্ত নগরের খড়্গ রাজবংশ।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন এবং বাঁশখারা তাম্রশাসনদ্বয়ের অক্ষর আশরফপুরের তাম্রশাস-

(১) Pl. XXIX Fleet's Gupta Inscriptions.
(২) Ibid Pl. XXVIII.
(৩) Epi. Ind. Vol. I. P. 67
(৪) Ibid Vol VI. P. 210.

নের অক্ষরের অনুরূপ। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে আশরফপুরের তাম্রশাসনের ভূমিদাতা মহারাজ দেবখড়্গ হর্ষের সমসাময়িক রাজা। ইৎচিঙ্গের বিবরণ পড়িয়া এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

আশরফপুরের প্রথম তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, কুমার রাজভট্টের দীর্ঘজীবন কামনায় মহারাজ দেবখড়্গ আর্য্যসঙ্ঘে ভূমিদান করিতেছেন। দ্বিতীয় তাম্রশাসনে রাজভট্ট নিজের সম্পত্তি হইতে ত্রিরত্নের জন্য ভূমিদান করিতেছেন,এবং তাঁহার পরিচয় হইতে বুঝা যায় যে তিনি মহারাজ দেবখড়্গের পুত্র এবং রাজ্যের ভাবী অধিকারী। সৌভাগ্যক্রমে ইৎচিঙ্গ তাহার বিবরণে এই সদাশয় রাজকুমারের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইৎচিঙ্গ ৬৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে তাহার সময়ে সমতটে মহারাজ রাজভট্ট রাজত্ব করিতেছিলেন। (৫) রাজভট্ট মহা উৎসাহী বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারে তাহার অনন্যসাধারণ যত্ন ছিল। হিউএন্থসঙ্গের সময় সমতটে ২০০০ ভিক্ষু বাস করিত, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পরে ইৎচিঙ্গ সমতটে যাইয়া দেখেন যে মহারাজ রাজভট্টের উৎসাহে বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৪০০০ এ দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্ত ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ দেবালয়াদির ব্যয়ভার সমস্ত মহারাজ রাজভট্ট বহন করিতেন। যিনি কুমারাবস্থায় নিজের সম্পত্তি হইতে ত্রিরত্নের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন, রাজা হইয়াও দানে তাহার সেই মুক্তহস্ততা ব্যাহত হয় নাই। খড়্গবংশ যে প্রকৃতই ব্রাহ্মণবংশ ছিল, রাজভট্টের নামই তাহার প্রমাণ। তাম্রশাসনে এবং ইৎচিঙ্গের বিবরণে উভয়ত্রই তিনি রাজভট্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

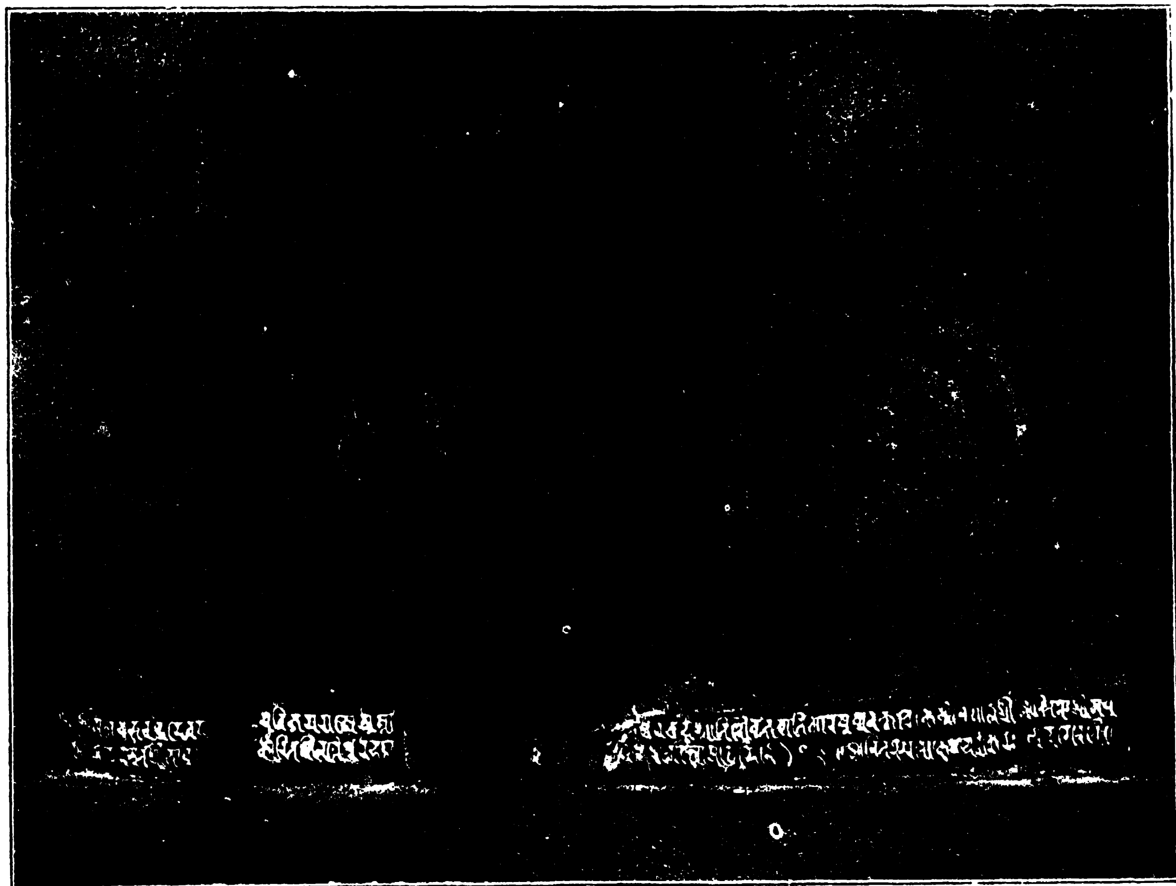
সমতট কোথায় ছিল তাহা লইয়া অনেক বাকবিতণ্ডা হইয়াছে, কিন্তু কেহই স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। সেই সমস্ত মত উদ্ধৃত করিয়া কোন লাভ নাই। ইৎচিঙ্গের বিবরণ এবং আশরফপুরের তাম্রশাসন হইতে আমরা দেখিলাম যে সমতটরাজ বৌদ্ধ রাজভট্টের রাজধানী কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী কর্ম্মান্ত নগরীতে ছিল। সমতট রাজ্য যে খুব ছোট ছিল এমন বোধ হয় না। রাজ্যটি যে পশ্চিমে অনেক দুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা কর্ম্মান্তপতি সমতটরাজ কর্ত্তৃক নারায়ণগঞ্জের অদুরস্থিত আশ্রফপুর গ্রামের ভূমি দান দেখিয়াই বুঝা যায়।

হিউয়েন্থ সঙ্গের বর্ণনা অনুসারে সমতট রাজ্যের পূর্ব্বে শ্রীহট্টরাজ্য অবস্থিত ছিল। উত্তরে কামরূপ রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। আমাদের বোধ হয়, পূর্ব্বে শ্রীহট্ট, উত্তরে কামরূপ, পশ্চিমে করতোয়া, গঙ্গা ইত্যাদি নদী, এবং দক্ষিণে সমুদ্র এই চতুঃ সীমার মধ্যে সমতট রাজ্য অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান ত্রিপুরা, নোয়াখালী বরিশাল, ফরিদপুর, এবং ঢাকা জেলা লইয়া এই রাজ্য গঠিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী কর্ম্মান্ত নগর এই বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল। হিউএন্থসঙ্গ লিখিয়া গিয়াছেন যে সমতট রাজ্যের রাজধানীর পরিধি প্রায় পাঁচ মাইল। রাজধানীর অভ্যন্তরে ত্রিশটি সঙ্ঘারাম এবং প্রায় শতাধিক দেবমন্দির বর্ত্তমান আছে। রাজধানীতে অনেক নিগ্রন্থ জৈনও বাস করিত। সহরতলীতে অশোকরাজনির্ম্মিত এক স্তূপ বিদ্যমান ছিল। স্তূপের নিকট একটি সঙ্ঘারামে সবুজ বসনে ভূষিত প্রায় ছয় হাত উচ্চ একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি ছিল। অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই ঐ সমস্তের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইবে। [এই বর্ষের জ্যৈষ্ঠের প্রতিভায় প্রকাশিত "প্রত্নানুসন্ধানের সুখ দুঃখ" প্রবন্ধে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে] সেই স্তূপ ও সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ এখনও কামতার নিকট বর্ত্তমান আছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ইৎচিঙ্গ ৬৭৩ হইতে ৬৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। কাজেই

(৫) Watters Yuan Chuang Vol II. P. 188.



বড় কামতায় প্রাপ্ত নর্ত্তেশ্বর লিপি।

রাজভট্ট সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে সমতটে রাজত্ব করিতেছিলেন, এই বংশের চারি জন রাজার নাম জানিতে পাওয়া গিয়াছে যথা,—খড়্গোদ্যম, তাহার পুত্র জাতখড়্গ, তাহার পুত্র দেবখড়্গ, এবং তাহার পুত্র রাজা রাজভট্ট। কাজেই দেখা যাইতেছে যে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সমস্ত ভারতবর্ষময় যখন অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, এই বংশের প্রথম রাজা খড়্গোদ্যম সেই সময় সমতট রাজ্যে রাজত্ব স্থাপন করেন।

রাজভট্টের পরে সমতটে কে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং খড়্গবংশের প্রাধান্য সমতটে কতদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল, তাহা সঠিকরূপে জানিবার কোনও উপায় নাই। বড় কামতা হইতে আবিষ্কৃত [এখন ঢাকা সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত] নটেশ শিবমূর্ত্তির খোদিত লিপি হইতে সমতটের পরবর্ত্তী ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।*

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে লিপিযুক্ত মূর্ত্তিটি বড় কামতার নিকটে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটি অষ্টাদশ হস্ত বিশিষ্ট নর্ত্তনশীল শিবের মূর্ত্তি। সম্প্রতি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিক্রমপুরের কলিকাল গ্রামে প্রাপ্ত ঐরূপ একখানা মূর্ত্তির চিত্র ঢাকা রিভিউতে প্রকাশিত করিয়াছেন। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে নটেশ শিবের পূজা বহুল ভাবে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। সমস্ত ভারতবর্ষেই নটেশ শিবের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রমপুর হইতে এ পর্য্যন্ত তিনখানা নটেশ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাদ্রাজ মিউজিয়মে চারিখানা নটেশ মূর্ত্তি আছে কিন্তু তাহার প্রত্যেকটিই চারিহস্ত বিশিষ্ট। বাদামী, এলিফেণ্টা এবং এলোরাতে যে নটেশ মূর্ত্তি আছে তাহাদের চতুরাধিক হস্ত। বাদামীর নটেশ মূর্ত্তিটি ঠিক কুমিল্লা নটেশ মূর্ত্তির অনুরূপ।

কুমিল্লার নটেশ মূর্ত্তির খোদিত লিপির পাঠ এবং অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

মূল

(১ম) শ্রীমল্লয়হচন্দ্র দেবপাদীয় বিজয় রাজ্যে অষ্টা... ষ্ণে চতুর্দ্দশ্যা তিথৌ বৃহস্পতি বারে পুষ্যানক্ষত্রে। কর্ম্মান্ত পালশ্রী

(২য়) কুসুম দেবসুত শ্রীভারুদেব কারিত শ্রীনর্ত্তে শ্বর ভট্টা... ... আষাঢ় দিনে ১৪॥ খনিতঞ্চ রতোকেন সর্ব্বাক্ষরঃ।

(৩য়) খনিতঞ্চ শ্রীমধুসূদনেনেতি॥

অনুবাদ

(১ম) শ্রীমল্লহচন্দ্রদেবের বিজয়-রাজ্যের অষ্টাদশ বৎসরে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে বৃহস্পতি বারে পুষ্যানক্ষত্রে কর্ম্মান্তরাজ শ্রী

(২য়) কুসুমদেবের পুত্র শ্রীভারুদেব নর্ত্তেশ্বর ভট্টারকের প্রতিমা (?) করাইয়াছেন। আষাঢ় মাসে ১৪ (তারিখে)। সমস্ত অক্ষর রতোক দ্বারা খনিত।

(৩য়) মধুসূদন দ্বারাও খনিত।

খুব সম্ভব, লিপিখানিতে অব্দ দেওয়া ছিল; কিন্তু দ্বিতীয় অংশের প্রথম ভাগ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বোধ হয় তারিখটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। "আষাঢ়" শব্দটীর পূর্ব্বে কয়েকটি অক্ষরও পড়া যায় নাই। তাহাতে শক কিম্বা তদ্রূপ কিছু লিখিত আছে বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক,

* মূর্ত্তিটি ঢাকা সাহিত্য পরিষদে আনয়নের পূর্ব্বেই উপরিস্থ শিবমূর্ত্তিটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্তু প্রস্তরের উপর নর্ত্তনভঙ্গিতে স্থাপিত পদযুগলের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, আলোকচিত্র গ্রহণের ত্রুটিতে উপরিভাগ না উঠাতে সেটা চিত্রে দৃষ্ট হইতেছে না—প্র, স।

* মধুসূদন বোধ হয় ভাস্করের নাম। "পূর্ব্ববঙ্গের ভাস্কর্য্য পদ্ধতি" নামক প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

তারিখ না থাকিলেও লিপিটিতে এমন সকল তথ্য আছে যে হয়ত তাহা অবলম্বনে জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা সন তারিখ ঠিক করা যায়। প্রশ্ন এইরূপ হইবেঃ—কোন বৎসরে ১৪ই আষাঢ় বৃহস্পতি বার, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথি এবং পুষ্যা নক্ষত্র মিলিয়াছিল? আমি এই প্রশ্ন বড় বড় জ্যোতিষ-শাস্ত্রবেত্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কটক কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম এ ও ঢাকা কলেজের, ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম, এ, মহাশয় উভয়েই আমার এই প্রশ্ন বিচারে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন; কিন্তু উভয় মহাত্মাই এক বাক্যে বলেন যে চতুর্দ্দশী তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রের সমাগম অসম্ভব। অথচ লিপিতে তাহা অতি স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে : এই আশ্চর্য্য সমস্যার মীমাংসা কি হইতে পারে বুঝিতে পারিতেছি না। অক্ষর-তত্ত্বের বিচারে লিপিটিকে কিছুতেই ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায় না।

লিপি হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে লিপির সময়ে কর্ম্মান্তের রাজগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন। কর্ম্মান্তরাজ কুসুমদেবের নামের পূর্ব্বে কোন রাজোপাধি সূচক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই! ইহা হইতেই বুঝা যায় যে কর্ম্মান্তের রাজগণ স্থানীয় জমীদারের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন। লিপি হইতে ইহাও দেখা যায় যে কর্ম্মান্ত স্বাধীনতা হারাইয়াছে। কুসুমদেব লয়হচন্দ্র দেব নামক জনৈক অজ্ঞাতপূর্ব্বনামা রাজার অধীনে সামন্ত রাজা স্বরূপ রাজত্ব করিতেছিলেম।

বর্ত্তমান সময়ে চন্দ্র উপনামধেয় দুই রাজবংশের বার্ত্তা আমরা অবগত আছি। একটি বিক্রমপুরের চন্দ্র রাজবংশ, অপরটি আরাকাণের চন্দ্র রাজবংশ।

অল্প দিন হইল বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশের বিষয়ে সঠিক খবর পাওয়া গিয়াছে। মিঃ রেঙ্কিণ ঢাকা রিভিউর গত অক্টোবর সংখ্যায় রাজা শ্রীচন্দ্রের ইদিলপুর তাম্রশাসনের বিষয় প্রকাশিত করিয়াছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় মিঃ রেঙ্কিণকে ইদিলপুরের তাম্রশাসনখানা পরীক্ষা করিয়া তাহার এক সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাই মিঃ রেঙ্কিণ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা হইতে বিক্রমপুরের চন্দ্র রাজবংশের তিনজন রাজার নাম অবগত হওয়া যায়—যথা:—সুবর্ণচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র এবং শ্রীচন্দ্র। ইদিলপুরের তাম্রশাসনের প্রতিকৃতি সহ সম্পূর্ণ পাঠ প্রকাশিত না হইলে ইহা লইয়া বেশী আলোচনা সম্ভবপর নহে; কিন্তু গঙ্গামোহন বাবুর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হইতে বুঝা যায় যে রাজা চন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাম্রশাসনের অক্ষরাবলী দ্বাদশ শতাব্দীর। কাজেই কুমিল্লা নর্ত্তেশ্বর লিপির লয়হচন্দ্রের জন্য আরাকাণের চন্দ্রবংশ খুঁজিতে হইবে।

আরাকাণের চন্দ্র রাজবংশের ইতিহাস বড়ই অসম্পূর্ণ রূপে জানা গিয়াছে। মিঃ ফেয়ার তৎকৃত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে আরাকাণের চন্দ্রবংশের বিবরণ যতদূর অবগত হওয়া যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে আরাকাণের চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম রাজা মহাটৈংচন্দ্র। তিনি ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং রাজ্যলাভ করিয়াই বৈশালী নামক নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের নয় জন রাজা বৈশালী নগরে ৯৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ফেয়ার সাহেবের "নিউমিস্‌মেটা অরিয়েন্টেলিয়া" দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম ভাগ, ৪২ পৃষ্ঠাতে আরাকাণি ভাষা হইতে অক্ষরান্তরিত এই নয় জন রাজার সম্পূর্ণ নাম দেওয়া আছে। এই সকল নাম শুনিতে এমন অদ্ভুত যে ইহাদের মূল সংস্কৃত নামগুলি যে কি ছিল তাহা ঠিক করা দুঃসাধ্য।

আরাকাণের চন্দ্ররাজাদের কয়েকটি মুদ্রাও পাওয়া

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক শ্রীচন্দ্রের একখানা তাম্রশাসন "সাহিত্যে" প্রকাশিত করিয়াছেন।

গিয়াছে। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে মুদ্রা হইতে যে সকল নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোন নাম আরাকাণী ভাষার পুস্তক হইতে সঙ্কলিত নয় জন রাজার এক জনের নামের সহিতও মিলে না! মুদ্রা হইতে বর্ম্মচন্দ্র প্রীতিচন্দ্র এবং বীরচন্দ্র এই কয় রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু উল্লিখিত নয়জন রাজার এক জনের নামও এইরূপ নহে।

এমতাবস্থায় কুমিল্লা নর্ত্তেশ্বর লিপির লয়হচন্দ্রকে নির্দ্দিষ্ট করা সহজ নহে। কিন্তু ঐ নয় জন রাজার শেষ রাজার নাম—চুল টৈং চন্দ্র (Tsu-la-taing-tsandra ইহাই শ্রীলয়হচন্দ্র হইতে পারে চুলটৈংচন্দ্র ৯৫১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহন করেন এবং কুমিল্লা লিপিও ঐ সময়েরই হওয়া সম্ভব।

যদি চুলটৈংচন্দ্রই শ্রীলয়হচন্দ্র হইয়া থাকেন তবে এই অনুমান অন্যায় নহে যে রাজভট্টের বংশধরগণ সমতটের কর্ম্মান্ত নগরে রাজভট্টের তিরোধানেরও একশত বৎসর পর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। পরে আরাকাণের চন্দ্র বংশ তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে সমতট রাজ্য অধিকার করেন। লয়হচন্দ্রের সময় অর্থাৎ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজা কুসুমদেব লুপ্তগৌরব কর্ম্মান্তের সিংহাসনে বসিয়া আরাকাণের সামন্ত রাজরূপে কর্ম্মান্ত শাসন করিতেছিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে আশরফপুরের তাম্রশাসনদ্বয়ে রাজকীয় লাঞ্ছনে যেরূপ একটি শয়ান বৃষের আকৃতি আছে, আরাকাণের চন্দ্ররাজদের মুদ্রায়ও সেইরূপ শয়ান বৃষের মূর্ত্তি অঙ্কিত। ইহাতে বোধ হয় যে খড়্গ ও চন্দ্রবংশের মধ্যে কোনও রূপ অজ্ঞাত সম্বন্ধ ছিল।

বড়কামতার চতুর্দ্দিকস্থ পরগণার নাম পাটিকারা। মহারাজোয়াং নামক ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে লিখিত আছে যে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতেও এই স্থানে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাটিকারার এক রাজকুমার পেগুর রাজা কিংদিখার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহজ পুত্র রাজা অলংশিশু আবার পাটিকারার এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। রাজা অলংশিশু ১০৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৬০ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তিনি অনেক বার পিতৃভূমি সন্দর্শন করিতে আগমন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে লালমাই পাহাড়ে রণবঙ্কমল্ল নামক এক রাজার একখানা তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় যে রণবঙ্কমল্ল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক রিসার্চেস নামক পত্রের নবমখণ্ডের ৩৯৮ পৃষ্ঠায় কোলব্রুক সাহেব এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার করেন। সেই পাঠই তাহার রচনাবলী সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪১ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। তাম্রশাসনখানা তৎকালে এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর ইহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

লুব্ধ

আঁধারে তরণী বাহিয়া চলেছি,
নাচে জল-রাশি দু'ধারে,
মত্ত জলধি উঠেছে গরজি,
জাগে ভীতি হৃদি-মাঝারে!

গরজি'ছে ঘন জলদ-নিকর,
চমকি' হাসি'ছে দামিনী,
প্রলয়ের শত ভীম উচ্ছ্বাসে
নাচি'ছে ভীষণা যামিনী!

আজি এ' বিষম ঘোর দুর্য্যোগে
আমি শুধু হেথা' একাকী,
কেবলি বাহিয়া চলেছি তরণী,
পথ, ঘাট কিছু না দেখি!

জন-মানবের নাহি হেথা' সাড়া,
চীৎকারে বায়ু-বারিধি,
বিচরে চৌদিকে বিভীষিকা-রাশি
ব্যাপিয়া বিশ্ব-পরিধি !

সুন্দর মোর বাস-ভূমি ছাড়ি'
কোন্ কুহকেতে মজিয়া,
কা'র মোহ-মাখা সোহাগ-মালাটি
অন্তর মাঝে যাচিয়া,

অজ্ঞাত কোন্ মায়িক প্রদেশে
চলেছি, কহিবে কে মোরে !
প্রিয়-বন্ধন ছিঁড়িয়া, কাহারে
বাঁধিতে চলেছি সে ডোরে !

কে আসি,' আশার দীপ্ত আলোকে
অধর মধুর খচিয়া,
উজ্জ্বল দু'টি নয়নের কোণে
বিশ্ব-সুষমা রচিয়া,

ভুলা'য়ে, ভুলা'য়ে, আনিয়া আমারে
ভীষণ সাগর-মাঝারে,—
সহসা সুদূরে গেছে গো লুকা'য়ে,
দু'হাতে টানিয়া আঁধারে !

বহুদূরে এবে আসিয়া পড়েছি,
পারি না ফিরা'তে তরণী,
কোথা' এ' সময়ে অয়ি সুহাসিনি,
অয়ি কুহকিনী-রমণি !

সাগরের পারে তব মায়া-পুরে
আলোটি জ্বালিয়া ধর গো ;
শত বিভীষিকা ভাসি'ছে আঁধারে,
এ তিমির-রাশি হর গো !

এ' কাল নিশীথে, কুহকে তোমার
মজাও, মোহিনি, আমারে
তোমারি লক্ষ্যে বাহিব তরণী,
আজি দুর্য্যোগে' আঁধারে !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সুপ্তি ও জাগরণ *

চুম্বনে কার, আঁখির পাতা পড়লো নমি রে,
অবশ হলো সকল শরীর অলস সমীরে ॥
গেলাম মুদি—ছিলাম ফুটে ;
মূর্চ্ছা এলো নেত্রপুটে
মৃণাল তনু এলিয়ে গেল তাহার শরীরে ।
তার পরে সে সংজ্ঞাহতা,
শুনিনি ক একটি কথা ;
কেমন যেন নেশার মোহে ছিলাম আমি রে ॥

চুম্বনে কার, আঁখির পাতা উঠলো ফুটিয়া ।
শিউরে দিল দেহ হঠাৎ শোণিত ছুটিয়া ॥
শিথিল হলো শক্ত মুঠি
অমল আলোয় গেলাম ফুটি !
মরমকোষের কুণ্ঠাভরা গ্রন্থি টুটিয়া ।
দাঁড়িয়ে উঠে মৃণাল ভরে,
চেয়ে তাহার বদন পরে
নিলাম শিরে, পায়ের অরুণ রেণু লুটিয়া ॥

শ্রীকালিদাস রায় ।

মগধের রাজা "দর্শক" *।

"অহো! প্রচ্ছন্ন-রত্নতা পৃথিব্যাঃ" ॥—ভাসঃ

পরহিতকামী আর্য্যগণ স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে ভবিষ্যৎ জনসমাজের কল্যাণার্থ নানাবিধ বহুমূল্য সম্পত্তি রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ প্রভৃতি বহুবিধ সম্পত্তি আমরা পরম্পরাক্রমে পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি ; কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে এতদুর আঢ্য হইয়াও, আমরা একটি বিষয়ে ততদুর সৌভাগ্যবান্ হইতে পারি নাই। সে বিষয়টি "ইতিহাস"। ইদানীন্তন লোকে "ইতিহাস"-শব্দে যাহা বুঝেন, সে প্রকার ইতিহাস আমাদের নাই,— এইমাত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাচ্য প্রতীচ্য প্রখ্যাতনামা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই, ভারতীয় আর্য্যগণের "ঐতিহাসিক প্রতিভা" ["historical sense"] একবারেই ছিল না বলিয়া যেপ্রকার দোষারোপ করেন, বোধ করি তাঁহারা ততটা দোষের পাত্র ছিলেন না। তাঁহাদের রচিত পুরাণ-গ্রন্থ-নিচয়, ঐতিহাসিক আখ্যান-মালা, এবং পর্ব্বতগাত্রে, শিলাস্তম্ভে, তাম্রাদি ধাতুপট্টে শ্রীমূর্ত্তিপাদপীঠে, মন্দিরপ্রাচীরে, মুদ্রা-পৃষ্ঠে, খোদিত বা উৎকীর্ণ প্রশস্তি-লিপি প্রভৃতি দেখিয়া, পড়িয়া বা জানিয়া তাঁহাদিগকে "ঐতিহাসিক প্রতিভাহীন" বলিয়া কলঙ্কিত করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হওয়া উচিত নয়। ধারাবাহিক, প্রণালী-বদ্ধ ইতিহাস তাঁহারা রচনা করেন নাই মাত্র। ভারতীয় জাতীয়-ইতিহাস লিখিত হয় নাই,—যথাযথ ভাবে তাহা লিখিত হইতে আরও বহুকাল লাগিবে। পর্য্যায়-গত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস লিখিত নাই সত্য, কিন্তু ইতিহাস রচনার উপাদানের অভাবও নাই। অভাব কেবল উপকরণ-সংগ্রহের, অভাব তাহা সঙ্কলন কবিবার উপযুক্ততার, অভাব উদ্যমের ও ধৈর্য্যের, এবং অভাব দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহানুভূতির। আমরা নিজ দোষে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া, অন্ধকার অনুভব করিতেছি।

প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্কলন-বিষয়ে, বৈদেশিক পর্য্যটকগণের লিখিত বর্ণনা প্রভৃতি যেমন প্রয়োজনীয়, প্রাচীন কালে লিখিত কাব্য-নাটকাদির বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পাঠ ও আলোচনাও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। প্রাচীন কবিগণ প্রাচীনতর ঘটনা বা বিষয় অবলম্বন করিয়া কাব্যাদি রচনা করিয়া থাকিলেও, নিজ আবির্ভাব কালের অনেক তথ্য স্বরচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অন্ততঃ কবি-কাল-প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ভাব-ভাষা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শস্ত্র-শাস্ত্র, আহার-বিহার, বাণিজ্য-ব্যবসায়, স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য, চিত্র-সঙ্গীত প্রভৃতি নানা বিদ্যা ও নানা ললিত কলার অনেক আভাস কবি-রচিত গ্রন্থ হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

মহাকবি ভাসের নবাবিষ্কৃত নাটক-চক্র হইতে প্রাচীন ভারতের বহু বিলুপ্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। সংক্ষিপ্ত উপক্রমণিকা সহ ভাস-নাটক-চক্রের কথা-বস্তু প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিয়া,—(১) মহা-কবির প্রাদুর্ভাব কাল, (২) তাঁহার কাব্যে তৎকালীন ভারতবর্ষের সমাজ-চিত্র, ও (৩) তৎপরবর্ত্তী কবিগণের উপর ভাসের প্রভাব—এই বিষয় কয়টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার জন্য "সাহিত্য"-সম্পাদকের নিকট প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছি। মহাকবি ভাস যে কালিদাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, তাহা প্রবন্ধান্তরে [সাহিত্য ১৩২০ সনের, পৌষ সংখ্যা] পর্য্যালোচিত হইয়াছে। ভাসের উদ্ভব-কালের নিশ্চিত নির্দ্দেশ বড়ই কঠিন। কিছুকাল হইল, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস"-রচয়িতা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ম্যাক্ ডোনেল সাহেব রয়েল এসিয়াটিক

* উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর পাবনা অধিবেশনে পঠিত।

সোসাইটির (Royal Asiatic Society) [১৯১৩ জানুয়ারী সংখ্যা] পত্রিকার একটি প্রবন্ধে ভাসের প্রাদুর্ভাব-কাল-সম্বন্ধে নিজ মত বিজ্ঞাপিত করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই মহা-কবির উদ্ভব-কালের নিম্নতম সীমা অন্ততঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিচার-সমর্থন-পটু বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রমাণাবলী যথা-যথ-রূপে ও সাবধানে পরীক্ষিত ও পর্য্যালোচিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের সম্যক্ মীমাংসা সহজ নয়। সে যাহা হউক, ভাস যে অতি প্রাচীন কালের কবি সে বিষয়ে কোন মত-দ্বৈধ নাই। এই মহাকবি বহু নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে "প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণম্" ও "স্বপ্ন বাসবদত্তম্" নামক নাটক দুইখানিকে তিনি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। অবন্তি-পতি প্রদ্যোতের কারাগার হইতে, মহাসচিব-যৌগন্ধরায়ণ কর্ত্তৃক বৎসরাজ উদয়নের কারামুক্তি,—প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তাকে অপহরণ করিয়া তাঁহাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন এবং পরে উদয়ন-বাসবদত্তার বিবাহ-সম্পাদনই প্রথমোক্ত নাটকের প্রধান কথা। তৎপর বৎসরাজ্য শত্রু-হস্ত গত হইলে, যখন উদয়নের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল, তখন মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণ আদেশিকগণের সিদ্ধাদেশে বিশ্বাসপ্রবণ হইয়া, মগধরাজ "দর্শকের" ভগিনী পদ্মাবতীর সহিত স্বপ্রভু উদয়নের বিবাহ সম্পাদন বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন, কারণ আদেশিকগণ বলিয়াছিলেন যে, মগধনাথ "দর্শকের" ভগিনী পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করিলে পর, বৎস-রাজ্য পুনরায় উদয়নের স্বহস্তগত হইবে। উদয়ন মৃগয়ায় বহির্গত হইলে, রাজনীতিবিচক্ষণ যৌগন্ধরায়ণ গোপনে রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে রাজ-মহিষী বাসবদত্তা লাবাণক গ্রামে অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া পরলোক-প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তিনি নিজেও রাজমহিষীকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করিতে যাইয়া সমান অবস্থাই লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ সাজিয়া প্রচ্ছন্নবেশধারিণী বাসবদত্তাকে সঙ্গে লইয়া মগধে গেলেন এবং সেই স্থানে অবন্তি-রাজ-কন্যাকে আত্ম-ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিয়া মহারাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর হস্তে ন্যাসরূপে রাখিয়া দিলেন। ঘটনাক্রমে উদয়ন কার্য্যোপলক্ষে মগধে গিয়াছিলেন। মহারাজ দর্শক ইতিপূর্ব্বেই বাসবদত্তার মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়াছিলেন; তিনি উদয়নের বয়সানুরূপ রূপগুণাদিতে মোহিত হইয়া নিজ-ভগিনী পদ্মাবতীকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। কিছুকাল পর মগধ-পতি দর্শকের চতুরঙ্গ-বলের সহায়তায় উদয়ন শত্রু-হৃত নিজ রাজ্য পুনরায় আত্মাধিকারে আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন, এবং মগধেই ঘটনাক্রমে স্ব-মহিষী বাসবদত্তা ও স্ব-সচিব যৌগন্ধরায়ণের সহিত পুনর্মিলিত হইলেন। ইহাই দ্বিতীয় নাটকের বর্ণিত বিষয়।

প্রাচীন কবির এই নাটক দুইখানিতে যে তিনটি প্রধান রাজকুলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না,—তাহা আলোচ্য। যদিও নাটকোক্ত ঘটনাবলির মূল অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ হই নাই, তথাপি পালি-সাহিত্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ও তৎ-সম-সময়ে ভারতবর্ষে ষোলটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, যথা, অঙ্গ, মগধ, কাশি, কোশল, মল্লদিগের দেশ, চেড়িদিগের দেশ [বর্ত্তমান নেপালের অধিকাংশ], বৎস দেশ, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অশ্বকদেশ, অবন্তি, গান্ধার, ও কাম্বোজ। এই ষোলটি রাজ্যের মধ্যে মগধ, কোশল, বৎস ও অবন্তি—এই প্রধান রাজ্যচতুষ্টয় বুদ্ধদেবের সম-সাময়িক ছিল। পালি-গ্রন্থে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, সেই সময়ে মগধের রাজধানী রাজগৃহ-নগরে [বর্ত্তমান রাজগির] শিশুনাগ-বংশীয় রাজা বিম্বিসার ও তদনন্তর তদীয় পুত্র অজাতশত্রু রাজত্ব করিতেছিলেন। কোশল-রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী-নগরে প্রসেনজিৎ তদানীন্তন রাজা ছিলেন। বৎসরাজের রাজধানী কোশাম্বি-নগরে উদয়ন শাসন পরিচালনা করিতেছিলেন। অবন্তি রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী-নগরে প্রদ্যোত সিংহাসনাধিরূঢ় ছিলেন। এই প্রাচীন রাজ্য-চতুষ্টয় পরস্পর বিবাহ-সূত্রে সম্পর্কিত ছিল বলিয়া ইতিহাসে পরিচয় পাওয়া যায়; এই বিবাহ-সম্বন্ধই সময়ে সময়ে বিগ্রহ-সম্বন্ধেরও কারণ হইয়া উঠিত। বৎসরাজ উদয়ন কর্ত্তৃক বাসবদত্তার যে অপহরণ বৃত্তান্ত লইয়া "প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্" নাটক রচিত হইয়াছে,

সেই বৃত্তান্ত আমরা বৌদ্ধগ্রন্থেও তুল্য ভাবে বর্ণিত দেখিতে পাই [ধম্মপদের ২১-২৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য]। এই বাসুলদত্তা বা বাসবদত্তাই উজ্জয়িনী-পতি প্রদ্যোতের কন্যা। তাঁহার পাণি-গ্রহণে উৎসুক হইয়া সেই কালের অন্যান্য নরপতি-গণও প্রদ্যোত-পাদ-প্রান্তে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন—এই কথা আমরা "প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণম্" নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে উল্লিখিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানিতে পারি। যথা

অস্মৎ সম্বন্ধো মাগধঃ কাশিরাজো বাঙ্গঃ সৌরাষ্ট্রো মৈথিলঃ শূরসেনঃ।
এতে নানার্থৈর্লোভয়ন্তো গুণৈর্মাং কন্তে বৈতেষাং পাত্রতাং যাতি রাজা॥

কন্যার জন্য পাত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কথোপকথন-কালে, প্রদ্যোত স্বমহিষীর নিকট এই রাজাবলীর নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বৎশরাজ উদয়নের ভাগ্যই সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। বৎসরাজ-বংশের সহিত অবন্তি-রাজ-বংশের বিবাহ-সম্পর্ক প্রমাণিত হইল। ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে মগধ-নাথ বিম্বিসার কোশল-রাজের এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং পরে তিনি স্বপুত্র অজাতশত্রুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে, পতি-বধে শোকাকুলা ভগিনীর দুঃখ-নির্ব্বাপণ-কল্পে কোশলরাজ পিতৃহন্তা অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। যুদ্ধে মগধরাজেরই জয় হয় এবং যুদ্ধের ফলে অজাতশত্রু কোশল-রাজবংশীয়া এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই বৃত্তান্ত হইতে কোশল-রাজকুলের ও মগধ-রাজকুলের মধ্যে বৈবাহিক-সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইল।

এখন দেখা যাউক, মগধের সঙ্গে বৎসরাজ্যের এইরূপ কোন সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল কি না? ভাসের "স্বপ্নবাসবদত্তম্" নাটক হইতে আমরা দেখাইয়াছি যে, বৎসরাজ-সচিব যৌগন্ধরায়ণের বুদ্ধি বলে, অবন্তিনাথ প্রদ্যোতের দুহিতা বাসবদত্তার জীবদ্দশায়ই অজ্ঞাতসারে কৌশাম্বিপতি উদয়ন মগধনাথ "দর্শকের" ভগিনী পদ্মাবতীকে মগধ রাজধানী রাজগৃহ নগরেই বিবাহ করেন, এবং এই বিবাহের ফলেই, মগধনাথ "দর্শকের" হস্তি-হয়-রথ-পদাতি চতুরঙ্গ সৈন্যের সহায়তায় উদয়ন শত্রুহস্ত হইতে আত্মরাজ্য পুনরায় কাড়িয়া লয়েন। এখন বিচার আবশ্যক, এই "দর্শক" কে?

বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে শৈশুনাগ রাজগণের যে বংশাবলী প্রদত্ত আছে, তাহাতে রাজগণের সংখ্যা ও সংজ্ঞা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। পুরাণের মতে শিশুনাগবংশের পঞ্চম নৃপতি বিম্বিসার। কথিত আছে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম মগধের রাজধানী রাজগৃহ-নগর নির্ম্মাণ করান, এবং অঙ্গদেশ জয় করিয়া মগধ-রাজ্যকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী করেন। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রুও রাজগৃহ-নগর হইতেই রাজ্যশাসন করিতেন; লিচ্ছবি-বংশীয় প্রতিপক্ষগণের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য তিনি কেবল পাটলি নামক স্থানে এক দুর্গ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। "মহাপরি-নির্ব্বাণ সূত্র" নামক বৌদ্ধগ্রন্থে এই দুর্গ সংস্থাপনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বায়ুপুরাণের মতে, অজাতশত্রুর পৌত্র মহারাজ উদয়ী সর্ব্বপ্রথম পাটলিপুত্র নগর সংস্থাপিত করিয়া, রাজগৃহ নগর হইতে রাজধানী তথায় উঠাইয়া লইয়া যান। পাটলিপুত্র বা কুসুমপুর সংস্থাপনের কথা বায়ুপুরাণের ৯৯ অধ্যায়ের, ৩১৯ শ্লোকে পাওয়া যায়, যথা—

স বৈ পুরবরং রাজা পৃথিব্যাং কুসুমাহ্বয়ম্।
গঙ্গায়া দক্ষিণে কূলে চতুর্থেঽব্দে করিষ্যতি॥

উত্তরকালে পাটলি বা কুসুমপুরই কেবল মগধের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেরও রাজধানী ছিল। উপরি উল্লিখিত পুরাণ সমূহের মতে অজাতশত্রুর পর, তদীয় পুত্র 'দর্শক" মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। কেবল বায়ুপুরাণেই এই ক্রমের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। তন্মতে, "দর্শক" অজাতশত্রুর পুত্র না হইয়া বিম্বিসারের পুত্ররূপেই উল্লিখিত; মৎস্য, বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণের মতে "দর্শক" অজাতশত্রুরই পুত্র ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত; এবং

তাহাই সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয়। বৌদ্ধগণও তাঁহাদের অনেক গ্রন্থে, অজাতশত্রুর পর, "দর্শকের" নাম উল্লেখ না করিয়া, পাটলিপুত্রনগরসংস্থাপক উদয়ী বা উদয়িভদ্রকেই অজাতশত্রুর পুত্র ও উত্তরাধিকারী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ স্থলে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজনীয়। কেবল বায়ুপুরাণের মতে এই রাজার নাম "দর্শক" বলিয়া উল্লিখিত, যথা—

"পঞ্চবিংশৎ সমা রাজা দর্শকস্তু ভবিষ্যতি"।

৯৯ অঃ। ৩১৮ শ্লোঃ

মৎস্যপুরাণের মতে অজাতশত্রুর পুত্রের নাম "বংশক", বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের মতে তাঁহার সংজ্ঞা "দর্ভক"। "বংশক", "দর্ভক" ও "দর্শক"—ইঁহারা একই ব্যক্তির নাম, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; এবং পুরাণোদ্ধৃত বংশতালিকাতেও তাঁহার স্থান অজাতশত্রুর পুত্ররূপেই ধৃত আছে। গো-তীর্থের [Oxford] পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পার্জ্জিটার সাহেব মহোদয় তৎসম্পাদিত "কলিযুগ রাজ-বংশ সম্বন্ধে পুরণোক্তপাঠ নিচয়" ["The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age"] নামক সদ্যঃপ্রকাশিত গ্রন্থের দ্বাবিংশ পৃষ্ঠায় ২৯ নং পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে, "দর্শক" নামটি ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে (লিপিকর প্রমাদবশতঃ) "বংশক", "দর্ভক" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, "Dorsaka seems the most central form"; অর্থাৎ, নামটির মৌলিক আকার "দর্শকই" ছিল। এখন দেখা যাইতেছে যে, অজাতশত্রুর পর, তদীয় পুত্র "দর্শকই" মগধের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। যদিও কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে অজাতশত্রুর পর তৎপুত্র "দর্শকের" নাম উল্লিখিত না দেখিয়া, উদয়ীকেই তৎপুত্র ও তদুত্তরাধিকারী বলিয়া উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ সাহেব মহোদয় পুরাণোক্ত পর্য্যায়কেই গ্রহণীয় বলিয়া ধরিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন,—"It is difficult to decide which version is correct, but on the whole the authority of the Puranas seems to be preferable in this case. If Darsaka or Harshaka was a reality nothing is known about him"—History of India, Second Edition P. 35.

যতদিন ভাসের নাটকাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছিল না, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বাস্তবিক বলিতে বাধ্য ছিলাম যে, "দর্শক" ঐতিহাসিক রাজা হইয়া থাকিলেও, তাঁহার সম্বন্ধে পুরাণোক্ত বংশ-পরিচয় ব্যতীত আর বেশী কিছু জানা যাইত না। কিন্তু, ভাসের নাটক হইতে এই বংশ-পরিচয় ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া সমর্থিত হইল, এবং "দর্শক" নামটি যে শশ-বিষাণের ন্যায় অবস্তু নয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। তিনি মগধের রাজা ছিলেন; তিনি তাঁহার ভগিনী পদ্মাবতীকে বৎসরাজ উদয়নের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন; এবং তিনি তাঁহার নিজ সৈন্যসামন্ত দিয়া ভগিনীপতির শত্রু-হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। "স্বপ্নবাসবদত্তম্" নাটকের পঞ্চমাঙ্কের একস্থানে মগধরাজের কঞ্চুকী উদয়নের নিকট দর্শকের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া বলিতেছেন,—

"অস্মাকং মহারাজো দর্শকো ভবন্তমাহ—এষ খলু ভবতোঽমাত্যো রুমণ্বান্ মহতা বলসমুদয়েনোপযাতঃ খল্বারুণিমভিঘাতয়িতুম্। তথা হস্ত্যশ্বরথপদাতীনি মামকানি বিজয়াঙ্গানি সন্নদ্ধানি। তদুত্তিষ্ঠ তু ভবান্। অপি চ,
ভিন্নাস্তে রিপবো ভবদ্গুণরতাঃ পৌরাঃ সমাশ্বাসিতাঃ
পার্ষ্ণী চাপি ভবৎপ্রয়াণসময়ে তস্যা বিধানং কৃতম্।
যদ্যৎ সাধ্যমরিপ্রমাথজননং তত্তন্ময়ানুষ্ঠিতং
তীর্ণা চাপি বলৈর্নদী ত্রিপথগা বৎসাশ্চ হস্তে তব॥"

"আমাদের মহারাজ দর্শক আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন,—আমার অমাত্য রুমণ্বান্ মহতী সেনা লইয়া আরুণির অভিঘাতের উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। বিজয়ের অঙ্গীভূত আমার হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি—এই চতুর্ব্বিধ সৈন্যও সুসজ্জিত আছে। অতএব, আপনিও

উত্থিত হউন। আরও দেখুন,—আপনার রিপুকুল উৎসাদিত হইয়াছে; আপনার গুণে অনুরক্ত প্রজাবর্গ সমাশ্বস্ত হইয়াছে; আপনার যুদ্ধযাত্রা-সময়ে সৈন্যের পৃষ্ঠদেশ রক্ষারও বিধান করা হইয়াছে। [মোট কথা.] শত্রু-নাশ-জনক যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তত্তাবতেরই বিধান করা হইয়াছে। সম্প্রতি, গঙ্গা পার হইলেই বৎসরাজ্য আপনার করতল-গত হইতে পারিবে।"

"স্বপ্নবাসবদত্তম"-নাটক হইতে আমরা আর একটি ঐতিহাসিক তথ্যেরও সমর্থন প্রাপ্ত হইয়াছি। "দর্শকের" সময় পর্য্যন্ত রাজধানী যে, রাজগৃহ নগরেই সংস্থাপিত ছিল, তাহার প্রমাণ এই নাটকের প্রথমাঙ্কেই দুইবার পাওয়া যায়, যথা—

"সৈষা নো মহারাজমাতরং মহাদেবীমাশ্রমস্থামভি-গম্যাভ্যানুজ্ঞাতা তত্রভবত্যা রাজগৃহমেব যাস্যতি"।

অন্যত্র, এক ব্রহ্মচারী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে "কুত আগম্যতে?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন "ভোঃ শ্রূয়তাম্। রাজগৃহতোঽহং"। সুতরাং পুরাণোল্লিখিত দর্শক পুত্র উদয়িকর্ত্তৃক পাটলিপুত্র নগরনির্ম্মাণ বিবরণ সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারিবে। "দর্শকের" রাজ্যকাল পর্য্যন্তই রাজধানী রাজগৃহ নগরে সংস্থাপিত ছিল। পুরাণোল্লিখিত রাজবংশাবলীর বিবরণ উপেক্ষায় উড়াইবার উপায় নাই। অন্যান্য প্রমাণাবলীর সহিত তত্ত্ববিচ্ছেদে বিচার করিয়া যাহা গ্রহণীয়, তাহার গ্রহণ হইতেই হইবে।

"দর্শক" ঐতিহাসিক রাজা বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। তাঁহার অভ্যুদয়-কাল গৌতম-বুদ্ধের মহা-নির্ব্বাণের অল্পকাল পরেই নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। কারণ, অজাতশত্রুর রাজত্বের শেষভাগেই বুদ্ধ মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। বৎসরাজ উদয়ন ও অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের রাজত্ব চলিত থাকিতেই মগধরাজ অজাতশত্রুর মৃত্যু ঘটিয়া থাকিবে, এবং তৎপরেই "দর্শক" মগধের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া থাকিবেন। মগধরাজ-কুলের সহিত বৎসরাজকুলের বৈবাহিকসম্পর্ক ছিল বলিয়া যে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও প্রমাণিত হইল। "দর্শক উদয়নের হস্তে ভগিনী পদ্মাবতীকে দান করিয়া স্বসৈন্য-সাহায্যে বৎস-রাজের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া ছিলেন, এই জন্য মহারাজ অবন্তিপতি প্রদ্যোতও মগধরাজ "দর্শককে" অভিনন্দন-বাণী প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। তাহাও এই নাটকে উল্লিখিত আছে।

অবান্তর আরও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য ভাস-নাটক-চক্র হইতে সংকলিত হইতে পারিবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নাটকগুলির পাঠ ও আলোচনা আবশ্যক। ইত্যলমতি বিস্তরেণ

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

ঢাকার ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

(ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত।

বিগত ১৩১৯ সালের সাহিত্য জগতে ইতিহাস সৃষ্টিই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল, এ কথা আমরা "গৌড়-রাজ মালার" আলোচনা সম্পর্কে বলিয়াছি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ "ঢাকার ইতিহাসও" সেই ইতিহাস বিভাগেরই প্রাধান্যের পরিচয় দেয়।

আধুনিক বাঙ্গালার দীক্ষাগুরু বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া-ছিলেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না।' কিন্তু বাঙ্গালী বাঙ্গালার ইতিহাসের যে ধ্যান ধরিতে চায়, বাহিরের লোকে তাহা ধরাইতে পারিবে না; বাঙ্গালী তাহার ইতিহাসের যে রূপ দেখিতে চায়, বাহিরের লোকে তাহা দেখাইতে পারিবে না। তাই বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, 'একখানি ইংরাজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। ঐরূপ গ্রন্থের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের কোন সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গালী জাতির ইতি-

হাস উহাতে কিছুই নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালীর ভরসা নাই।' কিন্তু 'কে লিখিবে?' বঙ্কিমই উত্তর করিয়াছেন, 'তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। ....আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য সে ততদূর করুক। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।'

বঙ্কিমের আগ্রহের আহ্বান বাঙ্গালী শুনিয়াছে। আমরা প্রকৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাইতেছি। অক্ষয়কুমার, কালীপ্রসন্ন, রমাপ্রসাদ, যতীন্দ্রমোহনের গ্রন্থগুলিতে দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গালার ইতিহাসের কত বিচিত্র দিকে কর্ম্মীগণের প্রযত্ন নিয়োজিত হইতেছে।

সংক্ষিপ্ত ভাবে হইলেও "গৌড়রাজমালা" একটা রাজ্যের ইতিহাস। বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার দিনে গৌড়-রাজমালার প্রতি বাঙ্গালীর চিত্ত প্রবল আগ্রহে ধাবিত হয়; কারণ ঐ গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বহুকাল আর্য্যাবর্ত্তের কণ্ঠলগ্ন প্রাচ্য ভারতের দেশগত জাতীয়ত্বের প্রথম উন্মেষের ইতিহাস, বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় সত্তার প্রথম স্বতন্ত্র বিকাশের ইতিহাস। যে বাঙ্গালী সেই এই ইতিহাস পাঠে ভাবে বিভোর হইয়া উঠিবে। কিন্তু "ঢাকার ইতিহাসের" আকর্ষণ অন্যরূপ। ইহা স্থানীয় ইতিহাস শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু অন্য সকল জেলার ইতিহাস হইতেও "ঢাকার ইতিহাসের" একটা বিশেষত্ব থাকিবে। এই জেলার বিভিন্ন স্থানকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাভার প্রদেশে বৌদ্ধ পালবংশীয়গণের, বিক্রমপুরে হিন্দু সেন ও বর্ম্ম বংশীয়গণের, সোনারগাঁ প্রদেশে মুসলমান পাঠানগণের এবং নিজ ঢাকায় মুসলমান মোগলগণের রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত থাকাতে, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ঢাকার ইতিহাস বঙ্গরাজ্যের ইতিহাসে মিশিয়া যাইবে। "ঢাকার ইতিহাসে" স্থানীয় ইতিহাসের সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া রাজ্যের ইতিহাসের বিশালতর প্রবাহের সহিত পরিচয় হইবে। এই দুই প্রকৃতির যথোপযুক্ত সামঞ্জস্য সাধন অল্পায়াসসাধ্য নহে। কিন্তু আশা করি যতীন্দ্রমোহন তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন। যতীন্দ্রমোহন আমাদের বন্ধু, তাঁহার গ্রন্থ ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত; তাই ভয় হইত, পাছে আপনার লোক বলিয়া অতি প্রশংসা দ্বারা তাঁহার কৃত কর্ম্মের গৌরবলাঘব ঘটাই। কিন্তু ঢাকার সহিত ঘনিষ্ঠসম্পর্কবিহীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুধীগণও যতীন্দ্রমোহনের কণ্ঠে জয়মাল্য অর্পণ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর গ্রন্থ মধ্যে ঢাকার ইতিহাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে। আশা করি গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে দেখিব, গ্রন্থকারের কৃতিত্বে ঢাকার স্থানীয় ইতিহাস যথোপযুক্ত ভাবে বঙ্গের রাজ্যেতিহাসের গুণগৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত বিশেষত্বের সম্যক্ সম্পাদনে যতীন্দ্র বাবুর যোগ্যতার প্রমাণ আমরা তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের মধ্যেই পাইতেছি। যতীন্দ্র বাবু তাঁহার কর্ম্মের যে অংশ সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার বিশেষত্ব রহিয়াছে। তিনি কেবল ইতিহাস রচয়িতা নহেন, তিনি ইতিহাস নির্ম্মাতা— ইতিহাস রচনার উপকরণের উদ্ধার কর্ত্তা। উন্নত পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রতিভাশালী লেখক এখন ঘরে বসিয়াই ইতিহাস রচনা করিতে পারেন। রাজ্য সম্বন্ধীয় দলীলপত্র, শিলালিপি, ধাতুপট্ট প্রভৃতি পুরাতনের নিদর্শন-গুলি এখন প্রতীচ্য-মণ্ডলের সর্ব্বত্রই ব্যবহারার্থ স্থানে স্থানে সযত্নে সুসজ্জিত থাকে। তালিকা, বিষয়সূচী, সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া ঐতিহাসিকের পথ সুগম ও তাঁহার সময়ের অপব্যয় নিবারিত করিয়া দিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ঐতিহ্যের আলোচনা কারখানার ন্যায় শ্রেণীবিভাগে সুবিন্যস্ত, সমবায়-শক্তিতে পরিচালিত, ও সুপ্রণালীসংবদ্ধ হইয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এতদ্দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গালার ইতিহাস বিষয়ে, এখনও সে দিন আসে নাই। বাঙ্গালার ঐতিহাসিকের এখনও মাঠে যাইয়া শিলালিপির উদ্ধার

করিয়া, জঙ্গলে প্রবেশ পূর্ব্বক ধ্বংস-স্তূপের আবিষ্কার করিয়া, প্রাচীন গ্রামবাসীর নিকট হইতে কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া, তাহারই ইতিহাস রচনা করিতে হয়। যতীন্দ্র বাবু পনর বৎসরের অধিক কাল হইতে এই উদ্ধার-কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তাহারই ফলে "ঢাকার ইতিহাসের" প্রথম খণ্ডে আমরা ঢাকা জেলার যে বিবরণ পাইয়াছি, তাহা অমূল্য।

গ্রন্থকার নিজেই জানাইয়াছেন, "ঢাকার ইতিহাস ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ভৌগোলিক বিবরণ, ভূতত্ত্ব, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বন্দর, জমি ও জমা, প্রাচীন কীর্ত্তি, তীর্থস্থান ও পুণ্যস্থান, দেবালয় এবং ঐতিহাসিক স্থান প্রভৃতির বিবরণ প্রথম খণ্ডে লিখিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ড হইতেই প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দু শাসনকাল হইতে বারভূঞার আমল পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে মোগল ও ইংরেজ শাসনকালের ইতিহাস লিখিত হইবে। চতুর্থ খণ্ডে বিভিন্ন পরগণার বিবরণ এবং জমিদারদিগের বিষয় আলোচনা করিব"।

ইতিহাসের চিরপ্রবহমান ঘটনা-স্রোতের যে অংশগুলি খণ্ডিত হইয়া নিশ্চল ভাবে এখন অতীতের নিদর্শন স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে, সেইগুলিই ঢাকার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে ঢাকার বিবরণ রূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। এগুলি কি ছিল এবং কি হইয়াছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ব্যাখ্যানই পরবর্ত্তী গ্রন্থভাগে ঢাকার ইতিহাসরূপে রচিত হইবে।

সংগৃহীত বিবরণগুলির যথোপযুক্ত সন্নিবেশে যতীন্দ্র বাবুর অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইলেও দুই একটি ত্রুটিও লক্ষিত হয়। স্থানে স্থানে পুনরাবৃত্তিহেতু গ্রন্থ কলেবর অনাবশ্যক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি উচ্চদরের ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মের উল্লেখ যতটুকু স্থানের দাবী করিতে পারে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। একেবারে আধুনিক বিষয় বা ব্যক্তি-সম্পর্কে এরূপ ঘটিলে, বর্ণিত বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাহিত্য রূপ ঐতিহাসিকের পক্ষে সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় মহদ্‌গুণটী ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু সুখের কথা, এই সকল সামান্য ত্রুটিতে যতীন্দ্র বাবুর আসল কার্য্যের গৌরবের লাঘব হয় নাই। তাহার বিবরণীর সম্পূর্ণতা ও বিশালতা হইতে ঢাকার ইতিহাসের উচ্চাঙ্গত্বের যে আভাষ পাই, তাহাতে স্থির বুঝা যায় যে, অনাবশ্যক বর্ণনার পরিত্যাগ, বর্ণিত বিষয়ের সহিত নিঃসম্পর্ক ভাব, সমগ্র বিষয়ের তুলনায় বর্ণিত বিষয়-বিশেষের উপযুক্ত পরিমাণবোধ প্রভৃতি ঐতিহাসিকোচিত গুণাবলীর অভাব গ্রন্থকারের হইবে না।

ইতিহাস রূপে আকারিত না হইলেও, এই খণ্ডের দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ, ও চতুর্বিংশ অধ্যায়ে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি, প্রসিদ্ধ দেবালয়, পুণ্যস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ আছে, তাহা বাঙ্গালা দেশবাসী পণ্ডিত-সাধারণ সকলের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে। আজকাল এগুলির মূল্য সকলেই অল্পবিস্তর বুঝিতেছেন। কিন্তু হয়ত এই খণ্ডের অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিকে নীরস ভৌগোলিক বা অর্থনৈতিক তথ্যের তালিকামাত্র মনে করিয়া, ইতিহাসগ্রন্থে স্থানদান করিতে অনেকে দ্বিধা করিতে পারেন। বাস্তবিক কিন্তু, নদ নদী, খাল বিল, গ্রাম নগর, কৃষি বাণিজ্য, জমি জমা, হাট বন্দর, মেলা বাজার, স্থাপত্য ভাস্কর্য্য, ও অন্যান্য শিল্পনিদর্শন—এই গুলিকেই দেশের বস্তুগত ইতিহাস বলিতে হইবে।

ইতিহাস কেবল অক্ষরেই লিখা থাকে না। প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে মানুষের প্রবেশকাল হইতেই ইতিহাস গঠিত হইতে থাকে। "মানব যখন যাযাবর অবস্থায় চর্ম্ম ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্র পরিত্যাগ করতঃ কোথাও বসতি করিয়া অপর দ্রব্যমাত্রের অধিকারী হইয়াছে, তখন হইতেই ইতিহাস-গঠনের আরম্ভ হইয়াছে। যখনই ভূমিপৃষ্ঠে রাস্তা, গড়খাত ও ক্ষেত্রের পত্তন

হইয়াছে, তখনই মানুষের কার্য্যনিদর্শন ভবিষ্যতের জন্য রক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।" "সভ্য মানব যে দেশেই বাস করিয়াছে সেখানেই এমন সকল বস্তুগত নিদর্শন রহিয়াছে, যদ্দারা আমরা মানবের ইতিহাসের পুনর্গঠন করিয়া তুলিতে পারি।*

কেবল শিল্পনিদর্শন নহে, মানচিত্রে প্রদর্শিত তথ্য সকল হইতেও আমরা ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের ধারার অনুসরণ করিতে পারি। মিশরপুরাতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক পণ্ডিত ফ্লীণ্ডার্স পেট্রি বলিয়াছেন "ইংলণ্ডের সবিস্তার মানচিত্রের যে কোন খণ্ডে দেশবাসীর ইতিহাসের প্রধান ঘটনাগুলি অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। কোন নগরের রাস্তা ও সরকারী কার্য্যস্থানগুলির অবস্থান দৃষ্টে ঐ নগর কিরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায়। রাজবর্ত্মসমূহের গতিপথ দৃষ্টে বুঝা যায়, কোন পথটী নগর প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল কোনটি পরে হইয়াছে। নগর হইতে নগরান্তরে যাতায়াতের পথ দৃষ্টে বিচার করিলে নগরগুলির প্রতিষ্ঠা-কালের পৌর্ব্বাপর্য্য মোটামুটি ধরা পড়ে। পল্লীপ্রদেশের প্রান্তরবাহী সোজাসুজি মেঠো পথগুলি এখনও আমা-দিগকে দেখাইয়া দেয় যে, ঐ পথগুলির যেখানে আরম্ভ ও শেষ, তত্তৎস্থলে বহু পুরাতন কালে দেশের কর্ম্মকেন্দ্র-গুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহাদের মধ্যে যাতায়াত জন্যই ঐ পথগুলির পত্তন হইয়াছিল। এই রূপ, যদি কোন দেশের ছয় ইঞ্চিতে এক মাইল হিসাবে একখানি মানচিত্র মাত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলেও দেশবাসীগণের বসতি-স্থাপন, সংখ্যাবৃদ্ধি, ও আর্থিক অবস্থার ইতিহাসের উদ্ধার করা যায়।" † পেট্রি বুঝাইয়া দিয়াছেন, মানবাধ্যুষিত জড়জগতের অবস্থার বিচার দ্বারা, কেবল সাময়িক ব্যাপারবিশেষের নহে, পরন্তু ব্যাপার হইতে ব্যাপারান্তরে পরিবর্ত্তন-প্রবাহের, এমন কি দীর্ঘকাল-ব্যাপী সামাজিক অবস্থার ইতিহাস পর্য্যন্ত আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি।

অতএব দেখা যাইতেছে, ঢাকার ইতিহাসের এই খণ্ড কিরূপ বহুমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। এতদ্দেশের ইতিহাস সম্পর্কে এই বিবরণ-রূপের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। ঢাকার ইতিহাস রচনার পথে এখনও বহু পথিকের পদচিহ্ন দেখা দেয় নাই। এরূপ অবস্থায় এই বিবরণ-ভাগ সম্মুখে থাকিলে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক ব্যাখ্যানের কৃতিত্ব বিচার সহজ হইবে। বর্ত্তমানের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া আমরা বুঝিতে পারিব যে গ্রন্থকারের কারণ নির্দ্দেশ যথেষ্ট হইতেছে কি না।

এই বিবরণ-সংগ্রহের আর একটি মূল্য এই যে, সর্ব্ব-বিধ্বংসী কালের সংহার-হস্ত হইতে যাহা কিছু অতীতের চিহ্ন এখনও রক্ষা পাইয়াছে, তাহার একটি মুদ্রিত বিবরণ ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য পাওয়া গেল। পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়াবিশেষত্বে অতীতের নিদর্শন যেরূপ ত্বরিত গতিতে অপহৃত হয়, তাহাতে ভবিষ্যৎ তথ্যানুসন্ধানকারীর পক্ষে বর্ত্তমান বিবরণ অমূল্য-সম্পদ স্বরূপ হইবে।

এরূপ সংগ্রহ যে কেবল প্রভূত শ্রমের পরিচায়ক তাহা নহে, পরন্তু গ্রন্থকারের সততারও সাক্ষ্য প্রদান করে। ভুল ভ্রান্তি সকলেরই হইতে পারে। তাই যেন

* "So soon as man becomes a settler and acquires anything beyond the skin and wood vessels of the nomad, he begins to lay by history; so soon as he disturbs the surface of the land by roads, entrenchments, or fields, he leaves the proof of his industry to the future,......There is no land in which civilized man has lived in which we can not reconstruct his history entirely from his material remains."—Flinders Petrie's Essay on Archaelogical Evidence—"Lectures on the Method of Science."

† Petrie's Essay on "Archaelogical Evidence"—Lectures on the Method of Science.

গ্রন্থকার বলিয়া দিতেছেন যে উপাদানরাজি সম্মুখেই উপস্থিত রহিয়াছে, বিভিন্ন যুক্তিপ্রয়োগ সম্ভব হইলে সেই ঘটনাসম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন।

সর্ব্বোপরি আমরা দেখিতেছি যে এইরূপ বিবরণেই প্রবন্ধারম্ভে উল্লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের বাসনা ফলবতী হইয়াছে। ইহার মধ্যেই আমাদের বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস রহিয়াছে। বাদশাহ সুবাদারের জন্মমৃত্যু গৃহ-বিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন বাঙ্গালার ইতিহাস নয়। আজ বাঙ্গালী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধানের ফলে আমরা বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস পাইতেছি। আমরা এখন দেখিতে পাইব, 'এই বৃহৎ দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল। রাজ্যশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত। রাজস্ব কি প্রকারে আদায় হইত, কে আদায় করিত, কি প্রকারে ব্যয়িত হইত। কে বিচার করিত, বিচারের নিয়ম কি ছিল, বিচারের সার্থকতা কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল। ধান্য কিরূপ হইত, রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্ত্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত। তাহাদিগের সুখদুঃখ কিরূপ ছিল। কোন কোন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল,—বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক চার্ব্বাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনার্য্য—কোন ধর্ম্ম কতদূর প্রচলিত ছিল। শিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা কতদূর প্রবল ছিল। কোন কোন কবি, কে কে দার্শনিক, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে। বাঙ্গালীর চরিত্র তদ্দ্বারা কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, সমাজ-তত্ত্ব কিরূপ, ধর্ম্মতত্ত্ব কিরূপ, বিবাহ, জাতিভেদ কিরূপ। বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্য্যে পরিপাট্য ছিল, কোন কোন দেশোৎপন্ন শিল্প, কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত। বিদেশযাত্রার পদ্ধতি কিরূপ ছিল। সমুদ্র পথে বিদেশে যাইত কি? যদি যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকার প্রকার কিরূপ ছিল, কোন দেশীয় লোকেরা নাবিক হইত, কোম্পাস ও লগ্ বুক ভিন্ন কি প্রকারে নৌযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। ভিন্ন দেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানী হইত, পণ্য কার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইত। ······ দেশীয় লোকের অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল। কেন মুসলমান হইল? কোন জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে?'

বাঙ্গলার ইতিহাসে এই সকলের অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই। যে গ্রন্থে এই সকল তত্ত্বের সমাধানের আয়োজন আমাদের সমক্ষে উপস্থিত এরূপ গ্রন্থের প্রকাশ বাঙ্গলা ভাষার স্মরণীয় ঘটনা। অনেকে সে কথা স্বীকার করিয়াছেন ইহা সুখের কথা।

ঢাকার ইতিহাস ঢাকা সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলী-ভুক্ত। ইহা পরিষদের সৌভাগ্য। 'পরিষদে' আলোচিত ও 'প্রতিভায়' প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধ ঢাকার ইতিহাসের গঠন-কার্য্যে কথাচিৎ সাহায্য করিয়াছে, ইহা সংশ্লিষ্ট সকলের সুখের কথা।

এই গ্রন্থ প্রকাশে গ্রন্থকারের বহুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি গ্রন্থ ক্রয় করিয়া গুণগ্রাহিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। দেশবাসীর, বিশেষতঃ ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভ্যবৃন্দেরও এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। পরিষদের সভ্যগণের জন্য মূল্য ৩।৹ টাকা স্থলে ৩৲ টাকা করিয়া দিয়া গ্রন্থকার তাঁহার পরিষদ-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের মনে রাখা উচিত যে বাঙ্গালা গ্রন্থের বিদেশে বিশেষ কাটতি নাই, অতএব এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বথা পালনীয়। ঢাকার ইতিহাস গ্রন্থখানি বাহ্যদৃশ্যেও অতি মনোরম হইয়াছে। ঢাকা জেলার স্কুলসমূহে পুরস্কার বিতরণ কালে ছাত্রগণকে এক এক খণ্ড ঢাকার ইতিহাস পুরস্কার দিলে কেবল গ্রন্থকারের ও সাহিত্যের উপকার হইবে তাহা নহে, সমস্ত জেলার অধিবাসী বালকবৃন্দ

অল্প বয়সেই দেশের সহিত পরিচিত হইয়া দেশকে ভাল বাসিতে শিখিবে। আশা করি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার।

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ *

গ্রন্থখানির নাম দেখিয়া স্বতঃই অনুমিত হয় যে ইহা পূর্ব্ববঙ্গের পালরাজগণের ধারাবাহিক ইতিহাস, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। গ্রন্থকার এই পুস্তকে পাল উপাধিধারী তিন জন রাজার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। এই তিন জন রাজার নাম শিশুপাল, যশোপাল ও হরিশ্চন্দ্র পাল। গ্রন্থকারের মতে শিশুপাল ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাশিয়ায়, যশোপাল তালিপাবাদ পরগণার অন্তর্গত মাধবপুরে, এবং হরিশ্চন্দ্র পাল কাশীমপুর পরগণার অন্তর্গত সাভারে রাজত্ব করিতেন।

এই তিন জনের মধ্যে অন্ততঃ প্রথম দুইজন সম্বন্ধে জন-প্রবাদ ব্যতীত অন্য কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। এরূপ অবস্থায় ইহাদের সম্বন্ধে কোন কথা লেখা বাস্তবিকই কঠিন। একদল লোক আছেন যাহারা ইহাদিগকে কাল্পনিক বলিয়াই উড়াইয়া দিবেন, এবং ইতিহাসের গণ্ডীর ভিতর টানিয়া আনিতে যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ করিবেন। অপর একদল লোক আছেন, যাহারা ইঁহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত সমুদয় প্রবাদ-বাক্যই বেদবাক্যবৎ মানিয়া লইয়া তদুপরি ইতিহাস রচনা করিতে প্রয়াস পাইবেন। এ ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বাবু যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি ইহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদবাক্যগুলি সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং প্রবাদ বাক্যানুযায়ী ইহাদের রাজ্য ও বাসস্থান যেখানে ছিল, তাহার বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। বীরেন্দ্র বাবুর কৃতিত্ব এই যে, তিনি ইহাপেক্ষা বেশী কিছু করিতে প্রয়াসী হন নাই।

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বীরেন্দ্র বাবুর বিশিষ্ট কৃতিত্ব, হরিশচন্দ্র পালের নামাঙ্কিত ইষ্টক আবিষ্কার। হরিশ্চন্দ্র যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এতদ্দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে। যতদূর মনে পড়ে, হরিশ্চন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এরূপ সন্তোষজনক প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আর আবিষ্কৃত হয় নাই। বীরেন্দ্র বাবুর ন্যায় যুবকের পক্ষে ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে। জনশ্রুতি হরিশ্চন্দ্র পাল সম্বন্ধে নানা বিচিত্র কাহিনী বহন করিয়া আনিয়াছে। বীরেন্দ্র বাবু সেই হরিশচন্দ্রের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মূল্য অনেক বেশী। আজকাল বাঙ্গালীর ইতিহাস লেখা অর্থে প্রায়শঃ ইংরেজীর তর্জ্জমা বুঝায়; কিন্তু বীরেন্দ্র বাবুর পুস্তক এই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। বাড়ীর নিকট যে সমুদয় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অযত্নে ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে, তিনি অশেষ শ্রম অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় সহকারে তাহার কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাই আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। পাঠক-সমাজে বীরেন্দ্র বাবুর পুস্তকের বিশেষ সমাদর হইবে, এরূপ ভরসা আমাদের নাই; কারণ, স্বাধীন ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের মূল্য এখন পর্য্যন্ত এতদ্দেশবাসীর হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। কিন্তু তথাপি এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিব যে বীরেন্দ্র বাবু যে পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাই প্রকৃষ্ট পথ। দেশের নানাস্থানে যে সমুদয় প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংসমুখে প্রয়াণ করিতেছে, বীরেন্দ্র বাবুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া যদি কেহ আমাদিগকে তাহার বিবরণ প্রদান

---

* শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর প্রণীত মূল্য ৷৹ আনা। ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

করেন, তবেই এ দেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে।

গ্রন্থের দুই একটি ভুল অমার্জ্জনীয়। যথা "খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে টলেমি ভারতের যে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন" পৃঃ ৪। বলা বাহুল্য, ভৌগোলিক টলেমি দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের লোক।

গ্রন্থকার যে প্রমাণাবলীর সাহায্যে একডালা দুর্গের স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত মনে হয় না (১৬ পৃঃ)। একডালা দুর্গ লইয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বেভারিজ ও অন্যান্য অনেকে তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, এমতাবস্থায় গ্রন্থকার একডালা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলেই ভাল হইত। গ্রন্থকার এক স্থলে লিখিয়াছেন, "কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় শব্দদ্বয় তখন প্রায় একার্থবোধকই ছিল," অথচ ইহার কোন প্রমাণ দেন নাই। পরিশিষ্টে গ্রন্থকার শাকাসর নামক স্থানে প্রাপ্ত স্তম্ভের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা অতীব মূল্যবান।

দেশের পুরাকীর্ত্তি সম্বন্ধে যাঁহাদের আগ্রহ আছে তাহাদের সকলকেই এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এইরূপ গ্রন্থের যত সম্মান হয়, দেশের পক্ষে তত গৌরবের বিষয়।

শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার।

ময়নামতীর গানের
আলোচনা *

[চট্টগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মৌলবী আব্দুল করিম ও শ্রীযুক্ত যোগিন্দ্রী মোহন দাস মহাশয় "প্রতিভায়" প্রকাশিত ময়নামতীর গান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন :—]

"গত কয়েক সংখ্যা হইতে আপনার পত্রিকায় ময়নামতীর পুঁথি" প্রকাশিত হইতেছে। সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাহার শেষ হইবে। এই পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। নানা বিষয়ে উক্ত সংস্করণে ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হইতেছে। নানা স্থানে পাঠের এবং প্রদত্ত শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা ইত্যাদির বিশেষ অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইতেছে আমরা মৌলবী আব্দুল করিমের প্রাপ্ত পুস্তক দেখিয়াছি ও তাহার একটী অবিকল নকল লইয়াছি। এবং এই পুস্তক সম্বন্ধে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি। তাহা চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদের গত মাঘ মাসের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছে।* শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম সাহেব অনেক বিষয়ে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের সহিত একমত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই উক্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে।

তৎপূর্ব্বে আপনার পত্রিকার প্রকাশিত পুঁথির বিশেষ আলোচনা করিতে বিরত রহিলাম। কিন্তু মাত্র দু একটী কথার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহা এই——

১। "তোর বাপের ঘর ছিল শঙ্খছরা মাটী।"

এই স্থলে "শঙ্খছরা" অর্থে "শঙ্খ বসান গৃহতল" করা হইয়াছে। কিন্তু এই "শঙ্খছরা" যে একটী গ্রামের নাম, বোধ করি প্রকাশকেরা তাহা অবগত নহেন। উক্ত শঙ্খছরা বর্ত্তমান সময়েও "শঙ্খছাইল" নামে ত্রিপুরা জিলায় বিদ্যমান আছে। ভাবিয়া দেখিলে শঙ্খছরা মাটি অর্থে শঙ্খ বসান গৃহতল কোন প্রকারেই হইতে পারে না। এই ছত্রের প্রকৃত অর্থ "তোর বাপের বাড়ী শঙ্খছরা গ্রামে ছিল।" এই সম্বন্ধে আমাদের প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। গোপীচাঁদের পিতা মাণিক চাঁদ শঙ্খছরা গ্রামে বাস করিতেন। এই শঙ্খছরাই আমাদের বর্ণিত শঙ্খছাইল। ময়নামতী ও মানিকচাঁদ যে পৃথক বাড়ীতে বাস করিতেন তাহার প্রমাণ পুঁথির কয়েক ছত্র পরেই পাওয়া যাইতেছে।

ময়নামতী মানিকচাঁদের মৃত্যু-কাহিনী পুত্রের নিকট বলিতেছেন ঃ— —

তোর বাপে পড়ি মৈল রাত্রি নিশা ভাগে
আমি খবর না পাইলাম সকালের আগে॥
লড় দিয়া গেল মুই রাজা দেখিবারে।
মৃত্যা দেহ লাগ পাইল শৈজ্যার উপরে॥"

ভিন্ন গ্রামে ও ভিন্ন বাড়ীতে না থাকিলে কেন রাত্রি নিশাভাগে মানিক চাঁদের মৃত্যু হইল অথচ ময়নামতী রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে খবর পাইল না এবং লড় দিয়া রাজাকে দেখিতে গেল?

"তোর বাপের ঘর" এই কথাটিই কি পৃথক বাড়ীর পরিচায়ক নহে? ভিন্ন না হইলে আমার বাড়ী বা তোর বাপের বাড়ী ইত্যাদি বলিবার প্রয়োজন কি ছিল?

আর লড় দিয়া যাওয়া কথাটা উক্ত পৃথক বাড়ীর নৈকট্যের পরিচায়ক। আমরা ময়নামতীর বাড়ী "কলিকা নগরকে" * "কলিকাপুর" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। উক্ত শব্দছাইলও কলিকাপুরের নিকটবর্ত্তী স্থান এবং "লড় দিয়া" যাইবার মতই নিকটবর্ত্তী।

"মাটী" অর্থ যে গ্রাম বা বাসস্থান তাহা দেখাইবার জন্য সমালোচ্য পুস্তক হইতে কয়েকটী ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আগু মাটী আছে কিছু মেহারকুল নগরে।
আগু মাটী আছে কিছু বিক্রমপুর সহরে॥
আর আছে আগু মাটী তরপের দেশ।
ছাটি গ্রাম পূর্ব্ব মাটী জানিবা বিশেষ॥" †

উল্লিখিত কয়টী স্থানে বাস করিয়া সিদ্ধা গোর্খনাথ যোগ তপস্যা করিয়াছিলেন। এবং এই চারি স্থানে তাহার চারিটী আস্তানা ছিল বলিয়াই বুঝা যায় না কি? ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী চরণ——

অস্রেথা হইল সিদ্ধ্যা খেতির উপর।
এক নাম রাখিবারে মেহার কুল সহর॥"

দ্বারা সিদ্ধ্যা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে পর স্থানেই আমার নাম আছে অন্ত ময়নামতীকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া যমের হাত হইতে রক্ষা করিয়া মেহার কুলে "এক নাম রাখিয়া যাইব। নতুবা সিদ্ধ্যা নামের খ্যাতির উপর কলঙ্ক হইবে।

২। "অবশ্য মরিবা তুমি আমরার বাশরে।
সপ্ত দিনের বাশি মরা করিব তোমারে॥"

এখানে "বাসরে" অর্থ "আমরা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে" করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। "বাসরে" অর্থ "বাড়ীতে"। অবশ্য তুমি আমাদের বাড়ীতে মরিবা, তখন তোমাকে সাত দিনের বাশিমড়া করিব। ভাব তুমি মরিয়া গেলে সমস্ত বাড়ীঘরই আমাদের হইবে। সমালোচ্য গ্রন্থেই বাসর শব্দ গৃহের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। গোপীচাঁদ বলিতেছে——

"শাছা নি য়াসিব জম বাড়ির ভিতর।
তবে লোহাএ বান্দিব পুনি আমার বাসর॥

অতঃপর বাসরের অন্য অর্থ করা চলে কি?

আমরা আমাদের প্রবন্ধে মানিকচাঁদ, গোপীচাঁদ, ময়নামতী, পদুনা প্রভৃতি প্রত্যেকের পৃথক পৃথক মহল বা বাড়ী ছিল তাহা দেখাইয়াছি। তাহার প্রমাণ স্বরূপ এখানেও দু একটী ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মানিক চাঁদের বাড়ীর কথা পূর্ব্বেই বলা হইল। এখন——

"তুমি মায়ের বড় বাড়ী কলিকানগর।
আমি বাড়ী বান্দিয়াছি মেহারকুল সহর॥

* * *

---

* আমাদের প্রাপ্ত পুস্তকের পাঠ। বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রাপ্ত পুস্তকে "কনিকা নগর" দৃষ্ট হইতেছে। ইহা সম্ভবতঃ 'ন' এর নীচের বিন্দু-লুপ্তির ফল। পূর্ব্ব কালে 'ন' এর নীচে বিন্দু দিয়া 'ল' লিখা হইত ইহা কাহারো অবিদিত নহে।

† নীচের দুই ছত্র "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া নির্দ্দেশের কারণ কি? লেখক।

"এক দিন ছিল রাজা নিকুঞ্জ মন্দিরে।
প্রভাতে চলিয়া গেল মায়ের হুজুরে॥"

* * *

"ভেট ঘাট জতেক বেগারের * মাথায় দিয়া।
খাশুরী দর্ব্বারে বধু চলিল হাটিয়া॥"

ময়নামতী

"গোপীচাঁদের মহল্ল্যাতে উত্তরিল গিয়া।" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা অঙ্গগুলিরও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না কি?

৩। "তরাজু" অর্থে "ছুরি" নহে, 'দাঁড়ি পাল্লা বা নিক্তি"।

"একে ত বানিয়ার পুত্র বিকির লাগল পাএ।
হস্তেতে তরাজু নিয়া ভাণ্ডার ঘরে যাত্র"॥

এখানে ছুরি নিয়া ভাণ্ডার ঘরে যাওয়া অপেক্ষা দাঁড়ি পাল্লা বা নিক্তি নিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক নহে কি? অভিধানেও তরাজু অর্থ দাঁড়ি পাল্লা বা নিক্তিই লিখিত আছে।

৪। "ঢৈতা" অর্থ "পাকাটি" নহে "ছন ঘাস"। ইহা দেশপ্রচলিত শব্দ। ত্রিপুরা পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী লালমাই ও ময়নামতী নামক স্থানে ছন ঘাসের বাহুল্য সত্বেও সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শোলা বা পাকাটি দিয়া ঘর ছাউনি দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যদিও অপ্রাপ্ত পক্ষে আজকাল দেশে কোথাও কোথাও তাহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সহস্র বৎসর কেন? শত বর্ষ পূর্ব্বেও ত্রিপুরা জিলায় পাট খেতের চিহ্ণ মাত্রও ছিল কি না সন্দেহ। তাই পাকাটি দিয়া ঘর ছাউনির কল্পনাটা খাপছাড়া বলিয়া মনে হয় না কি? বিশেষতঃ দেখা যায়।

ঢৈতার আটনি ঘর ঢৈতার ছাউনি।
আনা বান্ধে রহে ঘর বিশাই কারিগরী॥"†

ছনের ছাউনির ঘর ছন দিয়াই বন্ধন করা হইয়াছিল। যেমন বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ঘর আনা বান্ধেই থাকে।

নীচের ছত্রটি উপমা। শোলা দিয়া শোলার ঘর বান্ধা অবশ্যই অসম্ভব, কিন্তু কাঁচা ছন দিয়া ছনের ঘর যেমন তেমন করিয়া বান্ধা যায়। এই ঘরটী বাস করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল না। ময়নামতীকে পোড়া দিয়া অগ্নি পরীক্ষার জন্য করা হইয়াছিল, তাই সম্ভব যেন তেন প্রকারে ছন দিয়াই বন্ধনের কার্য্য সমাপ্ত করা হইয়াছিল।

৫। "চারি বর্ণ লাগিল খলার কারবার।
ভাঙ্গ খাই সিধ্যাএ লাগিল ঢুলিবার॥"

এখানে বর্ণ অর্থে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র কিনা? বড়ই হাস্যকর কথা! ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র কেন যে বৈশ্য * গোপীচাঁদের বাড়ীর হাড়ী বা মেথরের কর্ম্ম করিতে আসিবে বুঝা গেল না। এরূপ আজগুবী অর্থ করা সঙ্গত হয় নাই। আমাদের মতে এই "বর্ণ" শব্দ "বরণ" শব্দের লিপিকর প্রমাদ। "বরণ" অর্থ "প্রতিনিধি"। ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কেন না দেখা যাইতেছে হাড়িফার চারিজন প্রতিনিধি বা অনুচর খলার অর্থাৎ উঠানের কাজে লাগিয়া গেল, সিদ্ধ্যা নিজে ভাঙ্গ খাইয়া ঢুলিতে লাগিল। তাহার অনুচরগণ যে তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল তাহা ২।৪ ছত্র পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

"রজনী প্রভাত হইল উদিত তপন।
কান্দেতে কোদাল হাড়ি করিল গমন॥
একজন আগে জাএ দুইজন পিছে।
জমের পুত্র মেঘনালে ছত্র ধরিয়াছে॥"

৬। "রাজ আজ্ঞা পাই জ্যশী খড়ি হাতে লৈল।
পাঞ্জি দেখিয়া তবে গনিতে লাগিল॥"

এই স্থলে "যশী" শব্দের অর্থ "যশস্বী" কল্পনা করা হইয়াছে তাহাও ভুল। এখানে যশী শব্দ জ্যোতিষী শব্দের অপভ্রংশ। ইহাও লিপিকরপ্রমাদ। "পাঞ্জি

---

* বৈকুণ্ঠ বাবুর পুঁথিতে "গাথরের" দৃষ্ট হয়। গাথর হইতে বেগার কথাটাই ঠিক। বেগার অর্থে মুজুর।

† আমাদের প্রাপ্ত পুস্তকের পাঠ।

* আমাদের প্রবন্ধে আমরা গোপীচাঁদ ও হাড়িপাকে প্রভৃতিকে বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। লেখক।

দেখিয়া হাতে খড়ি লইয়া গণনা করা গণকের কর্ম্ম, যশস্বীর তাহাতে কোন হাত নাই। অথচ ইহার পূর্ব্বক্ষণেই গোপীচাঁদ তাহার অনুচরকে দৈবজ্ঞ আনিবার জন্য আজ্ঞা করিয়াছিলেন। যথা:—

"রাজাএ বলে শুন দুত বাটার পান খাইবা।
দৈব্বজ্ঞক আনিয়া শিঘ্রে দিন করি দিবা॥
তবে দুতে পাইল যদি রাজার প্রমাণা (ফর্ম্মন্)
দৈব্বজ্ঞক আনিয়া শিঘ্রে দিল তুরমান॥"

অতঃপর বশী শব্দকে যশস্বী বলা চলে কি?

৭। "ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া শিঙ্গাতে দিল ফুক।
পুরী থাকি চারি বধুর শুনিতে লাগে সুখ।" (শোক)

এই ধর্ম্ম ধর্ম্ম স্থলে আমাদের প্রাপ্ত পুথিতে—
"ধোও ধোও করিয়া শিঙ্গাতে দিল ফুক।"

এইরূপ পাঠ লিখা আছে। ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। কেন না শিঙ্গার ধ্বনি সাধারণতঃ ধূ ধূ বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে। আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া ফুক দিলেও যে তাহাকে কেবল বুদ্ধ ত্রিরত্নের এক রত্ন (!) মনে করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। ধর্ম্ম শব্দ কেবল বৌদ্ধদিগের একচেটিয়া নহে। এরূপ স্থানে অস্থানে বুদ্ধ দর্শনই বা কেন? উক্ত ধর্ম্ম ধর্ম্ম শব্দটাকে ধোও ধোও স্থলে লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই মনে হয়।

৮। তুমি হও মোর ঘরের জে স্তিরি।
আমি নাকি হই তোমার ঘরের যে গিস্তি॥
ঘরের রমণী স্থানে জ্ঞান জে শাদিমু।
গুরু বুলি কোন মতে পদ ধুলি লৈমু॥

এই স্থলে "গিরি" অর্থ "ঘরণী" করা হইয়াছে। ইহাও হাস্যজনক। কেন না মানিকচাঁদ ময়নামতিকে বলিতেছে "তুমি হও আমার ঘরের স্ত্রী আর আমি হই তোমার ঘরের গিরি বা গৃহী। ঘরের স্ত্রীর নিকট জ্ঞান সাধনা করিয়া গুরু স্বীকারে পদধূলি কেমন করিয়া লইব? তাই বলিতে হয়, স্ত্রীর আবার ঘরণী কেমন? ঘরণী অর্থও যে স্ত্রী। এই গিরি শব্দটি যে গৃহী শব্দের রূপান্তর তাহা সাধারণ চিন্তাতেই উপলব্ধি করা যায়। গৃহী অর্থ স্বামী এ কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না।

৯। "জিয়া থাকে গুপীচান্দ নাথে দেউক বর।
চারি বধুর দুগ্ধ খাএ্যা চল দেশান্তর॥

এই খানে "বধুর দুগ্ধ খাইয়া কথাটিকে উপহাসসূচক মনে করা হইয়াছে। তাহাও ঠিক নহে। কেন না ময়নামতীর ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধা মাতা পুত্রকে উপহাস করিবেন এরূপ ধারণায় আসে না। বিশেষতঃ এই স্থলে ময়নামতী পুত্রকে যোগী হইয়া জ্ঞান সাধিবার জন্য বরাবরই জেদ করিতেছেন এবং কেবলই জ্ঞান উপদেশ প্রদান করিতেছেন। হাস্যপরিহাসের ভাব এ স্থলে আসিতে পারে কি না সুধীগণের বিচার্য্য। আমাদের মতে এই দুগ্ধ খাইয়া শব্দের ভাবার্থ "মাতৃ সমা মনে করিয়া"—মায়ের স্তনের দুধ খাইতে যেরূপ দ্বিধা আসে না সেইরূপ দ্বিধা শূন্য ভাবে বধুগণকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া দেশান্তরে যাও। অর্থাৎ কামিনীর লোভে আর ভুলিয়ো না। কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি থাকিতে নাকি যোগসাধন হয় না, তাই।

এইরূপ উক্তি ময়নামতী আরও একবার করিয়াছিলেন, যখন তাহার বাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া গোপীচাঁদ বিদেশ গমনে স্বীকৃত হইয়া মাতৃ অনুমতি লইয়া মাত্র এক রাত্রির জন্য নিকুঞ্জ মন্দিরে বাস করিয়া বধুদিগকে প্রবোধ দিয়া আসিতে গিয়াছিলেন এবং প্রভাতে ময়নামতীর দরবারে আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন।

"সর্ব্বজএ * নেত নৃপ গলাএ বান্ধিয়া।
প্রণাম করিল মাএর চরণে ধরিয়া॥
জিউ জিউ গুপীচাঁদ নাথে দিউক বর।
চারি বধুর দুগ্ধ খাইয়া চল দেশান্তর॥"

* আমাদের প্রাপ্ত পুস্তকের সর্ব্বস্থানের "সর্ব্বজএ" এবং বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রাপ্ত পুঁথিতে "সর্ব্বগাত্র" দুই হয়। ইহাও সম্ভবতঃ পাঠোদ্ধারের ভ্রমেতে হইয়া থাকিবে। কিন্তু "সর্ব্বজএ" পাঠই সত্য বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ সর্ব্বগাত্রে নেত থাকিলে তাহা গলায় কিরূপে বান্ধা যায় বুঝা যাইতেছে না।

ইহাও কি পরিহাস ? তবে ময়নামতী কি কেবলই পুত্রের সহিত পরিহাসের ভাবেই ব্যবহার করিতেন ? কখনই নয়। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ বাবুই "প্রতিভা, ২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যায়" তাঁহার প্রবন্ধে ময়নামতীকে "নাছোড়-বান্দা" বিশেষণে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আরো দেখা যায় গুপীচাঁদের গুরু হাড়িফাও গোপী-চাঁদের সন্ন্যাস যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীগণকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন, এবং অনিচ্ছা সত্বেও গোপীচাঁদকে তাহা করিতে হইয়াছিল।

"মোহা জ্ঞান শিখ তুমি রৈতে না চাহ ঘরে।
ঘরে আছে চারি বধু মা বোলাও তারে"
... ...
"মাএ না ডাকিয়া যদি রৈতে চাহ ঘরে।
পিছেতে উপায় নাই জমে যদি ধরে॥"

ইহাকে পরিহাস বলিবেন কি ?

১০। কেঙ্গা ফলের অর্থ মাকাল ফল করায়ও আমা-দের আপত্তি আছে।

"ভাঙ্গি চাও কেঙ্গাফল ভিতর আন্ধার।" বৈকুণ্ঠ বাবুর পাঠে ',কেঙ্গা" স্থলে "কেন্দা" দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে তাহাও লিপিকরপ্রমাদ বা পাঠোদ্ধারের ত্রুটী। "কেন্দা" নামে কোন ফল নাই। মাকাল ফলের নাম যে কেন্দা তাহাও কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই মনে হয়, আমাদের প্রাপ্ত পুস্তকের "কেঙ্গা" কেআ বা কেয়ার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেয়া গাছের ফল গুলিও বেশ সুন্দর ছোট কাঁঠালের মত, কিন্তু তাহা অভক্ষ্য ও অসার বলিয়া জানি।

২। "জে ঘরে থাকয়ে জান আপনযুক্য নারী।
ভাগ্য বৃদ্ধি নাহি তার পুরুষের নহে শ্রী॥"

"আপনযুক্য" নারীর অর্থ 'অলক্ষী' না হইয়া 'আত্মসুখী' হইলেই যেন সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। যে ঘরে আত্মসুখী রমণী বিরাজ করে সেই ঘরের পুরুষের ভাগ্য বৃদ্ধি হয় না এবং লক্ষী-শ্রী থাকে না। আর "আপনযুক্য" কথাটা স্বয়ংই "আত্মসুখী" বলিয়া পরিচয় দিতেছে। এ অবস্থায় "অলক্ষী" টানিয়া আনিয়া লাভ কি ?

অদ্য এই পর্য্যন্ত। পুথির মুদ্রণ শেষ হইলে ও আমাদের প্রবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে অন্যান্য কথার বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমাদের বিবেচনায় এই পুস্তকখানি বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রাপ্ত পুথির পাঠ ও আমাদের হস্তগত পুথির পাঠাদি মিলাইয়া সঙ্গত ও অসঙ্গত বোধে ঠিক পাঠ উদ্ধার করিয়া ও উত্তমরূপে শব্দার্থ ঠিক করিয়া পুনঃ মুদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাচীন কালের যে ইতিহাসের ছায়া এই পুস্তকে আছে তাহা অমূল্য।

শ্রীমোহিনীমোহন দাস।
শ্রীআবদুল করিম।

---

* সর্ব্বজয় নেতা বা কাপড় সম্বন্ধে দু একটী কথা বলি-তেছি। পূর্ব্ব কালে একপ্রকার মন্ত্রপূতঃ বা দৈবশক্তি সম্পন্ন বস্ত্র, যষ্ঠি, ও কবচ ইত্যাদি ব্যবহার করিবার প্রথা ছিল। এই সর্ব্বজএ নেতও তাহারই অন্যতম সন্দেহ নাই। এরূপ বস্ত্র ও যষ্ঠি ইত্যাদি ধারণ করিয়া যে খানে যে উদ্দেশ্যে গমন করা যাইত, তাহা সর্ব্বদা সুসিদ্ধ হইত। তন্মধ্যে সর্পের মৈথুন সময়ে এক প্রকারে বস্ত্রকে শক্তিসম্পন্ন করা হইত। সর্পের মৈথুন সময়ে কেহ কোন প্রকার বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া দিলে উক্ত সর্প-মিথুন যদি স্বেচ্ছায় সেই বস্ত্রোপরি আসিয়া সঙ্গম সমাধা করিত, তবে উক্ত বস্ত্র এরূপ সর্ব্বজয়গুণসম্পন্ন হইত। আমরা আমাদের পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতা ভবানী-পুর লণ্ডন মিশনারী কলেজের সন্নিকটস্থ জলটঙ্গির ধারে এইরূপ দৃশ্য দর্শন করিয়াছি। তখন দেখিয়াছিলাম, এক ব্যক্তি এই দৃশ্য দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার গাত্র বস্ত্র উক্ত সর্প-মিথুনের সন্নিকটে আস্তৃত করিয়া দিয়া-ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিম্বা বহুল জনসমাগমে চমকিত হইয়াই সর্প-মিথুন ত্বরায় জলটঙ্গির পুষ্করিণীর জল সন্তরণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল। সেই সময়ে কৌতু-হল পরবশ হইয়া উক্ত বস্ত্রবিস্তার কারী ব্যক্তিকে উহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়াই উপরি উক্ত সর্ব্বজয় বস্ত্রের কথা জানিতে পারিয়াছিলাম।

এই ঘটনার পর বহুলোকের কাছে এই কথা শুনি-য়াছি। আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ মধ্যেও কেহ কেহ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন জানা যায়। মন্ত্রপূতঃ ও দৈব শক্তি সম্পন্ন বস্ত্র যষ্ঠি ও কবচ ইত্যাদি ব্যবহার বিরল নহে।—লেখক।

তৃতীয় বর্ষের সূচী

প্রতিভা, ১৩২০

বর্ণানুক্রমিক সূচী।